# শিপ্রা

জান্তব চুর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

* প্রচুর ফেন
* স্নেহময় স্পর্শ
* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

## —আমাদের ছেলেমেয়েদের নূতন বই—

নগেন্দ্রনাথ দত্তের **কুমড়োপটাস**
তোমাদের পরিচিত জীবনের অতি ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে লেখা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
**সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ**
বিশ্বসাহিত্য ও সাহিত্যিকের কথায় ভরা।

ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায়ের
**রাতের বিভীষিকা**
রাতে যারা ভয় দেখায়—তাদের কথায় ভরা।

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর
**হরেক রকম**
বইখানা শিশুচিত্তের খোরাকে ভরপুর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের **বিজ্ঞানের অ, আ**
বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বগুলি গল্পের ছাঁচে লেখা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রর
**জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন?**
সাধারণ জ্ঞানের অসাধারণ বই।

কালিদাস রায়ের **জাতকমালিকা**
গৌতমের পূর্বজন্মের কথা।

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর **দুর্গমপথের যাত্রী**
আবিষ্কার ও ভৌগোলিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**যা সকলে চায়**
ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

**এ, এন, ব্যানার্জ্জি**
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক। আর, এন, দাস রোড, ঢাকুরিয়া দক্ষিণ কলিকাতা।



শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত


# রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র


সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

পঞ্চদশ বর্ষ ( মাঘ, ১৩৪৮—পৌষ, ১৩৪৯ )

কার্য্যালয় :—১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।


## সূচীপত্র


| বিষয় ( বর্ণানুক্রমিক ) | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| অঙ্ক শেখার মজা ( প্রবন্ধ ) ... | শ্রীঅজিতলাল ঘোষ, বি.এস.সি ... | ১৭৮ |
| অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ( সত্য ঘটনা ) ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি ... | ৪৩০ |
| অনাদৃত ( কবিতা ) ... | ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্ | ১৬১ |
| অনেক—অনেক দূরে ... | শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... | ৪০০ |
| অভাব ( কবিতা ) ... | শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ১৯৬ |
| অভিভাষণ ( ঐ ) ... | অধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম্.এ ... | ৩৮৬ |
| অযাত্রার জীবনযাত্রা ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ ... | ১২৬ |
| অশথচারার মিনতি ( কবিতা ) | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ ... | ৩৭১ |
| অষ্টমী পূজোর দিন ( গল্প ) ... | শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ... | ২৭ |
| অসি রাজে ঝন্ ঝন্ (ধারাবাহিক উপন্যাস) | শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ... | ১৩৩, ৫০, ৯৫, ১৪৯, ১৬৩ |
| আওতে-আরোয়া ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ ... | ৪২০ |
| আজগুবি খেয়াল ( প্রবন্ধ ) ... | শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ ... | ১৮৭ |
| আফ্রিকার জঙ্গলে ( ঐ ) ... | শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ ... | ৫ |
| আমার মামার কাহিনী ( গল্প ) ... | শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী ... | ১১ |
| আমার স্বর্গ ( কবিতা ) ... | শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... | ৬১ |
| আমেরিকার একটি ছোট্ট ছেলে(জীবন-কথা) | শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ... | ৩২৬ |
| আষাঢ় এল ( কবিতা ) ... | শ্রীআশীষকুমার লাহিড়ী ... | ২০১ |
| আসামে ঘড়িয়াল শিকার (শিকার-কাহিনী) | শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত ... | ২৬৭ |
| একটি অদ্ভুত হ্রদ ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি ... | ৪৬২ |
| একটি রহস্যময় চুরি ( গল্প ) ... | শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ... | ১৪০ |
| একটি সত্যিকার বীরের কাহিনী(জীবন-কথা) | শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ ... | ২৮৬ |
| এক বিন্দু নয়নের জল ( গল্প ) ... | শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি ... | ৩৩০ |
| এক যে ছিল ফুলের পরী ( কবিতা ) | শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ৩২১ |
| কণ্টক ( গল্প ) ... | শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ ... | ১৫৫ |
| কলকাতার কুকুর ( ঐ ) ... | শ্রীশামুক ... | ৩৪৬ |

| বিষয় ( বর্ণানুক্রমিক ) | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কিরঘিজ ( প্রবন্ধ ) | শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ | ১০৯ |
| খেলাধূলা | শ্রীদেবলাল সেন | ৩১১ |
| খোকা ও শাদা পাখী ( কবিতা ) | শ্রীভবানী চৌধুরী | ৪১ |
| খোস্‌ গল্প ( গল্প ) | শ্রীকৌটিল্য | ৩৫৬, ৪৭০ |
| গিরিধারী-রহস্য ( গল্প ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি | ২০২ |
| গ্রীজ্ জি ভালুকের কবলে | শ্রীশান্তা দেবী | ৪৭৪ |
| চিঠিপত্র | ... | ৭৭, ১৯৭, ৩১৮, ৩৫৮, ৪০৩, ৪৮০ |
| চিত্রশালা | ... | ২২০, ২৭৫ |
| ছবির কথা ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত | ২৬২ |
| ছিঁটেফোঁটা ( কবিতা ) | শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি.এল্ | ৩৪৯ |
| জনার্দ্দনের বিপত্তি ( গল্প ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি | ৬৪ |
| জলের তেপান্তর ( কবিতা ) | শ্রীঅজিত দত্ত | ৪১৯ |
| ঠাকুরমার শাস্তি ( ঐ ) | শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী | ৮১ |
| তারকা ভস্ম ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী | ৫৮ |
| তৃপ্তি ( কবিতা ) | শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী | ৩০৮ |
| দরদী রবীন্দ্রনাথ (জীবন-কথা) | শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্যভূষণ | ৪৫৩ |
| দাঁড়কাক ( কবিতা ) | শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় | ৪৪৫ |
| ধাঁধার উত্তর | | ৪০, ৮০, ১১৯, ১৬০, ১৯৯, ২৩৯, ২৭৯, ৩২০, ৩৫৯, ৪০৭, ৪৪৩, ৪৮০ |
| নবযুগের কবি ( গল্প ) | শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ১৮১ |
| নানা প্রসঙ্গ ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি | ১৪৪, ৪০২ |
| নিওন্ গ্যাসের কাহিনী (ঐ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি | ২৩৫ |
| নিমাই পণ্ডিত ( জীবন-কথা ) | শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্ | ৪৩৩ |
| নিরুদ্দিষ্টের দল ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্.এ, বি.এল্ | ২৩, ৬২, ৯১, ১৩৭, ১৭৫, ২২১, ২৫৮, ২৯৩, ৩৪২, ৪১১, ৪৫৮ |
| নূতন ধাঁধা | | ৪০, ৮০, ১২০, ১৬০, ২০০, ২৪০, ২৮০, ৩২০, ৩৬০, ৪০৮, ৪৪৪, ৪৮০ |
| পম্পাইএ (ভ্রমণ-কথা ) | শ্রীঅমলশঙ্কর রায় | ৪৬ |
| "পরের উপকার ক'র না" ( গল্প ) | শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি | ৩০২ |
| পশুপাখীর ভাষা ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি | ৯৭ |
| পঁচিশ বছরের আগেই ( ঐ ) | ঐ | ৩৮০ |
| পাম্পায় ( প্রবন্ধ ) | শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ | ২১৫ |
| পালিয়েও পার নেই ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্.এস্-সি | ৩৩৬ |
| পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল | ... | ৩৯৮, ৪৭৭ |
| পুরানো পম্পাইএ ( ভ্রমণ-কথা) | শ্রীঅমলশঙ্কর রায় | ১৩৩ |





| বিষয় ( বর্ণানুক্রমিক ) | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পুস্তক-পরিচয় | ... | ৩৫৪ |
| পূজার ম্যাজিক | শ্রীদেবকুমার ঘোষাল | ৪০১ |
| প্রাচীন ভারতীয় গুহা ( ইতিহাস ) | শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্.এ, পি.আর.এস্ | ৮৬ |
| প্রাচীন ভারতের গুহা ( ঐ ) | ঐ | ১২২ |
| প্রায় ভূতের গল্প ( গল্প ) | শ্রীবুদ্ধদেব বসু, এম্.এ | ৩৭৬ |
| ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নাতে ( কবিতা ) | শ্রীসুনির্ম্মল বসু | ৩৬১ |
| বদ্যিনাথের ভাঁওতা ( গল্প ) | শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি | ১৯০ |
| বংকু বাবুর ব্যতিক্রম ( ঐ ) | ঐ | ২৫৮ |
| বাঙ্গালী বীর আশানন্দ ঢেঁকি | অধ্যাপক শ্রীনি রণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি | ২১২ |
| বাসে বিড়ম্বনা ( গল্প ) | শ্রীববীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি | ৪৩৬ |
| বিচার ( ঐ ) | শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ | ২৪৩ |
| বিচিত্র ভারত | ... | ২৯০ |
| বিদ্যার্থী হাবুল ( গল্প ) | শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ | ৩৭২ |
| বিশু বাবুর মামা ( ঐ ) | শ্রীশামুক | ২২৯ |
| বেদুইনের দেশে ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ | ১৭০ |
| বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ( প্রবন্ধ ) | অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ | ৩৯১, ৪৪৭ |
| বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি (বড় গল্প) | শ্রীআনন ঘোষাল | ৩১৪, ৩২২, ৩৬৮, ৪২৭, ৪৭২ |
| ভাগ্যবান্ ( কবিতা ) | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ | ১২১ |
| ভাদর ( ঐ ) | শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৮১ |
| ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক | ... | ৩৮, ১১৭, ১১৮, ২৭৬, ৩১৭, ৩৫৫, ৪৪১ |
| ভাল-মন্দ ( কবিতা ) | শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক | ৩২ |
| ভূষণের মা ( গল্প ) | শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ | ৩৯৪ |
| মণিমঞ্জুষা | ... | ১১৩, ১৮২, ৪২৪ |
| মনোরঞ্জন ( জীবন-কথা ) | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ | ৫৫ |
| মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা | ... | ৪৭৮ |
| মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল | ... | ৪০ |
| মা-কালী দর্শন ( কবিতা ) | শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি | ২৯১ |
| মিহিরকুমার ( জীবন-কথা ) | ... | ২২৮ |
| মুসারের দান ( গল্প ) | শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ২৭০ |
| মেঘের দেশে ( কবিতা ) | শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় | ২৪১ |
| মোটা মাসীমার মাত্র একদিন ( গল্প ) | শ্রীপ্রতিভা বসু | ৪৬৭ |
| যা হয়ে থাকে ( গল্প ) | শ্রীবাণী নিয়োগী | ২৮৩ |
| যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি | ১৭ |

| বিষয় ( বর্ণানুক্রমিক ) | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| যেখানে বাঘের ভয় ( কবিতা ) ... | শ্রীসমর সরকার ... | ৩৯৯ |
| যে সময়ের যা ( প্রবন্ধ ) ... | শ্রীঅখিল নিয়োগী ... | ১৬৭ |
| রবীন্দ্র-স্মরণে ... | ... ... | ৩২০ |
| রামধনু ( কবিতা ) ... | শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি ... | ৪০৯ |
| রামধনুর প্রতি ( ঐ ) ... | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ ... | ৩৫৩ |
| রাশিয়ায় যেখানে যুদ্ধ চলছে ( প্রবন্ধ ) | শ্রীগৌরী দেবী ... | ৩০৯ |
| রূপকথা ( কবিতা ) ... | শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ... | ১ |
| লেজ্ঞা ( ভ্রমণ-কথা ) ... | শ্রীসীতা দেবী ... | ৩৫০ |
| শিশু ( কবিতা ) ... | শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি.এ ... | ২১৯ |
| শিশুসাহিত্য-সংবাদ ... | ... | ২৭৮, ৪০৪, ৪৪০ |
| শ্রাবণে ( কবিতা ) ... | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... | ২৭৭ |
| শ্রীমতীর বিয়ে ( গল্প ) ... | শ্রীশান্তা দেবী ... | ৬৬ |
| ষ্টালিনগ্রাদ ( নাটিকা ) ... | শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ... | ৪৪৮ |
| সত্যিকারের রত্নদ্বীপ ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি | ২৫২ |
| সন্দেশ | ৩৯, ৭৮, ১১৮, ১৫৯, ১৯৮, ২৩৮, ২৭৮, ৩১৯, ৩৫৮, ৪০৫, ৪৪২, | ৪৭৮ |
| সবই এক ( প্রবন্ধ ) ... | শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী ... | ৩৬৩ |
| সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ... | ... | ১৮৬ |
| সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর ... | ... ... | ২২৪ |
| সাধুর কিস্‌মিস্ প্রদান ... | শ্রীদেবকুমার ঘোষাল ... | ২৪৬ |
| সাহেব ও তেলো দা ( গল্প ) ... | শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... | ১২৯ |
| সু-বাবু ও র-ডাকবাংলো ... | শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্ ... | ২২৫ |
| সেকালকার অগ্নি নির্ম্মাণ ( প্রবন্ধ ) | অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... | ৫৩ |
| সেলুলয়েডের কথা ( ঐ ) ... | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্.এস্-সি | ২৯৭ |
| সোমড়ার ভোমরা ( কবিতা ) ... | শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি | ৪৫৭ |
| স্ফিংকস ( প্রবন্ধ ) ... | শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্ ... | ২৬ |
| হরিবিলাসের স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তন ( গল্প ) | শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি ... | ১০৩ |
| হরে মাঝি ( ধারাবাহিক উপন্যাস ) | শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি.এ, | ২, ৪৩, ৮৩ |
| হাবুলের আস্ফালন ( গল্প ) ... | শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ ... | ৭৩ |
| হিমালয়ের ছাদ ( সচিত্র প্রবন্ধ ) | অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি | ৪১৫ |
| হুঁসিয়ার ( গল্প ) ... | শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ ... | ৩৮৮ |

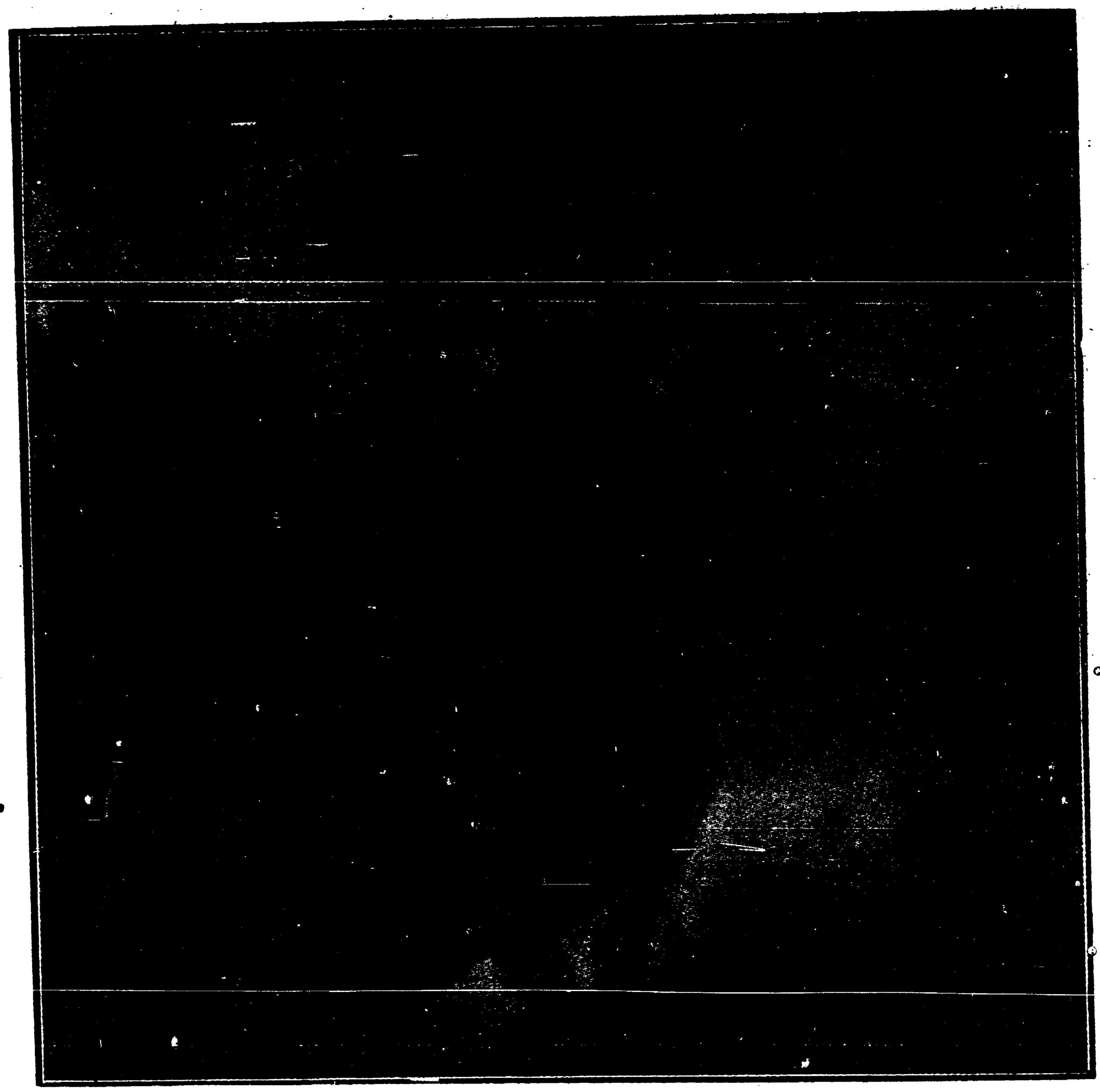

পাহাড়ের প্রাণ

( পৃথিবীর একখানি বিখ্যাত ছবি )

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৮ { ১ম সংখ্যা

## রূপকথা

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম্. এ, বি. এল্

আমাদের খোকাবাবু বড় ভালো ছেলে,
চায় না ক' আর কিছু বই কোনো পেলে,
এক মনে পড়ে তাহা প্রাণ মন ঢেলে
কোনো দিকে চোখ নাহি দিয়ে।
প্রতিদিন ঘুম ছেড়ে ওঠে ভোর বেলা,
পড়া বড় প্রিয় তার, নাহি করে হেলা,
আর খেলা জানে না ক'—পড়া-পড়া খেলা,
পড়ে শুধু বই কোলে নিয়ে।

পাহাড়ের প্রাণ

( পৃথিবীর একখানি বিখ্যাত ছবি )

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৪৮ { ১ম সংখ্যা

## রূপকথা

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম্. এ, বি. এল্

আমাদের খোকাবাবু বড় ভালো ছেলে,
চায় না ক' আর কিছু বই কোনো পেলে,
একমনে পড়ে তাহা প্রাণ মন ঢেলে
কোনো দিকে চোখ নাহি দিয়ে।
প্রতিদিন ঘুম ছেড়ে ওঠে ভোর বেলা,
পড়া বড় প্রিয় তার, নাহি করে হেলা,
আর খেলা জানে না ক'—পড়া-পড়া খেলা,
পড়ে শুধু বই কোলে নিয়ে।

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

নাওয়াখাওয়া কোন কথা ভাবেনাক'-কিছু,
সব কথা ভুলে গিয়ে মাথা ক'রে নীচু
বই খুলে পড়ে যাঁহা, তারি পিছু পিছু
মন তার ছোটে ধীরে ধীরে।

এক মনে পড়ে শুধু, পড়ে দিনে-রেতে,
যত পড়ে তত তা'র মন ওঠে মেতে,
মা আসিয়া ডাক দিলে যায় তবে খেতে,
খেয়ে এসে ফের পড়ে ফিরে।

বিছানায় শুয়ে রাতে বই নিয়ে পাশে,
নাড়ে তাহা যে-অবধি ঘুম নাহি আসে;
বইখানি বুকে নিয়ে শুতে ভালবাসে,
বুকে নিয়ে ঘুম যায় শেষে।

ঘুমঘোরে হাসে কিবা মুখখানি তা'র,
ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে নড়িছে আবার,
স্বপনের দেশে বুঝি হাজার হাজার
রূপকথা শোনে খোকা হেসে!

স্বপনের দেশে বুঝি পরীদের সাথে
কত কথা বলাবলি চলে মাঝরাতে,
দেহখানি প'ড়ে শুধু থাকে বিছানাতে,
আমি তাহা দেখি ঠায় বসি';
দেখি আর প্রাণ মম করে উচাটন,
আমিও খোকার সাথে করি না গমন?
হায় হায়, মন আর নয় যে তেমন—
পরীদের দেশে গিয়া পশি।

---

# হরে মাঝি

[ ধারাবাহিক উপন্যাস ]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক:—প্রায় দেড়শ' বছর আগে অজয়ের খানাঘাটে হরি মাঝি খেয়ারীর কাজ করিত। স্বভাবের গুণে সকলে তাহাকে ভালবাসিত। হরি খুব বলশালী ও পাকা লাঠিয়াল ছিল, তার সাকরেদ ছিল দীনু ও তিনু। দেশে তখন ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী। একবার শালোগুার রায়বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইল। হরি অজয়ের বন্যায় ভাসিয়া-আসা এক মোহুরের বাক্স পাইয়া অবস্থা ফিরাইয়াছিস কিন্তু লোকে তাহা জানিত না। হিংসুকেরা রটাইল হরি ডাকাত—ঠগী দলের সঙ্গে তাহার দলের যোগ আছে। হরি ও তাহার মনিবদের ডাক পড়িল, কিন্তু শেষে দেখা গেল হরিরই বীরত্বে সেদিনকার ঐ ডাকাতি সফল হইতে পারে নাই। শাস্তির বদলে হরি সরকার হইতে পুরস্কার পাইল।



এই সময়ে দেশে ছেলেধরার উৎপাত দেখা দিল। তাহারা ছেলেদের ভুলাইয়া লইয়া বহুমূল্যে ওলন্দাজ জলদস্যুদের কাছে বিক্রয় করিত। একদিন হরির ভাগিনেয় 'কটা'কে পাওয়া গেল না। 'হয় কটাকে ফিরাইব, নয় ফিরিব না'—প্রতিজ্ঞা করিয়া হরি গৃহত্যাগ করিল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে শুনিল, এক গ্রামে এক সন্ন্যাসী আছেন—তিনি হারানো ছেলে ফিরাইতে পারেন। হরি সাধুর নিকট গেল ও তাঁহারি নির্দ্দেশমত তাঁহার দলে যোগ দিল। ইহারাও জলদস্যুর দল—ওলন্দাজ আড়াকাটি ও সাগরযাত্রীর নৌকা লুট করিয়া ছেলে ধরিয়া আনিত, ঐ সব ছেলেরা 'কর্ম্মকাণ্ড' আশ্রমে থাকিয়া নানা শিক্ষাদীক্ষার পর জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিত। নিজ প্রতিভা বলে হরি শীঘ্রই দলের নেতা হইল। এদিকে দীনু-তিনু নানা জায়গা ঘুরিয়া ঘটনাচক্রে হরির দলে আসিয়া জুটিল। হরি এক দুর্দ্ধর্ষ ওলন্দাজ জলদস্যুর বাহিনী আক্রমণ করিয়া তাহাদের পরাস্ত করিল এবং তাহাদের নেতা ডাইক্ সাহেবকে বন্দী করিল; কিন্তু শেষে, ডাইক্ দস্যুতা ছাড়িবে—তাকে দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া, ছাড়িয়া দিল। ইহার পর হরি জানিতে পারিল 'কটা' ডাইকেরই কাছে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে শোনা গেল, ডাইক্ প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করিতেছে। শেষে হরি এক পত্র পাইল, তাহাতে ডাইক্ হরিকে একা বা সদলবলে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা করিতে আহ্বান করিয়াছে।

## ১২

হরি দূতের হস্তে প্রত্যুত্তর দিল। তখন ডুয়েল বা দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রচুর প্রচলন ছিল—ডাইক্ ইহাতেও হরিকে আহ্বান করিয়াছে মনে হয়।

হরির অজ্ঞাতেই কর্ম্মকাণ্ডে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল—নূতন নূতন ছিপ, নূতন নূতন অস্ত্রে সজ্জিত করা হইতে লাগিল—যে সকল গাবর ছুটীতে গিয়াছিল তাহাদিগকে অবিলম্বে যোগ দিবার আদেশ জারি হইল। সকলেই বুঝিল ডাইক্ সাহেবকে মুক্তি দেওয়া মোটেই সঙ্গত হয় নাই। সমস্ত ইউরোপীয় জলদস্যুর সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হইবে না।

হরি নির্ভীক অথচ উদাসীন—তবুও একটা রিভলবার লইয়া ডাইকের চিঠির প্রত্যেক হরফটাকে লক্ষ্য করিয়া কুড়ি হাত দূর হইতে গুলি ছোঁড়া অভ্যাস করিত। প্রায় প্রতিদিন পুরা একঘণ্টা এই ব্যায়াম চলিত। এমনি অমোঘ লক্ষ্য যে প্রত্যেক হরফটাই গুলিবিদ্ধ হইত।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মাত্র কয়েকজন কর্ম্মীসহ একটী ছোট বজরায় হরি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থান অভিমুখে রওনা হইল। দীনু-তিনুর একান্ত আগ্রহে তাহাদিগকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইল। কর্ম্মকাণ্ডের আয়োজন ও অনুরোধ ব্যর্থ হইল। অন্ধকার রাত্রি, গঙ্গায় জোয়ার ডাকিয়াছে—দূরে দেখা গেল অসংখ্য বজরা, ভাউলে ও ছিপ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে গঙ্গাবক্ষ বেড়িয়া উজানে আসিতেছে। আর ঐরূপ আর একটী বহর ভাটায় ঠিক অনুরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া মনে হয় দুই দিক্ হইতে ঘেরাও করিবার জন্যই ওই অভিযান—এই ব্যূহরচনা। হরির বজরার লোকেরা এই সমাবেশের সমারোহে একটু চিন্তিত হইল। তিনু একটা সড়কী সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া আনিয়াছিল, ভাবিল সর্ব্বাগ্রে সে সেই নিমকহারাম ওলন্দাজটাকে বিঁধিবেই।

এদিকে হরির নিষেধ সত্ত্বেও 'কর্ম্মকাণ্ড' নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহারাও বহর বহুদূরে লুক্কায়িত রাখিয়াছে—আক্রমণের চেষ্টা দেখিলে তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিউগিল বাজিয়া উঠিল—বিদেশী বহরের উভয় দিকেই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল। হরি গঙ্গাবক্ষে আলোকমালার দ্রুত সঞ্চরণই কেবল নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিল।

একটু পরেই একখানা বৃহৎ বজ্‌রা অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—অন্য কোনও ছিপ্ বা নৌকা সঙ্গে নাই। বজ্‌রা আসিয়া হরির বজ্‌রার প্রায় গায়েই লাগিল; হরি উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজন ইউরোপীয় হরির বজ্‌রায় উঠিল—একজন পূর্ব্ব পরিচিত ডাইক্ সাহেব, অন্যটিকে হরি চিনিতে পারিল না।

ডাইক্ হাস্যমুখে যেই হরির করমর্দ্দন করিল অমনি দূরে বিদেশী বহরগুলিতে বিলাতী ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল।

ডাইক্ হরিকে বলিল—"আপনি আমার প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন তার কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ আমি দিচ্ছি। আমি জানতে পেরেছি 'আড়াকাটি' আপনার ভাগ্নেকে ভুলিয়ে এনে আমাদের কাছে বিক্রী করেছে। আমি তাকে ভাল বেসেছি, শিক্ষিত করেছি, এবং কিছু সম্পত্তিও দান করেছি। এখন আপনার হাতে তাকে প্রত্যর্পণ করে তার মা এবং আপনার ন্যায় আত্মীয়গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর একটা কথা, আমি স্বদেশে ফিরছি। আমার বহর, যা এ দেশের প্রভূত ক্ষতি করেছে তা আজ আপনার অধীনে দিয়ে গেলাম, এবার থেকে এগুলি যেন বিপন্নের উদ্ধারে ও সাহায্যে নিয়োজিত হয়।" ডাইক্ যখন তাহার কথা শেষ করিল তখন বিদেশী বহরগুলিতে ব্যাণ্ড আরো জোরে—আরো মধুর স্বরে বাজিয়া উঠিল।

ডাইক্ কটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"যাও কেট, তুমি তোমার মামার কাছে রহিয়া যাও—আমাকে স্মরণ করিয়ো।" কটা রুমাল মুখে দিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

হরি স্তম্ভিত বিমুগ্ধ। ভালভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার সামর্থ্যও তখন সে হারাইয়াছিল। 'কটা' পুত্তলিকার ন্যায় পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল। কর্ম্মকাণ্ডের বহর হইতে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

---

## আফ্রিকার জঙ্গলে

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ধার দিয়ে কয়েকখানা জাহাজ চল্‌ছিল। জাহাজের উপর পর্ত্তুগীজ পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। আরোহীরা প্রথমে দেখতে পেল বালুকাময় বেলাভূমি, তার পেছনে সবুজ গাছের সারি দেওয়া

আফ্রিকার জঙ্গলের সাধারণ দৃশ্য : সার বেঁধে বুনো হাতীর পাল চলেছে।

উপকূল রেখা। কিনারা পেরিয়ে অদূরে কতকগুলি মাথা ভাঙ্গা পাহাড়; আসলে এগুলি হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। আর একটু এগিয়ে দেখা গেল সামনে এক বিশাল নদীর মোহানা। কিনারায় নেমে আরোহীরা জানতে পারলে যে নদীটির নাম "কঙ্গো" আর এই নদীর দক্ষিণে "ম'ওয়ানি কঙ্গো" নামক রাজা রাজত্ব করেন।

যাই হোক্, পর্ত্তুগীজরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে, আর সেইদিন থেকে তাদের সঙ্গে সুরু হ'ল শ্বেত জাতির বাণিজ্য। তার কিছুদিন পর এখানে একটি খৃষ্টান মিশনও বসান হ'ল।

এরা কিন্তু নদীর ভেতর বেশী দূরে যায় নি। নদীর মোহানা থেকে এঁকশ' মাইল দূরে জলপ্রপাতগুলি হয়ে দাঁড়াল প্রধান বাধা।

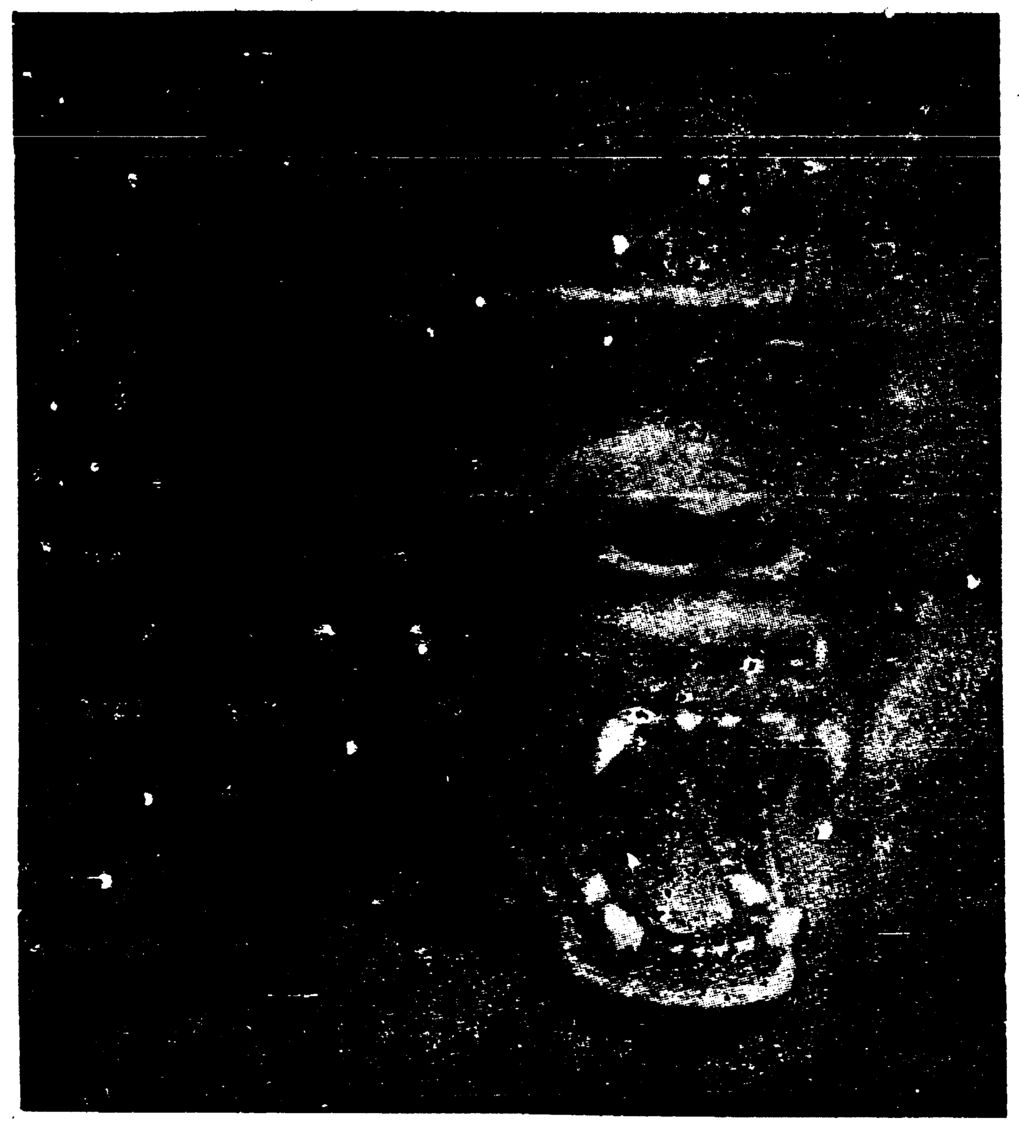

কঙ্গো দেশে যারা থাকে তাদের একজন প্রতিবেশী

এর কিছু দিন পর লিভিংষ্টোন, ষ্টামলী প্রভৃতি বিখ্যাত পর্য্যটকেরা আফ্রিকার নানা স্থান আবিষ্কারে বেরোলেন। এঁদের কথা তোমরা আগেই রামধনুতে কিছু কিছু শুনেছ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বেল্‌জিয়ামের রাজা লীয়োপোল্ড একটি ভালো রকম অভিযানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই সব জায়গার স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে মিলে-মিশে বাণিজ্য করা।

কঙ্গোনদীটি পৃথিবীর সব বড় নদীগুলির মধ্যে একটি লম্বায় প্রায় তিন হাজার মাইল অর্থাৎ গঙ্গার ত্'গুণ। এর উপত্যকাই ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমান। একজন ভৌগোলিক লিখেছেন যে ইউরোপ মহাদেশে যদি এই নদীটিকে নিয়ে বসান যেত তা হ'লে এর মোহানা হ'ত স্পেনে, উৎস হ'ত আনাতোলিয়ায় (তুর্কী) আর উপত্যকা উত্তরে সুইডেন থেকে সুরু করে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত যুড়ে থাকত।



এইখানে বাণিজ্য করবার জন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে স্থানীয় রাজাদের অনেকগুলি সন্ধি হয়। পাম্ অয়েল, তালের শাঁস, রবার, হাতীর দাঁত—ব্যবসার জিনিষের মধ্যে এইগুলিই ছিল প্রধান। এখনও অবশ্য এ সব আছে, তা' ছাড়া এখন ইউরোপে এখান থেকে নানা রকম খনিজ পদার্থ আর অন্যান্য কাঁচা মাল যায়।

কঙ্গো দেশের লোকেদের কথা শুন্‌তে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে; আর সেই কথাই আমি বল্‌ব। তার আগে এখানকার আবহাওয়ার কথা শুনে নাও।

এই জায়গাটা বিষুব রেখার কাছে, তাই এখানে সারা বছরই বর্ষা হয় আর তার সঙ্গে হয় খুব গরম। বছরে এখানে গড়ে প্রায় ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। রোগের উৎপাত এখানে বড় কম নয়—গ্রীষ্মপ্রধান সমতল প্রদেশে যত রকমের রোগ আছে প্রায় সবই দেখা যায়; তবে উঁচু জায়গাগুলোতে রোগের প্রতিপত্তি কিছু কম। সব চেয়ে অস্বাস্থ্যকর যায়গা হচ্ছে "বোমা" অঞ্চল। সমুদ্র-উপকূল কিছু ঠাণ্ডা, দেখ্‌তেও বেশ সুন্দর।

এখানে স্ত্রীলোকেরাই চাষের কাজ করে; পুরুষেরা শিকার করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে আর মাছ ধরে। এখন এখানে রবার-চাষ, রবার-শিল্প খুব বেড়ে চলেছে। কাসাই নদীর ধারে অল্প বর্ষা হওয়ায় এখানে খাম-আলু, মেনিয়ক—এই সব হয়। তা ছাড়া এখানে "সেট্‌-সী" মাছি কম, সেজন্য গোপালনও সম্ভব হয়েছে।

কঙ্গো নদীর ধারে অনেক খনি আছে। এই খনিগুলির মধ্যে "কাটাঙ্গা" প্রধান। এখানে হীরে পাওয়া যায়। তা ছাড়া "ক্যাম্বোড্" বলে একটা জায়গায় অনেক তামা পাওয়া যায়। "কিলো-মোটায়" সোনারও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব জায়গায় রেল-লাইন বসান তেমন সুবিধে হয়ে উঠতে পারে নি, তাই নদীর মধ্যে জায়গায় জায়গায় ষ্টীমার চলে। স্থানে স্থানে অবশ্যি রেলও আছে। কঙ্গো নদীর মোহানায় "ব্যানানা" হচ্ছে বন্দর, বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

উৎস হ'তে কিছু দূরে তোমরা এলে দেখতে পাবে যে চারিদিকে বড় বড় গাছ। তার মাঝে ত্' একটী পাতার কুঁড়েঘর। তুমি নিশ্চয়ই ষ্টীমারে যাবে; আর যেই তোমার ষ্টীমার বাঁশী বাজাবে অমনি কাতারে কাতারে লোক জড় হবে

ষ্টীমার দেখতে। তুমি যদি ৫০ বছর আগে যেতে তা হ'লে তুমি হয়তো আর ফিরে আস্‌তে পারতে না—তারা তোমায় ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু আজকাল তেমন নয়, তারা শান্ত খোকাটির মত দাঁড়িয়ে দেখে। তাদের পানে তাকালে তুমি দেখবে যে তাদের গালে মোটা মোটা গর্ত্ত করা সব উলকি; এই উলকিগুলো আলাদা আলাদা দলের চিহ্ন। পাছে কেউ অন্য দলে চলে যায় তাই এই চিহ্ন দেওয়া হয়। একটু ভেতরে গেলেই ছোট্ট বসতি দেখতে পাবে। রাস্তার ছ'ধারে ছোট ছোট ছ' সারি ঘর। ঘর বা কুঁড়েগুলো সব বাঁশ আর তালপাতা দিয়ে তৈরী। সাধারণতঃ একটি কুঁড়ে ঘরে মাত্র একটি ঘর। আসবাবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বড় জোর একটি টুল আর ছ' একটি মাছুর।

আশে পাশে এঁরাও আছেন

ঘরের বাইরেই পরিস্কার বাগান। তারা এইখানে নিজেদের জন্যে কলা, খাম-আলু, কাসাভা এই সব তৈরী করে। ছেলেরা যৌবনে পা দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে আলাদা ঘর তৈরী ক'রে বাস করে।

এখানকার লোকেদের খাবার হচ্ছে মাছ, বাঁদর আর জঙ্গলী ইঁদুর, তা ছাড়া সাধাবণ ফলমূল। গ্রামের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী মানুষ হচ্ছে "যাছুকর ডাক্তার",



আর তার পর হচ্ছে গ্রাম্য সর্দ্দার। যাছুকর ডাক্তারকে গ্রামের সকলেই ভয় করে কারণ তারা মনে করে যে ডাক্তার রেগে গেলে অভিশাপ দেবে। এই ডাক্তারগুলি সময় সময় মন্ত্র-টন্ত্র করে নাকি তাদের যথেষ্ট ক্ষতি করে। এখানকার লোকেরা যে সব এক জাতের তা নয়, নানা জাতের লোক এখানে থাকে। তাদের ভাষা, কাপড়-চোপড় পরার ঢং, সবই আলাদা। সাধারণতঃ তারা লম্বায় ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি।

সাদা আগন্তুকদের সঙ্গে জংলী অধিবাসীদের যুদ্ধ

সবচেয়ে ঢেঙ্গা লোকটি হয়তো [illegible] ফুট। ষ্টানলী সাহেব যখন প্রথম আসেন তখন এই সব লোকেরা তাঁদের দেখেই দে দৌড়। পরে যখন ষ্টানলীর লোকেরা তাদের ধরে আনল তখন ষ্টানলী বল্‌লেন, "ছেড়ে দাও, ছেলে মানুষ"। কিন্তু আসলে তারা কেউই ছেলে নয়, অনেকেই বুড়ো—কারুর হয়ত বয়স পঁয়তাল্লিশ, কারুর বা পঞ্চাশ।

সমস্ত কঙ্গো উপত্যকাটি বেল্‌জিয়ান্‌দের নয়। বেল্‌জিয়ান্‌ কঙ্গোর উত্তরে "ফরাসী বিষুবীয় আফ্রিকা", তার উত্তরে "ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান"। বেলজিয়ান্‌ কঙ্গোর

দক্ষিণে "য়্যাঙ্গোলা"। এই অঞ্চলে চার শ' বছর হ'ল ইউরোপীয়রা রয়েছে তবুও তারা স্থায়ী ভাবে বাস করে নি, এইজন্য যে তাদের এ রকম জলবায়ু পোষায় না। বেল্‌জিয়ান্ কঙ্গোয় আগে "নিয়াম-নিয়াম" বলে এক জাত বাস করত। তারা খুব হিংস্র; কিছুদিন আগেও তারা নরমাংস খেত; তবে আজকাল আর খায় না। আজকাল তারা সুন্দর হাতীর দাঁতের কাজ করতে পারে। উবাঙ্গি নদীর ধারে এক রকম যোদ্ধা জাত থাকে; তারা বেশ বলিষ্ঠ, দেখতেও অপেক্ষাকৃত ভাল। যোদ্ধা অর্থে মনে ক'র না তারা ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন বা যান্ত্রিক-বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে। তারা যুদ্ধ করে তীর ধনুক, বর্শা, ঢাল এই সব নিয়ে।

কাফ্রী কুলিরা হাতীর দাঁত মাথায় নিয়ে জলা পার হচ্ছে।

এখানকার লোকেদের একটা বিশ্বাস আছে যে কোন লোক মরে গেলে সে তার নিজের সমস্ত জিনিষ নিয়ে যেতে চায়। তাই তারা কোন মৃত লোককে কবর দেওয়ার সময় তার দরকারী জিনিষ-পত্রও সঙ্গে পুঁতে দেয়। এমন কি কিছুদিন আগে তারা ক্রীতদাস এনে তাকে মেরে মৃত লোকের সঙ্গে পুঁতে দিত—যাতে মৃত ব্যক্তির পরলোকে গিয়ে চাকরের অভাব না হয়।

আর একটা মজার ব্যাপার তোমরা শুনলে খুব আশ্চর্য্য হবে যে এখানকার নদীর উপরকার সেতুগুলি লতাপাতা দিয়ে তৈরী। লতা ব'লে মনে কর না যে তোমার ছাদে যে আইভি বা ঝুমকো লতা আছে সেই লতা! সে লতা দিয়ে বড় জোর তোমার বোনের পুতুলের জন্য সেতু করা যাবে। সেখানকার লতাগুলি খুব মোটা আর সহজে সেগুলি ছেঁড়ে না। কোন রকমে নদীর



দু'ধারকার লতা একসঙ্গে লেগে গেলেই সেতু হয়ে গেল। লতাগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে সুন্দর ঝোলা পোল মতন হয়। তার উপর লোকেরা চলাচল করে। এক সঙ্গে ৫।৬ জন লোক গেলেও সেতু ছেঁড়ে না।

আঙ্গোলায় কাসাই, কুয়াঙ্গো এই সব নদীর ধারে অদ্ভুত উপায়ে সংবাদ পাঠান হয়। একটা কাঠের ড্রামের মত আছে, তাতে দু'টো ছেঁদা করা থাকে। তার উপর বড় বড় দু'ট কাঠি দিয়ে ঠুকলে খুব জোরে শব্দ হয় আর এই শব্দ দিয়েই তারা সংবাদ পাঠায়। এমনি করে সংবাদ দু' ঘণ্টার মধ্যে চল্লিশ মাইল রাস্তা চলে যায়। একজন বাজায়; আর একজন শুনে অন্য জনকে বলে, সে আবার অন্যকে বলে—এমনি করে। সেই হিসেবে এটাকে দেশীয় বেতারও বলা যেতে পারে।

---

# আমার মামার কাহিনী

শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী

'ধুমধাড়াক্কা' কাগজের সম্পাদক এখন বজ্রাঙ্গ বাবু—একাধারে মালিক এবং সম্পাদক দুই-ই। আর—

আর আমি তার লেখক। বলতে গর্ব্ব বোধ করছি আমিই 'ধুমধাড়াক্কা' মাসিক পত্রিকার প্রধান লেখক। যদিও এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—কারণ বজ্রাঙ্গ বাবু সম্পর্কে আমার মেজমামা হন। তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, মেজমামা আমার লেখা ভারী পছন্দ করেন (করবেন না কেন—খারাপ তো আর লিখি নে!)—তাই আমার যে কোনও লেখা তাঁর কাগজে ছাপার হরফে বেরিয়ে যায়। এমন সংখ্যা যায় না যাতে আমার দু'তিনটে লেখা না থাকে—তাও তো আমি নিজেই লিখে কুলিয়ে উঠতে পারি নে। এই অবস্থায় আমাকেই যদি 'ধুমধাড়াক্কার' প্রধান লেখক বলা হয় তবে বিশেষ অন্যায় হবে না নিশ্চয়ই। আমি নিজেও বেশ বুঝতে পারছি যে মামার পরে আমারই সম্পাদক হবার ঘোরতর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই সম্ভাবনার পথেই একদিন এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—

শারদীয়া সংখ্যার 'ধূমধাড়াক্কা'র জন্য খান তিনেক লেখা বগলদাবা করে মামাবাড়ীতে এসেছি। মামার অফিস-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি মামা নিবিষ্ট মনে কি একটা লেখা পড়ছেন। নির্ভয়ে ঘরে ঢুকে বল্লাম, 'এই নাও মামা—পূজো সংখ্যায় ছাপিয়ে দিও লেখা তিনটে, এ মাসে আর লেখার সময় নেই।'

মামা ছোট্ট একটা হাই তুলে বল্লেন, 'এনেছিস্? কিন্তু এ মাসে তো আর জায়গা নেই। যদি একটু ফাঁক পাই তো খবর দেব—এখন বরং নিয়ে যা।'

জবাব শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, কারণ এই রকম অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। আমার লেখা ছাপা হবে না—বিশেষতঃ মামার কাগজে—এবং স্থানাভাবের অজুহাত দিয়ে! এই অসম্ভব ঘটনা কেমন করে ঘটল ভেবে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাই আমি। পুরো এক মিনিট মামার মুখের দিকে চেয়ে আমি লেখাগুলি নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলাম—সোজা দোতলায় মেজমামীমার কাছে।

'কি ব্যাপার বল তো মামীমা? মামার কি অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?'

'কেন?'—মেজমামীমাও বেশ অবাক্ হলেন বোঝা গেল, 'কেন বল্ তো?'

ঘটনাটা আগাগোড়াই মেজমামীমাকে বল্লাম। মামীমা এতক্ষণে হেসে ফেল্লেন, 'ও, সে কথা আর বলিস নে। কে ওঁর এক বন্ধু জুটেছে নতুন—বশিষ্ঠ বাবু না কি নাম, তিনিই এবার সব লিখবেন শুনছি।'

মামার ভাবান্তরের কারণ বুঝতে পেরে লোকটার ওপর রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। 'ওঃ, ভারী বন্ধু এসেছেন উনি!' কঠিন স্বরে বল্লাম, 'তাই নাকি? এত দূর গড়িয়েছে ব্যাপার?'

'চুপ্, চুপ্; তোর মেজমামা শুনলে খুন হয়ে যাবি টম্। বল্লাম না ভয়ানক বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে। আজ আবার শুনলাম শীগ্‌গিরই নাকি বশিষ্ঠ বাবুই সাব-এডিটর হয়ে যাবেন ধূমধাড়াক্কার!'

অভিমান ভরে বল্লাম, 'তা হলে আমার লেখাগুলির কি হবে?'

মামীমা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'তার জন্যে ভাবনা কি? আমি ছাপাবার ব্যবস্থা করছি।'

'থাক্, খোসামোদ করে লেখা ছাপাতে চাই নে।' বেশ রেগে এই কথাগুলি বলে নীচে চলে এলাম ফের। মামার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মামার অট্টহাসি শুনে উঁকি মেরে দেখলাম মামা একটা লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন। আন্দাজে বুঝলাম উনিই বশিষ্ঠ বাবু। মামাই শুনলাম বলছেন: 'কিছু ভাবনা নেই আপনার—যে কোন লেখা নিয়ে আসবেন, আমি ছাপিয়ে দেব, মনে করবেন এটা আপনারই কাগজ।'—বটে? এই কথাগুলো না একবার



আমাকেও বলা হয়েছিল! আর আজ আমার লেখা ছাপা হয় না! বশিষ্ঠ বাবু বিগলিত হয়ে কি বল্লেন তা শোনবার আগেই আমি রাস্তায় নেমে এলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, নাঃ, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর মামাবাড়ী-মুখো হচ্ছি না।

তার পর, সত্যি কথা বলতে কি, সেই থেকে দেড় মাস আমি মামাবাড়ী ছাড়া। কিন্তু আমি স্বয়ং মামাবাড়ী ছাড়া হলেও মামাবাড়ীর খবর শুনতে আমার কোন বাধা হচ্ছিল না। ওঁদের অন্তরঙ্গতা শুনছি ইতিমধ্যে আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। মেজমামা আর বশিষ্ঠ বাবুকে আজকাল প্রায় সব সময়েই একসঙ্গে দেখা যায়—কাঁধ ধরাধরি অবস্থায়। আমিই তো ওঁদের কত দিন দেখেছি সিনেমা কিংবা রেস্তোরাঁয় কিংবা দ্বারিকের দোকানে।

দৈবাৎ কোনদিন চোখাচোখি হয়ে গেলে মেজমামা না চেনার ভান করে থাকেন। তার উপরে 'ধূমধাড়াক্কা' তো বশিষ্ঠ বাবুই একচেটিয়া করে ফেলেছেন। ওঁদের মাখামাখি আজকাল এতদূর গড়িয়েছে যে অনেক সাহিত্যিকেরও টনক নড়েছে লক্ষ্য করেছি। তার পর বশিষ্ঠ বাবু যখন তাঁর নতুন বইটা মেজমামার নামেই উৎসর্গ করে বসলেন তখন আমিও সত্যি সত্যি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এর একটা আশুপ্রতিকারের কথাই যখন ভাবছিলাম—তখন দ্বিতীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল আমার কিংবা মামার জীবনে।

বশিষ্ঠ বাবু লোকটি আসলে ভয়ানক সাত্ত্বিক প্রকৃতির—মাছ মাংস, ডিম স্পর্শ করেন না পর্য্যন্ত, নেহাৎ মেসে যদি কোনদিন মুর্গীর মাংস রান্না হয় তবে একটু চেখে দেখেন—তাও বন্ধুবান্ধবেরা খুব পীড়াপীড়ি করলে পর এবং পরিমাণও অতি সামান্যই। এখন, মেজমামা তাঁর ছোট ভাই অর্থাৎ আমার ছোটমামার বিয়েতে বশিষ্ঠ বাবুকে নেমন্তন্ন করলেন। আমিও এসেছি—না এসে আর করি কি—নিজের মামা যখন, ফেলতে তো আর পারি না। রাত্রি দশটার পর বাইরের 'খাওয়া-দাওয়ার' হাঙ্গামা চুকে গেলে পর মেজমামা আর বশিষ্ঠ বাবু ছোট এক ঘরে আলাদা খেতে বসলেন—টেবিল চেয়ারে মুখোমুখী। নানা রকম খাওয়ার পর এল 'মাটন্-কাটলেট'। চক্‌চকে দু'খানা প্লেটের উপর একখানা ক'রে কাটলেট, মাষ্টার্ড আর পেঁয়াজ দিয়ে সাজিয়ে ঠাকুর পরিবেশন করে গেল। মেজমামা একটা প্লেট নিজে টেনে নিয়ে আর একখানা বন্ধুর দিকে আদর করে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'নে বশিষ্ঠ, তোর কথা ভেবেই নিউ মার্কেট থেকে মাটন্ এনে কাটলেট করিয়েছি—খেয়ে দেখ্ কি জিনিষ।'

বশিষ্ঠ বাবু হাসতে হাসতে বল্লেন, 'তুই তো জানিস্ বজ্রাঙ্গ, ও সব আমি খাই না।'

মেজমামা হোঃ হোঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। 'হোঃ হোঃ! তোর দেখছি এখনও এ সমস্ত কুসংস্কার গেল না। 'হিন্দু ধর্ম্মের অধঃপতন' নামে আগামী মাসের ধূমধাড়াক্কায় একটা প্রবন্ধ ফাঁদব ভাবছি—তাতে তোর নাম 'মেন্‌সন্' করে দেব। কি বলিস্?'

বশিষ্ঠ বাবুও মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'তা দিস, আমার আপত্তি নেই।' এই বলে আর একটু হেসে কাটলেটের প্লেটটা ঠেলে দিলেন।

মেজমামা তখনও হাসছিলেন, হাসির বেগটা একটু কমিয়ে বললেন, 'আবার প্লেটটা সরিয়ে রাখলি কেন? একদিন খেলে তোর কিছু যায় আসে না—নে, খেয়ে ফেল্।'

বশিষ্ঠ বাবু মুখটা বেশ হাসি হাসি করে বললেন, 'নাঃ, খেতে ইচ্ছা করছে না ভাই।'

মেজমামা মুচ্‌কী হেসে বললেন, 'তুই তো আচ্ছা ক্ষ্যাপা! একটা কাটলেট খেয়েই ফেল্ না আমার অনুরোধে; কত লোকে বন্ধুর জন্য হাসতে হাসতে গলায় দড়ি দিয়ে ফেলে আর তুই সেই জায়গায় একটা সামান্য কাটলেট খেতে পারবি না! নে, খেয়ে ফেল্।'

'পাগল নাকি?'

'একদিন খেলে কি তোর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে শুনি?' মেজমামার গলাটা এবার আর ঠিক হাসি হাসি শোনাল না।

বশিষ্ঠ বাবু অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'তা বলে যেটা খাই না সেটা কি খাওয়া উচিত? তুই-ই বল্?'

মেজমামা অভিমান করে বললেন, 'তবে তুই খাবি না? আর কোনদিন তো বলি না—আজ বলছি, তুই আর আপত্তি করিস্ না ভাই বশিষ্ঠ!' প্লেটটা আবার এগিয়ে দেন মেজমামা।

বশিষ্ঠ বাবুও ভাবলেন বজ্জাত জেনেশুনেও তাঁকে লোভ দেখাচ্ছে। তা না হলে এত জিদ হবে কেন? তাঁরও কেমন জানি আজকে রোখ চেপে গেল, গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, আজ আমি কিছুতেই খাব না।'

মেজমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এটা কি তোমার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না বশিষ্ঠ?'

'উঁহু, মোটেই না—বরং তোমারই এ অন্যায় জিদ্।'

মেজমামা একটু চটে বললেন, 'অন্যায় জিদ্ হলেও বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখার জন্য তোমার খাওয়া উচিত।'

বশিষ্ঠ বাবু আর বিরক্তি না চাপতে পেরে বললেন, 'বন্ধুত্ব আবার কি? এ বন্ধুত্বের নামে অত্যাচার। তোমার অত্যাচার সইতে আমি মোটেই রাজী নই।'

'বটে? এ আমার অত্যাচার? আমার অনুরোধটা তবে কিছুই নয়—আমাদের বন্ধুত্বটা তা হ'লে একটা ধাপ্পাবাজী? একটা জোচ্চুরী? তুমি বলতে চাও আমি তা হ'লে একটা মানুষ নই?' উত্তেজনায় মেজমামা দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন—একটু লজ্জিত হয়ে ধপ্ করে আবার বসে পড়ে কাটলেটের প্লেটটা আরও খানিকটা এগিয়ে দিলেন বশিষ্ঠ বাবুর দিকে। 'খেতেই হবে—বলেছি যখন, তখন তোমাকে খেতেই হবে।'



বশিষ্ঠ বাবু মুখে একটা ঘেন্নার ভাব এনে দু আঙুলে আলগোছে প্লেটটা সরিয়ে রেখে বললেন, 'তর্ক ক'র না বজ্জাত—বলেছি খাব না—ব্যস।'

'উঁহু, খেতেই হবে তোমাকে।'

'বটে? গায়ের জোরে নাকি?'

মেজমামা রাগে ফেটে পড়লেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বেশ চীৎকার করেই বললেন, 'এমনি না খেলে গায়ের জোর ফলাতেও পেছপা হব না জেনে রেখো।...এই টম্, শীগ্‌গির শুনে যা—রামধনিয়াকেও ডাক।' মামার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দরজার আড়ালে থেকেই এতক্ষণ আমি শুনছিলাম সব—ডাক শোনা মাত্র আস্তিন গুটিয়ে ভিতর ঢুকে পড়লাম, রামধনিয়াও দেখলাম পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকল। হুঁহুঁ, আরো লেখো মামার কাগজে মাণিক। আমার মামাকে এখনও চেনো নি তুমি!

মেজমামা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'কি, এখন খাবেন কিনা বলুন?' রাগে মেজমামার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

বশিষ্ঠ বাবুও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখ লাল করে রাগে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'না, খাব না—খাব না—খাব না! আপনি আমাকে বাড়ীতে ডেকে অপমান করতে সাহস পান? এত দূর আস্পর্দ্ধা!'

এই রামধনিয়া, বাবুকা গোড়ঠো আচ্ছাসে···

মেজমামা আরও চীৎকার করে বললেন, 'অপমানের এখনই কি দেখেছেন? এই রামধনিয়া, বাবুকা গোড়ঠো আচ্ছাসে পাকড়ো—আর টম্, তুই রান্নাঘর থেকে চট্ করে হামানদিস্তাটা নিয়ে আয়।'

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আমি হামানদিস্তা নিয়ে হাজির। মেজমামাই তার পর হুকুম দেন,—'এইবার একে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দে তোরা।' মামার আদেশ শিরোধার্য্য করে বশিষ্ঠ বাবুকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দি আমি আর রামধনিয়া। ভূমিষ্ঠ হয়ে বশিষ্ঠ বাবু প্রাণপণে হাত ছোঁড়াছুঁড়ি করেন। দেখে আমার সত্যিই বেশ ভাল লাগল। মেজমামা তখন একটু একটু করে কাটলেট ভাঙেন আর হামানদিস্তার লোহার ডাণ্ডাটা দিয়ে বশিষ্ঠ বাবুর মুখে গুঁজে দেন—আর বলেন: 'কি, খাবেন না—না?'

আধখানা কাটলেট যখন শেষ হয়েছে তখন মেজমামা বলেন, 'থাক্, এবার ছেড়ে দেওয়া যাক্। বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখার জন্য আমার যেটুকু কর্ত্তব্য সেটুকু আমি করেছি, বাকীটুকু ও আর করবে না বোধ হয়। এবার ওকে ছেড়ে দে তোরা।'

ভূমিশয্যা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বশিষ্ঠ বাবু উঠে দাঁড়ান—রাগে আর অপমানে দিশেহারা হয়ে; তার পর বলেন—'উঃ, এত দূর? এত দূর?'

—'এত দূর আবার কি?' মেজমামা ফের ধমকে ওঠেন, 'বজ্রাঙ্গ বটব্যাল বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখার জন্য আরও অনেক দূর যেতে পারে ইচ্ছে করলে।'

বশিষ্ঠ বাবু বিষের মত সুরে বল্‌লেন, 'কিন্তু এর জন্যে আপনাকে হয়তো আদালতেও যেতে হতে পারে শেষ পর্য্যন্ত—সেদিন জানবেন 'বশিষ্ঠ কারফরমা কাউকে ক্ষমা করে না।'—কথাগুলি বলে ঝড়ের মত বশিষ্ঠ বাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। মেজমামা কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—'লোকটা কি রকম ছোটলোক দেখেছিস্? কি রকম মেজাজ দেখিয়ে চলে গেল! আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে লোকটা আগাগোড়া আমাকে ঠকিয়েছে। ও নিশ্চয়ই আমাকে বন্ধু ভাবে নি। তবুও ধাপ্পা দিয়ে আমার ঘাড়ে বসে দ্বারিকের সন্দেশ খেয়েছে আর সিনেমা দেখেছে!'

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লুম: 'আমারও তাই মনে হয়।'

'মনে হয় আবার কি?' মেজমামা আবার চটে ওঠেন, 'নিশ্চয়ই তাই। আর এই লোককে কিনা আমি সাব্‌এডিটার করেছি! আজই ওকে বরখাস্ত করে দিলুম। ও ব্যাটার সঙ্গে তোর যদি কোনদিন রাস্তায় দেখা হয় তবে বলে দিস্ ভবিষ্যতে ও যেন কোনদিন আর লেখা পাঠিয়ে উৎপাত না করে। কাগজের মালিক আমি, ও না। ও রকম বিতিকিচ্ছিরী লেখা ছাপলে দু'দিনে কাগজ উঠে ভূত হয়ে যাবে।' মেজমামা একটু দম্ নেবার জন্য থামেন; তার পর ট্যাঁক থেকে সাড়ে চার আনা পয়সা গুণে বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বলেন, 'এই নে, কালকে সিনেমা দেখিস্—আর—' কথার ফাঁকে ফাঁকে মেজমামা পিঠ চাপড়ে দেন। 'আর এবার থেকে 'ধূমধাড়াক্কায়' রেগুলার লিখিস—বুঝেছিস্?'

হোঃ, তা আর বুঝি নি! তখন আমার ডাক ছেড়ে হাসতে ইচ্ছে করছে। মেজমামার হাত থেকে পয়সাগুলি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে লাফাতে লাফাতে রাস্তায় নেমে আসি আমি।... তার পর—

তার পর আর বিশেষ কিছু নেই। আমিই এখন 'ধূমধাড়াক্কার' সাব্‌এডিটর—মামার ঠিক নীচেই আছি আর কি। যে কোন মাসের 'ধূমধাড়াক্কা খুললে বুঝতে পারবে' সত্যি বলছি কি না।

---

## যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

ছলে, বলে, কৌশলে—যে ভাবে হোক্ শত্রুকে ধ্বংস করতে হবে এই হচ্ছে আধুনিক যুগের রণনীতি। এই যুক্তির ফলে মারণাস্ত্র হিসাবে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার সুরু হয়েছে। তবে ব্যাপারটাকে একেবারে আধুনিক ব্যাপার বল্‌লে বোধ হয় ভুল বলা হবে। অনেক—অনেক দিন আগে পিলোপোনেশিয়ান্ যুদ্ধেও নাকি এমনি ধারা গ্যাসের প্রয়োগ হয়েছিল—গন্ধক ও পিচ্ পুড়িয়ে তার তীব্র গন্ধে শত্রুসৈন্যের দম বন্ধ করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রায় শ'খানেক বছর আগে (১৮৫৪) সেবাষ্টপলের অবরোধের সময়ও লর্ড ডান্‌ডোনাল্‌ড্ নাকি ঠিক ঐ রকম গন্ধক-পোড়ান গ্যাস ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ে উপায়টা অত্যন্ত "অমানুষিক" মনে করে কেউ তা'তে আমল দেয় নি।

আধুনিক কালে আর অত ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নেই। যদিও এর প্রতিকারের জন্য আন্তর্জাতিক বৈঠক কয়েক বার হয়েছে, কিন্তু কার্য্যকালে কাউকে তা মানতে দেখা যায় না।

যত দূর জানা গেছে যুদ্ধে গ্যাস প্রয়োগের প্রবর্ত্তন (বা পুনঃপ্রচলন, যাই বল) সুরু হয়েছে জার্ম্মান্‌দের হাত দিয়ে। গত মহাযুদ্ধ বাধবার কিছু পরেই—১৯১৪ সনের শেষ দিকে যখন তারা দেখল বিপক্ষ দল খাদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাদের আক্রমণ অনেকটা ব্যর্থ করে দিচ্ছে—তখন তারা এর প্রতিকারের উপায় খুঁজতে লাগল। জার্ম্মেনী বৈজ্ঞানিকদের দেশ, তাই আগেই ডাক পড়ল

বৈজ্ঞানিকদের। নানা রকম ওষুধপত্র, মালমশলা নাড়াচাড়া করে তাঁরা উপায় বাৎলে দিলেন, রাসায়নিকের পরীক্ষাগার ছেড়ে নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস এসে হাজির হ'ল যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধবিশারদ্‌রা এই নতুন ধরণের যুদ্ধের নাম দিলেন 'কেমিক্যাল্‌ ওয়ারফেয়ার'—অর্থাৎ 'রাসায়নিক যুদ্ধ'। ১৯১৫ সনের গোড়াতেই এই নতুন প্রণালীর যুদ্ধ প্রচলিত হ'ল।

বিপক্ষ দল প্রথম প্রথম খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের অভাব ছিল না, তাদের মধ্যেও—তারাও গবেষণা করে, মাথা খাটিয়ে নানা রকম বিষাক্ত গ্যাস প্রচুর পরিমাণে তৈরীর ব্যবস্থা করে ফেল্‌ল। কাজেই 'রাসায়নিক যুদ্ধ'টা দেখতে দেখতে বেশ ঘোরালোই হয়ে উঠল।

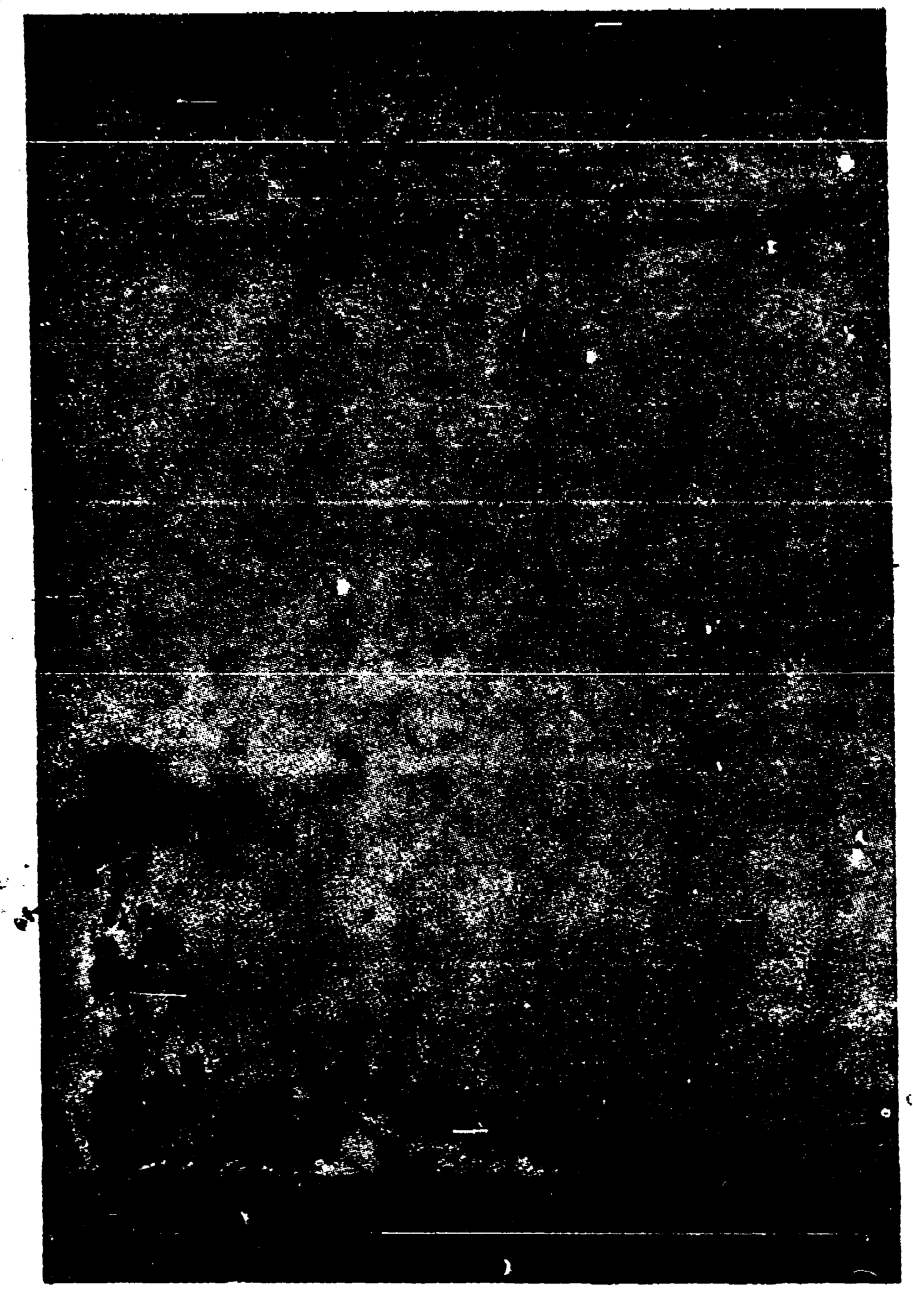

বোমারু বিমান ঝাঁক বেঁধে আক্রমণ চালাচ্ছে। গ্যাস-বোমা এই ভাবে ফেলা হয়।

বিষাক্ত গ্যাস তৈরী ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের কয়েকটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ গ্যাসটা শুধু মারাত্মক হ'লেই হবে না—খুব অল্প খরচে এবং হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন সব জিনিষের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে তা তৈরী করতে না পারলে বিশেষ কাজে আসবে না। তা ছাড়া—গ্যাসটা এমন হওয়া দরকার যে শত্রুপক্ষ কিছুতেই না বুঝতে পারে—জিনিষটা কি দিয়ে তৈরী এবং কি করলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।



এ জন্য নানা রকম গ্যাস মিশিয়ে এক এক ধরণের মিশ্র গ্যাস করতে পারলে ভাল হয়। শোনা যায় গতবারের যুদ্ধে জার্ম্মেনীর বৈজ্ঞানিকেরা কম করে তিন হাজার গ্যাস মিশিয়ে এই রকম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং এই সব ভীষণ জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের কয়েকজনকে প্রাণও দিতে হয়েছিল।

এই সব গ্যাসের একটু-আধটু পরিচয় শোন। তোমাদের দাদারা—যাঁরা কলেজে বিজ্ঞান পড়েন, (এবং হয়তো তোমাদেরও কেউ কেউ) ক্লোরিন্‌, ব্রোমিন্‌ ইত্যাদি গ্যাসের সঙ্গে পরিচিত.—ও নিয়ে কিছু নাড়াচাড়াও হয়তো তাঁদের করতে হয়েছে। ঈষৎ সবুজ বা লালচে রংএর এই সব গ্যাস যখন প্রবল চাপের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শত্রুশিবিরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তখন প্রথমেই তা সৈন্যদের নাকে ঢুকে পড়ে। সুরু হয় চোখ জ্বালা, কাশি এবং গা বমি-বমি; এবং দেখতে দেখতে দেহযন্ত্র হয়ে পড়ে বিকল। ক্লোরো-পিক্‌রিনও অনেকটা এই জাতের। আর এক রকম গ্যাস আছে সেগুলি চোখে লাগলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। কোনটায় বা ক্রমাগত হাঁচি আসতে থাকে—ক্রমে নাক, চোখ, গলা জ্বালা করতে থাকে, গা বমি-বমি করে, অবশেষে শরীর অসাড় হয়ে যায়। ডাইফেনিল-ক্লোরাসিন এই জাতের পদার্থ। কোনটায় বা শরীরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দেবে—যেমন ফস্‌জীন্‌ গ্যাস। আর হাইড্রোসায়ানিক এসিড্‌ হ'লে তো রক্ষা নেই—শরীরে ঢুকলেই মৃত্যু। জ্যান্ত অবস্থায় শরীরের চামড়া একেবারে পুড়িয়ে দেয় এমন গ্যাস, শরীরের প্রধান প্রধান প্রত্যঙ্গ অকেজো করে ফেলে এমন গ্যাস, খাওয়ার শক্তি, কথা বলার শক্তি, কানে শুনবার শক্তি নষ্ট করে দেয় এমন গ্যাস—এ সবেরও অভাব নেই। এমন কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাতে পারে এমন গ্যাসও নাকি বৈজ্ঞানিকদের অজানা নয়। কী ভয়ঙ্কর বল দেখি!

মাষ্টার্ড্‌ গ্যাসের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনেছে। এটি আর একটি মারাত্মক চীজ্‌। রাসায়নিকদের ভাষায় এর নাম ডাইক্লোরএথিল সালফাইড্‌। ১৯১৭ সনে যখন জার্ম্মান্‌রা দেখ্‌ল শত্রুপক্ষ গ্যাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানা নতুন নতুন কৌশল বার করছে তখন তারা এই নতুন মারণাস্ত্র বার করল। যুদ্ধে যত রকম গ্যাস ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে এটিরই প্রতাপ সব চেয়ে বেশী

মাষ্টার্ড্ গ্যাসের গন্ধ তেমন উগ্র নয়, তা ছাড়া এর কাজ গ্যাস ছড়ান'র সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় না। কাজেই শত্রুপক্ষ এই গ্যাসে আক্রান্ত হ'লেও চট্ করে টের পায় না। কিন্তু একটু পরেই সুরু হয় এর ধ্বংসলীলা। দেখতে দেখতে নাক, চোখ, ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হয়ে—সমস্ত শরীর ফুলে ওঠে, তার সঙ্গে দেখা দেয় ফোস্কা। আর শরীরের ভিতরে সুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। অতি সামান্য পরিমাণ গ্যাস প্রচুর ক্ষতি করতে পারে—এবং কোথাও ছড়াতে পারলে কয়েক দিন—এমন কি কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানকার মাটী-বাতাস বিষাক্ত করে রাখে। এমনও দেখা গেছে—গ্যাস প্রয়োগের কয়েক দিন পরে সেখানকার মাটীতে হেঁটে লোকেরা তার হাত থেকে নিস্তার পায় নি। মাটী গ্যাস শুষে রেখেছে এবং পরে তা পথচারীর দেহে সংক্রামিত হয়েছে। মাষ্টার্ড্ গ্যাসের প্রয়োগে জার্ম্মান্‌রা পথ দেখালেও শেষ পর্য্যন্ত বিপক্ষ দলও এর সুবিধা নিতে পিছ-পা হয় নি। লিউসাইট্ গ্যাসও অনেকটা মাষ্টার্ড্ গ্যাসেরই অনুরূপ। আর একটি মারাত্মক গ্যাস হচ্ছে আর্সেনিউরেটেড্ হাইড্রোজেন।

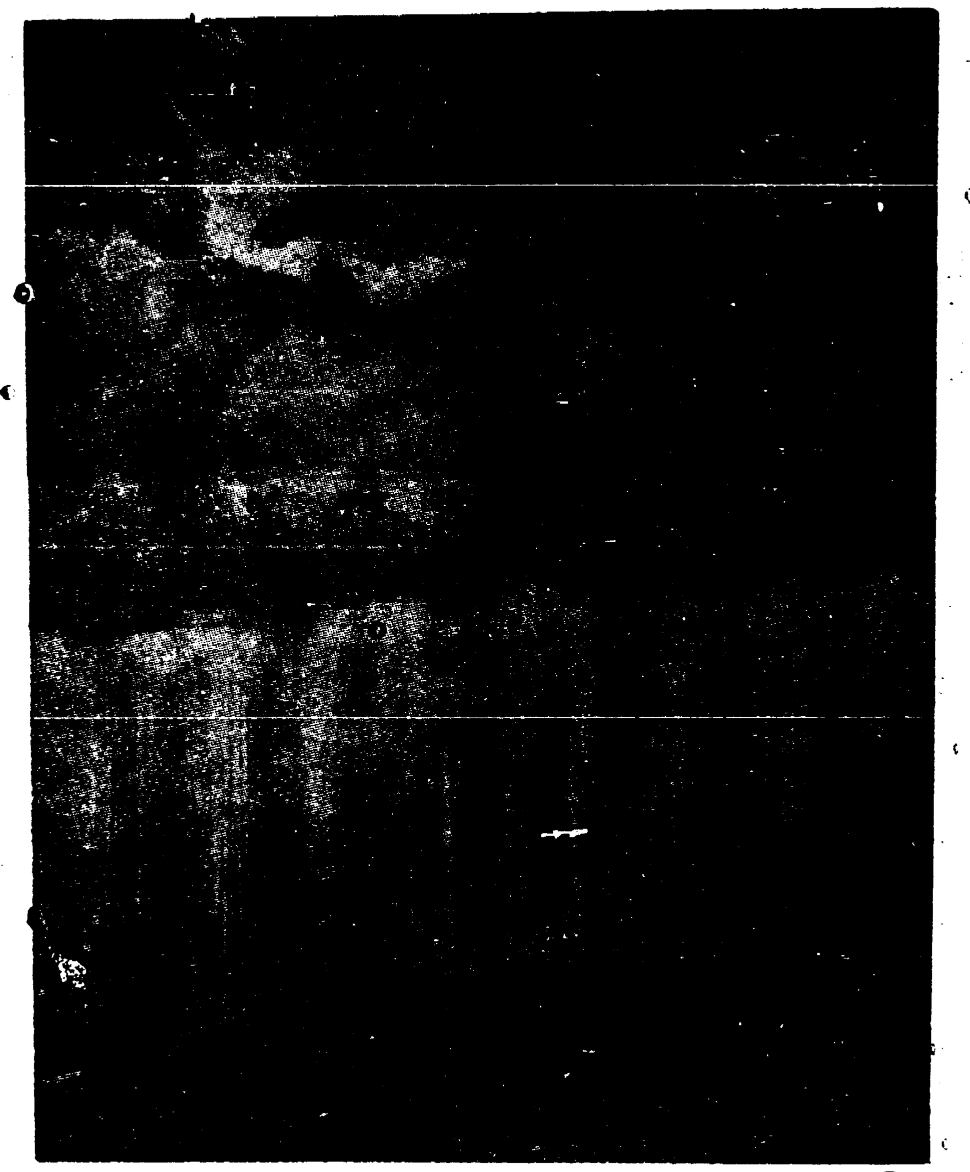

এরোপ্লেনের সাহায্যে নকল বৃষ্টি ফেলা হয়, তেমনি বিষাক্ত গ্যাসও তরল অবস্থায় বর্ষণ করা হয়।

গ্যাস প্রয়োগ করবার পদ্ধতি হরেক রকম। যেমন ধর, বড় বড় সিলিণ্ডারে প্রচুর চাপের মধ্যে গ্যাস আটকে রেখে সুযোগ মত বাতাসের গতি বুঝে কুয়াসার মত করে ছেড়ে দেওয়া; বোমার মধ্যে পূরে প্রজেক্টারের সাহায্যে এক সঙ্গে



অনেকগুলি ছুঁড়ে দেওয়া,—যাতে ভাল করে বুঝতে পারার আগেই বোমা ফেটে অতি ঘন এবং তীব্র গ্যাস শত্রুদের ঘিরে ফেলতে পারে; কামানের গোলার মধ্যে গ্যাস ও বিস্ফোরক ভরে ছোঁড়া। এখানে মনে রাখতে হবে যে বিষাক্ত 'গ্যাস' ছাড়বার আগে যে সেটা গ্যাস আকারেই থাকে তা নয়,—তরল, এমন কি গুঁড়ো আকারেও থাকতে পারে। যেমন ডাইফেনিলক্লোরাসিন্। এগুলো তরল অবস্থায় বোতলের মধ্যে পূরে অতিবিস্ফোরক কামানের গোলার মধ্যে ভরে ছোঁড়া হয়। ছুঁড়বার পরেও যে সব সময় এগুলি গ্যাস্ হয়ে বেরোবে তার মানে নেই, অনেক সময় বৃষ্টিধারার মত তরল অবস্থায়ই বেরোতে পারে, এমন কি মিহি গুঁড়োর আকারেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এরোপ্লেন থেকে গ্যাস ছাড়বারও রেওয়াজ আছে। এরোপ্লেন থেকে যে বোমা ফেলা হয় তার মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস ভরা থাকে—বোমা ফাটবার সময় তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া এরোপ্লেন থেকে যেমন নকল বৃষ্টি ফেলা হয় তেমনি ট্যাঙ্ক বোঝাই তরল পদার্থ বৃষ্টি-ধারার মত নীচে বর্ষণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় সব সময়েই তা বাতাসের চেয়ে ভারী হয়—যাতে আকাশে উড়ে না যেতে পারে।

বিপদ্ এলেই তার থেকে প্রতিকারের উপায় মানুষ খুঁজতে থাকে। গ্যাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায়ও বৈজ্ঞানিকেরা বার করেছেন। প্রথম প্রথম তূলোর প্যাড বা ফ্লানেলের টুক্‌রো এমন সব রাসায়নিক ওষুধে ভিজিয়ে নাকে চাপা দেওয়া হ'ত যা ঐ সব গ্যাস শুষে নিতে পারে—যেমন সোডিয়াম্ থায়োসাল্‌ফেট্, কাপড়-কাচা সোডা ইত্যাদি। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটির উন্নতি হ'তে লাগল। বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন—গ্যাস শোষক হিসেবে কাঠ-কয়লা বিশেষ উপযোগী। তাঁদের চেষ্টায় দেখা দিল নানা রকমের গ্যাস-মুখোস। এই সব মুখোসের ছবি তোমরা বোধ হয় দেখে থাকবে—হাতের কাছে না পাওয়ায় এখানে দিতে পারলাম না। মুখোস আজকাল নানা রকমের হয়—তার ভিতরকার ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম, তবে বিভিন্ন দেশে এর রকম ফের আছে: একটা টিনের পাত্রে বা বাক্সে থাকে থাকে সাজান থাকে কাঠ-কয়লা, সোডা লাইম্, পারম্যাঙ্গানেট্

বা ঐ জাতীয় পদার্থ। বাক্স থেকে একটা রবারের নল বেরিয়ে মুখোসের সঙ্গে আটকান থাকে। মুখোসটা, রবারের তৈরী, এমন ভাবে সেটা মুখে আটকান যায় যে চোখ-মুখ-নাক গ্যাস থেকে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে। গ্যাসে বিষাক্ত বাতাস টিনের পাত্র বা বাক্সের ভিতর দিয়ে আসবার সময় শোধিত হয়ে যায়, তার পর রবারের নল বেয়ে যখন মুখের কাছে আসে তখন তা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

যুদ্ধে গ্যাসের ব্যবহার উচিত কি অনুচিত তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও যুদ্ধ-বিশারদদের মধ্যে নানা রকম মত আছে। যাঁরা এর ব্যবহারের স্বপক্ষে তাঁদের যুক্তিটা এই রকম: বর্ত্তমান যুগে প্রত্যেক সভ্য দেশেই বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে যে "রাসায়নিক যুদ্ধই" কালে যুদ্ধের প্রধান অংশ নিতে বাধ্য—একে ঠেকান অসম্ভব। যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহার করলে যত সহজ উপায়ে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা যায় অন্য উপায়ে তা সম্ভব নয়। আচমকা আক্রমণ করতে এর যুড়ি নেই, যেখানে অন্য উপায় অচল সেখানেও এই উপায়ে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে। তা ছাড়া গ্যাসের ব্যবহার বাড়লে শত্রুদের সব সময়েই গ্যাস-প্রতিষেধক মুখোস প'রে থাকতে হবে—তা'তে তাদের আসল কাজ করবার ক্ষমতা অনেকটা কমে যাবে। এই রকম সব যুক্তি। তাঁরা যুদ্ধের ফলাফল থেকে হিসেব কষে এও বলেন যে যুদ্ধে অন্য ভাবে আক্রান্ত হ'লে যত লোক মারা পড়ে তার তুলনায় গ্যাসে আক্রান্ত লোক কম মারা পড়ে। যেমন—গত মহাযুদ্ধে আমেরিকায় যত লোক আক্রান্ত হয়েছিল তার মধ্যে শত করা ২৭ জন লোক আক্রান্ত হয়েছিল গ্যাসে। এদের মধ্যে মাত্র শত করা ২ জন মারা পড়েছিল। যারা গ্যাস ছাড়া অন্য ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে কিন্তু শত করা ২৪ জন মারা পড়েছিল। এ ছাড়া গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে যারা বেঁচে যায় তাদের মধ্যে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে খুব কম, কিন্তু অন্য ভাবে আক্রান্তদের মধ্যে চিরজীবন বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে এমন লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। আর নিষ্ঠুরতার কথা যদি বল—তবে অন্যান্য অস্ত্রের কোন্‌টাই বা কম? আর যাঁরা গ্যাস প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তি তো তোমরা জানই—কারণ তুমি-আমি সকলেই প্রায় এই দলভুক্ত।

# নিরুদ্দিষ্টের দল

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম.এ.বি.এল

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক: চৌদ্দটি ভারতীয় বালক ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের সহিত অষ্ট্রেলিয়া হইয়া নিউজিল্যাণ্ডে বেড়াইতে গিয়াছিল। ঐ দ্বীপের চারিদিক্‌টা ঘুরিয়া দেখিবার জন্য একটা পাল-তোলা 'স্কুনার' জাতীয় জাহাজ ভাড়া করা হইল ও সব রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যে তাহা বোঝাই করা হইল।

জাহাজ ছাড়িবার আগের দিন জাহাজের বালকভৃত্য বুনো (জাতে মাওরী) ও এই ১৪টি ছেলে সন্ধ্যা হইতেই জাহাজে আসিয়া চড়িল; অভিভাবকেরা ও জাহাজের অন্যান্য নাবিকেরা ভোর বেলা আসিবেন। দুপুর রাত্রে হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিল এবং কখন যে দড়ি ছিঁড়িয়া বাতাসের টানে জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া বহু দূর সমুদ্রে আসিয়া পড়িল কেহ টের পাইল না। প্রবল ঝড়ের মধ্যে কয়েকদিন যুদ্ধ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে জাহাজটি ভগ্নাবস্থায় এক অজানা জনহীন দ্বীপে বালির মধ্যে গিয়া ঠেকিল। অভিভাবকেরা নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছেলেদের আশা ত্যাগ করিলেন।

ডাঙ্গায় নামিয়া নিঃসহায় ছেলের দল প্রথমটা ভাঙ্গা জাহাজের মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা করিল। দলের মধ্যে সুশান্ত, অশোক, রঞ্জিৎ, কুণাল, রোহিতাশ্ব, কমলাক্ষ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বড়। সুশান্তর ভাই মনন, ধ্রুব, বাবলু প্রভৃতি বাকী কয়টি বয়সে ছোট। সুশান্তই দলপতি হইবার যোগ্য। রঞ্জিৎ সুশান্তকে মানিতে চাহিত না। কুণাল, রোহিতাশ্ব ও কমলাক্ষ তাহার দলে। বাকী সকলেই সুশান্তর পক্ষপাতী।

শীত আসিয়া পড়ায় সুশান্ত ও কয়েকজন মিলিয়া একটা পাকা আশ্রয়ের খোঁজে বাহির হইল; জায়গাটা দ্বীপ না মহাদেশের অংশ তাহারও সন্ধান করিবে। অনেক পথ ও জঙ্গল পার হইয়া তাহারা একটা বড় হ্রদের ধারে পৌঁছিল। তার কিছু পরে তারা একটা পরিত্যক্ত গুহার সন্ধান পাইল, সেখানে একটি নরকঙ্কালও পাওয়া গেল। গুহায় পাওয়া আসবাব ও ফরাসী ভাষায় লেখা এক ডায়েরী হইতে তারা জানিতে পারিল যে ঐ কঙ্কাল ফ্রাঁসোয়া বদোয়া নামে এক ফরাসী নাবিকের। প্রায় একশ' বছর আগে জাহাজ ডুবি হইয়া তিনি এই দ্বীপে উঠেন, এবং বাকী জীবন এখানেই কাটান। তাঁহার তৈরী দ্বীপের একটা ম্যাপও পাওয়া গেল।

জাহাজে ফিরিয়া জিনিষপত্র নামাইয়া ফেলিয়া ছেলেরা জাহাজটি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল। এই সময় একটা ঝড় তাহাদের সাহায্য করিল। ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলি দিয়া তারা একটা প্রকাণ্ড ভেলা তৈরী করিল। তার পর সেই ভেলায় সমস্ত মালপত্র তুলিয়া ফরাসী গুহায় (ফ্রাঁসোয়া বদোয়ার নামানুসারে ছেলেরা গুহাটির নাম 'ফরাসী গুহা' রাখিয়াছিল) যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

## ১৫

সুশান্ত দেখিল, নদীর তীরস্থিত জলীয় ঘাসের মধ্যে চাপ চাপ সাদা বরফ ভাসিতেছে। কে জানে হয়তো ফরাসী গুহায় পৌঁছিবার আগেই সমস্ত নদী বরফে জমিয়া যাইবে। হয়তো ইহা সুদূর য়্যাণ্টার্ক্টিক্ সাগর মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ। তা না হইলে সমুদ্রোপকূলে সীল দেখা দেয়? কিন্তু ভাবিয়া লাভ নাই।

যাইবার পূর্ব্বে সুশান্ত কহিল—"বন্ধুগণ, সমুদ্রতীর ছেড়ে আমরা এখন চিরদিনের মত ফরাসী গুহায় বাস কর্‌তে চলেছি। অত দূর হতে বনের ভিতর দিয়ে যখন তখন আমরা এই সমুদ্রতীরে আস্‌তে পারব না। কাছ দিয়ে কোন জাহাজ গেলেও আমরা জান্‌তে পারব না। অথচ পরিত্রাণের জন্য আমাদের এখন সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌তে হচ্ছে এমনিতর কোন সাহায্যের উপর। তাই আমি বলি কি, সমুদ্র উপকূলে একটা লম্বা মাস্তুল পুঁতে তার উপর একটা বড় নিশান উড়িয়ে রাখা যাক্।" এ প্রস্তাব সকলেই একবাক্যে অনুমোদন করিল। তখন সকলে মিলিয়া জাহাজের সব চেয়ে লম্বা মাস্তুলটাকে পুনরায় সমুদ্রতীরে টানিয়া লইয়া গেল ও তাহার উপর জাহাজের একটি প্রকাণ্ড ফ্ল্যাগ উড়াইয়া দিল। সমুদ্রের তীব্র হাওয়ায় সেই বিশাল বহুবর্ণ রঞ্জিত পতাকা পত্ পত্ করিয়া উড়িতে লাগিল। মনে হইল, সুদূর সমুদ্রবক্ষ হইতেও এই বিশাল রঙিন পতাকা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

বেলা সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, তবুও জোয়ারের দেখা নাই। নদীর জল তখন অত্যন্ত শান্ত; দুইকূল ঠাণ্ডা জলে একেবারে চাপাচাপি হইয়া আছে। বেলা আটটা বাজিল; সূর্য্যের কিরণও বেশ প্রখর হইয়া উঠিল। কিন্তু জোয়ারের কোন চিহ্ন নাই। ক্রমে নয়টা বাজিল; সহসা সেই ভেলার কাঠগুলি কট্‌কট্ কর্‌কর্ শব্দ করিয়া উঠিল। নদীতে জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। সুশান্ত তখন সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া নদীতীরে লাফাইয়া পড়িল ও গাছের দড়ি খুলিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে ভেলার উপর লাফাইয়া উঠিল। দড়ি খোলা পাইতেই ভেলা আস্তে আস্তে ভাসিয়া চলিল। তখনো জোয়ারের বিশেষ টান দেখা দেয় নাই। চারিজনে চারি কোণে লগি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ভেলা যাহাতে ডাঙ্গার উপর ধাক্কা না খায়।

কিন্তু জোয়ার হইলে কি হইবে, অত বড় ও ভারী ভেলা যেন ভালভাবে চলিতেছিল না। দুই ঘণ্টায় তাহারা এক মাইল পথ আসিল। ফরাসী গুহা তখনো ছয় মাইল দূরে। সুশান্ত হিসাব করিয়া দেখিল, প্রত্যেক জোয়ারে তাহারা দুই মাইলের বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে না; অর্থাৎ গুহায় পৌঁছাইতে অনেকগুলি জোয়ারের অপেক্ষা করিতে হইবে। বেলা এগারোটার সময় নদীর জল স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তার পর আরম্ভ হইল ভাটার টান। তখন সুশান্ত ও অশোক ভেলা তীরে লাগাইয়া একটা গাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিল।



পুনরায় জোয়ার আসিবে সেই সন্ধ্যার সময়, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে জলপথে চলা নিরাপদ নহে। স্থির হইল, আগামী প্রাতঃকালে পুনরায় তাহারা ভেলা ছাড়িবে। অতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা রঞ্জিতের কোষ্ঠিতে লেখে নাই। সে তখন সঙ্গে তাহার বন্ধুত্রয় ও বিয়্যারকে লইয়া নদীর তীর ধরিয়া শিকার অন্বেষণে চলিল। বিকাল নাগাদ তাহারা দুইটা বৃহৎকায় বাসটার্ড পাখী ও ডজন খানেক জলপিপি মারিয়া আনিল। জলপিপিগুলাকে ছাড়াইয়া বুনো সেদিনকার জন্য রান্না করিল। বাসটার্ড পাখীর মাংস অতি সুখাদ্য। বুনো সেই দুটাকে নুন মাখাইয়া রাখিয়া দিল, ফরাসী গুহায় পৌঁছিয়া এই দুইটিকে সে রাঁধিবে। রঞ্জিৎ কহিল, বনের মধ্যে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু কোথাও মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। উপরন্তু কতকগুলি লম্বা লম্বা পাখীকে সে মাটীর উপর দৌড়াইতে দেখিয়াছে, কিন্তু ওগুলি যে কি পাখী তাহা সে বলিতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় জোয়ার দেখা দিল। কাছি ঠিক আছে কিনা দেখিয়া সকলে সান্ধ্যভোজন সাঙ্গ করিয়া শুইতে গেল। সে রাতে নদীতীরে তাহাদের তাঁবু পড়িল। রাত্রে শঙ্খচূড়, কুণাল ও কমালাক্ষ পালাক্রমে পাহারা দিল।

পর দিন আবার ভেলা ছাড়া হইল—এবং বেলা একটার সময় তাহারা সেই ভয়ঙ্কর জলার মুখে আসিয়া পড়িল। জোয়ারের বেগ তখন শেষ হইয়াছে, তাই বাধ্য হইয়া তাহারা সেইখানে ভেলা আটকাইল। মিথ্যা সময় নষ্ট না করিয়া কয়েক জনে মিলিয়া জলার মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইল। সেই ভাঙা নৌকাটার কথা আশা করি তোমারা ভুল নাই। সেটাকেও তাহারা ভেলায় লইয়াছিল। সেই নৌকায় চড়িয়া বুনো, রঞ্জিৎ ও রোহিতাশ্ব জলার মধ্যে প্রবেশ করিল। জল কোথাও বেশ গভীর, কোথাও বা নিতান্ত কম। বামদিকে বেশ ঘন নিবদ্ধ আগাছার জঙ্গল—সেইটাই প্রকৃতপক্ষে জঙলা জলা। তাহার ডান পাশ দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথমে যখন তাহারা ফরাসী গুহা হইতে জাহাজে ফিরিতেছিল তখন ইহা বুঝিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল নদীটা জলার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নদী ঠিক আছে, কেবল তাহার বাম পার্শ্বে সেই ভয়ঙ্কর দুষ্প্রবেশ্য জলা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা ফিরিয়া আসিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নদীর স্রোতে বরফের টুকরা দেখা দিল। বোধ করি হ্রদের জলে বরফ জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে রাত্রি তাহাদের বড় কষ্টে কাটিল। সমস্ত রাত্রি আগুন জ্বালিয়া রাখিয়া, লেপের উপর লেপ চাপাইয়া তাহাদের আর কিছুতেই শীত ভাঙে না। পরদিন জোয়ার আসিল বেলা এগারোটার সময়। সেই জোয়ারে ভেলা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সামনে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা জলা পার হইয়া গেল ও বেলা তিনটার সময় নৌকা

আসিয়া লাগিল একেবারে ফরাসী গুহার ঘাটের উপর। সামনেই সেই দিগন্তবিসারী অতল হিম-শীতল হ্রদ। বড় বড় ঢেউ বালুচরের উপর আসিয়া সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতেছে। তখন সকলে ফরাসী গুহার সামনে লাফাইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

---

## স্ফিংক্‌স্

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

আমাদের দেশে যেমন গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ইত্যাদির গল্প প্রচলিত আছে, চীনদেশে যেমন ড্র্যাগনের কাহিনী চলে, তেমনই গ্রীস্ আর মিশরে স্ফিংক্‌স্ ব'লে একরকম জীবের সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। গ্রীক্‌দের মতে এর চেহারাটা ছিল বেজায় বেয়াড়া রকমের—মেয়েলোকের মত মাথা, সিংহের মত গা' আর থাবা, অজগরের মত ল্যাজ, আর তার ওপর কাঁধে একযোড়া পক্ষিরাজের পাখা। ঠিক যেন 'আবোল-তাবোল' বইয়ের 'বিদ্‌ঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত'টার মত। এই বদ্‌খত্ত চেহারাখানা নিয়ে সে থীব্‌স্ সহরে যাবার পথের ধারে পাহাড়ের মাথায় ঘাপ্‌টী মেরে বসে থাকত', আর, মহাভারতের বকরূপী যমের মত যা'র নাগাল পেত' তা'কেই একটী প্রশ্ন করত'। প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলেই আর কথা নেই, তখনি লোকটীকে গলা টিপে মেরে ফেলে টুপ্ ক'রে তা'কে জলযোগ ক'রে ফেল্‌ত'। প্রশ্নটা ছিল এই—"সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দু'পায়ে, আর সন্ধ্যায় তিন পায়ে চ'লে, এ জানোয়ারের নাম কি?" তোমরা তো সকলেই এ প্রশ্নের উত্তর জান'। কিন্তু সেকালের লোকগুলির বোধ হয় তলোয়ারের ধার ঠিক রাখ্‌তেই বেলা কেটে যেত', ওদিকে বুদ্ধিশুদ্ধি যেত' ভোঁতা হ'য়ে। তাই অনেক লোক ক্রমে ক্রমে স্ফিংক্‌সের হাতে মারা পড়ে। শেষে ঈডিপাস্ ব'লে একটী ছেলে এসে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। স্ফিংক্‌স্ তখন রেগেমেগে উঠে পাহাড়ের মাথা থেকে ধপাস্ ক'রে প'ড়ে গিয়ে একেবারে ছাতু। দেশের লোকেরও হাড়টী জুড়োল'।

কিন্তু গ্রীসের স্ফিংক্‌স্ মরলে হ'বে কি? তার একটী জ্ঞাতি ছিল সমুদ্রের



ওপারে, মিশর দেশে। তবে কিনা তার চেহারায় অত প্যাঁচ ছিল না, স্রেফ্ সিংহের ধড়ে একটী পুরুষ মানুষের মাথা আঁটা। মানুষ-টানুষও বোধ হয় খেত না। বেশ জাঁদরেল গোছের চেহারা থাকায় মিশরীয়রা পাথর দিয়ে তা'র মূর্ত্তি গ'ড়ে মন্দিরের দরজায়, পিরামিডের কাছে বা রাস্তার দু'ধারে পাহারাওয়ালার মত দাঁড় করিয়ে দিত', যেমন আমাদের দেশে কালো হাঁড়িতে চূণের ফোঁটা লাগিয়ে কাগ্‌তাড়ুয়া বানিয়ে ক্ষেতে টাঙিয়ে দেয়। গিজে নামক জায়গায় যে প্রকাণ্ড পিরামিডগুলি আছে, সেখানে পাহারা দিচ্ছেন যে স্ফিংক্‌স্ মূর্ত্তি, তিনি ব'সে আছেন একশ' কুড়ি হাত জায়গা নিয়ে, আর তাঁর মাথাটী মাটি থেকে ত্রিয়াল্লিশ হাত উঁচু হ'য়ে র'য়েছে। জানই তো, পিরামিডগুলির মধ্যে যেটা সব চেয়ে বড়, তা' লম্বায় পাঁচশ' হাত আর উঁচু তিনশ' কুড়ি হাত। এমন বাড়ী না হ'লে অমন দ্বারোয়ান মানা'বে কেন?

যারা জান না তাদের জন্য এবার ঐ ধাঁধাটার উত্তর চুপি চুপি ব'লে দি'। জীবনের প্রভাতকালে, মানে একেবারে ছেলেবেলায়, মানুষ চলে হামাগুড়ি দিয়ে চার হাত পায়ে। তার পর জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে, মানে শরীর যতদিন শক্ত থাকে ততদিন, সে চ'লে দু'পায়ে। ক্রমে যখন জীবনের সন্ধ্যাকাল আসে, মানে বুড়ো বয়সে, দু'পা আর তা'কে বইতে পারে না, একখানা লাঠি নিয়ে তা'কে ঠেং-ঠেঙে হ'তে হয়। কাজেই মানুষই হ'ল ঐ আশ্চর্য্য জীব, যা'র কখনও চার পা, কখনও দু' পা, আবার কখনও বা তিন পা'। হ'ল তো?

---

## অষ্টমী পূজোর দিন

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিন্দু 'সন্ধি পূজো' দেখ্‌তে এসেছিল চৌধুরীদের অট্টালিকায়। কাঁসর-ঘন্টা আর ধূপ-ধুনোয় পূজোর দালানটা ভরা দুপুরেই কেমন রহস্যময়, অবাস্তব মনে হচ্ছিল তা'র। তন্ময় হ'য়ে

সে কখন প্রতিমার চালচিত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করে নি। খেয়াল হ'ল—যখন ঘাড়ের ওপর একযোড়া কড়া হাত সজোরে এসে পড়ল।

বিন্দু চম্‌কে উঠে পেছন ফেরবার চেষ্টা কর্‌লে; কিন্তু সাঁড়াশির মতন শক্ত সেই হাত তাকে হিড়হিড় ক'রে এক দালান লোকের সামনে থেকে নামিয়ে আনলে গেটের কাছে। লজ্জায়, অপমানে হতচকিত মুখ তুল্‌তেই দ্বারোয়ান তার নরম গালে ঠাস ক'রে এক চড় কষিয়ে দিলে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে সে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। অস্পষ্ট ভাবে দ্বারোয়ানের দু'একটা কথা তার কানে গেল: 'বারোয়ারী তলায় যা'…ছোটলোক ছোঁড়া…ভদ্দর-লোকের বাড়ি…।'

সামনের দোতলা বারান্দা থেকে ওরই বয়সী একদল ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে অনর্গল হাসতে লাগল। ব্যাপারটা তা'রা বেশ উপভোগ করেছে বোধ হয়।

বিন্দুর রগ দু'টো ঝিন্‌ঝিন্ কর্‌ছে। দু'হাতে মাথাটা চেপে সে উঠে দাঁড়াল। বাড়ি যাবে। কাপড় দিয়ে গায়ের ধুলো মুছে পা বাড়ালে। চল্‌তে চল্‌তে, ঘটনাটা তা'র মনে কর্‌তে প্রবৃত্তি হ'চ্ছিল না; কিন্তু ভোলা কি যায়? তা'র কী দোষ? কেন সে এই পশুর ব্যবহার পেলে—শুধু শুধু? পূজোর দালানে অতগুলি হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক তা'র নির্য্যাতন দেখ্‌লে, কেউ ত' দ্বারোয়ানকে একটি কথাও বল্‌লে না!

সব রাগ গিয়ে পড়্‌ল মা'র ওপর। মা-ই ত' তাকে পাঠালে।

প্রচণ্ড রোদে তার মাথা ধ'রে গেল। আকাশ আজ কী নীল হ'য়ে উঠেছে! ওপরের দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়; অজস্র উজ্জ্বল, নীল আলো ঝ'রে পড়ছে যেন। এত আলো তার ভাল লাগে না—কাপড়-জামা বড় বেশী ময়লা মনে হয়; টিনের বাড়ি ভারী বেমানান দেখায়। ঘরে এসে জানলা বন্ধ ক'রে বালিশে মুখ গুঁজে সে শুয়ে পড়্‌ল।

সন্ধ্যে হ'তে আর দেরী নেই। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়ে বিন্দু চুপ ক'রে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল, ছেলেমেয়ের দল রঙ্‌-বেরঙের জামাকাপড়ে সেজে ঠাকুর দেখ্‌তে বেরিয়েছে। খুসীতে উজ্জ্বল তাদের মুখ, সারা অঙ্গে আনন্দ ঝল্‌মল্ করছে।

বোধ হয় সে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমক্ ভেঙে দেখলে, সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক, ধব্‌ধবে ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে, স্নিগ্ধ গলায় তাকে বল্‌ছেন: 'এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে, খোকা। তোমার নাম কি?'

'আমার নাম?' সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, 'আমার নাম জিজ্ঞেস করছেন? আমি বিন্দু।'

'আজকে-মহাষ্টমী জান না? এ সময়ে কি অমন শুক্‌নো মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে আছে?'



এ কথার সে কী উত্তর দেবে? সরল, ম্লান মুখ সে নামিয়ে নিলে। চোখ তার ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌ল।

ভদ্রলোক যেন তার মনের অন্তঃস্থল দেখ্‌তে পেলেন; 'এসো বিন্দু, আমার সঙ্গে এসো।' ব'লে, সস্নেহে তার হাত ধরলেন। তাঁর স্বর সহানুভূতিতে কোমল। বিন্দু না করতে পারল না। একটি একটি করে ভদ্রলোক তাদের সব কথাই জেনে নিলেন।

বড় রাস্তায় এসে তা'রা থাম্‌ল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড দোকান। আলোর ঝল্‌কানিতে আর ক্রেতাদের সরব সমাগমে ভেতরটা যেন ভরা দিন হ'য়ে উঠেছে। বাইরের শো-কেসে রকমারি পোষাক আর চমৎকার সব সখের জিনিষপত্রের বিজ্ঞাপন।

বিন্দুর সঙ্গী দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাক্‌লেন: 'এসো!'

কিন্তু ওখানে সে কেন যাবে? দোকানের মধ্যে ভদ্রলোক তা'কে নিয়ে যেতে চান কেন? তিনি কি তাকে কিছু কিনে দেবেন? দিলেই বা সে নেবে কেন? আর কেনা মানে ত' টাকা খরচ—তাও আবার পরের জন্যে! ভদ্রলোক কি পাগল?

অকস্মাৎ আর একটা কথা মনে হ'তেই তা'র সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল। সন্দেহের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ শরীরের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল; সে ছেলেধরার ফাঁদে পড়ে নি ত! ছেলেধরা! মা'র কাছে সে অনেক দিন ছেলেধরার কথা শুনেছে। ছোট ছেলেদের তা'রা মিষ্টি কথা ব'লে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। বিক্রি ক'রে দেয় আসামের চা-বাগানে, আরো কত জায়গায়। বাড়িতে ফেরবার আর কোন উপায় থাকে না। সেও ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে না-কি?

'দাঁড়িয়ে রইলে যে? লজ্জা কিসের, চ'লে এসো ভেতরে।' ভদ্রলোকের দীর্ঘ, দীপ্ত চেহারার ছায়া পড়েছে পাশের ঝক্‌ঝকে কাচে। বিন্দু আর একবার দেখে নিলে সেই প্রশান্ত, কারুণিক মুখভাব। পরমুহূর্ত্তেই তার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হ'ল: ছি, ছি, মন তার কত ছোট হ'য়ে গেছে আজকাল। না, এঁকে অবিশ্বাস করা পাপ। নির্ভয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দোকানে ঢুকল।

'এর মধ্যে কোন্‌টা পছন্দ হয় তোমার?' একরাশ সুন্দর জামা তার সামনের টেব্‌লে রেখে তা'র মত জিজ্ঞেস করা হ'চ্ছে! অসহ্য আনন্দে তার দেহ অবশ হ'য়ে এল, তখনি মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না: এ কি স্বপ্ন না সত্যি?

'বল, কী রঙ্‌ তোমার ভাল লাগে?'

কোন্-রঙ্‌ তার ভাল লাগে? এত রঙের, এত দামী জামা সে কখনো এত কাছে দেখে নি! কী বল্‌বে সে? কোন্‌টা ফেলে কি রাখ্‌বে!

দোকানের কর্ম্মচারী তার ভাব দেখে একটা জামা তুলে দেখালে। সূক্ষ্ম রেশমের চুড়িদার

পাঞ্জাবী। সবুজ রঙ: গহন অরণ্যের মত, দুপুরের নিস্তরঙ্গ গভীর সমুদ্রের মত নিভাঁজ, মসৃণ, সবুজ।

জামাটা গায়ে দিলে সে। এ এক অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য অনুভূতি! তার পর কাপড়—ঢালা জরির পাড়, মিহি জমি। কাপড়ের ওপর জামা চমৎকার মানাল বিন্দুকে। কিন্তু তা'র পা এখনো খালি। জামা-কাপড়ের দাম মিটিয়ে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে এলেন সেই দোকানেরই অন্য একটি কোণে। এখানে, সে দেখ্‌লে, চতুর্দ্দিকের দেয়াল-ভরা 'র‍্যাক্', তাতে স্তরে স্তরে শাদা বাক্‌স সাজান। নানা রকমের জুতো র‍্যাক্ থেকে উঠ্‌ছে, নাম্‌ছে খরিদ্দারের চাহিদা অনুযায়ী।

বিন্দুর দিকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বল্‌লেন, 'এই পায়ের 'সোয়েট' দেখি, গ্রিসিয়ান্ কাট্—সোনালী বর্ডার।'

তা'র পা মুছিয়ে এখানকার কর্ম্মচারী নতুন সেই জুতো পরিয়ে দিলে। ভেল্‌ভেটের মত কৃষ্ণাভ গহন অন্ধকারের মত কালো জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে সে প্রথমেই ভাবলে, চৌধুরীদের বাড়ির সামনে দিয়ে একবার ঘুরে আস্‌বে।

ওখান থেকে উঠে আসতে আসতে দোকানের প্রকাণ্ড আয়না সামনে পড়ল তার। তাতে নিজের প্রতিফলিত চেহারা দেখে সে থম্‌কে দাঁড়াল, চেয়ে রইল খানিক নির্নিমেষ চোখে। নিজেকে যে আর চেনা-ই যায় না! সর্ব্ব-শরীর তার উৎসাহে উচ্ছল, চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল।

অবোধের মত বল্‌লে, 'আচ্ছা, বাবা-মা দেখে কী ভাব্‌বে, বলুন্ দিকি? ভারী অবাক্ হ'য়ে যাবে, না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার আর কী চাই? একটা 'ফাউন্টেন্ পেন্' নেবে? চল, ওদিকে যাই।'

ফাউন্টেন্ পেন্, ফাউন্টেন্ পেন্! কী সুর-ভরা, স্বপ্ন-ভরা কথা! রূপকথার দেশের মত কী সুন্দর দেখ্‌তে! একটা ফাউন্টেন পেন্ হ'বে তার একেবারে নিজস্ব? ইচ্ছে মত, যখন তখন লিখ্‌বে সে তাই দিয়ে? ঝর্ণার মত নেমে আস্‌বে কালী সোনার নিবের মুখ বেয়ে! সোনার ক্লিপে আটকান থাক্‌বে বুকপকেটে—আলোয় ঝিক্‌মিক্ করবে!

কল্পলোক থেকে যেন নেমে এল তা'র মনের মত কলমটি: চমৎকার ঝক্‌মকে চকোলেট্-রঙা, সোনার নিব, সোনার ক্লিপ, সোনা বাঁধান। উত্তেজনায়-কাঁপা হাত দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে আটকালে—তা'র একান্ত একার কলম। কেউ আপত্তি করবে না, কেউ ধমক দিয়ে কেড়ে নেবে না!

দোকান থেকে বেরিয়ে তা'রা এসে ঢুক্‌ল বড় একটা রেস্তরাঁয়।



খানকতক প্লেটে একরাশ খাবার এলো—তা'দের নাম সে জানে না, জানে না কেমন স্বাদ। টাট্‌কা, রসাল গন্ধময় খাবারগুলোর দিকে চেয়ে সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে, হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত গলায় ব'লে উঠ্‌ল, 'আমি খাব না, আমি খাব না; আমার ক্ষিদে নেই। এ সব আমি বাড়ি নিয়ে যাবো। নিয়ে যাওয়া যায় না বাড়িতে?'

'কেন নেওয়া যাবে না? তুমি যা' পারো খাও, তার পর এক প্যাকেট ভর্ত্তি ক'রে আমরা নিয়ে যাবো।'

ঝাপ্‌সা চোখে তৃপ্তির সঙ্গে সে খেলে। আকণ্ঠ ক্ষিদে পেয়েছিল—পেট ভ'রে খেলে সে নামহীন, তুলনাহীন খাবার। খাওয়ার পর বেশ বড় একটা প্যাকেট নিয়ে তারা রাস্তায় বেরুলো।

ভদ্রলোক হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'ন'টা বেজে গেছে। তোমার বাড়িতে হয়ত এতক্ষণ ভাব্‌ছেন। এবার বাড়ি যাবে ত', বিন্দু?' তার পর রাস্তা থেকে একটা চল্‌তি ট্যাক্সি-ড্রাইভারের হাতে আগাম ভাড়া দিয়ে, বিন্দুর বাড়ির রাস্তার নাম ব'লে, তা'কে বল্‌লেন, 'গাড়িতে উঠে পড়।'

এইটাই যেন বাকি ছিল, এইটাই যেন সে চাইছিল মনে মনে। ভেতরের সীটের নরম গদীতে সে টুপ্ ক'রে ডুবে গেল।

বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলে দিয়ে ভদ্রলোক একটু হেসে বল্‌লেন, 'আচ্ছা। আবার দেখা হবে, কেমন?'

লাফিয়ে উঠে বিন্দু বল্‌লে, 'আপনি আস্‌বেন না?'

কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে নিঃশব্দে চল্‌তে সুরু করেছে। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে সে দেখলে, অনেক পেছনে ফুট্‌পাথের ধারে দাঁড়িয়ে তিনি হাত শূন্যে আন্দোলিত করলেন।

মনের মধ্যে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তিনি তাকে একলা ছেড়ে দিলেন কেন? এত রাত্রে? সঙ্গে এলেই ত' বেশ হ'ত। পরের গাড়িতে একলা যেতে তা'র ভয় করতে পারে, এ কথাটা তাঁর মনে হ'ল না!...এমন সুন্দর মোটরে চড়বার আনন্দ সে তেমন ক'রে বোধ করতে পারলে না। ভয় না পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও তা'র গা' ছম্‌ছম্ করতে লাগল।...

এ কী! হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে তা'র আপাদমস্তক কেঁপে উঠ্‌ল। এ কোথায় যাচ্ছে গাড়িটা? রাস্তার দু'ধারে জমাট্-বাঁধা অন্ধকার—একটু আলোর কণা, একটি বাড়ির আভাসও তার চোখে পড়্‌ল না! নিস্পন্দ, নির্জ্জন চওড়া রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। হেড্-লাইট্ দু'টো অন্ধকার ফুঁড়ে আলোর রেখা প্রসারিত ক'রে দিয়েছে, আর, হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে ট্যাক্সিটা। ছুটে চলেছে কোন্ পাতালের দিকে। এ' কোথাকার রাস্তা? তা'দের বাড়ি,

ষেতে এ' রাস্তা ত' পড়ে না! ড্রাইভার কি রাস্তা ভুল করেছে? কিন্তু ঠিকানা ত' তাকে বলা হয়েছে! তবে?

নিদারুণ আশঙ্কায় স্তব্ধ হ'য়ে সে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুকি শুন্‌লে খানিকক্ষণ। যথাসাধ্য চেষ্টায় অবাধ্য, অসাড় জিভ নেড়ে ডাক্‌লে: 'ড্রাইভার!'

গলার আওয়াজটা নিজেরই কাছে তা'র অদ্ভুত ঠেক্‌ল। কিন্তু সেই জড়ান, ভাঙা গলার ডাকে ড্রাইভারের পাশের পাগ্‌ড়ী-পরা পাঞ্জাবী একমুখ দাড়ি-গোঁফের মধ্যে থেকে জ্বল্‌জ্বলে চোখে চাইলে তার দিকে। গাড়ির মধ্যে অস্বচ্ছ, পীতাভ আলো। তাইতেই তার চোখ দেখে বিন্দু শিউরে উঠ্‌ল। চীৎকার করতে গেল সে, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না।...

ট্যাক্সি তেমনি ছুট্‌ছে নিঃসাড়, নিস্তব্ধ অন্ধকারকে চিরে চিরে। হঠাৎ সে দেখ্‌লে, রোগা লম্বা পাঞ্জাবীটা তেম্‌নিভাবে চেয়ে তা'র দিকে উঠে আসছে। কী সর্ব্বনাশ! লোকটা ফাউণ্টেন পেন্ দেখ্‌তে পেয়েছে নাকি? ব্যাকুল হাতে সে মোড়কটা দিয়ে বুকপকেট আড়াল করলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এসে তার হাত বুক থেকে ঠেলে দিলে। বিন্দু প্রাণপণ শক্তিতে কলমটা চেপে ধরলে, আর পাঞ্জাবীটা তার ঘর্ম্মাক্ত হাত সরাবার জন্যে টানাটানি করতে লাগ্‌ল।

* * *

ঘুমন্ত বিন্দুর বুকে হাত দিয়ে তা'র মা জাগাবার চেষ্টা করছিলেন, 'বিন্দু ওঠ, সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে; আর কত ঘুমুবি?'

'আমার ফাউণ্টেন পেন, আমার ফাউণ্টেন পেন!' স্বপ্ন-রাজ্য থেকে ফিরতে ফিরতে সে আর একবার কান্নার সুরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল; 'মা, মা, তোমার জন্যে কত খাবার এনেছি—'

'কি বক্‌ছিস্ পাগলের মতন?'

উঠে প'ড়ে, পাগলেরই মতন চোখে বিন্দু মাটির দেয়ালের চারদিকে চাইতে লাগ্‌ল, আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে তা'র নাক, চোখ জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল।

চৌধুরীদের বাড়ি তখন সরগরম হ'য়ে উঠেছে পূজোর বাজনায়।

---

## ভাল-মন্দ

**শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক**

ভাল আর মন্দ—এরা পিঠোপিঠি ভাই,
একই মাতা একই পিতা, থাকে এক ঠাঁই।
হা-ডু-ডু-ডু লুকোচুরি খেলে সারা বেলা,
বিশ্বলোকে বোঝে না সে অপরূপ খেলা।

---

[ ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী ]

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক:—দেড় হাজার বছর আগেকার কথা। হূনদের অত্যাচারে ভারতবর্ষ তখন জর্জ্জরিত। এমনি সময়ে কালো ঘোড়ায় কালো বর্ম্মপরা এক ছদ্মবেশী হিন্দু বীর অত্যাচারিতদের সাহায্যে এল। হূন-সম্রাট্ মিহিরকুল তাকে ধরবার জন্য ৫০০০ স্বর্ণমুদ্রা ঘোষণা করলেন। এদিকে কারুষ রাজকুমার ধর্ম্মদেবও ঠিক কালো সওয়ারের ছদ্মবেশে হূন-অত্যাচার দমন করছিল। একদিন দুই কালো সওয়ারে দেখা। আসল কালো সওয়ার ২য়কে কারুষ রাজকুমার ব'লে চিনতে পারল। তারই কথায় ধর্ম্মদেব হূন রাজধানীতে রাজবৈদ্য বিষ্ণুবর্দ্ধনের আশ্রয় পেল এবং রাজসভায় তার ভাই ব'লে পরিচিত হ'ল। ঐ সভায় হূন সেনাপতি জেতমানা বন্দিনী মালব-রাজকন্যা মল্লিকাকে অপমান ক'রে ধর্ম্মদেবের সঙ্গে অসিযুদ্ধে পরাজিত হ'ল। সমবেত হূনের অন্যায় আক্রমণ থেকে হূন-সম্রাটের পালিতা কন্যা কন্যাকুমারী ধর্ম্মদেবকে বাঁচাল। এর পর, ধর্ম্মদেবই কালো সওয়ার সন্দেহে, জেতমানা তাকে গোপনে হত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে মল্লিকার হাতে প্রাণ হারাল। কন্যাকুমারী আগেই শুনতে পেরে তাদের সাবধান করে দিয়েছিল।

ধর্ম্মদেব ও মল্লিকা পালাবার পথে কালো সওয়ারের দেখা পেল ও তার নির্দ্দেশে মহাকাল-মন্দিরে ভৈরব আচার্য্যের কাছে আশ্রয় পেল। আচার্য্য ধর্ম্মদেবকে হূনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন ও প্রয়োজন মত সৈন্য যোগাবার আশ্বাস দিলেন। এদিকে মিহিরকুল জেতমানার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ হিন্দুদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার সুরু করায় মল্লিকা গোপনে ধরা দিতে গেল। সেই সময় কালো সওয়ার তাকে উদ্ধার ক'রে পালাল এবং পথে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে মল্লিকা তার বর্ম্ম খুলে দেখল—সে আর কেউ নয়, রাজবৈদ্য বিষ্ণুবর্দ্ধন। এই সময় হূনরা তাদের দু'জনকেই বন্দী করল।

### বারো

মন্দিরের পিছনে পাহাড়ী জঙ্গল, মাঝে একটি সরু পায়ে-চলা পথ-রেখা ঘন জঙ্গলকে দু'পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। ভৈরব আচার্য্য ধর্ম্মদেবকে নিয়ে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করলেন।

কিছু দূর গিয়ে পথটা যেখানে বেঁকে গেছে, তার এক পাশে গাছপালার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ঠেলে খানিকটা গেলে সামনে একটি ছোট গুহামুখ নজরে পড়্‌ল। একটি লোক কোন রকমে সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। আচার্য্য ধর্ম্মদেবের হাত ধরে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ভিতরে ঘন অন্ধকার।

আচার্য্য ডাকলেন—নরোত্তম, আছ ?

প্রতিধ্বনিত হয়ে গুহার ভিতর গম্ গম্ করে উঠ্‌ল—আছ-হ-হ!

অন্ধকারের ভিতর থেকে সাড়া এল—আজ্ঞা করুন আচার্য্যদেব!

—একটা আলো জ্বাল দেখি, অন্ধকারে কিছুই ঠাহর পাচ্ছি না।

চকমকি চিক্ চিক্ করে উঠ্‌ল, তার পর একটি প্রদীপের আলো গুহার অন্ধকার ম্লান করে দিলে। প্রদীপটি পিলসুজের উপর রেখে যে লোকটি এগিয়ে এসে আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করল তার মাথার চুলগুলি দুধের মত শাদা, মুখে বার্দ্ধক্যের কুঞ্চন পড়েছে, হাতের শিরাগুলি জেগে উঠেছে পেশীর উপর।

আচার্য্য ধর্ম্মদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—এটি হচ্ছে আমাদের অস্ত্রাগার, আর এই অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হচ্ছে এই নরোত্তম তলোয়ারকার। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ শুধু তলোয়ার তৈরী করেছে, এখনও করছে, ষাট বছর বয়সেও ওর ক্লান্তি আসে নি। নরোত্তম প্রতিজ্ঞা করেছে হুনরা নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ও বিশ্রাম করবে না। দিনরাত বসে বসে ও শুধু অস্ত্র তৈরী করে, গত বছর দুই ধরে ও একরাত্রিও ঘুমোয় নি। এখানে যা কিছু দেখছ, ও সবই ওর নিজের হাতের তৈরী।

ধর্ম্মদেবকে একে একে আচার্য্যদেব চারিপাশ দেখালেন। বর্শা ও তীরের ফলা আর তলোয়ার স্তূপাকারে জড় হয়েছে গুহার এক একটি স্থানে। ম্লান দীপের আলো সেই তলোয়ারের ধারে ধারে খেলা করছে বিদ্যুৎ-দ্যুতির মত।

ধর্ম্মদেব তাকিয়ে থাকে, অস্ত্রগুলির পানে তাকিয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। একখানি তলোয়ার তুলে নেয়, ভালো করে নেড়ে-চেড়ে আবার সন্তর্পণে রেখে দেয়, তার পর জিজ্ঞাসা করে—আচার্য্যদেব, এই তলোয়ার ধরবে কারা ?

ভৈরব হাসিমুখে বল্‌লেন—তলোয়ার ধরার লোক অনেক আছে, কিন্তু যোগ্য পরিচালকের অভাব। তুমি তাদের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারবে, রাজকুমার ?

—আমি কেন, কালো সওয়ার ?

—কালো সওয়ার তো আছেই, আর একজনের দরকার—দু'জন দু'দিক্ থেকে দুর্গ আক্রমণ করবে। তুমি পারবে একদিকের অধিনায়ক হ'তে ?

—এখনি।—ধর্ম্মদেবের চোখ দুটি জ্বলজ্বল্ করে উঠ্‌ল।

নরোত্তম এগিয়ে এসে ধর্ম্মদেবের মুখের পানে তাকাল। তার কোটরে-বসা চোখ দুটি এমন দীপ্যমান হয়ে উঠ্‌ল যেন সে ধর্ম্মদেবের মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত দেখে নিতে চায়। খন্‌খনে গলায় বল্‌লে—এ কিন্তু বড় কঠিন ব্রত রাজকুমার, শত্রুর সামনে থেকে পিছু হটে আসার উপায় নেই কিন্তু!



ধর্ম্মদেব উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে—কে বল্‌লে আমি পিছু হটে আসব ?

—রাজরাজড়ার প্রাণের মায়া সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী কিনা, তাই বলছি।—নরোত্তম খন্ খন্ করে হেসে উঠ্‌ল।

রাগে ধর্ম্মদেবের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, সহসা সে কোন জবাব দিতে পারল না।

আচার্য্যের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধর্ম্মদেবের মুখের পরিবর্ত্তন ধরা পড়তে এতটুকু বিলম্ব হ'ল না। তার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বল্‌লেন—তলোয়ারকারের কথায় রাগ ক'র না রাজকুমার, ওর কথাগুলি চিরদিনই বড় বেশী ধারাল। পাঁচ-পাঁচটা ছেলে হুনদের হাতে মরেছে, তার পরেও ও যে আজ কথা বলছে এইটেই আশ্চর্য্য!

নরোত্তম বাকীটা যোগ করে দিলে—একেবারে নির্ব্বংশ হয়ে গেছি রাজকুমার, একেবারে নির্ব্বংশ! সেইজন্যই তো দিনরাত্তির বসে বসে তলোয়ার শানাচ্ছি। ব্যাটাদের নির্ব্বংশ না করে আমিও ছাড়ব না।

বুড়ো নরোত্তম খুক্ খুক্ করে হেসে উঠ্‌ল, তার চওড়া বুকের জীর্ণ পাঁজরগুলো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

ধর্ম্মদেবের মনে এবার বিরাগের বদলে করুণার সঞ্চার হ'ল।

আচার্য্য জিজ্ঞেস করলেন,—কত হ'ল নরোত্তম ?

—তলোয়ার দু'হাজার সাইত্রিশখানা, বর্শাফলক আট হাজার, তীরের ফলা সাতাশ হাজার দু'শ'। আর এই তিনখানি তলোয়ার আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ হবে।—নরোত্তম তার হাতের কাছে তিনখানি সদ্য-প্রস্তুত অসম্পূর্ণ তলোয়ার দেখিয়ে দিল,—এগুলো শুধু ধার দিতে বাকী।

—বেশ, তুমি তোমার কাজ কর নরোত্তম, আমি ততক্ষণে একে চারপাশটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

আচার্য্য ধর্ম্মদেবকে গুহার আর একদিকে নিয়ে গেলেন, সেখানে লৌহবর্ম্মের স্তূপ জড় হয়েছে, আর একদিকে ঘোড়ার কণ্ঠ-ত্রাণ ও শিরস্ত্রাণ।

ধর্ম্মদেব বল্‌লে—এ তো দেখছি একেবারে রাজকীয় ব্যাপার!

—ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজার অভ্যর্থনা করতে হ'লে রাজকীয় ব্যাপারেরই যে দরকার হবে রাজকুমার!

কথা বল্‌তে বল্‌তে দু'জনে অন্য মুখ দিয়ে গুহার বাহির হ'য়ে আসে। (ক্রমশঃ)

# শ্রীমতীর বিয়ে

[ পুরাণের গল্প ]

শ্রীশান্তা দেবী

অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের মেয়ে ছিলেন শ্রীমতী। শ্রীমতী দেখতে যেমন অসামান্যা সুন্দরী, তেমনি গুণবতী। এমন মেয়ের স্বামী হবার উপযোগী এক বিষ্ণু ছাড়া কে আছে? শ্রীমতী গতজন্মে বিষ্ণুকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা ক'রে এ জন্মে অম্বরীষের কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন।

কিন্তু গোল বাধালেন দুই মুনি। নারদ মুনি আর পর্ব্বত মুনি কি একটা কাজে তাঁরা এলেন রাজা অম্বরীষের বাড়ী, আর শ্রীমতীকে দেখেই দু'জনেরই লোভ হ'ল মেয়েটিকে বিয়ে করবার। অম্বরীষ তো শুনে মহা ভাবনায় পড়লেন। অমন হীরের টুকরো মেয়েকে কি ঐ সব দাড়িওয়ালা মুনির হাতে সঁপে দেওয়া যায়। আবার না দিলেও মুনিঋষির কাণ্ড, না জানি কি শাপ দিয়ে বসবেন! অনেক ভেবে অম্বরীষ বল্লেন, "ঠাকুর, আমার মেয়ে তো মোটে একটি, কিন্তু আপনারা দু'জনেই তাকে বিয়ে করতে চাইছেন। সে কি ক'রে হবে? আগে আপনারা নিজেদের মধ্যে একটা রফা করুন।"

মুনিরা নাছোড়বান্দা। ঠিক হ'ল শ্রীমতীর স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করা হবে। দুই মুনি সেজেগুজে আসবেন, শ্রীমতীর যাঁকে খুসী তাঁর গলায় মালা দেবেন।

সেই বন্দোবস্ত হ'ল। এখন, দুই মুনিরই ভয় হ'ল পাছে হেরে যান। নারদ মুনি চটপটে লোক, তখনই ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে। সব কথা খুলে বল্লেন, তার পর বল্লেন, "ঠাকুর, আপনি যদি দয়া করে ঐ সময় পর্ব্বত মুনির মুখটা ঠিক বানরের মত করে দেন তবে অধম বড়ই উপকৃত হয়। ভক্তের এ বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন না প্রভু?" বিষ্ণু হেসে বল্লেন, "বেশ, তাই হবে।"

পর্ব্বত মুনিও চালাক লোক। নারদ চলে যাবার পর তিনিও এসে হাজির—তাঁর আরজি, বিষ্ণু যদি দয়া করে ঐ সময়টা নারদের মুখ হনুমানের মত করে দেন, তা হলে—"। বিষ্ণু বল্লেন, "তথাস্তু।"

স্বয়ম্বর সভা। দুই মুনি সেজেগুজে এসে বসেছেন। এমন সময় ফুলের মালা হাতে শ্রীমতী ঢুকলেন। তাঁর পূর্ব্বজন্মের তপস্যা কি তবে ফল্‌ল না?

অম্বরীষ পরিচয় করিয়ে দিলেন, "মা, এই ইনি নারদ মুনি আর ইনি পর্ব্বত মুনি। তোমার যাঁকে খুসী মালা দাও।" ঠিক সেই সময় বিষ্ণুর বরে দুই মুনিরই চেহারা বানর আর হনুমানে



রূপান্তরিত হয়েছে। শ্রীমতী বল্লেন, "বাবা, কই, মুনিরা কোথায়? সামনে তো দেখছি এক বানর আর এক হনুমান! তবে তাঁদের মাঝখানে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেখছি বটে—কী সুন্দর তাঁর চেহারা!"

মুনিরা শুনে চটে গেলেন। কী, তাঁদের ঠাট্টা! "মহারাজ, আপনার মেয়েকে ঠাট্টা ছেড়ে তাড়াতাড়ি মনস্থির করতে বলুন। নইলে—"।

অম্বরীষ মেয়েকে আবার অনুরোধ করলেন। শ্রীমতী আর ভাববার সময় পেলেন না, চকিতে তাঁর মালা পড়্‌ল গিয়ে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের গলায়। পরমুহূর্ত্তে শ্রীমতী সহ সেই পুরুষ উধাও হলেন।

ব্যাপার দেখে মুনিদের তো চক্ষুস্থির। নিশ্চয়ই এ কোন দেবতার ছলনা। তাঁরা তখনই ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে নালিশ করতে। এর প্রতিকার চাই।

এখন, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষটি কিন্তু আর কেউ ন'ন, স্বয়ং বিষ্ণু, শ্রীমতীকে মুনিদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিজেই গিয়ে স্বয়ম্বর সভায় হাজির হয়েছিলেন। শ্রীমতী ঠিক জায়গায়ই মালা দিয়েছেন। মুনিদের নালিশ শুনে বিষ্ণু হেসে বল্লেন, "কি জানি, কত দেবতা আছেন, কে মায়া ক'রে কাণ্ডটা বাধিয়েছেন কি ক'রে বল্‌ব?" মুনিরা ভাবলেন, এ আর কিছু নয়, রাজা অম্বরীষেরই চালাকি। তাঁরা তখনই শাপ দিলেন,—"আজ থেকে ঘোর অন্ধকার এসে অম্বরীষকে ছেয়ে ফেলুক।" মুনিদের রূপ থাক্‌ না থাক্‌ তপস্যার জোর ছিল। শাপ দেবা মাত্র এক দারুণ অন্ধকার এসে অম্বরীষকে ঘিরে ফেল্‌ল। বিষ্ণু দেখলেন, বিনা দোষে অম্বরীষ বেচারী শাস্তি পাচ্ছেন। তিনি অমনি সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিলেন ঐ অন্ধকারকে তাড়া করতে। সঙ্গে সঙ্গে চক্রও ছুট্‌ল। বিষ্ণুর চক্র, সে কি সহজ জিনিষ? চক্রের তাড়া খেয়ে অন্ধকার অম্বরীষকে ফেলে ছুট্‌ল। কিন্তু চক্র নাছোড়বান্দা, সমানে তার পিছু নিল। বেগতিক দেখে মুনিদের আনা অন্ধকার তখন আশ্রয়ের জন্য তাঁদেরই কাছে ছুট্‌ল।

কি সর্ব্বনাশ! তখন দৌড়—দৌড়—দৌড়। সামনে দুই মুনি, তার পেছনে অন্ধকার, তার পেছনে সুদর্শন চক্র—সুরু হ'ল এক ভীষণ দৌড়ের পাল্লা।

দিবারাত্র ত্রিভুবনময় ছুটোছুটি ক'রে শেষে নিরুপায় মুনিযুগল বিষ্ণুর কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। তিনি ছাড়া এখন কে রক্ষা করবে? মুনিদের কাকুতি দেখে বিষ্ণু হেসে চক্রকে আদেশ দিলেন অন্ধকারকে ছেড়ে দিতে। ছাড়া পেয়ে অন্ধকারও নিমেষে উধাও হ'ল।

এর পর আর মুনিরা কখনও বিয়ের নাম করেন নি।

---

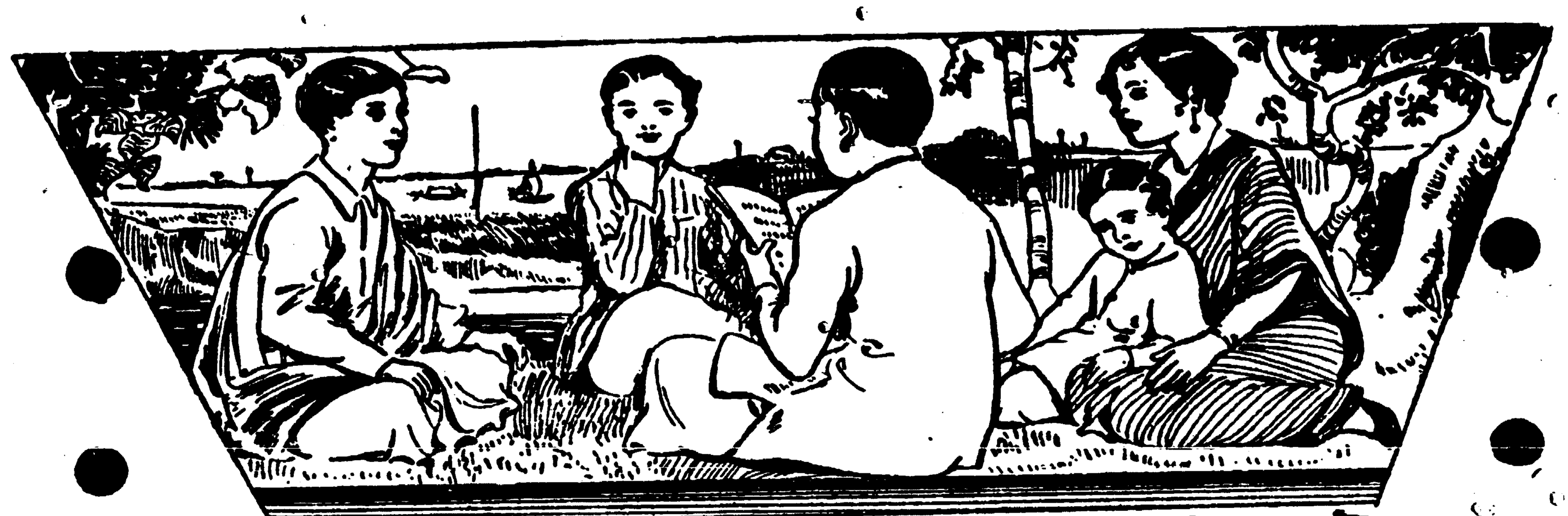

# ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

## সাগর ও কাদা

শ্রীবীরসিংহ

সিন্ধু কহে, "ওহে কাদা, জন্ম তব মিছে,
চিরদিন প'ড়ে আছ মম দেহ-নীচে।"
কাদা হাসি' কহে, "মোর বক্ষে বাস ক'রে, নাহি স্থান দিলে তোমা হৃদয়ে আমার,—
লজ্জাহীন মুখে তবু নিন্দা কর ওরে? কোথায় থাকিতে তুমি ভাব একবার।"

## শিমুলতলা

শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য্য

নাইকো সেথা কলের ধোঁয়া, মস্ত বাড়ী,
রাস্তা-যোড়া মোটর লরী, ট্রামের গাড়ী।
হেথায় সবাই হাসে খেলে আপন মনে,
বড় হবার উচ্চ-আশা নাইকো মনে।
মাঠের 'পরে দিন কেটে যায় লাঙ্গল হাতে,
কাজ ফুরোলে গাছের তলে গল্পে মাতে।
ধরার মাঝে ছোট্ট এ গ্রাম পাহাড় ঘেরা,
শ্যামল শোভায় ছোট্ট এ গ্রাম সবার সেরা।

মাঠের মাঝে শীর্ণতোয়া পাহাড়-নদী,
তর্তরিয়ে চল্‌ছে ব'য়ে নিরবধি।
মাঝে মাঝে ভেসে আসে ঝর্‌ণা-ধ্বনি,
আকুল হ'য়ে ওঠে হৃদয় তাই না শুনি।
এই গ্রামেরই নামটা আমার
হয় নি বলা,
তোমরা জান? শুনবে? শোন—
"শিমুলতলা"।



রণদামামার অট্টরোলের মধ্যে 'রামধনু' এ মাসে ১৫ বছরে পদার্পণ কর্‌ল। রামধনুর শুভাকাঙ্ক্ষীরা শুনে সুখী হবে, এমন দিনেও 'রামধনু' তার অগণিত পাঠক-পাঠিকার স্নেহ-দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি—প্রতি বারের মত এবারেও অজস্র শুভেচ্ছাসূচক চিঠি সে স্নেহের পরিচয় বহন ক'রে এনেছে। এই শুভেচ্ছার পাথেয় নিয়েই রামধনু আবার যাত্রা সুরু কর্‌ল।

* * *

যুদ্ধের খবর আর নতুন ক'রে কি বল্‌ব? জাপান বিপক্ষে যোগ দেওয়ার পর পূর্ব্ব এশিয়ার অশান্তি বেড়েই চলেছে। মালয়ে জাপসৈন্য অনেকটা এগিয়েছে, ব্রহ্মদেশেও মাঝে মাঝে বিমান আক্রমণ চলছে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও তারা সমানে আক্রমণ চালাচ্ছে। এখন সিঙ্গাপুরে দু' পক্ষের শক্তি পরীক্ষা সুরু হয়েছে।

ওদিকে উত্তর আফ্রিকায় বৃটীশ বাহিনীর সাফল্যের কথা বোধ হয় সকলেই জান। রুশরাও জার্ম্মান্‌দের ক্রমাগত হঠিয়ে দিয়ে বহু স্থান পুনর্দখল করেছে।

* * *

এ বছরকার পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা বোম্বাইএ শেষ হয়েছে। ফাইনালে হিন্দু দল পার্শী দলকে দশ উইকেটে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ন্ হবার সম্মান লাভ করেছে। হিন্দু দলের বিজয় মার্চ্চেণ্ট্ এই প্রতিযোগিতায় খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবং একাধিক বার দু' শ'র ওপর রান্ তুলেছেন। রণজী প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয় নি।

কলকাতায় পূর্ব্বভারত টেনিস্ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। সিঙ্গল্‌স্ ফাইনালে গাউস্ মহম্মদ ইফ্‌তিকার আমেদকে হারিয়ে ভারতীয় টেনিসে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অজেয় রেখেছেন।

* * *

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এবারকার অধিবেশন কাশীধামে সমারোহের সঙ্গে হয়ে গেছে। এবারকার সম্মেলনের বিশেষত্ব—এবারে শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের জন্য একটি পৃথক্ শাখার অধিবেশন হয়েছিল এবং 'ঠাকুরমার ঝুলি'র লেখক সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয় এই শাখায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। বহু প্রবাসী কিশোর-সাহিত্যরসিক সভায় যোগ দিয়ে বাংলা শিশু-সাহিত্যের প্রতি তাঁদের দরদ জানিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আসরে শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের দাবীও যে কম নয় এ থেকে তা আর একবার প্রমাণিত হ'ল।

* * *

স্যর আকবর হায়দরীর কর্ম্মময় জীবনের অবসান হ'ল। ব্যক্তিগত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য তাঁকে সর্ব্ব শ্রেণীর ভারতীয় শ্রদ্ধার চোখে দেখত। হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্যও তাঁর চেষ্টার ক্রুটী ছিল না। এ নিয়ে তিনি নানাভাবে কাজ করে গেছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা লেক্‌চারার রূপে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

## মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে গত বছরের ( মাঘ ১৩৪৭—পৌষ, ১৩৪৮ ) রামধনুতে প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি (৫টি ক'রে) সব চেয়ে ভাল ব'লে মনোনীত হয়েছে :—

**কবিতা—**

নববর্ষ—৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিশ্বকবির তিরোভাব—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক
রবীন্দ্রনাথ—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
আফিংখোরের সাক্ষ্য—বন্দে আলি মিয়া
যুদ্ধে যাবেন খুড়ো—শ্রীসমর সরকার

**প্রবন্ধ**—যুদ্ধে গুপ্তচর—শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সান্ত্বনা পুরস্কার—অধ্যাপক শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য্য
মাটী খোঁড়ার কথা—শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত
ভীম ভাসমান মাইন—শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ঠেকে শেখা—শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

**গল্প—**

গোলাপগঞ্জের কয়েদখানা—শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য
এক রাত্রের বিভীষিকা—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
গালপাট্টার মিয়াদ—শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত
একটি ধূসর বস্তু—শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল
অর্থনীতির এক অধ্যায়—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠিয়েছেন—শ্রীতারা লাহিড়ী (কলিকাতা) ; তিনিই পুরস্কার পাবেন। শ্রীমাধুরী দেবী (ঢাকা ) ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ( কানপুর ) —এঁদের তালিকাও খুব কাছাকাছি হয়েছে।

---

### গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৪

এই ভাবে সাজিয়ে যোগ করতে হবে :

```
 ৪৪৪
  ৪৪
   ৪
   ৪
   ৪
----
 ৫০০
```

### উত্তরদাতাদের নাম

নীহারকণা সেনগুপ্তা ( বুরু ), দেবী, রঘু ও আরও অনেকে ( ভাগলপুর ) ; মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ) ; মণিরাম ( মোহনলাল ) আগরওয়ালা ( সুজানগর ) ; কালিদাস পাল ( বালুভরা ) ; সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ) ; সত্যব্রত সেন ( মণিপুর ) ; শান্তি, ছোট মামা, তুম্যা ( গয়া ) ; প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী ( বালুভরা ) ; সৌরীন্দ্র সরকার ( খড়্গপুর )।

অনেক গ্রাহক ধাঁধাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি।

## নূতন ধাঁধা

আমাকে প্রশ্রয় দিলে পাবে শস্য এবং একটা গহনা দিলে পাবে একটি সুন্দর ফুল। রাত্রির সঙ্গে যদি আমাকে মেলাতে পার তবে তোমাকে বেশ ধারাল একটি অস্ত্র উপহার দেব। তবে আমাকে শক্তি দেওয়া মানে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রাস ক'রে ফেলা। তা' ব'লে কিন্তু আমাকে আটকে রেখ না ; যদি আমাকে আবদ্ধ ক'রে রাখ তবে দেখবে আমার শরীরের এমন খানিকটা অংশ নেই যাতে আমি মানুষ হ'লেও তোমাদের কোনই কাজে লাগ্‌ব না। তোমাদের অল্প বয়স থেকেই আমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছিল। আজ চিনতে পার ?

---


ছোটদের উপযোগী ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী

সুলেখক **শ্রীঅমলশঙ্কর রায়** প্রণীত

# ইউরোপের আলো

**সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত**

"এ তো গাইড্ বুক্ নয়, এ চিত্রকথা। আমার স্থির বিশ্বাস বইখানা প'ড়ে আমাদের দেশের ছেলেরা য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারবে।"
—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

"আপনার লেখা বেশ ঝরঝরে, আপনার অভিজ্ঞতাগুলিও কৌতুককর। প্রচুর হাস্যরসের আয়োজন থাকায় আপনার আসরে ছেলেরা সহজেই ভিড়বে।" —শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

"বইটি অত্যন্ত সরল ভাষায় লেখা, আর তারই মধ্যে আছে তথ্য ও ঘটনার বুনোনি। বইটি মুখ্যত বালকবালিকাদের জন্য লেখা হ'লেও সাবালকদের উপভোগ্য।" —শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সুন্দর পুরু কাগজে সুদৃশ্য ছাপা। উপহারের উপযোগী মনোজ্ঞ রঙ্গিন প্রচ্ছদপট।

দাম এক টাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা।



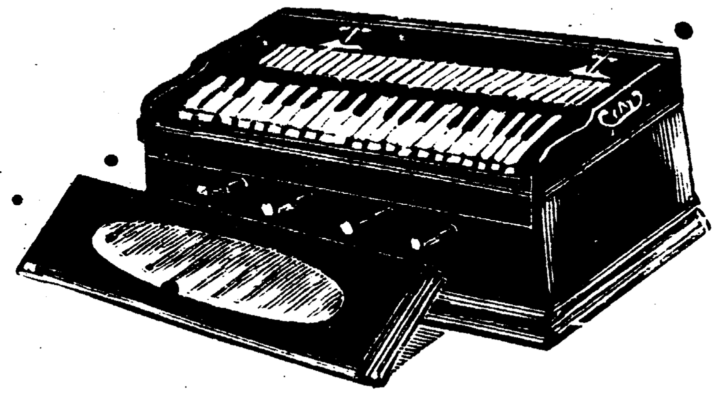

সুর সাধনায় অরগ্যান কোং'র

হারমোনিয়মই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

**বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে**

আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

**অরগ্যান কোং**

৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।



ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা

= সুন্দর বই =

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

হুকাকাশির গল্প ··· ৷৷০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি ··· ৷৷০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

আবিষ্কারের গল্প ··· ৷৷০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ··· ৷৷৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ··· ১৷৷০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা।



১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C–1641


# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

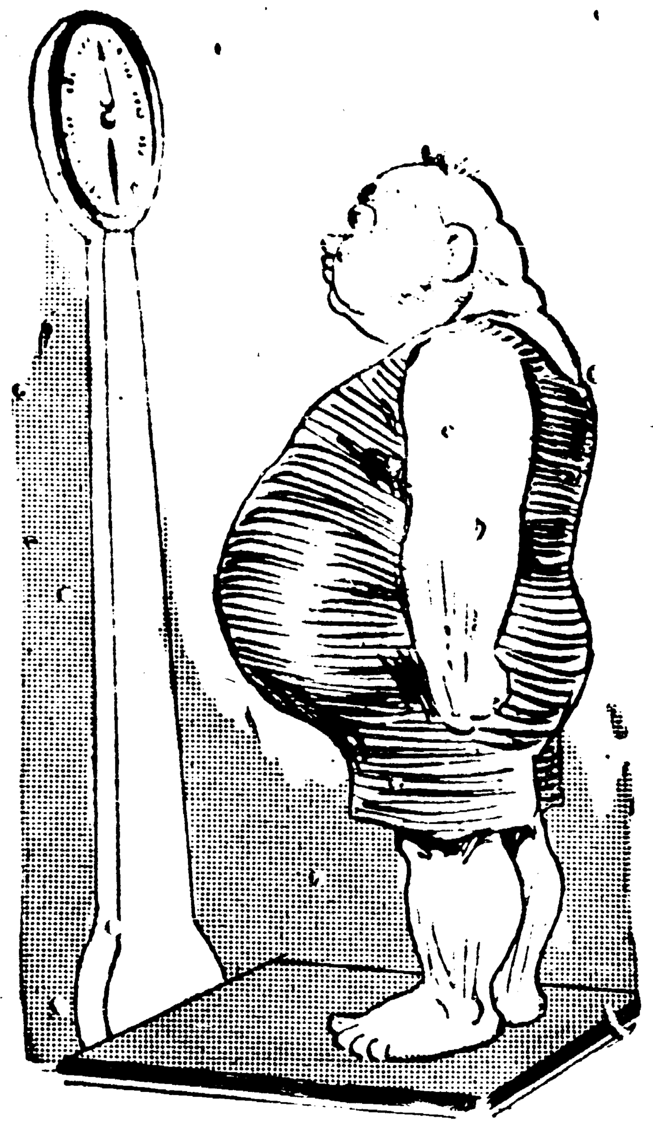

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী
ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বল্লবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৬৬০


Cover: C. H. Aran & Co.

১৫শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৪৮ দ্বিতীয় সংখ্যা

# রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

বার্ষিক ২৸৶০ | কার্য্যালয় ১৬, টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর, কলিকাতা। | প্রতি সংখ্যা ।॰

## রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০, ষাণ্মাসিক ১৵০; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস্-সি প্রণীত

**বিজ্ঞান-বুড়ো**

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

**বিজ্ঞানের জয়যাত্রা**

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

**আকাশের গল্প**

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৫১০

**আবিষ্কারের গল্প**

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

**জন্মদিনের উপহার**

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

**ফুলের মূল্য**

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপ্‌"এর মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

**প্রাপ্তিস্থান**:—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)



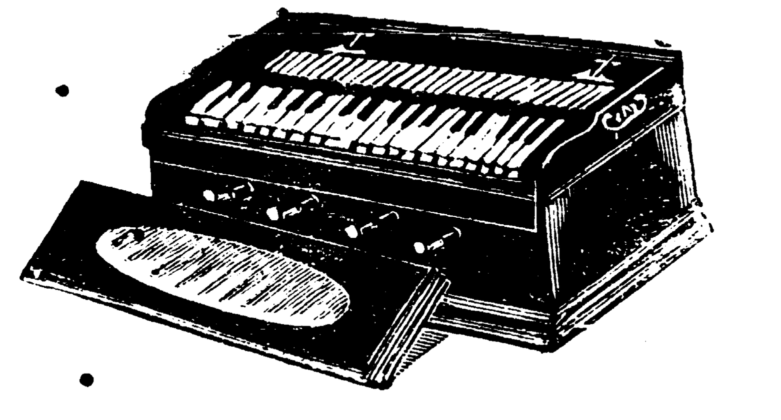

সুর-সাধনায় অরগ্যান কোং'র

**হারমোনিয়মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।**

বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

**অরগ্যান কোং**

৬।১১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।



**ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা**

= সুন্দর বই =

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের
ইউরোপের আলো ... ১৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ... ॥০

শ্রীলীলা মজুমদারের
বদ্যিনাথের বড়ি ... ॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

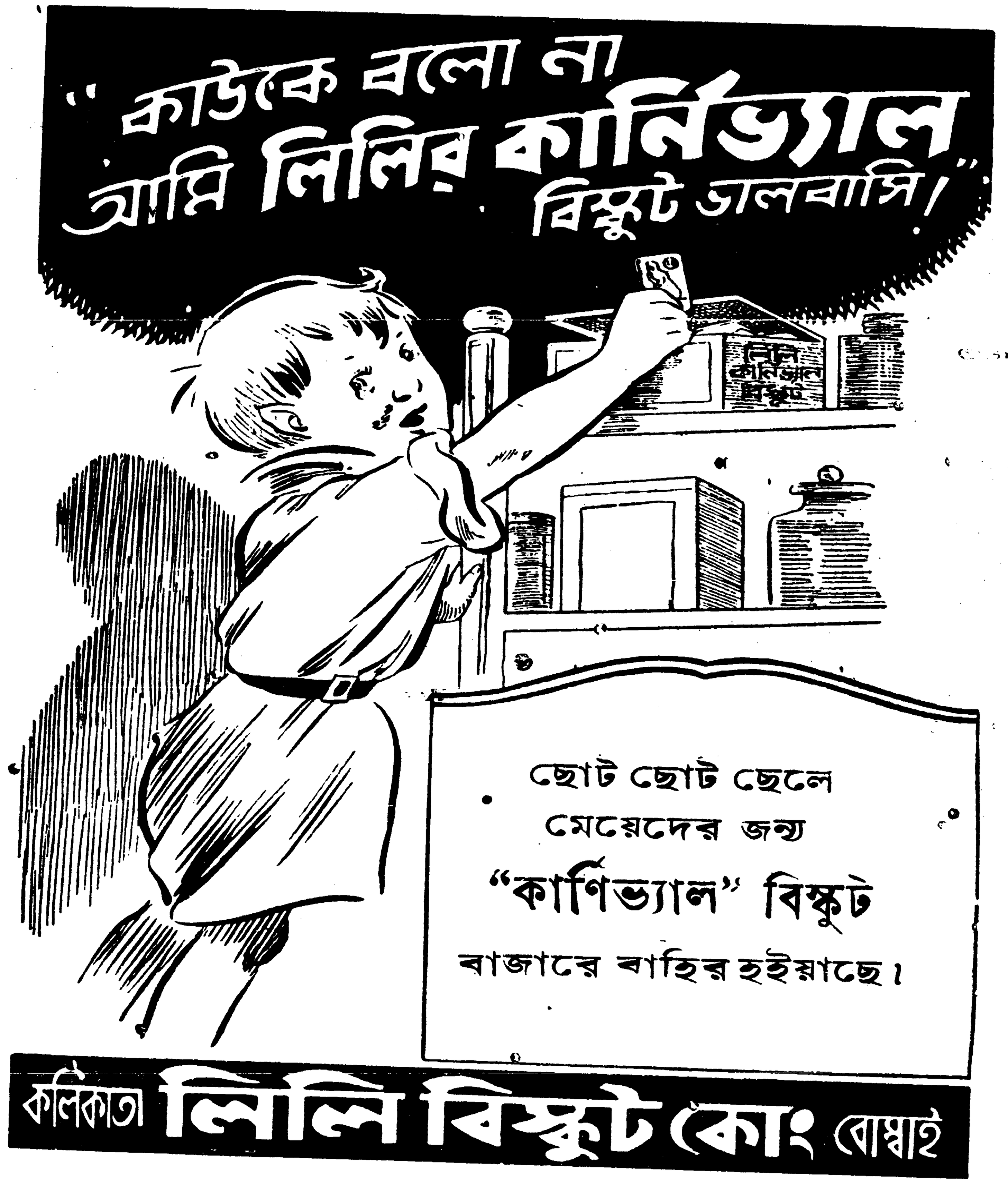



## = কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ =

( রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ্‌ শিশু উপন্যাস )

প্রতি মাসেই বাহির হইতেছে— :: —প্রত্যেকখানি আট আনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। **অন্ধকারের বন্ধু**
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। **ছিন্নমস্তার মন্দির**
শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। **তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক**

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। **বিজয় অভিযান**
শ্রীবুদ্ধদেব বসুর
৫। **ছায়া কালো-কালো**
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। **রাত্রির যাত্রী**

শিশু-সাহিত্যে ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রথম দান

### ৭। হারাণো বই

প্রকাশিত হইয়াছে—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

### ৮। জীবন্ত সমাধি

—আমাদের প্রকাশিত এ বৎসরের নূতন বই—

শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী, এম্.এ প্রণীত
**স্বর্গে থিয়েটার** (পৌরাণিক গল্প) ॥৵০
শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত
**অদ্ভুত যত ভূতের গল্প** (ভূতুড়ে গল্পসঞ্চয়ন) ১।০
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
**দেড়শো খোকার কাণ্ড** (শিশু-উপন্যাস) ১৲
শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
**উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে** (কৌতুক কথা) ৸০
শ্রীযুক্ত নিখিলেশ সেনের
**রোমাঞ্চকর কাহিনী** (ছোট গল্প) ॥০
শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়ের
**ছেলেধরা সার্কাস** (শিশু উপন্যাস) ॥৵০
শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
**দানবীর কার্নেগী** (জীবনী) ॥০

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্তের
**প্রতাপসিংহ** (ছেলেদের নাটক) ॥০
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর
**আকাশ গঙ্গা** (ভ্রমণ কথা) ৸০
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
**তাতারের বন্দী** (বৈদেশিক গল্প) ৸০
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তের
**বিষের তীর** (শিশু উপন্যাস) ॥০
**নিশির ডাক** (শিশু উপন্যাস) ৸০
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের
**বোম্বেটে-দ্বীপ** (শিশু উপন্যাস) ৸০
**সোনার পাখী** (ছোট গল্প) ১।০
শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতীর
**ঋষি অরবিন্দ** (জীবনী) ॥০
শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের
**হারানো দিন** (শিশু উপন্যাস) ১৲

**দেব সাহিত্য-কুটীর**—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

# ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে

দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

## =কয়েকখানি উপহার দিবার বই=

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

**যান্ত্রিক আবিষ্কার**—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

**জীবন ও সাহিত্য**—সর্ব্বজন প্রশংসিত উচ্চাঙ্গের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী। মূল্য—১৲

**আবিষ্কার যাত্রী**—(Heroes of Exploration) মূল্য—১৲

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

**হিমালয়ের হিমতীর্থে**— ১।০

৺অমরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

**বাংলার নবরত্ন**—(Nine Gems of Bengal) শ্রীঅপরাজিতা বসু কর্ত্তৃক সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য—॥৵০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত

**কাশ্মীরের কথা**—বহু চিত্র শোভিত ৸০

শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত

**আচার্য্য শঙ্কর**—(শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত) মূল্য—॥৵০

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা রাধারাণী রায়ের

**রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা**

ভারতের দুইটী বীরাঙ্গনার পবিত্র জীবন কথা। মূল্য—।০ ইংরাজীতে মূল্য—।০

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

**বাংলার বীর** ... ১।০ **বাংলার বীরাঙ্গনা** ... ৸০

**গোল্ডকুইন কোং লিঃ—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা**

পল্লীশ্রী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত আর্থার এস্, ঘোষ

রামধনু—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৮ { ২য় সংখ্যা

## খোকা ও শাদা পাখী

শ্রীভবানী চৌধুরী

শাদা পাখী এক ঝাঁক
উড়ে যায়।—
আকাশের বুক ঘেঁসে সোনালিয়া রোদে ভেসে
হেথা হ'তে ওই দূর নীলিমায়।

ছোট খোকা ব'সে থাকে
জানালায়;
ভাবে তারা শাদা পরী— রূপকথা-শাদা পরী,
তাই ডাকে, 'কাছে আয়, ওরে আয়!'

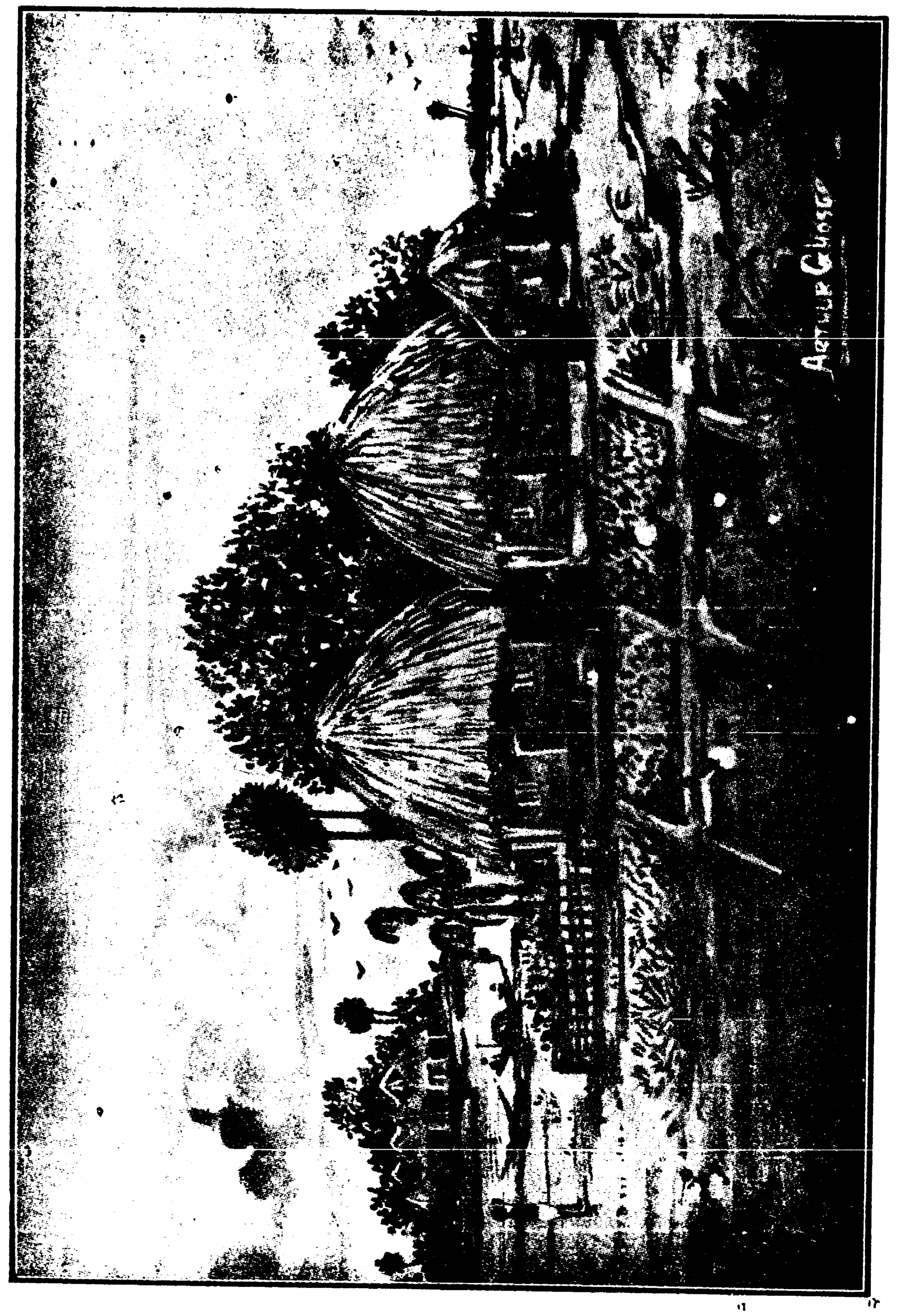


পল্লীশ্রী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত আর্থার এম্. ঘোষ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৪৮ { ২য় সংখ্যা

# খোকা ও শাদা পাখী

শ্রীভবানী চৌধুরী

শাদা পাখী এক ঝাঁক
উড়ে যায়।—
আকাশের বুক ঘেঁসে সোনালিয়া রোদে ভেসে
হেথা হ'তে ওই দূর নীলিমায়।

ছোট খোকা ব'সে থাকে
জানালায়;
ভাবে তারা শাদা পরী— রূপকথা-শাদা পরী,
তাই ডাকে, 'কাছে আয়, ওরে আয়'!'

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

শাদা পাখী আনমনে ভেসে যায় ;
শোনে নাকো, খোকা ডাকে, ভোর রোদে ভেসে থাকে—
চিক্‌মিক্ ঝলসায় ডানা তায় !

খোকা তবু ডেকে চলে, ডাকে হায় :
'ওগো পরী, ভালবাসি, কত তোরে ভালবাসি,
মোর কাছে এইখানে নেমে আয় !'

শাদা পাখী নামে নাকো, ভেসে যায় ;
এক সাথে ঘুরে ঘুরে, ওড়ে তারা বহু দূরে,
কত সুখ পায় তারা নীলিমায়।

খোকা ডাকে, 'ওরে পরী, নেমে আয় ;
তোর সাথে যাব ভাসি'— হাল্‌কা ভেলায় ভাসি',
আকাশের ওই শেষ সীমানায়।'

শাদা পাখী শোনে নাকো, উড়ে যায়।
ভোরের রঙ্গীন আলো তাহাদের বাসি' ভালো,
রামধনু এঁকে দেয় পাখনায়।

খোকা ব'সে চেয়ে থাকে, শুধু চায় ;
ওই পরী আসে বুঝি, তা'র ডাক শোনে বুঝি,
আরো ডাকে আশা ভরে, 'ওরে আয় !'

উড়ে যায় শাদা পাখী—উড়ে যায় ;
আরো দূরে বহু দূরে, ঘুরে ঘুরে যায় উড়ে,
ধরা হ'তে আর তা'রে দেখা দায়।



খোকা তবু চেয়ে থাকে, তবু চায় ;
পরী তা'র উড়ে গেল, কাছে তা'র নাহি এল ;—
চোখে জল ভ'রে আসে হতাশায়।

---

# হরে মাঝি

[ ধারাবাহিক উপন্যাস ]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

## ১৩

'কটা'কে ফিরিয়া পাইয়া হরি কিন্তু সুখী হইতে পারিল না। চারি বৎসর বিদেশী ও বিজাতির সঙ্গ ও শিক্ষায় সে কটা যেন পৃথক্ মানুষ হইয়াছে। পুরাতন স্নেহ-মমতা সব ভুলিয়াছে। হরি তাহার হৃদয়হীনতা ও অপ্রীতিকর ধরণ ধারণ দেখিয়া ব্যথা পায় আর ভাবে—

বনের পাপিয়াটিরে
বদল করিল কিরে ?
ভুলাইয়া গান, ভাঙ্গি' পাখা দুটী,
বনে দিয়ে গেল ফিরে।

হরি 'কটা'কে আশ্রমে স্থান না দিয়া 'কর্ম্মকাণ্ডে' রাখিল এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার তিনুর উপর দিয়া নিজে 'ডাইক্' সাহেব যে নৌবহর তাহার অধীনে দিয়া গিয়াছে তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য স্থানান্তরে গেল।

'কটা' কাহারও সঙ্গে মেশে না, তাহার খানসামাদের কিংবা তাহার প্রিয় কুকুরগুলির সঙ্গে আলাপ করে। নিষেধ সত্ত্বেও গুলি করিয়া পাখী মারে। সর্পাদি অকারণ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। এই সব আশ্রমবিরোধী আচরণের জন্য তিনু বড়ই বিরক্ত হয় এবং বলে—"বিলিতী ছেলেধরারা আচ্ছা মন্ত্র জানে বটে! ছেলেটাকে তেলাপোকা থেকে একেবারে কাঁচপোকা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে—পূব থেকে মুখটাকে একেবারে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। এ বিষ যায় কিসে ?"

'কটা' সময় সময় ব্যাঞ্জোতে বিদেশী গৎ বাজাইত—'টা-রা, রা-রা, রা-রা, রাঃ'। তিনু ভাবিত মরা মরা বলিয়া রত্নাকরের রাম নামে মুক্তি হইয়াছিল—আহা, টারা টারা বলিতে বলিতে তারা নামে 'কটা' যেন পাপমুক্ত হয়।

'কটার' খানসামাদের মধ্যে একজন ছিল সেই পরিচিত সহিস—হরি যাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। সে তিনুকে বলিত, "সাহেব বলেন জীবনকে ভোগ করতে হ'লে হিংসা দরকার। হিংসা জীবনযুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার। দুর্ব্বল মানুষই কেবল ভগবান্ ভগবান্ করে।"

এই সব কথা শুনিয়া তিনু 'কটার' উপর হাড়ে হাড়ে চটিত আর রাগে তার উদ্দেশে অজস্র গ্রাম্য গালি বর্ষণ করিত।

হঠাৎ এক নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিল। একদিন রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় কটাকে কিসে কামড়াইল। রোজারা আসিয়া হাত চালাইয়া বলিল বিষাক্ত সাপে কাটিয়াছে। সাধুবাবা ত্রিবেণী স্নানে গিয়াছেন—হরিও ফিরে নাই; তিনু ও কর্ম্মকাণ্ডবাসীরা প্রমাদ গণিল। কটার উপর তিনুর সমস্ত রাগ মুহূর্ত্তে গভীর স্নেহে পরিণত হইল। সে ব্যাকুল ভাবে কাঁদে আর ভগবান্‌কে বলে—"প্রভু, বাছাকে মায়ের কোঁলে ফিরে যেতে দাও, কুমীরের মুখ থেকে এনে সাপের মুখে দিও না দয়াল!" যন্ত্রণায় কটা ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

জনৈক গাবর এই সময়ে একজন বড় রোজাকে লইয়া আসিল। তিনি ব্রাহ্মণ, বয়সে যুবক, কিন্তু রোজা হিসাবে খুব নামডাক।

রোজা সর্পদষ্ট স্থান বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলেন। তার পর ক্ষত স্থানে হাত রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া মনে মনে কি বলিলেন। কোনও ঔষধ বা ঝাড় ফুঁ ইহার নাই। অনেকক্ষণ পর কটার দেহে যেন সামান্য চেতনার সঞ্চার হইতেছে মনে হইল।

হরিকে আনিতে ছিপ পাঠানো হইয়াছিল, সে আসিয়া পৌঁছিল। সজলনয়নে কম্পিত হস্তে সে ভাগিনেয়ের অবশ শির কোলে তুলিয়া লইল। ব্রাহ্মণ পুনরায় সেইরূপ ভাবে ধ্যান করিতেই 'কটা' সংজ্ঞালাভ করিল। সে চক্ষু মেলিয়াই—'আমি মায়ের কাছে যাব, মাকে দেখ্‌ব, কত দিন দেখি নাই, বড় মন কেমন করছে। মামা, বাড়ী নিয়ে চ'ল'—এই সব বলে আর উভয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

এত দিন পর কটার মুখে প্রথম মায়ের কথা শুনিয়া তিনুর আনন্দ যেন ধরে না। সে বলে, "এইবার বাছার বিষ ও বিকার দুই-ই কেটেছে। এম্‌নি বিলিতি মন্ত্র যে মাকে মনে পড়াতে একটা গোটা কেউটে সাপের বিষ লাগল—বিষই বিষের ওষুধ বটে।"

হরি প্রফুল্লচিত্তে রোজাকে বহু টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ হাস্যমুখে নিষেধ করিলেন, বলিলেন—উহা গ্রহণ করিলে মন্ত্রের আর এ শক্তি থাকিবে না—উহা আর ফলপ্রসূ হইবে না। তবে তিনি ওই দীঘির কয়েকটী পদ্ম গ্রহণ করিবেন—উহা পূজায় লাগিবে।

হরি মুগ্ধ বিস্ময়ে রোজাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেবতা, আপনার এ মন্ত্রের গুরু কে? মন্ত্র ত'



গোপনীয়, তাহা জানাবার বহু বাধা। আপনি এক অনাথিনী জননীকে তাহার হারা ছেলে পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমার মন্ত্রে গোপন কিছুই নেই। আমি মূর্খ, আচারহীন। আমার পিতা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন—অশিক্ষিত ব'লে আমাকে কোন মন্ত্র বা ওষুধ দেন নি। তাঁর আদেশে আমি জীবনে জ্ঞাতসারে কখনও কোনও জীবের প্রাণহানি করি নি। সর্পদষ্ট রোগীর ক্ষতে হাত বুলিয়ে আমি কেবল বলি—'ভগবান্, আমি জ্ঞানে কখনও কোন জীবের প্রাণহানি করি নি; এই রোগীর প্রাণ ভিক্ষা করছি—তোমাকে এ ভিক্ষা দিতে হবে।' এই আমার পিতৃদত্ত মন্ত্র।"

হরি নিবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণের সকল কথা শুনিল। তাহার মনের কোণে যেন কি একটা আঘাত লাগিল। বেদনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল—'অহিংসাই সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে শক্তিশালী দেখছি।'

কটা এখন সুস্থ। দেহে মনে সুস্থ। সর্ব্বদা গ্রামের কথা ও মায়ের কথা শুনিতে চায়, মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল—তিনুকে কাছ-ছাড়া হইতে দেয় না। হরি 'কটাকে' মাতৃসকাশে পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিল—গ্রামে গিয়া কি ভাবে ব্যবহার করিবে সে বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দিল। হরি দীনুর মুখে তাহার পত্নী ও পুত্রের সংবাদ পাইত আর শুনিত—

'বিরহবিধুরা পত্নী তাহার
চাপি' জল আঁখিপ্রান্তে,
পর্ণকুটীরে আশায় আশায়
তারি পথ চেয়ে জীবন কাটায়,
লুটে প্রতিদিন তুলসীতলায়
ফিরাস্তে সুদূর পান্থে।'

হরি কটাকে বলিল—"তোমার মামীকে ও 'খোকা'কে বলবে আমি বাড়ী ফিরব। তবে কবে যাব জানি নে।" তিনুকে সঙ্গে দিয়া হরি কটাকে দেশে পাঠাইয়া দিল। তিনখানা নৌকায় তাহার লোকজন ও জিনিষপত্র গেল। (ক্রমশঃ)

## পম্পাইয়ে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

একদিন পম্পাই দেখতে গেলাম।

সে এখান থেকে বহু দূরে—ইটালীর এক প্রান্তে। নেপ্‌ল্‌সএর নাম শুনেছ?—তারই খুব কাছাকাছি এই পম্পাই সহর। কিন্তু এত বড় সহর, এতে আজ একটি জনপ্রাণীও নেই, দোকান পসারের ঘর আজ সব শূন্য—শুধু পাথরের তৈরী ভাঙ্গা ও জীর্ণ অবশেষ মাত্র আজ বর্ত্তমান। অত বড় সহরের আজ এমন অবস্থা হ'ল কেমন ক'রে? যে রাজপ্রাসাদে একদিন ইটালীর শ্রেষ্ঠ ধনীরা বাস করত আজ সেখানে রাম, শ্যাম, আমি, তুমি সকলেই যেতে পারি! উঠানের মাঝখানে সে রং-বেরঙের আলোয় রঙ্গানো ফোয়ারার টুকরো টুকরো জল আজ দেখতে পাওয়া যায় না কেন? সে স্থানে আজ পড়ে রয়েছে একটা ভাঙ্গা ময়লা ফোয়ারার বেদীর অবশিষ্ট। এত ঐশ্বর্য্য, এত বিলাসিতা আজ কি করে ডুবে গেল তাই বলি।

তখন যীশুর মৃত্যুর পর একশ' বছরও গত হয় নি, যখন ভিসুভিয়াসের পায়ের কাছে ও সারনাস নদীর কোলে ঐ পম্পাই সহরটি ক্রমশঃ বেশ প্রতিপত্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। সহরে লোক গম্‌গম্ করছে। রাজরাজড়াদের ও সহরের সব বাড়ীতে ধনীদের মুখে হাসি আর ধরে না। অসংখ্য দাসদাসী, যখন যা হুকুম হচ্ছে তখনি



তা করা হচ্ছে। প্রচুর রকম খেলাধূলার আয়োজন। এত ফলমূল যে রাখবার আর জায়গা ধরে না। আঙ্গুরের ক্ষেতে মাঠের পর মাঠ আঙ্গুরের গোছা, আপেলের গাছগুলি ফলে নুয়ে পড়ছে, পিয়ার, প্লাম, ব্ল্যাকবেরি, গুস্‌বেরি, পিচ,—কোনও ফলেরই অভাব নেই। এ ছাড়া কলা-গাছও আছে বহু। এই তো গেল ফলের কথা, ফুলের নাম লিখে আর শেষ করা যায় না, এত ফুল বাগানে বাগানে। শস্যের অভাবও নেই তাদের।

এমনি একটা বিরাট ঐশ্বর্য্যের দেমাক নিয়ে পরম সুখে বাস করতে লাগ্‌ল

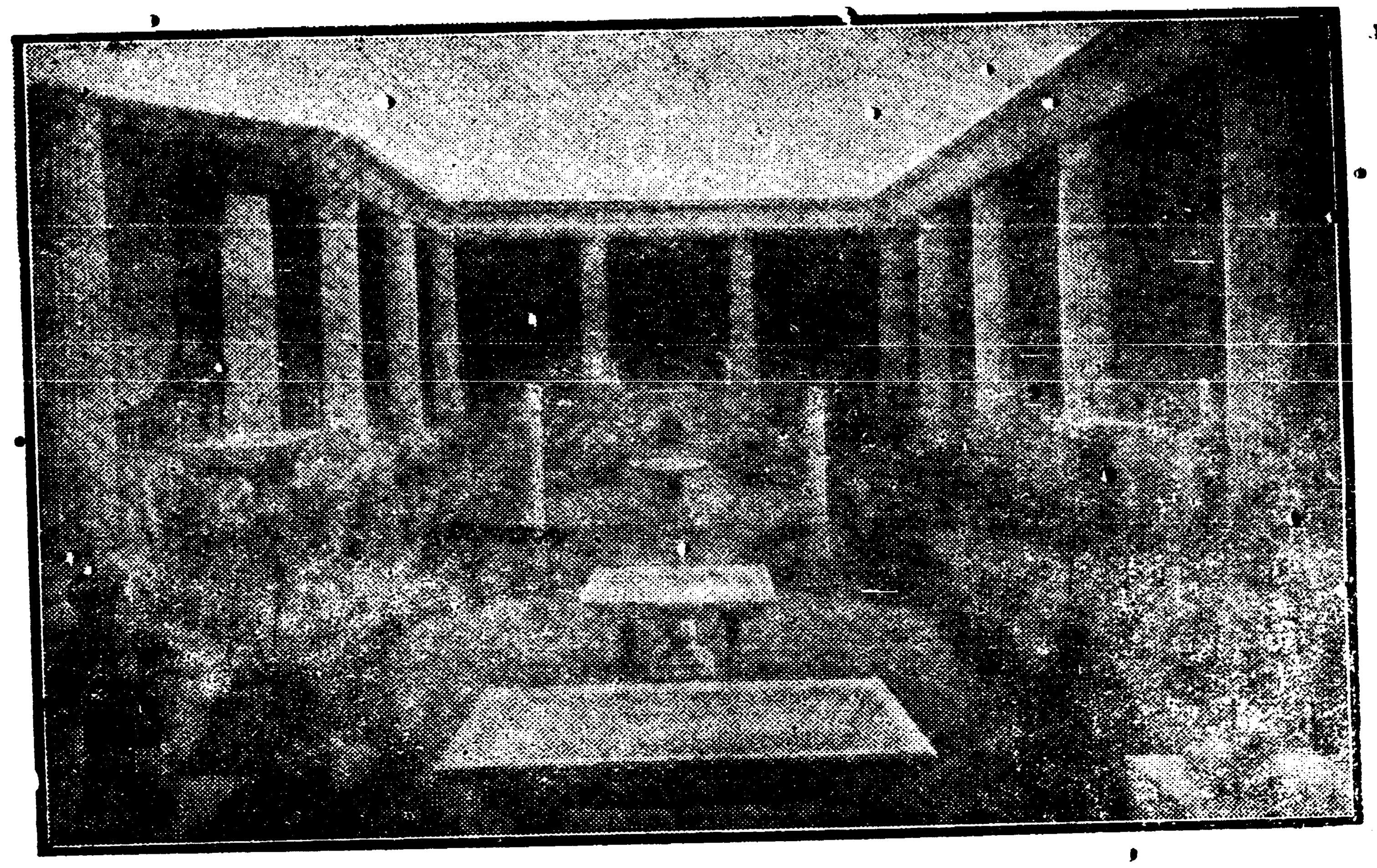

আধুনিক পম্পাইএর একটি দৃশ্য। মাটি খুড়ে এই সুন্দর বাগান-বাড়ীটি বার করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছর মাটির নীচে চাপা পড়ে থেকেও বাগানটির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি।

পম্পাইএর ধনীরা। কিন্তু ক্রীতদাসেরা সুখী ছিল না তাই বলে। উঠতে চাবুক, বস্‌তে চাবুক, এমনি কড়া শাসন ছিল তাদের উপর। কিন্তু তাদের দুঃখের কথা শুনিয়ে তোমাদের মন খারাপ কর্‌ব না। পূর্ব্বের কথা আবার তোলা যাক্। সেদিন রাজরাজড়ারা মহা আনন্দে মস্‌গুল হয়ে আছে। মনে তাদের অপরিসীম গর্ব্ব। এত ধন, দৌলৎ, প্রতিপত্তি—এর তুলনা পৃথিবীতে কবে কোথায় কে পেয়েছে?

হঠাৎ তক্ তক্ করে নড়ে উঠ্‌ল মাটি। মাথার উপরকার ঝালরও নড়ে উঠ্‌ল ঝিন্ ঝিন্ করে। একটা ঝুলান বাতি অসম্ভব রকম দুল্‌তে লাগ্‌ল। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? বাইরে কে তখন চেঁচাচ্ছে—"ভূমিকম্প, ভূমিকম্প!" ঘরে ঘরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল—ধনী, দরিদ্র, ক্রীতদাস—সকলেই গিয়ে দাঁড়াল খোলা মাঠে অথবা বাগানে। মানুষে মানুষে প্রভেদ সকলে তখন ভুলে গেছে। প্রকৃতির কাছে সকলেই সমান, কেউ বড় নয় বা কেউ ছোট নয়। ধপাস্ ধপাস্ করে পড়তে লাগ্‌ল একটার পর একটা বাড়ী। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। তার পর এক গভীর স্তব্ধতা। আর সহরময় ভরে গেল ধুলোতে ধুলোতে। যখন সকলের জ্ঞান হ'ল, তারা ছুটল আপন আপন বাড়ীতে, কার কি ক্ষতি হয়েছে দেখতে। কেউ দেখ্‌ল তার সমস্ত বাড়ীটাই পড়ে গেছে, কেউ দেখ্‌ল তার বাড়ীর আর বেশী কিছু হয় নি, শুধু দেয়ালে একটা ফাটা দাগ দেখা যাচ্ছে। কারও বাড়ীর একটা অংশ ধ্বসে গেছে, ও ঐ রকম ধরণের অনেকের অনেক রকম ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সে ধাক্কা তারা শেষ পর্য্যন্ত সামলে উঠ্‌ল। আবার হাসির ফোয়ারা ঠিক্‌রে পড়্‌ল সহরময়। রাজপ্রাসাদ ও বিরাট বিরাট অট্টালিকা ধনদৌলতের গর্ব্বে জম্ জম্ করে উঠ্‌ল।

ষোল বছর পরে।......

ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরি থেকে ধোঁয়া উঠছে তো উঠছেই। আগে যেমন উঠছিল, আজও তেমনি ভাবে উঠছে তাই সেদিকে কারও বিশেষ ক'রে নজর পড়ছে না; কিন্তু ভিতরে যে একটি বিরাট লেলিহান অগ্নিকুণ্ড বেরিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে কথাও কেউ বুঝতে পার্‌ল না। হঠাৎ একদিন এক অশুভ মুহূর্ত্তে ফেটে উঠ্‌ল পাহাড়ের মুখ। ভস্ ভস্ করে শূন্যে উঠতে লাগল গলা গন্ধক, পিচ ও বহু রকম গলিত ধাতু। ক্রমেই যেন বাড়ছে। শেষকালে গলিত ধাতু ও লাভা এসে ভাসিয়ে দিয়ে গেল পম্পাই সহরকে। সে কি করুণ দৃশ্য! জ্বলে পুড়ে মরতে লাগ্‌ল লক্ষ লক্ষ সহরের অধিবাসী। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, দাপাদাপি—কে আগে পালাতে পারে তারই চেষ্টা। নেপ্‌ল্‌সের পায়েই অগাধ সমুদ্র, তার পাড়ে বাঁধা ছিল সারি সারি নৌকো। হুড়হুড় করে উঠতে লাগ্‌ল সকলে ঐ নৌকোগুলিতে। কতকগুলি



নৌকো তো ভারে ডুবেই গেল, আর কতকগুলি ভেসে চল্‌ল সাগরের বুকে। এই তো গেল মানুষের দুরবস্থা। পশুপক্ষীদের আর্ত্তনাদও বড় কম করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি কর্‌ল না। কুকুরগুলো চেঁচিয়ে দৌড়াদৌড়ি সুরু করে দিল কিন্তু পালাবার জায়গা পেল না। গরুগুলি বাঁধা ছিল, সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা শিকল ছিঁড়ে বেরোতে চেষ্টা কর্‌ল এবং দু'চারটে তাতে কৃতকার্য্যও হ'ল। কিন্তু বেশীর ভাগ জানোয়ারের চেষ্টাই নিস্ফল হ'ল। কোন কোন কুকুর (বোধ করি শক্ত শিকলে বাঁধা ছিল) গলা ধাতুতে জমে গিয়েছিল, যেমনি অবাধে সে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল তেমনি সে দাঁড়িয়ে মর্‌ল। শত শত বছর পরে আজও তার দেহ রক্ষা হয়েছে কিন্তু সে দেহ হয়ে গেছে পাথরের।

পাখীদের দুরবস্থা কি রকম হয়েছিল তা বোধ করি তোমরা সহজেই কল্পনা করতে পারছ। প্রথমে কিছুক্ষণ তারা গাছে গাছে আর্ত্তনাদ করতে করতে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল, তার পর মাটিতে পড়ে গিয়ে লাভার স্রোতে কবরিত হয়ে গেল।

পম্পাই সহর শেষ হয়ে গেল। পুরানো জরাজীর্ণ পাথরের বাড়ীগুলি আস্তে আস্তে মাটি ও লাভার নীচে ডুবে গেল। মানুষ ক্রমশঃ ভুলে গেল যে পম্পাই নামে কোন সহরের অস্তিত্বও একদিন ছিল।

তার পর দেড় হাজার বছরেরও বেশী পার হয়ে গেছে। মানুষ তখন সভ্যতার এক নতুন অধ্যায়ে মনোনিবেশ করতে বসে গেছে। পৃথিবীতে কত মহৎ ও পণ্ডিত লোক জন্মেছেন। তাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন বহু বিষয় নিয়ে। নানা বিষয়ে গবেষণা করতে করতে তাঁদের সাধ হ'ল অতীত যুগের সব লুপ্ত সভ্যতার পীঠস্থানগুলিকে উদ্ধার করবেন। ঐ সময়ে পম্পাইয়ের দিকেও তাঁদের নজর গেল।

তাই ভিসুভিয়াসের ছ'মাইল দূরে যেখানে পম্পাই নগর গড়ে উঠেছিল সেস্থান নিয়ে তাঁরা লেগে পড়্‌লেন। লোক লেগে গেল মাটি খুঁড়তে। খুঁড়তে খুঁড়তে কিছু পুরানো স্মৃতির মূর্ত্তি পাওয়া গেল। তার পর ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দেই প্রথম লুপ্ত সহরকে খুঁজে বার করতে বহু টাকাপয়সা খরচ করা আরম্ভ হ'ল।

আজ সে সহর দেখতে পৃথিবীর বহু লোক যাচ্ছে। সেই প্রাসাদ, সেই বড়

ও মাঝারি ধরণের বাড়ী, সেই ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ, দোকান পসার, অফিস-আদালত—সব আজ খুঁজে বার করা হয়েছে।

একটি উঁচু জায়গার উপর দাঁড়িয়ে অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ল। উপরে বিরাট নীল আকাশ। সামনে একপাশে দাঁড়িয়ে ভিসুভিয়াস্ ধোঁয়া ছাড়ছে অবিশ্রান্ত। তার নীচে একটা গ্রাম, পায়ের নীচে প্রকাণ্ড পম্পাই সহর। অদূরে নেপল্স্‌এর বর্ত্তমান শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বিরাট বিরাট বাড়ী, বাগান ও পরিষ্কার সুন্দর রাস্তা। আরও দূরে সাগরের অগাধ জলরাশি অসীমের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একদিকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও অপর দিকে মানুষের তৈরী ঐশ্বর্য্য। একটি শাশ্বত, অপরটি ক্ষণভঙ্গুর। দু'টি যেন দুই বিভিন্ন জগৎ।

---

[ ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী ]

## তেরো

অল্প কিছু দূর যেতে না যেতে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেল। শব্দটা কাছে এলে আচার্য্য ধর্ম্মদেবের হাত ধরে পথের একপাশে একটি গাছের আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। সামনে দিয়ে একটি ঘোড়া ছুটে গেল। তার পিঠে কোন সওয়ার নেই। ভালো করে ঘোড়াটির পানে তাকিয়ে দেখে ভৈরব ডাকলেন—গণশা! গণশা!!

ছুটন্ত ঘোড়া থম্‌কে দাঁড়াল, কান খাড়া করে কি যেন শোনার জন্যই দাঁড়াল।

ভৈরব আবার ডাকলেন—গণশা!



গণশা এবার ফিরল। ভৈরবের পাশে এসে চুপ ক'রে দাঁড়াল। ভৈরব তার গলায় একটি চাপড় মেরে বল্‌লেন—তোর সওয়ার কোথায় গেল রে, গণশা?

গণশা একবার মাথাটা দোলাল, তার পর এমনভাবে দাঁতগুলো বের করল যেন সে সত্যই কিছু বলছে। ফোঁস ফোঁস ক'রে দু'টো নিঃশ্বাস ফেললে ভৈরবের হাতের উপর। ভৈরব কি বুঝ্‌লেন কে জানে, গণশার নাকের উপর হাত বুলিয়ে আদর ক'রে বল্‌লেন—আচ্ছা, তুই যা, আমি একবার দেখে আসি—

গণশাকে ছেড়ে দিয়ে ভৈরব অগ্রসর হলেন। মেঘে-ঢাকা আকাশের মত মুখখানি থম্‌থমে হয়ে উঠ্‌ল। ধর্ম্মদেবের সঙ্গে আর তিনি একটি কথাও বল্‌লেন না, পাশাপাশি যে আর একজন লোকও যাচ্ছে তা তিনি ভুলে গেছেন বলে মনে হ'ল।

বনপথ পার হয়ে যখন তাঁরা মন্দিরের কাছে এসে পড়েছেন এমন সময় সামনের পায়ে-চলা পথের উপর এক অশ্বারোহীকে দেখা গেল।

অশ্বারোহী তাঁদের দেখতে পেয়েছিল, বরাবর তাঁদের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল; আচার্য্যের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে—আচার্য্যদেব, আমি আপনার কাছেই আসছিলাম।···

—কোন খবর আছে?

—একটি বিশেষ কথা ছিল।

—বল?

আগন্তুক ধর্ম্মদেবের মুখের পানে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করছিল। ভৈরব বল্‌লেন—ওঁর সামনেও তুমি বলতে পার, উনি কারুষের রাজকুমার ধর্ম্মদেব।

—নমস্তে রাজকুমার!—আগন্তুক রাজকুমারকে নমস্কার জানাল।

—নমস্তে!—ধর্ম্মদেব দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতিনমস্কার করল।

ধর্ম্মদেবের দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে আগন্তুক ভৈরবের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—এইমাত্র হূনেরা কালো সওয়ারকে ধরেছে, আহত অবস্থায় সে নদীর এপারে এসে উঠেছিল, সঙ্গে ছিল একটি মেয়ে।

ভৈরব সহসা কোন কথা বল্‌লেন না, কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না, চুপ করে আগন্তুকের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন; কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবলেন, তার পর বল্‌লেন—ওখানে তোমরা কত জন আছ?

—দশ জন।

—ঘোড়া আছে?

—আছে।

—এখনই তা হ'লে বেরিয়ে পড়, সমস্ত বৈষ্ণবদেরকে সমবেত হবার নির্দ্দেশ দাও গে। আজ রাত প্রথম প্রহরের মধ্যে আক্রমণ করতে না পারলে আমরা কালো সওয়ারের জীবন রক্ষা করতে পারব না।'

—আমি এখনই সব ব্যবস্থা করছি আচার্য্যদেব!

—তোমাদের সকলের সঙ্কেত জানা আছে?

আগন্তুক মাথা নাড়্‌ল, তার পর আচার্য্যের পায়ের ধূলো নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

আগন্তুক যেতে না যেতেই মন্দিরের ভিতর থেকে একটি বুড়ো হন্তদন্ত করে ছুটে এল, বল্‌লে—দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, আপনাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়ে গেলাম। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন, দাদাঠাকুর? এদিকে তো' সেই মেয়েটি, (ধর্ম্মদেবকে দেখিয়ে) এনার সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, একটু আগে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কিছুই বলে গেলেন না। মনে কর্‌লাম জিজ্ঞেস করি, তা আমি আসতে আসতে ভোঁ—

—কোন্ দিকে গেছে?

—ঐ সিধে—

—কতক্ষণ গেছে?

—তা, দু'দণ্ড হবে…

—হুঁ—ব'লে গম্ভীরমুখে ভৈরব মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন।

ইতস্ততঃ গ্রামের বুকে তখনও কোন কোন স্থানে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। অত্যাচার-ভীত জনপদ ভয়ে থম্ থম্ করছে। মাঝে মাঝে বাতাসে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে। নাগরিকের দল কান পেতে আছে অন্ধকারের বুকে কখন দুন সওয়ারের পদধ্বনি শোনা যায়। সাহস নেই ঘরের বাহির হয়। পিতৃপিতামহের ভিটের মায়া ছাড়তেও তারা পারে না, ছেড়ে যাবেই বা কোথায়? বিষহীন সরীসৃপের মত পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে তারা বসে থাকে কিসের যেন প্রতীক্ষায়। একটা দুর্য্যোগের কালো ছায়া তাদের আচ্ছন্ন করেছে। রাত্রি কেটে যাচ্ছে তন্দ্রাহীন শঙ্কার ভিতর দিয়ে।

এমন সময় সত্যই ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা যায়। পরক্ষণেই সেই মৃত্যুভীত জনপদকে মুখরিত ক'রে তোলে সঙ্গীতের তরঙ্গ:

'ডাকে মহাকাল, ডাকে যে মৃত্যু,
ডাক দিয়ে যায় কালো সওয়ার,



মায়ের সেবক, আয় তোরা সব,
ঘোচা এ কারার অন্ধকার!'

ঘরে ঘরে সেই কণ্ঠের প্রতিধ্বনি পৌঁছায়। ঘরে ঘরে তরুণের দল সেই সঙ্গীতের সঙ্কেত জানে। কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একে একে সব বেরিয়ে পড়ে, তার পর হারিয়ে যায় পার্ব্বত্য অন্ধকারের মাঝে।

দু'দণ্ড পরে দেখা গেল, পাহাড়ী পথে শত শত ঘোড়-সওয়ার মহাকালের মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়েছে। চারিপাশের পাহাড়তলী ভেঙে পড়েছে মন্দিরপ্রান্তে। (ক্রমশঃ)

---

# সেকালকার অগ্নিনির্ম্মাণ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি

মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখিল কি করিয়া? বোধ হয় বনে কাঠে কাঠে ঘষা লাগিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহা দেখিয়া কোনও বুদ্ধিমান্ কল্পনা করিলেন কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জ্বালান যাইতে পারে। আধপোড়া হরিণ বা বন্য কন্দ আস্বাদন করিয়া মানুষ বুঝিল আগুনের কত গুণ।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চক্‌মকিই আগুন প্রস্তুতের প্রধান সহায় ছিল। দেশলাই তখন সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাষাভূষারা—অনেক ভদ্রলোকরাও দেশলাইয়ের জন্য পয়সা খরচ করিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু চক্‌মকির সাহায্যে অগ্নিনির্ম্মাণ বেশ একটু কষ্টকর ব্যাপার ছিল। অনেকেই সে কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজী হইত না। তাহারা আগুন সংগ্রহ করিত 'আগুন চাহিয়া আনিয়া'।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রসিদ্ধ গল্প তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে। বালক জগন্নাথ এক অধ্যাপকের গৃহ হইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া মায়ের কথা মত আগুন চাহিতে গিয়াছিল। কিন্তু ভুল করিয়াছিল; আগুন আনিবার কোনও পাত্র আনে নাই। অধ্যাপক কয়েক টুক্‌রা জ্বলন্ত কয়লা লইয়া তাহাকে বলিলেন, 'নাও'। বালক তখন তাড়াতাড়ি নিকট হইতে এক আঁজলা ধূলা তুলিয়া লইয়া হাতে

বিছাইয়া তদুপরি অগ্নি লইল। অধ্যাপক বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া স্থির করিলেন এ বালক কালে মহাপণ্ডিত হইবে। তিনি তাহার পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে একটি চুপড়িতে একটি চকমকি পাথর, তাহাতে আঘাত করিবার জন্য একটি বাঁকান ইস্পাত, কয়েক টুক্‌রা শোলা, কিছু কাঠ-কয়লা এবং নারিকেলের ছোবড়া থাকিত। বাঁ হাতে চক্‌মকি পাথরটা ধরিয়া তাহার উপরে ইস্পাত দিয়া আঘাত করিলেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। চক্‌মকি পাথরের ঠিক নীচেই একখণ্ড শোলা রাখা হইত; স্ফুলিঙ্গ তাহাতে পড়িলেই শোলা জ্বলিয়া উঠিত। তাহাতে একটু ফুঁ দিলেই শোলার আগুনটা একটা পয়সার মত বড় হইয়া উঠিত। তখন উহার সাহায্যে নারিকেলের ছোবড়া বা কয়লা ধরাইয়া আর একটু বড় আগুন প্রস্তুত হইত। সেই আগুনটুকু উনানে স্থাপন করিয়া তদুপরি অন্য জ্বালানী (পাটকাঠি, খড় প্রভৃতি) দিয়া অনেক ফুঁ দিয়া বেশ একটু কষ্টের পরই তবে উনান জ্বলিয়া উঠিত। আগুন প্রস্তুতের ঐ কষ্টের জন্য লোকে একটা হাঁড়িতে তুষ রাখিয়া তাহাতে আগুন দিত। তুষের আগুন বহুক্ষণ থাকিত। চাষারা মাঠে কাজ করিতে যাইবার সময় খড় দিয়া একটা শক্ত মোটা দড়ি প্রস্তুত করিয়া উহাতে আগুন দিত। দড়িটা শক্ত থাকায় আগুন ধীরে ধীরে জ্বলিত ও অনেকক্ষণ থাকিত। কলিকাতার বিড়ি-সিগারেটের দোকানে নারিকেলের ছোবড়ার এক প্রকার আলগা দড়ি ঝুলাইয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া রাখা হয়। তাহা হয়তো অনেকে দেখিয়াছ।

সম্প্রতি কিছু কাল হইল বৈদিক যুগে কি করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করা হইত তাহা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। উপনিষদে আছে—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্"। নিজের শরীরকে নিম্নকাষ্ঠ এবং প্রণবকে (ব্রহ্মের নাম) উপরের কাষ্ঠ করিয়া জ্ঞানযোগে মথন করিতে করিতে ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। এই উত্তর ও অধর অরণি কাঠের প্রয়োগ প্রণালী জানে সাঁওতালরা—ব্রাহ্মণেরা নয়। বর্দ্ধমানের কাছে প্যারীগঞ্জ নামক এক অজ পাড়াগাঁয়ে কয়েক দিন বাস করিতেছিলাম।



চারিদিকে শালের জঙ্গল, তার মাঝে মাঝে সাঁওতালদের পাড়া আছে। শুনিলাম তারা এখনও কাঠে কাঠে ঘষাঘষি করিয়া অগ্নি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। একজন সাঁওতালকে কিছু বখশিস্ দিবার প্রলোভন দেখান'তে সে অগ্নিনির্ম্মাণ দেখাইতে স্বীকার করিল এবং কাঠ সংগ্রহ করিতে বনে গেল। খানিকক্ষণ 'পরে সে আর একজন সাঁওতালকে সঙ্গে লইয়া কয়েক টুক্‌রা কাঠ সহ উপস্থিত হইল। যে কাঠ দেখাইল তাহা খুব শুষ্ক অরহরের কাঠ। সে বলিল ইহা অপেক্ষা আরও ভাল কাঠ আছে, তবে তাহা সে এখন যোগাড় করিতে পারিল না। বলিল, অরহর কাঠের সাহায্যে অগ্নিনির্ম্মাণ করিতে বেশী পরিশ্রম লাগে। নীচেকার কাঠটার মাঝখানে ছুরি দিয়া সে একটি ছোট গর্ত্ত প্রস্তুত করিল। উপরের কাঠের এক মুখ পেন্‌সিল কাটার মত ছুঁচাল করিয়া লইল। এখন নীচের কাঠটার দুই মাথা দুই পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া উপরের কাঠটা দুই হাত দিয়া ধরিয়া ও একটু নীচের দিকে চাপ দিয়া ঘুরাইতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট ক্রমাগত ঘুরাইয়া লোকটা বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। মিনিট কুড়ি পরে সত্য সত্যই নীচের কাঠের গর্ত্তে একটু আগুন দেখা দিল। একটু ফুঁ দিতেই সেটা একটু বড় হইয়া উঠিল। আর একটি সাঁওতালও ঐরূপে অগ্নি নির্ম্মাণ করিল। আমরা তিন-চার জন বাঙ্গালী তখন ঐ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অগ্নি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলাম। কেবল একজন মাত্র কৃতকার্য্য হইল। দেখিলাম, ব্যাপারটিতে হাতের বেশ জোর ও ধৈর্য্য থাকা প্রয়োজন। যাহারা জ্বালাইতে পারিল না তাহাদের কাঠগুলিও খুব গরম হইয়াছিল।

---

## মনোরঞ্জন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মনোরঞ্জন ছিলেন সত্যই সার্থকনামা, তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই ভালবাসিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে। আমি তাঁকে প্রথম দেখিয়াই মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই। হইবার কারণ বলিতেছি। মনোরঞ্জনের পিতা শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

মনোরঞ্জন

জন্ম—কার্ত্তিক, ১৩১০ মৃত্যু—মাঘ, ১৩৪৫



মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত ছাত্র—তাঁহার সময়কার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম। তিনি যখন আমাদের কাটোয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যান তখন তাঁহাকে সকলেই দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইত। সে আজ অনেক দিনের কথা।

তিনি ছিলেন গম্ভীর, সৌম্যমূর্ত্তি, অল্পভাষী কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, উদাসীন প্রকৃতির লোক। বর্দ্ধমানের নামজাদা উকীলরা তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিতে ভয় পাইতেন। বলিতেন—'আমার যা বলিবার তিনি রায়ে তাহা বলিয়াছেন এবং যুক্তিতর্কে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।' তাঁর নিরপেক্ষতা, তাঁর অকাট্য যুক্তি, তাঁর আইনজ্ঞান তখন প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতই প্রচলিত ছিল।

আমি যখন মনোরঞ্জনকে প্রথম দেখি আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হই। কারণ বলিতেছি। আমি বিশ্বেশ্বরের পুত্রকে অন্ততঃ গণেশের মত গম্ভীর দেখিব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু দেখিলাম একেবারে কার্ত্তিক! যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনি অমায়িক স্বভাব, তেমনি, হাস্যোজ্জ্বল কথাবার্ত্তা। বাপের প্রতিভার অধিকারী কিন্তু সে উদাসীনতা, সে ছাড়ো ছাড়ো ভাব মোটেই নাই।

মনোরঞ্জনের লেখা পড়িয়া যেমন আনন্দ পাইতাম, তাহাকে দেখিয়া, আলাপ করিয়া ততোধিক আনন্দ পাইলাম।

রামধনু কাগজখানি আমি আগাগোড়া পড়ি এবং বিশেষ করিয়া পড়ি মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্রের লেখাগুলি। রামধনুর প্রত্যেক লেখাই সুনির্ব্বাচিত, বানান ভুল চোখে পড়ে না। এমন একখানি সুন্দর কাগজ সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রায় সমগ্র গৌরবই মনোরঞ্জনের প্রাপ্য।

মনোরঞ্জনের ন্যায় যুবক বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব। দীর্ঘজীবী হইলে সে বঙ্গভাষাকে কত সমৃদ্ধ করিত তাহা অনুভব করি। তাহার সহপাঠীগণ তাহাকে কি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত তাহার পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি।

হঠাৎ যদি গড়ের মাঠের মনুমেণ্ট ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাতে তত দুঃখ হয় না, কারণ সে বহুদিন তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা পাইয়াছে; কিন্তু যদি সেদিনকার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ধূলিসাৎ হয় তাহা হইলে একটা বড় দাগ লোকের মনে রাখিয়া যায়

কারণ তাহার বয়স যে নিতান্ত কাঁচা। মনোরঞ্জনের মহাযাত্রা চঞ্চলের জয়যাত্রা। তাতে সকলের বুকে একটা দারুণ ব্যথার বোঝা রাখিয়া যায়। উদাস সমীর বলে—

'ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে'।*

## নানা প্রসঙ্গ

# তারকা-ভস্ম

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী

রাতে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তোমরা অনেক সময় দেখতে পাও—যেন একটা তারা ছুটে গেল। এগুলোকে উল্কা বলে। যখন ওগুলো ছুটতে ছুটতে মাটীতে খ'সে পড়ে তখন তাকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড বা উল্কা-প্রস্তর। এরা কিন্তু আসলে তারা নয়! আসল তারাগুলো এক একটী সূর্য্যের চেয়েও বড়—কোন তারা পৃথিবীর ওপরে এসে পড়লে পৃথিবীটা ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে যেত। তারা থেকে—গ্রহ-উপগ্রহ থেকে প্রতি নিয়ত ছোটবড় স্ফুলিঙ্গ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই কতক এসে আমাদের পৃথিবীর বুকে পৌঁছায়। উল্কার সৃষ্টি এইভাবে।

কখনও কখনও খুব বড় আকারের উল্কাপিণ্ডও পড়তে দেখা গেছে। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়াতে একটী সুবৃহৎ উল্কাপিণ্ড পড়েছিল। সেটা মাটীতে পড়বার সময় যে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি হয় তার ফলে ১০০ বর্গ মাইল স্থানের সবগুলো গাছ ভূমিসাৎ হয়। কালিফোর্ণিয়াতে একবার একটা ২৫৭৩ পাউণ্ড ওজনের উল্কাপিণ্ড পড়তে দেখা গিয়েছিল।

* লেখাটি তিন বছর পূর্ব্বে রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমনের পরেই লেখা।



সব সময় এত বড় আকারের উল্কাপিণ্ড পড়তে দেখা যায় না। নিত্য নিত্য যেগুলি পড়ে তা'র অধিকাংশই মটরের মত ছোট। তা ছা'ড়া ভস্মের আকারে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ড পতিত হয়। সেগুলো ধূলিকণার অনুরূপ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে সেগুলোকে ছোট ছোট গোল গোল পদার্থের মত দেখায়। এগুলোকে তারকা-ভস্ম বলা যেতে পারে। কলকাতার যাদুঘরে ছোটবড় নানা রকম উল্কাপিণ্ড সাজান আছে। যারা দেখ নি, একদিন সুবিধা মত দেখে নিও।

এমন একটা জিনিষ নিয়ে যে বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম গবেষণা করবেন তা খুবই স্বাভাবিক, এবং তা চলছেও। বর্ত্তমানে একদল পরীক্ষা করছেন—এই উল্কাপিণ্ড এবং তারকা-ভস্ম রোজ পৃথিবীর উপরে কতখানি ক'রে এসে পড়ে। একজন পণ্ডিত গণনা ক'রে বলেছেন, গড়ে প্রতি-বৎসর পৃথিবীর ওপরে ১৪,৬০০ কোটী পাউণ্ড উল্কাপিণ্ড এসে হাজির হয়। এইচ্. নিনিঞ্জার নামক বৈজ্ঞানিকের মতে পৃথিবীতে প্রতিদিন ৬৬ বর্গ ফুট পরিমিত স্থানে গড়ে সাত মিলিগ্রাম (১ মিলিগ্রাম হচ্ছে গিয়ে ·০১৫৪৩২৩৪৮৭ গ্রেণ) তারকা-ভস্ম পড়ছে নিয়মিত ভাবে।

সাইবেরিয়ায় পতিত বিরাট উল্কাপিণ্ড

মিঃ নিনিঞ্জার এই বিষয়ে অনেকদিন থেকে গবেষণা করছেন। সম্প্রতি তিনি সর্ব্বসাধারণে যা'তে তারকা-ভস্মের একটা পরিমাণ করতে পারে তা'র উপায় বাৎলে দিয়েছেন। উপায়টী তোমাদের সবাইকে ব'লে দিচ্ছি; যারা কৌতূহলী তারা একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পার।

প্রথমে কয়েকটী ছোট এলুমিনিয়মের মুখ ছড়ান পাত্র, কয়েকটী ছোট চুম্বক-খণ্ড এবং একটী পাতলা রবারের স্নানের টুপি যোগাড় করতে হ'বে।

একবার মুষলধারে বৃষ্টির পর যখন তোমাদের বাড়ীর ছাদের ওপরের ধুলো-বালি নর্দ্দামা এবং দালানের গায়ে লাগান পাইপ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে তখন রবারের টুপিটী দিয়ে একখণ্ড চুম্বক আচ্ছাদিত ক'রে কতকগুলি ধাতুখণ্ড (যেগুলো ধুয়ে নেমে গেছে) সংগ্রহ করতে হ'বে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে ভস্ম-পিণ্ডগুলোকে ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থের মত দেখাবে। তার পর যখন পুনরায় মুষলধারে বৃষ্টি আসবে তখন বাড়ীর গায়ের প্রত্যেকটী পাইপের মুখের নীচে মাটীর ওপরে এক এক খণ্ড চুম্বকের ওপরে এক একটী এলুমিনিয়মের পাত্র বসিয়ে দিতে হ'বে। তা হ'লে ভস্ম-পিণ্ডগুলো পাইপের মধ্যে দিয়ে ধুয়ে এসে পাত্রের সঙ্গে লেগে যাবে। মনে কর, প্রথম বৃষ্টির ১০ দিন পরে পুনরায় বৃষ্টি এসেছিল; তা হ'লে যে পিণ্ডগুলো সংগ্রহ করা হ'ল তার পরিমাণকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে দৈনিক গড়-পরতা হিসাব মিলে যাবে। ব্যাপারটী সত্যিই কৌতূহলপ্রদ,—একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পার তোমরা।

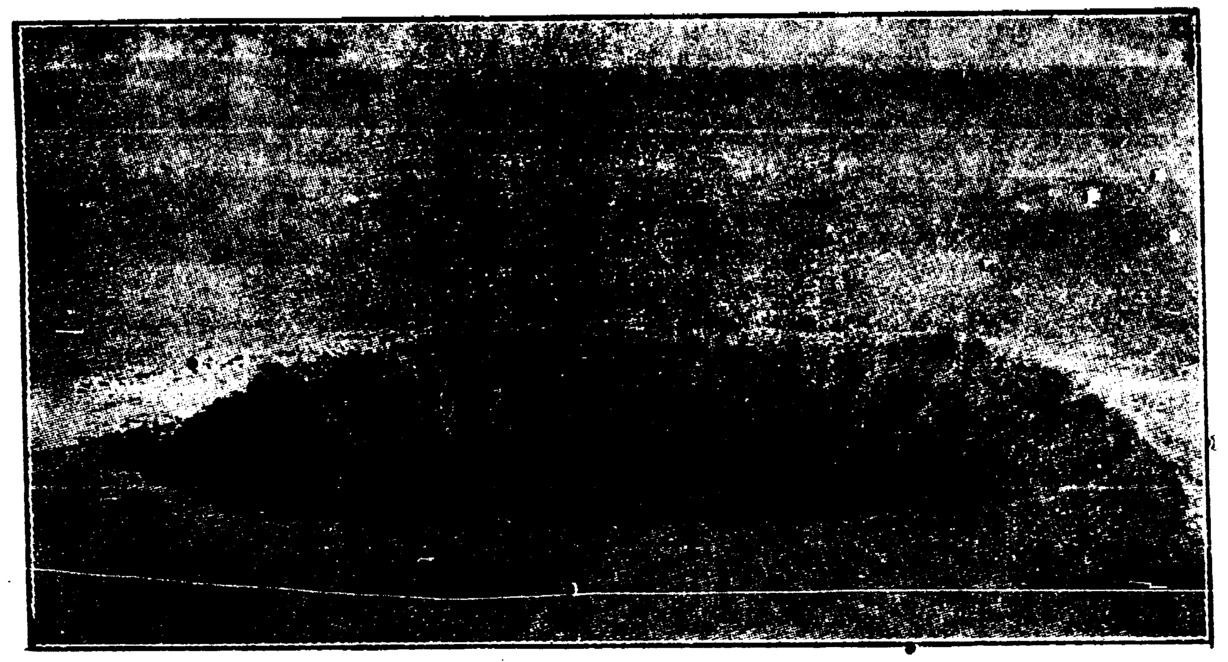

আকাশ থেকে খসে-পড়া একটি উল্কাপিণ্ডের আঘাতে এই বিরাট্ গর্ত্তটি তৈরী হয়েছে। গর্ত্তটির ব্যাস ৪০০০ ফুট, গভীরতা ৬০০ ফুট। এত বড় উল্কাপিণ্ডের কথা আর কখনও শোনা যায় নি।

---

## আমার স্বর্গ

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

একটি স্বর্গ রচিব বলিয়া মনে ছিল বড় আশা,
রচিব একটি স্বরগ-কানন তাহারি একটি ধারে;
সাধ ছিল মনে এক কোণে তার বাঁধিব ছোট্ট বাসা,
রঙ, বেরঙের আল্পনা দিয়া সাজায়ে রাখিব তারে।

কেতকীর বন কাঁপায়ে কাঁপায়ে বহিবে দখিনা বায়,
সুরভি কুসুম গন্ধ ছড়াবে সারাটি আকাশ ভরি';
দূর হ'তে আসি বাঁশরীর সুর মুরছি' পড়িবে, হায়,
মধুর আবেশে আমার স্বর্গ কাঁপিবে সে থরথরি।

ব'সে র'ব আমি চাঁদপানে চাহি' শিউলি গাছের তলে,
রাতের শিশির পড়িবে আমার ক্লান্ত আঁখির পাতে,
দূরের ঝর্ণা নূপুর বাজাবে চঞ্চল তার জলে,
পাহাড়িয়া গাছ বাতাসে নাচিয়া গাহিবে তাহার সাথে।

স্বর্গ আমার জীবন ভরিয়া শেষ হবে না'ক' দেখা,
আমার স্বর্গ আমিই গড়িব, আমিই রহিব একা।

---

## ১৬

তীরের উপর 'উঠিয়া সমস্ত ছেলেদের কি উদ্দাম আনন্দ! তাহাদের জন্য যেন একটি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, আজ তাহাদের গৃহ-প্রবেশ উৎসব। সকলে কোলাহল করিতে করিতে অগ্রসর হইল। প্রথমেই সকলে মিলিয়া ফরাসী গুহায় প্রবেশ করিল; কারণ যাহারা গুহাটা এখনো দেখে নাই তাহাদের একবার ভালো করিয়া দেখা আবশ্যক। বুনো বুদ্ধি করিয়া ভেলা হইতে একটা ল্যাম্প লইয়া আসিয়াছিল। তার আলো একেবারে 'বিজলী বাতির মত উজ্জ্বল। সে আলোয় গুহার চারিদিক্ একেবারে ঝক্মক্ করিয়া উঠিল। পূর্ব্বে মশাল জ্বালিয়া তাহারা তত ভালো ভাবে দেখিতে পায় নাই। এখন মনে হইল তাহারা যেন একটা বড় হল্‌ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শঙ্খচূড় কহিল—"ও বাবা, এই চোর-কুঠরীর মধ্যে এতগুলি প্রাণী কেমন করে থাক্‌বে! আমার যে এর মধ্যেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। পনেরোটা বিছানা পড়লে আমরা নড়্‌ব-চড়্‌ব কি করে?" সুশান্ত কহিল—"এর চেয়ে একটা ভালো ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে পার? তা হ'লে বল, আমরা সেইখানে যাব।" কমলাক্ষ কহিল—"এ যে দেখ্‌ছি আমরা একেবারে সেই 'প্রিমিটিভ্ কেভ্‌ম্যান্' হয়ে পড়্‌লুম!" নীলাদ্রি কহিল—"তা অবস্থা গুণে পড়ে মাঝে মাঝে হ'তে হয়।" রঞ্জিৎ কহিল—"কিন্তু এর মধ্যে রান্নাবান্না কি করে চল্‌বে? ধোঁয়ায় যে দম আট্‌কে মর্‌তে হবে!" বুনো কহিল—"ভিতরে রান্না করে কাজ নেই; দরজার পাশে বাইরে রান্না কর্‌লেই চল্‌বে।" সুশান্ত কহিল—"তা চল্‌তে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে তা চল্‌বে না। আমি বলি কি, বাইরের সংস্রব সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমাদের রান্নাবান্না হবে ষ্টোভে; তাতে আর ধোঁয়ার ভয় নেই। সঙ্গে আমাদের চার পাঁচটা ষ্টোভ আছে, মেথিলেটেড্ স্পিরিট ও কেরোসিন তেলও আছে যথেষ্ট।" রঞ্জিৎ কহিল, "কিন্তু যদি মাথা ধরে—?" নীলাদ্রি কহিল—"মহারাজ রঞ্জিৎ সিং, মাথা ধরলে পরে স্মেলিং সল্ট্ ব্যবহার করবে।" রঞ্জিৎ কহিল—"কর্‌বই



ত; তুমি আবার কথা কও কোন্ মুখে? রান্নার নাম শুন্‌লে তোমার আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। পেটুক কোথাকার!" অশোক কহিল—"থাক্, থাক্, এখন ঝগড়া কর্‌বার সময় নয়। পরে আমাদের একটা আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। আশপাশের দেওয়াল খুঁড়ে দেখ্‌তে হবে, কোন দিকে কোন নতুন ঘর পাওয়া যায় কি না। সামনে এখন লম্বা শীতকাল; তখন আর বাইরে বেরুনোর উপায় থাক্‌বে না, সারা দিনমান শাবল আর গাঁতি নিয়ে কাজ চালান যাবে'খন।"

তখন সকলে মিলিয়া ভেলা হইতে প্রথমে বিছানাপত্র লইয়া আসিল; তার পর কিছু পাত্‌লা তক্তা। গুহার পাথরের মেঝের উপর প্রচুর শুক্‌না বালি বিছানো আছে। তার উপর কিছু তক্তা বিছাইয়া তাহারা সকলকার বিছানা পাশাপাশি পাতিল। জাহাজের বড় টেবিলখানা গুহার মাঝখানে রাখা হইল। টেবিলের উপর কাপড় বিছাইতেও তাহারা ভুলিল না। তার পর অন্যান্য সরঞ্জামও আনা হইল। এক কোণে কিছু পাথর সাজাইয়া একটু আগুন জ্বালানো হইল। রাত্রে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পড়িবে, কিছু আগুন জ্বালিয়া রাখা ভালো। গুহার বাহিরে গাছতলায় প্রচুর শুক্‌না ডালপালা পড়িয়া আছে। জ্বালানি কাঠের অভাব তাহাদের কখনও হইবে না। রাত্রে বুনোর হাতের রান্না বাস্‌টার্ডের মাংস। আঃ, কি আরাম!

ছেলেরা ফরাসী গুহায় আসিয়াছে আটই মে তারিখে। তাহার পর তিন চারিদিন ধরিয়া তাহারা আর কোন দিকে যাইতে পারিল না। ভেলা হইতে সমস্ত জিনিষগুলি গুহার মধ্যে আনিতেই এ কয়দিন তাহাদের কাটিয়া গেল। ওদিকে আকাশ বাতাস কুয়াসায় বেশ ভরিয়া উঠিয়াছে। তার উপর তেমনি শীতল হাওয়া। সকলেরই গাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। গ্লিসারিন ও গ্রীজ্ লাগাইয়াও তাহারা গা ফাটা হইতে রক্ষা পাইল না। শীঘ্রই যে তুষারপাত আরম্ভ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বরফ পড়িবার আগেই সমস্ত জিনিষ গুহার মধ্যে আনা দরকার।

এ কয় দিন রঞ্জিৎ, কুণাল, কমলাক্ষ, রোহিতাশ্ব, নীলাদ্রি ও প্রদ্যোৎ বন্দুক লইয়া শিকার করিতে বাহির হইত। প্রত্যেক দিনই তাহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট পরিমাণে শিকার মিলিত। স্নাইপ, টিল, বালিহাঁস, জলপিপি ও বন্য মোরগ। একদিন তাহারা একটু বেশী দূরে গিয়াছিল। জায়গাটায় কেবল বার্চ্চ ও বীচ্ গাছের জঙ্গল। তাহারা অবাক্ হইয়া দেখিল চারিদিকে সুস্পষ্ট মনুষ্যবসতির লক্ষণ। কোথাও একটা ভাঙা চালাঘর, কোথাও বা মাটীতে বড় বড় গর্ত্ত খোঁড়া রহিয়াছে। গর্ত্তের উপর সরু সরু ডালপালা বিছানো। সেগুলি যে বন্য জন্তু ধরিবার ফাঁদ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খুব গভীর গর্ত্ত, ভিতরে কোন জন্তু পড়িলে আর উঠিয়া পালাইতে পারিবে না। একটা গর্ত্তের মধ্যে তাহারা একটা বড় জন্তুর আস্ত কঙ্কাল দেখিতে পাইল। কিন্তু

কঙ্কাল দেখিয়া বুঝা গেল না সেটা কি বা কোন্ জাতীয় জন্তু। রোহিতাশ্ব সেই গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া কঙ্কালটিকে পরীক্ষা করিয়া বলিল—"এটা কি জন্তু তা না বোঝা গেলেও এটা যে একটা প্রকাণ্ড বন্যজন্তু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হাড়গুলো একেবারে ঝাঁঝ্‌রা হয়ে গেছে; তা'তে মনে হচ্ছে জন্তুটা গর্ত্তে পড়েছিল বহু—বহু বৎসর পূর্ব্বে।" উপর হইতে সকলে গর্ত্তের কিনারায় বসিয়া নীচের পানে দেখিতেছিল। রঞ্জিৎ কহিল, "জন্তুটা নিশ্চয় খুব বলবান্ ছিল, দেখ্‌ছ না মাথার হাড়টা কি প্রকাণ্ড! মুখের চোয়াল ও দাঁতগুলোও কি রকম বড় বড়!" কুণাল রঞ্জিতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি মনে হয় রঞ্জিৎ, জন্তুটা মাংসভুক্ ছিল?" রঞ্জিৎ কহিল—"নিশ্চয়, তা না হ'লে কি ও রকম দাঁতের গড়ন হয়?" তার পর বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া কহিল—"বাঘ-সিংহ না হলেও এটা জাগুয়ার কিংবা কাউগার হবে।" "তবে ত ভয়ের কথা রঞ্জিৎ!" রঞ্জিৎ উদ্ধত ভাবে কহিল—"সাবধান হয়ে চল্‌তে হবে। জানোয়ারের ভয়ে ত আর শিকার ছেড়ে গুহার মধ্যে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না!" সঙ্গে বিয়্যার ছিল, হঠাৎ সে বনের দিকে মুখ করিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে সুরু করিল। নীলাদ্রি কহিল—"গতিক ভালো নয়, রঞ্জিৎ। কাছে পিঠে বোধ হয় কোন বন্য জন্তু এসেছে। দেখ্‌ছ বিয়্যারের রকমসকম?" তখন সকলে মিলিয়া সতর্ক নয়নে গুহার দিকে পা ফিরাইল। যাইবার পূর্ব্বে রোহিতাশ্ব কি মনে করিয়া গর্ত্তটিকে পূর্ব্বের ন্যায় ডালপালা দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। (ক্রমশঃ)

---

# জনার্দ্দনের বিপত্তি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

শীতের সকাল। এক ঝলক কাঁচা রোদ রাস্তার গ্যাসপোষ্টটার নীচে লুটোপুটি খাইতেছে। মুখুজ্যেদের রোয়াকে বসিয়া একটি লোক একখানি বাংলা খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইতেছিল। লোকটির বয়স অনুমান ৩৫।৩৬, হাবভাব এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাকে ঠিক উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয় না—বড়লোকের বাড়ীর বাজার-সরকার বা জমীদার-বাড়ীর গোমস্তা—এই জাতীয় জীব বলিয়া অনুমান হয়।

কাগজ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ লোকটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, একটি বিশেষ খবরের দিকে তার চোখ পড়িয়াছে। খবরটি এই রকম: "জনাইগঞ্জের কুমার বাহাদুর ৺অনন্ত রায়ের



উইল প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বছর ঠিক এই সময়ে কুমার বাহাদুর দুষ্প্রাপ্য জন্তু শিকারের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে গিয়াছিলেন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেই হিংস্র জন্তুর হাতে নিহত হ'ন। তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি তাঁর মা ও ছোট বোনকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁর নিজস্ব বিরাট্ লাইব্রেরীটি জনাইগঞ্জের সাধারণ পাঠাগার রূপে ব্যবহৃত হইবে। জনাইগঞ্জের দাতব্য চিকিৎসালয়ও একটা মোটা রকম টাকা পাইবে। এ ছাড়া প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা তিনি আলাদা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—ইচ্ছা এ টাকায় একটা ভাল গোয়েন্দা-বাহিনীর ব্যবস্থা করা হোক্। ইহারা শুধু চুরি-ডাকাতির তদন্ত করিবে। সকলেই জানেন, কুমার বাহাদুর নিজে একজন বড় দরের সখের ডিটেক্‌টিভ্ ছিলেন, এবং কয়েকটা বড় বড় রহস্য সমাধানে পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্যও করিয়াছিলেন; কাজেই শেষের দানটিও তাঁর উপযুক্তই হইয়াছে।"

খবরটি শেষ করিয়া লোকটি যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। আপন মনেই বলিল, 'যাক্, আজ থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উইল যখন বেরিয়েছে তখন এত দিনে অনন্ত রায় সত্যি-সত্যিই কাবার হয়েছে। বেশ, বেশ।'

সেইদিনই বিকাল বেলা। সহরের এক প্রান্তে খুড়োর চায়ের দোকান। তাহারই এক কোণে দু'টি লোক নিরিবিলি বসিয়া বিড়ি সেবনের ফাঁকে ফাঁকে ধূমায়মান চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল। শোনা যায় চায়ের দোকান বড় মধুর স্থান, সুখদুঃখের গল্প শুনিবার এবং শোনাইবার পক্ষে আদর্শ স্থান। এ দু'টি লোকও বোধ হয় তাহাই করিতেছিল। কিন্তু অত চুপি চুপি কেন? একজন, আর কেহ শুনিতে না পায় এমন ভাবে, চুপি চুপি কহিল, "তা হ'লে তুমি আমাদের সমিতিতে যোগ দিচ্ছ তো?" অপর জন, মুখ ফিরাইতে এটিকে চেনা গেল—সকালবেলার সেই গোমস্তা গোছের চেহারার লোকটি, নাম তার জনার্দ্দন, কহিল, "তা—তা, কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই—"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার। সমিতির সভ্যসংখ্যা এখন মোট ৪৩, তুমি গেলে ৪৪ হবে। কিন্তু এদের কেউ কারুর মুখ দেখে নি, কেউ কারও পরিচয়ও জানে না—এক নম্বর ওয়ান্ ছাড়া। যখন সবাইকে একত্র জড় হতে হয় তখন সকলকারই মুখ কালো মুখোসে ঢাকা থাকে; তখন তুমি আমাকেও চিনতে পারবে না। মুখোসে আঁটা নম্বর দেখে লোক চিনতে হয়। এমন কি নম্বর ওয়ান্‌কেও।"

"নম্বর ওয়ান্‌টি কে?"

"আরে তিনিই তো সব,—সমিতির প্রেসিডেন্ট, এক কথায় তিনিই হচ্ছেন 'সমিতি'। সমিতির অদ্ভুত লোক এই নম্বর ওয়ান্। দুনিয়ার কোন খবর যেন তাঁর জানতে বাকী নেই।

যা কিছু কাজকর্ম্ম—সবের মাথাই হচ্ছেন তিনি, তাঁকে এড়িয়ে কিছুই করবার যো নেই। অথচ আজ পর্য্যন্ত কেউ তাঁর পরিচয় জানে না। অবশ্য নম্বর টু'র কথা বলতে পারি না। প্রেসিডেণ্ট তাঁকে বড্ড বিশ্বাস করেন।"

"কিন্তু, যদি সমিতির কোন সভ্য বিশ্বাসঘাতকতা করে—গোপনে পুলিশে খবর দেয়? এই ধর, আমাকেই বা তোমাদের বিশ্বাস কি?"

অপর লোকটি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "প্রেসিডেণ্ট্‌কে কি তুমি এতই বোকা মনে কর যে এ সম্ভাবনাটা তিনি ভেবে দেখেন নি? সব দিকে আট ঘাট বাঁধা আছে হে, সব দিকে বাঁধা আছে। এ পর্য্যন্ত ২।১ জন দুর্ব্বুদ্ধি লোক সে চেষ্টা কি আর করে নি?—কিন্তু খবর পুলিশে পৌঁছবার আগেই তাদের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অতএব—তোমার পক্ষেও সে চেষ্টা না করাই ভাল।"

জনার্দ্দন আপন মনে কি চিন্তা করিল। অপর ব্যক্তি কহিল, "কি হে, ভাল করে ভেবে দেখ, শেষে কাজে নেমে পড়ে যেন পিছিও না। হ্যাঁ, তবে একটা কাজের মত কাজ বটে। গত দু' বছর ধরে সহরে যে ক'টা বড় বড় ডাকাতি-রাহাজানি হয়েছে সব এই সমিতির কাজ, অথচ কেউ এর টিকিটিরও পাত্তা পায় নি। আর উপার্জ্জন? অনন্ত রায়ের চাকরী করে আর ক' পয়সা জমিয়েছ হে? 'একদিনেই তার হাজার গুণ পেয়ে যাবে। সমিতির যা কিছু আয় প্রত্যেক সভ্য তার সমান ভাগ পায়, কোন জালজোচ্চুরি নেই। প্রেসিডেণ্ট খাঁটি মানুষ।"

জনার্দ্দন এবার মনস্থির করিয়াছে। কহিল, "হুঁ, রাজী। এখন আমায় কি করতে হবে বল।" সঙ্গীটির মুখ এবার জনার্দ্দনের কানের বড় কাছে ঘেঁষিয়া আসিল।

ইহার পর দুই বছর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সহরে অনেকগুলি বড় বড় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ মণিকার আসলভাই নকলভাইএর দশ লক্ষ টাকার হীরা-জহরৎ চুরি গিয়াছে, দিনে দুপুরে 'দি ব্যাঙ্ক অব্ ইষ্টার্ণ হেমিস্ফিয়ারের' ক্যাশ্ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা উধাও হইয়াছে, জনাইগঞ্জের রাজবাড়ী হইতে রাণীমার বহুমূল্য মুক্তার হার অন্তর্হিত হইয়াছে, এই রকম আরও কত কি! গোয়েন্দা-বিভাগের বড় কর্ত্তারা ঘটনার কিনারা করিতে গিয়া হিমসিম খাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোনও সূত্রের সন্ধান পান নাই।

সেদিন সকাল বেলা জনার্দ্দনকে দেখা গেল, মুখে যেন বেশ একটু উদ্বেগের ভাব। জনার্দ্দনের অবস্থা একটু ফিরিয়াছে, সহরতলীতে নিজস্ব একটা ছোট বাড়ীও হইয়াছে। কিন্তু বেশী কিছু করিবার সাহস পায় নাই। জমীদার অনন্ত রায়ের বরখাস্ত সরকার সে, বেশী বাড়াবাড়ি করিলে লোকে সন্দেহ করিতে পারে।



জনার্দ্দনের সম্মুখে একটা খোলা চিঠি,—সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। তার ভাবার্থ—'আজ রাত্রি ৯টায় প্রেসিডেণ্টের গৃহে জরুরী সভা। উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। মনোহরা চন্দ্রপুলী।"

সাধারণতঃ সমিতির চিঠির ভাষা এ রকমটা হয় না, তাই জনার্দ্দন একটু চিন্তিত। কিন্তু ভাবিয়া লাভ নাই, জনার্দ্দন নিজের কাজে মন দিল। সম্মুখের দেয়ালে একটা চোরা দরজা, সুইচ্ টিপিতেই ফাঁক হইয়া গেল। জনার্দ্দন সেটা পার হইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। এ ঘরের এক কোণে একটা মই ছাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। দেখিলে মনে হয় ছাদের কাছে পুরানো মালপত্র রাখিবার জন্য যে মাচা আছে তার জিনিষপত্র পাড়িবার জন্যই এই মই, কিন্তু মই বাহিয়া উপরে উঠিতেই ছাদের কোণে আর একটা লুকান স্প্রিং-এর দরজা পাওয়া গেল। জনার্দ্দন হামাগুড়ি দিয়া এটিও পার হইয়া গেল। পাশাপাশি কতকগুলি পায়রার খোপ। জনার্দ্দন সন্তর্পণে একটি পায়রা বাহির করিয়া লইয়া তার পায়ে ছোট্ট একখানা কাগজ বাঁধিয়া দিল, তার পর ছাড়িয়া দিতেই পাখীটা দু'বার ডানা ঝট্‌ফট্ করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। এ সব সমিতিতে থাকিলে এরূপ অনেক কিছুই শিখিতে হয়, বাড়ীতেও নানা বন্দোবস্ত রাখিতে হয়।

পায়রা উড়াইয়া দিয়া জনার্দ্দন খানিকক্ষণ সেখানেই পায়চারী করিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পায়রা ফিরিয়া আসিল। পায়রার পায়ে বাঁধিয়া চিঠির উত্তর আসিয়াছে। আপন মনে একবার 'হুঁ' বলিয়া জনার্দ্দন নামিয়া আসিল।

রাত্রি সাড়ে ৮টা বাজিতেই জনার্দ্দন বাহির হইয়া পড়িল। সহরের আর এক প্রান্ত। পাড়াটা একটু ঝিরিবিলি, বেশীর ভাগ বাড়ীর সঙ্গেই খানিকটা করিয়া বাগান। বড়লোকের বাগান-বাড়ী যাকে বলে এগুলি তাই। একটি বাড়ীর সামনে লেখা 'দি কোহিনূর ড্র্যামেটিক্ ক্লাব'। জনার্দ্দন চারিদিকে চাহিয়া, নিকটে কেউ নাই দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কোটের পকেট হইতে একটা কালো মুখোস বাহির করিল এবং সযত্নে মুখে আঁটিয়া লইল। তার পর ড্র্যামেটিক ক্লাবের দরজায় গিয়া তিন বার আঙ্গুলের টোকা দিয়া দু'বার হাত মুঠা করিয়া দরজায় আঘাত করিল। দরজা আধ ইঞ্চি ফাঁক হইল, এবং তার পাশে একটি কান দেখা গেল। জনার্দ্দন চুপি চুপি কহিল, "মনোহরা চন্দ্রপুলী"। দরজা খুলিয়া গেল।

ভিতরে একটা টেবিলের সামনে একজন বলিষ্ঠ লোক প্রকাণ্ড একটা খাতা খুলিয়া কি লিখিতেছিল, জনার্দ্দন তার কাছে গিয়া মিলিটারী কায়দায় স্যালিউট্ করিল, তার পর মুখোসটা একটু টানিয়া কহিল, "ছত্রিশ"। টেবিলের লোকটি মুখ তুলিল, তারও মুখে কালো মুখোস, তার উপর সাদা অক্ষরে একটি '১' জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। মুখোসের ভিতর চোখ দু'টি যেন আরও স্বচ্ছ, এবং সে চোখের দৃষ্টিও তেমনি তীব্র। জনার্দ্দনকে একবার খুঁটিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়া লোকটি কহিল, "হল্"।

দোতলার উপর হল্। জনার্দ্দন হলে পৌঁছিয়া দেখিল, মাঝখানের বড় টেবিলটা ঘিরিয়া ইতিপূর্ব্বেই জনা চল্লিশেক লোক বসিয়া আছে। প্রত্যেকেরই মুখে মুখোস আঁটা, এবং তার উপর সাদা অক্ষরে ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি নম্বর আঁটা। অদূরে একটা গ্রামোফোনে টুং টুং করিয়া একটা বিলাতী বাজনা বাজিয়া চলিয়াছে।

ঘড়িতে টং টং করিয়া ন'টা বাজিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রেসিডেণ্ট নম্বর ওয়ান্ ঘরে ঢুকিলেন।

কোনও ভূমিকা না করিয়া প্রেসিডেণ্ট কহিলেন, "বন্ধুগণ, অত্যন্ত একটা জরুরী ব্যাপারে আজ আমাদের এখানে একত্র হ'তে হয়েছে। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন, আমাদের ১২ আর ১৮ নম্বর বন্ধু দু'টি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁরা আসবেনও না, কারণ তাঁরা ধরা পড়েছেন।"

সমস্ত হল্ যুড়িয়া একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর গলায় কহিলেন, "অবশ্য আমাদের ধরা পড়ার ভয় নেই, কারণ তাঁদের উদ্ধার করতে না পারলেও গ্রেপ্তারের আগেই তাঁদের শরীরে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা গেছে; কাজেই পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে কোন কথা বার করতে পারবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে পুলিশ খবর পেল কি ক'রে?"

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, স্ূচ পড়িলেও তার শব্দ শোনা যায়। প্রেসিডেণ্ট বলিয়া চলিলেন, "পুলিশের কৃতিত্ব এতে বিশেষ নেই। বন্ধুগণ, আপনারা শুনে রাখুন, আমাদের মধ্যে আর একটি বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব হয়েছে। নাম্বার থার্টিসিক্স, এগিয়ে এস।"

জনার্দ্দন কম্পিত পদে আগাইয়া আসিল। প্রেসিডেণ্ট আবার হাঁকিলেন, "নাম্বার টুয়েন্টি য়্যাণ্ড টুয়েন্টিওয়ান্।" ইঙ্গিত বুঝিয়া চোখের পলকে দু'জন লোক আগাইয়া আসিল এবং জনার্দ্দনের হাত দু'টি পিছন দিকে আনিয়া লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। প্রেসিডেণ্ট আগাইয়া আসিয়া একটানে তার মুখোস কাড়িয়া লইয়া মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

"তোমার নাম জনার্দ্দন নয়, কেমন?" প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করিলেন।

জনার্দ্দন হেঁট মুখে কহিল, "না।"

"তোমার আসল পরিচয় জানতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। আমার নাম অনন্ত রায়। লোকে বলে—কুমার অনন্ত রায়।"

"কুমার অনন্ত রায়! জনাইগঞ্জের কুমারবাহাদুর।" ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটিয়াছে। "কিন্তু তিনি তো আজ তিন বছর হ'ল মারা গেছেন!"

"হ্যাঁ, লোককে তাই জানতে দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু আমাদের এত খোঁজ খবর—তা তো ভুল হবার কথা নয়!"



"ভুল হয়েছে, তবে আপনাদের খুব দোষ নেই। জনার্দ্দন আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন চাকরী করেছিল; তার হাবভাব, চালচলন আমার মুখস্থ ছিল। লোকটা নেশাভাঙ করত বলে বাবা তাকে ছাড়িয়ে দেন। কিন্তু ভালো শিকারী ছিল বলে শিকারে যাবার সময় আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। শিকার করতে গিয়ে সে মারা পড়ে, কিন্তু সে খবর কেউ জান্‌ত না। আমি নিজের মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে তার ছদ্মবেশে বছর খানেক পরে দেশে ফিরি। ইতিমধ্যে দিবারাত্র বহু পরিশ্রমে আমি নিজেকে জনার্দ্দন বানাবার চেষ্টা করি, এবং লোকের চোখে ধূলো দেওয়াও সম্ভব হয়। আগেই বলেছি ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে তার চালচলন সবই আমার জানা ছিল। আমি রাতদিন মনে করতে চেষ্টা করতাম আমিই জনার্দ্দন, অনন্ত রায় মরে গেছে। আমাদের দু'জনের চেহারার মধ্যেও খানিকটা মিল ছিল, মেক্ আপ্ করে বাকিটাও মিলান সম্ভব হয়। বাইরের লোক কিছুই বুঝতে পারে নি। তবে আমার মা-বোনকে ঠকান যায় নি। তাঁরা আমার উদ্দেশ্য বুঝে ব্যাপারটা গোপনে রেখেছেন।"

"কিন্তু স্বয়ং জনাইগঞ্জের রাণীমার হারও তো আমরা সরিয়েছি, এবং সেও আপনারই সাহায্যে!"

"এর উত্তর সহজ। প্রথমতঃ, ঐভাবে, আমার বিরুদ্ধে অণুমাত্র সন্দেহ জাগলেও তা যাতে নষ্ট হয় তার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ, ও হারটি এখন পর্য্যন্ত আমাদের আয়রন্ সেফ্‌এ জমা আছে, নানা অজুহাত দিয়ে আমি ওটাকে এ পর্য্যন্ত বেচতে বা ভাঙ্গতে দেই নি; ভাঙ্গালেই জানা যাবে ওটি আসল মুক্তা দিয়ে তৈরী নয়, একেবারে নকল।"

হল্ শুদ্ধ লোক তখনও স্তম্ভিত। প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর গলায় কহিলেন, "আপনার বুদ্ধির তারিফ্ করছি, কিন্তু সময় আমাদের অল্প। এবার আপনাকে সত্যি সত্যি মরতে হবে কুমার বাহাদুর! এবং খুব আরামে আপনাকে মরতে আমরা দেব না। আমাদের বিশ্বাসঘাতক-সায়েস্তা-করা কল আপনি দেখেছেন তো? তিলে তিলে যন্ত্রণা পেয়ে আপনাকে মরতে হবে।"

অনন্ত রায়ের মুখে গভীর কালিমার ছায়া পড়িল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ভাব চাপিয়া মুখে হাসি আনিয়া তিনি কহিলেন, "মৃত্যু আমার হবেই, তা জেনেশুনেই এ কাজে হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে আপনাদের যদি কিছু খবর দিয়ে যাই তবে কি সহজ মৃত্যু পেতে পারি?"

"কি খবর দেবেন?"

'দু'বছর আমি আপনাদের সমিতিতে আছি। এত দিনে আপনাদের সমিতির নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা হয়ে গেছে। আপনাদের প্রত্যেকটি সভ্যের নাম, পরিচয়, ঠিকানা, আঙ্গুলের ছাপ আমার খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আসবার আগে পুলিশকে আমি তার সন্ধান দিয়ে এসেছি। যদি সেটা পুলিশের হাতে যাবার আগেই আপনাদের তার খোঁজ দেই?"

এই নতুন খবরে মুখোসের আড়ালে সকলের মুখ নতুন করিয়া সাদা হইয়া গেল। মনে হইল প্রেসিডেণ্ট্‌ও কিছু বিচলিত হইয়াছেন। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া তিনি কহিলেন, "এ সব খবর আপনি যোগাড় করেছেন? অসম্ভব। মিথ্যা ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করবেন না।"

অনন্ত রায় হাসিয়া বলিলেন, "মিথ্যা আমি বলি না। আমার বুক-পকেটে দেখুন, আপনাদের কয়েক জনের আঙ্গুল-ছাপের ফটো সেখানে রয়েছে। আর নাম-ধাম! বল্‌ব? প্রেসিডেণ্ট্‌ থেকেই আরম্ভ করা যাক্‌, কেমন?"

"না, না। এখানে কারও নাম জোরে উচ্চারণ করলে আপনার প্রার্থনা কিছুতেই মঞ্জুর হবে না। আচ্ছা, এ ঘরে আসুন। বন্ধুরা, আপনার দু' মিনিট অপেক্ষা করুন।"

দু' মিনিট পরে প্রেসিডেণ্ট বন্দীসহ গম্ভীর মুখে ফিরিলেন। মনে হইল তাঁর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ লাগিয়াছে, কিন্তু মুখোসের বাহিরে কিছু বোঝা গেল না। গলা সাফ করিয়া তিনি কহিলেন, "বন্ধুগণ, কুমার বাহাদুর যা বলেছেন তা সত্যি। আমাদের সমিতির নাড়ীনক্ষত্র এঁর জানা হয়ে গেছে। এমন একটি বুদ্ধিমান্‌ লোককে আমরা দলে পেয়েও হারালাম, এটা বড় আফশোসের কথা। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। সহজ মৃত্যুর বদলে উনি যা দিতে চাইছেন তা বোধ হয় আমাদের নেওয়াই ভাল। আপনাদের কি মত?"

প্রেসিডেণ্টের কথায় সকলেই সায় দিল। অনন্ত রায় আশ্বাস পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁর ঘরের গুপ্ত চোরা-সিন্দুক ও তা খুলিবার সঙ্কেত বলিয়া দিলেন। খাতাখানি সেই সিন্দুকেই আছে।

এখন, প্রশ্ন হইল খাতা আনিতে কে যাইবে? একজন যখন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তখন নিজের প্রাণ বাঁচাইতে আর কেউ যে তা করিবে না বলা যায় না। কাজেই সভ্যেরা একমত যে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট্‌কেই যাইতে হইবে, কারণ তিনি আগে হইতেই সকলের খবর জানেন। শুধু নম্বর টু আপত্তি করিল। প্রেসিডেণ্ট্‌ যদি বিপদে পড়েন তবে পরামর্শ দিবে কে? কিন্তু সকলের সম্মিলিত মতের কাছে একজনের আপত্তি টিকিল না। প্রেসিডেণ্ট্‌ যেন একটু অনিচ্ছুক ভাবেই কহিলেন, "বন্ধুরা, সকলকার যখন মত তখন আমাকেই যেতে হবে। যদি দু' ঘণ্টার মধ্যে আমি না ফিরি তা হ'লে বুঝবেন আমার কোন বিপদ্‌ হয়েছে, তখন নিজেরা বুদ্ধিমত কাজ করবেন। আমার অবর্ত্তমানে নাম্বার টু আপনাদের নেত্রী হবেন।" কথা শেষ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে তিনি মিশিয়া গেলেন।

প্রেসিডেণ্ট যাইবার পর দু' ঘণ্টা হইয়া গেল, কিন্তু তাঁর আসিবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সকলে অনন্ত রায়কে চাপিয়া ধরিল, নিশ্চয়ই সে আর একবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। অনন্ত রায় সহাস্যমুখে কহিলেন, "অনন্ত রায় মিথ্যা কথা বলে না। আমার কি



মনে হয় জানেন? পুলিশ তো আপনাদের খবর জেনেই গেছে, কাজেই বুদ্ধিমানের মত প্রেসিডেণ্ট্‌ মশাই সময় থাকৃতে থাকৃতে কেটে পড়েছেন। সমিতি গেল তো তাঁর বয়েই গেল।"

"খবর্দ্দার। মুখ সামলে কথা বলবেন।" নম্বর টু গর্জ্জিয়া উঠিল। "প্রেসিডেণ্ট কি চরিত্রের লোক আমরা সবাই জানি। সত্যি কথা বলুন, নইলে—নইলে গরম লোহা ছেঁকা দিয়ে সত্যি কথা বার করব।"

অনন্ত রায়ের মুখে আবার সেই হাসি। "বিশ্বাস হ'ল না? আচ্ছা, তবে আমার আর একটা সন্দেহের কথা বলি। আমার সিন্দুকের খবর আপনাদের দিয়েছি কিন্তু তাড়াতাড়িতে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয় নি। আগে সেটা দিয়ে নি। সিন্দুকটি লম্বায় ৬ ফুট, চওড়ায় ৩ ফুট আর গভীরও ৫ ফুট। সিন্দুকে দরজা দু'টি। বাইরেরটা খুলবার সঙ্কেত প্রেসিডেণ্ট জেনে গেছেন, কিন্তু ভিতরেরটা জানেন না। আর বলতে কি, সিন্দকটা এমন ভাবে তৈরী যে বাইরে থেকে এই দ্বিতীয় দরজার অস্তিত্ব বোঝাও যায় না। বাইরের দরজা খুলে প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই সিন্দুকের ভিতরে ঢুকবেন, কারণ খাতাটা আছে একেবারে পেছনে, ভিতরে না ঢুকলে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। খাতাটা বেশ ভারী, আর আছেও ওপরের দিকে তোলা, কাজেই ভাল ক'রে দেখতে গেলে সেটা তুলে নামাতে হবে। আর তা করলেই বিপদ্‌। খাতা তুললেই সিন্দুকের স্প্রিং-বসান তাক সামান্য উঠে আসবে আর তার সঙ্গে এমন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে যে তাক একটু উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে ফটাং করে ভিতরের দরজাটা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট্‌ মশাই বোধ হয় সিন্দুকের মধ্যেই আটকা পড়েছেন।"

"অসম্ভব। প্রেসিডেণ্ট্‌ অমন কাঁচা ন'ন।"

টেবিলের ওধারে আর একজন লোক, কথার ভাবে মনে হইল সে এঞ্জিনীয়ারিং জানে, কহিল, "না না, ব্যাপারটা অসম্ভব নয়।"

অনন্ত রায় তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, "আমায় কথাটা শেষ করতে দিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভিতরের দরজা তো ঐ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তা খোলাই হচ্ছে হাঙ্গামা। আপনারা হয়তো শুনেছেন, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা শব্দ-তরঙ্গ বা আলোক-তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আমার সিন্দুকে খুব বড় এক আমেরিকান্‌ বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে ঐ ব্যাপারটিরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ভিতরের দরজার পাশে একটা খুব ছোট টেলিফোনের 'মাউথ্‌পিস্‌'র মত জিনিষ আছে। দরজা খুলতে হ'লে তার মধ্যে মুখ দিয়ে বলতে হয়, 'দ্বার খুলে দাও দ্বারী!' সেই শব্দ-তরঙ্গ ভিতরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তারই সাহায্যে একটা বৈদ্যুতিক কাঁটা ঘুরে দরজা খুলে যায়।"

এঞ্জিনীয়ার সভ্যটি মাথা নাড়িয়া কহিল, "হ'তে পারে, অসম্ভব নয়। ও দেশে কোন কোন ব্যাঙ্কে এ রকম ব্যবস্থা হয়েছে শুনেছি।"

নম্বর টু আবার গর্জ্জিয়া উঠিল: "উঃ, কি সয়তান! একে বেঁধে রাখ। ফিরে এসে পুড়িয়ে মারব। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট্ কি এতক্ষণ বেঁচে আছেন! চলুন, চলুন, আমার সঙ্গে আর দু'-এক জন চলুন।"

"কিন্তু",—অনন্ত রায় বলিয়া চলিলেন, "সেই সঙ্গে আমাকেও নিতে হবে যে! দরজা খোলার মন্ত্র তো বলে দিলাম, কিন্তু সে মন্ত্র আমার গলা দিয়ে বেরোন চাই। কেবল মাত্র আমার গলার স্বরেই ও যন্ত্র কাজ করে, আর কারোটায় নয়। একবার তো সর্দ্দি হয়ে গলা ভেঙ্গে যাওয়ায় কয়েক দিন সিন্দুক খুলতেই পারি নি।"

"অসম্ভব নয়।", এঞ্জিনীয়ারের গলা আবার শোনা গেল। কিন্তু অন্যান্য সভ্যেরা আর সবুর করিতে নারাজ। পুলিশ এতক্ষণে সমস্ত খবরই জানিয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে বাড়ী ঘেরাও করিতে পারে। এখন সকলের আগে পালান দরকার। একা প্রেসিডেণ্টের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ লইয়া খেলা করা ঠিক নয়। আর বন্দীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া? সে তো অসম্ভব।

অনন্ত রায়কে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নীচের চোর-কুঠুরীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বদ্ধ ঘরে অনন্ত রায় বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। পুলিশ এত দেরী করিতেছে কেন? এদিকে ইহারা যদি ডিনামাইট্ দিয়া বাড়ী উড়াইয়া দেয়? হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হইল; পাগলের মত ঘরে ঢুকিল নম্বর টু। মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্ত রায়ের বাঁধন খুলিয়া লইয়া সে কহিল, "কুমার বাহাদুর, আপনার পায়ে পড়ি, প্রেসিডেণ্টকে বাঁচান। আপনি গেলে এখনও হয়তো তিনি প্রাণে বাঁচতে পারেন। আমি গয়না আনবার নাম করে পালিয়ে এসেছি।"

"কিন্তু?—"

"আর কিন্তু নয়। প্রেসিডেণ্ট্ আমার স্বামী। যত দোষই করুন, তিনি আমার স্বামী। তাকে বাঁচান—বাঁচান—বাঁচান কুমার বাহাদুর!"

সিন্দুকের ভিতর হইতে নম্বর ওয়ান্‌কে যখন বাহির করা হইল তখনও তার প্রাণ বাহির হয় নাই,—একটু একটু নিঃশ্বাস তখনও পড়িতেছে। সমস্ত দেহ রক্তাক্ত, মাথা ফুলিয়া ঢোল হইয়াছে। বাহির হইবার জন্য কি চেষ্টাই না সে করিয়াছে!

পুলিশের লোক আগেই আসিয়া পড়িয়াছিল; খবর লইয়া জানা গেল অন্যান্য সমস্ত আসামীই ধরা পড়িয়াছে। পুলিশের বড় কর্ত্তা বলিলেন, "যাক্, এত দিনে একটা মস্ত বড় ভাবনা চুকল।"



কুমার বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, "আমার কিন্তু একটা ভাবনা এখনও আছে। আমি যে, 'আমি' এবার যে সেটা প্রমাণ করতে হবে!"*

---

# হাবুলের আস্ফালন

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ

বাড়ীতে একটা বিবাহ উপলক্ষ্যে মেজদিকে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইয়াছিল। লোক ফেরত আসিয়াছে, মেজদিকে পাঠায় নাই। মাতাঠাকুরাণী কাঁদিতেছেন। তাঁহার বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে এবং নাতি-নাত্‌নীরা সকলেই আসিয়াছে,—আসে নাই কেবল তাঁর মেজ মেয়ে। সব ক'টিকে এক যায়গায় দেখা বুঝি বা তাঁর ভাগ্যে আর ঘটিল না!

বয়স তখন তরুণ। আনন্দ-সম্মেলনে সকলের এই নিরানন্দ মনোভাব আমাকে সজাগ করিয়া তুলিল। আমি নিজেই চলিলাম এবার মেজদিকে আনিতে। সঙ্গে চলিল হাবুল। গ্রাম-সম্পর্কে সে আমার ভাইপো। অসাধ্য সাধনের প্রয়োজন হইলেই তাহাকে আমরা ডাকিতাম। সেবার নষ্টচন্দ্রার দিন রাত্রে রায়দের বাড়ীর নারিকেল চুরি করিবার সময় তাহাদের টিনের ঘরের উপর নারিকেলের কাঁদি ফেলিয়া সেই যে হাবুল পালাইয়াছিল, তার পর এ পর্য্যন্ত তাহার টিকিও দেখিতে পাই নাই। হাবুল খুব 'সিভাল্‌রাস্‌' ছেলে। মারামারি করিতে, সাঁতার কাটিতে, রাস্তার কুকুর ঠেঙ্গাইতে সে অদ্বিতীয়। কেহ কেহ বলেন, তা'র বুদ্ধিটা কিছু কম। সম্ভব। হয়ত এই বুদ্ধি কম বলিয়াই তাহাকে যখন তখন ডাক দিলে পাওয়া যায়।

অবস্থাটা বুঝাইয়া দিয়া হাবুলকে বলিলাম, 'যাবি আমার সঙ্গে?' হাবুল সোৎসাহে বলিল, 'এক্ষুণি।'

'কিন্তু ট্রেণ ত' চ'লে গেছে সেই কখন!'

বে-পরোয়া ভাবে হাবুল উত্তর করিল, 'হেঁটেই যাব।'

'আনতে পারবি মেজদিকে?'

দৃঢ়স্বরে হাবুল বলিল, 'আলবাৎ।'

দুই জনে বাহির হইলাম।

---

* বিদেশী গল্পের অনুসরণে

হাঁটা-পথ সম্পূর্ণ অজানা। মাইল চার পাঁচ গিয়া সম্মুখে পড়িল একটি নদী। খেয়া নৌকা ওপার। পাটনীর কুঁড়ে ঘর এপার হইতে দেখা যাইতেছে। হাবুল 'মাঝি মাঝি' বলিয়া চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিল—কিন্তু মাঝির কোনই সাড়াশব্দ মিলিল না। প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া থাকার পর হাবুলকে বলিলাম, 'চল্ বাড়ী ফিরে যাই।'

হাবুলের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। কাপড় গুটাইতে গুটাইতে দৃঢ়-মুষ্টি তুলিয়া ওপারের অদৃশ্য মাঝিকে হাবুল বলিল, 'রাস্কেল, স্কাউণ্ড্রেল, আজ তোমাকে দেখে নেব।'

হাবুল সাঁতরাইয়া নদী পার হইবে; কিন্তু নদীর মধ্যে নামিতেই তাহার পায়ে বাধিল একটা দড়ি। এই দড়ির সঙ্গে খেয়া-নৌকা বাঁধা। দড়িটি টানিলেই নৌকাখানি চলিয়া আসে। পাটনী সব সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারে না বলিয়াই নদীর উভয় পাড় হইতেই এইরূপ দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধা আছে।

হাবুলের মুষ্টি-নিক্ষেপ বৃথাই গেল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হাবুল লজ্জিতও হইল খুব।

আমরা পথ হাঁটিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম আকাশে উঠিয়াছে একখানি কালো মেঘ।

তার পর ঝড় ও বৃষ্টি।

আমরা তাড়াতাড়ি আশ্রয় লইলাম—একটা খালের ধারে কোনও জেলের একখানি পরিত্যক্ত ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে।

যখন ঝড়-বৃষ্টি থামিল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে এবং একটু একটু জ্যোৎস্নাও দেখা যাইতেছে। মাঠ, অপরিচিত গ্রাম, জঙ্গল এবং খেজুর-বনের ভিতর দিয়া দুইটি প্রাণী আমরা চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে সম্মুখে পড়িতেছে ঝড়ে-ভাঙ্গা চালাঘর, ছেঁড়া বালিশ, মাদুর, ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়ি এবং কোথাও বা আকস্মিক ভাবে শিয়ালের হুটোপাটি।

একটি লোক লম্বা লাঠি ঘাড়ে করিয়া সেই নির্জ্জন বন-পথে আমাদের দিকেই আসিতেছে। হাবুল থামিল। 'কাকা, দাঁড়ান।' বলিলাম, 'কি?' হাবুল চুপি চুপি বলিল, 'দেখতে পাচ্ছেন না,—ওরা ডাকাত। তখন ব'লেছিলাম, লাঠিটা নিয়ে যাই—তা আপনি কিছুতেই রাজী হ'লেন না!'—হাবুল তাড়াতাড়ি একটা গাছের মোটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল।

'দেখ্‌লেন, ডাল ভাঙ্গতে দেখে ভড়কে গেছে। পাশ কাটাল। পেছন থেকে আসবে মনে ক'রেছে।'

হাবুলের মাথায় চট্ করিয়া বুদ্ধি জুটিয়া গেল। 'ছোট কাকা, আপনি চলুন সম্মুখে তাকিয়ে আর আমি চ'লব পেছনে তাকিয়ে—দু' জনের পিঠ থাকবে এক যায়গায়,—দেখি, ব্যাটারা পেছন পায় কোথায়?'



কিছু দূর এইভাবে যাওয়ার পর হাবুল বলিল, 'ঠিক ধরেছি। ঐ দেখুন ঐ পথেই এবার আসছে।' আমরা দাঁড়াইলাম।

'কে! কারা ওখানে?'

হাবুল চটিয়া গিয়াছে। গাছের ডালটি শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, 'তা দিয়ে তোমার দরকার? তুমি কে? কি চাও? মতলবখানা কি তোমার?'

'একটা বাছুর দেখেছেন?—ছোট বাছুর? ঝড়-বৃষ্টির সময় গাইটা গিয়ে গোয়ালে উঠেছে কিন্তু সঙ্গে বাছুর নেই!'

বলিলাম, 'কে রে, তারক নাকি!'

'ও! তুমি কেদার!'

তারকনাথ আমাদের সঙ্গে গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়িত। সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গ্রামের নাম রাধাডাঙ্গা এবং এইখানেই তারকনাথের বাড়ী।

অগত্যা তারকনাথের বাড়ীতেই সে রাত্রি আশ্রয় লইতে হইল। হাবুল কিন্তু তারককে সেই 'চ্যালেঞ্জ' করার পর আর তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারে নাই।

আহারাদির পর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প সঙ্গে দিয়া তারক আমাদের শুইবার জন্য একখানি নির্দ্দিষ্ট ঘর দেখাইয়া দিল এবং বলিল, 'বিছানাপত্র ওখানে সব ঠিক করাই আছে—গিয়েই শুয়ে পড় আর কি!' তখন শন্ শন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে এবং টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে। তারক আর কি বলিল ভাল শুনিতে পাইলাম না।

ঘরে ঢুকিতেই একটা দম্‌কা বাতাসে ল্যাম্পটি নিবিয়া গেল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাবুল তক্তপোষ আবিষ্কার করিল। আমি দরজায় খিল দিয়া তাহার পাশে গিয়া শুইলাম। সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটির পর একটু বিশ্রাম,—শুইতেই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

হঠাৎ হাবুলের ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

হাবুল চাপা-কণ্ঠে বলিতেছে—'ছোটকাকা,—সাপ!'

'য়্যাঃ!' আমি তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে সরিয়া যাইতেছি—হাবুল একলাফে মেঝেয় নামিয়া বলিল, 'শীগ্‌গির নামুন,—বিছানার উপর সাপ!'

'ওরে বাবা!' একলম্ফে মেঝের উপর নামিয়া গেলাম। হাবুল আমার মুখে হাত দিয়া বলিল, 'চুপ্—ফোঁস ফোঁস্ কচ্ছে শুনুন্!'

নিস্তব্ধ ঘর। কান পাতিয়া শুনিলাম, বিছানার উপর হইতে হিস্ হিস্ শব্দ আসিতেছে।—যেন মধ্যে মধ্যে ছোবল মারার শব্দ!

আমরা দরজা খুঁজিয়া পাইতেছি না। হাবুল হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা ভাঙ্গা খাটের

হাঁটা-পথ সম্পূর্ণ অজানা। মাইল চার পাঁচ গিয়া সম্মুখে পড়িল একটি নদী। খেয়া নৌকা ওপার। পাটনীর কুঁড়ে ঘর এপার হইতে দেখা যাইতেছে। হাবুল 'মাঝি মাঝি' বলিয়া চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিল—কিন্তু মাঝির কোনই সাড়াশব্দ মিলিল না। প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া থাকার পর হাবুলকে বলিলাম, 'চল্ বাড়ী ফিরে যাই।'

হাবুলের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। কাপড় গুটাইতে গুটাইতে দৃঢ়-মুষ্টি তুলিয়া ওপারের অদৃশ্য মাঝিকে হাবুল বলিল, 'রাস্কেল, স্কাউণ্ড্রেল, আজ তোমাকে দেখে নেব।'

হাবুল সাঁতরাইয়া নদী পার হইবে; কিন্তু নদীর মধ্যে নামিতেই তাহার পায়ে বাধিল একটা দড়ি। এই দড়ির সঙ্গে খেয়া-নৌকা বাঁধা। দড়িটি টানিলেই নৌকাখানি চলিয়া আসে। পাটনী সব সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারে না বলিয়াই নদীর উভয় পাড় হইতেই এইরূপ দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধা আছে।

হাবুলের মুষ্টি-নিক্ষেপ বৃথাই গেল। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হাবুল লজ্জিতও হইল খুব।

আমরা পথ হাঁটিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম আকাশে উঠিয়াছে একখানি কালো মেঘ।

তার পর ঝড় ও বৃষ্টি।

আমরা তাড়াতাড়ি আশ্রয় লইলাম—একটা খালের ধারে কোনও জেলের একখানি পরিত্যক্ত ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে।

যখন ঝড়-বৃষ্টি থামিল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে এবং একটু একটু জ্যোৎস্নাও দেখা যাইতেছে। মাঠ, অপরিচিত গ্রাম, জঙ্গল এবং খেজুর-বনের ভিতর দিয়া দুইটি প্রাণী আমরা চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে সম্মুখে পড়িতেছে ঝড়ে-ভাঙ্গা চালাঘর, ছেঁড়া বালিশ, মাদুর, ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়ি এবং কোথাও বা আকস্মিক ভাবে শিয়ালের ছুটোপাটি।

একটি লোক লম্বা লাঠি ঘাড়ে করিয়া সেই নির্জ্জন বন-পথে আমাদের দিকেই আসিতেছে। হাবুল থামিল। 'কাকা, দাঁড়ান।' বলিলাম, 'কি?' হাবুল চুপি চুপি বলিল, 'দেখতে পাচ্ছেন না,—ওরা ডাকাত। তখন ব'লেছিলাম, লাঠিটা নিয়ে যাই—তা আপনি কিছুতেই রাজী হ'লেন না!'—হাবুল তাড়াতাড়ি একটা গাছের মোটা ডাল ভাঙ্গিয়া লইল।

'দেখ্‌লেন, ডাল ভাঙ্গতে দেখে ভড়কে গেছে। পাশ কাটাল। পেছন থেকে আসবে মনে ক'রেছে।'

হাবুলের মাথায় চট্ করিয়া বুদ্ধি জুটিয়া গেল। 'ছোট কাকা, আপনি চলুন সম্মুখে তাকিয়ে আর আমি চ'লব পেছনে তাকিয়ে—দু' জনের পিঠ থাকবে এক যায়গায়,—দেখি, ব্যাটারা পেছন পায় কোথায়?'



কিছু দূর এইভাবে যাওয়ার পর হাবুল বলিল, 'ঠিক ধরেছি। ঐ দেখুন ঐ পথেই এবার আসছে।' আমরা দাঁড়াইলাম।

'কে! কারা ওখানে?'

হাবুল চটিয়া গিয়াছে। গাছের ডালটি শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, 'তা দিয়ে তোমার দরকার? তুমি কে? কি চাও? মতলবখানা কি তোমার?'

'একটা বাছুর দেখেছেন? —ছোট বাছুর? ঝড়-বৃষ্টির সময় গাইটা গিয়ে গোয়ালে উঠেছে কিন্তু সঙ্গে বাছুর নেই!'

বলিলাম, 'কে রে, তারক নাকি!'

'ও! তুমি কেদার!'

তারকনাথ আমাদের সঙ্গে গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়িত। সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গ্রামের নাম রাধাডাঙ্গা এবং এইখানেই তারকনাথের বাড়ী।

অগত্যা তারকনাথের বাড়ীতেই সে রাত্রি আশ্রয় লইতে হইল। হাবুল কিন্তু তারককে সেই 'চ্যালেঞ্জ' করার পর আর তাহার সহিত ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারে নাই।

আহারাদির পর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প সঙ্গে দিয়া তারক আমাদের শুইবার জন্য একখানি নির্দ্দিষ্ট ঘর দেখাইয়া দিল এবং বলিল, 'বিছানাপত্র ওখানে সব ঠিক করাই আছে—গিয়েই শুয়ে পড় আর কি!' তখন শন্ শন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে এবং টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে। তারক আর কি বলিল ভাল শুনিতে পাইলাম না।

ঘরে ঢুকিতেই একটা দম্‌কা বাতাসে ল্যাম্পটি নিবিয়া গেল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাবুল তক্তপোষ আবিষ্কার করিল। আমি দরজায় খিল দিয়া তাহার পাশে গিয়া শুইলাম। সমস্ত দিন হাঁটাহাঁটির পর একটু বিশ্রাম,—শুইতেই কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

হঠাৎ হাবুলের ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

হাবুল চাপা-কণ্ঠে বলিতেছে—'ছোটকাকা,—সাপ!'

'য়্যাঃ!' আমি তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে সরিয়া যাইতেছি—হাবুল একলাফে মেঝেয় নামিয়া বলিল, 'শীগ্‌গির নামুন,—বিছানার উপর সাপ!'

'ওরে বাবা!' একলম্ফে মেঝের উপর নামিয়া গেলাম। হাবুল আমার মুখে হাত দিয়া বলিল, 'চুপ্—ফোঁস ফোঁস্ কচ্ছে শুনুন্!'

নিস্তব্ধ ঘর। কান পাতিয়া শুনিলাম, বিছানার উপর হইতে হিস্ হিস্ শব্দ আসিতেছে।—যেন মধ্যে মধ্যে ছোবল মারার শব্দ!

আমরা দরজা খুঁজিয়া পাইতেছি না। হাবুল হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা ভাঙ্গা খাটের

পায়া কুড়াইয়া পাইল। সেই পায়া সে সাপের মাথায় বসাইবে।—তার হাত ধরিয়া ফেলিলাম, 'পাগল, যদি সাপের লেজে লাগে!'

হাবুল বলিল, 'কক্ষণও না—দেখে নিন্, আমি ঠিক মাথায় বসাব।—এ হাবুল, হাঁ।'

হাবুল দুই হাত দিয়া সেই মুগুর তুলিল। বলিলাম, 'রাখ, তারককে ডেকে আলো আনি—তার পর—'

হাবুল চটিয়া গেল। 'ঐ তো আপনাদের দোষ! কোনও কাজে সাহস নেই। আলো দেখলে সাপ পালিয়ে যাবে না? আমি বসিয়ে দিই আগে, তার পর আপনারা আলো এনে দেখবেন, যাদুর মাথাখানা ছাতু হ'য়ে আছে ঐ বিছানার উপর।'

তাড়া দিয়া বলিলাম, 'গোঁয়ারতুমি করিস নে হাবুল।'

তার পর চীৎকার করিয়া হাবুলকে ডাকিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে ফোঁস্ ফোঁসানি থামিয়া গেল। আমরা দরজা খুলিয়া ফেলিলাম। তারক আলো লইয়া আসিল এবং বিছানার একপ্রান্ত হইতে যিনি নামিয়া আসিলেন তিনি সাপ নহেন, তারকের প্রত্যক্ষ বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়! দন্ত-হীন বৃদ্ধের মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় যে শব্দ হইতেছিল তাহা বড় বড় গোক্ষুরা-কেউটের ফোঁস ফোঁসানিকেও হার মানাইয়া দেয়।

ভগবান্‌কে সহস্র ধন্যবাদ,—তারকনাথের বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ের শুভ্র মাথাটি ছাতু হইয়া যায় নাই।

ভোর হইবার পূর্ব্বেই হাবুলের ডাকাডাকিতে সেখান হইতে আবার আমরা পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

মেজদিদিদের বাড়ীর কাছে আসিয়া হাবুলকে বলিলাম, 'হ্যারে, যদি মেজদির শ্বশুর বলেন—পাঠাব না?'

'বললেই হ'ল!'

'কি করবি?'

'বুড়োর মাথা—'

'দূর গাধা!'

'মেজ পিসীমাকে বলব—চলে এস!'

'তাই কি হয়?'

হাবুল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'খাব। খেয়েই ওদের হাঁড়ী সাবাড় ক'রে দেব!'

'তাতে মেজদির আসার কি সুবিধে হবে?'



হাবুল কিছুই বুদ্ধি স্থির করিতে পারিল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কিছু স্থির করা তাহার কোষ্ঠিতে নাই। রাত্রে থাকিয়া ওদের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিবে, ঘরে আগুন লাগাইবে, মারামারি করিবে—এই রকম কত কি বলিতে বলিতে হাবুল পথ চলিতে লাগিল।

হাবুল যেরূপ চটিয়াছে, ভয় হইল, সে একটা কুরুক্ষেত্র না করিয়া বসে।

মেজদি'র বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গাড়ী প্রস্তুত। মেজদি'র শ্বশুর মহাশয় নিজেই মেজদিকে লইয়া আসিবেন বলিয়া লোক ফিরাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু আসল কথা ঐ লোককে বলেন নাই। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'আবার তোরাও এসেছিস্!—নে, তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে খেয়ে নে—ট্রেণের খুব দেরী নেই।'

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। হাবুলও তাঁহার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—'হে হে, আপনিও যাবেন?'

---

মাঘের রামধনু তোমাদের অনেকেরই ভাল লেগেছে জেনে সুখী হ'লাম। নানা রকম বাধাবিঘ্নের মধ্যেও রামধনু যে তার ছোট্ট বন্ধুদের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেছে এ কথা ভাবলে সত্যিই আনন্দ হয়। প্রত্যেক সংখ্যায় রামধনুর সব ক'টি বিভাগ কেন দিতে পারছি না তা তো সকলেই বুঝতে পারছ—পৃষ্ঠাসংখ্যার অপ্রাচুর্য্য। তবে হ্যাঁ, মণিমঞ্জুষা বিভাগটা আসছে বার নিশ্চয়ই দেবার চেষ্টা করব। এ মাসেও দেখছি অনেকে—যেমন শ্রীবেলা রায়, শ্রীবেলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনুকূল বসু, শ্রীনির্ম্মল দত্ত, কুমারী জাহানারা বেগম—এঁরা সকলেই এই বিভাগটির জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। রামধনুর কোন কোন লেখার প্রতিকূল সমালোচনা পেলে, তোমাদের কারো কারো বোধ হয় ধারণা, আমরা অসন্তুষ্ট হই। মোটেই তা নয়, বরঞ্চ, এতে আমরা খুসীই হই এবং তোমরা কি পছন্দ কর বুঝতে পারি। কাজেই নিঃসঙ্কোচে মতামত জানিও। "লেখনী-বন্ধু" বিভাগ চালাবার জন্য অনেকে—বিশেষ ক'রে শ্রীঅজয়কুমার দত্ত, কুমারী রাবেয়া

খাতুন ও কুমারী মিনি ব্যানার্জ্জি অনেক কথা লিখেছেন। এ বিভাগটি আমাদের পত্রিকায় আগে ছিল—কিন্তু পাঠকদের' উৎসাহের অভাব দেখে স্থগিত রাখা হয়েছে। যথেষ্ট উৎসাহের পরিচয় পেলেই আবার এ বিভাগটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমাদের প্রীতিসম্ভাষণ নিও। ইতি—

—রাঃ সঃ

রণজী প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল উত্তেজনার মধ্যে শেষ হ'ল। বাংলা দলকে মহীশূর দলের কাছে ১৭ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। মহীশূর দলের রান্ হয় ১ম ইনিংস্এ ৩০৭, ২য় ইনিংসএ ২০৮। বাংলা দলের হয় ১ম ইনিংস্এ ২৭৯, ২য় ইনিংসএ ২১৯। মহীশূর দলের রামদেব ও গুরুদাচর এবং বাংলা দলের রামচন্দ্রের খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। অপর সেমিফাইনাল খেলা হবে বোম্বাই ও উত্তর ভারত দলের মধ্যে।

কলকাতায় 'গভর্ণরের একাদশ' দলের সঙ্গে মহারাষ্ট্র দলের (যারা গত দু' বছর পর পর রণজী ট্রফী জিতেছে') একটা প্রদর্শনী খেলা হয়ে গেছে। ফলাফল হয়েছে ড্র। গভর্ণরের দলের রান্ ১ম ইনিংস্এ হয় ২৫৭, ২য় ইনিংস্এ ৭ উইকেটে ২৭৫ (ডিক্লেয়ার্ড্)। মহারাষ্ট্র দল ১ম ইনিংসএ করে ৩০৮, ২য় ইনিংস্এ ৫ উইকেটে ১৫৩। দুই দলেই ভারতের অনেক বাছা বাছা খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন।

* * *

একদল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে বলেছেন খেতে হয় তো খরগোসের দুধ খাও। গরুর দুধে যা প্রোটিন আছে সেই তুলনায় খরগোসের দুধে প্রোটিন প্রায় তার পাঁচগুণ বেশী। ফ্যাট্ বা চর্ব্বি জাতীয় জিনিষও তাতে কম নেই। তবে কথা হচ্ছে, মানুষ আজও খরগোসের দুধ খাওয়া অভ্যাস করে নি—খেতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে? আর মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযোগী দুধ যোগাবার মত খরগোস পাওয়া যাবে কিনা সেও একটা প্রশ্ন।

* * *

হাঙ্গর অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী, বাগে পেলে মানুষকে শুধু ছিঁড়ে খেতেই তারা জানে—তোমাদের অনেকেরই হয়তো এই রকম ধারণা। কিন্তু হাঙ্গরকে মানুষ কত রকম কাজে লাগায় তা বোধ হয় জান না। কোন কোন জাতের হাঙ্গরের মাংস নাকি খুব উপাদেয়। শোনা যায় চীনারা হাঙ্গরের মাংসের ভারী ভক্ত। হাঙ্গরের দাঁত, হাঙ্গরের ডানা, হাঙ্গরের হাড় মানুষ নানা কাজে লাগিয়েছে—বাজারে ওগুলির দামও



বেশ চড়া। কড্ লিভার অয়েলের মত হাঙ্গরের যকৃতের তেলও আজকাল ওষুধ হিসাবে খুব ব্যবহার করা হচ্ছে।

* * *

যুদ্ধের গতি ক্রমাগতই ঘোরালো হয়ে উঠছে। জাপান মালয়ে ও প্রশান্ত মহাসাগরের নানা জায়গায় অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে তা বোধ হয় কাগজে ইতমধ্যেই পড়েছ। সিঙ্গাপুরে এই-বার প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হ'ল। ওদিকে ইয়োরোপে রুশরাও আগের মতই ক্রমাগত নানা জায়গা পুনর্দখল ক'রে চলেছে। জার্ম্মেনীর মতিগতি অতঃপর কোন্ মুখী হবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ফিলিপাইন্স্এর বিখ্যাত বন্দর ম্যানিলা—জাপানী আক্রমণের একটি বড় লক্ষ্যবস্তু।

* * *

সম্প্রতি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের জাতীয় গৌরব। এটি গড়ে তুলবার প্রায় সমস্ত কৃতিত্বই অক্লান্ত সাধক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর প্রাপ্য।

* * *

আজকাল চারদিকে বিজয়চিহ্ন V ('ভি') দেখতে পাওয়া যায়। এই V-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক হচ্ছেন শ্রীযুত এম্. ডি. লেভলে। ইনি জাতিতে বেল্‌জিয়ান্। জার্ম্মান্ বাহিনী বেলজিয়াম্ দখল করলে ইনি ইংলণ্ডে চলে আসেন।

* * *

সম্প্রতি বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের পুণ্য জন্মভূমি "গ্রামরত্ন ফুলিয়ায়" কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফুলিয়ায় সমবেত হয়েছিলেন। সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় পৌরোহিত্য করেন। শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায়ই এই সম্মেলনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল।

ফুলিয়ায় কবি কৃত্তিবাসের একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক যবন হরিদাসেরও সাধনাস্থল ছিল এই ফুলিয়া গ্রাম। কৃত্তিবাসের সমাধিস্মৃতির পাশে দেখা যায় তাঁরও তপস্যার স্থান। স্থানটি বড় সুন্দর। তোমরা সুবিধা হ'লে বাংলার এই পুণ্যতীর্থটি দেখতে ভুল না।

* * *

হিসেব ক'রে দেখা গেছে পশমের জন্য

ভারতে প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ভেড়া প্রতিপালন করা হয়। এদের থেকে বছরে প্রায় ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের পশম পাওয়া যায়। প্রায় সাড়ে আটত্রিশ লক্ষ টাকার পশম বিদেশে রপ্তানী হয়। এ বছর যুদ্ধের দরুণ রপ্তানী কমে গেলেও সৈন্যবাহিনীর জন্য চাহিদা বেড়েছে। সরকার থেকে ভেড়া ও পশমের উন্নতির জন্য নানান রকম গবেষণা চলছে।

---

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

**ক**

( ক+লাই=কলাই, ক+মল=কমল, ক+রাত=করাত, ক+বল=কবল, ক+বন্ধ=কবন্ধ। )

### উত্তরদাতাদের নাম

রামেন্দু ও দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, অপরাজিতা সেন ( ভবানীপুর ); মনীষা সেন, মণ্টু, নীপু, শঙ্কু ( খুলনা ); জামগ্রাম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ( জামগ্রাম ); নবেন্দু সেন ( রাজসাহী ); গীতা, শান্তি ও গীতেন্দু দত্ত ( শিলং ); কালিদাস পাল ( বালুভরা ); উষসী সেনগুপ্তা ( ঢাকা ); বেলা রায় ( ড্যাল্টনগঞ্জ ); সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগচী ( বালুভরা ); জয়ন্ত, স্বপ্না ও রত্না দেবী ( বাঁকীপুর ); দীপালি, গায়ত্রী ও অর্চ্চনা ( জলপাইগুড়ি ); বাবু বসু ( মেদিনীপুর ); আরতি দাস ( শিলং ); রশিদ, কফিল, রাখাল বর্দ্ধন, নৃপেন ( লাখপুর শিমুলিয়া ); চণ্ডী, জবা, কণা. ছন্নু ( ধানবাদ ); লিলি, বেলা, বাদল, বর্ষা ( চাইবাসা ); বাবু, বুবুল, গীতা, ইন্দিরা, বোকানী ও শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য ( মথুরা )।

---

## নূতন ধাঁধা

### হেঁয়ালী

( ১ ) কোন্ প্রাচীন দেশ জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াত?
( ২ ) সেকালকার কোন্ রাজার গা বেয়ে জল পড়্ত?
( ৩ ) বিছানা কখন গাছের ওপরে ওঠে?
( ৪ ) পা' কখন মেঘের মত উঁচু হয়?
( ৫ ) ভোঁতা পয়সা দিয়েও কোন্ জিনিষ কাটা যায়?

---

বাহির হইয়াছে
রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান
হুকাকাশির গল্প
'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেকটিভ্
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।
আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।
সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট
দাম মাত্র আট আনা

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম এ, বি. এল্ প্রণীত

সোনার হরিণ
হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

হাস্য ও রহস্য
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ৷৷৵০

পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷৷০

নূতন পুরাণ
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৷৵০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে
( শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে )
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক
একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায়
হাসি। দাম ৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর ( কলিকাতা ) কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C 1641.


## শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

'শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী

ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

**লক্ষ্মী ঘি-ই**

বোঝায়।

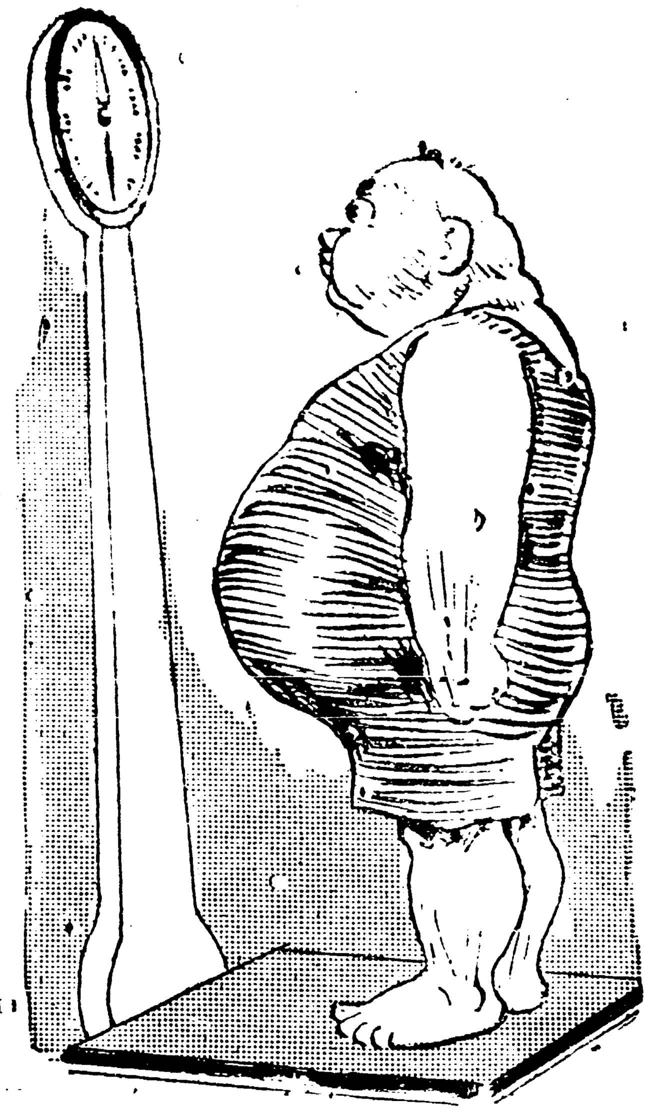

অৰ্দ্ধ শতাব্দীর উপর

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে

সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০


Cover: C. H. Aran & Co.



# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বার্ষিক ২॥৵০

প্রতি সংখ্যা ।০


মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে

আবিষ্কৃত ১৯০২

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

## রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৶০, ষাণ্মাসিক ১৷৶০; প্রতিসংখ্যা ।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্ত চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

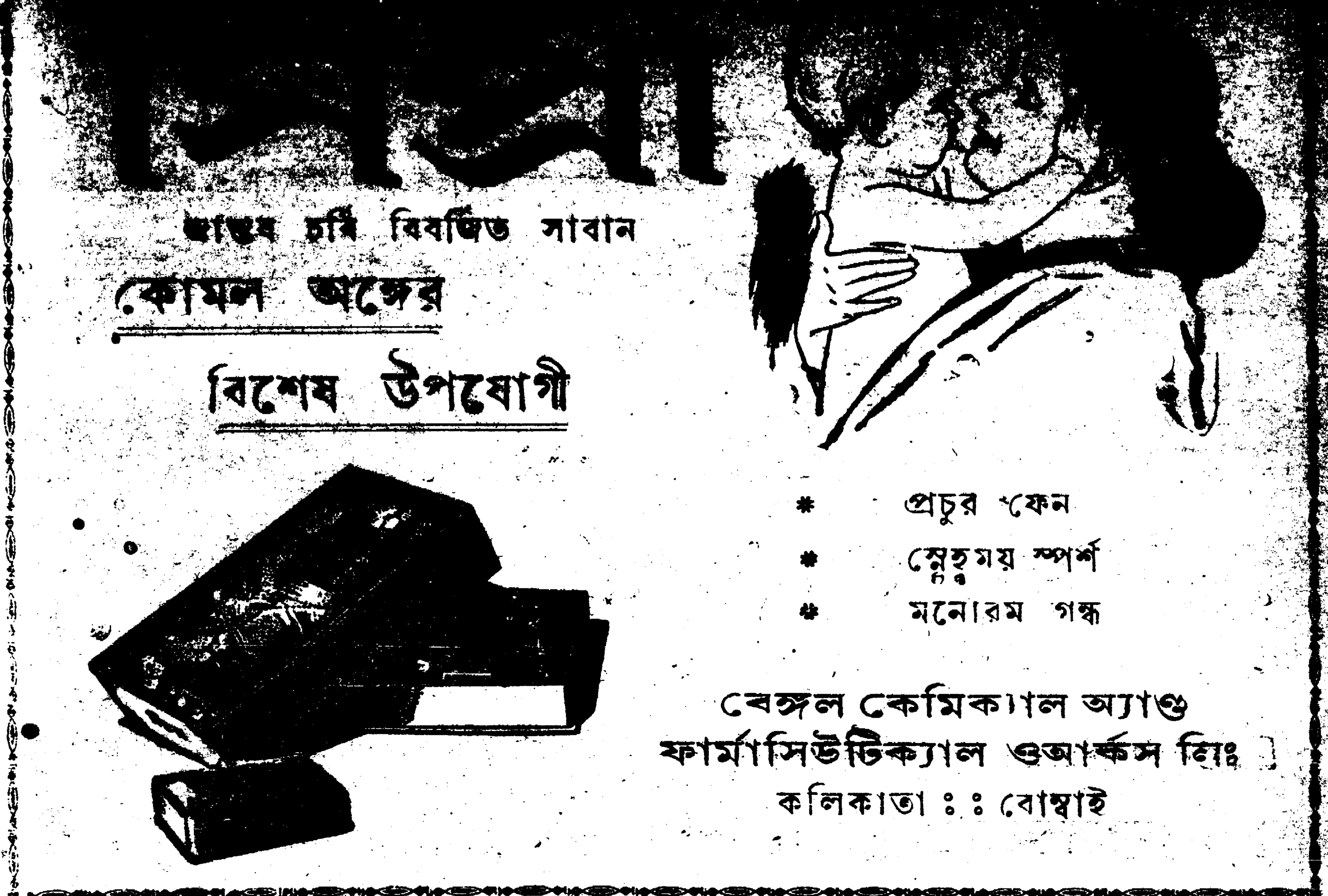

সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার মহান্ সৌন্দর্য্য লইয়া শিশুসাহিত্যে
বাহির হইতেছে

# কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজ

আধুনিক-যুগের নামকরা সাহিত্যিকগণের লেখা রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চার ও ভয়াবহ ডিটেক্‌টিভ কাহিনী-ভরা এই শিশু-উপন্যাসগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি নিয়া বাহির হইয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
১। অন্ধকারের বন্ধু

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
২। ছিন্নমস্তার মন্দির

শ্রীঅখিল নিয়োগীর
৩। তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
৪। বিজয় অভিযান

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর
৫। ছায়া কালো-কালো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
৬। রাত্রির যাত্রী

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
৭। হারানো বই

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
৮। জীবন্ত-সমাধি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
৯। গুপ্ত ঘাতক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
১০। মিসমিদের কবচ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
১১। উদাসীবাবার আখ্‌ড়া

শ্রীসুনির্ম্মল বসুর
১২। কেউটের ছোবল্

বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লেখা বুকে লইয়া প্রতি মাসে একখানি করিয়া এই সিরিজের
**গ্রন্থাবলী বাহির হইতে থাকিবে**
মূল্য প্রত্যেকখানি আট আনা

**দেব সাহিত্য-কুটীর**—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ১৲

## [illegible]

— দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের [illegible]

অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ॥০

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক-কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,

সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ॥৵০

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙীন বাঁধাই মলাট,

চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৸১০

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"

মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

**প্রাপ্তিস্থান** :—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড ( ১বি, রসা রোড, কলিকাতা )

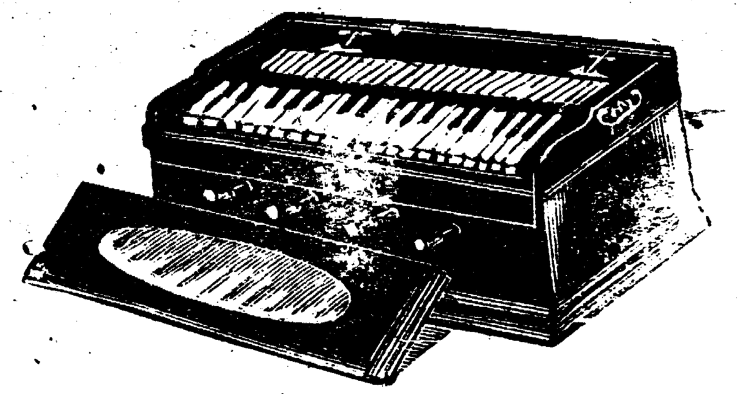

স্থুর সাধনায় অরগ্যান কোংর

## হারমোনিয়মই

## সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ।

**বাদ্যযন্ত্র কিনিবার পূর্ব্বে**

আমাদের কোম্পানীর জিনিষ যাচাই করিলে

ইহার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন।

## অরগ্যান কোং

৭/১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

## ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা

**=সুন্দর বই=**

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

**ইউরোপের আলো** ... ১৲

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

**ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি** ... ॥০

শ্রীনীলা মজুমদারের

**বন্তিনাথের বড়ি** ॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

**ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন** ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

**অনুসন্ধানী** (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

"এনিমি নাম্বার ওয়ান্‌"

আলোকচিত্র—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪৮ { ৩য় সংখ্যা

## ঠাকুরমা'র শাস্তি

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

খোকাকে আজ বকেছে খুব খোকার ঠাকুরমা,
তাই ব'লে কি কাঁদবি খোকন ; কান্না থাকুক না।
ঠাকুরমাটা, দুষ্টু বেজায়
বল্‌ গিয়ে তুই ঠাকুরদাদায়,
উচিৎ শাস্তি দেবেন তিনি কেমন সে কায়দায়।
বন্ধ রেখে কান্না খোকন দাদুর কাছে ছোটে,
নালিশ শুনে বুড়োর ভুরু কুঁচকে আস্তে ওঠে।
রাগের বহর দেখে তাঁহার
খোকার স্ফূর্ত্তি কে ধরে আর ?

হাসছে খোকন, এবং সুখে ভাবতেছে মনে
এতক্ষণে বুড়ী লুকায় ঘরেরি কোণে।

ঠাকুরদাদার কোলে উঠে বলে খোকন ধন,
"হয়তো বুড়ী ভয়েই, দাদু, লুকায় এতক্ষণ।"
দাদু বলে, "শাস্তি দেওয়ার কোথায় এখন কি?
দেখবি তখন গরম ভাতে ঢালব যখন ঘি।
লুকিয়ে ক'দিন থাকবে বুড়ী বেরোক না একবার
কাৎলা মাছের মুড়ো এনে ঢালব পাতে তার।"
খোকন হাসে, হাততালি দেয়, বলে ঠাকুরদা'য়,
"উচিৎ শাস্তি ঠিক দিয়েছ দুষ্টু ঠাকুরমায়।"
খোকন ভাবে গরম ভাতে ঢাললে পরে ঘি
আগুন জ্বলে যাবে, বুড়ী থাক্ না, খাবে কি?
কাৎলা মাছের মুড়ো যদি সামনে দেওয়া হয়
হাপুস ক'রে কামড়ে নেবে নাকটা বুড়ীর, নয়?
কাৎলা-মুড়ো দেখলে খোকা ভয়েই যে হয় খুন,
পাতে কারও মুড়ো দেওয়া শাস্তি নিদারুণ।
তাই সে ভাবে, ভাবতে ভাবতে হেসেই সে অস্থির,
কেমন জব্দ, কেমন শাস্তি দুষ্টু বুড়ীটির!

সেদিন দেখে ঠাকুরমা তার গরম ভাতেতে,
নিজেই যে ঘি ঢালছে, খাবে, আপন পাতেতে।
কাৎলা মাছের মস্ত মুড়ো সামনে পড়ে তার;
খোকা তখন দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে ঠাকুমা'র।
বলে, "দিদু, ঘি দেওয়া ভাত কাৎলা-মুড়োর সাথ
অমন ক'রে খেয়ো নাক' ধরি তোমার হাত।



আর কখনো বল্‌ব নাক' বুড়ো ঠাকুরদায়
যতই তুমি মার আমায় সইব সে ব্যথায়।"
শুনে হাসে কাকিমারা, বোনেরা আর মা,
খোকন কি যে করবে কিছু বুঝতে পারে না।
কাঁচুমাচু হয়ে ব'সে দেখে মিটির মিট্,
কাৎলা-মুড়োটাকে বুড়ী করলে কেমন ঢিট্।
কোথায় গেল ঘি-মাখা ভাত? শব্দ গপাগপ্;—
ভাবছে খোকন, ঠাকুরদাদার কারসাজি এই সব।

---

# হরে মাঝি

[ ধারাবাহিক উপন্যাস ]

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

## ১৪

ব্রাহ্মণ রোজার সরল কথাগুলি হরির মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তাহারা হরিকে যেন এক নূতন রাজ্যের পথ ও সন্ধান দিল। প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যকে তাহার অতি তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল।

হরি কিছু দিন পরে সাধুবাবার পদ বন্দনা করিতে গেলে সাধুবাবার ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'বৎস আমার সময় হইয়াছে।' বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজের গড়া নূতন বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছি; জগতের হিত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মনে করিয়া যে সব কার্য্যে আমি সাহায্য করিয়াছি—যাহা আমি অনুমোদন করিয়াছি তাহাতে হিংসার সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক। শাস্ত্র বলিয়াছেন—'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কর্ম্মফলং শুভাশুভম্'—ভাল মন্দ দুই কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতে হইবে। সেইজন্য এই মাঘে আমি তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়া তুষানলে দেহত্যাগ করিব—এই প্রায়শ্চিত্তই শাস্ত্রের বিধান।'

হরি সাধুর কথায় একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে

লাগিল। বলিল—'প্রভু আপনি, অপাপবিদ্ধ। আমরা পাপী—আপনার এই নিদারুণ দণ্ডগ্রহণ আমি সহ্য করিতে পারিব না।'

সাধু—'বৎস, হিংসার ফল অতি ভীষণ। হিংসাকে যে কোন ভাবেই হউক প্রশ্রয় দিলে উহা ধ্বংস ও অধোগতি আনিবে।'

হরি—'বাবা, আমার এ ঐশ্বর্য্য আর ভাল লাগে না, আপনার অভাবে আমার পৃথিবী অন্ধকার। আমি আপনার অনুগামী হইব।'

সাধু—'আমায় একাকী যাইতে হইবে। বৎস, সে দুর্গম ও দুজ্ঞেয় পথে ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সঙ্গী নাই।' সাধু শৃঙ্খলিত ব্যাঘ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তুই আর বাঁধা থাকিস কেন—'অধীন করিয়া রাখাও এক প্রকার হিংসা।' সাধু ব্যাঘ্রের বন্ধন মোচন করিলেন কিন্তু সে নড়িতে চায় না। সাধু হরিকে বলিলেন—'দেখ, বন্ধনের এমনি মোহ যে স্বাধীনতা পাইয়াও ভোগ করিবার শক্তিও এ যেন হারাইয়াছে!' সাধু বাঘের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—'যা, তুই মুক্ত।' বলিতেই সে লাফাইয়া গভীর অরণ্যের দিকে চলিয়া গেল।

হরি সাধুবাবার চরণে লুটাইয়া বলিল, 'প্রভু, আপনি অন্তর্য্যামী, আমার বন্ধনও মোচন করুন।' সাধু হরিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—'তোমার গ্রাম পুণ্যভূমি; তোমার গৃহই তপোবন হইবে।'

হরি বিদায় হইয়া নয়নজলে পথ হারাইয়া ফেলিতে লাগিল—পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। একান্ত কাতর ও শূন্যপ্রাণে গভীর রাত্রে সে আশ্রমে ফিরিল।

পরদিন হরি আশ্রম-সচিব প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া জানাইল তাহাকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে। ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে। আশ্রমাদির নিয়মশৃঙ্খলা যেন পূর্ব্ববৎ থাকে, তাঁহাদিগের উপরই নির্ভর।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বদিন বৈকালে হরি তাহার দীর্ঘ দিনের সেই প্রিয় বজ্‌রাটির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল : 'কিশোর বয়সে গাহিতাম—

'মন রে কৃষিকাজ জান না'—

আজ জীবন-গোধূলিতে মনে হইতেছে—

'এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।'

এই ঐশ্বর্য্য—এই সম্পদ্ কি দিতে পারে? তার চেয়ে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ রোজার মত যদি হইতাম তাহা হইলে ভগবান্ ডাক শুনিতেন। হরির অজয় নদীতে সেই পল্লীজীবনের কাহিনী মনে পড়িল—মনে পড়িল সেই প্রভাতের সূর্য্যোদয় আর আজ এই সায়াহ্নের অস্তরাগ। যত্নসঞ্চিত



পুরাতন পরিধেয় বস্ত্র ও রঙিন সেই গামছাখানি আর তাহার নিজস্ব যৎসামান্য অর্থ সম্বল করিয়াই হরি তীর্থযাত্রায় বাহির হইবে মনস্থ করিল—আশ্রমের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিল না। সে অর্থ শ্রীকৃষ্ণের, হরি তাহার খাতাঞ্চী মাত্র।

সে আর একবার বজ্‌রাখানিকে ভাল করিয়া দেখিল—তার কত জয়যাত্রার কথা তাহার সঙ্গে জড়িত। সুদীর্ঘ জলপথ হইতে এবার স্থলপথেই তাহার নূতন জীবনযাত্রা সুরু হইল। নৌকা লইয়াই তাহার এতদিন কাটিয়াছে, তাই তার প্রতি এত মমতা। হরি গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

মাঝিরে দাও গো বিদায়
দাও গো বিদায় সোনার তরী,
ধীরে ওই সন্ধ্যা আসে
অদূরে ওই বিভাবরী।
ত্যজিতে হবেই আহা,
আজি এ ঘাটের মায়া,
বটের এ নিবিড় ছায়া
অনেক দিনের রে সুন্দরী!

মনে যে পড়ছে আজি
সেই প্রভাতে প্রথম বাওয়া,
যবে এ তরুণ বুকে
লাগলো প্রথম নদীর হাওয়া।
আহা কি উজল দিবা,
নীলিমা গভীর কিবা,
কে যেন ভূতল গগন
কেবল দিল সুধায় ভরি!

সুদূরের পারের ঘাটে
হঠাৎ পেলাম ডাকের সাড়া,
ডুবন্ত সাঁঝের রবির
কনক করে সেই ইসারা।

হয় ত কোন সুপ্রভাতে
মিলিব তোমার সাথে,
আজি এ লতার বাঁধন
শিথিল হয়ে পড়লো ঝরি'।

—শেষ—

# প্রাচীন ভারতীয় গুহা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্.এ, পি.আর.এস্

তোমরা সকলেই জান যে আজকাল ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্য দেশগুলির অন্যতম ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই দেশে সর্ব্বপ্রকার শিল্পকলাতে বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরা পাহাড়ে গুহাতে বসে তপস্যা করতেন। এটা যে কল্পনা নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতে প্রাপ্ত গুহা থেকে। এই গুহাগুলির সম্বন্ধে আজ তোমাদের কিছু বলব।

বরাবর পাহাড়ের গুহা বিহার

ভারতবর্ষে যে সব গুহা পাওয়া গিয়েছে সে সমস্তই পাহাড় থেকে খোদাই ক'রে তৈরী করা। ভারতবর্ষ ছাড়া প্রাচীন মিশরে ও পারস্যে এ রকম গুহা খোদাই ক'রে তৈরী করা হ'ত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে মিশর দেশেই নাকি সর্ব্বপ্রথম গুহা খোদাই করা হয়েছিল এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য মিশর থেকে গুহা নির্ম্মাণ করবার পদ্ধতিটী জেনে নিয়েছিল। আমাদের দেশের সব চেয়ে পুরোনো গুহা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল। এর থেকে কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে পারস্য দেশের কাছ থেকেই ভারতবর্ষ গুহা খোদাই করতে শিখেছিল; কিন্তু পারস্য দেশের ও ভারতবর্ষের গুহার ভেতরে এত বৈসাদৃশ্য আছে যে এ মত কোন রকমেই গ্রাহ্য হতে পারে না।



ভারতবর্ষে সব চেয়ে পুরোনো গুহা বিহারে বরাবর পাহাড়ে অবস্থিত। মৌর্য্য সম্রাট্ অশোক এই পাহাড়ে অবস্থিত দুটী গুহা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য খোদাই ক'রে দিয়েছিলেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে বৌদ্ধ গুহাই ভারতবর্ষে সব চাইতে পুরোনো গুহা। বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকে' লেখা আছে যে কিছুকালের জন্য ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজগৃহে একটী গুহাতে বাস করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করবার জন্য রাজগৃহের নিকটে বভেরু পাহাড়ে অবস্থিত সপ্তপর্ণী গুহাতে একটী ধর্ম্মসভা হয়েছিল। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মসাহিত্যে লেখা আছে যে তপস্যা ও ধর্ম্মসভা করবার জন্য গুহা খুব প্রশস্ত, তা হ'লেও কোন বইতে লেখা নেই যে এ সব ব্যবহৃত গুহাগুলি পাহাড় থেকে খোদাই করা না স্বাভাবিক। বরাবর গুহার সহিত কাষ্ঠময় স্থাপত্যের এত সাদৃশ্য আছে যে সকলেই অনুমান করেন যে বরাবর গুহার আগে কাঠের দ্বারা বড় বড় প্রকোষ্ঠ তৈরী করা হ'ত। পরে এই গুহাগুলি কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠের অনুকরণে খোদাই করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষের আরও নানাস্থানে পুরোনো যুগের গুহা পাওয়া গিয়েছে; এর ভেতরে পশ্চিম ভারতে গুহার সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। বিহারে বরাবর, রাজগীর ও সিতামারিতে গুহা পাওয়া গিয়েছে। উড়িষ্যাতে ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে গুহা আছে। মাদ্রাজ প্রদেশে বেজওয়াদা ও মহাবল্লীপুরম্ বলে জায়গাটাতে যে গুহাগুলি আছে তা বেশ প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশে বাগ ও উদয়গিরিতে গুহা আছে। বাগগুহাতে যে সব পুরোনো কালের ছবি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি খুব নামকরা। বোম্বাই প্রদেশে যে সব জায়গাতে গুহা পাওয়া গিয়েছে তার ভেতরে বাদামী, আইহোলি, কারাড়, বেদশা, কারালচ, ভাজা, কোন্দানে, এলিফ্যান্টা, কান্হেরি, জুন্নার ও নাসিকের গুহাগুলি খুব নামকরা। এ ছাড়া

হায়দারাবাদে অজন্টা ও ইলোরাতে গুহা আছে। তোমরা বোধ হয় সকলেই জান যে অজন্টা গুহার দেওয়ালে যে সব ছবি আঁকা আছে তার চাইতে ভাল ছবি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নি ও সমস্ত পৃথিবীতেও খুব কম আছে।

ভারতবর্ষে যে সব গুহা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ধর্ম্ম অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন। কোন কোন জায়গাতে এই তিন রকম গুহা এক সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। এখন তোমাদের এই তিন রকম গুহার সম্বন্ধে বল্‌ব।

বৌদ্ধ গুহাগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খোদাই করা সুরু হয়। এই গুহাগুলিকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—হীনযান ও মহাযান। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন প্রথম প্রচলিত হয় তখন বুদ্ধের বা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি তৈরী ক'রে পূজো করা হ'ত না। সে সময় কেবল ভগবান্ বুদ্ধের কোন প্রতীক্ খোদাই ক'রে পূজো করা হ'ত। এই রকম বৌদ্ধ ধর্ম্মকে হীনযান বলা হয়। তার পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঠিক হয়েছিল যে ভগবান্ বুদ্ধের ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়ে পূজো করা হবে। এ রকম বৌদ্ধ ধর্ম্মকে মহাযান বলা হয়। হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের গুহাগুলি খৃষ্টাব্দের কিছু আগে কিংবা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল। এই ধরণের বৌদ্ধগুহাগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এগুলিতে ভাস্কর্য্যের বিশেষ কোন কাজ নেই ও এতে ভগবান্ বুদ্ধের কোন মূর্ত্তিও নেই। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের গুহাগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নির্ম্মিত হ'তে আরম্ভ

খণ্ডগিরির বিখ্যাত গুহা



হয়েছিল। এই গুহাগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এগুলিতে গৌতম বুদ্ধের ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে সব গুহা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে নামকরা হচ্ছে বোম্বাই প্রদেশে পুনা জেলাতে কারলা, ভাজা, বেদসা, জুন্নার, নাসিক সহরে ও বোম্বাই সুবরবন জেলাতে কাহ্নেরি বলে পাহাড়ে প্রাপ্ত গুহাগুলি। এ ছাড়া হায়দারাবাদে অজন্টা ও ইলোরাতে প্রাপ্ত কতকগুলি গুহা। পুনা সহর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে কারলা গ্রামে একটী পাহাড়ের ওপরে কতকগুলি গুহা রয়েছে। এগুলির মধ্যে একটী হচ্ছে চৈত্যগৃহ আর কতকগুলি হচ্ছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্মেলনের জন্য বিহার গৃহ। কারলার চৈত্যগৃহটী সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেছেন যে এর চাইতে বড়, সুন্দর ও সুসংরক্ষিত এই জাতীয় গুহা আর পাওয়া যায় নি। এই গুহাটীর দেওয়ালে যে সব লিপি উৎকীর্ণ আছে সেগুলি আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে এই গুহাটী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমভাগে খোদাই করা হয়েছিল। এই গুহাটীর সঙ্গে প্রাচীন খৃষ্টীয় গির্জ্জার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এটী লম্বায় ১২৪ ফুট, চওড়ায় ৪৫ ফুট আর উচ্চতায় ৪৫ ফুট। এই গুহাটীর ভেতরে একটী খোদাই করা স্তূপ আছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই স্তূপটীর চারিদিকে ঘুরে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। গুহাটীর সম্মুখ দিকে আলো যাওয়ার জন্য অনেকটা ঘোড়ার নালের মতন খিলানযুক্ত একটী প্রকাণ্ড জানালা খোদাই করা আছে।

কারলা গুহার পরে ভাজাতে প্রাপ্ত গুহার কথা বল্‌তে হয়। এই গুহাগুলিও কারলা গুহার কাছে অবস্থিত। এখানকার চৈত্যগুহাটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গুহাটী লম্বায় ৬০ ফুট ও চওড়ায় ২৭ ফুট। এই গুহাটীর ভেতরেও একটী স্তূপ খোদাই করা আছে। এই গুহাতে কোন উৎকীর্ণ লিপি নেই; সুতরাং এটা কোন্ সময়ে খোদাই করা হয়েছিল তা জানতে হ'লে অন্য উপায়ের শরণ নিতে হবে। বোম্বাই সুবরবন জেলাতে কোন্দানে বলে একটী জায়গাতে একটী চৈত্যগুহা আছে। এই গুহাতে প্রাপ্ত একটী উৎকীর্ণ লিপি থেকে বুঝতে পারা যায় যে এটী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল। কোন্দানের চৈত্যগুহার সঙ্গে ভাজা চৈত্যগুহার এত বেশী রকম সাদৃশ্য আছে যে ভাজা চৈত্যগুহাকে কোন্দানের

চৈত্যগুহার সমসাময়িক বলা অযৌক্তিক হবে না। এর থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভাজা চৈত্যগুহাও খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

ভাজার নিকটে বেদসা নামে আর একটী জায়গাতে কতকগুলি গুহা আছে। এগুলির ভেতরে একটী চৈত্যগৃহ, একটী বিহার ও আর কতকগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ। চৈত্যগৃহটী লম্বায় ৪৫ ফুট ও চওড়ায় ২১ ফুট। এখানে যে বিহারটী পাওয়া গিয়েছে এ রকম বিহার ভারতবর্ষে আর পাওয়া যায় নি। ভেতর দিকে এটী ৩২ ফুট লম্বা ও ১৮ ফুট চওড়া কিন্তু চৈত্যগুহার মত এর পেছন দিক্‌টী গোলাকার। এই বিহারের দেওয়ালের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য ছোট ছোট ঘর আছে।

পুনা সহর থেকে প্রায় ৫৬ মাইল উত্তর দিকে জুন্নার বলে একটী জায়গা আছে। এই জায়গাটী দেখতে ভারী সুন্দর—চারিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় উঠেছে। এইখানে, শিবনেরি ব'লে এক পাহাড়ের ওপরে একটী ছোট ঘরে মারাঠা বীর শিবাজী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই ঘরটী এখনও বেশ ভাল অবস্থাতে আছে এবং আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকেই বড় হ'লে এই ঘরটী দেখতে ভুলবে না। জুন্নারের ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে অসংখ্য গুহা আছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হ'ল :—(১) মানমোদি পাহাড়ে অবস্থিত তিনটী শাখার গুহা; (২) শিবনেরি পাহাড়ে অবস্থিত অনেকগুলি শাখার গুহা; (৩) তুলজা লেন শাখা; (৪) গণেশ লেন শাখা।

জুন্নারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মানমোদি পাহাড় অবস্থিত। এখানে ৩৩ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া একটী অসমাপ্ত চৈত্যগৃহ পাওয়া গিয়েছে। এই পাহাড়ের দ্বিতীয় গুহা-শাখার নাম অম্বিকা লেন। এখানেও একটী অসমাপ্ত চৈত্যগুহা পাওয়া গিয়েছে,—এটী বেদসাতে প্রাপ্ত চৈত্যগুহার মত দেখতে। তৃতীয় শাখাটীর নাম অম্বল্য লেন। এখানেও একটী অসমাপ্ত চৈত্যগুহা পাওয়া গিয়েছে।

শিবনেরি পাহাড়ের ওপরে যে সব গুহা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি অধিকাংশই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য ছোট ছোট ঘর ও ছোট ছোট বিহার।



জুন্নার সহর থেকে দু'মাইল পশ্চিমে তুলজ লেন নামে আর একটী গুহা-শাখা পাওয়া গিয়েছে। এখানে আমরা একটী সুন্দর চৈত্যগুহা দেখতে পাই। এই গুহাটী গোলাকার ও এর মাঝখানে একটী স্তূপ খোদাই করা রয়েছে।

সুলেমান পাহাড়ের ওপরে গণেশ লেন গুহা অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য অনেক ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ আর বিহার পাওয়া গিয়েছে। এর ভেতরে ৬নং চৈত্যগুহা আর গণেশ লেন নামে খ্যাত বিহারটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিহারের দরজার ওপরে একটী প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছে; এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে এটী খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল।

বাকী গুহাগুলির কাথা বারান্তরে বল্‌ব।

---

১৭

গর্ত্তের মধ্যে সেই বৃহৎকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কাল দেখিয়া সকলের মনে ভয় হইলেও রঞ্জিৎ দলবল লইয়া বনের মধ্যে শিকার করিতে যাইতে দ্বিধা বোধ করিত না। তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ, বন্দুকের উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস; বনের জন্তুকে সে ভয় করিবে কেন? সেই জনহীন অরণ্যভূমি নানাবিধ শিকারে পরিপূর্ণ; গাছের ডালে ডালে হরেক রকমের পাখী দেখা যাইত। কত বৎসর এই দ্বীপে লোকের আগমন হয় নাই,—ইহারাও নির্ব্বিবাদে বনের মধ্যে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। তাই রঞ্জিৎও সুদে আসলে তাহার বখ্‌রা আদায় করিতে লাগিল। নানা রকম পাখী ব্যতীত বনের মধ্যে ছিল টুকুটুকু নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র শশক জাতীয় ভীরু প্রাণী, আরও

ছোটবড় নানা জাতের জন্তু। একদিন হ্রদের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে সুশান্ত দুইটি অতি প্রয়োজনীয় গাছ আবিষ্কার করিল। প্রথমটি সেলারি শাক, দ্বিতীয়টি ক্রেশ্ শাক। শুধু মাংস খাইলে স্কার্ভি রোগে মরিতে হইবে; তাই সে ব্যবস্থা করিল প্রতিদিন এই দুইটি শাক তরকারী করিয়া রাঁধিতে হইবে।

এক একদিন তাহারা সেই গর্ত্তের ডালপালা সরাইয়া দেখিয়া আসিত, গর্ত্তের মধ্যে কোন বন্য জন্তু জড়িল কি না। কিন্তু কোনদিন কিছু পড়িত না। শেষে রোহিতাশ্ব বুদ্ধি করিয়া একখণ্ড বড় মাংস সেই ডালপালার উপর রাখিয়া দিল। জাল বা ফাঁদ পাতিয়া জীবজন্তু ধরার পক্ষপাতী রঞ্জিৎ মোটেই নহে, তাহার মতে বন্দুকই এই সব বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু রোহিতাশ্বের আস্থা যেন ফাঁদের উপরই বেশী। সেদিন সুশান্ত ও শঙ্খচূড় বনের ভিতর দিয়া কিছু দূরস্থিত একটা পাহাড় দেখিতে গিয়াছিল। উদ্দেশ্য—যদি আর একটি গুহা পাওয়া যায়, কিছু কিছু জিনিষ তাহার মধ্যে রাখা যাইবে। নিরাশ হইয়া তাহারা ঘরের দিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ বনের মধ্য হইতে একটা চীৎকার শোনা গেল। কাছে আসিয়া দেখে সেই গর্ত্তের চারিধারে ছেলেরা জড় হইয়া ভীষণ হল্লা করিতেছে। সকলেরই বেশ উত্তেজিত ভাব। বিয়্যারও লাফালাফি করিয়া চীৎকার করিতেছে ও গর্ত্তের মধ্যে তাড়া করিয়া যাইতেছে, কিন্তু ভিতরে নামিবার সাহস হইতেছে না। সুশান্ত আরো কাছে আসিয়া দেখিল গর্ত্তের উপর তখনও ডালপালা ঢাকা রহিয়াছে তবে ফাঁক হইতে দেখা যাইতেছে ভিতরে একটা জন্তু পড়িয়াছে। নিশ্চয় জাগুয়ার, নয় তো কাউগার। সুশান্ত তখন ডালপালা একটু সরাইয়া হেঁট হইয়া জন্তুটাকে দেখিল, পরে হাসিতে হাসিতে বলিল—'এ জাগুয়ারও নয়, কাউগারও নয়, গর্ত্তের মধ্যে পড়েছে একটা অষ্ট্রিচ্ পাখী।" অষ্ট্রিচ্ পাখীর নাম শুনিয়া সকলেই উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। পাখীটাকে পুষিলে বেশ মজা হইবে। আর যদি পোষ না মানে তখন মারিয়া খাইলে চলিবে। অষ্ট্রিচ্ পাখীর মাংস, বিশেষতঃ বুকের কাছটা খাইতে নাকি অতি সুস্বাদু। তখন সমস্ত ডালপালা সরাইয়া সকলে পাখীটাকে ভালো করিয়া দেখিল। বেশ বড় গোছের পাখী; প্রকাণ্ড পিঠ, প্রকাণ্ড তার ডানা দুইটি। মাথাটা মুরগীর মাথার মত দেখিতে। সর্ব্বাঙ্গ বড় বড় সাদা পালকে ঢাকা। সেটা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রিচ্ পক্ষী নহে; কারণ অষ্ট্রিচ্ পক্ষী একমাত্র আফ্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার এই জাতীয় পক্ষীকে এমু বলে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস্ প্রান্তরে যাহাদের বিচরণ করিতে দেখা যায় তাহাদিগকে নান্ডু বলে। আমাদের এই পাখীটাও সেই নান্ডু জাতীয়। সুশান্ত কহিল—"তোমরা খুব সাবধান, এর ঠোকর খেলে আর রক্ষা নেই। আমরা বেটাকে জ্যান্তই ধরব।" বেশ গভীর গর্ত্ত; পাখীটা লাফাইয়া ডানা মেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু উঠিতে পারিতেছিল না। এখন এই রাক্ষস-সমান পাখীটাকে কেমন করিয়া জ্যান্ত ধরা যায়—এই হইল



মহাসমস্যা। রোহিতাশ্ব তখন সাহস করিয়া গর্ত্তের মধ্যে নামিয়া পড়িল—অবশ্য পাখীর ঠোঁটের দুই চারিটা ঠোকর সে যে খাইল না তাহা নয়, কিন্তু অল্পপরিসর গর্ত্তের মধ্যে পাখীটা বেশী কিছু করিতে পারিল না। রোহিতাশ্ব তখন কোটটা খুলিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে পাখীটার মাথাটা ঢাকিয়া ফেলিল ও তিন চারিটা রুমাল লইয়া পাখীর ঠ্যাং দু'টা বাঁধিয়া ফেলিল। গলাটাও বাদ গেল না। পাখীটা এখন একেবারে অন্ধ। নীলাদ্রি কহিল, "একে আমি নিশ্চয় পোষ মানাব।" রঞ্জিৎ কহিল—"বনের অষ্ট্রিচ্ কি আর পোষ মান্‌বে?" নীলাদ্রি কহিল—"কেন মান্‌বে না? আমি 'সুইস্ ফ্যামিলি রবিন্‌সন্' বইএ পড়েছি বুনো অষ্ট্রিচ্ বেশ পোষ মানে। আমি বল্‌ছি একে শুধু পোষ মানাব না, এর পিঠের উপর আমরা চড়ব।" নীলাদ্রির কথায় কেহ বিশ্বাস করিল না। তখন নীলাদ্রি ও প্রদ্যোৎ গুহায় ফিরিয়া আসিয়া একগাছা বড় দড়ি লইয়া গেল। সকলে মিলিয়া পাখীটার দু'টা পা ও গলা সেই দড়িতে বাঁধিয়া তাহাকে উপরে তুলিল। পাখীটার শরীরে ভীষণ শক্তি; সে কেবলই ডানার ঝাপ্‌টা মারে, লাফাইয়া চীৎকার করিয়া ওঠে; কিন্তু যাহার পা ও গলা দড়িতে বাঁধা ও মাথা কোটে ঢাকা সে আর কি করিতে পারিবে? সকলে তাহাকে হেঁচ্‌রাইয়া গুহার মধ্যে টানিয়া আনিল। অশোক সেদিন ঘরেই ছিল। বড় শুচোনি মানুষ সে—এত বড় একটা জীবকে নিত্য খাওয়া জোগাইতে হইবে ভাবিয়া সে খুব খুসী হইল না। কিন্তু অষ্ট্রিচের খাদ্য শুধু বনের ঘাস ও গাছ-পাতা; তাই সে কিছু আপত্তি করিল না। রোহিতাশ্ব ও নীলাদ্রি পাখীটার দুইটা পা ফাঁক করিয়া বাঁধিয়া গুহার মধ্যে এক কোণে রাখিয়া দিল। কিছুদিন পরে অষ্ট্রিচ্ পাখীর পিঠের উপর চড়িবে শুনিয়া রাজীব, আশীষ ও বাব্‌লুর খুব আনন্দ হইল। পাখীটার মাথাটা এখন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাই কেহ সাহস করিয়া তাহার খুব নিকটে গেল না। সদ্য বন্দী হইয়া সে তখন কেবলই পা ছুঁড়িয়া, ডানার ঝাপ্‌টা দিয়া, ভীষণ চীৎকার করিয়া সেই ফরাসীগুহার অভ্যন্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছিল।

ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া সুশান্ত সঙ্গে দুই চারিজনকে লইয়া হ্রদের তীরবর্ত্তী সেই পাহাড়টা দেখিতে গেল। প্রকাণ্ড লম্বা পাহাড়। এই পাহাড়ের একটা গুহা পাইলে ইহাও তাহারা গুদাম ঘর স্বরূপ ব্যবহার করে; কারণ জাহাজের অনেক জিনিষ এখনো ফরাসী গুহার বাহিরে এদিক্ ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহারা একটা মনের মত গুহা পাইল না। তখন তাহারা স্থির করিল যে ফরাসী গুহার একটা দেওয়াল খুঁড়িয়া ভিতরে আর একটা ঘর করিয়া লইবে। শুনিতে কেমন কেমন লাগিলেও কাজটা খুব কঠিন নয়, কারণ তাহারা দেখিয়াছে এক দিকে দেওয়াল চূণা-পাথরে তৈয়ারী। সামনের সুদীর্ঘ শীতের সময় তাহারা শাবল ও গাঁতি লইয়া সেই দেওয়াল খুঁড়িয়া আর একটি ঘর করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু খুব সাবধানে কাজ করিতে হইবে; কারণ উপর হইতে পাথর ধ্বসিয়া পড়ার খুব সম্ভাবনা। প্রথমে তাহারা জাহাজের একটা মজবুত দরজা গুহার প্রবেশমুখে লাগাইল। দুয়ারের দুই পাশের দেওয়াল খুঁড়িয়া দুইটা বড় বড় ঘুলঘুলি প্রস্তুত করিল যাহাতে গুহার দরজা বন্ধ করিলেও ভিতরে বেশ হাওয়া ও আলো চলাচল করে।

গুহায় আসিবার পনেরো দিন পরেই ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল। তার উপর অবারিত তুষারপাত। এইবার প্রকৃত দক্ষিণ মেরুর শীত আরম্ভ হইল।

এইবার গুহার দেওয়াল খুঁড়িতে হইবে। সুশান্ত কহিল—"আমরা যদি গড়েন দিকের দেওয়াল খুঁড়তে আরম্ভ করি তা হ'লে খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে শেষে হ্রদের দিকে গিয়ে পড়্‌ব, কারণ হ্রদের দিকেই এখানকার গড়েন। তাতে আমাদের হ্রদের দিকে আর একটা দরজা হবে; তাতে উপকারও হবে যথেষ্ট। এক দিকের পথ কোন রকমে বন্ধ হ'লে অন্য দিক দিয়ে বেরুনো যাবে।" সুশান্তর কথা খুব যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত। হ্রদের দিকে গুহার প্রাচীর বড় জোর চল্লিশ কি পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ। এইটুকু চুণা-পাথরের দেওয়াল তাহারা সহজেই খুঁড়িতে পারিবে। অবশ্য প্রথমে একটা সুড়ঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে, তার পর যত ভিতরে ঢুকিবে ঘরটাকে ততই বড় করিতে হইবে। তাহাতে বেশ দুইটা ঘর হইবে; মধ্যে একটা দুয়ার বসাইলে, দু'টা ঘরই বন্ধ করা যাইবে। সুতরাং সেই দিন হইতেই তাহারা খনন কার্য্য আরম্ভ করিল। প্রথম তিনদিন কাজ অতি সহজে ও সুন্দরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। চুণা-পাথর এত নরম যে তাহা ছুরি দিয়াও কাটা যায়। তবে ভিতরে বড় অল্প স্থান; সকলে এক সঙ্গে কাজ করিবার সুবিধা নাই। তাই পালা করিয়া সকলে কাজ আরম্ভ করিল। তার পর, রন্ধ্রটুকুও প্রায় চারি পাঁচ ফুট দীর্ঘ হইয়াছে, এমন সময় একটি অদ্ভুত, অকল্পনীয় কাণ্ড ঘটিল।

কয়লার খনির মধ্যে কুলিরা যেমন করিয়া কয়লা কাটে, সুশান্তও তেমনিভাবে সেদিন বিকালে চুণা-পাথর কাটিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল,—মনে হইল বলি কেন,—সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল পাথরের মধ্যে কিসের শব্দ হইতেছে। গাঁতি থামাইয়া সে কান খাড়া করিয়া রহিল। আবার সেই একই প্রকার শব্দ—ঠিক যেন কার চাপা কান্নার স্বর!

(ক্রমশঃ)

[ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী]

## চৌদ্দ

কারুর মুখে কোন কথা নেই, কিসের যেন প্রতীক্ষায় সকলে স্তব্ধ।

মন্দিরের সিঁড়ির উপর ভৈরব বসেছিলেন, এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো চাঁদের আলো এসে পড়্‌ল তাঁর শাদা দাড়ির উপর, মাথার জটার উপর, গৈরিক বেশের উপর। মনে হ'ল যেন ছোট ছোট তারা ফুটে উঠেছে তাঁর চারিপাশে।

ভৈরব কিছুক্ষণ সামনের পানে তাকিয়ে রইলেন, যেন সেই স্তব্ধ জনতার মাঝে তিনি কিছু নিরীক্ষণ করছেন, তার পর সুরু করলেন তাঁর বক্তব্য: তোমরা বৈষ্ণব। বিষ্ণু যুগে যুগে ধরণীতে অবতীর্ণ হয়ে অত্যাচারী নিধন করেছেন, তেমনি প্রত্যেক বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য জগৎকে কলুষ-মুক্ত করা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুক্ত তরবারী হাতে যে লড়তে পারে না, সে সত্যকারের বৈষ্ণব নয়। মিহিরকুলের কাল পূর্ণ হয়েছে, এবার তাকে আঘাত করতে হবে, না হ'লে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে পতিত হব।

—কালো সওয়ার আজ সন্ধ্যায় উজ্জয়িনীর রাজকুমারীকে রক্ষা করতে গিয়ে হূনদের হাতে ধরা পড়েছেন, তাঁকে রক্ষা করতে হ'লে এখনই গোবিন্দগড় আক্রমণ করতে হবে। ওদের সঙ্গে এই আমাদের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হয় মিহিরকুল আজ ধ্বংস হবে, না হয় হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের তরে লুপ্ত হয়ে যাবে হিন্দুর মন থেকে। আজ আমাদের হয় উত্থান, না হয় পতন। আজ আমাদের প্রত্যেকের বাহুর উপর হিন্দুস্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ভর করছে। আজ আমাদের মৃত্যুপণ করে লড়তে হবে। দেশের জন্য, জাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য, তোমরা মৃত্যু বরণ করে নিতে পারবে?

—পারব।

—এখনও অবসর আছে, এখনও ভেবে দেখ। তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, যে জাতির চেয়ে নিজেকে বেশী মূল্যবান্ মনে করে, যে মাতৃভূমির চেয়ে নিজের প্রাণকে বেশী ভালবাসে, স্বাধীনতার চেয়ে আত্মরক্ষাই যার কাছে-বেশী কাম্য, তেমন আত্মকেন্দ্রী স্বার্থপর কেউ থাকলে এখনও ফিরে যাও, একের দুর্ব্বলতায় আমাদের সকলের মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিও না।

—কেউ এতটুকু নড়্‌ল না।

মুহূর্ত্ত কয় চুপ করে থেকে সকলের মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে ভৈরব বল্‌লেন—উত্তম! তা-হ'লে এবার ত্রিকালজ্ঞ দেবাদিদেব মহাকালের সামনে তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, জন্মভূমিকে কলুষমুক্ত না করে তোমরা আর গৃহে ফিরবে না।

—প্রতিজ্ঞা করলাম!—সমবেত উদাত্ত স্বরে পার্ব্বত্যভূমি প্রতিধ্বনিত হ'ল।

—বেশ;—ভৈরব বল্‌লেন,—কালো সওয়ার আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তার কর্ত্তব্যভার সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কারুষ রাজকুমার ধর্ম্মদেবের উপর। গোবিন্দগড়ের প্রত্যেকখানি ইটের সঙ্গে ধর্ম্মদেবের পরিচয় আছে, তা ছাড়া হূনদেব সঙ্গে বার কয়েক যুদ্ধক্ষেত্রে তার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। তার নেতৃত্বে এবার তোমরা জয়যুক্ত হও মহাকালের কাছে এইটুকুই আমি কামনা করি। ইতিমধ্যে তোমরা নিজেকে ও নিজ নিজ অশ্বকে উপযুক্ত অস্ত্রে ও বর্ম্মে সজ্জিত করে নাও! নরোত্তম, এদেরকে অস্ত্রাগারে নিয়ে যাও—

—আমাকেও এদের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিন আচার্য্য!—নরোত্তম সামনে এসে দাঁড়াল।

—তুমি যাবে! এই বয়সে?

—পুণ্য কাজে সকলের সমান অধিকার আচার্য্যদেব!

—বেশ, যাও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চার-পাঁচ হাজার তরুণ ঘোড়সওয়ার মৃত্যুপণ করে বাহির হয়ে পড়্‌ল গোবিন্দগড়ের উদ্দেশে। তাদের পথ দেখিয়ে চল্‌ল কালো ঘোড়ার পিঠে কালো বর্ম্ম পরা কারুষ রাজকুমার ধর্ম্মদেব।

যতক্ষণ তাদের দেখা যায় ভৈরব তাকিয়ে রইলেন তাদের পানে, তার পর মন্থর পদে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গোবিন্দগড়।

বিজেতার দর্পিত স্পর্শ প্রাসাদটীকে বিপর্য্যস্ত করেছে, তার শ্রীহীনতাকে সুদর্শনা করে



তোলার জন্য কোথাও কোন ব্যাকুলতা নেই, হূন-প্রধানদের অস্থায়ী কেন্দ্র হয়েছে কক্ষে কক্ষে।

ঘরে ঘরে দীপাধারে মশাল জ্বলছে কিন্তু সে আলোর আশেপাশে মানুষের ছায়া পড়ে নি, সকলে সমবেত হয়েছে সভা-ঘরে, কালো সওয়ারের সত্যিকারের রূপটা দেখবার জন্য।

যায় নি শুধু কন্যাকুমারী, তার মনটা ভালো নেই, ঘরে বসে আকাশ-পাতাল কত কি সে ভাবছে।

ভাবতে ভাবতে কোন এক সময় সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এমন সময় যেন কার পদশব্দে তার তন্দ্রা টুটে গেল, চোখ মেলেই সে চমকে উঠ্‌ল। জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী তার সামনে,—চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তারই মুখের উপর।

কন্যাকুমারীর মুখ থেকে আর কথা সরল না, রাজ্যের ভয় তাকে পেয়ে বসল। তান্ত্রিকদের বহু ভয়াবহ অলৌকিক কাহিনী সে শুনেছে, এখন চোখের সামনে তেমনি এক তান্ত্রিককে দেখে সেই সব কাহিনীর যত ভীষণতা তার অন্তরকে কাঁপিয়ে তুল্‌ল। ভয়ে চীৎকার করার শক্তিটুকুও তার লোপ পেল।

(ক্রমশঃ)

## পশুপাখীর ভাষা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

আমাদের 'ছুট্‌কী' ওরফে 'অপা' আজকাল বেশ বোলচাল শিখিয়াছে। মনের ভাব বুঝাইতে হইলে এত দিন পর্য্যন্ত তাকে শুধু কান্না বা হাসির সাহায্যই লইতে হইত; কিন্তু সে দিন আর নাই, এখন সে বড় হইয়াছে, বয়স প্রায় দেড় বছর পূর্ণ হইতে চলিল, এখন সে দিব্যি এক অক্ষরের কঠিন কঠিন শব্দ আওড়াইয়া দিদি হইতে সুরু করিয়া দাদুকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। আর ছুট্‌কীর দিদি ঝর্ণা তো একটি বিচ্ছু মেয়ে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানখানি যেন তাঁর ঠোঁটের আগায়। বিশ্বাস না হয় ডাক, এখনই আসিয়া একখানি প্রমাণ মাপের "স্পীচ" ঝাড়িয়া যাইবে।

মানুষ নানা দিক্ দিয়া ভগবানের কাছে যত রকম আস্কারা পাইয়াছে তার মধ্যে বক্ বক্ করিবার ক্ষমতাটা নিশ্চয়ই একটা বড় রকম পাওয়া। আর অন্য

জীবের বেলা দেখ। বেশী দূর যাইতে হইবে না—ছুটকীদের বাড়ীর পাশেই তো চিড়িয়াখানা, সেখানকার কচ্ছপ মশাইএর কথাই ধর না কেন। বয়সের গাছপাথর নাই—কম করিয়া দেড়শ'টি বছর পার হইয়া গেল অথচ আজ পর্য্যন্ত কেউ তার মুখ দিয়া তেমন একটা উঁচু গলার রা-ও শুনিতে পাইল না। বাঘ-সিঙ্গির দল যদিও গর্জ্জনে দড়, কিন্তু ঐ এক ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ, মানুষের মত দু'দণ্ড বসিয়া দু'টা সুখদুঃখের গল্প করিবার মুরোদ কি তাঁদেরই আছে? রাম বল।

কিন্তু সত্যি কি তাই? মানুষ ছাড়া অন্য সব পশুপাখীদের কি ভাষা বলিয়া কিছু নাই? কোকিলের গানে আমরা মুগ্ধ হই, কাকের ডাকে গা জ্বালা করে। গরু-ঘোড়া-গাধা-কুকুর—চীৎকারে ইহাদের কেহই কম যান না। ইহাদের মুখনিঃসৃত ঐ সব দুর্ব্বোধ্য শব্দগুলি কি উহাদের ভাষা নয়?

কর্কশকণ্ঠ কাকাতুয়া
মানুষের ভাষা নকল করিতেও ইঁহারা সুপটু।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা এই ব্যাপারটা লইয়া অনেক দিন ধরিয়াই মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। তাঁরা বলেন—হ্যাঁ, পশু-পাখীরও ভাষা আছে বই কি, তবে তা মানুষের ভাষার তুলনায় একেবারেই অন্য ধরণের। তাদের ভাষায় কেবল মনের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাব—যেমন ভয়, আনন্দ, স্নেহ, ক্ষুধা এই সবই বুঝান যায়। কোন নামের বালাই তার মধ্যে নাই। এক-একটি জানোয়ারের ভাষায় শব্দসম্ভারও তাই খুব কম—৪।৫টি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় জোর ২০।২৫টি শব্দলইয়া সে ভাষা তৈরী। কেমন সহজ ব্যাপার বল তো!



টম্‌সন্ শেটন্ নামে আমেরিকার একজন বড় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ জন্তু-জানোয়ারের ভাষা লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইতর প্রাণীদের ভাষা শুধু মুখের শব্দেই প্রকাশ পায় না, আরও নানা ভাবে আকারে ইঙ্গিতে তারা মনের ভাব ব্যক্ত করে, সেগুলিকেও ভাষা বলিয়া ধরিতে হইবে বই কি। অনেক জানোয়ার গায়ের গন্ধ ছড়াইয়া জাতভাইদের সঙ্কেত করে, কেউ বা চোখের দৃষ্টিতে ইঙ্গিত করে, কেউ বা পা দিয়া শব্দ করে, কেউ বা গায়ে গা ঠেকাইয়া আলাপ করে। খরগোস ভয় পাইলে পিছনের পা ঠুকিয়া অন্য খরগোসদের সাবধান করে এ বোধ হয় অনেকেই জান। আমেরিকায় এক রকম হরিণ আছে, তারা ৩।৪ রকম শব্দ করিতে পারে। বাচ্চাদের ডাকিবার সময় আস্তে আস্তে ডাকে, আনন্দের সময় তোলে উচ্চরব, কিন্তু ভয় পাইলে শীষ দিতে থাকে।

পণ্ডিতেরা বলেন, অনেক জানোয়ারের—বিশেষতঃ অনেক কীটপতঙ্গের শব্দ করিবার ক্ষমতাই নাই। থাকিলেও কেবল মাত্র পুরুষরাই শব্দ করিতে পারে, স্ত্রী-জাতিরা একেবারেই বোবা। যাঁদের স্ত্রীরা কিঞ্চিৎ মুখরা তাঁদের হয়তো বিধির এ বিধান খুব লোভনীয় মনে হইতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলা এ বিধান থাকিলে কি অসুবিধাটাই না হইত! কীটপতঙ্গদের কিন্তু ব্যাপারটা বেমালুম সহিয়া গিয়াছে। কারণ শব্দ করিবার প্রয়োজনই তাদের অনেকের হয় না, স্পর্শ দিয়াই তারা মনের কথা জানাইতে পারে। ভাস্‌মান্ নামে একজন কীটতত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে খুব গবেষণা করিয়াছেন। পিঁপড়েদের ভাষা লইয়া তিনি এত চর্চ্চা করিয়াছেন যে সে ভাষার একটি অভিধান তৈরী করিতেও তাঁর কষ্ট হয় নাই। অবশ্য সে অভিধান তোমাদের চেম্বার্স্ বা সুবল মিত্রের অভিধানের মত বিরাট্-কলেবর নয়, অতি সামান্য তার আয়তন। যেমন ধর একটি পিঁপড়ে যখন আর একটির মাথায় মাথা ঠেকায় তখন বুঝিতে হইবে "আমার সঙ্গে এস।" যদি মাথায় না ঠেকাইয়া শরীরের মধ্য ভাগে মাথা ঠেকায় তবে বুঝিতে হইবে, "ভারী মালটা টেনে নিতে হবে, আমায় সাহায্য কর," ইত্যাদি। ফন্ ফ্রিশ্ নামে আর এক বৈজ্ঞানিক এমনি ধারা মৌমাছির ভাষা লইয়াও গবেষণা করিয়াছেন।

আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্‌এর মিউজিয়ামে হাওয়ার্ড হিল্ নামে একজন

পক্ষিতত্ত্ববিদ্ আছেন। পাখীর ভাষা লইয়া তিনি অনেক চর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁর মতে পাখীদের সাধারণতঃ চার রকম শব্দ করিতে দেখা যায়। বিপদ্ আসিলে এক রকম শব্দ, ক্ষুধা পাইলে আর এক রকম ; পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য এক রকম, আবার দূর পথে যাত্রা সুরু করিবার জন্য ডাকিবার সময় ( বিশেষতঃ যে সব পাখী দলবদ্ধ হইয়া ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় দেশত্যাগ করে তাদের বেলায় ) আর এক রকম। কোন কোন পাখী আবার অন্যের শব্দ নকল করিতে পারে। চন্দনা, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতির এ গুণ তো তোমরা নিজেরাই দেখিয়াছ। তবে শব্দ নকল করিতে পারে বলিয়াই যেনমনে করিও না যে তারা সব সময় সে শব্দের অর্থও বোঝে।

মানুষের সঙ্গে চেহারায় এবং বুদ্ধিতে সব চেয়ে কাছাকাছি হইতেছে বানর। বানরদের মধ্যে আবার কোন কোন জাত—যেমন ওরাং ওটান, শিম্পাঞ্জী—এরা একটু বেশী অগ্রসর। কাজেই এদের ভাষাও অনেকটা মানুষের মত হইবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন মানুষ ও বানরের স্বরযন্ত্রও অনেকটা এক ধরণের।

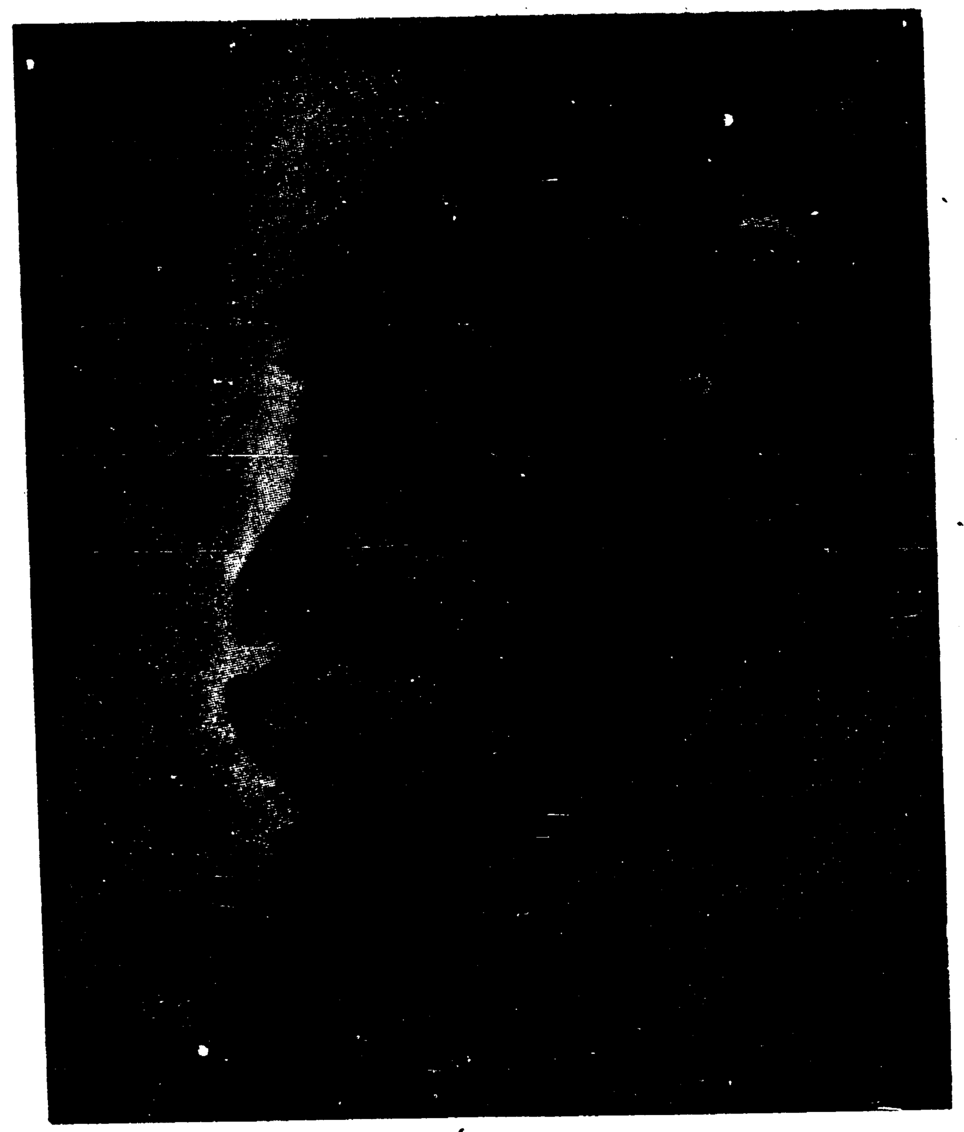

শিম্পাঞ্জী

জন্তুজানোয়ারের মধ্যে ভাষাগৌরবে ইঁহাদের স্থান মানুষের নীচেই।

বানরের ভাষা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ডাক্তার গার্ণারের নাম আগে করিতে হয়। জীবনের দীর্ঘ চল্লিশটি বছর ইনি বানরের ভাষা চর্চ্চা করিয়া কাটাইয়াছেন।



গার্ণার সাহেব আমেরিকার লোক। একদিন তিনি চিড়িয়াখানায় গিয়া লক্ষ্য করিলেন, একটা বড় বানর পাশের খাঁচায় একদল ছোট বানরের উদ্দেশে নানা রকম হাঁকডাক করিতেছে আর ছোট বানরগুলি ভয়ে প্রায় কেঁচো বনিয়া গিয়াছে। কয়েক দিন পরে তিনি আবার দেখিলেন সেই বড় বানরটাই কেমন এক রকম নতুন ধরণের শব্দ করিতেছে, শুনিয়া ছোট বানরের দল ভারী খুসী। দেখিয়া গার্ণার সাহেবের মনে হইল, বাঃ, এদের তো দিব্যি ভাষা আছে দেখিতেছি ! দাঁড়াও, এ ভাষা শিখিতে হইবে।

গার্ণার সাহেব তখন বানরের ভাষা শিখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁর কথা মত চিড়িয়াখানায় পৃথক্ পৃথক্ খাঁচায় বানরদের আলাদা আলাদা করিয়া রাখা হইল। তার পর নানা রকম অবস্থায় তারা যে সব হাঁকডাক ছাড়িতে লাগিল গ্রামোফোনের রেকর্ডে সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধরা হইল। তার পর সেই রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজাইয়া অন্যান্য খাঁচার অপর বানরদের শোনান হইতে লাগিল, এবং কলে জাতভাইদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তারা কি করে তাহাও লক্ষ্য করা হইতে লাগিল। শুধু লক্ষ্য করা নয়, তাদের স্বরও আবার রেকর্ডে ধরিয়া প্রথম দলের বানরগুলিকে শোনান হইতে লাগিল। এইভাবে গার্ণার সাহেব বানরের বিভিন্ন শব্দ—ভয়-পাওয়া শব্দ, আনন্দের শব্দ ইত্যাদি শিখিয়া ফেলিলেন।

শুধু চিড়িয়াখানায় বসিয়াই গার্ণার সাহেব ক্ষান্ত রহিলেন না, বানরের ভাষা ভাল করিয়া শিখিবার জন্য তিনি সুদূর আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে গিয়া হাজির হইলেন—এবং এক-আধ দিন নয়, দীর্ঘ সাতাশ বছর সেই বিপদ্সঙ্কুল অরণ্যে কাটাইয়া বিভিন্ন জাতের বানরের ভাষা আয়ত্তের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি অদ্ভুত সাধনা বল দেখি !

গার্ণার সাহেবের মতে, এক জাতের বানর অপর জাতের বানরের ভাষা অল্পই বুঝিতে পারে—ঠিক যেমন এক দেশের মানুষ অপর দেশের মানুষের ভাষা বোঝে না। তবে বানরদের ভাষায় শব্দের সংখ্যা খুবই কম—বড় জোর ২০ কি ২৫। এক একটি শব্দে এক একটি মনের ভাব বুঝায়, আমাদের মত শব্দরূপ, ধাতুরূপ বা ব্যাকরণের বালাই তাদের নাই। গার্ণার সাহেব নিজেও বানরের ভাষায় কথা বলা অভ্যাস করিতে ছাড়েন নাই, তবে কিনা 'জাবান সে নেহি আতা'—জিহ্বার

আড়ষ্টতা যায় না। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম তখন আমাদের একজন ইংরাজ অধ্যাপক প্রায়ই ক্লাসের পাঠ্য বিষয় না পড়াইয়া আমাদের ইংরাজী উচ্চারণ শিখাইতেন। তিনি বলিতেন, "ঐ তো মজা, বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালী বেশ ইংরেজী বলে, কিন্তু ইংরেজের পাল্লায় পড়লেই তার জারিজুরি ধরা পড়ে। আমি যখন ফ্রেঞ্চ শিখতাম আমারও ঠিক অমনি হ'ত, ইংরেজদের সঙ্গে চমৎকার ফ্রেঞ্চ বলতাম কিন্তু ফরাসী বন্ধুদের সঙ্গে বলতে গেলেই তারা উচ্চারণের ভুল ধরে হাসত।" উক্ত অধ্যাপক মহাশয় অল্পস্বল্প বাংলা জানিতেন। একদিন একটি ছেলে সুর করিয়া রিডিং পড়ায় কহিলেন, "গান করিটেশো কেনো ?" তার পর হাসিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "ঠিক আমার ফরাসীদের কাছে ফ্রেঞ্চ বলার মত হ'ল, নয় কি ?"

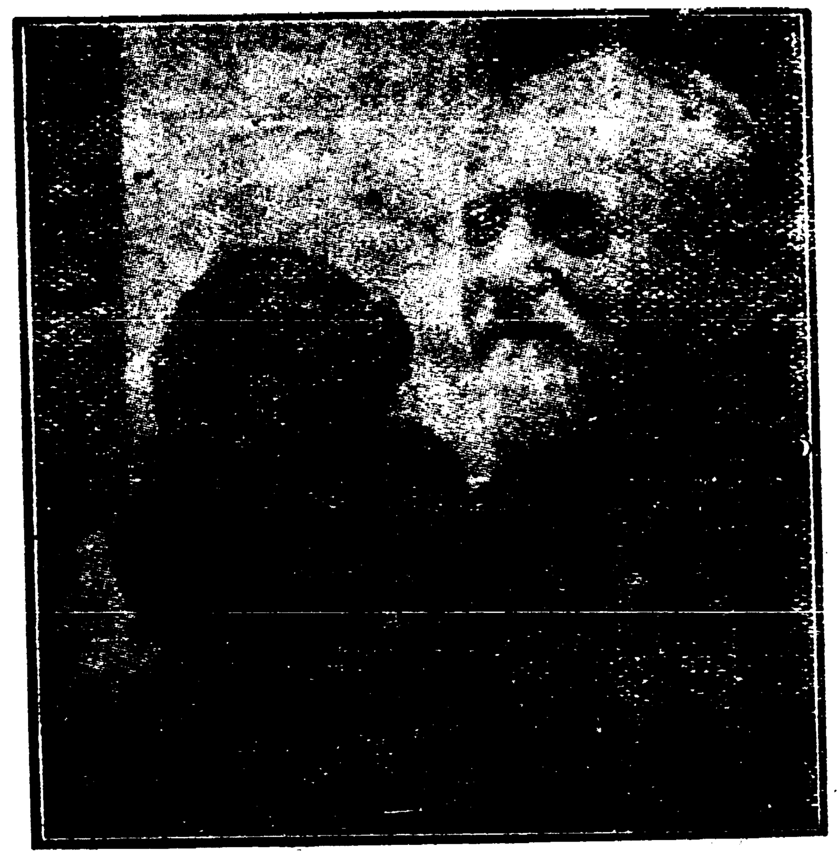

মানুষের সব চেয়ে কাছাকাছি জীব গরিলা-শিশু। ইহার ভাষা শিখিবার জন্য পালককে বহু তোয়াজ করিতে হয়।

গার্নার সাহেবের মুখে বানরের ভাষা শুনিয়া বানরেরাও হয়তো ঐ রকম হাসিত, তবে ভাবার্থ বুঝিত এবং 'অল্পবুদ্ধি দু'-পেয়ের কাণ্ড' ভাবিয়া হয়তো মনে মনে ক্ষমাও করিত।

যাক্, এইবার গার্নার সাহেবের তৈরী শিম্পাঞ্জী-ভাষার অভিধান হইতে কয়েকটি নমুনা তুলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যথা : গাক্ গাক্ = ক্ষিদে পেয়েছে, ও-আ ও-আ = খুসী হয়েছি, উ-উ-উ = দাও না ভাই !, উই = ও কি ?, উপ্ = তোরা কোথায় গেলি ?, ক্রি-ই = কোথায় ?, খিউই = সাবধান, খিউই-হুপ্ = পালাও, ইউপ্ = এখানে, চু-উক্ = শোন, কা-কা-কা = বড় কষ্ট।

---

# হরিবিলাসের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, বি.এস্-সি

যমে-মানুষে টানাটানি যাকে বলে হরিবিলাসের জীবনটা নিয়ে স্রেফ তাই হয়ে গেল। যম হেরে যাওয়ার ফলে হরিবিলাস কোনও রকম করে সেরে উঠ্‌ল সেবার দারুণ অসুখ থেকে।

ডাক্তার বল্‌লেন—অসুখ সার্‌ল বটে কিন্তু শরীরটাও যে সারান দরকার, নইলে সংসার থেকে সরে পড়তেও হয়ত হ'তে পারে—অসুখ সারা সত্বেও। ডাক্তার বিধান দিলেন—কলকাতার বাইরে কোথাও একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে, এবং, গেলেই শুধু হবে না, বেশ পুষ্টিকর খাদ্যেরও প্রয়োজন কিছুদিন। ডাক্তার ত' বিধান দিয়েই নিশ্চিন্ত—কিন্তু বিধির বিধান যে ঠিক তার উল্‌টো !

হরিবিলাস মনে মনে শুধু ভাবে—কত লোক ত' বড়লোক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের স্কন্ধে ভর করে কত জায়গা ঘুরে আসে, কি রকম 'চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়'র বন্দোবস্ত করে নেয় দিনের পর দিন। তার ভাগ্যে কি একজনও ঐ রকম বড়লোক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—!!

হরিবিলাস মনে মনে একবার দিগ্‌ভ্রমণ করে আসে। উঁহু, একজনও সে রকম আত্মীয় বা বন্ধুর কথা মনে পড়ে না যার কাঁধে ভর ক'রে গিয়ে শরীরটা তার সারিয়ে নিয়ে আসতে পারে সে।

আত্মীয় বল্‌তে তার এক কালা খুড়ো আর এক বাতগ্রস্ত মেসো—তা এঁরা ত' হরিবিলাসের কাঁধে ভর করে হরিবিলাসকেই ভরাডুবি করবার মতলবে আছেন।

তবে ?

বন্ধুবান্ধব ?—ওরে বাবা ! হরিবিলাসের পকেট দু'টোকেই তারা চিরকাল নিজেদের পকেট মনে করে এসেছে আজ পর্য্যন্ত !—উঁহু, চল্‌ল না ! হরিবিলাস প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌ল সংসার থেকে সরে পড়বার জন্য। কোন উপায়ই নেই তা ছাড়া।

কিন্তু সরে পড়তে হ'ল না বোধ হয়।

সদয় হ'লেন বোধ হয় অদৃষ্ট দেবতা। কলেজের বড়লোক সহপাঠী প্রমথেশের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন ওর দেখা হয়ে গেল বহুদিন পরে—চৌরঙ্গীর মোড়ে।

হরিবিলাসের শরীরের অবস্থা দেখে এবং তার কাছ থেকে সব কিছু শুনে প্রমথেশের মাথায়

হঠাৎ পরোপকারের নেশা চেপে গেল। সে জিদ্ ধর্‌ল—হরিবিলাসকে যেতেই হবে তাদের সঙ্গে চেঞ্জে এবার। এই ত' দিন দশেক পরে তারা বাড়ীশুদ্ধ সবাই চলেছে এক পাহাড়ী দেশে হাওয়া বদ্‌লাতে।

হরিবিলাস ইতস্ততঃ করে বলে শুধু—"আমি একজন বাইরের লোক—"

প্রমথেশ তার সে কথায় বাধা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে বলে—"বাইরের লোক, তা কি হয়েছে? আমাদের বাড়ীর ও সব হাঙ্গামা নেই। আমার আরও তিন চারটী বন্ধু যাচ্ছে, তারাও ত' বাইরের লোক,—কোন অসুবিধা হবে না, যেতেই হবে আপনাকে—আমি আজকেই গিয়ে আমার মাকে আর আমার বোনেদের জানিয়ে দেব কিন্তু যে আমাদের কলেজের ফার্ষ্টবয় এবার আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন; খুব খুসী হবেন তাঁরা—"

হরিবিলাসকে রাজি করে প্রমথেশ বিদায় নিল সেদিন। হরিবিলাস বাড়ী এসে খানিকটা চুপ করে ভাব্‌ল বসে—এ সত্যি না স্বপ্ন! কতদিন আগে এক সঙ্গে পড়েছিল শুধু—হঠাৎ সেই সূত্রে আজ এতখানি আত্মীয়তা!—হবেও বা! বিধি যখন দেন তখন মাটী ফুঁড়েও দেন।

দশটা দিন কোথা দিয়ে যে হরিবিলাসের কেটে যেতে লাগ্‌ল তার ঠিক নেই। ও দিনরাত শুধু স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌ল—সুন্দর সুন্দর পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে দিনের পর দিন ওর শরীরের কি দ্রুত উন্নতি হচ্ছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'দিনের মধ্যে ওর ঐ রুগ্ন দেহ কি সুন্দরই না হয়ে উঠেছে! কল্পনায় ও ওর নিজের 'নব কলেবর' দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল প্রায়। ও ভাবল এখন ওর এই চেহারার একটা ফটো তুলে রাখলে কেমন হয়? চেঞ্জ থেকে ফিরে এসে আর একটা ফটো! ঘরে টাঙ্গান থাক্‌বে—দুটো ফটো পাশাপাশি, লেখা থাক্‌বে তলায়—'চেঞ্জের পূর্ব্বে এবং পরে।"

যাই হোক্—কল্পনা থেকে বাস্তবের দিন এসে গেল। হরিবিলাস সেদিন যাত্রা কর্‌ল প্রমথেশদের পাহাড়ী দেশের উদ্দেশে।

সকাল বেলা পৌঁছাল গিয়ে সে প্রমথেশদের বাড়ী। প্রমথেশ এসে অতি সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল হরিবিলাসকে, সুন্দর একটী ঘর দেখিয়ে দিল তাকে—সেইটাই তার থাক্‌বার জন্য ঠিক করা হয়েছে।

পাশের 'বাথরুম' থেকে বেশ করে হাতমুখ ধুয়ে এসে কাপড় বদ্‌লে হরিবিলাস বস্‌ল একটা জানালার ধারে। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, জানালা দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া আসছে, তার মাঝে সামান্য শীতের আমেজ। ওর মনটা এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠ্‌ল।

হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল কে যেন ওকে ডাকছে। তাকিয়ে দেখ্‌ল, বছর নয় দশের ছোট্ট একটী সুন্দর মেয়ে বল্‌ছে অতি মিষ্টি ক'রে—"আপনার ব্রেক্‌ফাষ্ট্ কি এখানে পাঠিয়ে দেবেন না আপনি ভিতরে আস্‌বেন? জিজ্ঞাসা করলেন বড়দিদি।"



হরিবিলাস প্রথমটায় যেন একটু গণ্ডগোলে পড়ে গেল। 'ব্রেক্ ফাষ্ট্—!' হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল, বল্‌লে, "ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই পাঠিয়ে দিতে বল।" মেয়েটী তৎক্ষণাৎ চলে গেল ছুটে বাড়ীর ভিতর।

একটী বেয়ারা এসে একটী ছোট্ট সুন্দর 'টিপয়' রেখে গেল। হরিবিলাস ভাব্‌ল—'ফাষ্ট'ই বটে—সমস্ত রাত্রি ট্রেনে কিছু খায় নি, ক্ষিধেয় প্রাণ গেল প্রায়। যাই হোক, ঐ টিপয়ের উপর এখনই ত আসছে ডিসভরা কত কি—

তার চিন্তা ভঙ্গ করে বেয়ারা নিয়ে এল 'ট্রে'তে করে এক পেয়ালা, চা এবং একটী ডিসে টোষ্ট এবং 'ওমলেট্'। টোষ্ট এবং ওমলেটের পরিমাণ দেখে হরিবিলাসের প্রথমটা একটু ধাঁধা লেগে গেল। পাঁউরুটীর একটী পাতলা 'স্লাইস'কে লম্বালম্বি চার ভাগ করে তার একভাগ দেওয়া হয়েছে, আর ওমলেটের আয়তন দু' আঙ্গুল লম্বা, দু' আঙ্গুল চওড়া। কি সর্ব্বনাশ! এতে যে ওর পেটের একটা কোণও ভরবে না। এরা কি সবাই এইটুকু করেই খায়!

হঠাৎ ওর খেয়াল হয়—কানের মধ্যে 'ব্রেক্ ফাষ্ট্' কথাটা বেজে ওঠে—ওর খেয়াল হয় ও ত' শুনেছিল 'ফাষ্ট্' 'ব্রেক্' করতে হ'লে অল্প জিনিষ খেয়েই করতে হয়—বেশী খাওয়া শরীরের পক্ষে নাকি ক্ষতিকর—মহা ক্ষতিকর। তাই হবে। ও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় তবু।

একটা নভেল নিয়ে বসে ও। পড়তে পড়তে ঘণ্টা দু'য়েক কেটে যায়—এর মধ্যে গুটীকতক ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরে গেছে, প্রমথেশ একবার এসে জেনে গেছে হরিবিলাসের কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা।

বেলা প্রায় এগারোটা বাজে।

সেই ছোট্ট মেয়েটী দূতরূপে আবার আসে, অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—"স্নানের যোগাড় করে দেবে কি?" হরিবিলাস নভেল রেখে লাফিয়ে ওঠে। বলে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!" স্নানের পরের বন্দোবস্তটার জন্য ওর দেহ মন একসঙ্গে লালায়িত হয়ে ওঠে।

স্নানের পরেই আহারের জন্য ওর ডাক আসে—এবার ডাক্‌তে আসেন প্রমথেশের সেজ বোন্ ললিতা।

হরিবিলাস অতি সন্ত্রস্তভাবেই ললিতার পিছু পিছু বাড়ীর ভিতরে আসে; এসে দেখে প্রকাণ্ড 'ডাইনিং রুম্'—তার মাঝে প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিল, তারই চারিদিকে চেয়ারে বসে প্রমথেশের মা ও বোনেরা, প্রমথেশ এবং তার কয়েকটী বন্ধু—আন্দাজে বুঝে নেয় ও।

যাই হোক্, প্রথমে টেবিলে খেতেই ওর মহা অসুবিধা, দ্বিতীয়তঃ পাঁচজনের মাঝে, বিশেষতঃ অন্য বাড়ীর মেয়েদের সামনে খাওয়া ওর পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। প্রমথেশের বোনেরা আবার, ও শুনেছিল, সব এম্.এ, বি.এ পাশ। মহা শঙ্কিত ও লজ্জিত হয়ে ও বস্‌ল ওর চেয়ারে।

ঠাকুর এসে ওর সামনে একটা পরিষ্কার থালা রেখে গেল।—রূপোর থালা, তার ধারে সূক্ষ্ম কাজ করা।

ও লজ্জায় মাথা নীচু করে বসে ছিল এতক্ষণ। সামনে থালাটার খানিক অংশ চোখে পড়তেই ওর ক্ষিধেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠ্‌ল। অপেক্ষায় রইল কখন ভাত নিয়ে আসবে।

কিন্তু কই, ভাত ত আসে না!···হঠাৎ কানে এল,—"খেতে বসুন হরিবিলাস বাবু!"

এ রসিকতার মানে কি ও ঠিক বুঝ্‌ল না, ভাত নেই অথচ খেতে বসতে হবে?—তার মানে?

ভাল ক'রে মুখ তুলে তাকাতেই ও দেখ্‌ল থালার এক কোণে বড় চামচের দু' চামচ আন্দাজ ভাত সাজান রয়েছে—ওর সেটা এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—সকলের পাতেই ঐ একই পরিমাণ ভাত দেওয়া হয়েছে। ও প্রথমটায় কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারল না—এ ক'টা ভাত দেওয়ার মানে কি? শেষটায় হঠাৎ ওর মনে বহুদিন আগের একটা স্মৃতি ভেসে উঠ্‌ল। শান্তিপুরে এক গোস্বামী-বাড়ী গিয়েছিল সে দু'দিনের জন্য। তাঁদের বাড়ীতে থালায় প্রথমে সামান্য দু'টো 'সাদা ভাত' দেওয়া হ'ত। ঠাকুরের প্রসাদ বুঝি সে ভাত ক'টী—প্রথমে সেই ভাত ক'টী মুখে দিয়ে তার পর অন্য সব খেতে হ'ত।

ও ভাব্‌লে—এও বোধ হয় সেই রকম, প্রমথেশের মা বোধ হয় পূজো-টুজো করেন—

কিন্তু ওর এ সমস্ত ধারণাই ভুল দেখল ও। কারণ ও শুন্‌তে পেল ওর পাশেই বেশ নম্রভাবে সামান্য কথা কাটাকাটি চলেছে। প্রমথেশের এক বন্ধু বল্‌ছে, অতি বিনম্র ভাবেই বল্‌ছে—"এতগুলি ভাত আমি খেতে পারব না ললিতা দেবী।"

প্রমথেশের বোন ললিতা একটু অনুযোগের স্বরেই বল্‌ছেন—"না না, এমন বেশী কিছু ভাত দেওয়া হয় নি। আপনি কাল আপত্তি করেছিলেন বলে আপনাকে আজ দেড় চামচ ভাত দিতে বলেছি।"

সে ভদ্রলোক একটু হেসে চুপ করে গেলেন।

প্রমথেশের মেজ বোন মিনতি হরিবিলাসের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন একটু হেসে—"হরিবিলাস বাবু, আপনি কিন্তু একটী ভাতও ফেল্‌তে পারবেন না—সমস্ত খেতে হবে কিন্তু!" চমৎকার অনুরোধ; হরিবিলাসের সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে ক্ষিধেয় এবং হতাশায়।

ঠাকুরের হাত থেকে ডালের ছোট্ট একটী কাচের বাটী নিয়ে ললিতা দেবী ডাল পরিবেশন করতে লাগ্‌লেন।

অনুরোধ এল একটী চেয়ার থেকে—"আমাকে ওন্‌লি হাফ্‌ স্পুন্‌ফুল্‌—আধ চামচে ডাল দেবেন।"



ললিতা দেবী বল্‌লেন—"এক চামচ দেব না?"

সেই চেয়ারই বল্‌লে একেবারে আঁতকে উঠে—"ওঃ, ইট্ ইজ্‌ টু মাচ্‌—অত বেশী খাওয়া কি সম্ভব?"

আর এক চেয়ার থেকে একটী মেয়ে বল্‌লেন—"ললিতা, আমাকে ডাল দিও না",—একটু থেমেই বল্‌লেন—"আচ্ছা দাও—কোয়ার্টার স্পুন্‌ফুল্‌"। ললিতা দেবী ডালের বাটী হাতে ঘুরে আস্‌ছেন হরিবিলাসের দিকে, হরিবিলাসের পাশের চেয়ার থেকে বল্‌লে প্রমথেশের একজন বন্ধু—"দেখুন ললিতা দেবী, আমাকে হাফ্‌ স্পুন্‌ফুল্‌ দেবেন—তবে টেব্‌ল স্পুন্‌ নয়, চায়ের চামচে—হাফ্‌ টী-স্পুন্‌ফুল্‌ দেবেন।"

হরিবিলাসের সংজ্ঞা লোপ পাবার যোগাড়। ও শুন্‌ল কে যেন জিজ্ঞাসা করেছ ওকে—"আপনাকে এক চামচ ডাল দিই?" ও বোধ হয় ঘাড় নাড়ল ডান দিকে। তার পর ওর কানে আসতে লাগল—কেউ বল্‌ছে, "দেখুন, আমাকে এক পিস্‌ ডাঁটা দেবেন—", কেউ বল্‌ছে—"কিছু যদি মনে না করেন তা হ'লে আমাকে হাফ্‌ পিস্‌—না না, কোয়ার্টার পিস্‌ মাছের ফ্রাই দেবেন।"···

হরিবিলাস অন্যের কথা অস্পষ্ট শুন্‌তে লাগল বটে কিন্তু নিজে যে কি বল্‌ল তা ওর নিজের কানেই ঢুক্‌ল না, আর কি যে খেল সে তাও নিজে জানতে পারল না।

মুখ ধুয়ে কোনও রকম করে নিজের ঘরে গিয়ে গায়ে একটা কাপড় দিয়ে শুয়ে পড়্‌ল; খানিকক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল কি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল তা বোঝা গেল না, তবে এইটুকু বোঝা গেল যে সে সজ্ঞানে নেই আর।

জ্ঞান তার ফিরে এল একেবারে বৈকাল চারটেয়—প্রমথেশের ডাকে; বল্‌ছে সে—"চলুন, চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। আপনি ত' আবার সাহিত্যিক লোক—খুব ভাল লাগ্‌বে আপনার; পাহাড়ের গা দিয়ে নদী বয়ে চলেছে দেখ্‌বেন চলুন।"

চা খেয়ে প্রমথেশের বোনেরা এবং ওর বন্ধুরা, প্রমথেশ, হরিবিলাস সকলেই বেড়াতে বার হ'ল। হরিবিলাসের পা দুটো যেন দুমড়ে আস্‌ছে। একটু পরেই ও ফিরতে চাইল।

প্রমথেশের একটী বন্ধু মৃদু বাধা দিয়ে বল্‌ল,—"না না, আর একটু হাঁটা যাক্। ও বেলা বড় বেশী 'হেভি' খাওয়া হয়েছে।"

হরিবিলাসের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল—মনে হ'ল ঐ লোকটার টুঁটি টিপে ধরে বলে শুধু—'সাবধান, সব জিনিষের একটা সীমা আছে তা জেন'—কিন্তু, কোনও রকমে নিজেকে সাম্‌লে নিল সে।

রাত্রেও খেতে বসে ঠিক সেই "হাফ্‌ টী-স্পুন্‌" আর "এক্ পিস্‌ না হাফ্‌ পিস্‌"-এর পালা চল্‌ল।

সমস্ত রাত্রি—সমস্ত রাত্রি ধরে হরিবিলাস ভাবলে—কি করা যায়! ক'মাস থাকব ব'লে এসেছি, অথচ একদিন থেকেই বা চলে যাই কি করে? বড় খারাপ দেখায় যে!

যাই হোক, আরও দু'দিন কাটল অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। সেদিন মনে হ'ল ওর যে ও আর বাঁচবে না। নিরুপায় হয়ে সন্ধ্যাবেলা সকলের অগোচরে বার হয়ে পড়ল সে যদি কোথাও একটা হোটেল বা খাবারের দোকান মেলে। বহু দূর গিয়ে ছোট একটা পরোটার দোকান মিলল; দোকান মিলল কিন্তু খাবার মিলল না।

দোকানী বললে—তিন বাবু সমস্ত পরোটা খেয়ে গেছেন। হরিবিলাস চমকে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে, "তিন বাবু? কি রকম দেখতে?"

দোকানী বর্ণনা দিলে; বললে দিন পনেরো হ'ল রোজ আসেন। হরিবিলাস গর্জ্জে উঠল নিজের মনেই—শয়তানের দল! এখানে গাদা গাদা পরোটা খেয়ে প্রমথেশের বোনেদের সামনে "হাফ পিস" চালান হয়! মনে মনে ভাবলে—দাঁড়াও, প্রমথেশের মাকে আর বোনেদের চুপি চুপি ডেকে নিয়ে এসে দেখাচ্ছি—ঐ ষণ্ডাগুলি "হাফ পিস, আর হাফ টী-স্পুনফুল খেয়ে বাঁচতে পারে না। ওঁরা স্ত্রীলোক, ওঁদের হয়ত অল্প খেলেই চলে, কিন্তু—

যাই হোক—সে সব ত পরে হবে। সে রাত্রে যে হরিবিলাসের মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে—ক্ষুধা রাক্ষসী ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করছে মনে হচ্ছে। রাত তখন প্রায় বারোটা। ও মরিয়া হয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে চলল খাবার ঘরের দিকে।

একটু খুট্ ক'রে শব্দ হতেই পাশের ঘর থেকে প্রমথেশের মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে? চোর না কি?" ওঁর বোধ হয় ধারণা যে চোর হ'লেও মিথ্যাবাদী না হ'তে পারে। হয়ত বলবে সে, "আজ্ঞে মা ঠাকরুণ, আমি চোরই বটে।" যাই হোক আর এগুনো উচিত নয়, হরিবিলাস আস্তে আস্তে ফিরে এল।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। নাঃ, এ ভাবে আর থাকা যায় না। প্রমথেশের মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছেন। হরিবিলাস আবার চলল খাবার ঘরের দিকে।

প্রায় পৌঁছেছে—এমন সময় হঠাৎ দূরে একটা টর্চ্চের আলো জ্বলে উঠল।

হরিবিলাস চমকে উঠল—তার পরেই সে তাড়াতাড়ি একটা দরজার আড়ালে গিয়ে লুকাল। সেখান থেকে টর্চ্চের আলোতে—অস্পষ্ট আলোতে দেখল সে,—প্রমথেশ এসে খাবার ঘরের খাবারের আলমারি খুলে, কি সব খেয়ে নিল তাড়াতাড়ি; তার পরে আলমারি বন্ধ ক'রে চলে গেল।

হরিবিলাস ভাবল—ও শয়তান, তুমিও! তা ত' হবেই, হাফ পিস খেয়ে কি বাবা ঐ চেহারা হয়!



দরজার পাশ থেকে বার হতে যাচ্ছে—এমন সময়ে শুনল চুড়ির শব্দ। আবার লুকাল দরজার পিছনে। এবার দেখল—প্রমথেশের তিনটী বোনই এলেন পর পর—এবং প্রমথেশ যা করে গেছে তাঁরাও তাই করলেন।

হরিবিলাসের সমস্ত রহস্য জল হয়ে গেল। তবে তখন ওর আর অন্য কিছু ভাববার সময় ছিল না; তাড়াতাড়ি দরজার পাশ থেকে বার হয়ে এসে খাবারের আলমারীর দরজা খুলল। কিন্তু, হায় অদৃষ্ট! সমস্ত ফাঁকা। ঠিক মাপ করাই ছিল বুঝি।

হরিবিলাস রাত্রিটা কোনও রকমে কাটিয়ে সকালে স্যুটকেসটী গুছিয়ে নিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিতে গেল। বললে—"বিশেষ দরকার পড়েছে একটা—"

সকলেই একবাক্যে বলে উঠলেন প্রায়—"সে কি! এর মধ্যেই চললেন কেন?"

প্রমথেশের মেজ বোন বললেন, "আপনার বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল?—"

হরিবিলাস একটু হেসে অতি বিনীত ভাবে বললে—"আজ্ঞে, না না, বরং একটু 'হেভি'—বেশীই খাওয়া হয়ে যাচ্ছিল—আচ্ছা নমস্কার।" বলেই সে বার হয়ে পড়ল।

গোটা কয়েক ষ্টেশন পরেই একটা ষ্টেশনে এসে দেখল—পরোটা আর আলুর দম বিক্রি করছে। হরিবিলাস হাঁকলে—"এই, দশঠো পরোটা আউর দশ পয়সাকা আলুর দম—"

কানে তখনও বাজছে—"হাফ স্পুনফুল—না না, কোয়াটার স্পুনফুল দেবেন আমাকে।"

---

## কিরঘিজ

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

'কিরঘিজ' কথাটা কেমন খটমট লাগছে, না? 'কিরঘিজ' বলতে বোঝায় 'ষ্টেপস্' অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। এই ষ্টেপস্ অঞ্চলটা হচ্ছে কাস্‌পিয়ান্ হ্রদের পাশে। এই অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি—ইংরেজীতে যাকে বলে "টেম্পারেট

গ্রাসল্যাণ্ড্"—তারই মধ্যে। এমনি ধরণের যায়গা পৃথিবীতে আরও অনেক আছে; যেমন—উত্তর আমেরিকার প্রেরী, দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাজ্, আফ্রিকার ফেল্ট, অষ্ট্রেলিয়ার ডাউনস্ ইত্যাদি।

গ্রীষ্মকালে এ দেশে বেশ বর্ষা হয় তাই খুব গরম হয় না। শীতকালে কিন্তু বরফ পড়ে। যেখানে খুব বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে ঘন তৃণভূমি দেখা যায়। যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে মরুভূমি পর্য্যন্ত দেখা যায়। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রচুর ফুল ফুটতে আরম্ভ করে। ভারবেনা, ভেচ্ ইত্যাদি কত রকমের ফুল।

এদের দেশে যদি তুমি কখনও বেড়াতে যাও তবে দেখবে এখানকার সব পশুই প্রায় বেঁটে। তবে সেগুলি বেশ তাড়াতাড়ি পোষ মানে। ব্যাক্‌ট্রিয় উট এক অদ্ভুত জীব। এরা আরবীয়া উটের চেয়ে বেঁটে আর এদের পাও অত সরু নয়। সব-চেয়ে মজার জিনিষ হচ্ছে এদের পিঠে দু'টো ক'রে কুঁজ। এখানে আর এক রকম মাংসভোজী জীব দেখা যায়—তার নাম মারমট। গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রেরী মুরগী প্রধান। তা ছাড়া গরু, ঘোড়া, উট, শূয়োর কিরঘিজরা এ সবও পোষে। তোমাদের মধ্যে অনেকের মোটর আছে, আবার কারুর বা সাইকেল আছে, কিন্তু এদের ও সব বালাই নেই; তবে এদের মতে ওর চেয়ে ঢের ভাল জিনিষ—ঘোড়া আর য়্যাক্ (Yak) আছে। য়্যাকের গায়ে খুব লোম এবং পিঠটা একটু উঁচু। গরম দেশে এরা থাক্‌তে পারে না।

কিরঘিজরা এই সব জীবজন্তুর কাছ থেকে প্রায় সব খাবার-দাবার, আসবাব-পত্র, এমন কি ঘরবাড়ী তৈরী করবার জন্য যে সব মাল-মশলা—সবই পায়।

কিরঘিজরা মোঙ্গোলিয় জাতের শাখা। এদের শরীরের আকার, দেহের গঠন অনেকটা চীনাদের মত। কোন কোন ভৌগোলিক এদের 'মোঙ্গোলিয় মেষপালক' (Mongolian Shepherd) এই নাম দিয়েছেন। এদের মাথার চুল সব খোঁচা খোঁচা আর মুখটা চেপ্টা। সে মুখে আবার অনেকগুলো রেখা। গায়ের রং হল্‌দে আর তামাটে মেশান বলা চলে। চীনাদের যেমন গালের হাড় উঁচু, তেমনি এদেরও।

একটি পরিবার অনেকগুলি দলে বিভক্ত হয়ে বাস করে। প্রত্যেক দলের কাজ হচ্ছে পশুপালন করা; পশুপালনই হচ্ছে এদের জীবিকা। গরম-কালে এরা



দলে দলে পাহাড়ের ওপর তাঁবু গেড়ে থাকে। শীতকালে ওসব যায়গায় বরফ পড়তে আরম্ভ করে, তাই তারা পালিয়ে এসে কোন নদীর ধারে—নয়ত কোন হ্রদের ধারে তাঁবু গাড়ে। কিছুদিন একটা যায়গায় থেকে গেলে ওরা ও যায়গাটাকে 'পচা' যায়গা বলে; কারণ তখন সেখানকার ঘাস সব ফুরিয়ে যায়। ঘাসই হচ্ছে ওদের জীবন; তাই ঘাস শেষ হয়ে গেলে ওরা অন্য কোথাও চলে যায়। এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বলে এদের 'যাযাবর' বলা হয়।

এদের পশুপালনের একটি মজার নিয়ম আছে। নতুন যায়গায় এসে তারা প্রথমে সেখানকার ঘাস ঘোড়াকে খেতে দেয়; তার পর সেই ঘাস দেয় গরু আর উটকে। সব শেষে সেই ঘাস পায় ছাগল আর ভেড়ার দল।

দলের লোক কমে গেলে এরা অন্য দলে গিয়ে মেশে, নয়ত স্থায়ী জীবন আরম্ভ করে। পূর্ব্বে এই ষ্টেপস্ দেশটা তৃণভূমি ছিল কিন্তু আজকাল রুষ সরকার সেখানে জমিতে সার দিয়ে ফসল জন্মাবার মত করে তুলেছেন। আর যে কিরঘিজরা সেখানে থাকত তাদের অনেককে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চীন-তুর্কীস্থানে।

আমাদের যেমন ভাত তেমনি এদের আসল খাদ্য হচ্ছে দুধ। গরম কালে তারা কেবল দুধ খায়। আর মজার কথা এই যে তারা গরুর দুধের চেয়ে ঘোড়ার আর উটের দুধই বেশী পছন্দ করে। এই দুধ থেকে তারা এক রকম দই তৈরী করে—তাকে বলে "কোমিস্"। তাদের এত জন্তু আছে শুনে তোমরা হয়তো ভাবছ, ওরা বোধ হয় খুব মাংস খায়, কিন্তু আসলে তা নয়। জীবহত্যাকে ওরা পাপ বলেই মনে করে। তবে শীতকালে যদি কোন খাবার না পাওয়া যায় তা হ'লে ঘোড়ার মাংস খায়। ভেড়ার মাংসও তারা পছন্দ করে। রুটি বা ভাতের বদলে এক রকম পায়েসও তারা খেয়ে থাকে। এদের পোষাক সব চামড়ার তৈরী। শার্ট উটের লোমের, টুপী তৈরী হয় উটের চামড়ায়। জুতো পরে সব হাঁটু অবধি লম্বা। পাথর আর সময় বিশেষে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে হয় বলে তার শুকতলাও খুব মোটা। মেয়েদেরও পোষাক অমনি, তবে মাথায় টুপী না পরে তারা জড়ায় রুমাল।

আগেই বলেছি এরা তাঁবুতে থাকে। এদের ভাষায় তাঁবুকে বলে য়ুর্ট। বাঁশ বা কাঠের তৈরী কাঠামোর ওপর মোটা চামড়া ফেলে এই তাঁবু তৈরী হয়।

কাঠ বা বাঁশগুলি সব ঘোড়ার চুলে একটার সঙ্গে আর একটা বাঁধা হয়। তাঁবুর মেঝেতে একটা মোটা চামড়া পাতা থাকে, তার ওপর থাকে বেশ সুন্দর একটা কার্পেট। এক একটা তাঁবু লম্বায় প্রায় ২৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়।

আমাদের থালা বাটি যেমন কাঁসার বা পিতলের বা এলুমিনিয়ামের, এদের তেমনি কাঠের বা চামড়ার। ভারী মজার, নয়?

কোন স্থান 'পচা' হয়ে গেলে স্ত্রীলোকেরা তাঁবু জড়িয়ে, আবশ্যকীয় আসবাব-পত্র বেঁধে নিয়ে চলে; পুরুষেরা জন্তুদের গলায় গলায় বেঁধে নেয়।

ঘোড়াকে গো-দেবতার মত এরা বলে 'অশ্ব-দেবতা'। ঘোড়ার মত কাজ করে আর একটা জন্তু, সেটি হচ্ছে 'য়্যাক্'।

শীতকালে কির্‌ঘিজরা নদীর ধারে তাঁবু গাড়ে। শীতের পর হঠাৎ যখন গরম পড়ে তখন অনেক জন্তু মরে যায়। পাহাড়ের ওপরও এরা এক রকম তাঁবু গাড়ে—তেমনি কাঠের কাঠামোর ওপর চামড়া ফেলে। তাকে বলে 'একোই'।

কিরঘিজদের প্রধান কাজ হচ্ছে পশুপালন। তবে এরা সুদূর আরবীয়দের সঙ্গে লোহার আর কাঠের ব্যবসাও করে আর কোরীয়া ও মান্‌চুকোর সঙ্গে করে চায়ের ব্যবসা। টাকা পয়সা নিয়ে এরা ব্যবসা করে না, করে জিনিষ বদল দিয়ে। ধর মান্‌চুকোর কোন লোকের কাছ থেকে চা নিল; তাকে দিল ভেড়া।

এদের দেশে একটা মজার খেলার চলন আছে। তাকে বলে বইগু। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক গোল হয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানে একটা মরা য়্যাক্ বা ঘোড়া ফেলে রাখা হয়। একজন সর্দ্দার ধরণের লোক শিষ দেয় আর অমনি সকলে সেই য়্যাক্ বা ঘোড়াকে নিতে চেষ্টা করে। যে আগে নিয়ে পালাতে পারে তার পেছনে অন্য সকলে ছুটে তার কাছ থেকে সেটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, আবার সে নিয়ে দৌড়ায়। এ খেলা চলে ঘোড়ার পিঠের ওপরে বসে বসে। এই সময় অনেক সময় ৩।৪ মাইল দৌড়তে হয়। এদের ঘোড়ার জিন নেই, রাশ নেই; তবে ভাব, কত ভাল সওয়ার এরা! ভাল ঘোড়সওয়ার বলে এদের পৃথিবী-যোড়া খ্যাতি। রুষ সরকার এই জাতের অনেক লোককে নিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করেছেন।

---

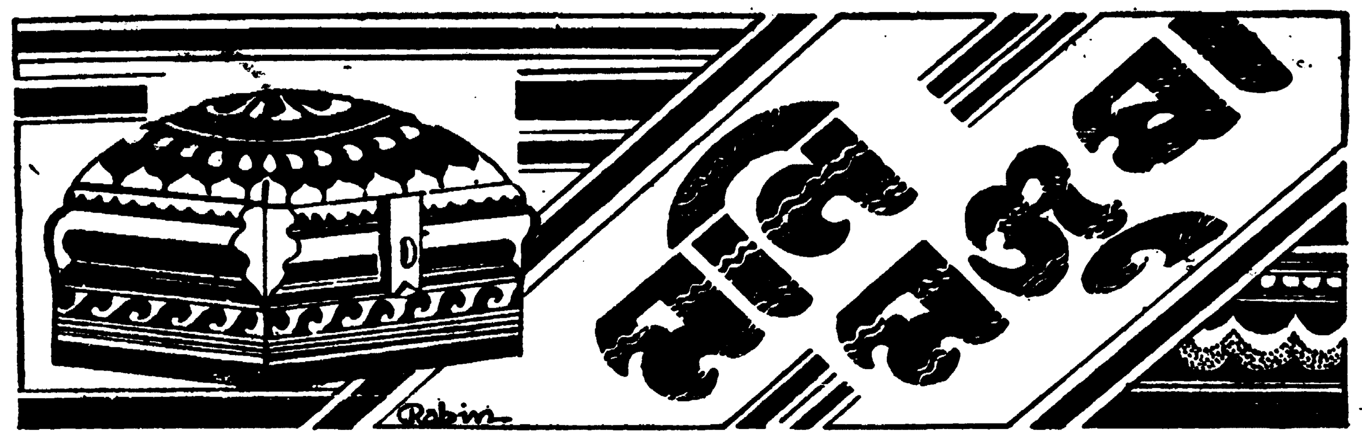

শ্রী————

## এনোক্ আর্ডেন

[য়্যাল্‌ফ্রেড্ টেনিসন্ (১৮০৯-১৮৯২) ইংল্যাণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও ভিক্টোরিয়ান যুগের রাজকবি। The Princess, Ulysses, In Memoriam, Enoch Arden ইত্যাদি কয়েকটি তাঁর বিখ্যাত কবিতা। টেনিসনের গল্প বলবার ক্ষমতা অসাধারণ। সেই সঙ্গে, তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সহজ-সুন্দর ছন্দের জন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এনোক্ আর্ডেন তাঁর সেই রকম একটি গল্প-কবিতা। তারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এখানে দিলাম। বড় হয়ে তোমরা আসল কবিতাটি পড়ে নিও।]

এক শ' বছর আগের কথা। সমুদ্রের তীরে ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট সহরে তিন পরিবারের তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে খেলাধূলোর মধ্যে দিয়ে এক সঙ্গে বড় হয়। য়্যানি লী ছিল এখানকার সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে। ফিলিপ রে মিলারের ছেলে। আর এনোক্ আর্ডেনের বাবা ছিলেন নাবিক। ছুটোছুটি, থালাধূলো করে দিন তাদের কেটে যায় অতি আনন্দে। কখনও তারা সমুদ্রের চরে গিয়ে বালি দিয়ে দুর্গ তৈরী করত; জোয়ারের জলে সেটা যখন ধুয়ে যেত তখন তাই দেখে তিন জনেই দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে নেচে উঠত। আবার কখনও ঘরকন্না খেলা নিয়ে তারা মেতে উঠত। কোনদিন ফিলিপ সাজত বাড়ীর কর্ত্তা, এনোক্ হ'ত অতিথি—য়্যানি নামত গিন্নীর ভূমিকায়। ছোট্ট গিন্নীকে নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য হ'ত—দু'জনেরই কর্ত্তা হবার সখ। এই মান-অভিমান অনেক সময় হাতাহাতিতে পরিণত হ'ত। এ-সব গোলমাল দেখে য়্যানি ভয় পেয়ে কেঁদে বল্‌ত—"তোমরা মারামারি ক'র না; আচ্ছা, আমি তোমাদের দু'জনেরই বউ হব।" এই ভাবে কয়েক বছর যায়।

* * *

ফিলিপ ও এনোক আস্তে আস্তে বড় হ'ল। এদিকে য়্যানিরও বিয়ের সময় হ'ল। ওরা দু'জনেই য়্যানিকে বিয়ে করতে চাইল। য়্যানির পছন্দ এনোক্‌কেই, এবং শেষ পর্য্যন্ত তারই

সঙ্গে য়্যানি'র বিয়ে হ'ল। সাত বছর কেটে গেল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে। এর পর এল দুটি ছেলেমেয়ে। এদের মানুষ করাই হ'ল এনোকের একমাত্র লক্ষ্য,—সেই আশা নিয়েই সে সংসারে মন দিল। প্রথমে মাছের ব্যবসা করে এনোক্ বেশ উন্নতি করেছিল। পরে জাহাজের নাবিকের কাছে যোগ দিয়েছিল। একদিন হঠাৎ জাহাজে এক দুর্ঘটনা ঘট্‌ল। পড়ে গিয়ে এনোক্ খুব বেশী রকম আঘাত পেয়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ল। এ-অবস্থায় সংসার তাদের অচল হ'ল। অভাব-অভিযোগ দেখা দিল; ছেলেমেয়েদের দুর্দ্দশা দেখে এনোক্ চোখে অন্ধকার দেখল। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ এনোকের উপর সদয় ছিলেন। তাঁরা তাকে এ-অবস্থায় দেখে জাহাজের মধ্যেই একটি চাকরি দিলেন। চাকরির তাগিদে এবার তাকে ঘরের মায়া ত্যাগ করতে হ'ল। সংসার চালাবার জন্য য়্যানিকে একটি মুদীর দোকান করে দিয়ে একদিন সজল চোখে বাড়ীর সবাইকার কাছ থেকে এনোক্ বিদায় নিল সমুদ্র-যাত্রার উদ্দেশে। যাবার আগে য়্যানি এনোকের সব চেয়ে প্রিয় ছোট ছেলেটির কোঁকড়া চুলের একগোছা কেটে তাকে উপহার দিল।

* * * *

য়্যানির দিন কোন রকমে চলে। কিছুদিন যেতেই ছোট ছেলেটি মারা গেল। সাংসারিক অভাবে ও শোকে জর্জ্জরিত হয়ে য়্যানির পক্ষে সংসার চালান ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ল। এনোকের ফিরবার এখনও অনেক বাকী। এদিকে ফিলিপ তাদের এই দুর্দ্দশার কথা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারল না। অতীতের সব কথা ভুলে য়্যানিকে আর্থিক সাহায্য করবার অনুরোধ জানাল। দুঃসময়ের এই সাহায্য য়্যানি গ্রহণ না করে পারল না। এখন থেকে ফিলিপের সাহায্যেই তাদের সংসার চলে। এইভাবে ফিলিপও এই পরিবারের সঙ্গে পুরানো ঘনিষ্ঠতা ফিরে পেল। এনোকের শূন্য স্থান ফিলিপ জুড়ে বসল, বুঝি বা সকলের অজ্ঞাতসারেই। ছেলেমেয়েদের কাছে এনোকের স্মৃতি আবছা হয়ে যেতে লাগল। এই ভাবে বছরের পর বছর ঘুরে গেল। দশটি বছর কেটে গেল। সকলে মনে করল, এনোক্ আর ইহজগতে নেই।

য়্যানিও প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে ফিলিপ তার মনের ইচ্ছা য়্যানিকে জানাল। সে জানত তার স্বামী আর নেই। তবুও ফিলিপকে সে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে বল্‌ল। সে বছরও কাটল। য়্যানি ভগবান্‌কে ডাকে, প্রার্থনা জানায় তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে সে এক অমঙ্গল ইঙ্গিত পেয়ে বুঝল, এনোক্ আর নেই। সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল দেখে ফিলিপের প্রস্তাবই সে মেনে নিল—তাকে সে বিয়ে করল। সেই সঙ্গে তাদের অবস্থাও ফিরে গেল। কিন্তু য়্যানির মনে সুখ নেই। সব সময়েই সে যেন কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পায়; একলা থাক্‌তে তার ভয় হয়। কেন এ-রকম হয় সে বুঝতে পারে না।



এবার দেখা যাক্, এনোকের কি হ'ল। প্রথম কিছুদিন দেশ-বিদেশ ঘুরে সময় তাঁর কাটে ভালই। হঠাৎ একদিন ঝড়ের মুখে পড়ে জাহাজখানা ডুবে গেল। মাত্র তিনটি প্রাণী রক্ষা পেল—তাদের মধ্যে একজন এনোক্। কোন রকমে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তারা এক দ্বীপে এসে উপস্থিত হ'ল—জনমানবশূন্য সে জায়গা। জীবন-ধারণের পক্ষে ফলমূল ছিল সেখানে অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু সেখানে দেখা যায় না মানুষের সুন্দর মুখ—না শোনা যায় মানুষের কণ্ঠস্বর। এক গুহার মধ্যে তালগাছের পাতা দিয়ে ঘর বানিয়ে তারা বাস করতে লাগল। কিছুদিন না যেতেই এনোকের সঙ্গী দুটির মৃত্যু হ'ল, কিন্তু ভগবান্ তাকে নিলেন না। চারিদিকে সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন—এনোক্ চেয়ে থাকে দিগন্তহীন সমুদ্রের দিকে সুধীর প্রতীক্ষায়। কিন্তু ওকে তুলে নেওয়ার জন্য কোন জাহাজই গেল না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সে ভাবে তার দেশের সুখের দিনগুলির কথা। এখনও যেন মাঝে মাঝে গির্জ্জার ডিংডং ঘণ্টা শুন্‌তে পায়। এই ভাবে দিন যায়। * * *

একদিন সত্যিই একখানা জাহাজ এসে ঐ দ্বীপে নোঙর ফেল্‌ল। জাহাজের লোকেরা জল নিতে দ্বীপে নেমে দেখ্‌তে পেল কিম্ভূতকিমাকার এক মানুষ—সমস্ত মুখ তার দাড়িতে ঢাকা, লম্বা লম্বা চুল, রোদে পুড়ে রং তার মলিন ও শীর্ণ। এনোকের মুখে তার জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে তারা তাকে তুলে নিয়ে গেল।

* * * *

বহুদিন পর এনোক্ আবার তার জন্মভূমিতে ফিরে এল; কারো দিকে তাকাল না, কারো সঙ্গে কোন কথা বল্‌ল না, সোজা সে এগিয়ে চল্‌ল তার বাড়ীর দিকে। কিন্তু কার বাড়ী? তার নিজের কি কোন কালে বাড়ী ছিল? তবু সে এগিয়ে চল্‌ল। শেষে নিজের বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছল—যেখানে একদিন সে তার সুখের সংসার পেতেছিল। কিন্তু আজ সেখানে কারও সাড়া পেল না। "তবে তারা কি নেই? না—আমার কাছে নেই?" এই চিন্তায় তার মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। * * নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়ে মিরিয়াম লেন্ নামে জনৈকা বিধবার ঘরে গিয়ে সে আশ্রয় নিল। সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিঃশব্দে কিছুদিন কাটিয়ে দিল। মিরিয়াম অতি ভাল মানুষ। এনোক্‌কে নতুন লোক ভেবে সহরের সব ঘটনাই গল্পে গল্পে বলে। ফিলিপদের কথাও বাদ যায় না। এনোক্ চলে যাওয়ার পর য়্যানির দুর্দ্দশার কথা, কি ভাবে ফিলিপ তাদের সাহায্য করে য়্যানিকে শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করল—এ সবই গল্পচ্ছলে বল্‌ল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল হয়ে এনোক্ সে-সব কথা শুনে যেতে লাগল। কোন রকম মনের আবেগ বা অস্থিরতা তার ব্যবহারে বোঝা গেল না। মনে হ'ল এ যেন কার কথা কে বল্‌ছে! গল্পের শেষে মিরিয়াম মন্তব্য করল—"তার পর হতভাগ্য এনোক্ সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গেল।"...

...."ডলিয়ে গেল!...."

য়্যানির মুখখানা দেখ্‌বার জন্য তার প্রাণটা আকুল হয়ে উঠ্‌ল,—অতীতের সেই সুখ-স্মৃতির কথা মনে পড়ে তার চোখ সজল হয়ে উঠ্‌ল। "যদি তাদের একবার দেখে জানতে পারতাম যে তারা সুখেই আছে—" এই সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে একদিন সে ফিলিপের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। বাড়ীখানা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা; ভিতরে একটা "ইউ" গাছ। আস্তে আস্তে দেওয়াল বেয়ে উঠে এনোক্ দেখ্‌তে পেল ফিলিপের সাজান সংসার: দেখ্‌ল য়্যানিকে, তারই ছেলেমেয়েদের, তারই এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপকে: সকলের মুখই আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরা। এই সোনার সংসার তারই নিজের; কিন্তু এখানে আজ তার কোন অধিকারই নেই। শুধু অধিকার কেন, আজ যদি সে নিজের পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে চায়—তা হ'লে চোখের নিমিষে একটি পরিবারের সব সুখ-শান্তি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই আজ স্নেহের দাবীতে নিজের পরিচয় দিয়ে দাঁড়ান'র পথও বন্ধ। সমস্ত শরীর তার কাঁপতে লাগ্‌ল; ইচ্ছে হ'ল, চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। তাও সে পারল না, পাছে জানাজানি হয়ে যায়। অতি সাবধানে যে পথে এসেছিলে নিঃশব্দে সেই পথ দিয়ে চলে গেল। মনে মনে বলতে লাগল: "আর সহ্য করতে পারি না; কেন আমাকে তারা নিয়ে এসেছিল! হে ভগবান্, শক্তি দাও যেন আর কিছু দিন চুপ্ করে থাক্‌তে পারি, যেন তাদের সুখ-শান্তি নষ্ট না করি!" * * *

এখন থেকে তার সঙ্কল্প হ'ল য়্যানির কাছ থেকে দূরে থেকে, নিজের পরিচয় গোপন রেখে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। এইটুকু আশার আলো নিয়ে তাকে বাঁচতে হবে। তাই আজ তার মনে হ'ল সে একেবারে অসুখী নয়।

খেটে খেয়ে এনোকের দিন চলে। কিন্তু আশাহীন ভবিষ্যতের পানে চেয়ে কাজ করার মধ্যে প্রাণ কই? বাঁচবার আনন্দই বা কোথায়? বছর গড়িয়ে যায়। এনোকের শরীর ভেঙ্গে পড়্‌ল। অবসন্ন শরীর নিয়ে কাজ করবার সামর্থ্যও সে হারাতে লাগ্‌ল। এনোক্ বুঝল, তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই যাবার আগে মিরিয়ামকে আস্তে আস্তে তার জীবনের অতীত কাহিনী সব শুনিয়ে গেল, শেষে থেমে বল্‌ল—"আমিই সেই এনোক্। য়্যানিকে জানিও যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাদের সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানিয়েই সে গেছে।" এই বলে সে তার বুক পকেট থেকে এক গোছা কোঁকড়া চুল বার করে মিরিয়ামের হাতে দিয়ে বল্‌ল—"এটা তাকে দিও; সে কিছু সান্ত্বনা পেতে পারে। আর আমিই যে সেই এনোক্—এটা তারও পরিচয় হবে।" * * *

কয়েক দিন পর। এনোকের প্রায় শেষ অবস্থা। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। হঠাৎ বিকারের ঘোরে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ঐ যে পাল দেখা যায়, এবার আমি বেঁচে গেছি।" এই বলে অসাড় হয়ে এলিয়ে পড়ল—আর উঠ্‌ল না। * * *



একটি মহৎ তেজোদ্দীপ্ত প্রাণ নিভে গেল। জগতে এ-রকম মূল্যবান্ জীবন সত্যিই অতুলনীয়।

---

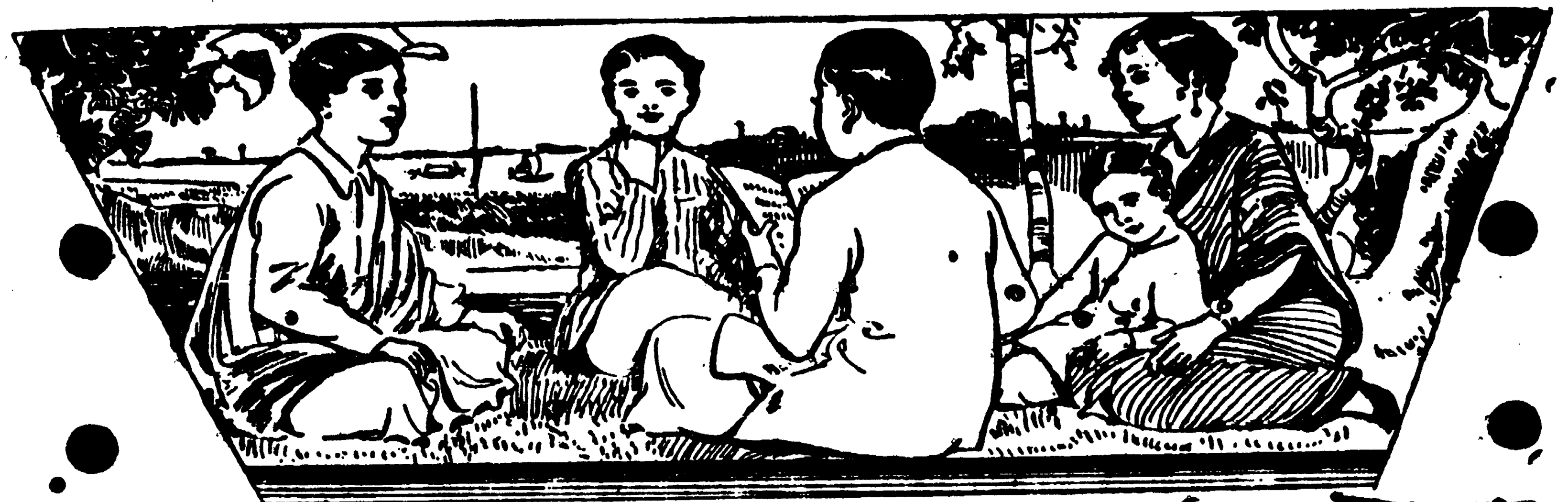

# ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

## বর্ষ-বিদায়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মাগিছে বিদায় পুরানো বর্ষ
মধু-বিহ্বলা চৈত্র রাতে,
বিগত কালের রোদন-হর্ষ
যায়—মুছে যায় তাহার সাথে।
কাল যারা ছিল মোদের ঘিরিয়া
রূপে, রসে আর গন্ধে ভরা,
ঝরাপাতা সাথে গিয়াছে ঝরিয়া
চৈতালী বায়ে আজিকে তারা।
প্রাচীন, তোমার বুকেতে লুকানো
রয়েছে অনেক গোপন কথা,
আশা-নিরাশার কাঁদন-মাখানো
স্মরণ-জাগানো অনেক ব্যথা।
উদাসী সন্ধ্যা সজল চক্ষে
বিদায়-রবির অস্তরাগে
বিরহ-বিধুর কোমল বক্ষে
প্রাচীন, তোমার বিদায় মাগে।
যাও হে অতীত, যাও হে প্রবীণ,
মহাকাল বুকে শান্তি লভ,
প্রাচীনের বুকে ঘুমায় নবীন
মরণের কোলে জীবন নব।

---

## তাসের খেলা

### শ্রীপুণ্যব্রত ঘোষ

রামধনুর ভাইবোনেরা, আজ তোমাদের একটা মজার খেলা শিখিয়ে দেব; তা দেখিয়ে খুব আনন্দ পাবে। খেলাটা এই রকম: একটা তাসকে সমান তিন ভাগে ভাঁজ কর। উল্টোদিকে মধ্যের ভাঁজটায় একটা দেশলাই বা একটা ফুল এঁটে দাও।

খেলাটা দেখাবার সময় তাসটা বাঁ হাতের তালুতে নিয়ে দাঁড়াবে। তার পর বলবে, "দেখুন, আমি এই তাসকে ফুলে পরিণত করব।" এই বলে তাড়াতাড়ি তাসটার দু'ভাঁজ মুড়ে ডান হাতের তালুতে নিয়ে আসবে। অমনি তাসের পরিবর্ত্তে সকলে দেখবে ফুল। এই খেলায় ম্যাজিকের মূলমন্ত্র একাগ্রতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও সাবধানতার কথা মনে রেখ।

---

চীনের মহানায়ক মার্শাল চ্যাং কাই শেক ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী মাদাম চ্যাং কাই শেক সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লী নগরীতে তাঁরা 'রাজপ্রতিনিধির আতিথ্য নেন'। এই উপলক্ষ্যে বাংলার রাজধানী কলকাতা এবং রবীন্দ্রনাথের বড় সাধের শান্তিনিকেতনেও তাঁদের শুভাগমন হয়েছিল। "প্রবীণ প্রাচীন চীন" ও সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগ থেকে যে মৈত্রীর আদানপ্রদান চলে এসেছে মার্শাল তার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। গান্ধীজি, জওহরলাল প্রভৃতি জনগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও তিনি দেখা করে গেছেন।

মাত্র ২১ বছর বয়সে সুগায়িকা কুমারী উমা বসু (হাসি) ইহলোক ছেড়ে গেছেন শুনে তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেদনা বোধ করবে। রামধনুতে তাঁর কথা তোমরা ইতিপূর্ব্বে পড়েছ। অতি অল্প বয়সে সঙ্গীতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়ের কাছে তাঁর সঙ্গীতসাধনা হয়েছিল। রেকর্ডে তাঁর গান হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে।

* * *

শীতের শেষে নানা জায়গায় খেলাধূলা, স্পোর্টস ইত্যাদি অনেক কিছু হয়ে গেল।



সম্প্রতি কলকাতায় একটি প্রতিযোগিতায় দু'জন খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কে. মেহ্‌তা ১০০০০ মিটার সাইকেল রেসে ও মিস্ রাওরকি ৮০ মিটার হাড্‌ল্ রেসে (মেয়েদের) ভারতীয় রেকর্ডের সমান করেছেন। কলকাতায় হকি লীগ্ চলছে। পোর্ট্ কমিশনার্স, কাষ্টাম্‌স্, মিলিটারী মেডিক্যাল্‌স, মোহনবাগান প্রভৃতি এ বছর ভাল খেলছে। ক্রিকেটে রণজী ট্রফীর ফাইনাল শেষ হ'ল। ফাইনালে গিয়েছিল বোম্বাই ও মহীশূর দল। মহীশূর সেমি-ফাইনালে বাংলা দলকে হারিয়েছিল কিন্তু এবারে বোম্বাই দলের কাছে ভীষণ ভাবে হেরে গেছে। তাদের প্রথম ইনিংস-এ হয় মাত্র ৬৮ রান্, ২য় ইনিংসএ ১৫৭। বোম্বাই দল শুধু প্রথম ইনিংসএই ৯ উইকেটে ৫০৬ রান্ তোলে। তাদের মধ্যে ইব্রাহিম্ সেঞ্চুরি করেছেন। মিস্ত্রী ৯৩, ও বিজয় মার্চেণ্ট ৬০ রান্ করেছেন। এর আগে পর পর দু'বার মহারাষ্ট্র দল রণজী ট্রফী পেয়েছিল, তার আগের বার পেয়েছিল বাংলা।

* * *

পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধে জাপান ক্রমাগতই এগিয়ে চলেছে সে খবর সকলেই জান। যে সিঙ্গাপুর একটা মস্ত বড় এবং অজেয় সামরিক ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল তাও জাপানের করতলগত হয়েছে। ফলে তাদের পক্ষে ভারতের দিকে আক্রমণ চালান অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়্‌ল। ওদিকে ব্রহ্মদেশেও তারা অনেক জায়গা নিয়ে নিয়েছে। ১১ই মার্চের খবর—রাজধানী রেঙ্গুনেও এখন জাপানীরা প্রবেশোন্মুখ।

* * *

এরোপ্লেন থেকে প্যারাসুট্ নিয়ে লাফিয়ে পড়বার সময় মানুষের কেমন অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্থার ষ্টার্নস নামে একজন আমেরিকান্ বৈমানিক এক অদ্ভুত পরীক্ষা দিয়েছেন। ৩০ হাজার ফুট্ অর্থাৎ এভারেষ্টের চেয়েও উঁচু জায়গা থেকে তিনি শূন্যে লাফিয়ে পড়েন। তাঁর শরীরের সঙ্গে আঁটা ছিল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মাপবার যন্ত্র, হৃদ্‌পিণ্ডের গতি মাপবার যন্ত্র, মাটীর লোকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য রেডিয়ো যন্ত্র, বৈদ্যুতিক উপায়ে শরীর গরম রাখবার যন্ত্র এবং মুখে ছিল অক্সিজেন-ভরা মুখস।

নীচে নামতে তাঁর সময় লেগেছিল প্রায় আট মিনিট। ঘণ্টায় ১৮০ মাইল বেগে তিনি নামতে থাকেন—এবং ২৮৫০০ ফুট—অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল নেমে আসবার পর তবে তাঁর প্যারাসুট্ খোলে।

---

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) মৎস্য (২) নল (৩) যখন পাতা হয় (৪) যখন তার সঙ্গে গাড় যোগ করা হয় (৫) টিকেট।

---

### উত্তরদাতাদের নাম

জয়ন্ত, স্বপ্না ও রত্না রায় ( বাঁকীপুর ) ; মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ) ; শীলা, অশোক, প্রভাত, অমিয়, অমিতাভ ( ভবানীপুর ) ; শিবু, মগন, মা, মামাবাবু ( জামসেদপুর ) ; রণেন্দ্র, রথীন্দ্র ও রণেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পট্টনায়ক ( রামচন্দ্রপুর ) ; শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ( কলিকাতা ) ; রাণী ব্যানার্জ্জি ( কৃষ্ণনগর ) ; শোভা, বিনয় ও নমিতা মজুমদার ( নিউদিল্লী ) ; নূরজাহান বেগম ( ঢাকা ) ; অরুন্ধতী বসু ( এলাহাবাদ ) ; অরুণ রায় ( লক্ষ্ণৌ ) ; কৃষ্ণা ও কল্পনা দাশগুপ্তা ( বরিশাল ) ।

---

## নূতন ধাঁধা

### শব্দ চৌকি

**সঙ্কেত** :—তিন অক্ষরের এমন তিনটি ক'রে শব্দ বার করতে হবে যা পাশাপাশি পড়লেও যা হয় উপর-নীচে পড়লেও তাই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি :

ধাঁধা :—(ক) ধাতুবিশেষ (খ) আহত (গ) নদী বিশেষ। উত্তর হবে :—

র জ ত
জ খ ম
ত ম সা

এইভাবে চেষ্টা কর :—

(১) (ক) যাকে আদর ক'রে চোখে রাখি (খ) রাত্রে যেখানে যাওয়া নিরাপদ নয় (গ) স্ত্রীলোক।

(২) (ক) ঠাণ্ডা (খ) ভাল গাইতে গেলে যা কাজে লাগে (গ) লোকে বলে সবই এর উপর নির্ভর করে।

(৩) (ক) আসছে মাসে যা দেখা দেবে (খ) ফলের বাগানে একে খোঁজ (গ) ডাক্তারখানায় একে পাবে।

(৪) (ক) সূর্য্য (খ) এখানে গেলে এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের দেখা মেলে (গ) এরা আকাশে থাকে—সম্প্রতি নাকি ছবির পর্দ্দায়ও এদের দেখা যায়।

(৫) (ক) দ্বিতীয় নয়ন (খ) শিকারী (গ) বধ।

( সবগুলির উত্তর পাঠাতে হবে। )

---


**বাহির হইয়াছে**

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

# হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি

গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্‌

**হুকা-কাশির**

বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট

দাম মাত্র আট আনা

---

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি. এল্ প্রণীত

## সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস

২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

## হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।

সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ॥৵০

## পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস

রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

## চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

## এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

( শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে )

বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

## নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প

সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা।


৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে

### উত্তরদাতাদের নাম

জয়ন্ত, স্বপ্না ও রত্না রায় ( বাঁকীপুর ); মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ); শীলা, অশোক, প্রভাত, অমিয়, অমিতাভ ( ভবানীপুর ); শিবু, মগন, মা, মামাবাবু ( জামসেদপুর ); রণেন্দ্র, রথীন্দ্র ও রণেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পট্টনায়ক ( রামচন্দ্রপুর ); শৈবাল চট্টোপাধ্যায় ( কলিকাতা ); রাণী ব্যানার্জ্জি ( কৃষ্ণনগর ); শোভা, বিনয় ও নমিতা মজুমদার ( নিউদিল্লী ); নূরজাহান বেগম ( ঢাকা ); অরুন্ধতী বসু ( এলাহাবাদ ); অরুণ রায় ( লক্ষ্ণৌ ); কৃষ্ণা ও কল্পনা দাশগুপ্তা ( বরিশাল )।

---

## নূতন ধাঁধা

### শব্দ চৌকি

**সঙ্কেত**:—তিন অক্ষরের এমন তিনটি ক'রে শব্দ বার করতে হবে যা পাশাপাশি পড়লেও যা হয় উপর-নীচে পড়লেও তাই হবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি :

ধাঁধা :—(ক) ধাতুবিশেষ (খ) আহত (গ) নদী বিশেষ। উত্তর হবে :—

র জ ত
জ খ ম
ত ম সা

এইভাবে চেষ্টা কর :—

(১) (ক) যাকে আদর ক'রে চোখে রাখি (খ) রাত্রে যেখানে যাওয়া নিরাপদ নয় (গ) স্ত্রীলোক।

(২) (ক) ঠাণ্ডা (খ) ভাল গাইতে গেলে যা কাজে লাগে (গ) লোকে বলে সবই এর উপর নির্ভর করে।

(৩) (ক) আসছে মাসে যা দেখা দেবে (খ) ফলের বাগানে একে খোঁজ (গ) ডাক্তারখানায় একে পাবে।

(৪) (ক) সূর্য্য (খ) এখানে গেলে এক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের দেখা মেলে (গ) এরা আকাশে থাকে—সম্প্রতি নাকি ছবির পর্দ্দায়ও এদের দেখা যায়।

(৫) (ক) দ্বিতীয় নয়ন (খ) শিকারী (গ) বধ।

( সবগুলির উত্তর পাঠাতে হবে। )

---

**বাহির হইয়াছে**

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

**হু কা কা শি র গ ল্প**

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।
আজই একখানি কিনিতে ভুলিও না।
সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট
দাম মাত্র আট আনা

শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় শিল্পী স্বর্গীয় রামধনু-সম্পাদক
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি. এল্ প্রণীত

**সোনার হরিণ**
হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

**হাস্য ও রহস্য**
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ৷৵০

**পদ্মরাগ** (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

**চা'য়ের ধোঁয়া** (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷০

**নূতন পুরাণ**
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৵০

**এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে**
( শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে )
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা।

৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C—1641.

# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটি ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

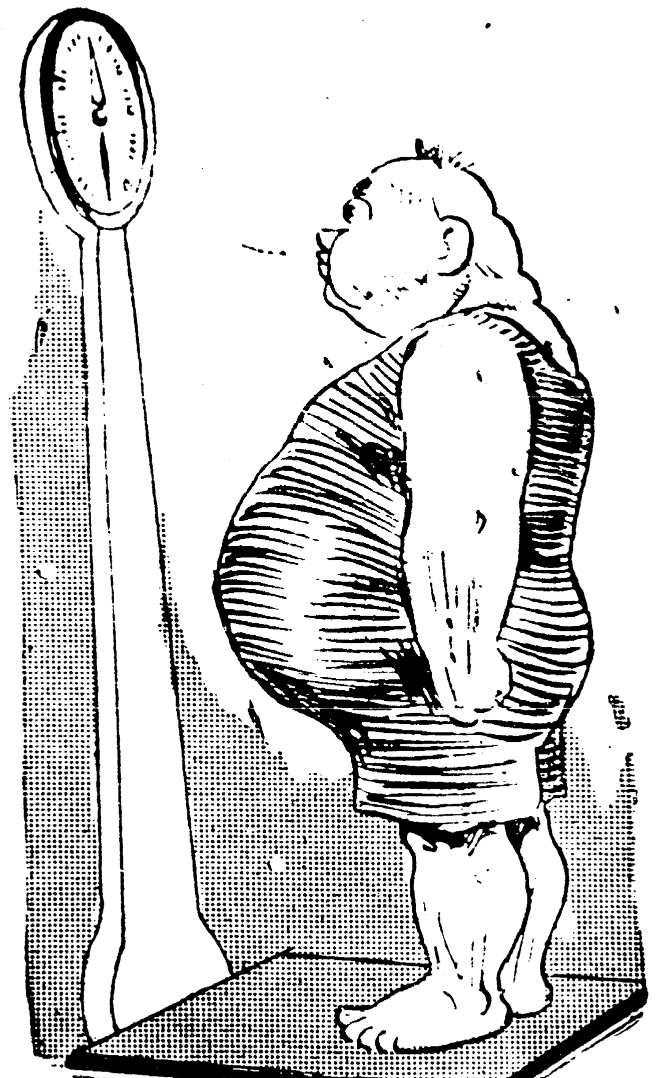

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

— সর্ব্বত্র পাওয়া যায় —

**লক্ষ্মীদাস প্রেমজী**
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন : কলিঃ ৩৬৬০

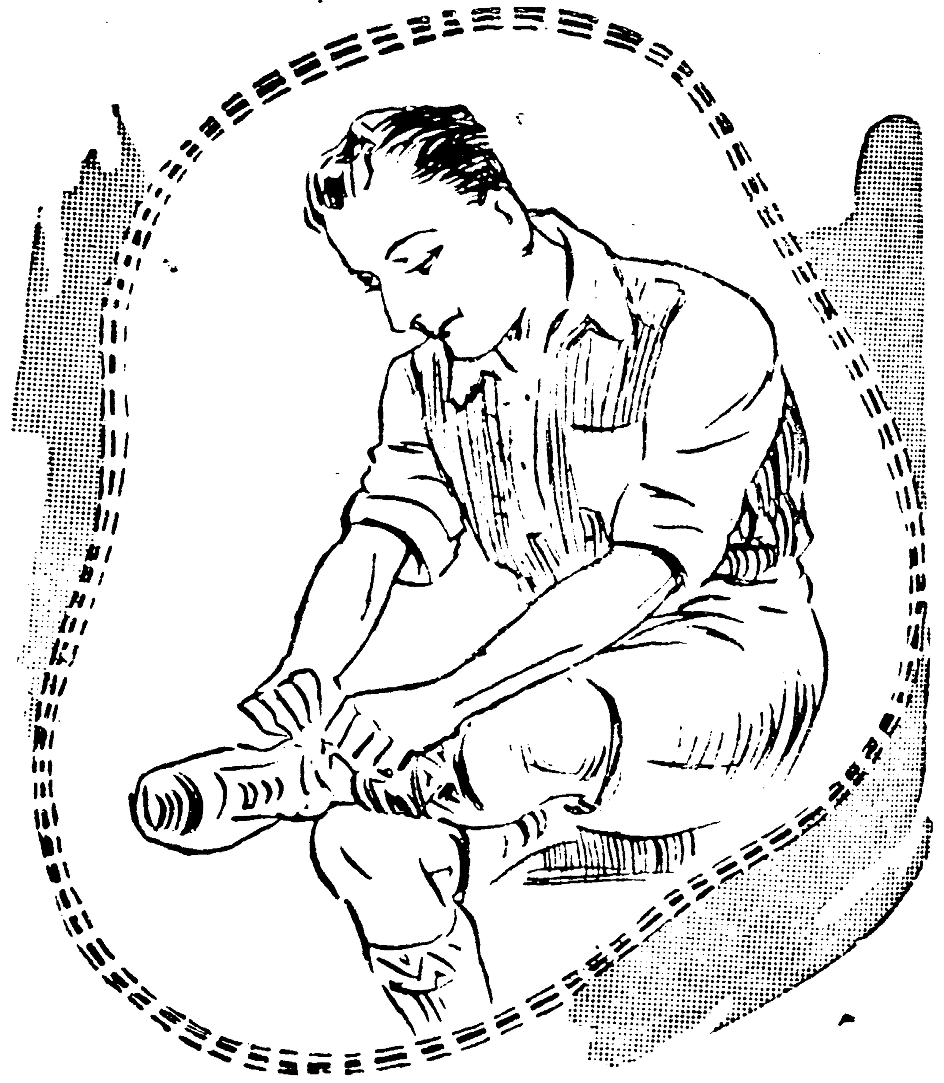

Cover: C. H. Aran & Co.



১৫শ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৪৯ চতুর্থ সংখ্যা


# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস্-সি



বার্ষিক ২।৵০

প্রতি সংখ্যা ।৹



মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে
আবিষ্কৃত ১৯০২
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

## রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

ভ্রমণের কাহিনী

শ্রীঅমলশঙ্কর রায় প্রণীত

# ইউরোপের আলো

### সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

"এ তো গাইড্ বুক নয়, এ চিত্রকথা। আমার স্থির বিশ্বাস বইখানা প'ড়ে আমাদের দেশের ছেলেরা য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারবে।"
—শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

"আপনার লেখা বেশ ঝরঝরে, আপনার অভিজ্ঞতাগুলিও কৌতুককর। প্রচুর হাস্যরসের আয়োজন থাকায় আপনার আসরে ছেলেরা সহজেই ভিড়বে।" —শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

"বইটি অত্যন্ত সরল ভাষায় লেখা, আর তারই মধ্যে আছে তথ্য ও ঘটনার বুনোনি। বইটি মুখ্যত বালকবালিকাদের জন্য লেখা হ'লেও সাবালকদেরও উপভোগ্য।" —শ্রীবুদ্ধদেব বসু

সুন্দর পুরু কাগজে সুদৃশ্য ছাপা। উপহারের উপযোগী মনোজ্ঞ রঙ্গিন প্রচ্ছদপট।

**দাম—এক টাকা**

**প্রাপ্তিস্থান** ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

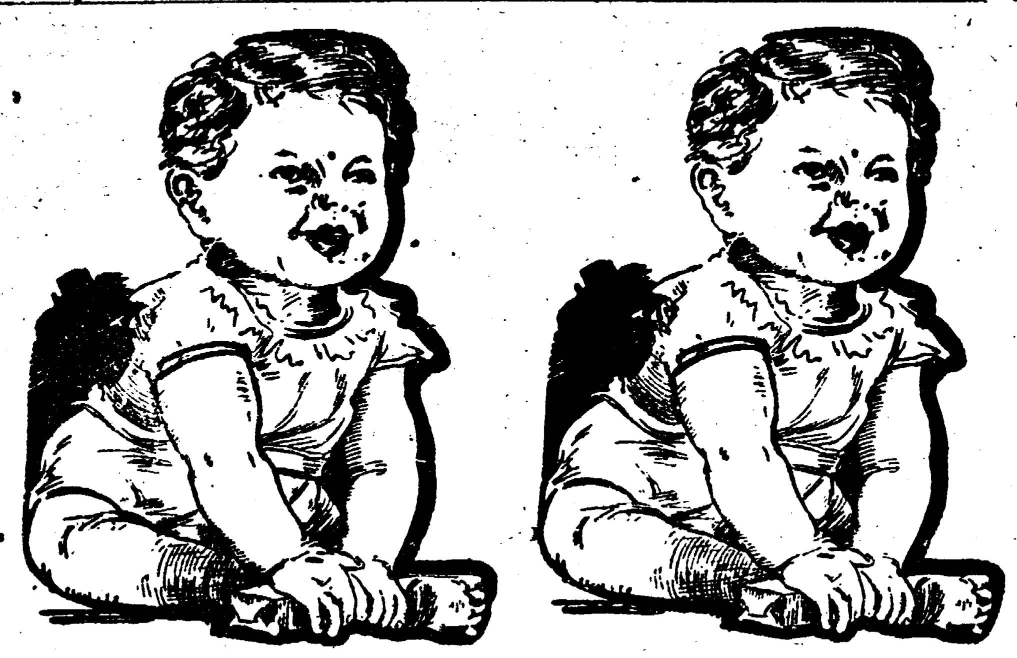

ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে
দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

প্রথম [illegible]

শ্রীহেমে[illegible]

১। অন্ধকারের বন্ধু

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

২। ছিন্নমস্তার মন্দির

শ্রীঅখিল নিয়োগীর

৩ তিব্বত-ফেরৎ তান্ত্রিক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

৪। বিজয় অভিযান

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর

৫। ছায়া কালো-কালো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

৬। রাত্রির যাত্রী

ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের

৭। হারানো বই

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

৮। জীবন্ত-সমাধি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

৯। গুপ্ত ঘাতক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

১০। মিসৃমিদের কবচ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

১১। উদাসীবাবার আখড়া

শ্রীসুনির্ম্মল বসুর

১২। কেউটের ছোবল

মূল্য প্রত্যেকখানি আট আনা

## কা[illegible]-সিরিজের

১৩৪৯ সালে দ্বিতীয় বর্ষ!

সারা বাংলার ছোটদের কাছে

'কাঞ্চনজঙ্ঘা-সিরিজ'এর এই যে

একাধিপত্য—

এতে গৌরব যথেষ্ট থাকলেও গর্ব্ব করবার আমাদের কিছুই নেই। কারণ, এ-দুর্দ্দিনে এই সিরিজ প্রকাশের সমস্ত উপকরণ শুধু 'দুর্ম্মূল্য' নয় 'দুষ্প্রাপ্য' হওয়া সত্ত্বেও, আমরা যে উৎকণ্ঠা ও যে ক্ষতি সহ্য করে বারো মাসে বারো খানি গ্রন্থ যোগান দিতে পেরেছি, তা এককথায় 'অসাধ্য-সাধন' বলিলেও অত্যুক্ত হয় না।

তবে জলপানির পয়সা জমিয়ে

আমাদের যে সব কচি-গ্রাহক 'কাঞ্চন-জঙ্ঘা-সিরিজ' কেনেন, তাঁদের হাসিমুখে ব্যথার রেখা যাতে না ফুটে ওঠে সেদিকে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখবো একথা নিশ্চিত।

আগামী দ্বিতীয় বর্ষের

১৩৪৯ সনের প্রথম সংখ্যা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

## মুখ আর মুখোস

দাম পূর্ব্বের মতই আট আনা

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৵৹

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৮১৹

## আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী
অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৹

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট,
চমৎকার ছবি। দাম—৷৴৹

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

## ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা

-সুন্দর বই-

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কলকাতার হালচাল ... ৸৵৹

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর ... ৷৹

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতিখণ্ড ... ৷৹

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন কিছু ... ৷৵৹

জসীম উদ্দীনের
হাসু ... ... ৷৵৹

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ... ৷৹

শ্রীলীলা মজুমদারের
বদ্যিনাথের বড়ি ৷৹

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৷৵৹

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৹

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং ... ... ৷৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড, কলিকাতা )

আঃ কি আরাম!

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৯ | ৪র্থ সংখ্যা

## ভাগ্যবান্

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সেই সে ভাগ্যবান্
ভগবানে যার অচলা ভক্তি,
ভগবানে যার টান।

সব জীব পায় যার ভালবাসা,
নির্ম্মল বুক, নিষ্পাপ আশা,
হিংসা-দ্বেষের ধারে না ক' ধার
নাহি মান, অভিমান।

অন্যায় প্রতি শুধু যার রোষ,
বুক ভরা যার সদা সন্তোষ,
অগর্ব্বিত যে, অকুণ্ঠিত ও
অজ্ঞাত যার দান।

নাহি তার নাশ, নাহি তার ভয়,
সব চলে যায় সেই শুধু রয়,
তার সব ব্যথা, সকল বিপদ্,
উদ্বেগ অবসান।

---

# প্রাচীন ভারতের গুহা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্.এ, পি.আর.এস্

গত মাসে তোমাদের প্রাচীন ভারতের কতকগুলি গুহার কথা বলেছিলাম। এবারে বাকীগুলির কথা বল্‌ব।

বোম্বাই প্রদেশে নাসিক নামে একটী বড় সহর আছে। কথিত আছে যে নাসিকের কাছে পঞ্চবটী বনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে অনেক সময় কাটিয়েছিলেন। এই সহরের খুব কাছে পাণ্ডু লেন বলে বৌদ্ধ গুহা আছে। এই গুহাগুলি খুব প্রাচীন যুগের ও হীনযানু সম্প্রদায়ভুক্ত, কারণ এগুলির কোনটীতেই ভগবান্ বুদ্ধের কোনও মূর্ত্তি পাওয়া যায় নি। এখানে সবশুদ্ধ ২৩টী গুহা পাওয়া গিয়েছে; তার ভেতরে কয়েকটী বেশ উল্লেখযোগ্য। এখানে ৩নং গুহাটী একটী বড় বিহার। এই গুহাটী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল। ১০ ও ১৭ নং গুহা ছুটীও বড় বড় বিহার—এ ছুটীও ঐ সময় খোদাই করা হয়েছিল। এখানে কেবলমাত্র একটী চৈত্যগুহা পাওয়া গিয়েছে—সেটী হচ্ছে ১৮ নং গুহা।

...



বোম্বাই সহরের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে কাহ্নেরি নামে একটী পাহাড়ের ওপরে অনেকগুলি গুহা আছে। তোমরা যদি বোম্বাইতে কখনও যাও তা হ'লে এটী দেখতে ভুল না। এখানে প্রায় ১০০টী গুহা আছে এবং তার ভেতরে চৈত্য-গুহাটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারলাতে প্রাপ্ত চৈত্যগুহাটী যে রকম ভাবে খোদাই করা, এটীও সেই রকম ভাবে খোদাই করা। এটী লম্বায় ৮০ ফুট ও চওড়ায় ৪০ ফুট। এর ভেতরে যে স্তূপটী আছে সেটী দেখতে খুব সাদাসিধে ধরণের।

ভারতবর্ষে যত গুহা পাওয়া গিয়েছে তার ভেতরে হায়দারাবাদে অবস্থিত ইলোরা বলে গ্রামে প্রাপ্ত গুহাগুলি খুব নাম-করা। এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু—ছ'রকম

খাড়া পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা অজন্টার বিখ্যাত গুহাশ্রেণী

গুহাই আছে। ১২টী বৌদ্ধগুহা পাওয়া গিয়েছে। এগুলি ৩৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দের ভেতরে নির্ম্মিত হয়েছিল। ৬ নং গুহাটী দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এই চৈত্যগুহাটী লম্বায় ৮৬ ফুট, চওড়ায় ৪৩ ফুট ও উচ্চতায় ৩৪ ফুট।

নিজামের রাজ্যে আওরঙ্গবাদ সহরের ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অজন্টা বলে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটী খাড়া পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গুহা খোদাই করা হয়েছিল। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত গুহা পাওয়া গিয়েছে তার ভেতরে

অজন্টাতে প্রাপ্ত গুহাগুলি সব চাইতে সুন্দর ও প্রসিদ্ধ। এগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য। অজন্টাতে ৮ ও ৯ নং গুহা দু'টী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদাই করা হয়েছিল আর ১নং ও ২৬ নং গুহা দুটী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল। এই দু' সময়ের মধ্যবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ প্রায় হাজার বছরের ভেতরে এখানে প্রাপ্ত উনত্রিশটী গুহা খোদাই করা হয়েছিল। ইলোরাতে প্রাপ্ত বিশ্বকর্ম্মা ও কারলাতে প্রাপ্ত চৈত্যগুহা ব্যতীত এখানে প্রাপ্ত ১৪ ও ২৬ নং চৈত্যগুহা দেখতে খুব সুন্দর।

এই তো গেল সব বৌদ্ধ গুহা। এবারে হিন্দু গুহা সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। এ পর্য্যন্ত যে সব হিন্দু গুহা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির যুগ আলোচনা করলে মনে হয় যে হিন্দু গুহাগুলি প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল। এই সব গুহার মধ্যে যেগুলি খুব প্রসিদ্ধ তাদের নাম নীচে দেওয়া হ'ল:— (১) আইহোলিতে প্রাপ্ত শৈব গুহা; (২) বাদামীতে প্রাপ্ত একটী শৈব আর দুটী বৈষ্ণব গুহা; (৩) করুষাতে প্রাপ্ত গুহা; (৪) মোমিনবাদ ও ভাম্বুর্দাতে প্রাপ্ত গুহা, (৫) ঢোকেশ্বর গুহা; (৬) ইলোরাতে প্রাপ্ত রামেশ্বর, রাবণ কা খাই ও দশাবতার গুহা; (৭) মহাবল্লীপুরে প্রাপ্ত রথ; (৮) বেজওয়াদাতে প্রাপ্ত বৈষ্ণব গুহা; (৯) বোম্বাই প্রদেশে প্রাপ্ত এলিফ্যাণ্টা, যোগেশ্বরী ও মণ্ডপেশ্বর গুহা; ও (১০) ইলোরাতে প্রাপ্ত কৈলাস মন্দির।

এ সব গুহার মধ্যে যেগুলি খুব নাম-করা শুধু সেগুলির সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলব। বাদামীতে প্রাপ্ত গুহাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে সব শুদ্ধ চারটী গুহা আছে; তার ভেতরে একটী শৈব গুহা, দুটী বৈষ্ণব গুহা ও আর একটী জৈন গুহা। এই গুহাগুলি এখন পর্য্যন্ত খুব ভাল অবস্থাতে আছে এবং এদের দেওয়ালে অসংখ্য খোদাই করা মূর্ত্তি আছে।

বোম্বাই থেকে ৬ মাইল দূরে সমুদ্রের ভেতরে এলিফ্যাণ্টা (Elephanta) নামে একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটীর আসল নাম কিন্তু ঘারাপুরী; প্রায় দু'শ' বছর আগে পর্ত্তুগীজ নাবিকরা যখন বোম্বাইএর দিকে আসতে সুরু করে তখন তারা দূর থেকে এখানে একটী খুব বড় পাথরের হাতী দেখতে পেয়েছিল, তাই দ্বীপটীর নাম রেখেছিল এলিফ্যাণ্টা। এই দ্বীপে অবস্থিত পাহাড়ের ২৫০ ফুট ওপরে



অবস্থিত কতকগুলি গুহা আছে। এই গুহাগুলি বেশ বড় বড়। এর মধ্যে একটী গুহা খুব নাম-করা। এর ভেতরে একটী খুব বড় ত্রিমূর্ত্তি খোদাই করা আছে। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে সব খুব নাম-করা পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে এটী অন্যতম। এটা যে কত বড় শিল্পীর কাজ তা না দেখলে বোঝান যায় না। এমন কি এও বলতে পারা যায় যে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত নাম-করা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে তার ভেতরেও এটী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে।

ইলোরাতে প্রাপ্ত গুহাগুলিও খুব বিখ্যাত। কিন্তু এখানকার যে জিনিষটী সব চেয়ে বিখ্যাত সেটী ঠিক গুহাও নয় কিংবা পাথরের তৈরী মন্দিরও নয়। এটা যে কি তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মনে কর একটী পাহাড় আছে। এই সমস্ত পাহাড়টীর কিছু অংশ কেটে ভেতর ও বাইরে যদি একটী মন্দিরের রূপ দেওয়া যায় তা হ'লে যা হয় এটা হচ্ছে ঠিক তাই। এ জিনিষটী তৈরী করা যে কত শক্ত কাজ তা না বল্‌লে বোঝা যায় না এবং সেজন্যই এটীকে সারা পৃথিবীতে যে সমস্ত নাম-করা পাথরে খোদাই করা মন্দির আছে তাদের অন্যতম বলে ধরা হয়। এমন কি কেউ কেউ বলেন যে এটী পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য জিনিষ। এই মন্দিরটী খোদাই করবার জন্য ২৮০ ফুট লম্বা ও ১৬০ ফুট চওড়া পাহাড় কাটতে হয়েছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট-নৃপতি প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বে এই মন্দিরটী খোদাই করা হয়েছিল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মত জৈনরাও কিছু কিছু গুহা খোদাই করেছিলেন। জৈন গুহাগুলি সংখায় সব চাইতে কম। জৈন ধর্ম্মের ভেতর দুটী শাখা আছে—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। যে সব জৈন গুহা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দিগম্বর সম্প্রদায়ের। জৈন গুহাগুলি বৌদ্ধ গুহার, মত অত পুরোনো নয় এবং মনে হয় যে সব চাইতে পুরোনো জৈন গুহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে হবে না। বাদামী, করুষা, মোমিনবাদ, ধরশিলোখা, চামর লেন, নাসিক, চান্দোর, ভামের, পিতলখোড়া, আইহোলি ও ইলোরাতে জৈন গুহা পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে কেবল মাত্র বাদামী, আইহোলি ও ইলোরাতে প্রাপ্ত গুহাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

# অযাত্রার জীবন-যাত্রা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ

আমি অযাত্রা এবং অস্পৃশ্য। 'কচ্ছপ'—আমার এই নাম শুনেই হয় ত' তোমরা কাণে আঙ্গুল দেবে! কিন্তু কেন আমি এত অবহেলা ভোগ করব? আমি এত নীচেয়েই বা প'ড়ে থাকব কেন?

আমি স্বয়ং ভগবানের দ্বিতীয় অবতার। আমার রূপ পরিগ্রহ করেই ভগবান্ একদিন পৃথিবীর ভার বহন করেছেন। আমি কি আজকের লোক? সেই যে একটা বিরাট গজের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হ'য়েছিল—সে কি আজকের কথা? কশ্যপাত্মজ গরুড় এসে তবে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করে।

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

প্রাণিজগতে আমার মত দীর্ঘায়ু আর কেউ আছে কি? কি জানি কেন, আমাকে কেউ কেউ মূর্খ ব'লে মনে করেন। এমন কি হিতোপদেশে আমার নামে একটা গল্পও রটানো হয়েছে। প্রাণের দায়ে আমাকে পালাতে হ'চ্ছিল দুটি হাঁসের সাহায্য নিয়ে। নীচে রাখাল ছেলেরা হৈ চৈ ক'রে উঠলে হাঁস দুটি প্রাণের ভয়ে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে অন্য দিকে উড়ে গেল, আর আমি অমনি পপাত ধরণীতলে!

কিন্তু লোকে রটাল, আমিই নাকি রাখাল ছেলেদের মুখে 'ছাই পড়ুক' ব'লতে গিয়েই আছাড় খেয়ে প'ড়েছি! বুদ্ধিমানেরা নিশ্চয় এ কথা বিশ্বাস করবেন না; কারণ, তাঁরা জানেন, উপরে উঠে প্যাঁক্-প্যাঁক্ করা চঞ্চলমতি হাঁসেরই স্বভাব, আমার নয়। আমার মত দৃঢ় ও স্থির-সঙ্কল্প কেউ আছে কি? সকলেই ত' জানেন, আমি একবার কোন কিছু কামড়িয়ে ধর্‌লে মেঘ না ডাকলে আর ছাড়ি না।

আমার মন্থরগতি দেখে অনেকে উপহাস করেন; কিন্তু 'স্লো য়্যাণ্ড্ ষ্টেডি উইন্‌স্ দি রেস্' কথাটি মিথ্যা কি? পেরেছিল দাম্ভিক খরগোস আমার সঙ্গে দৌড়ে?



আমার মত কৃচ্ছ্রসাধনা আর কে ক'রতে পারে? আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে মাটির নীচে সমাধিস্থ অবস্থায় আর কোন্ প্রাণীর থাকবার ক্ষমতা আছে?

জাতি?—হাঁ, আমিও দ্বিজ। অধিকন্তু আমি উভচর। জল এবং স্থল উভয় যায়গাতেই আমি বাস করতে পারি।

অনেকে আমার জীবনটাকে একটা বিশুষ্ক কৃপণের জীবন ব'লে মনে করেন। কিন্তু আমার মধ্যেও প্রচুর রসজ্ঞান আছে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন খা খা রৌদ্রের মধ্যে ব'সে মাছ ধরতে 'সিরিয়াস্' ভাবে চেষ্টা পান, আমি তখন 'টুব্' ক'রে তাঁর পাত্‌তাড়িটি দিই ডুবিয়ে। তার পরই হুইলে খুটু খুট্ শব্দ হ'তে থাকে এবং অনেক লোক যায় জমা হ'য়ে। সব্বাই যখন ভাবছে যে একটা প্রকাণ্ড রুই-ই হয় ত' এবার ছিপে উঠবে ঠিক সেই 'ক্লাইমেক্স'এর মুখে আমি হাত-পা ছড়িয়ে উঠে পড়ি ছিপের মাথায়—আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে প'ড়ে যায় একটা হাসির ঢেউ!

শ্রেণী বিভাগ আমার জাতির মধ্যেও আছে। যারা নদীতে বাস করে—ইংরেজীতে যাদের বলে 'টার্ট্‌ল্' (Turtle)—আকারে তারা অনেক বড়। 'হরি বোল' ধ্বনিতে এদের বিশেষ প্রীতি আছে দেখা যায়। আর এক শ্রেণী বিলে বা খানা-ডোবার মধ্যে বাস করে। কেউ বা আবার জলের চেয়ে ডাঙ্গায় বাস করাটাই বেশী পছন্দ করে—ইংরেজীতে এদের বলে টর্টইজ্ (Tortoise)। আর এক বিশেষ শ্রেণীর গায়ে কাঁটার মত উঁচু উঁচু থাকে—এরাই উচ্চ জাতি ব'লে মানুষের কাছে বেশী আদর পায়। বিলের মধ্যে যারা বাস করে, দেখা গেছে, বিল শুকিয়ে যখন খা খা ক'চ্ছে তখন তারা শক্ত মাটির নীচে সমাধিস্থ হ'য়ে থাকে—চৈত্র মাসে লাঙ্গল দিলে মাটির নীচে থেকে অনেকের অভ্যুত্থান হয়।

আমাদের সকলেই যে মাংসাশী বা হিংস্র তা' নয়। গিনিপিগ্ বা খরগোসের মত অনেকে আমাদেরও পুষে থাকেন। বাঁধাকপি, ঘাস ও অন্যান্য শাকসব্জী খেয়েও আমরা বেঁচে থাকি। বৃন্দাবনলীলার সময়ে আমরা যমুনার জল তোলপাড় ক'রে কত সাঁতার কেটেছি। আজও যমুনার সেই কালো জল আমরা ছাড়তে পারি নি। বেচারা লক্ষ্মণ! সরযূর জলেই ত' তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সেই সরযূই বা আমরা কি ক'রে পরিত্যাগ করি?

আমি যে কত বড় তা' জানতে পেরেছিলেন ডারউইন সাহেব 'চাথাম' দ্বীপে আমাকে দেখে। কিন্তু অদ্ভুত ওই ডারউইন সাহেবের বুদ্ধি! আমার শুঁড়টা সাপের মত দেখে তিনি রায় দিলেন সাপ-ই নিষ্কর্ম্মা থেকে থেকে আমি হ'য়ে গেছি! বানরের সঙ্গেও তিনি এই ভাবে মানুষের একটা সম্পর্ক পাতিয়েছেন।

দুর্ভাগ্য আমাদের—বাপ-মায়ের সংবাদ আমরা বড় একটা রাখি না। মা আমাদের গোল ডিম্বাকারে মাটির নীচে রেখে যান; গোসাপ, বেজী প্রভৃতির হাত

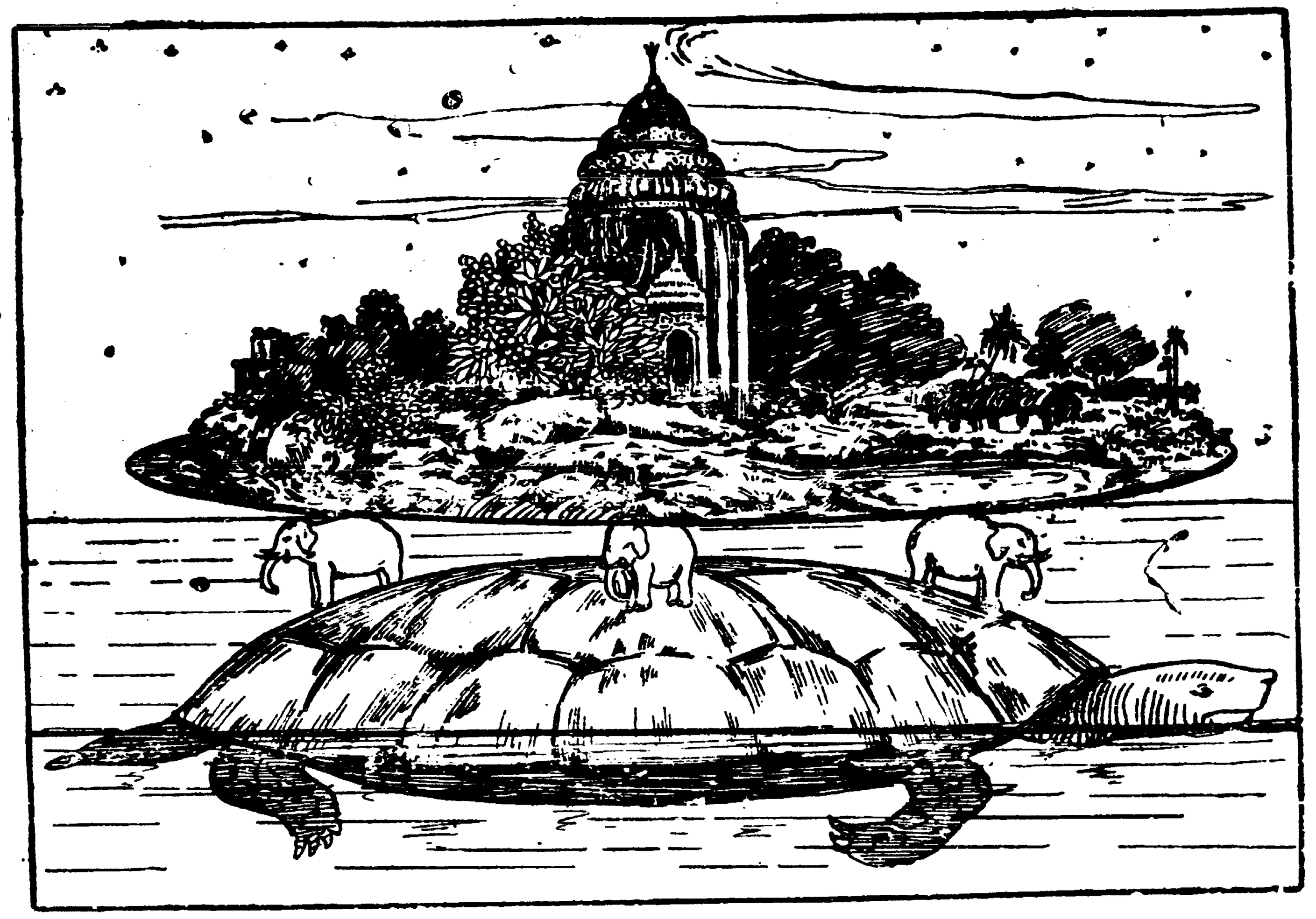

পুরাণের মতে আমি পৃথিবীটাকে এইভাবে পিঠে ধরে রেখেছিলাম।

থেকে যদি রক্ষা পাই তা হ'লে, সেই ধরিত্রীর বক্ষ থেকেই, কিছুকাল পরে একদিন আমরা বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ি।

আমার আবরণ দিয়েই চশমার খাপ ও কত কি তৈরী হয়। কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে আমার শ্রেষ্ঠ দান 'ট্যাঙ্ক'। বিজ্ঞানীরা হয়ত' সে কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন। কিন্তু পাখী ও মাছের গতি থেকে যে তাঁরা এরোপ্লেন চালাবার কল্পনা পেয়েছেন এটা কি মিথ্যা কথা? বিজ্ঞানীরা শত শত বৎসর ধরে আমাকে পরীক্ষা



ক'রে দেখলেন, আমি একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করি—প্রয়োজন মত বন-বাদাড় ভেঙ্গে গুটি গুটি ক'রে চ'লতে পারি এবং জলে স্থলে আমার সমান অধিকার। আমায় দেখেই ত' বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্ক!

অথচ আশ্চর্য্য, আজও লোকে আমাকে চিনতে পার্‌ল না! সেদিনও যারা জন্মাল তাদেরও কত রজত-জয়ন্তী, সুবর্ণ-জয়ন্তী হ'য়ে গেল! সে হিসেবে আমারও হীরক-জয়ন্তী—রেডিয়াম্‌-জয়ন্তী হওয়া উচিত।

---

# সাহেব ও তেলোদা

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা হচ্ছে খাঁদুর দাদা বাবুলাল বাবুর বিয়ে। সুতরাং আমরা, অর্থাৎ খাঁদুর বন্ধুরা, মানে—আমি, তেলোদা, নন্টু, ঘন্টু, পেতো, হেবো যথা সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত ছিলাম।

বাবুলাল বাবু বাপের বড় ছেলে। আর বাবুলাল বাবুর বাবা আবার কলকাতার মস্ত বড় ব্যবসাদার। কাজেই বিয়ের আসরে যে খুব দহরম-মহরম ধুম-ধাড়াক্কা হবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এ সব পারিবারিক কথা থাক্‌।

এদিকে আমরাও একটা আলাদা আসর জমিয়ে তুলেছিলাম। পাণ্ডা তেলোদা,—আমাদের গুরুদেব তেলোদা, যিনি আমাদের একা একা সিনেমায় যাওয়া থেকে হিন্দুমহাসভার আসরে মাথা গলাতে শিখিয়েছেন—যিনি এই মহামানবের আর মহাদানবের সাগরতীর কলকাতা সহরের হালচাল শিখিয়ে নিজের হাতে আমাদের মানুষ ক'রে তুলেছেন—সেই তেলোদা!

আগেই বলেছি আসরে খুব দহরম-মহরম আর ধুম-ধাড়াক্কা। কাজেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দু' একজন সাহেবও হ'তে পারেন। এবং হ'য়েছেনও তাই। অর্থাৎ আসরে একজন স্কচ সাহেব এসে এদিক্‌-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন,—বোধ হয় বাঙালীর বিয়েটা হৃদয়ঙ্গম করতে।

আমরা প্রত্যেকেই এটা লক্ষ্য করেছিলাম আর একটু মুস্কিলেও পড়েছিলাম একটু আগে। পড়েছিলাম সেই সাহেবের পাল্লায়। বাপ্‌রে বাপ্‌! ঘেমে নেয়ে অস্থির! একেই সাহেবের

আস্তানা স্কটল্যাণ্ডে, তার ওপর তার মুখে সিগার—দাঁত চেপে চেপে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি যে বলে বোঝা কঠিন। কোন রকমে "ইয়েস্ নো' ক'রে স'রে পড়লাম।

আমি শুধু একা নই, আমাদের মধ্যে অনেকেই পড়েছিল সেই সাহেবের পাল্লায় এবং অবস্থাও হ'য়েছিল ঠিক আমারই মত কিন্তু ব্যাপারটা যে যার লুকোবার তালে ছিলাম। বলা বাহুল্য আমরা সবাই ইস্কুলের ছাত্র।

সাহেব বেচারী একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক'রে আমরা বেশ খানিকটা দূরে বসেছিলাম যেন সাহেব-নন্দন হঠাৎ আমাদের মাঝে এসে না পড়তে পারেন।

এদিকে আসর জাঁকিয়ে তেলোদা ব'লে চলেছেন নানা কাহিনী, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাই শুনছি। বাজে কথা বাদ দিয়ে তারই খানিকটা শোনাই:

'জানিস, একবার আমি একটা জ্যান্ত বাঘ ধরেছিলাম—'

'জ্যান্ত বাঘ!' আমাদের হাঁ বড় হ'ল। 'কি ক'রে?...'

'গলায় দড়ি দিয়ে,'—তেলোদা নির্ব্বিকার চিত্তে এক টিপ নস্য নিলেন।

'শোন্ তা হ'লে বলি,'—একটু থেমে তেলোদা আরম্ভ ক'রলেন: 'একবার আসামে গিয়েছিলাম শিকার ক'রতে, সঙ্গে ছিলেন গণ্ডা গণ্ডা নবাব, রাজা-মহারাজা, বড় বড় শিকারী সব। যথা সময়ে মাচা বাঁধা হ'ল। আমি বন্দুক-টন্দুক না নিয়ে শুধু একবস্তা নেবু নিয়ে মাচায় উঠে বসলাম বাঘের প্রতীক্ষায়। নবাব তো হাঁ। তাকে বল্লাম, 'ওহে নবাব, ঘাবড়াচ্ছ কেন? বাপের সিংহাসন পেয়ে খুব নবাবী কর্‌ছ—আর কিছু তো শেখ নি? দেখ চুপ্ ক'রে কি ক'রে বাঘ ধরি—'

'কোথাকার নবাব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কি জানি কামস্কট্‌কার না গোয়ালন্দর—অত খবর কে রাখে? তার পর শোন্। বাঘ আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল গ্যাঁক্ গ্যাঁক্ ক'রতে ক'রতে। সময় বুঝে আমি একটা নেবু ছুঁড়ে মারলাম, বাঘ গপ্ ক'রে সেটা লুফে নিল মুখ দিয়ে। তার পর আবার এগিয়ে আসতে লাগল। আমি আবার নেবু ছুঁড়লাম, বাঘ সেটাও লুফে নিল। এমনি ক'রে একবস্তা নেবুও শেষ হ'ল আর আমি বাঘটাকে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এলাম।'

'সেটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?' নণ্ট জিজ্ঞেস করল।

'কেন?' তেলোদা নাক চুলকোলেন। 'অসম্ভবের কি আছে? এতগুলো নেবু খেয়ে বাঘ বেচারা বেশ কাবু হ'য়ে পড়েছে, দাঁত ট'কে গেছে তার—'

'কিন্তু নখ?'

'আরে দূর্ছোর নখ,'—তেলোদা মুখ বাঁকালেন, 'নখে কি আর ধার আছে রে? বাঘের তখন ১০৩ ডিগ্রী জ্বর—আসামী নেবু কিনা!'



আমরা আবার মুখব্যাদান করলাম। 'বাঘটা কোথায় গেল?'—ঘণ্ট জিজ্ঞেস ক'র্ল।

'সেই নবাবের চিড়িয়াখানায় প্রেজেন্ট্ ক'রে দিলাম। নবাব ভারী খুসী—খুব ধন্যবাদ-টাদ দিল। বল্‌ল, ওর দেশে গেলে শীষমহলে থাকতে দেবে আর কাবুলি পরোটা খাওয়াবে।'

'তবে যে বল্‌লে কামস্কট্‌কা—?'

'ঐ একই কথা।'

'সেখানে গিয়েছিলে নাকি?'

'আমার পিসে গিয়েছিল, কিন্তু সে কথা থাক্—এক সাহেবের গল্প শোন্: আমরা তখন আরায়—রাস্তায় এক সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেককে পথের কথা জিজ্ঞেস করছেন কিন্তু লোকগুলো এমন ইডিয়ট্—সাহেবের কথার মানেই বুঝতে পারছে না। ভাগ্যক্রমে দেখা হ'ল আমার সঙ্গে, চমৎকার ইংরেজীতে চমৎকার ক'রে সাহেবকে রাস্তা বাৎলে দিলাম। সাহেব এতখুসী হ'লেন যে সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা সোনার মেডেল বের ক'রে আমায় দিয়ে বল্‌লেন, বাঙালীর মুখে এমন ইংরেজী তিনি এই প্রথম শুনলেন।'

আমরা আড়চোখে একবার সেই স্কচ্ সাহেবটার দিকে চেয়ে দেখলাম। পেতো হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, 'তুমি সাহেবের সঙ্গে অনর্গল কথা বল্‌লে?'

'কেন?' তেলোদা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, 'তাতে অবাক্ হবার কি আছে?'

'তুমি যে ইংরেজীতেই ফেল কর প্রত্যেক বছর।'

'বেশ করি! তোদের মত বই মুখে গুঁজে ব'সে থাকা আমার দ্বারা হয় না। আমার যা "আউট্ নলেজ" বুঝলি পেতো—'

'কিন্তু সাহেবের সঙ্গে—'

'আরে রাখ্ তোর সাহেব, জানিস আমার পিসে মেম বিয়ে করেছে?'

'বেশ তো, ওই সাহেবটির সঙ্গে কথা ব'লে এস তো দেখি আমরা সব—'

'দেখ্ না—' একলাফে উঠে তেলোদা এগিয়ে গেলেন সাহেবের দিকে। আমাদের মনে হ'ল সাহেবকে মেরেই বসবেন বুঝি এবার তেলোদা।

খানিকক্ষণ পরে সত্যি আমরা অবাক্ হ'য়ে গেলাম। তেলোদা সাহেব-নন্দনের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে তুলেছেন আর আমাদের দিকে কট্‌মট্ ক'রে এক একবার চাইছেন। সাহেব-নন্দনকে, গল্প ক'রতে ক'রতে, তেলোদা যদি আমাদের আসরে নিয়ে আসেন মজা দেখবার জন্যে তবেই তো সর্ব্বনাশ—পালে একেবারে বাঘ পড়বে। আমাদের মুখ বাংলা পাঁচের মত হ'য়ে গেল। সকলে মাথা নীচু করলাম।

দেখলাম সাহেব একগাল হেসে কেস্ খুলে সিগারেট দিতে চাইলেন তেলোদাকে, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে তেলোদা সাহেবকে জানালেন তিনি সিগারেট খান না। আবার ওঁদের গল্প সুরু হ'ল। গল্প ক'রতে ক'রতে ওঁরা আসরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আমরা এখনও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক'রে বেশ খানিকটা দূরে ব'সে আছি। তেলোদা ফিরে এসে পেতোকে দেখে নেবেন—পেতো বলেছিল সাহেবের সঙ্গে তেলোদা নাকি কথা বলতে পারবেন না। সে বেচারী তেলোর ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে গা ঢাকা দিল।

তেলোদা ওদিকে সাহেবকে খুব বোঝাচ্ছেন—বোধ হয় বাঙালীর বিয়ের কথা। সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শুনছেন, মাঝে মাঝে কি সব প্রশ্ন করছেন, আর তেলোদা, দূর থেকে আমাদের মনে হ'ল, চমৎকার ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সাহেবকে সমস্ত ব্যাপার। সাহেব ভারী খুসী। খুব হাসছেন আর মাঝে মাঝে তেলোদার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন আর তেলোদা কট্‌মট্ ক'রে চাইছেন আমাদের দিকে। পিলে আমাদের সে চাউনিতে চমকে চমকে উঠছে বার বার।

নণ্টু কিন্তু এখনও কিছুতেই, নিজের চোখে দেখেও, বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা। কিন্তু বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি! ওই তো সকলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

'দেখা যাক্,'—নণ্টু উঠে দাঁড়াল, তার পর একাই এগিয়ে চল্‌ল সাহেবের দিকে।

যেখানে সাহেব আর তেলোদা কথা বল্‌ছিলেন অতি সন্তর্পণে নণ্টু এসে দাঁড়াল তাদের পেছনে—খুব সাবধানে, যেন তেলোদা তাকে দেখতে না পান। হ্যাঁ, ওঁদের কথাবার্ত্তা এবার বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওকি! নণ্টুর মুখ যেন মন্ত্রবলেই হাঁ হ'য়ে গেল। সাহেবের সঙ্গে তেলোদার ইংরেজী বাক্যালাপ চল্‌ছিল এই ভাবে :

'হাঁ সাব্, বেশীর ভাগ সময় বাঙালী আদমিকা সাদি রাত্তির মে হোতা হ্যায়।'

'কাহে?' সাহেব প্রশ্ন কর্‌ল।

'কারণ কুছ্ নেই হ্যায়—'

'সাদি দেতা কোন্?'

'পুরোহিত দেতা হ্যায় সাব্।'

'পুরোহিট্ কৌন্ চীজ্ হ্যায়?'

'দেশী পাদ্রীসাব্, আপলোগ্‌কা য্যায়সা পাদ্রীসাব্ সাদি দেতা, হামলোগকা ওইসা মাফিক পুরোহিত দেতা। একই ব্যাপার হ্যায়—থোরা অদল বদল—' তেলোদা হঠাৎ নণ্টুকে দেখতে পেলেন আর বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন, 'হ্যাল্লো নোন্-ঠু এই এলি বুঝি আমায় ডাকতে? কি কর্‌বো সাহেব ছাড়তে চায় না কিছুতেই! চল্ যাচ্ছি।' সাহেবের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন তেলোদা, 'ওয়েট্, ওয়েট্। আয় নণ্টু।'

...



নণ্টুকে নিয়ে তেলোদা ফিরে এলেন আমাদের আসরে। এসেই বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন, 'কই, সেই পাজি পেতো কই? আমার পিসে বিয়ে করেছে মেম আর আমি ইংরেজি ব'লতে পারব না সাহেবের সঙ্গে! এই তো এক ঘণ্টা ধ'রে মুখ থেকে নায়াগ্রা জল-প্রপাতের মত ইংরেজী ছুটে বেরিয়ে গেল—কই, পেতো কই?'

'পেতো পালিয়েছে', ঘণ্টু বল্‌ল।

'কোথায় পালিয়েছে? ইডিয়ট্—রাস্কেল্—ষ্টুপিড্—ননসেন্স্—'

হঠাৎ খাবার ডাক পড়্‌ল, আর ছুটে গেলেন তেলোদা কথা শেষ না ক'রেই; সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

---

# পুরানো পম্পাইয়ে

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

নেপল্‌স্ সহর থেকে দেখতে পাওয়া যায় অদূরে ভিসুভিয়স্ অনবরত ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। ভিসুভিয়স্ ও নেপল্‌স্ সহরের মাঝখানে পুরানো পম্পাই সহরের ধ্বংসস্তূপ।

তোমরা জান বোধ হয়, চোখে দেখে পাহাড়ের দূরত্ব সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করতে গেলে কেমন জব্দ হ'তে হয়। দূর থেকে মনে হয়, ওই তো ওই দেখা যায় পাহাড়,—ও আর কতটুকু দূরে হবে! কিন্তু হাঁটতে যাও, দেখবে পথ যেন আর ফুরোয় না। চলেছ তো চলেছই।

সুতরাং আমরা রওনা হ'লাম মোটরে করে, এবং আমদের গন্তব্য স্থান ছিল ভিসুভিয়স্ আগ্নেয়গিরি নয়, পুরানো পম্পাই সহর,—ভিসুভিয়সের কোল থেকে দশ মাইল দূরে।

সুন্দর বাঁধানো পথ। দু'ধারে বন ও আঙ্গুরের ক্ষেত। পথে গাড়ী দু'চারটে রেস্তোরাঁ ও বড় বড় দোকানের সামনে দাঁড়াল। দোকানগুলিতে দেখলুম বহু রঙের পাথরের তৈরী জিনিষপত্র কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও বেশী দেরী না করে আমরা গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চল্‌লাম। আগে পড়্‌ল নতুন পম্পাই সহর। খুব উঁচু উঁচু বাড়ী। বাড়ীগুলি দেখতে তেমন সুন্দর নয়। বারান্দার রেলিংএর উপর দিয়ে ঝুলছে নতুন, পুরানো ও কোন কোনটা আবার শতছিদ্র কাপড়-জামা। দেখে হাসি পেল। মনে হ'ল, এমন কুরুচিসম্পন্ন মানুষ শুধু আমাদের দেশেই তবে নেই, ইটালীতেও আছে। তবে ইটালীর কোন একটী বড় সহরে বোধ হয় এমন কুরুচিসম্পন্ন লোক বেশী দেখতে পাওয়া যাবে না। সহর ও গ্রামের লোকের ভিতর এই যে রুচির ভেদাভেদ এটা শুধু ইটালীতে নয়, ইউরোপের সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ সভ্যতার ছোঁয়াচ ইউরোপের সহুরে লোকেরা যতটা পেয়েছে গ্রাম্য লোকেরা তা পায় নি। গ্রাম ছেড়ে সহরে যাবার আকর্ষণ তাই সেখানেও কম নয়। আমাদের দেশের গ্রামগুলির অবস্থা অবশ্যি আরও শোচনীয়। ওদের দেশে সহরের লোক যে সব সুবিধা ভোগ করে সে সব সুবিধার ব্যবস্থা আজকাল গ্রামে করে দিয়ে গ্রামগুলিতে লোক আটকে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা হয় নি। ফলে গ্রামের লোকেরা নানা অসুবিধে ভোগ করতে না পেরে স্থায়ী ভাবে সহরে গিয়ে বসবাস করতে সুরু করেছে, আর গ্রামগুলি দিন দিন মরুভূমিতে পরিণত হ'তে চলেছে।

যাক্, বহু দূরপথ অতিক্রম করে পুরানো পম্পাই সহরে এসে পড়লাম। মোটর থেকে নামা মাত্র একদল লোক অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে আমাদের দেখতে এল। কৃষ্ণবর্ণ লোকের এই জ্বালা ইউরোপের সর্ব্বত্র। আমরা যে তাদের মতন হাত, পা ও মুণ্ডওয়ালা মানুষ তা তারা সহজে ভাবতে পারে না। তাদের আচরণ দেখে মনে হয় তারা ভাবে আমরা বুঝি অন্য কোন ভূলোক থেকে নেমে এসেছি।

•••



পম্পাইয়ে ঢুকবার মুখে প্রকাণ্ড একটা দরজা; দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকেই একটা মিউজিয়ম্। মিউজিয়মে পুরানো পম্পাইয়ের কিছু ধ্বংসাবশেষ কাচের আলমারিতে সাজানো রয়েছে,—টুকরো টুকরো পাথর, ভাঙ্গা অলঙ্কার, টাকা পয়সা। কয়েকটী মানুষের মৃতদেহ পাথর হয়ে জমে রয়েছে। বহুযুগের পুরানো ইট। শুনেছি পুরাকালের তৈরী ইট বর্ত্তমান কালের ইটের চেয়ে বেশী শক্ত ও টেকসই হ'ত। তখনকার দিনে মানুষের অভাব কম ছিল, তাই তারা যখন যে জিনিষ তৈরী কর্‌ত তার পিছে যতটা পরিশ্রম ও সময় নিযুক্ত কর্‌তে পার্‌ত এখন তা পারে না বা করে না। এখনকার মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে অল্প সময়ে বেশী উৎপাদন—বেশী টাকা উপার্জ্জন করা।

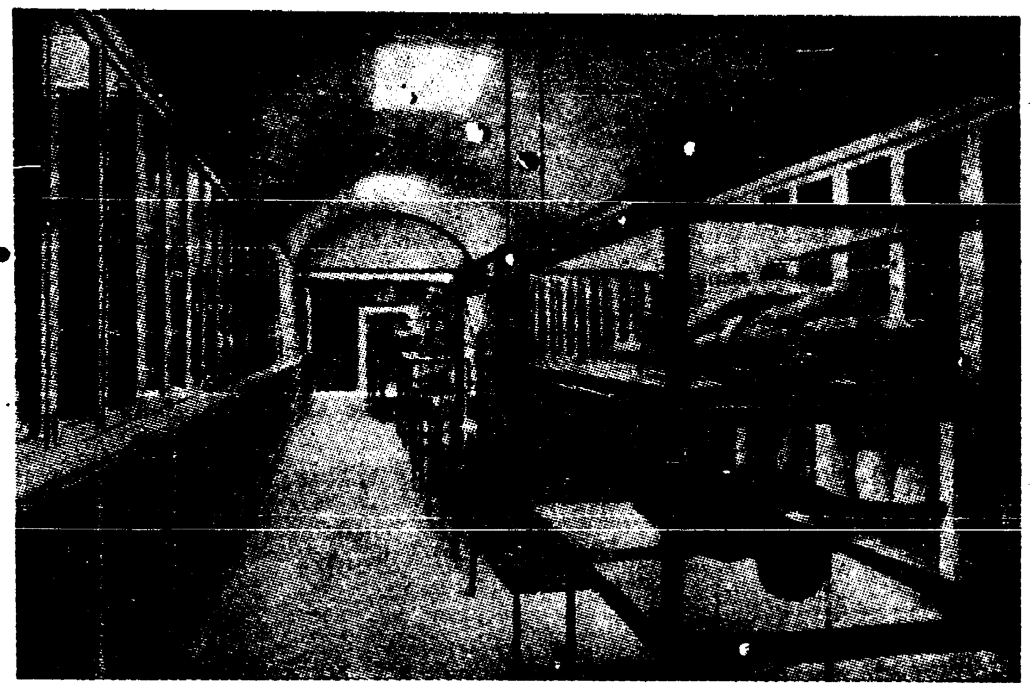

পম্পাই মিউজিয়মের একাংশ।

কাচের আলমারির মধ্যে দেখা যাচ্ছে—একটি মানুষের মৃতদেহ পাথর হয়ে জমে আছে।

যাক্, মিউজিয়ম্ দেখে ঢুকে পড়লুম পুরানো পম্পাই সহরে। রাস্তা ও বাড়ী সব পাথরের। বাঁধান রাস্তা। কোন কোন বাড়ীর ছাদ নেই, শুধু একতলার কয়েকটী থাম আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কোন কোন বাড়ী আবার এখনও বাসোপযোগ্য আছে। দেখে আশ্চর্য্য লাগ্‌ল বাড়ীগুলি আধুনিক ধরণের। দেয়ালের গায়ে সুন্দর কারুকার্য্য। কোন কোন বাড়ীর উঠানে ফোয়ারা এখনও বর্ত্তমান, তবে এখন আর তা থেকে চারদিকে জল ঠিকরে পড়ে না।

একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ভীতির চিহ্ন। জানোয়ারটী বোধ করি আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গারের সময় মুখ উঁচু করে আর্ত্তনাদসূচক চীৎকার করছিল, ঠিক এমনি সময়ে গলিত লাভা এসে তাকে কবরিত করে ফেলেছে। তার পর

তার উপর বহু বছর ধরে বালির কণা পড়েছে ও আজ তাই সে পাথরে পরিণত হয়ে ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হ'ল, কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বা ভাস্কর কুকুরটীর ঐ মূর্ত্তি দেখে ছবি আঁকবার বা মূর্ত্তি গড়বার একটা সুন্দর রসদ পাবে।

কোন কোন বাড়ীর গায়ে নানা রকম ভাষায় লেখা আছে। তাতে বোঝা যায় বহু জাতির লোক সেখানে বাস করত। আর একটী জিনিষ সেখানে লক্ষ্য করবার ছিল। ক্রীতদাসদের তারা বিশ্বাস করে একতলায় থাকতে দিত না, তাদের ঘর ছিল দোতলায়। আর দোতলার ঘরগুলি ছিল সাধারণতঃ একটু ছোট ছোট।

পম্পাইয়ে ক্রীতদাসদের উপর যে কি রকম অত্যাচার হ'ত তার গল্প তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই রকম ক্রীতদাস-প্রথা মাত্র কয়েক বছর আগে আবি-সিনিয়াতেও ছিল, সম্প্রতি সে প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে বলে শুনতে পাই। আমেরিকার ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে যে কত গল্প লেখা হয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু সেখানেও আজ ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে। এর মূলে ছিলেন সেখানে মহানুভব আব্রাহাম্ লিঙ্কন্।

আজকের মাটি খুঁড়ে বার করা পম্পাইকে নিয়ে ঐতিহাসিকেরা বহু রকম গবেষণা সুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, সে রাজত্বে আধুনিক যুগের মতন মিউনিসিপ্যালিটী ছিল, ব্যাঙ্ক ছিল ও বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। তবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই কারণ বাস্তবে সভ্যতা যে দেশের যেমনই হোক্ না কেন, ব্যবসা ও বাণিজ্য ছাড়া কোন জাত বেশীদিন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। ও সেজন্য প্রয়োজন অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলিরও।

পম্পাইয়ের কোন উঁচু স্থানে দাঁড়ালে চারদিকে অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। একদিকে ধূমায়মান ভিসুভিয়স্ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর একদিকে উত্তাল সমুদ্র দিগন্তের সাথে মিশে গেছে। আগ্নেয়গিরির নীচে ছোট একটী গ্রাম, আর গ্রামটীকে বেষ্টিত করে রয়েছে সবুজের গুচ্ছ। দেখে মনে হয় গ্রামবাসীরা এক অদ্ভুত মায়াকাননের মাঝে বাস করছে। পরম শান্তিময় বোধ করি তাদের



সরল জীবন। কিন্তু শত আনন্দের মধ্যেও কি তাদের মনে মাঝে মাঝে এই ভেবে আতঙ্কের উদয় হয় না যে ধূমায়মান গিরি কোন দিন বজ্রের মত ফেটে উঠতে পারে! হয়তো ওঠেও। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তে তারা মনে করে এমন কোনও হিংস্র মুহূর্ত্ত যদি আসেই তবে তার আগে কি দেশের বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। এই বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করছে। শুধু তারাই নয়, সমগ্র ইউরোপবাসীই আজ বিজ্ঞানের যাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ।

---

১৮

সুশান্ত তৎক্ষণাৎ দেয়াল খোঁড়া বন্ধ করিয়া অশোক ও শঙ্খচূড়ের কাছে সেই অলৌকিক শব্দের কথা জানাইল। শুনিয়া সকলেরই মুখ ভয়ে সাদা হইয়া উঠিল। অশোক কহিল—"কি শুনতে কি শুনেছ হয় ত!" সুশান্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—"আমি কিছু ভুল শুনি নি; স্পষ্ট শুন্‌লাম পাহাড়ের মধ্যে থেকে শব্দ বেরুচ্ছে; বরং তুমি একবার নিজের কানে শুন্‌বে এস।" তখন অশোকও ভিতরে ঢুকিল এবং একটু পরেই বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—"সত্যি!" রঞ্জিৎ বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আগ্নেয়াস্ত্রের উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস। অশোকের ভাব দেখিয়া সে তাচ্ছীল্য ভরে বন্দুক লইয়া বুক ফুলাইয়া ভিতরে ঢুকিল কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই ভীরুতম শশকের মত ফিরিয়া আসিল। কি এক আকস্মিকতায় সে যেন সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তার পর একে একে শঙ্খচূড়, কুণাল, কমলাক্ষ, রোহিতাশ্ব ও নীলাদ্রি ঢুকিল। সকলেরই মুখ ভয়ে মলিন হইয়া উঠিয়াছে,—সকলেই সেই রুদ্ধ গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিয়াছে। সেদিন আর কাজ না করিয়া সকলে খাইতে বসিল। সান্ধ্য ভোজনের পর সকলেই ভয়ে ভয়ে আবার এক

একবার সেই গর্ত্তের মধ্যে সেই শব্দ শুনিবার জন্য প্রবেশ করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আর কোন শব্দই শোনা গেল না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি নয়টা বাজিল। তখনও কোন শব্দ কানে আসিল না। সকলে তখন যে যার বিছানায় শুইতে গেল।

রাত্রি দুইটার সময় বিয়্যারের গর্জ্জনে সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ছেলেরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখে বিয়্যার ভীষণ অন্ধকারে একবার করিয়া সেই গর্ত্তের ভিতর ঢুকিতেছে ও রাগে ফুলিতে ফুলিতে পরমুহূর্ত্তেই বাহির হইয়া আসিতেছে। সুশান্ত, অশোক ও রঞ্জিৎ তখন আবার উঠিয়া একে একে সেই গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখন সেই চাপা গর্জ্জন যেন আরো স্পষ্ট, আরো ভয়ঙ্কর। সে শব্দ যেন দূর—বহুদূর হইতে আসিতেছে, অথচ মনে হইতেছে স্পষ্ট পাহাড়ের ভিতর! কোনও ভৌতিক ব্যাপার নয় ত! হঠাৎ রঞ্জিৎ কহিল—"আচ্ছা, এটা পাহাড়ের কোন ঝর্ণার শব্দ নয় ত?" রোহিতাশ্ব কহিল—"ঝর্ণার শব্দ কখনও হ'তে পারে না; তা হ'লে মাঝে মাঝে থেমে যাবে কেন?" অশোক কহিল—"ঠিক কথা; আমার তো মনে হয় উপরের কোন ফাটলে বাতাস ঢুকে এই শব্দ কর্‌ছে।"

কোন রকমে সে রাত কাটিল। পর দিন ভোরে সকলে পাহাড়ে উঠিবার জন্য গুহা হইতে বাহির হইল। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে সেই ফরাসী গুহার মাথার উপর গিয়া উঠিল, কিন্তু চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহারা কোন ফাটল দেখিতে পাইল না। পাহাড়ের উপর নিবিড় আগাছার জঙ্গল। শেষে সকলে হতাশ হইয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল।

তখন পুনরায় সেই গর্ত্ত খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হইল। বেলা বারোটা পর্য্যন্ত বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাজ চলিল, কিন্তু বারোটা বাজিতেই আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। সেই সময় শঙ্খচূড় গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, গর্ত্তের দেওয়াল যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে। গাঁতির শব্দে মনে হয় যেন ওদিকে পাহাড়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। শঙ্খচূড় তখন নূতন উদ্যমে গাঁতি চালাইতে লাগিল।

বেলা দুইটা। কাজ বন্ধ করিয়া সকলে একত্র খাইতে বসিয়াছে। হঠাৎ অশোকের নজরে আসিল, গুহার মধ্যে বিয়্যার নাই। কোথায় গেল সে? বিয়্যার ত দিবারাত্র গুহার মধ্যে থাকে। কেহ বাহিরে না গেলে সেও বাহিরে যায় না। আর এই খাইবার সময়টিতে সে আগে হইতেই টেবিলের তলায় আসিয়া বসিবে। এখন সে গেল কোথায়? অশোক ও নীলাদ্রি দুয়ারের কাছে গিয়া বিয়্যারের নাম ধরিয়া কত ডাকিল, আশে পাশে কত খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু কোন দিক্ হইতে তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সারা দিন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও বিয়্যারের সন্ধান পাওয়া গেল না। আশেপাশে সর্ব্বত্র খোঁজ করা হইল, কিন্তু না, বিয়্যারের কোন চিহ্নই নাই। এই মূক প্রাণীটি যে তাদের মধ্যে কতটা



জায়গা জুড়িয়া ছিল ছেলেরা আজ তাহা প্রথম উপলব্ধি করিল। সে রাত্রে রান্না চাপান'র কথাও তাদের মনে আসিল না।

রাত্রি তখন দুইটা; সকলের তখন একটু তন্দ্রা ভাব আসিয়াছে, হঠাৎ এক গভীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহারা লাফাইয়া উঠিল। কে যেন অসহ্য যন্ত্রণায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। একে গভীর রাত্রি, তায় তন্দ্রাঘোর, তায় বিয়্যারের সঙ্গবিচ্ছেদ-বেদনা! সকলের বোধ হইতে লাগিল এইবার গুহার মধ্যে কোন প্রেত বা দানব প্রবেশ করিবে। হঠাৎ সুশান্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ গর্ত্তের ভিতর হ'তে এই কান্না আসছে!"—এই বলিয়া সে গর্ত্তের মধ্যে ছুটিয়া গেল। বাকী সকলে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোটরা ভয়ে লেপের ভিতরে ঢুকিল। কিছুক্ষণ পরে সুশান্ত ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"কান্নাটা আস্‌ছে, মনে হয়, ওদিক্‌কার গহ্বর থেকে। নিশ্চয় হ্রদের দিকে গহ্বরের কোন প্রবেশপথ আছে। সেই পথ দিয়ে বন্যজন্তুরা গহ্বরের মধ্যে এসে বাস করে।"

পরদিন আবার দেয়াল খোঁড়া চলিল। দুপুরের পর দেয়াল অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। মনে হইল আর দুই ইঞ্চি খুঁড়িলেই ওদিকের গহ্বর আসিয়া পড়িবে। গহ্বরের মধ্যে না জানি কোন্ বন্যজন্তু লুকাইয়া আছে,—গুহার সঙ্গে যোগাযোগ হইলেই আসিয়া ছেলেদের আক্রমণ করিবে! তাই রঞ্জিৎ, কুণাল, কমলাক্ষ ও রোহিতাশ্ব চারিজনে চারিটা বন্দুক লইয়া গুহার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন সুশান্ত খুঁড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার চীৎকারে সকলে চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার শাবলের আঘাতে দেওয়ালের একটা প্রকাণ্ড চাঁই ভাঙিয়া পড়িয়াছে; হাতের শাবলও সঙ্গে সঙ্গে ওদিক্‌কার গহ্বরের মধ্যে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সুশান্ত তখন শূন্য হাতে গুহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সেই ভাঙা ফাটলের মধ্য হইতে একটা জন্তু ক্ষিপ্রবেগে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেদের ভয়ার্ত্ত চীৎকারধ্বনি তাহাদের অর্দ্ধোন্মুক্ত ঠোঁটেই মিশিয়া গেল। ছেলেরা চাহিয়া দেখিল, জন্তুটি আর কিছু নহে, তাহাদেরই বড় আদরের বিয়্যার। বিয়্যার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহারও দিকে না তাকাইয়া প্রথমে ছুটিয়া গেল মেঝেয় বসানো একটি জলপূর্ণ পাত্রের প্রতি। জলে মুখ ডুবাইয়া সে পেট ভরিয়া প্রচুর জল খাইয়া লইল। তার পর সে লেজ দোলাইয়া ঘাড় কাৎ করিয়া ছেলেদের নিকট ফিরিয়া আসিল। মুখে এখন তাহার এতটুকু রাগের চিহ্ন নাই।

এইবার গহ্বর পরীক্ষার পালা। সকলেরই বুক ভয়ে দুর্ দুর্ করিতেছে তবু সাহস করিয়া একে একে সকলেই সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গিয়া নামিল। প্রকাণ্ড গহ্বর। ফরাসী গুহার মত; কিন্তু দৈর্ঘ্যে তাহার দ্বিগুণ। শক্ত গ্রানাইট পাথরের মেঝে মিহি বালিতে আচ্ছাদিত। অন্ধকার গহ্বর দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল ভিতরের হাওয়া হয়তো বিষাক্ত; কিন্তু হাতের লণ্ঠন

দিব্যি জলিতেছে। নিশ্চয় কোন ফাটল দিয়া বাহিরের বাতাসের যোগাযোগ আছে। আর তাহা যদি না থাকিবে ত বিয়ারই বা তাহার ভিতরে গিয়াছিল কি করিয়া? আলো লইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ কিসে উপর হোঁচট খাইয়া রোহিতাশ্ব পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাত দিয়া দেখে একটা ঠাণ্ডা অসাড় মৃতদেহ মেঝেয় পড়িয়া রহিয়াছে। রোহিতাশ্ব ভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ( ক্রমশঃ )

---

# একটি রহস্যময় চুরি

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গভীর রাত।

স্বপ্নময় ঘুমের মধ্যে শুভোর একটা শব্দ কানে এল—যেন কা'র কাশির আওয়াজ। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মেলে ও চিৎ হ'য়ে শুল, আর, এবার স্পষ্ট শুনতে পেলে, কে যেন দরজা খুললে—ওপরেই!

শুভো ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। ঘরের দরজা ফাঁক ক'রে দেখ্‌লে। এবার যা দেখ্‌লে তা'তে তা'র সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল: ছাদের দরজা খোলা, আর অন্ধকার দালান দিয়ে একজন লোক এগিয়ে আস্‌ছে! ক্রমে এদিক্ ওদিক্ চাইতে চাইতে লোকটা ওর ঘর পার হ'য়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

শুভোর ভীষণ সন্দেহ হ'ল; অদেখা গুরু শার্লক্ হোম্‌স্‌কে স্মরণ ক'রে ও তীক্ষ্ন চোখে জমাট অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে তা'র দিকে চাইলে; পরিষ্কার বুঝতে পারলে চোর এসেছে।

আমাদের বাড়িতে আজ চোর এসেছে!

মনে মনে কথাটা ও আর একবার উচ্চারণ করলে উৎফুল্লভাবে আর তার আবির্ভাব বিশ্লেষণ ক'রে নিলে:

ছাদ থেকেই চোরকে আসতে দেখা গেছে, সুতরাং ছাদ দিয়েই সে বাড়ি ঢুকেছে; আর ছাদে নিশ্চয়ই দড়ির মই দিয়ে উঠেছে। কিন্তু দরজাটা তো দালানের দিক্ থেকে বন্ধ থাকে—খুললে কী ক'রে? ওঃ হো, চোরটা কোন ঝি-চাকরকে ঘুষ খাইয়ে এই কাযটি হাসিল করেছে! যাক্, ব্যাপারটা তা হ'লে খোলসা হ'য়ে গেল।

...



এদিকে চোর সিঁড়ির দরজা খুলে নীচে নামতে আরম্ভ করেছে।

শুভো চট্ ক'রে বালিশের তলা থেকে টর্চ্ বার ক'রে জাল্‌লে, খাটের নীচের গোপন বাক্সটা খুলে ফেল্‌লে আর অশেষ ক্ষিপ্রতায় মিনিট দেড়েকের মধ্যেই কালো প্যাণ্ট্, কালো মুখোস্ প'রে, এক হাতে টর্চ্ অন্য হাতে হুইস্‌ল্ ও দড়ির ফাঁস নিয়ে সিঁড়ির দরজায় এল; রুদ্ধশ্বাসে মুখ নীচু ক'রে দেখ্‌লে, 'শিকার' নীচের দালানে নেমেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নামতে নামতে উল্লসিত, উদ্বেলিত শুভো একবার নিজের কথা ভাব্‌লে। এই নিস্তব্ধ, নিষুপ্ত, দুর্নিরীক্ষ্য রাতে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে শুন্‌তে ও শত্রুর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করতে চলেছে! বাড়ির সবাই মৃত্যু-গাঢ় ঘুমে অচৈতন্য। কেউই জানে না, ও তাদের কী বিপদ্ থেকে উদ্ধার ক'রবে, বা, কত বড় বিস্ময় তাঁদের জন্যে সঞ্চিত হচ্ছে!

এই আশ্চর্য্য অভিযান ওর অত্যন্ত দুঃসাহসিক মনে হ'ল; এ যেন কোন স্বপ্নের, কোন উপন্যাসের কাহিনী!

একটু পরেই শুভো চোরকে উঠোনে দেখ্‌তে পেলে।

এইবার যদি বাইরের দিকে পালায়? হুইস্‌ল্‌টা মুখের কাছে এনে ও দাঁতে ঠোঁট চেপে একটু ভাবল—এখুনি বাজিয়ে দেবে? নাঃ, তা হ'লে একেবারে কাপুরুষতা হয়। তা ছাড়া এতে আর মজা কী হ'ল; চোরের মনই যে 'ষ্টাডি' করা হ'ল না। এ রকম অবৈজ্ঞানিক ভাবে ধরিয়ে দিতে তো রাম-শ্যামও পারে। না, এত শীগ্‌গির ধরা হবে না।

দালানের একটা থামের আড়ালে থেকে ও চোরকে অভিনিবেশের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। চোখে ততক্ষণে অন্ধকার একটু সয়ে এসেছে—তাই সে আব্‌ছা দেখ্‌তে পেলে, চোরের গায়ে কোন জামা নেই। তা না থাকুক, না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু খালি পা; বেশ। বাঁ হাতে আবার কোঁচাটি ধরা হয়েছে! ভারী সৌখীন চোর তো!

চোর আস্তে আস্তে এগিয়ে সদর দরজার খিলে হাত দিলে, কিন্তু দরজা খুল্‌লে না। যেন খিলটা ঠিক দেওয়া আছে কি না দেখে, আবার এদিকে ঘুরে আস্‌তে লাগ্‌ল। উত্তেজিত শুভো চট্ ক'রে একটা কোণে দাঁড়িয়ে গেল।

চোর ওকে দেখ্‌তে পেলে না, ফিরে এল ভেতরের উঠোনে।

শুভোও তৎক্ষণাৎ ভেতর ও বার-বাড়ির মাঝখানকার দরজার আড়ালে আত্মগোপন ক'রল; উদ্‌গ্রীব হয়ে আশা কর্‌তে লাগ্‌ল—সদরের খিল পরীক্ষা ক'রে এসেছে চোর—এবার নিশ্চয়ই কায সারবার চেষ্টা ক'রবে।

কিন্তু না, চোরের মতলব ও এখনো বুঝ্‌তে পারে নি বল্‌তে হবে। ওকে স্তম্ভিত ক'রে

দিয়ে চোরটা ফুরফুরে হাওয়ায় পায়চারী ক'রতে আরম্ভ করলে। আর, তাও দিব্যি আমীরী চালে। এখনই ধরা পড়্‌লে কি হবে বাছাধনের খেয়ালই নেই। চুরি করতে এসে বাতাস খাওয়া হচ্ছে!

গলদ্‌ঘর্ম্ম শুভো ভাব্‌তে লাগ্‌ল: উঃ, কী সাংঘাতিক রহস্যময় চোর! ন' বছর বয়স থেকে পূরো ছ'টি বছর ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প প'ড়ে আসছি, শার্লক্ হোম্‌স্ থেকে রবার্ট ব্লেকের কোন কীর্ত্তিই তো জান্‌তে বাকি নেই—কিন্তু এমন ঘটনা যে কখন শুনি নি! চোরের এমন অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব হ'তে পারে, কোথাও এমন আভাস পাই নি! আর, কত দিনের আকুল কল্পনা, কত রাতের ব্যাকুল জল্পনা আজ যদি-বা সফল হ'ল, যদি-বা জীবনের এই পরম শুভক্ষণে চোর অনুগ্রহ ক'রে বাড়িতে পদার্পণ করল, তার সমস্ত চালচলন কি এম্‌নি দুর্ভেদ্য রহস্যময় হ'তে হয়?

অনন্যোপায়, অসহায় শুভোর এই অদৃশ্য পাহারার সামনে চোর বেশ খানিকক্ষণ হাওয়া খেয়ে নিলে। তার পর, ঘন অন্ধকারের জন্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলে না, কিন্তু ওর মনে হ'ল, চোর যেন ঝুঁকে প'ড়ে ও-কোণ থেকে একটা রজনীগন্ধা ছিড়লে!

রাগে ওর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা ক'রে উঠ্‌ল। আর একটু হ'লেই চোর ধরার ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌ছিল, নিজেকে সামলে নিলে কোন রকমে। ওঃ, এ যে একেবারে কবি! পরের ফুলগাছ পেয়ে খুব কবিত্ব করা হ'চ্ছে! চুরি করতে এসে মেজকা'র রজনীগন্ধায় হাত দেওয়া! দাঁড়াও, তোমার কাব্য করার শেষ হ'তে আর দেরী নেই। মেজকা'র হাতেই দেখছি তোমার প্রাণটি যাবে—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা?

সামনেই মেজকাকার ঘর, দরজা খোলা। চোর এবার সেই ঘরে ঢুকল। এইবারে আসল চুরি সুরু করবে। এ সময় চুপ ক'রে থাকলে চোরটা ঘুমন্ত মেজকা'র কোন ক্ষতি কর্‌বে না তো? এইবার কি তাকে হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া উচিত নয়?

আবার ভাবলে—'এখনো আমার সময় হয় নি।' বামাল সমেত একেবারে লোকটাকে ফাঁসে লট্‌কে সকলকে দেখাব। আর চোর তো সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—ভয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। একটু অপেক্ষা ক'রে দেখলে মন্দ কি?

এই ভেবে ও সিঁড়ির তলায় লুকাল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই চোর সে ঘর পার হয়ে দালানের দিকে এগিয়ে গেল। ওদিকে যে বাথরুম্ ছাড়া কিছু নেই তা তো বেচারা জানে না! বাথরুম্ দেখে চোর তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল!

ব্যাপারটা এত আকস্মিক আর এত অপ্রত্যাশিত যে, শুভো দেখবার অবকাশই পেলে না—চোর কি কি জিনিষ নিলে!

...



সে যাই হোক, ঘটনা আর ঘোরালো হ'তে দেওয়া উচিত নয়—ওর মনে হ'ল, এই উত্তম সুযোগ। নিজের ফাঁদ চোরটা নিজেই পেতে দিলে। উঃ, কী বোকা, কী বোকা! এই বুদ্ধি নিয়ে চুরি করবার সখ—আর তাও আবার শুভেন্দুশেখর সেনের বাড়ি? এম্‌নি ইঁদুরে মতন ধরা পড়াই তার উচিত।

পা টিপে টিপে এসে শুভো বাথরুমের দরজার শিকলটি টুক্ ক'রে বন্ধ ক'রে, সজোরে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে দিলে: একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার।

তীব্র, তীক্ষ্ণ আওয়াজে শব্দহীন, ভারী রাত যেন খান্ খান্ হ'য়ে গেল, বাড়ির সকলের নিটোল ঘুম টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে গেল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটা কাটিয়ে শুভোর বাবা সর্ব্বাগ্রে নীচে নেমে এসে আলো জাল্‌লেন: বিস্মিত, হতচকিত চোখে দেখলেন—কালো হাফপ্যান্ট, কালো মুখোস প'রে, টর্চ, হুইস্‌ল্ আর দড়ি হাতে বীর-বিক্রমে কে দাঁড়িয়ে!

তাঁর মুখ থেকে কোন ভাষা ফোটবার আগেই শুভো ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্-এর কায়দায় চোখের ওপর থেকে মুখোসটা খুলে ফেল্‌লে আর চার্লি চ্যাপলিনের ভঙ্গীতে এক পাক ঘুরে নিয়ে—(ঘটনাস্থলে তখন আর সকলেও উপস্থিত)—সবাইকে সশঙ্কিত, শশব্যস্ত ক'রে ব'লে উঠল: "বাবা, ছোটকা, দাদা! চোর ধরেছি, এই বাথরুমে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হুলস্থূল প'ড়ে গেল। হাতের কাছে যে যা পেলে নিয়ে এল চোর ধরতে, আর শায়েস্তা করতে। ওর দাদা আনলে তা'র নতুন হকিষ্টিক্‌টা।

ওর বাবা বল্‌লেন: "ওরে শোন্ শোন্, ওসব হাঙ্গামে কাষ নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ—"

শুভো প্রতিবাদ জানালে: "না, না, আপনি বুঝছেন না, বাবা! আর কিচ্ছু করবার দরকার নেই। কাজ তো আমি প্রায় সেরেই রেখেছি। এখন দরজাটি খুল্‌ব আর এই ফাঁসে ঝোলাব।"

কথাটা সকলেরই অনুমোদন পেলে।

এদিকে এত হট্টগোল, চোর ধরার ফন্দী নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে, ভেতর থেকে দরজা ঠেলাঠেলি ক'রে চোর যে কী বল্‌ছে, সেদিকে কারুর খেয়ালই নেই।

যা হোক, সবাইকার উৎকর্ণ উপস্থিতিতে—বাথ্‌রুমের একপাশে দড়ির ফাঁস হাতে শুভো (মুখে ওর বৌদ্ধ গাম্ভীর্য্য আর গোয়েন্দাসুলভ একাগ্রতার দর্শনীয় সংমিশ্রণ) আর একপাশে ওর দাদা এসে দাঁড়াল ষ্টিক্‌টা মাথার ওপর তুলে বলির ঘাতকের খাঁড়া ধরার মতন।

ছেলেমেয়ের দল বড় বড় চোখে চেয়ে রইল সেদিকে।

এইবার বাথ্‌রুমের দরজা বাইরে থেকে খুলে দেখা হ'ল (ভেতর থেকে চোর আগেই খুলেছিল)।

কিন্তু, আশ্চর্য্য! চোর বেরুল না; বরং কেমন যেন চেনা আর দারুণ রাগী গলায় ধমক দিয়ে উঠ্‌ল: "স'রে যা বাঁদর!"

থতমত খেয়ে ওরা সত্যিই স'রে গেল; বিস্ময়-বিস্ফারিত, অবিশ্বাস্ত চোখে দেখ্‌লে—বাথ্‌রুম থেকে বেরিয়ে এলেন—আর কেউ নয়—মেজকাকা!

তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই রহস্যভেদ করতে হ'বে না, (কারণ এর মধ্যে কোন রহস্যই নেই)—তা ছা'ড়া, তোমরা তো আর শুভোর মতন 'রোমাঞ্চকর' ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাসের আস্বাদ পাও নি!

---

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌.এস্‌-সি

## পেন্সিলের কথা

ইস্কুলে যাবার সময় বই-খাতার সঙ্গে পকেটে পেন্সিলটিও চাই। ছুরি দিয়ে মুখটা একটু চেঁছে নিলেই হ'ল—তার পর ঘষ্‌ ঘষ্‌ করে খাতা যুড়ে যেমন খুসী লিখে যাও। আমাদের ঠাকুরদা'দের আমলে কিন্তু এ সুবিধা ছিল না। দড়িতে বাঁধা দোয়াত ঝুলিয়ে নিয়ে তাঁদের পাঠশালায় যেতে হ'ত, একটু অসতর্ক হলেই হাতে জামায় কালিতে মাখামাখি ব্যাপার। আজকাল অবশ্য ফাউণ্টেন পেনের আদর বেড়েছে কিন্তু তবুও পেন্সিল ছাড়া লেখাপড়ার কথা এখনও আমরা ভাবতে পারি না।

পেন্সিলকে তোমরা কেউ কেউ বল 'লেড্‌ পেন্সিল'। 'লেড্‌' মানে সীসে—তা হ'লে লেড্‌ পেন্সিল হ'ল গিয়ে সীসের পেন্সিল। কেউ কেউ আবার বল "উড্‌ পেন্সিল" বা কাঠ-পেন্সিল। ২।১ জনকে আবার আর এক কাঠি ওপরে



গিয়ে "উট্‌ পেন্সিল" বলতেও শোনা যায়। কিন্তু এর সবগুলিই ভুল নাম। পেন্সিলকে তো লেড্‌ পেন্সিল কিছুতেই বলা চলে না। পেন্সিলের শীষ তৈরী হয় গ্র্যাফাইট্‌ আর মাটী মিশিয়ে। কাঠের মধ্যে ভরা থাকে বলে উড্‌ পেন্সিল বলা গেলেও সে কাঠে তো আর লেখা পড়ে না। কাজেই কাঠ-পেন্সিল নামটাও ঠিক নয়।

পেন্সিল কি ভাবে তৈরী হয় বলি। গ্র্যাফাইটের নাম তোমরা শুনেছ কি? এটি এক রকম খনিজ পদার্থ। কয়লা, হীরে—এগুলি যেমন আসলে অঙ্গার, গ্র্যাফাইট্‌ও তেমনি অঙ্গার ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ ভিতরকার উপাদান এক টুক্‌রো কয়লারও যা, এক টুক্‌রো হীরেরও তাই, আবার এক টুক্‌রো গ্র্যাফাইটেরও তাই। গ্র্যাফাইট্‌ জিনিষটাও দেখতে কালো—কিন্তু বেশ চক্‌চকে। ঐ রকম রং দেখে আগে লোকে মনে করত ওর মধ্যে বুঝি সীসে মেশান আছে, তাই ওকে বলা হ'ত 'ব্ল্যাক্‌ লেড্‌' বা কালো সীসে। এবং সেই জন্যই ও দিয়ে তৈরী পেন্সিলকে বলা হ'ত লেড্‌ পেন্সিল। কিন্তু বাস্তবিক্‌ পক্ষে ওর সঙ্গে লেডের বা সীসের কোন সম্পর্ক নেই।

পেন্সিল তৈরীর কারখানায় এই গ্র্যাফাইট্‌ মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে খুব ভাল করে যন্ত্রের সাহায্যে গুঁড়ো করা হয়। খুব মিহি গুঁড়ো হ'লে তার মধ্যে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে খুব ক'রে দলাই মলাই করা হয়। জিনিষটা তখন দেখতে হয় কাদা কাদা। এই কাদা নিয়ে খুব সরু দু'দিক্‌ খোলা নলের এক মুখের মধ্যে প্রচণ্ড চাপে ঢুকিয়ে দিলে নলের অপর মুখ দিয়ে তা সরু শীষের আকারে বেরিয়ে আসে, এবং আগুনে গরম করে শুকিয়ে নিলেই তা শক্ত শীষে (পেন্সিলে যেমনটি দেখ) পরিণত হয়। গ্র্যাফাইট্‌ আর মাটীর পরিমাণ অদল-বদল ক'রে শক্ত, নরম, মাঝারি—ইত্যাদি নানা ধরণের পেন্সিল তৈরী করা যায়। মাখবার সময় ভিতরে ইচ্ছেমত রং মিশিয়ে দিলে রঙ্গিন পেন্সিলও পাওয়া যায়।

শীষ তৈরী হ'লে কাঠে ভরবার পালা। এটা কিছুই নয়, দু'টুক্‌রো খাঁজকাটা লম্বাটে কাঠের খাঁজের মাঝখানে এই শীষ ঢুকিয়ে আঠা দিয়ে যুড়ে দিলেই হ'ল। তার পর তার ওপর রং চাপিয়ে, পালিশ ক'রে, ছাপ দিয়ে দিলেই পেন্সিল তৈরী

শেষ হ'ল। বলা বাহুল্য পেন্সিল তৈরীর সমস্ত ব্যাপারই আজকাল বড় বড় কারখানায় নানা যন্ত্রের সাহায্যে চট্‌পট্ সারা হয়—নইলে মজুরী পোষাবে কেন?

সাইবেরিয়ায় গ্র্যাফাইট্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্যানাডা, জার্ম্মেনী, ইটালি, জাপান, সিংহল প্রভৃতি দেশেও জিনিষটির অভাব নেই—ভারতবর্ষেও আছে। তবে পেন্সিলের পক্ষে নাকি সাইবেরিয়ার গ্র্যাফাইটেরই খুব আদর।

## খানাপিনার কথা

চিড়িয়াখানায় হরেক রকম জানোয়ার থাকে। বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে তাদের ঠিকমত খানাপিনার ব্যবস্থা রাখতে হয়। এ ব্যাপারটি নেহাৎ সহজ বলে মনে ক'র না এবং সময় বিশেষে চিড়িয়াখানার কর্ত্তাদের এ নিয়ে কম বিপদে পড়তে হয় না।

শুধু পরিমাণই নয়, খাবারের বৈচিত্র্যও কম গোলমেলে নয়। সিঙ্গীমশাই বা ব্যাঘ্রমশাই শুধু মাংসই খাবেন কিন্তু গণ্ডার প্রায় তাঁদের সমান বলশালী হয়েও খাবেন নিরামিষ। যাঁরা মাংসাশী তাঁদেরও রুচি এক রকম নয়। কেউ খাবেন ঘোড়া-গরুর মাংস, কেউ খাবেন পাখী, কেউ বা শুধু মাছ। টিকটিকি, ইঁদুর, খরগোস, পোকা-মাকড়—এ সব খাবারের ব্যবস্থাও কারো কারো জন্য করতে হয়। কেউ চান জ্যান্ত, কেউ মরা, কারোটা আবার রেঁধে দিলে ভাল হয়। মানুষের মত সৌখীন খাবারের ফর্দ্দও অনেকের আছে—ডিম, পাঁউরুটি, শশা, কলা, চা, বিস্কুট ইত্যাদি।

কয়েক বছর আগে একটা চিড়িয়াখানার বাৎসরিক খাবারের হিসেব বেরিয়েছিল। এখানে তার একটু নমুনা দিচ্ছি:—ঘোড়ার মাংস বারো হাজার মণ, পাঁঠার মাংস চার হাজার মণ, মাছ দেড় হাজার মণ, খড় এগার হাজার মণ, ফল কুড়ি হাজার মণ, তরিতরকারি সাড়ে পাঁচ হাজার মণ, পাঁউরুটি ষোল শ' মণ, ডিম পঁচিশ হাজার। এ ছাড়া খুচরো আরো অনেক কিছু।

হবেই বা না কেন? ধর আমাদের হস্তী মশাই। আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় একটা হাতী ছিল সে প্রত্যহ গড়ে ত্বু' মণ খড়, গোটা ২০।২৫ পাঁউরুটী, মণ দেড়েক ফল-ফলারি আর সের ত্রিশেক জল খেত। এ সব না হলে তার ঐ বিরাট্ বপু



পুষ্ট হবে কি ক'রে? এক-একটা সি-লায়ন্‌কে দিনে অন্ততঃ আধমণ মাছ খাওয়াতে হয়। সিন্ধুঘোটকও খেতে ওস্তাদ্। হাতীসীলও কম নন।

অজগরের খোরাক খুব বেশী নয়—মাসে মাত্র একবার সের ত্রিশেক ইঁদুর, খরগোস বা গিনিপিগ্ তাঁর চাই। তবে মুশকিল হচ্ছে, এগুলো তাঁকে জ্যান্ত দিতে হবে। তার পর এক মাস কিছু না দিলেও চলবে। সময় মত খাবার না পেলে কিন্তু সে যা পাবে তাই গিলবে। একবার নাকি হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা অজগর তার এক জাতভাইকেই গিলে ফেলেছিল। যেটিকে গিলেছিল সেটি ছিল ৯ ফুট, আর যে গিলেছিল সে ছিল সাড়ে দশ ফুট। বোঝ কাণ্ডখানা!

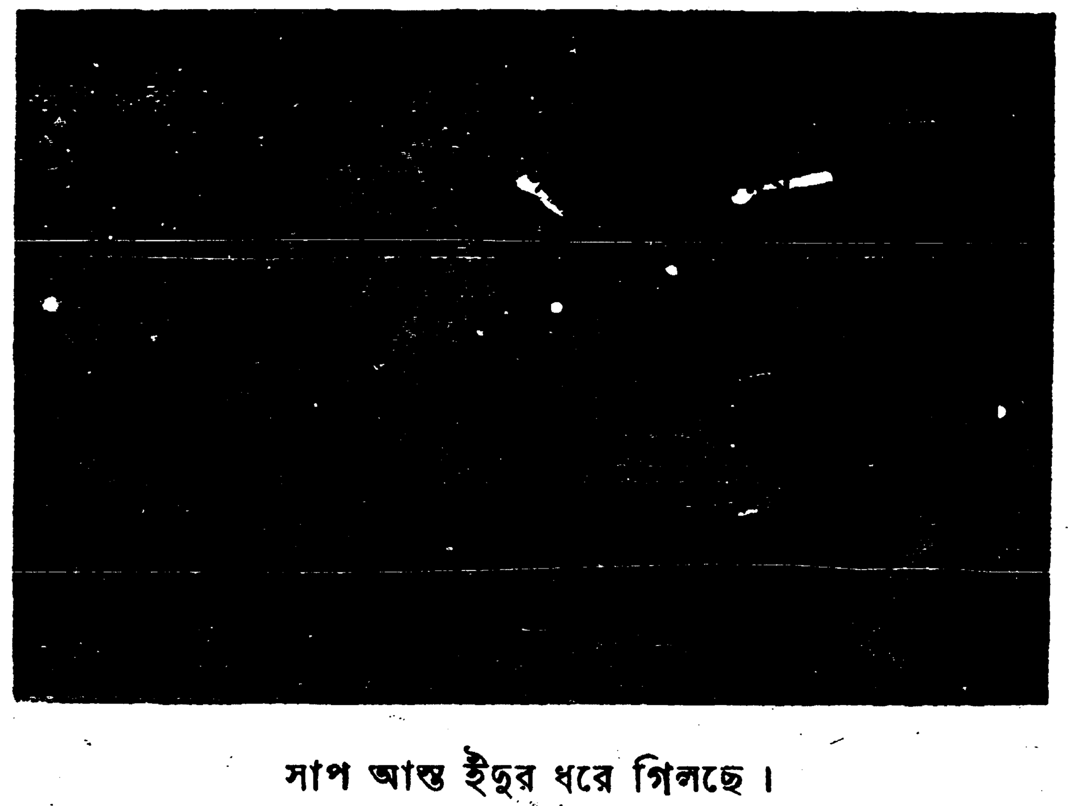

সাপ আস্ত ইঁদুর ধরে গিলছে।

উট পাখী লেট্যুস খেতে ভালবাসে। তবে সময় বিশেষে তার পেটে আরও অনেক অখাদ্য-কুখাদ্য পাওয়া যায় যা সে চুরি করে খাবার চেষ্টা করে; যেমন—দড়ি, চাবি, চিরুণী, রুমাল, পয়সা, পেরেক ইত্যাদি। ছাগল-হরিণ-গরু এদেরও এ বিষয়ে একটু-আধটু বদ্‌নাম আছে। আমাদের স্কুলের একটি বন্ধু একবার পড়া না পারায় মাষ্টার মশাইকে জবাব দিয়েছিল যে তাদের পোষা হরিণটা তার মেকানিক্সের বইটা খেয়ে ফেলেছে তাই সে সেদিন পড়ে আসতে পারে নি। গরুতে কাপড়-জামা-বই খেয়ে যাচ্ছে এ রকম তো প্রায়ই দেখা যায়। একবার এক চিড়িয়াখানায় একটা হরিণ মারা যায়। কি কারণে মারা গেল পরীক্ষা করতে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ তার পেট কেটে দেখেন সেখানে প্রায় সের আষ্টেক খবরের কাগজ আর ঠোঙ্গা জমে রয়েছে—হজম হয় নি।

জ্যান্ত মাছি, ফড়িং, আরশোলা এ সব খাবারের ব্যবস্থাও কোন কোন ভোজনবিলাসী জীবের জন্য রাখতে হয়। গিরগিটি, বহুরূপী—এদের এই ব্যবস্থা। হর্ণবিল্—যাকে বাংলায় বলে ধনঞ্জয় পাখী, আস্ত ডিম খেতে ওস্তাদ্। এক জাতের সাপ আছে তারা অন্য সাপ ছাড়া আর কিছু খায় না। বানর—ওরাং ওটাং, শিম্পাঞ্জী, বেবুন, হনূমান, উল্লুক এদের খাবার অনেকটা মানুষের মত। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এদের জন্য চা-পাঁউরুটি, শশা, কলা ইত্যাদির বরাদ্দ আছে। বিলেতের চিড়িয়াখানায়, শুনেছি, শিম্পাঞ্জীরা মদ, সিগারেট্ ইত্যাদিও খেতে সুরু করেছে।

যাঁরা নিরামিষ খান তাঁরাও কম হাঙ্গামা বাধান না। কারণ সকলেই তো

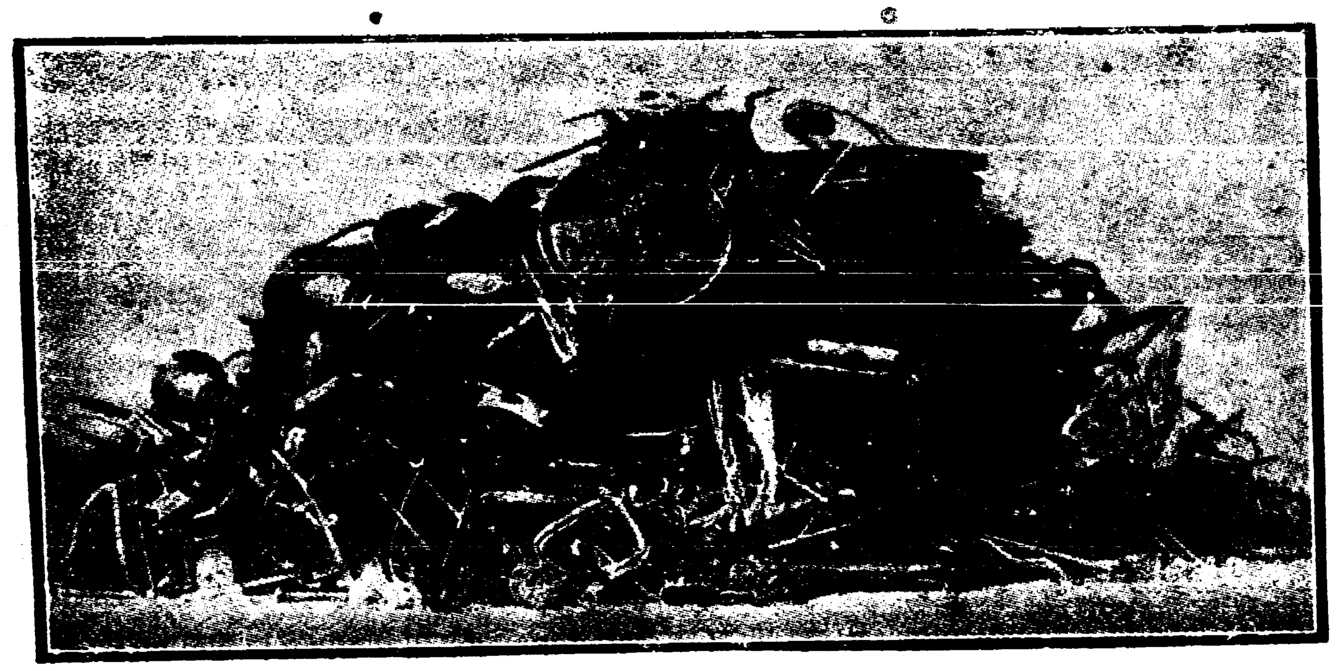

একটি মেম সাহেবের পেটে এই উপাদেয় 'খাবার'গুলি পাওয়া গিয়েছিল।

কচি ঘাসের ভক্ত নন। কত রকম গাছ-গাছড়া, লতাপাতা, শ্যাওলা ইত্যাদি এর জন্য যোগাড় করতে হয়। এর এটা সহ্য হয় না ওটা দাও, ওর ওটা সহ্য হচ্ছে না অমুক শাক আন—এ তো লেগেই আছে। এই তো সেদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পর পর ক'টা জিরাফ মরে গেল—তাদের নাকি ঘাসে ভিটামিন্ কম পড়েছিল। নতুন যে জিরাফ এসেছে তার খাবারে ভিটামিনের ব্যবস্থা রাখতে নিশ্চয়ই বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

জানোয়ারদের খাবারের কথা তো বল্‌লাম। আর মানুষের খাবার?

...



মানুষ যে কি খায় না তাই বলা কঠিন। আমিষ, নিরামিষ,—ফলমূল, শাকপাতা, পাখী, ডিম, পোকামাকড়, ইঁদুর, সাপ, আরশোলা, ফড়িং কিছুই মানুষ খেতে বাদ দেয় নি। আসল খাবার ছেড়ে নকল খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতেও সে কসুর করে নি। নতুন নতুন রকমের খাবারের বাতিকও অনেকের থাকে বলে শোনা গেছে। যেমন—একজনের ছিল খবরের কাগজ খাওয়া অভ্যাস। আর একবার একটি মেম সাহেবের পেটে যন্ত্রণা হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করে যে সব খাবার বার করেছিলেন তার একটা ছবি ও পাতায় দিলাম। এর মধ্যে সেফ্‌টিপিন, স্ক্রু, পয়সা ( পেনি ) সুতো সবই পাবে। ইনি উটপাখীর সঙ্গে খাবারের পাল্লা দিতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে?

---

[ ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী ]

## পনেরো

সন্ন্যাসী একেবারে শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—স্থিরো ভব। একজন সাধারণ সন্ন্যাসীকে দেখে এতটা চঞ্চল হওয়া তোমার মত মেয়ের পক্ষে শোভন নয়।

এবার কন্যাকুমারীর বুকে সাহস এল। অনেক চেষ্টায় মুখে কথা ফুটল, বল্‌লে—আপনি কে? এত রাতে এখানে এসেছেন কেন?

—সবই বলছি মা, শান্ত হ'য়ে শোন, অত জোরে কথা বল্‌লে পরিচারিকার ঘুম ভেঙে যাবে, তাতে সব কথা বলার সুবিধা হবে না, তোমার ক্ষতি হবে।

পরিচারিকা কাছে আছে, তা কন্যাকুমারী প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আগের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল, সহজ ভাবেই বল্‌লে—আমার কি ক্ষতি হবে?

—হ্যাঁ মা, তোমারই ক্ষতি হবে,—সন্ন্যাসী বল্লেন; তুমি জান না তুমি কে। তোমার পূর্ব্ব-স্মৃতি লোপ পেয়েছে, এখন তুমি নিজেকে সম্রাট্ মিহিরকুলের কন্যা বলেই জান, কিন্তু সত্যি তো তুমি তা নও।

—আমি তা জানি। আমি জানি আমি পথে কুড়িয়ে-পাওয়া জাতিগোত্রহীন······

—ওর সবটুকু সত্য নয় মা,—ভৈরব বাধা দিয়ে বল্লেন—তুমি রাজার মেয়ে। তোমার বাবা-মা হুনদের হাতে নিহত হ'লে তোমার ভাই পালিয়ে যায়। তোমাকে আমি মহাকালের মন্দিরে আশ্রয় দিই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে নিরাপদে রাখা সম্ভব নয় দেখে মিহিরকুলের মহিষীর হাতে আমি তোমাকে সমর্পণ করি। তাঁর কোন সন্তান ছিল না, তিনি তোমাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করছিলেন। ইতিমধ্যে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি খুন হন।

—একটা ছোট মেয়েকে রক্ষা করার শক্তি আপনাদের ছিল না, গলগ্রহ হিসাবে একদিন শত্রুর হাতে আমাকে সমর্পণ করেছিলেন, সেই কথাই আজ আমাকে শোনাতে এসেছেন?

—তা ছাড়া তোমার জীবন রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, মা। চেদীর রাজকন্যাকে প্রত্যেক প্রজাটি চেনে, তাদের মুখে মুখে একদিন হুনদের কানেও তোমার খবর গিয়ে পৌঁছাত, সেদিন তোমাকে রক্ষা করা যেত না।

—আমি চেদীর রাজকন্যা!—কন্যাকুমারীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠ্ল।

—হ্যাঁ মা, তোমার নাম সুনন্দা।

—আমি চেদীর রাজকন্যা, আমার নাম সুনন্দা!—কন্যাকুমারী ধীরে ধীরে কথাটি ক'বার আবৃত্তি কর্ল, নিজের মনকেই যেন সে বোঝাতে লাগ্ল এই কথাগুলি, শোনাতে চাইল নিজের কানকে। তার পর বল্লে—কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি আমাকে সে কথা শোনাতে এসেছেন কেন?

—শোনাতে এসেছি কারণ আজ এ কথা বলার প্রয়োজন আছে। তোমার সহোদর ভাই আজ বিপন্ন, হূন-সম্রাটের কবল থেকে আজ তাকে রক্ষা করতে হবে। এবং সে কাজ একা তোমার দ্বারাই সম্ভব—তুমিই পারবে।

—কে আমার সহোদর ভাই?

—কালো সওয়ার।

—কালো সওয়ার?

—হ্যাঁ। কালো সওয়ার তার সাধারণ পরিচয়, তার সত্যিকারের পরিচয় রাজ্যহারা যুবরাজ যশোদেব।



—তাকে তো সম্রাট্ আজ রাত্রে ফুটন্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছেন বলে শুনেছি। এখন আমি তাকে কি করে বাঁচাব?

—তুমিই পারবে। তুমি সেখানে অবাধে যেতে পারবে যা আর কেউ পারবে না। প্রয়োজন হ'লে আঘাতও করতে হবে।

—আঘাত করতে হবে? কা'কে?

—আঘাত করতে হবে হূন সম্রাট্‌কে। যে হূন সম্রাট্ তোমার পিতামাতার মৃত্যুর কারণ, অজস্র প্রজাসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচারের কারণ, সারা ভারতের জনগণের সর্ব্বনাশের হেতু, তাকে আঘাত করলে পাপ নেই। সমগ্র উত্তরাপথ যে নররক্তে কলুষিত করেছে তার রক্তপাতে পাপ নেই। অত্যাচারীকে শাস্তি দিলে পাপ হয় না, হয় অমরত্ব লাভ; রাবণকে বধ ক'রে রাম যেমন অমর হয়েছেন, কংসকে বধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেবত্ব পেয়েছেন······

—আপনি কি বলেন আমি তা হ'লে হূন-সম্রাট্‌কে খুন কর্ব?

—আমি বলি তুমি তোমার ভাইকে রক্ষা করবে এবং সেজন্য যদি প্রয়োজন হয় হূন-সম্রাট্‌কে আঘাত করতেও পিছ্-পা হবে না। সম্রাটের চেয়ে ভাই বড়, ভাইয়ের চেয়েও বড় পিতামাতার রক্তাক্ত স্মৃতির তর্পণ করা·····

ব্রহ্মচারী এমনভাবে তাকালেন যে কন্যাকুমারী কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়্ল, সেই বিচ্ছুরিত দৃষ্টিশক্তির সামনে সে কোন কথা বল্তে পারল না। ভৈরব আচার্য্য উত্তরীয়ের মধ্য থেকে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বের করে বল্লেন,—এই নাও।

—কি কর্ব?

—প্রয়োজনে আঘাত কর্বে।

—আমার কাছে আছে—কন্যাকুমারী কটিবস্ত্রের অন্তরাল থেকে একখানি ছুরিকা বের করে দেখাল।

—আর একখানা রাখতে ক্ষতি কি? প্রথমখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে দ্বিতীয়টা কাজে লাগবে।

কন্যাকুমারী প্রত্যাখ্যান কর্তে পারল না, অভিভূতের মত ছুরিকাখানি গ্রহণ কর্ল।

ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল চোখে কন্যাকুমারীর মুখের পানে তাকালেন, তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—জয়স্তু!

## ষোল

কালো সওয়ারকে হাতে পেয়ে সম্রাট্ মিহিরকুল উল্লসিত হয়ে উঠ্ল, তার মুখের কঠোর রেখাগুলি কোমল হয়ে এল, খুসি মনে অনুচরদের বল্লে—তেল গরম কর্; সয়তানটাকে আমি

—হ্যাঁ মা, তোমারই ক্ষতি হবে,—সন্ন্যাসী বল্লেন; তুমি জান না তুমি কে। তোমার পূর্ব্ব-স্মৃতি লোপ পেয়েছে, এখন তুমি নিজেকে সম্রাট্ মিহিরকুলের কন্যা বলেই জান, কিন্তু সত্যি তো তুমি তা নও।

—আমি তা জানি। আমি জানি আমি পথে কুড়িয়ে-পাওয়া জাতিগোত্রহীন······

—ওর সবটুকু সত্য নয় মা,—ভৈরব বাধা দিয়ে বল্লেন—তুমি রাজার মেয়ে। তোমার বাবা-মা হূনদের হাতে নিহত হ'লে তোমার ভাই পালিয়ে যায়। তোমাকে আমি মহাকালের মন্দিরে আশ্রয় দিই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে নিরাপদে রাখা সম্ভব নয় দেখে মিহিরকুলের মহিষীর হাতে আমি তোমাকে সমর্পণ করি। তাঁর কোন সন্তান ছিল না, তিনি তোমাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করছিলেন। ইতিমধ্যে এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি খুন হন।

—একটা ছোট মেয়েকে রক্ষা করার শক্তি আপনাদের ছিল না, গলগ্রহ হিসাবে একদিন শত্রুর হাতে আমাকে সমর্পণ করেছিলেন, সেই কথাই আজ আমাকে শোনাতে এসেছেন?

—তা ছাড়া তোমার জীবন রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, মা। চেদীর রাজকন্যাকে প্রত্যেক প্রজাটি চেনে, তাদের মুখে মুখে একদিন হূনদের কানেও তোমার খবর গিয়ে পৌঁছাত, সেদিন তোমাকে রক্ষা করা যেত না।

—আমি চেদীর রাজকন্যা!—কন্যাকুমারীর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠ্‌ল।

—হ্যাঁ মা, তোমার নাম সুনন্দা।

—আমি চেদীর রাজকন্যা, আমার নাম সুনন্দা!—কন্যাকুমারী ধীরে ধীরে কথাটি ক'বার আবৃত্তি কর্‌ল, নিজের মনকেই যেন সে বোঝাতে লাগ্‌ল এই কথাগুলি, শোনাতে চাইল নিজের কানকে। তার পর বল্‌লে—কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি আমাকে সে কথা শোনাতে এসেছেন কেন?

—শোনাতে এসেছি কারণ আজ এ কথা বলার প্রয়োজন আছে। তোমার সহোদর ভাই আজ বিপন্ন, হূন-সম্রাটের কবল থেকে আজ তাকে রক্ষা করতে হবে। এবং সে কাজ একা তোমার দ্বারাই সম্ভব—তুমিই পারবে।

—কে আমার সহোদর ভাই?

—কালো সওয়ার।

—কালো সওয়ার?

—হ্যাঁ। কালো সওয়ার তার সাধারণ পরিচয়, তার সত্যিকারের পরিচয় রাজ্যহারা যুবরাজ যশোদেব।



—তাকে তো সম্রাট্ আজ রাত্রে ফুটন্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছেন বলে শুনেছি। এখন আমি তাকে কি করে বাঁচাব?

—তুমিই পারবে। তুমি সেখানে অবাধে যেতে পারবে যা আর কেউ পারবে না। প্রয়োজন হ'লে আঘাতও করতে হবে।

—আঘাত করতে হবে? কা'কে?

—আঘাত করতে হবে হূন সম্রাট্‌কে। যে হূন সম্রাট্ তোমার পিতামাতার মৃত্যুর কারণ, অজস্র প্রজাসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচারের কারণ, সারা ভারতের জনগণের সর্ব্বনাশের হেতু, তাকে আঘাত করলে পাপ নেই। সমগ্র উত্তরাপথ যে নররক্তে কলুষিত করেছে তার রক্তপাতে পাপ নেই। অত্যাচারীকে শাস্তি দিলে পাপ হয় না, হয় অমরত্ব লাভ; রাবণকে বধ ক'রে রাম যেমন অমর হয়েছেন, কংসকে বধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেবত্ব পেয়েছেন······

—আপনি কি বলেন আশ্রিতা হ'লে হূন-সম্রাট্‌কে খুন কর্‌ব?

—আমি বলি তুমি তোমার ভাইকে রক্ষা করবে এবং সেজন্য যদি প্রয়োজন হয় হূন-সম্রাট্‌কে আঘাত করতেও পিছ্‌-পা হবে না। সম্রাটের চেয়ে ভাই বড়, ভাইয়ের চেয়েও বড় পিতামাতার রক্তাক্ত স্মৃতির তর্পণ করা·····

ব্রহ্মচারী এমনভাবে তাকালেন যে কন্যাকুমারী কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়্‌ল, সেই বিচ্ছুরিত দৃষ্টিশক্তির সামনে সে কোন কথা বল্‌তে পারল না। ভৈরব আচার্য্য উত্তরীয়ের মধ্য থেকে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বের করে বল্‌লেন,—এই নাও।

—কি কর্‌ব?

—প্রয়োজনে আঘাত কর্‌বে।

—আমার কাছে আছে—কন্যাকুমারী কটিবস্ত্রের অন্তরাল থেকে একখানি ছুরিকা বের করে দেখাল।

—আর একখানা রাখতে ক্ষতি কি? প্রথমখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে দ্বিতীয়টা কাজে লাগবে।

কন্যাকুমারী প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারল না, অভিভূতের মত ছুরিকাখানি গ্রহণ কর্‌ল।

ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল চোখে কন্যাকুমারীর মুখের পানে তাকালেন, তার মাথায় হাঁত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—জয়স্তু!

## ষোল

কালো সওয়ারকে হাতে পেয়ে সম্রাট্ মিহিরকুল উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল, তার মুখের কঠোর রেখাগুলি কোমল হয়ে এল, খুসি মনে অনুচরদের বল্‌লে—তেল গরম কর্; সয়তানটাকে আমি

ফুটন্ত তেলে ভাজব, বুঝিয়ে দেব সম্রাট্ মিহিরকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণাম কি! সারা হিন্দুস্থান ভয়ে কেঁপে উঠবে!......হ্যাঁ, আর ওই মেয়েটাকেও রাখব না, ওকেও শেষ করব ওই একই সঙ্গে।

শৃঙ্খলিত কালো সওয়ার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সম্রাটের আদেশ সে শুনলে। কিন্তু সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হ'ল না, তার মুখের এতটুকু ভাব পরিবর্ত্তন হ'ল না।

সম্রাট্ পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করল, সে মধু-ভাণ্ড নিয়ে এসে মিহিরকুলের পানপাত্র পূর্ণ করে দিলে। মধু পান করে নেশার আমেজে সম্রাট্ হেসে উঠ্‌ল, কালো সওয়ারকে উদ্দেশ করে বল্‌লে—এতদিন তো দূর থেকে চোখ রাঙিয়ে অনেক কথা বলেছ, এখন কাছে এসে একেবারে বোবা হ'য়ে গেলে বন্ধু? কথা বল। নির্ব্বাক্ থাকা তো তোমার শোভা পায় না,—একটা কথা বল, একটু মিষ্টি কথা। আচ্ছা, না হয় একটা রাগের কথাই বল, একটু গাল দাও। তাও দেবে না? বেশ, তা হ'লে একটা গান গাও, একটা ঘুমপাড়ানী গান, কি একটা মধু-পানের গান—যা তোমার ইচ্ছা।

কালো সওয়ার নিরুত্তর, আগের মতই নির্ব্বিকার।

—হাঃ হাঃ, তা হ'লে তুমিও মৃত্যুকে ভয় কর বন্ধু? য়্যাঁ!

চারিপাশের অনুচরেরা সে হাসিতে যোগ দিলে, একজন টিপ্পনী কাটল—সে কথা আবার নতুন করে কি বল্‌তে হবে প্রভু, দেখছেন না বাছাধনের শ্রীমুখখানি এতটুকু হয়ে গেছে!

আর একজন বল্‌লে—হবে না? যতই হোক হিন্দু তো, ওদের মুখই সর্ব্বস্ব। হ্যাঁ, হ'ত হূন, দেখিয়ে দিত কি ক'রে দাঁড়িয়ে বীরের মত মরতে হয়।

সাধু! সাধু! বলে মিহিরকুল আবার মধুপানে মত্ত হ'ল।

শাস্ত্রী কালো সওয়ারকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, মিহিরকুল বল্‌লে—না না, বাইরে নয়, সব হবে এইখানে, আমার চোখের সামনে, আমি দেখব।

সেইখানেই আয়োজন সুরু হ'ল। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড উনান তৈরী হয়ে গেল। কাঠ এল, অগ্নিসংযোগ করা হ'ল। উনানের উপর প্রকাণ্ড কড়াই তেলপূর্ণ করা হ'ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কড়াইয়ের তেল ফুটে উঠ্‌ল। উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যবস্থা দেখে মিহিরকুল এবার খুসিতে ঝলমল্ করে উঠ্‌ল, এত খুসি বোধ হয় তার অনুচরেরা তাকে আর কখনও দেখে নি। নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে সম্রাট্ বল্‌লে—এইবার প্রস্তুত হও বিদ্রোহী, মহারাজ অশোকের মত আমি এবার তোমাকে তৈলকটাহে নিক্ষেপ করব।

কালো সওয়ার এবার কথা বল্‌লে, মৃদু হেসে বল্‌লে—আপনার স্পর্দ্ধার প্রশংসা করি সম্রাট্। মহারাজ অশোকের সঙ্গে নিজের তুলনা করা আপনার মুখে শোভা পায় না।



—আহা, আমি এখন চণ্ডাশোক হ'য়ে আছি, তোমাকে গরম তেলের মাঝে ফেলছি। উপগুপ্ত সন্ন্যাসীর মত তুমি তৈলকটাহ থেকে সুস্থ দেহে উঠে এস, তখন আমিও ধর্ম্মাশোক হব, চাই কি তার চেয়ে বড়ও হ'তে পারি।

—সে অবসর বোধ হয় তুমি পাবে না সম্রাট্।

—কি করে পাই বল?—তুমি যদি পুড়েই মরে যাও!

—তা হ'লে তোমাকেও মরতে হবে।

—হাঃ হাঃ, সে তো এখনই বোঝা যাবে, কে মরে—তুমি না আমি।

সম্রাট্ অনুচরদের ইঙ্গিত করল, শাস্ত্রীরা কালো সওয়ারকে ধরে নিয়ে এল উনানের পাশে।

রজ্জুবদ্ধ মল্লিকা একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিল, মিহিরকুল সেদিকে নির্দ্দেশ করে বল্‌লে—ওটাকেও নিয়ে এস এদিকে, দুটোকে এক সঙ্গে ঝল্‌সানো যাবে! তোফা কাবাব তৈরী হবে কুত্তাগুলোর জন্যে।

হূনেরা মল্লিকাকেও টেনে আন্‌ল কালো সওয়ারের পাশে।

সম্রাট্ এবার উঠে এল, উনানের পাশে এসে তেলের কড়াইএর দিকে একবার দৃষ্টি দিলে, ফুটন্ত তেলের ঝাঁঝে তার নাকে-চোখে জল এসে পড়্‌ল। চোখ মুছতে মুছতে উৎসাহ-ভরে বল্‌লে—ঠিক হ্যায়! এইবার......

ঠিক সেই সময়ে কন্যাকুমারী এসে ডাকল—সম্রাট্!

—সম্রাট্ মুখ ফেরাল, বিরক্ত স্বরে বল্‌ল—কি? তুমি আবার এখানে কেন? কি চাও?

—আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

—কী?

—একটা ভিক্ষা চাই।

—কি, বল ঝট্‌পট্।

—কালো সওয়ারের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

—সাবাস! এই কথা তুমি আমাকে এই সময়ে বল্‌তে এসেছ?

—আপনার পায়ে পড়ি সম্রাট্!

কন্যাকুমারী সম্রাটের পায়ে ধরতে গেল, মিহিরকুল পদাঘাতে তার হাত সরিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—না। বিদ্রোহীকে আমি কখনও ক্ষমা করি না, কারুর কথাতেই নয়, স্বয়ং ভগবান্ এলেও নয়, রাজদ্রোহীর ক্ষমা নেই।

কন্যাকুমারী এবার উঠে দাঁড়াল, ধারাল কণ্ঠে বল্‌লে—আপনিও কি বিদ্রোহী নন্ সম্রাট্?

বিধাতার সৃষ্টিকে আপনি দিনের পর দিন ধ্বংস করে চলেছেন, সমগ্র হিন্দুস্থান নররক্তে কলুষিত করেছেন—এ সব কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়?—বিধাতার বিরুদ্ধে আপনার রাজদ্রোহ নয়?

—তোমার বিধাতা যদি শক্তিমান্ হন, আমায় শাস্তি দিন।

আমার বিধাতা আমাকে উপলক্ষ্য করে আপনার সম্মুখীন হয়েছেন,—বিচার চাইছেন। আপনার বিদ্রোহীকে আপনি ক্ষমা না কর্‌লে বিধাতাও আপনাকে ক্ষমা কর্‌বেন না।

—অর্থাৎ? তোমার বিধাতা আমার কি কর্‌বেন?

—বিদ্রোহীর জন্য আপনি যে বিধান দেবেন।

—অর্থাৎ তুমি আমাকে প্রাণের ভয় দেখাতে চাও?—মধুমত্ত সম্রাট্ সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল—একটা পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ের কথায় সম্রাট্ মিহিরকুল ভয় পাবে, তত ভীরু, তত দুর্ব্বল আমি নই।

সম্রাটের কণ্ঠস্বরের অনুসরণে তেম্‌নি দৃপ্ত স্বরে কন্যাকুমারী বল্‌লে—আমি পথে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে নই সম্রাট্। আমি চেদীর রাজকুমারী সুনন্দা, আর ওই কালো সওয়ার হচ্ছেন আমার ভাই,—চেদীর রাজকুমার যশোদেব।

মধুমত্ত সম্রাট্ চম্‌কে উঠ্‌ল।

বন্দী দু'জনও চম্‌কে উঠ্‌ল।

চারিপাশের হূনেরাও চম্‌কে উঠ্‌ল।

তার পর সম্রাট্ বল্‌লে—তা হ'লে তো অনেক আগেই ওর মরা উচিত ছিল…এই, ওদের দুটোকে ফেলে দাও, আর দেরী ক'র না।

—এখনও ভেবে দেখুন সম্রাট্।

হাঃ হাঃ করে মিহিরকুল হেসে উঠল। ভারতের মাটিতে এর চেয়েও আরো কত নিষ্ঠুরতা সে দেখিয়েছে, কত জন তাকে শাসিয়েও গেছে, কিন্তু সে সব জল-বুদ্বুদের মত কোথায় হারিয়ে গেছে। বিজয়দৃপ্ত মিহিরকুলের কাছে শক্তিহীনের বৃথা আস্ফালন হাস্যকর শুধু।

অনুচরেরা যশোদেব ও মল্লিকাকে ধর্‌ল ফুটন্ত তেলে ফেলে দেবার জন্য। সুনন্দা আর সইতে পার্‌ল না, ছুটে গিয়ে যারা যশোদেবকে ধরেছিল তাদের একজনকে আঘাত কর্‌ল। আহত হয়ে লোকটি আর্ত্তনাদ করে উঠল, কিন্তু সম্রাট্-তনয়াকে কিছু বল্‌তে কেউ সাহস পেল না, সকলে থমকে দাঁড়াল। রক্তাক্ত ছুরিকা নিয়ে কন্যাকুমারী তর্জ্জন করে উঠল—এখনই বন্দীকে ছেড়ে দাও নাহ'লে তোমরা সকলেই আমার হাতে মর্‌বে।

মিহিরকুল গর্জ্জে উঠল—দাঁড়ালে কেন? ফেলে দাও।

—খবরদার!—সুনন্দা রুখে দাঁড়াল।



মিহিরকুলের মুখে এবার নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল, কোন কথা না বলে কোমর-বন্ধ থেকে ছুরিকা খসিয়ে নিয়ে সে ছুঁড়ে মার্‌ল যশোদেবের দিকে। শৃঙ্খলিত যশোদেব এ জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, ছুরিকাখানি তাঁর পিঠে আমূল বিঁধে গেল। মল্লিকা শিউরে উঠল, চীৎকার করে উঠল।

(ক্রমশঃ)

---

# কণ্টক

শ্রীঅশোক সেন, এম্ এ

বিহারের কোন এক সহর থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের নীচে ছোট একটি বনভূমি। শীতের এক সন্ধ্যায় একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে জনৈক শিকারী—হাতে তার গুলিভরা বন্দুক। কিন্তু তার লক্ষ্য বনের পশু নয়—তারই আবাল্য পরিচিত একটি লোক। তারই সন্ধানে রাঘব সিং অন্ধকারে অস্থির-চিত্তে পায়চারী করছে। শিকারের লক্ষ্য মানুষ! ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক ঠেক্‌ছে, নয় কি?

একটু খুলেই বলি। এই অঞ্চলটি শিকারের প্রশস্ত জায়গা এবং এর মালিক এই রাঘব সিং। কিন্তু এই আইনসঙ্গত অধিকার লাভ করবার পেছনে দুইটি পরিবারের তিক্ত মনোমালিন্য ও বিরোধের ইতিহাস আছে এবং এটা চলে আসছে রাঘব সিং ও বেণীপ্রসাদের বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমল থেকে। এই জমি বেদখল হওয়ার জন্য রাঘবকে বহু বার আদালতে আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং অনেক সময় এর মীমাংসা হয়েছে রক্তপাতে। তারই পরিণামে বেণীপ্রসাদ ব্যক্তিগতভাবে রাঘব সিংএর পরম শত্রু। ছেলেবেলায় ওরা পরস্পরকে ঘৃণা করেছে, সুযোগ পেলে গলা টিপে ধরতেও কসুর করে নি। বড় হয়েও ওরা একজন আর একজনের অমঙ্গল কামনা করেছে এবং সুবিধে পেলে নানারকম ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ওদের এই মনোমালিন্য চরমভাবে আত্ম-প্রকাশ করত তখনই যখন বেণীপ্রসাদ চুরি করে এই বনে ঢুকে শিকার নিয়ে পালাত। সেইজন্যই রাঘব সিং এই জায়গাটা সম্বন্ধে সব সময় এত সতর্ক। বারো মাসই ওদের গতিবিধির ওপর ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়।

তাই আজ কয়েকজন পাহারাওয়ালা নিয়ে এই শয়তানদের শায়েস্তা করবার জন্য রাঘব সিং এখানে অসময়ে উপস্থিত। সে মরিয়া হয়েই এসেছে—দরকার হ'লে বেণীপ্রসাদকে আজ খুন করবে। তার সঙ্গীদের একটা ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করতে হুকুম দিয়ে রাঘব সিং টিলা

থেকে নেমে আস্তে আস্তে এগিয়ে চল্‌ল গভীর জঙ্গলের দিকে। যে কোন মুহূর্ত্তে সেই শয়তানটার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে—এ জন্য সে আজ প্রস্তুত হয়েই এসেছে। এই ভীষণ রাত্রিতে যদি তার দেখা পাওয়া যায়! ওঃ, তা হ'লে তার জীবনের সর্ব্বোচ্চ সাধ মেটাতে পারে। খুন করবার মত এমন নিরালা জায়গা সে আর কোথাও পাবে না। এই ভাবে ভাবতে ভাবতে একটা মোড় ঘুরতেই সে দেখল, বেণীপ্রসাদ তার সামনে উপস্থিত। দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—হাতে তাদের বন্দুক—মনে জল্‌ছে প্রতিহিংসার আগুন। রাঘবের মাথায় খুন চেপে গেল। চরম সুযোগ উপস্থিত। একটু ইতস্ততঃ করল। একবার তার বুক কেঁপে উঠল; শত হ'লেও সভ্য সমাজের মানুষ তো—একেবারে স্বহস্তে রক্তপাত করতে একটু দ্বিধা আসে বৈ কি! তাই বিমূঢ় অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত্ত কাটল। ঠিক এই সময়ে এক অঘটন ঘট্‌ল। ঝড়ো বাতাসে একটা অশ্বত্থ গাছের বিরাট একখানা শাখা ভেঙ্গে মড়্‌ মড়্‌ করে ওদের ওপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই ধরাশায়ী হ'ল। রাঘবের পায়ের ওপর ভারী ডালখানা পড়তেই ওর মনে হ'ল—পা-টা একেবারে থেঁতো হ'য়ে গেছে, আর বাঁ-হাতখানা পিঠের তলায় আট্‌কা পড়ে গেছে। দুই-তিন হাত দূরে বেণীপ্রসাদেরও ঠিক এই অবস্থা। কপালে ও মুখে চোট লেগে দর্‌ দর্‌ ক'রে রক্ত পড়ছে—সমস্ত শরীর ওদের ক্ষত-বিক্ষত। যন্ত্রণায় ওরা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌ল। প্রাণে বেঁচে গেলেও সেই স্তূপীকৃত শাখাপ্রশাখার নীচে ওরা এমনভাবে চাপা পড়ে গেল যে বাইরে থেকে কেউ এসে সাহায্য না করলে ওখান থেকে বেরিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব।

রাঘব নিজে যে প্রাণে বেঁচে গেছে এজন্য ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল; কিন্তু সেই সঙ্গে ওর চিরশত্রুর এই দুর্দ্দশা দেখে একটা নিষ্ঠুর আনন্দও পেল। বেণীপ্রসাদ তখনও কাৎরাচ্ছে; ওকে লক্ষ্য করে বল্‌ল: "শয়তানের উপযুক্ত সাজাই হয়েছে। মর নি' কিন্তু আমার হাতে আজ বন্দী। পরের ধনে পোদ্দারী কর্‌তে গিয়ে আজ ফাঁদে পড়েছ, বাছাধন! আমার কি? আমার দলবল এখনই এসে পড়ল বলে—ওরা এলেই আমাকে টেনে বের করবে। কিন্তু তোমাকে আজ পুঁতে তবে আমি নিশ্চিন্ত হ'ব।" বেণীপ্রসাদ চুপ করে কথাগুলো শুন্‌ল; তার পর আস্তে আস্তে বল্‌ল—"খুব যে বড়াই কর্‌ছ, জেনে রেখো, আমিও একা আসি নি। আমার সঙ্গের লোকেরা কাছেই আছে। ওরা আগে এসে পড়লে তোমাকে কিছু আর বাঁচতে দেবে না—ওরা ওদের মনিবের শত্রুকে ভাল করেই চেনে। তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় ওরা তা' জানে।

এই রকম মধুর বাক্য-বিনিময়ে কিছুক্ষণ কেটে গেল। দেখা গেল, যার দলের লোক আগে এসে পৌঁছবে তার জয়ই সুনিশ্চিত। নিজে বেরোবার চেষ্টা করে করে ওরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল; সেজন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর অন্য গতি ছিল না। রাঘবের তখন তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে ডান হাতখানাকে ছাড়িয়ে এনে পাশ থেকে ফ্লাস্ক্‌ বের করে একটু



জল খেল। উঃ, কি মিষ্টি লাগল জলটা! নিজের পিপাসা মিটিয়ে মাথাটা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা কর্‌ল, বেণীপ্রসাদের কি অবস্থা। ওর চাপা গোঙানী কানে আসতেই রাঘবের মনটা হঠাৎ কেমন কেমন করে উঠ্‌ল—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: "আমার ফ্লাস্কে একটু জল আছে। খাবে? ফ্লাস্কটা ছুঁড়ে দেব নাকি?"

রুক্ষস্বরে বেণীপ্রসাদ জবাব দিল, "শত্রুর কোন জিনিষ আমি স্পর্শ করি না—সেটুকু আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আমার আছে।" কথাটা শুনে রাঘব যেন একটু অপ্রস্তুত হ'ল—প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বল্‌তে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ কাটল। চারিদিকে হু হু বাতাস, আর সেই সঙ্গে কন্‌কনে শীত। নিঝুম অন্ধকার রাত্রি। মাঝে মাঝে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়। আর শোনা যায় বেণীপ্রসাদের অস্ফুট আর্ত্তনাদ। তাই শুনে রাঘবের প্রাণটাও ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। নিজেকে কঠিন করতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। আগের সেই বিদ্বেষ ও ঘৃণা যেন কোন যাদুস্পর্শে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হ'ল। এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! মানুষের ব্যথায় মানুষের প্রাণ কি এমনি করেই কেঁদে ওঠে! রাঘব সিং সেই স্তব্ধতা ভেঙ্গে একটু নীচু গলায় বল্‌ল, "দেখ বেণীপ্রসাদ, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না? তোমার দলের লোক এলে তোমার যা খুসী তাই ক'র; কিন্তু তার আগে আমি কয়েকটা কথা বল্‌তে চাই। আজ এই বিপদের দিনে আমি একটা চরম শিক্ষা লাভ কর্‌লাম। এতদিন তো আমরা শুধু হানাহানি করেই এসেছি, কিন্তু তাতে কি স্বস্তিটা পাওয়া গেছে? এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে আজ থেকে দু'জনে বন্ধুভাবে জীবন আরম্ভ করা যাক্‌ না। তাতে আমরা জীবনে অনেক বড় কাজ করতে পারব। আমার দলের লোকেরা যদি আগে এসে পড়ে, তোমাকেই আগে উদ্ধার করতে বল্‌ব ওদের, যেমন করে মানুষ তার বিপন্ন প্রতিবেশীকে সাহায্য করে।" এই বলে রাঘব চুপ কর্‌ল। বেণীপ্রসাদের কাছ থেকে কিছুক্ষণ কোনই সাড়া এল না। তার পর হঠাৎ সে অস্ফুটস্বরে বল্‌ল, "সত্যি, তা হ'লে ভারী মজা হয়। আমরা যদি আজ থেকে হঠাৎ ভাই বলে বন্ধুত্ব স্থাপন করি, কাল তা হ'লে সবাই অবাক্‌ হয়ে যাবে। তখন তোমাকে আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াব—আর তুমিও আমাকে এই বনে শিকার কর্‌তে আস্‌বার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। তোমাকে সত্যি কথাই বলি। এই একটু আগে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ছাড়া অন্য ভাব ছিল না কিন্তু এখন, বিপদের মুখে, মনে হচ্ছে আমরা সব এক—বন্ধু ছাড়া কিছু নই।"

দু'জনেই চুপ কর্‌ল। ওদের মনে তখন এক গভীর আলোড়ন চল্‌ছে; অবাক্‌ হয়ে ভাবছে, কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল। দু'জনেই এখন মানুষের পায়ের শব্দ শোন্‌বার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় কান খাড়া করে আছে। দু'জনেই মনে মনে কামনা কর্‌ছে, তার দলের লোক যেন আগে এসে পড়ে। তা হ'লে একজন আর একজনকে বন্ধুত্বের সম্মান দেখাবার সুযোগ পাবে।

কিন্তু কাছাকাছি জনমানবের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। রাঘব তখন বল্‌ল,—"কেউ তো এদিকে আস্‌ছে না; এস, আমরা একসঙ্গে চীৎকার করে ডাক ছাড়ি, যদি ওরা শুনতে পায়।" এই বলে ওরা অনেকক্ষণ একসঙ্গে চীৎকার কর্‌ল—ওদের কণ্ঠস্বর বনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হ'ল। কিন্তু সে ডাকের কোন সাড়া মিল্‌ল না। হতাশ হয়ে দু'জনে চুপ্‌চাপ্‌ পড়ে আছে, এমন সময় রাঘব হঠাৎ বলে উঠ্‌ল,—"ঐ যে, খশ্‌ খশ্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইবার বোধ হয় ওরা এই দিকেই আস্‌ছে।" এই বলে কান খাড়া ক'রে শব্দের গতি লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। একবার একটু আশান্বিত হ'য়ে উত্তেজিত-কণ্ঠে বল্‌ল—"টিলার ওপর কতগুলো মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি; আমাদের দলের লোকেরাই বোধ হয়; যাক্‌, বাঁচা গেল।" তার পর ওদের সঙ্কেত দেবার জন্য দু'জনে আবার সমস্বরে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। সেই চীৎকারে খশ্‌ খশ্‌ শব্দ থেমে গেল। বোধ হয় ওরা শুনেছে। নইলে থামল কেন? ঐ যে আবার দৌড়ের শব্দ!

বেণীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল: "দলে কত জন আছে ব'লে মনে হয়?"

রাঘব: "ঠিক বুঝতে পারছি না, জনা দশ-বারো হবে বোধ হয়।"

"তা হ'লে ওরা তোমারই লোক হবে; আমার সঙ্গে তো মাত্র সাত জন আছে।"

রাঘব হৃষ্টচিত্তে বলে উঠল—"ঐ যে, ওরা প্রাণপণে এই দিকেই দৌড়িয়ে আস্‌ছে।"

বেণীপ্রসাদ অধৈর্য্য হ'য়ে বল্‌ল—"ওরা কি তোমার লোক? একেবারেই কাছে এসে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"না"—রাঘব অস্ফুটস্বরে বল্‌ল, ভয়ে তার কণ্ঠরোধ হ'য়ে এল।

"তবে ওরা কারা?" চকিতে বেণীপ্রসাদ আবার জিজ্ঞেস কর্‌ল।

"একপাল নেকড়ে বাঘ।" *

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

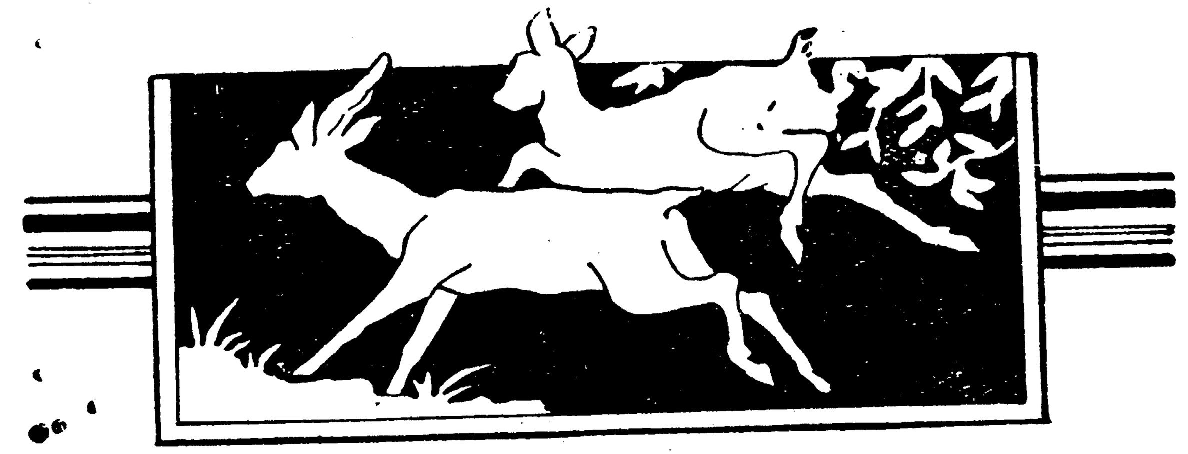

হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর এবং ব্রহ্মের কতকটা অংশ জাপান অধিকার করেছে তা তোমরা জান; আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও এখন তাদের হাতে গেছে। সম্প্রতি কয়েক দিন হ'ল তারা সিংহলের কলম্বোতে এবং অন্ধ্রদেশের ভিজাগাপট্টম্‌ ও কোকনদে বোমা বর্ষণ করে গেছে। ভারতের মাটিতে তাদের এই প্রথম আক্রমণ।

বৃটীশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যর্‌ ষ্ট্যাফোর্ড্‌ ক্রিপ্‌স ভারতে এসেছেন—যুদ্ধের পর ভারতকে 'ডোমিনিয়ান্‌ ষ্ট্যাটাস্‌' জাতীয় একটা শাসন-সংস্কার দেওয়া সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। বর্ত্তমান সঙ্কটকালে ভারতের সহানুভূতি তাঁদের প্রয়োজন। কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা, মুস্‌লিম লীগ ও ঐ রকম অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলছে। আজ ৯ই এপ্রিল—এখনও ব্যাপারটার মীমাংসা হয় নি।

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্যর্‌ আজিজুল হক্‌ হাই কমিশনার হয়ে ইংলণ্ডে যাওয়ায় তাঁর জায়গায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ভাইস্‌চ্যান্সেলার হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যর্‌ আজিজুল হক্‌কে অনারারি ডি. লিট্‌ উপাধিতে সম্মানিত করেছেন।

যুদ্ধে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয় তার এক-একটার দাম কি অসম্ভব রকম তা অনেকেরই ধারণা নেই। সম্প্রতি কয়েকটির দাম কাগজে বেরিয়েছিল। এখানে তা তুলে দিলাম:—

একটি বড় বোমারু বিমান—২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, একটি মাঝারি আকারের বোমারু বিমান—২ লক্ষ টাকা, একটি 'ফাইটার' বা জঙ্গী বিমান—১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, একটি বিমান-ধ্বংসী কামান—২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, একটি ক্রুজার ট্যাঙ্ক—১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা, একটি ছোট ট্যাঙ্ক—৬০ হাজার টাকা ইত্যাদি।

* * *

খেলাধূলায় আজকাল মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় মেয়েদের রেকর্ড এখানে তুলে দিচ্ছি, দেখলেই বুঝবে এখন তাঁদের আর যাই বল ঠিক 'অবলা' বলা চলে না।

হাইজাম্পে ডোরোথি অডহাম্‌ ৫ ফুট [illegible] ইঞ্চি লাফিয়েছেন। লং জাম্পে জাপানের কে. হিতোমি লাফিয়েছেন ১৯ ফুট ৮ [illegible] ইঞ্চি। পোল্যাণ্ডের ওয়ালাসিউইক্‌ ১০·৫ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়েছেন। হল্যাণ্ডের দেহুদেন ৫৯·৮ সেকেণ্ডে ১০০ গজ সাঁৎরে পার হয়েছেন। আমেরিকার মিস্‌ ডিড্রিক্‌সন্‌ ১১·৫ সেকেণ্ডে ৮০ মিটার হাড্‌ল্‌ রেস্‌ বিজয়ী হয়েছেন।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১) কাজল | (২) শীতল | (৩) গরম | (৪) সবিতা | (৫) চশমা |
| জজল | তবলা | রসাল | বিহার | শবর |
| ললনা | ললাট | মলম | তারকা | মারণ |

### উত্তরদাতাদের নাম

সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ) ; মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ) ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ ( রামচন্দ্রপুর ) ; জ্ঞানময় মজুমদার, পতু ও শম্ভু ( কাঁথি ) ; উমা, নিখিল, ম্যানেজার বিমল বাবু ( আঁটপুর ) ; রিণা রায় ( দেওঘর ) ; জামগ্রাম মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ; সন্তোষ, মনোতোষ, সলিল, সমীর, শ্যামল প্রভৃতি ( বহরমপুর ) ; মা, মীনা, মগন, শিবু ( জামসেদপুর ) ; সীতা সরকার ও মীরা বসু ( বাঁকুড়া ), অশোক, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না ঝরণা, পিন্টু ( বহরমপুর ) ; বিমলেন্দু, নির্ম্মলেন্দু মজুমদার, যাদবচন্দ্র ঘোষ, নীলিমা, ইলা প্রভৃতি ( কুরুমগ্রাম ) ; পুণ্যশ্লোক রায় ( বাঁকুড়া ) ; রত্না, জয়ন্ত ও স্বপ্না রায় ( বাঁকীপুর ) ; গোরাচাঁদ, চণ্ডী, হাবু, রামগতি ( ভিরিঙ্গী ) ; রমেশচন্দ্র, চুণী, লহর, কানু ও মুক্তি সেনগুপ্ত পট্টনায়ক ( রামচন্দ্রপুর ) ; উষসী সেনগুপ্তা, শেখর, আশিস, স্বপন ( ঢাকা ) ; অর্চ্চনা, গায়ত্রী, আশমান, উমা, শচীন ( নীলফামারী ) ; মুকুল ও টুলু ( নীলফামারী ) ; রামপ্রসাদ গাঙ্গুলী, আলোক চ্যাটার্জ্জি, নমিতা, তারক, গীতা প্রভৃতি ( হাওড়া ) ; বাণী মৈত্র ( নতুন ভারেঙ্গা ) ।

---

## নূতন ধাঁধা

তোমার সামনে আমি রয়েছি কিন্তু তোমার সাধ্য নেই আমাকে ধরে রাখ। তবে হ্যাঁ, আমার অঙ্গে কলমের আঁচড় কেটে আমাকে বদলে নিতে পার। তখন ইচ্ছে করলে আমাকে দিনের প্রথম ভাগে কিংবা শেষ ভাগে যখন চাও পাবে। পরের দিন তো আমি থাকবই। আমার শরীরে সামান্য একটু অংশ যুড়ে নিলে আমাকে এই এই ভাবে পাবে :—দেবী রূপে, ফল রূপে, হ্রদ রূপে, মহকুমা রূপে, বিখ্যাত বীর রূপে, প্রসাধন-সামগ্রী রূপে। তবে আমার পিঠে যেন দাগ কেট না—তা হ'লে আমি কোন কথাই শুনব না।

আমাকে চিনতে পার ? কি ভাবে পারলে বুঝিয়ে দাও।

---


**বাহির হইয়াছে**

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

# হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি

গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্

হুকা-কাশির

বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙিন মলাট

দাম মাত্র আট আনা

---

প্রকাশিত হইল

**রবীন্দ্রনাথের লেখা**

নূতন গল্পের বই

# গল্পসল্প

শোভন রঙীন মলাট : উপহারের উপযোগী

দাম এক টাকা

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত**

কবিতার বই

শিশু—৸৹

শিশু ভোলানাথ—১৲

ছেলেদের অভিনয়োপযোগী নাটক

মুকুট—৷৵৹

শারদোৎসব—১৲

ডাকঘর—৷৷৹

**ছেলেমেয়েদের জন্য**

মেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক

নটীর পূজা—৷৷৹

আবৃত্তির উপযোগী কবিতা

কথা ও কাহিনী—১৲

কণিকা—৷৹

হাসির বই

সে—২৷৷৹ ও ৩৲

খাপছাড়া—৩৲ ও ৩৷৷৹

হাস্যকৌতুক—৸৹

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের চিত্র

# ছেলেবেলা

মূল্য ১৷৷৹

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।



১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C 1641.


ছোটদের উপহারের সেরা বই

## বদ্যিনাথের বড়ি

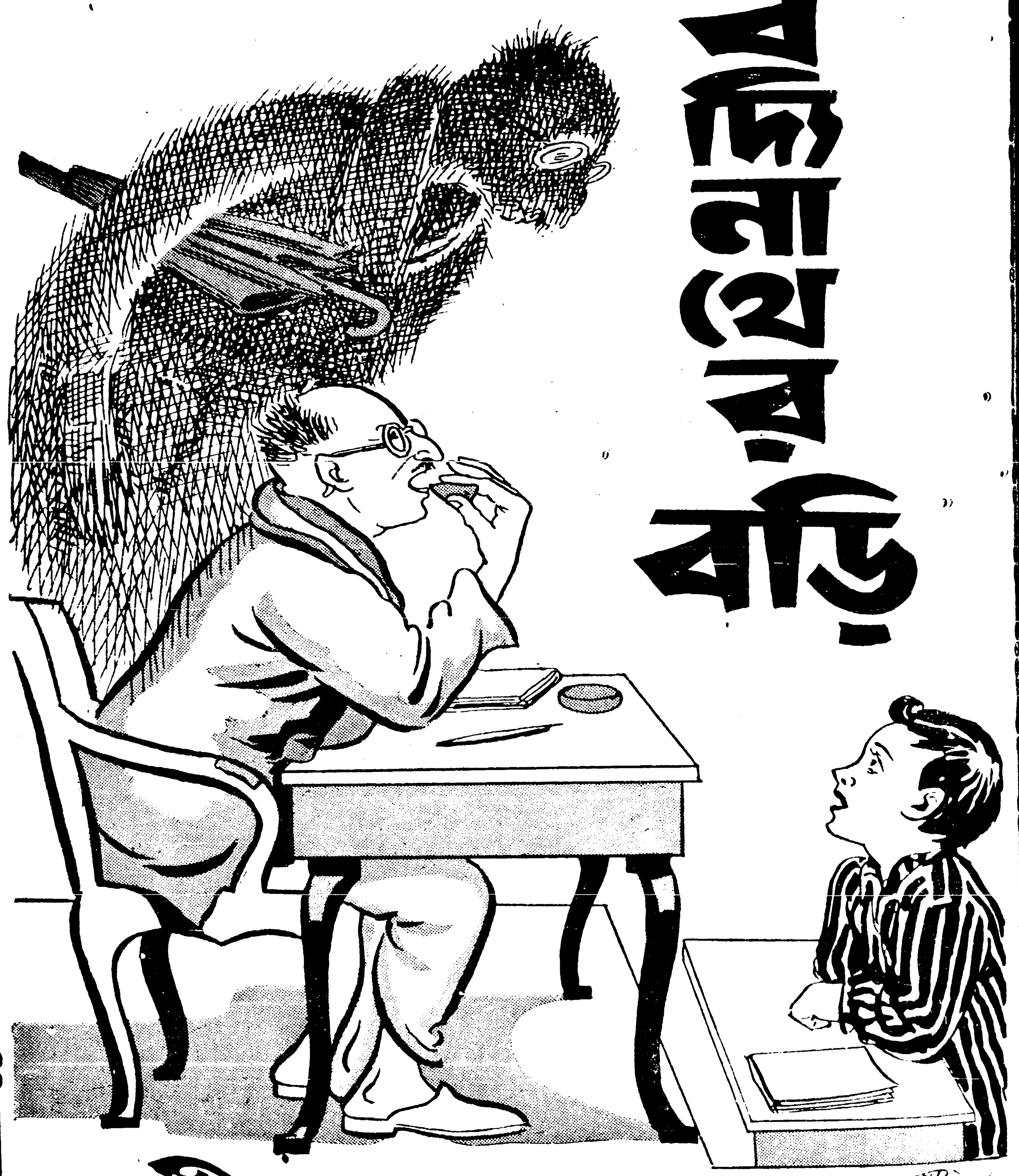


লীলা মজুমদার

দাম—আট আনা মাত্র : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ। ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।

Cover: C. H. Aran & Co.


১৫শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ পঞ্চম সংখ্যা

# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বার্ষিক ২।০ প্রতি সংখ্যা ।০


মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে

আবিষ্কৃত ১৯০২ ]

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

## রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১৸৵০; প্রতিসংখ্যা। ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

**সোনার হরিণ**
হকা-কাশির নতুন রহস্যময় দুঃসাহসিক উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

**হাস্য ও রহস্য**
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙিন মলাট। দাম ৸৵০

**পদ্মরাগ** (২য় সংস্করণ)
হকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

**চা'য়ের ধোঁয়া** (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷৷৹

**নূতন পুরাণ**
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৸৵০

**এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে**
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ৸৵০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

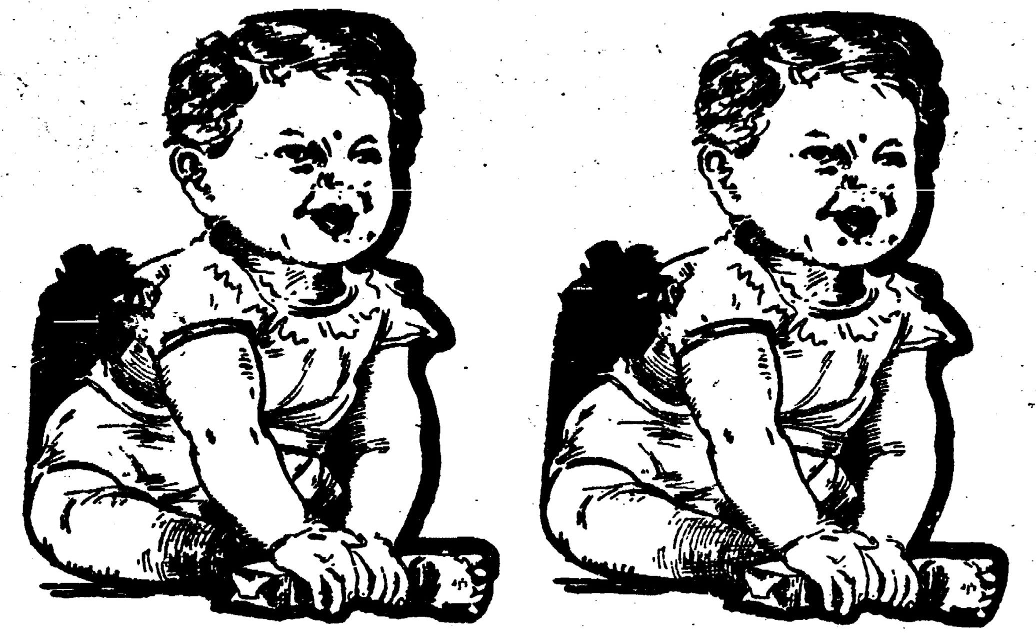

ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে
দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

# বন্দীবীর

নতুন সংস্করণ

সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে, নতুন ভাবে, নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশিত হোলো।

যুগের সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে হবে তাই—

বর্ত্তমানকালের উপযোগী করে বইখানার আগাগোড়া সংস্কার করা হোলো। এই সংস্করণের গানগুলি নতুন, ঘটনার সমাবেশ নতুন, ছেলেদের পক্ষে অভিনয় জমানো অনেক সহজ ও সরল হয়ে উঠ্‌বে।

হাজার শিশুর দাবী মেটাতে বইখানি ঠিক তাদেরই উপযোগী করে প্রকাশিত করা হোলো। আগের সংস্করণের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, নতুন নাটকীয় উপাদানে ভরপুর।

**নামে সেই 'বন্দীবীর' আসলে একখানা নতুন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নাটক।**

হাস্য রস, বীর রস, করুণ রস,—সমস্ত রসের অদ্ভুত রসায়ন।

কঙ্কাল সিংয়ের তলোয়ারের প্যাঁচ্ দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে দর্শকদের পেটে খিল্ ধরে যাবে।

একখানা নতুন সংস্করণের 'বন্দীবীর' না হলে সমস্ত আনন্দ উৎসব মাটি হয়ে যাবে।

—দাম ছয় আনা মাত্র—

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য [illegible]

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ১৲

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৷৵৹

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৶১৹

## আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৷৹

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—৷৵৹

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ (যন্ত্রস্থ)

---

## ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা

= সুন্দর বই =

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

**কলকাতার হালচাল** ... ৷৵৹

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

**দিগ্বিজয়ী বীর** ... ৷৷৹

**মহাভারতের গল্পগুচ্ছ**

১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতিখণ্ড ... ৷৷৹

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

**নতুন কিছু** ... ৷৷৵৹

জসীম উদ্দীনের

**হাসু** ... ... ৷৷৵৹

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

**ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি** ... ৷৷৹

শ্রীলীলা মজুমদারের

**বদ্যিনাথের বড়ি** ৷৷৹

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

**ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন** ... ৷৷৵৹

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

**অনুসন্ধানী** (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৷৹

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

**রং-চং** ... ... ৷৷৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

প্রথম পরিচয়

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

১৫শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ { ৫ম সংখ্যা

# অনাদৃত

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্

হাসিত একদা স্বদেশ আমার বক্ষে ধরিয়া পদ্মাধার,
গ্রহগীতি সম সঙ্গীত তার রণিয়া উঠিত বারম্বার বারম্বার।
যে গীতি গাহিত মলয় বায়
যে রূপ ফুটিত জলদ গায়
মুকুর সমান সকলি তায় দিত সে ধরিয়া স্নেহোপহার।

ডম্বরু-স্বনে ঘন অম্বর গাহিত যখন প্রাবৃট-গান
চঞ্চল নদি, নিমেষে তখন রুদ্র বীণায় তুলিতে তান।

প্রথম পরিচয়

# রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ { ৫ম সংখ্যা

## অনাদৃত

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এল্

হাসিত একদা স্বদেশ আমার বক্ষে ধরিয়া পদ্মাধার,
গ্রহগীতি সম সঙ্গীত তার রণিয়া উঠিত বারম্বার বারম্বার।
যে গীতি গাহিত মলয় বায়
যে রূপ ফুটিত জলদ গায়
মুকুর সমান সকলি তায় দিত সে ধরিয়া স্নেহোপহার।

ডম্বরু-স্বনে ঘন অম্বর গাহিত যখন প্রাবৃট-গান
চঞ্চল নদি, নিমেষে তখন রুদ্র বীণায় তুলিতে তান।

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

ফুলিয়া উঠিত সলিল ভার,
কুপিত ভুজগ বাঁধিয়া সার
বরজে যেন রে গরল ধার,—তৃপ্তি লভিত নয়ন-প্রাণ।

রচিয়া তোমার অঙ্গভূষণ সারি সারি সারি চলিত তরী,
গ্রাম্য মাঝির সরল কণ্ঠে আকাশ বাতাস উঠিত ভরি'।
উর্মিশিশুর চপল ঘায়
হেলিয়া দুলিয়া দখিনে বায়
কেমনে তরণী চলিয়া যায়, দেখেছি কত না সে কথা স্মরি।

শত হুঙ্কারে মত্ত মরুৎ ধ্বনিত যখন প্রলয় রাব
দেখেছি তোমার আননে, পদ্মা, অতি অপরূপ বিরূপ ভাব।
'পাড়িতে যেন রে নগর-গ্রাম
ফুলিত ফেনিল অলকদাম,
ভীষণে যে আছে মনোভিরাম দেখায়েছে তাহা তব প্রভাব।

স্মরি' উপকার তটিনী, তোমার, ফোটাতে তৃপ্তি চিত্তে তব
হরিত শস্য ধরিত বক্ষে স্বদেশ আমার নিত্য নব।
যখন আসিত শারদবালা
হরিতে পরাত কনকমালা
মায়ায় ভুবন করিত আলা, মধুর স্মিরিতি কত বা কব!

ছেড়ে গেছ আজ শপ্ত নগরী অজ্ঞাত কোন্ পাপের তরে
ম্লান মুখ আজ তপ্ত নগরী—দীপ্তি নাহিক' নয়ন 'পরে।
ক্ষতের আসন আঁকিয়া গায়
অনল যেমন চলিয়া যায়
স্বদেশ আমার তেমনি হায়, বলিতে সে কথা কথা না সরে।



শিশুকাল হ'তে পেলেছ যাহারে নিঃশেষে ঢালি' বুকের স্নেহ,
ভেঙে দেছ তার বুকের পাঁজর রেখে গেছ শুধু অসাড় দেহ।
অনিল পারে না প্রবোধ দিতে
শুধু বয়ে যায় ব্যথিত চিতে,
শূন্য সে হিয়া পুনঃ পূর্ণিতে পারে না পারে না পারে না কেহ।*

---

[ ভারতের বিস্মৃত যুগের এক বীরত্ব-কাহিনী ]

## সতেরো

রক্ত দেখে সুনন্দা আর মাথার ঠিক রাখতে পারলে না।—তবে তুমিও মর—বলে ভৈরব আচার্য্যের দেওয়া ছুরিকাখানি হাতে নিয়ে সে লাফিয়ে পড়্‌ল মিহিরকুলের উপর। অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। মিহিরকুল রুখতে পারল না। নিমেষ মধ্যে ছুরিকাখানি তার পাঁজরে আমূল বসে গেল। দুর্দ্ধর্ষ মিহিরকুল তখনই সেই ছুরিকাখানি টেনে তুলে নিলে, তার পর সুনন্দার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রক্তাক্ত ছুরিকাখানি নিয়ে। প্রচণ্ড আক্রোশে সুনন্দার দেহে যেখানে পারল সেইখানেই সে আঘাত করল। রক্তাপ্লুতা সুনন্দা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কিন্তু এতটুকু আর্ত্তনাদ করল না।

---

* এটি ৺মনোরঞ্জনের অল্প বয়সের রচনা। তাঁর বাল্যের অনেকটা সময় ফরিদপুর সহরে কাটিয়াছিল। সেই সময়ে পদ্মানদী ঐ সহরের ঠিক পাশ দিয়া বহিয়া যাইত। কয়েক বছর প্রবাসে কাটাইয়া মনোরঞ্জন যখন আবার ফরিদপুরে আসিলেন তখন দেখেন পদ্মা আর তাঁর প্রিয় নগরীর পাশে নাই—অনেকটা সরিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাইরে একটা তুমুল সোরগোল উঠল।

সম্রাটের জন কয় অনুচর কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে তাড়াতাড়ি বাহির হয়ে গেল।

কলরবটা খুব কাছে এসে পড়ল। উপস্থিত হূনেরা এত হতচকিত হয়ে গেল যে আহত সম্রাটের সেবা করতেও ভুলে গেল। মুমূর্ষু মিহিরকুল বোধ হয় একটু জল চাইছিল, কিন্তু বাইরের হট্টগোলে কেউ আর সেদিকে কান দিলে না। ভারতবিজয়ী হূন সম্রাট্ মৃত্যুকালে একবিন্দু জলের জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

হুড়্‌মুড়্ করে ক'জন হূন ছুটে এল। সম্রাট্‌কে রক্তাপ্লুত দেখে তারা থমকে দাঁড়াল, কি বল্‌তে এসেছিল বলা হ'ল না।

তাদের পিছনে মুক্ত কৃপাণ হাতে সদলবলে এসে পড়্‌ল ধর্ম্মদেব। সামনে রক্তাক্ত মিহিরকুল, কন্যাকুমারী ও বিষ্ণুবর্দ্ধনকে দেখে সে মুহূর্ত্তেকের জন্য অভিভূত হয়ে পড়্‌ল, তার পর কৃপাণ ফেলে ছুটে গেল বিষ্ণুবর্দ্ধনের পাশে।

এই সময় জলপূর্ণ এক কমণ্ডলু হাতে নিয়ে ভৈরব আচার্য্য সেখানে এসে পড়লেন।

প্রথমে মিহিরকুল ও সুনন্দাকে জল খাওয়াবার চেষ্টা করা হ'ল কিন্তু ততক্ষণে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। যশোদেবের আঘাত তত মারাত্মক হয় নি, তখনও তার জ্ঞান ছিল; অনেক আয়াসে সে খানিকটা জল পান করল। ধর্ম্মদেব তাড়াতাড়ি তার হাত-পায়ের বাঁধন মুক্ত ক'রে দিয়ে পরিধেয় ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে একটা পটী বেঁধে দিলে, যশোদেব মৃদু হেসে বল্‌লে—বৃথা চেষ্টা ভাই, মহাকালের পদধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।

আচার্য্য, মল্লিকা ও ধর্ম্মদেব সকলেই তার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল।

দেখতে দেখতে গোবিন্দগড়ের হূনেরা হিন্দু সেনার কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌ল, কেউ বা হ'ল বন্দী, কেউ বা আহত।

ভৈরব আচার্য্য বল্‌লেন—ভারতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্ক-কাহিনীর উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়্‌ল। কিন্তু যাঁর একান্ত চেষ্টায় ও একাগ্র সাধনায় এটুকু সম্ভব হ'ল সেই পুরুষসিংহটী আজ আমাদের ছেড়ে চল্‌ল, আমাদের এই জয়যাত্রা যে কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণ হবে তা সে দেখতে পেলে না,—এই আমার দুঃখ।

মুমূর্ষু যশোদেবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। মৃত্যুর যাতনা উপেক্ষা করেও মৃদু হেসে সে বল্‌লে—সেজন্য আমার এতটুকু দুঃখ নেই, আচার্য্যদেব! মিহিরকুলের মৃত্যু দেখে যেতে পারছি, তাতেই আমার আনন্দ।

—ওইটুকুতেই তুমি হয়তো সান্ত্বনা পেতে পার রাজকুমার, কিন্তু আমি যে তোমার কাছ থেকে আরো অনেক আশা করেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম চেদীর রাজকুমার উজ্জয়িনীর



সিংহাসনকে হিন্দুস্থানের জন-পালকদের আদর্শ করে তুলবে। তার বোন দেবে তাকে শক্তি। তোমাদের দু'জনকে হারাতে তো আমি প্রস্তুত ছিলাম না, রাজকুমার! তোমাদের দু'জনের অভাবে চেদীর রাজবংশ যে একেবারে নির্ম্মূল হ'য়ে গেল!

—তা যাক্ আচার্য্যদেব, একটা জাতিকে পুনরুজ্জীবিত কর্‌তে হ'লে একটা মানুষ বা একটি বংশকে বড় চোখে দেখলে তো চল্‌বে না। এখানে সবার বড় হবে আমাদের আদর্শ, সে-আদর্শ তো কারুর জন্য অপেক্ষা করবে না। সমগ্র উত্তরাপথ হূন-অত্যাচার থেকে মুক্ত কর্‌তে হবে। একজন হূনও ভারতে থাকা পর্য্যন্ত আমরা মৃত্যুর পরেও তো শান্তি পাব না।

এই পর্য্যন্ত ব'লে যশোদেব হাঁপাতে লাগল। এক সঙ্গে অনেক কথা বলার জন্য ক্ষতস্থান থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে বুকে-বাঁধা পটী কালো হয়ে উঠ্‌ল। মল্লিকা তাড়াতাড়ি তার মুখে কমণ্ডলু ধর্‌ল। আচার্য্য তাকে বেশী কথা বল্‌তে নিষেধ কর্‌লেন।

যশোদেবের ক্ষত গভীর হয়েছিল, কিছুতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হ'ল না। মৃত্যুর কালো ছায়া পড়্‌ল তার মুখে, প্রাণহীন অবসাদ ঘনিয়ে এল তার সারা দেহে। বেশীক্ষণ সে বাঁচল না। কিন্তু মৃত্যুর সেই মর্ম্মান্তিক মুহূর্ত্তেও নিজের চেয়ে নিজের দেশ ও নিজের জাতির কথা তাকে বেশী চিন্তিত করে তুল্‌ল। তরবারি স্পর্শ করিয়ে যশোদেব ধর্ম্মদেবকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে—হিন্দুকুশ থেকে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথ অত্যাচারমুক্ত না ক'রে সে যেন সিংহাসনে না বসে।

ধর্ম্মদেব সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিল।

গোবিন্দগড় জয় করে ধর্ম্মদেব সেই রাত্রেই হূনদের প্রধান কেন্দ্র গোয়ালিয়র আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। হাজার হাজার হিন্দু তরুণ-তরুণী * ঢাল-তলোয়ার হাতে ছুটল তার সঙ্গে। ঘুমন্ত ভারত এত দিন শুধু একজন যোগ্য নায়কের নেতৃত্বের প্রতীক্ষা করছিল যেন।

গোয়ালিয়র গেল।

তার পর গেল শিয়ালকোট।

হিন্দুর রক্তাক্ত কৃপাণের নীচে বিজাতীয় হূন অত্যাচারীর দল মাথা লুটাল। হূনের রক্তে হিন্দুস্থানের মাটী লাল হয়ে উঠ্‌ল, অসির ঝন্‌ঝনায় ভারতের বাতাসে উল্লাস জাগ্‌ল। বিজয়ীর ঘোড়ার ক্ষুর দেশে দেশে ধূলো উড়াল। হিন্দুর তলোয়ারে প্রভাতী সূর্য্যের রক্তিম ছায়া পড়্‌ল, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুল্‌ল হিন্দুর জয়গান:

* সে যুগে হিন্দু মেয়েরাও লড়াই করেছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

'আয় চলে আয়—
মোর সাথে আয়—
অসি হাতে আয়
নও জোয়ান্!'

তার পরবর্ত্তী ইতিহাস হিন্দুর বিজয়-অভিযানের ইতিহাস।

ধর্ম্মদেবের প্রচণ্ড বাহিনীর মুখে উত্তর ভারতের গান্ধার ও কিরাত-স্থান পর্য্যন্ত হূনেরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মৌখারীর (আগ্রা ও অযোধ্যা) রাজা সর্ব্বকর্ম্মা সসৈন্যে ধর্ম্মদেবের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের মিলিত বাহিনী হূনশক্তিকে চিরদিনের মত ধুলোয় মিশিয়ে দিল, ভারতের মাটিতে হূন বলে আর কোন জাতি রইল না।

ভারতবাসীর মুখরিত জয়গানের মাঝে ভৈরব আচার্য্য ধর্ম্মদেবকে মালবের সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন। স্বদেশপ্রেমিকের পবিত্র স্মৃতি চিরজাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মদেব নিজ নামের পুরোভাগে যশোদেবের নামটীও যুক্ত করে নিলেন—পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসে তিনি যশোধর্ম্মদেব নামে খ্যাত।

মল্লিকা মালবের রাণী হয়েছিলেন।

এমনি ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল।

ভারতের বুকে কত শত বিপর্য্যয় ঘটে গেল।

শক এল।

পাঠান এল।

মোগল এল।

আমাদের সভ্যতা, আমাদের কর্ষণা, আমাদের শিক্ষা ও সম্পদ্ পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতার সূর্য্য চিরদিনের মত অস্ত গেল।

আর তারই সঙ্গে গেল ভারতের সত্যকারের ইতিহাস। পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হ'ল বিজেতার লেখা যুগযুগান্তরের যত কলঙ্ক-কাহিনী, মানুষের মত মানুষের কথা কেউ আর লিখল না। অতীতের পানে তাকিয়ে তরুণ-তরুণীরা কোন বীরত্ব-কাহিনী খুঁজে পেলে না, বীরের পূজা ক'রে বীর হ'তে তারা ভুলে গেল।

তার পর আরো কত শতাব্দী কেটে গেল।



শিক্ষা-গর্ব্বী মানুষ ইতিহাসের পাতায় মধ্যে মনোনিবেশ করলেন। বহু আয়াসে তাঁরা একদিন আবিষ্কার করলেন: যশোধর্ম্মদেব নামে মালবে এক রাজা ছিলেন···তিনি হূনভীতি থেকে উত্তরাপথকে রক্ষা করেছিলেন···তাঁর আর এক নাম ছিল বিষ্ণুবর্দ্ধন···তার পর···

বাকীটুকু আর জানা যায় না, সব অন্ধকার।

পরাধীন জাতির ইতিহাস আত্মলুপ্ত, অবনমিত!*

—শেষ—

# যে সময়ের যা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

তোমাদের কোন্ বয়সে কি ভালো লাগে তার যদি একটা তালিকা তৈরী করা যায় তবে কি দাঁড়ায় বল্‌তে পার?

আমি মোটামুটি একটা ছক্ কষেছি এই সম্পর্কে। তোমাদের বল্‌ছি শোন:

তোমরা যখন একেবারে শিশু থাক—মাকে ছাড়া আর কিচ্ছু ভালো লাগে না। যখন মায়ের মুখ পর্য্যন্ত চেনা হয় নি তখনো মায়ের কোল বেশ টের পাও এবং অন্য কেউ কোলে তুলে নিলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদতে সুরু করে দাও।

তার পর আস্তে আস্তে চিনে ওঠ মায়ের মুখ আর বাবার মুখ, এবং সেই সঙ্গে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা মোটামুটি আঁচ করবার চেষ্টা কর। কিন্তু মায়ের কোলকেই সব চাইতে নিরাপদ বলে বুঝে নাও। এই সময় মায়ের কোলে থেকে অন্যের

* মিহিরকুলের মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিউয়েন-সাং লিখেছেন,—মিহিরকুল পরাজিত হয়ে কাশ্মীরে পালিয়ে যায় ও সুবিধা পেয়ে কাশ্মীররাজকে হত্যা করে কাশ্মীরের রাজা হয়ে বসে। ঐতিহাসিক পান্নালাল এ কথা স্বীকার করেন না। আর এক দলের মতে যশোধর্ম্মনের হাতে পরাজিত হয়ে সম্ভবতঃ মিহিরকুল নিহত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভেবে শেষের মতটাকেই আমি গ্রহণ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'উপন্যাস ইতিহাস নয়।' আমার এই গল্পটাকে ইতিহাস মনে করলে ভুল হবে—এটা ইতিহাসের ইঙ্গিত মাত্র। —লেখক।

হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে একটু তাল দাও বটে কিন্তু কেউ যদি হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিতে চায় তবে ঘোর আপত্তি জানিয়ে ক্রমাগত হাত ও মাথা নাড়তে থাক।

এই সময় থেকেই মাসি-পিসির ঘুমপাড়ানি গানের সাথে চিনে ওঠ চাঁদা মামাকে। কথা বল্‌তে পার না কিন্তু ছড়ার মিল থেকে থেকে মনকে দোলা দেয়। এই সময় চুষিকাঠি হয় তোমার সব চাইতে বড় সঙ্গী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে নিয়ে খেলা কর। মুখের লালায় ক্রমাগত জামা ভিজিয়ে তোল। মা হয়রাণ হয়ে বলেন, ভা—রী দুষ্টু!

এর পর খেলার সাথীর সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। বাড়ীর পোষা মেনী বেড়াল আর বাঘা কুকুরকে আপনার বলে মনে হয়। হামা দিতে দিতে আত্মীয়তা-সূত্রে তাদের লেজ ধরেও একটু-আধটু টান। তারা একটুও বিরক্ত হয় না, বরঞ্চ খুসী মনে আরো গা ঘেঁষে বসে।

এমনি ভাবে চেনা পরিচয় হয় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে।

বাড়ীতে যদি ভাইবোনের দল থাকে তবে ত' কথাই নেই। এর চুলের মুঠি ধরছ, ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছ, তার পিঠে ঘোড়া হয়ে বসছ···এমনি করে সারাটি দিন কেটে যায়।

এই সময় রঙ চিন্‌তে সুরু করে দিয়েছ। সব চাইতে লাল রঙটা ভারী পছন্দ। সেইজন্য যা কিছু লাল দেখ্‌তে পাও তাই টেনে নিয়ে মুখে পূরবার মতলব। মায়ের লাল রঙের সাড়ীর আঁচল, লাল বল্‌টা কিংবা ছিদেম গয়লার লাল গামছা—সব দিকেই তোমার সমান লোভ। যুদ্ধের সৈনিকের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেই হ'ল!

এই সময় থেকেই মিষ্টি কি টন্‌টনে জ্ঞান হয়েছে। চিনির চাইতে যে রসগোল্লা ভালো সে বোঝবার মুরুব্বিয়ানা পেয়ে গেছ তুমি। তাই সব সময় আকারে ইঙ্গিতে কিংবা ভাঙা-ভাঙা কথায় খাবার ইসারা জানিয়ে দেওয়া চল্‌ছে।

এর পর সুরু হ'ল 'একেবারে সর্ব্বভুকের পালা। অর্থাৎ যা সাম্‌নে পাওয়া যাবে এবং হাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরা চল্‌বে তাই সোজা চালান করে দিতে হবে একেবারে মুখের মধ্যে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বদন-গহ্বরে দিতে পারলেই যেন সুখী!



ভাত খাওয়া সুরু করার পর থেকে মাথা দোলানী যেন আরো বেড়ে যায়। ক্রমাগত খেয়ে ও দেখে যে দুধে অরুচি ধরে গিয়েছিল—ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে তা যেন আবার নতুন করে ভালো লাগ্‌তে সুরু করে।

ইতিমধ্যে অনেকগুলো দাঁত উঠে গেছে, তাই সব কিছু চিবুতে ইচ্ছে করে। সময় সময় কাকা-দাদাদের আঙুলই কাম্‌ড়ে দাও। ব্যথা পেয়ে তারা চীৎকার করে উঠ্‌লে—সে কি হাসি! যেন প্রকাণ্ড একটা রসিকতা করা হয়েছে।

হামা ছেড়ে পায়ে হাঁটা সুরু হয়েছে—তাই বার বার পড়েও দাঁড়াতে পারা এবং এক পা দু' পা করে এগিয়ে চলাটায় খুব বাহাদুরী। দেখে মনে হয় এই কসরৎ—এর চাইতে আশ্চর্য্যজনক খেলা দুনিয়ায় আর কিছু নেই!

এর পর বয়স যখন কিছু বেড়েছে—তখন অ-আ-ক-খ পড়া সুরু হয়েছে বটে কিন্তু মাষ্টারমশাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোটাই বেশী ভালো লাগে।

এইবার ইস্কুলে ভর্ত্তি হবার পালা। প্রথমে ইস্কুল সম্বন্ধে একটা নেশা থাকে। কারণ দাদারা নানা রকম বই-পত্তর ব্যাগে পূরে রোজ সেখানে যায়। দুপুর বেলা যায় টিফিন। লোভ ত' কম নয়! কিন্তু ভর্ত্তি হয়ে দেখা যায় শনিবার দুপুর বেলার মত মজাদার জিনিষ আর কিছু নেই। কারণ সাম্‌নে রয়েছে রবিবার—আর শনিবারের এ বেলাটা ত' একেবারে ফাউ! সেইজন্য সোমবার থেকে চলে শনিবার দুপুরের তপস্যা।

ইস্কুলে গিয়ে খেলাধুলোর দিকে তখন মন টানে। বাসায় ফিরতে হয় দেরী। মা জিজ্ঞেস করলে ভারিক্কী চালে জবাব দেওয়া হয়,—আমি কি এখন ছোটটি আছি? স্পোর্টস্ রয়েছে যে!

এই সময় বেশ বন্ধু-বান্ধব জুটে যায়—কারো বা মনে হয় ইস্কুল পালিয়ে বোশেখের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে আম-বাগানে বসে ঘুঘুর ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে কাসুন্দী-মাখা আম যেমন লাগে তেমন আর কিছুটি নয়!

খেলাধুলোয় যোগ দিয়ে বড় বড় নাম-করা ম্যাচ্ দেখ্‌তে যাওয়ার সে কি ঘটা! তখন মনে হয় কে. ভট্টাচার্য্য গোল দিচ্ছে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঝালছোলা

খাওয়ার মত আরাম আর কিছুতে নেই। ঝালে দু' চোখ জলে ভরে আসে তবু সে কি উত্তেজনা। এই সময় নানা রকম য্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প কিশোর-মনকে দোলা দিতে থাকে।

---

## বেদুইনের দেশে

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। সারা ইউরোপটা যতখানি যায়গা জুড়ে বসে আছে এই বিশাল মরুভূমিও প্রায় ততটা যায়গা জুড়ে আছে। এর উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, পূবে লোহিত সাগর আর দক্ষিণে চোখ ফেল্‌লে দেখতে পাবে ঘন বিষুবীয় জঙ্গল। তোমাদের মধ্যে অনেকের হয়তো ধারণা যে মরুভূমিতে কেবল বালিই থাকে। কিন্তু তা' নয়, মরুভূমিতে পাথরও থাকে বিস্তর। পাথর ক্ষয় হয়ে হয়েই বালি হয়। সাহারারও দশ ভাগের এক ভাগ বালি, বাকি নয় ভাগ পাথর। অনেকে তাই সাহারা মরুভূমিকে একটি নিম্ন মালভূমি বলেন। এর যায়গায় যায়গায় উঁচু পাহাড় বা 'মাল' দেখতে পাওয়া যায়। "আহাগার", "তাসিলি" এই সব যায়গা প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু। আবার অনেক যায়গায় এমন ফাটলও আছে যা নাকি সমুদ্রপৃষ্ঠের ঢের নীচে। সাহারার উচ্চতা গড়ে দেড় হাজার ফুট।



তোমরা সকলেই জান যে মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না। তবু তার মাঝে মাঝে গালপালা দেখা যায় না এমন নয়। গাছ যখন হচ্ছে তখন জল নিশ্চয়ই আসে; কিন্তু কেমন করে? গরমকালে হঠাৎ ঝড় হ'লে এখানে সামান্য বর্ষা হয়। এখানে এক রকম 'লু' বয় যার নাম "সিমুম"। এই ঝড়ে কেবল বালি ওড়ে। ঝড়ের সময় যে জল হয় তা জমে জমে ঝর্ণা হয়ে বেরোয়ে। এই ঝর্ণাগুলোরই নাম "ওয়াদি"। দিনের বেলা এখানে অত্যন্ত গরম হয় কিন্তু রাত্রে লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমুতে হয়।

মরুভূমিতে বর্ষা খুব কম হয় বলেই কোন রকম গাছপালা জান্মায় না।

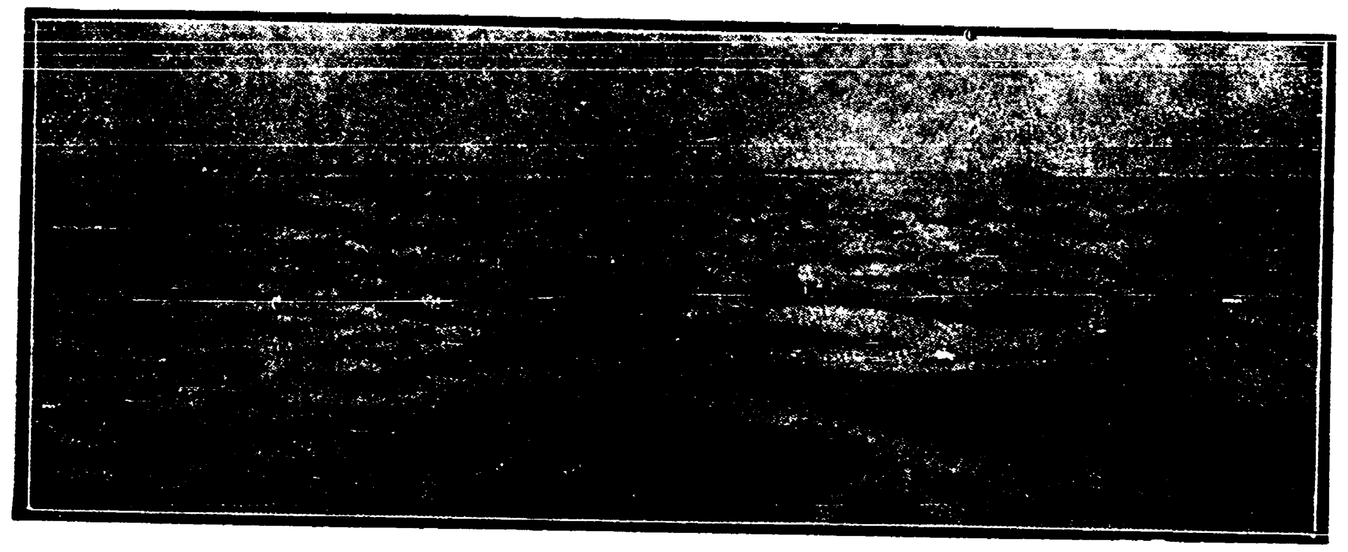

সাহারার সাধারণ দৃশ্য

ফণীমনসা, সিজ আরও কয়েক রকম কাঁটাগাছ হয়—তবে মরূদ্যানে প্রধান গাছ হচ্ছে খেজুর। যেখানে মাটির নীচে জল পাওয়া যায় আর উপরটা খুব শুক্‌নো সেইখানেই খেজুর গাছ ভাল হয়। তাই আরববাসীরা বলে যে খেজুর গাছের শিকড় থাকে স্বর্গে (জলে) আর উপর দিক্‌টা থাকে নরকে।

খুব কম জল পাওয়া যায় বলে এখানকার গাছগুলির জল ধরে রাখবার ক্ষমতা আছে। গাছগুলির পাতা হয় খুব মোটা—যাতে পাতার রস তাড়াতাড়ি শুকোতে না পারে। অনেক গাছের বল্কল খুব মোটা। আবার অনেক গাছের পাতা বল্‌তে বোঝায় কাঁটা। মরুভূমির মধ্যে যে সব যায়গায় জল আছে সেগুলিকে 'মরূদ্যান' বলে। এই মরূদ্যানগুলিতেই অনেক রকম গাছপালা দেখতে পাওয়া

যায়। মরূদ্যানে যারা থাকে তাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে খেজুর আর দুধ। তা ছাড়া তারা ভাত আর বাজ্‌রার রুটিও খায়। আমাদের ধানের গাছ থেকে আমরা কেবল চাল পাই কিন্তু তারা খেজুর গাছ থেকে ঘর তৈরী করবার সব কিছু, জ্বালানী কাঠ এ সবই পায়। মরূদ্যানে ধান, গম, আখ, মূলো, শশা, পেঁয়াজ এই সব চাষ করা হয়। আবার ঠাণ্ডা যায়গায় কমলা লেবু, আঙ্গুর এই সব ফলও ফলে।

সাহারার অধিবাসীদের 'বেদুইন' বলে তা বোধ হয় সকলেই জান। সাহারায় দু' রকম লোক বাস করে। এক রকম লোক আছে যারা স্থায়ী বাসিন্দা; এরা মরূদ্যানে ঘর বেঁধে থাকে। আর এক দল আছে যারা যাযাবর। এদের কোন রকম স্থায়ী ঘর নেই। তারা উট, ভেড়া, ছাগল এবং আরও অনেক রকম গৃহপালিত পশু নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বেদুইন শব্দটা আরবী ভাষার 'বেদোয়ে' শব্দ থেকে হয়েছে। তার মানে—যারা মরুভূমিতে বাস করে। যাযাবরদের প্রধান কাজ হচ্ছে পশুপালন করা। পশুদের খাওয়ানর জন্যই এরা বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। যেখানে ভাল ঘাস পাওয়া যায় সেখানে কিছুদিন থাকে, আবার, ঘাস শেষ হয়ে গেলে, অন্য যায়গায় চলে যায়। পশুদের কাছ থেকেই তারা সব দরকারী জিনিষ আদায় করে, যেমন—গায়ের কাপড়, পশম, খাবার দুধ ইত্যাদি। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে খেজুর আর দুধ সে কথা ত' আগেই বলেছি। মাংস প্রায় খায় না বল্‌লেই চলে, এক উৎসব ব্যাপার ছাড়া। এরা আমাদের মত টাটকা দুধ খায় না। দুধকে দই করেই এরা খায়। পানীয় হিসাবে 'কফি' খাওয়ারও রেওয়াজ আছে।

এরা তাঁবুতেই থাকে। এদের তাঁবু বেশ মজার। তাঁবুগুলো বড় ধরেণের কিন্তু হাল্‌কা। এগুলি প্রায়ই উটের চামড়ায় তৈরী। তাঁবুর মধ্যে সামনের ঘরটা হচ্ছে পুরুষদের জন্য, পিছন দিক্‌টা মেয়ে-মহল। সামনের ঘরে কোন রকম আসবাবপত্র থাকে না—যা কিছু থাকে সব পিছন দিক্‌কার ঘরে। গায়ের কাপড়, পশম, কাঁসাপাত্র, কাঠের ঘটিবাটি, থলি—এই সব আসবাব।

এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় যেতে হ'লে রাত্রি বা ভোর সময়টাই এরা পছন্দ করে। রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে রাস্তা চেনার উপায় হচ্ছে তারা।



অনেক সময় এদের মধ্যে একজন লোক ঘোড়ায় চেপে যায়গা ঠিক করে আসে, অন্যান্য সকলে পরে যায়। যাতায়াতের এক মাত্র বাহন হচ্ছে উট। উট এক অদ্ভুত জীব। উটের পিঠের উপর মস্ত কুঁজ থাকে তা তোমরা জান। তাতে কি থাকে তা জান কি? চর্বি। বালির মধ্যে হাঁটে তাই ভগবান্ উটের পায়ের তলা চওড়া করে গড়েছেন যাতে বালির মধ্যে পা ঢুকে না যায়। উটের গলা খুব লম্বা, কারণ হাঁটতে হাঁটতে যাতে ইচ্ছে মত কিছু খেতে পারে। মুখ খুব শক্ত; শক্ত মুখ ব'লেই কাঁটা গাছ খেতে এদের অসুবিধা হয় না। আবার এদের পেটের মধ্যে যে থলি আছে তাইতে এরা জল জমা করে রাখে। এই জন্যই এরা ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত অনায়াসে বিনা জলে হাঁটতে পারে। তৃষ্ণা পেলে থলি থেকে জল বের করে খায়। উটের ভ্রূও খুব বড়। কেন বল তো? তোমরা যখন রোদে তাকাও তখন কপালের নীচে হাত রাখ যাতে চোখে রোদ না পড়ে। উটের ত আর হাত নেই, তাই ভগবান্ তাদের ঐ রকম বড় বড় ভ্রূ দিয়েছেন। নাকের গর্ত্তও এদের খুব ছোট; তাতে তাদের নাকের মধ্যে বালি ঢোকে না। আর ঝড়ের সময় এরা বালির মধ্যে নাক ঢুকিয়ে দেয়। যখন বালির মধ্যে নাক ঢুকায় তখন তাদের উপুড় হয়ে শুতে হয়; তাতে তাদের বুকে লাগে না, তার কারণ হচ্ছে তাদের বুকের মাংস খুব শক্ত।

বেদুইন ও তাদের সঙ্গী উট

মরুভূমির লোকেরা বালির মধ্যে, ধুলোর মধ্যে বেড়িয়ে বেড়ায় তাই তাদের চোখ খারাপ হয়ে যায়। অনেকে তখন কোন সহরে গিয়ে ভিক্ষে করে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেয়। এই চোখের অসুখকে 'গ্লকোমা' বলে। গ্লকোমা এদেশে খুব বেশী।

এদেশে মেয়েদের পর্দ্দা নেই বল্‌লেই চলে। গায়ে তারা পশমের একটা আলখাল্লা পরে আর মাথায় লাল কিংবা হল্‌দে রঙের রুমাল জড়ায়।

যারা মরূদ্যানে স্থায়ী ঘর করে থাকে তারা চাষ ক'রে আপন জীবন নির্ব্বাহ করে। যা' তারা না করতে পারে অন্যের সঙ্গে বদলে নেয়; যেমন ধর সুদান-বাসীদের এরা দেয় খেজুর, আর তাদের কাছ থেকে নেয় তুলো। এদের ঘর খুব ছোট ধরণের। ঘরে যাতে বালি বা গরম বাতাস ঢুকতে না পারে তার জন্য একটি বা বড় জোর দুটি জানালা থাকে। বর্ষা কম হয়, তাই ছাদ চেপ্টা। অনেকের ঘর মাটির। তবে যারা বড়লোক তারা পাথরের ঘরে থাকে। তাদের ছেলেরাও স্কুলে পড়ে, তবে তাদের স্কুলে তোমাদের স্কুলের মত বিজলী-পাখা বা ব্ল্যাক্‌বোর্ড্ নেই, তারা খেজুর গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। তোমাদের মধ্যে যারা গাঁয়ে থাক তারা হাটে গিয়ে কেনাবেচা দেখেছ। সপ্তাহে একবার কিংবা দু' বার আবার যায়গায় যায়গায় তিন বারও হাট বসে; এদের দেশেও তেমনি হাট বসে; ঐ হাটগুলির নাম 'মক্'। 'মক্'গুলিও খেজুর গাছের ছায়ায় হয়। হাটের দিনেই তারা তাদের দরকারী সব কিছু কিনে নেয়।

এখানকার লোকেদের কথা ত' বল্‌লাম, এখন এদেশের যাতায়াতের ব্যবস্থার বিষয় একটু বলি। আগে উটই ছিল এর একমাত্র ব্যবস্থা। দল বেঁধে সারিবদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন এরা মরুভূমি পার হ'ত। কিন্তু আজকাল মোটরকারের ব্যবস্থা হয়েছে। মোটর আর মোটর-কারখানাগুলি সবই প্রায় ফরাসীদের। কারণ সমগ্র মরুভূমিটা ফরাসী সরকারের বল্‌লেই চলে। কিছু দিন পূর্ব্বে উড়োজাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল কিন্তু যুদ্ধের জন্য তা বন্ধ আছে। মোটরের ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকে উটের প্রাধান্য কমতে আরম্ভ করেছে।

আর এই সাহারা যুগ যুগ ধরে উত্তরে শ্বেতাঙ্গদের দক্ষিণের কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে আলাদা করে রেখেছে।

---

১৯

মোহিতাশ্বের চীৎকার শুনিয়া সুশান্ত তাড়াতাড়ি আলো লইয়া আসিয়া দেখে মৃতদেহটি অন্য কিছুর নহে, একটি প্রকাণ্ড শৃগালের। সুশান্ত কহিল—"আমাদের বিয়্যার নিশ্চয় একে হত্যা করেছে।" অশোক কহিল—"এখন বোঝা গেল সেই কান্নাটা কিসের।" কিন্তু তাহারা ভাবিয়া পাইল না গহ্বরের মধ্যে ইহারা ঢুকিল কি করিয়া! প্রবেশপথ দূরের কথা, কোথাও তাহারা এতটুকু ছিদ্র দেখিতে পাইল না। বিয়্যার তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল; নীলাদ্রি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"বল্ না ভাই বিয়্যার, তুই কেমন ক'রে ভিতরে ঢুকেছিলি? আমরা যে খুঁজে খুঁজে হাফিয়ে গেলাম!" বিয়্যার আর কি বলিবে? সে কেবল লেজ নাড়িয়া মাথা দোলাইয়া তাহার আনন্দ জ্ঞাপন করিল! সুশান্ত তখন একটা বুদ্ধি করিল। সকলকে সেই নব-আবিষ্কৃত গহ্বরের মধ্যে থাকিতে বলিয়া সে ফরাসী গুহা হইতে বাহির হইয়া হ্রদের তীরস্থিত সেই পাহাড়ের কোল চাপিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে চলিল। সুশান্ত চীৎকার করিয়া সকলের নাম ধরিয়া ডাকে, ছেলেরাও ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া উত্তর দেয়। এইভাবে প্রবেশপথটি বাহির হইল। পাহাড়ের কোলস্থিত ঘন ঝোপের মধ্যে একেবার মাটী বরাবর একটা গর্ত্ত। এই গর্ত্ত দিয়াই শিয়াল ও কুকুর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিয়্যার কেন আর বাহিরে আসিল না? এই প্রশ্নের উত্তর তাহারা শীঘ্রই পাইল। তাহারা ভিতরে ঢুকিবার পর কোন রকমে একটা আল্‌গা পাথর ধ্বসিয়া গিয়া গহ্বরের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাই বিয়্যার দুই দিন গহ্বরের মধ্যে বন্দী হইয়া ছিল।

দ্বিতীয় গহ্বরটির নাম রাখা হইল 'হল্ ঘর'। এবার হইতে হল্ ঘরেই সকলকার শোয়ার ব্যবস্থা হইবে, ফরাসী গুহায় কেবল মাত্র রান্নার কাজ ও জিনিষপত্র রাখা চলিবে। আসবাবপত্র হল্ ঘরে আনা হইল। হ্রদের দিকের প্রবেশপথে একটা দরজা বসান হইল। দরজার দুই দিকে

ঘুলঘুলি খুঁড়িয়া আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইল। দুই গুহার মাঝখানের গলিটার দুই পাশে দুইটা চোরকুঠরীও বানান হইল। সেখানে রহিল তালাবন্ধ অবস্থায় তাহাদের বন্দুক, গুলি ও বারুদ।

হ্রদ ও নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে কম পাখী থাকে না। তাহাই মারিয়া আনিয়া রঞ্জিৎ সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করিত। ফরাসী গুহার দুয়ারের দুই পাশে সুশান্ত প্রচুর শেলারী ও ক্রেশ শাক লাগাইয়াছিল; রোজ খাইলেও তাহা শেষ হইবে না। ইহা ব্যতীত ঘরের মধ্যে প্রচুর টিনে-ভরা খাবারও সঞ্চিত আছে। খাওয়ার অভাবে কোন দিন তাহাদের মরিতে হইবে না।

এখন তাহারা এক রকম গুছাইয়া লইয়াছে, এবার সামনের এই সুদীর্ঘ শীতকাল তাহারা কেমন করিয়া কাটাইবে? সুশান্ত প্রতিদিনকার কাহিনী তাহার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিত। দুই সেলফ্ ভর্ত্তি বই রহিয়াছে—সমস্ত শীতকাল তাহাই তাহারা পড়িয়া শেষ করুক। বেশীর ভাগ দেশ-বিদেশের সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। বড়রা সেই সব পড়িত ও ছোটদের গল্প করিয়া শুনাইত।

এক দিন সন্ধ্যায় সকলে বসিয়া নানা রকম গল্প করিতেছে, হঠাৎ অশোক কহিল—'এই দ্বীপেই যখন আমাদের চিরদিন বাস কর্‌তে হবে তখন দ্বীপের বিভিন্ন অংশের এক-একটা নাম হওয়া দরকার। অনেকগুলি নাম চাই। যে উপসাগরে আমাদের জাহাজ ভেসে আসে তার একটা নাম চাই, নদীর একটা নাম চাই, হ্রদের একটা নাম চাই; তা ছাড়া অদূরের ঐ পাহাড়, জলাভূমি, ওদিক্‌কার অন্তরীপ—এ সমস্তরই নাম চাই।" রঞ্জিৎ কহিল—"আমাদের জাহাজটা স্কুনারজাতীয় ছিল, সুতরাং উপসাগরের নাম হোক্ স্কুনার উপসাগর।" কমলাক্ষ কহিল—"বেশ নাম হয়েছে, উপসাগরের মধ্যে যে নদীটা গিয়ে পড়েছে তার নাম কি হবে?" শঙ্খচূড় কহিল—"ওর নাম থাকুক কঙ্কনা নদী;—যা কন্‌কনে ওর জল!" নীলাদ্রি কহিল—"আর হ্রদের নাম কি থাক্‌বে?" রোহিতাশ্ব কহিল—"হ্রদের নাম থাকুক শম্বর হ্রদ; তাতে আমাদের বাড়ী যে রাজপুতানায় তা মনে পড়্‌বে।" নীলাদ্রি আপত্তি করিয়া কহিল—"কিন্তু তোমার সে শম্বর হ্রদের জল যে বড় লোণা আর এর জল কি মিষ্টি!" সুশান্ত বিবাদ থামাইয়া বলিল—"হ্রদের নাম শম্বর হ্রদই থাক্।" এইভাবে পাহাড়টার নাম রাখা হইল 'নন্দন পাহাড়', অন্তরীপটার নাম রাখা হইল "মায়া-অন্তরীপ" ইত্যাদি। দ্বীপের সমস্ত বিভিন্ন অংশের নামকরণ হইয়া যাইবার পর সুশান্ত কহিল—"তোমরা এত জিনিষের নাম দিলে, কিন্তু আসল জিনিষের নাম দিলে না। এই দ্বীপের একটা নাম হওয়া উচিত নয় কি?" রাজীব কহিল—"এর নাম হোক্ বালক দ্বীপ;—আমরা এতগুলি ছেলে যখন এই দ্বীপের উপর এসে উঠেছি।" আশীষ কহিল—"ও নামটা



মোটেই ভালো নয়, তার চেয়ে দ্বীপের নাম হোক্ 'চর পোড়াগাছা'।" আশীষের বাবা এস্-ডি-ও মানুষ; একবার তিনি নোয়াখালিতে বদ্‌লী হইয়াছিলেন। সেখানে সে একবার পিতার সঙ্গে সুধারাম গ্রাম হইতে মেঘনার উপরিস্থিত চর-পোড়াগাছাতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেই তৃণহীন বালুময় চরের স্মৃতি আজও তার মনে জাগিয়া ছিল। সুশান্ত দু'জনকার কথা শুনিয়া কহিল—"আমার দুটো নামের কোনটাই পছন্দ হ'ল না; আর সমস্ত নাম তোমরাই কর্‌লে, এইবার আমি একটা নাম করি। দ্বীপের নাম হোক্ "সিন্ধু-দ্বীপ"। সকলেই উল্লসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বেশ নাম, বেশ নাম! এমন সুন্দর দ্বীপের এমন সুন্দর নাম না হ'লে কি চলে? বেশ একটা ভৌগোলিক গন্ধও আছে।"

এই বার সকলের শুইতে যাইবার কথা। দুই চারিজন বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন সুশান্ত এমন একটি কথা বলিল যাহাতে সকলেই আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কেবল রঞ্জিতের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সুশান্ত কহিল—"বন্ধুগণ, দ্বীপের নামকরণ হ'ল, কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ আমাদের বাকী আছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর শাসন করবার জন্য আমাদের একজন দলপতি দরকার, তাতে আমাদের সুবিধা অনেক। কারণ সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল হবে না; মনোমালিন্য, বিরুদ্ধাচরণ দেখা দেবেই। তাই একজন দলপতির দরকার, যার আদেশ সকলকে মাথা পেতে নিতে হবে। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে যা বিদ্যমান, আমাদেরই বা তা থাক্‌বে না কেন? দলপতি আমাদের একজন চাই। এখন কে যে দলপতি হ'বে তা তোমরা স্থির কর।" রঞ্জিতের বুকে হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। এত দিন সে যে বেশ স্বাধীন জীবন যাপন করিতেছিল। সুশান্ত এ আবার কি ফ্যাসাদ বাধাইতেছে! সুশান্তর কথা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে চীৎকার করিয়া উঠিল, "হাঁ, একজন দলপতি আমাদের চাই।" রঞ্জিতের খুব ইচ্ছা সে নিজেই দলপতি হয়, কিন্তু সেদিকে আশা খুব কম, কারণ সুশান্তরা দলে ভারী। কিন্তু তাহার ধীশক্তি ও উপস্থিত-বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ; চট্ করিয়া উৎসাহের সহিত সে বলিয়া বসিল—"বেশ, দলপতি একজন হোক্, কিন্তু তার শাসনের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার। মনে কর বর্ত্তমানে এক বছরের জন্য দলপতি নির্ব্বাচিত হোক্।" সুশান্ত কহিল—"রঞ্জিতের কথা খুব ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু এক বৎসরের পরেও পূর্ব্বের দলপতি আবার নির্ব্বাচিত হ'তে পার্‌বে, সে বিষয়ে কোন বাধা থাক্‌বে না।" এর উপর রঞ্জিৎ আর কি বলিবে? সে যায় পাতায় পাতায়, আর সুশান্ত চলে শিরে শিরে। সুশান্ত মতামত লইয়া বেশী সময় নষ্ট করিল না, একেবারে কহিয়া বসিল—"এইবার দলপতি নির্ব্বাচিত হোক্। আমি বলি কি অশোককে আমাদের দলপতি করি; এতে তোমাদের কারোর আপত্তি আছে?" সকলেই উল্লসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না; আজ হ'তে এক বৎসরের জন্য অশোক আমাদের দলপতি ও এই সিন্ধু-দ্বীপের

শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হ'ল। এখন থ্রি চিয়ার্স ফর্ অশোক।" ছেলেদের আনন্দধ্বনিতে তাহাদের আবাস-গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। অত রাত্রে এমন অতর্কিত হুঙ্কার-রব শুনিয়া বনের শিয়ালগুলিও যেন হুক্কাহুয়া শব্দে অশোকের নির্ব্বাচনে আনন্দ জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

---

# অঙ্ক শেখার মজা

শ্রীঅজিতলাল ঘোষ, বি.এস্-সি

অঙ্কের নাম শুনিলে তোমরা অনেকেই ভয় পাও, কিন্তু অঙ্কের মধ্যেও যে কত লোভনীয় রহস্য থাকিতে পারে তা হয়তো জান না। আমাদের ভারতবর্ষ এক সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চ্চায় পৃথিবীতে প্রায় অদ্বিতীয় ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যারও আদি প্রবর্ত্তক নাকি এই দেশ। তবে অনেকে মিশরবাসীকেও এই গৌরবের অধিকারী করিতে চান। সে যাহা হউক, প্রাচীন ভারতীয়েরাই যে দশমিক প্রণালীর আবিষ্কর্ত্তা এ বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষের লীলাবতী, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের দিক্‌পালেরা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

কাঠখোট্টা অঙ্কও যে কতটা সরস হইতে পারে তার ২।১টি উদাহরণ দিবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

মানুষ আইন করে—নিয়ম করে, আবার অন্য মানুষ সেই আইন ভঙ্গ করে। এক আইনে একজন দোষীর হয় জেল কিন্তু সেই আইনে আবার হয়ত সমদোষী পায় খালাস। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এই প্রকার অবিচার নাই—নাই কোন বিশৃঙ্খলা। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—("Law of Nature knows no exception"। যদি একটা নিয়ম কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে খাটে তবে সমপর্য্যায়ভুক্ত অন্যান্য বিষয়েও ঐ নিয়ম খাটিবে। দুই-এক স্থানে হঠাৎ একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু ভাল করিয়া চিন্তা করিলে সেগুলিকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইবে না। ছেলেমেয়েরা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে গণিতশাস্ত্রের নানা প্রকার



সঙ্গতি বা মিল খুঁজিয়া পাইবে। উচ্চ অঙ্কশাস্ত্র ছোটদের বোধগম্য নয়, তাই ছোটদের জন্য ছোটখাট সরল নিয়ম উদ্ভাবন করা দরকার।

সমান্তর প্রগতি (Arithmetical Progression) ছাড়া কি ভাবে সাধারণ সংখ্যাগুলির যোগফল নির্দ্দেশ করা যায় তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি :

(ক) ১, পর্য্যন্ত যোগফল ১, সুতরাং যোগফল শেষ সংখ্যা ১এর ১ গুণ
(খ) ১ হইতে ২ " " ৩, " " " ২এর $১\frac{১}{২}$ গুণ
(গ) ১ হইতে ৩ " " ৬, " " " ৩এর ২ গুণ
(ঘ) ১ হইতে ৪ " " ১০, " " " ৪এর $২\frac{১}{২}$ গুণ

এখন ভাল করিয়া শেষ সংখ্যার গুণগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা যাক্।

(ক) ১ গুণ = (শেষ সংখ্যা ১ এর অর্দ্ধেক + $\frac{১}{২}$) গুণ = ($\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{২}$) গুণ = $\frac{১ + ১}{২}$ গুণ
(খ) $১\frac{১}{২}$ গুণ = ( " ২ এর অর্দ্ধেক + $\frac{১}{২}$) " = ($\frac{২}{২}$ + $\frac{১}{২}$) গুণ = $\frac{২ + ১}{২}$ গুণ
(গ) ২ গুণ = ( " ৩ এর " + $\frac{১}{২}$) " = ($\frac{৩}{২}$ + $\frac{১}{২}$) গুণ $\frac{৩ + ১}{২}$ গুণ
(ঘ) $২\frac{১}{২}$ গুণ = ( " ৪ এর " + $\frac{১}{২}$) " = ($\frac{৪}{২}$ + $\frac{১}{২}$) গুণ = $\frac{৪ + ১}{২}$ গুণ

সুতরাং ১ হইতে কোন সংখ্যা পর্য্যন্ত যোগফল = (শেষ সংখ্যা) $\frac{(\text{শেষ সংখ্যা} + ১)}{২}$

১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত যোগফল কত হইবে ? এই প্রশ্নে শেষ সংখ্যা ৮, এবং যোগফল = ৮ $\frac{(৮+১)}{২}$ = ৩৬

২৫ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত যোগফল কত ? এই প্রশ্নে ১ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত যোগফল বাহির করিয়া ১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত যোগফল বিয়োগ করিলে প্রশ্নোত্তর সহজে মিলিবে, যথা—

১ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত যোগফল = ৫০ × $\frac{৫১}{২}$ = ২৫ × ৫১ = ১২৭৫
১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত " = ২৪ × $\frac{২৫}{২}$ = ১২ × ২৫ = ৩০০
২৫ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত " = ১২৭৫ − ৩০০ = ৯৭৫ উঃ।

এইবার ১ হইতে অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের নিয়ম বলি:

১, পর্য্যন্ত অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল = ১, একটী মাত্র অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল = ১ × ১
১ হইতে ৩ " " " " = ১ + ৩ = ৪, ২টী " " " " = ২ × ২
১ হইতে ৫ " " " " = ১ + ৩ + ৫ = ৯, ৩টী মাত্র " " " = ৩ × ৩
১ হইতে ৭ " " " " = ১ + ৩ + ৫ + ৭ = ১৬, ৪টী মাত্র " " = ৪ × ৪

অতএব দেখা যাইতেছে ১ হইতে যত অযুগ্ম সংখ্যা আছে তাহার যোগফল = যত অযুগ্ম সংখ্যা × তত, অর্থাৎ পদসংখ্যা × পদসংখ্যা।

২ হইতে যুগ্ম সংখ্যার যোগফল নির্ণয়:

২ পর্য্যন্ত যুগ্ম সংখ্যার যোগফল = ২, একটী মাত্র যুগ্ম সংখ্যার যোগফল = ১ × ২
২ হইতে ৪ " " " " = ২ + ৪ = ৬, ২টী মাত্র যুগ্ম সংখ্যার যোগফল = ২ × ৩
২ হইতে ৬ " " " " = ২ + ৪ + ৬ = ১২, ৩টী মাত্র " " " = ৩ × ৪
২ হইতে ৮ " " " " = ২ + ৪ + ৬ + ৮ = ২০, ৪টী মাত্র " " = ৪ × ৫

অতএব দেখা যাইতেছে ২ হইতে যতটী যুগ্ম সংখ্যা আছে, সেগুলির যোগফল = যত যুগ্ম সংখ্যা × ( তত + ১ ) অর্থাৎ ( পদসংখ্যা )( পদসংখ্যা + ১ )

কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পর্য্যন্ত মোট অযুগ্ম ও যুগ্ম সংখ্যা বাহির করিবার প্রণালী: মোট অযুগ্ম সংখ্যা = $\frac{\text{শেষ অযুগ্ম সংখ্যা + ১}}{\text{২}}$

এবং মোট যুগ্ম সংখ্যা = $\frac{\text{শেষ যুগ্ম সংখ্যা}}{\text{২}}$

একটা উদাহরণ দিলে আরও ভাল করিয়া বুঝা যাইবে, ধর, প্রশ্ন হইল—

(ক) ১৩ পর্য্যন্ত কয়টী অযুগ্ম সংখ্যা আছে এবং উহাদের যোগফল কত?

উত্তর: $\frac{\text{১৩ + ১}}{\text{২}}$ = ৭, সুতরাং ৭টী অযুগ্ম সংখ্যা এবং যোগফল = ৭ × ৭ = ৪৯

প্রশ্ন:—(খ) ১৬ পর্য্যন্ত কয়টী অযুগ্ম সংখ্যা আছে এবং উহাদের যোগফল কত?

$\frac{\text{১৬}}{\text{২}}$ = ৮, সুতরাং ৮টী যুগ্ম সংখ্যা এবং উহাদের যোগফল = ৮ × ৯ = ৭২।

১৮ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত যুগ্ম সংখ্যাগুলির যোগফল কত বা ১৩ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল কত—ইহা ছোট ছেলেরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে পারিবে।

---

# নবযুগের কবি

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী সহরে প্রধান উজীরের বাড়ীতে বন্দীরা গান গাইছিল।

তারা দু'জন—একজন বৃদ্ধ, অন্যটি যুবা। প্রথমে বুড়ো গান ধর্‌লে জীর্ণ কণ্ঠে, জড়িত স্বরে; গম্ভীর-মুখে যুবা তানপুরায় তান রাখ্‌লে। বুড়ো আর কি গাইবে? সে গাইলে—প্রাচীন কালে সূর্য্য-কিরণ ছিল আরো প্রখর, প্রচুর ছিল ফল শস্য, জীবন ছিল মাদকতায় ভরা! সে গাইলে—পুরাকালে ছিল মহা মহা বীর, যাদের স্থান অধিকার কর্‌বার মত আজও কেউ এল না! অতীতের জয়গানে বৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল।

উজীর-ভবনে ভোজের আয়োজন হয়েছিল। সুদীর্ঘ অলিন্দে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের দল সুপেয় পানীয়ের নেশায় মশ্‌গুল হ'য়ে উঠেছিল। বুড়োর কথায় তারা কেউ কান দিলে না।

বুড়োর গান শেষ হ'লে যুবক বন্দী গান সুরু কর্‌লে সুমধুর কণ্ঠে, হৃদয়গ্রাহী সুরে। অভিনব এবং আশ্চর্য্য সে গানের বাণী—বলিষ্ঠচিত্ত কবির রচিত সে গান বলদৃপ্ত যৌবনের প্রশংসায় পরিপূর্ণ, অতীতের স্থান তাতে নেই।

'মানুষ হচ্ছে অর্দ্ধ-দেবতা' এই ছিল গানের বাণী। 'একদিন আসবে যে দিন মানুষ পূর্ণ-দেবত্ব লাভ কর্‌বে।' সুর-লয়ে গান বেজে উঠ্‌ল—'মানুষ আজ স্বপ্ন দেখ্‌ছে এবং সে দিন আস্‌বে যে দিন তার স্বপ্ন সফল হবে!

'বর্ত্তমানের অধীশ্বর, ভবিষ্যতের কর্ত্তা মানুষই একদিন মানুষকে পরাজিত ক'রে উন্নত হবে! এবং যে দিন সে সর্ব্বজয়ী হবে সে-দিন সে হবে দেবতা!'

তানপুরা ও গানের শেষ বাণীর রেশ তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায় নি। নিমন্ত্রিতের দল তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠ্‌ল বন্দনাকারীকে দেখ্‌বার জন্য। সে সামনেই দাঁড়িয়েছিল—তাল-বৃক্ষের মত সরল ও উন্নত, মাথায় ছিল তার কুঞ্চিত কেশভার, দেহে ছিল যৌবনের দীপ্তি, আর মুখে ছিল আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা।

'এ গান রচনা করেছে কে?'—নিমন্ত্রিতেরা সাগ্রহে প্রশ্ন কর্‌লে। 'মিয়ামি গ্রামে ক্রীতদাস সগরসিংহের কাছে এ গান শুনেছিলুম। তারই এ গান।'

পরদিন সবাই সদলবলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়্‌ল লাহোরের সহরতলী মিয়ামির অনুসন্ধানে, অর্দ্ধদেবতা সগরসিংহকে পুষ্পাঞ্জলি দেবার সঙ্কল্পে।

একজন বল্‌লে, 'তালগাছের মত দীর্ঘ বোধ হয় তাঁর দেহ!'

দ্বিতীয় জন বল্‌লে, 'পাহাড়ের মত সবল তিনি নিশ্চয়!'

'সন্ধ্যাকালের দীপ্ত তারকার মত তিনি সুন্দর!'—তৃতীয় জন স্বপ্নাবিষ্টের মত গুঞ্জন করল।

মিয়ামি গ্রামে তারা নির্ব্বাসিত সগরসিংহের কাছে পৌঁছল। দেখল উঠান আগাছায় ভরা, ছিন্ন মলিন মাদুরের উপর জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধ পঙ্গু উপবিষ্ট, মাথায় তার ধূলামাখা পাকা চুলের জটা, অস্থিসার কালো কালো হাত দিয়ে সে একমনে আংরাখার উকুন মারছিল।*

---

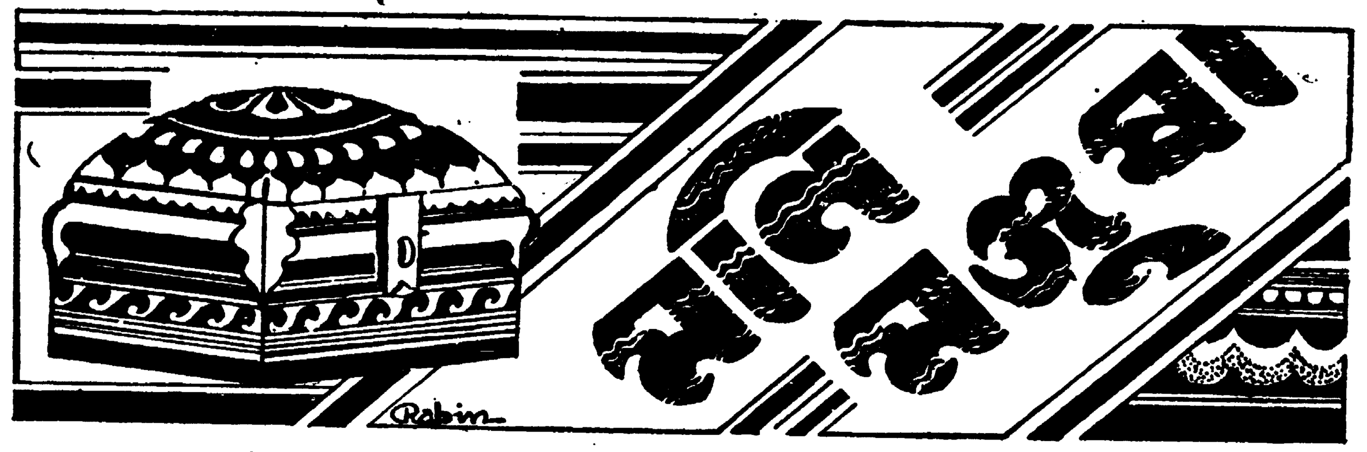

শ্রীঅশোক সেন, এম্ এ

## সাইলাস মার্ণার

(জর্জ্জ ইলিয়ট্)

তাঁতী সাইলাস মার্ণার যেদিন জীবিকা অর্জ্জনের আশায় র‍্যাভেলো গ্রামের এক কোণে একটি কুঁড়ে ঘরে বসতি স্থাপন করল সেদিন থেকে সুদীর্ঘ পনেরো বছর সে একান্তই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে এসেছে। এ পর্য্যন্ত কোন লোক কোন দিন ওর ঘরে পদার্পণ করে নি, আর ও নিজেও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশবার কোন প্রয়োজন বোধ করে নি,—অবশ্যি ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া। কাপড় বুনে আর টাকা রোজগার করে কেটে যায় সাইলাসের সীমাবদ্ধ দিনগুলি। আপন-জন বলতে ওর কেউ নেই—তাই ও বন্ধনহীন। সব আশা, সব আনন্দ ও ঢেলে দিয়েছে অর্থোপার্জ্জনের পেছনে। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে টাকার থলি সামনে রেখে যে সময়টুকু

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে।



নিভৃতে কাটায় সেই সময়েই সে খুঁজে পায় বেঁচে থাকার সার্থকতা। মানুষের 'পর যারা বিশ্বাস হারিয়েছে তাদের সকলেরই বুঝি এই রকম হয়ে থাকে! ফলে, গ্রামবাসীদের মার্ণার সম্বন্ধে একটা ভয়মিশ্রিত কৌতুহল থেকে গেল। এই রকম অদ্ভুত নিঃসঙ্গ জীবন সকলের একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। তাই সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরেও মার্ণারের জীবনটা একটা রহস্যই রয়ে গেল। তবে এ কথাটা রটে গেল যে, মার্ণার এই ক'বছরে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে। পনেরো বছর পর বড়দিনের কাছাকাছি সময় সাইলাসের জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এল, যার ফলে গ্রামের আর পাঁচ জনের সঙ্গে ওর জীবন এক হয়ে গেল। * * *

স্কয়ার কাসের পরিবার র‍্যাভেলো গ্রামের সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত ঘর। স্কয়ার কাসের দুই ছেলে, গড্‌ফ্রে ও ডান্‌ষ্টান্। ডান্‌ষ্টান্ সম্বন্ধে সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সবাই জানে, ও একেবারে বয়ে গেছে। বড় ছেলে গডফ্রের ওপরই সকলের আশা-ভরসা। কিন্তু একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ওকে অনেক দণ্ডই দিতে হয়। সকলের অজ্ঞাতে মলি ফ্যারেন্ নামে একটি মেয়েকে ও বিয়ে করে ফেলেছিল। এই গোপনীয় কথাটি আর কেউ না জানুক, ডান্‌ষ্টানের অজানা ছিল না। তাই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য কত টাকাই না গড্‌ফ্রের দিতে হয়েছে ওকে। এই ডানষ্টানের সাইলাসের টাকার ওপর অনেক দিন থেকেই লোভ ছিল। একদিনের কথা। রাত্রিতে বাড়ী ফিরবার পথে ডান্‌ষ্টান আস্তে আস্তে সাইলাসের কুটীরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং ওর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওর গচ্ছিত টাকার থলিটি হস্তগত করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন বৃষ্টি পড়ছে, পথ তাই পিছল। * *

* * ডানষ্টান যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সাইলাস তখন বাড়ী ফিরছে। ঘরে ঢুকে সেই শূন্য গর্ত্তের ওপর চোখ পড়তেই ওর মনটা ধ্বক্ করে উঠ্‌ল। কিন্তু টাকা যে চুরি যেতে পারে এ বিশ্বাসকে সে কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারল না। এ আশঙ্কা যে অমূলক সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য কম্পিত বক্ষে সমস্ত জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। যখন সেই ভয়ানক সত্য অস্বীকার করবার উপায় থাকল না, তখন সে পাগলের মত চীৎকার করে উঠ্‌ল। গ্রামের মোড়লরা খবর শুনে আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে ওকে সব রকমে সাহায্য করল; কিন্তু টাকার কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। টাকা পাওয়া গেল না, কিন্তু আজ সে মানুষের সহানুভূতি ও দয়ার মূল্য বুঝতে পারল। এর স্বাদ সে জীবনে আগে কোন দিন পায় নি তো! ...তবু সাইলাস আজ হৃতসর্ব্বস্ব। নিরুৎসাহ ও হতাশায় সাইলাসের দিন কেটে যায়। ওর এই শূন্য জীবনে কাজ করবার মধ্যে আনন্দ কোথায়? এতদিনকার এই সঞ্চিত ধনই ওকে সব কাজে অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে—আজ সব অন্ধকার। এই দুঃখের দিনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার ও সুযোগ পেল। এঁদের মধ্যে মিসেস্ উইন্‌থ্রপ্ একজন। এই

সর্ব্বনাশের পর থেকে সাইলাস সন্ধ্যার পর দরজা খুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ওর বিশ্বাস, টাকা যদি ফিরে আসে তো এই পথেই আস্‌বে; কেমন ক'রে আসবে সে সম্বন্ধে অবশ্যি ওর কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু ও ঐ সময় ঐ ভাবে বসে থাকে। বড়দিনের এক সন্ধ্যায় ঘরের মধ্য ওর ক্ষীণ-দৃষ্টি পড়্‌ল একটা জিনিষের ওপর। তবে কি ওর টাকা সত্যি অলৌকিকভাবে ফিরে এল! নীচু হয়ে হাত বাড়াতেই শক্ত টাকার বদলে সে অনুভব কর্‌ল নরম কোঁক্‌ড়া চুল! বিস্মিত হয়ে দেখ্‌ল, একটি ঘুমন্ত শিশু। সাইলাসের মনে প্রশ্ন জাগ্‌ল, ও এল কি ভাবে? কিন্তু জান্‌তে পারল না যে এই মেয়েটির মা, গড্‌ফ্রেরই স্ত্রী—মলি ফ্যারেন অদূরে একটি ঝোপের নীচে আফিঙের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে—বোধ হয় তখন সব শেষ হয়ে গেছে। শিশু-কন্যাটি সাইলাসের ঘরের আলো দেখে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে চিমনির পাশে গিয়ে শুতেই সেই উত্তাপে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগেই সে কেঁদে উঠ্‌ল মা, মা বলে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সাইলাস ওকে বুকে চেপে ধরে শান্ত কর্‌তে চেষ্টা করল। তার পর ওকে কোলে নিয়েই বেরিয়ে পড়্‌ল ওর মায়ের খোঁজে। ঝোপের কাছে এসেই দেখ্‌ল ওর মাকে। তখনই সাইলাস ছুট্‌ল গ্রামের লোকদের খবর দিতে। খবর পেয়ে সবাই সেখানে সাহায্যের জন্য ছুটে এল—গড্‌ফ্রেও সেখানে উপস্থিত। দেখা মাত্রই মা-মেয়েকে ওর চিন্‌তে দেরী হ'ল না; ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। আজ বুঝি ওর গোপন কথা গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যায়—তা হ'লে যে ওর মুখ দেখাবার উপায় থাক্‌বে না। তাই সমস্ত ব্যাপারটা জেনেও সে নিঃশব্দে চেপে গেল। যখন শুন্‌ল, মলি আর জীবিত নেই তখন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ল। কেউ জান্‌তেও পার্‌ল না যে এই মেয়েটি সম্ভ্রান্ত গড্‌ফ্রের স্ত্রী। * * *

সাইলাস আগ্রহ ক'রে মেয়েটিকে পালন করবার সব দায়িত্ব নিল। "অসহায়, অনাথ শিশুটিকে ভগবান্ যখন এ ভাবে পাঠিয়েছেন তখন ওর সব ভার আমাকেই নিতে হবে; এর মা নেই, বাপ কে তাও জানি না। মেয়েটিও একা, আমিও একা; আমার টাকা কোথায় গেছে জানি না, ও কোত্থেকে এসেছে তাও জানি না"—এই সব ভেবে সাইলাস মেয়েটিকে মানুষ কর্‌তে লাগ্‌ল। এখন থেকে ওর শূন্য জীবনে এই মেয়েটি সব জায়গা জুড়ে বস্‌ল। মেয়েটির নাম রাখা হ'ল এপ্‌পি। ওকে একান্তভাবে নিজের করে মানুষ করে তোলাই হ'ল সাইলাসের একমাত্র আশা ও আনন্দ। কিন্তু সংসারে অনভিজ্ঞ আনাড়ী সাইলাসের পক্ষে কাজটা মোটেই সোজা হ'ল না। যাই হোক, এই ব্যাপারে প্রতিবেশিনী মিসেস্ উইনথ্রপের পরামর্শ অনুসারে সে চলত। কিন্তু এপ্‌পির সব কিছুই ও নিজের হাতে কর্‌ত, ওর সব সময় ভয়, এপ্‌পি পাছে অন্য কারও বাধ্য হয়ে পড়ে। তাই ওকে নিয়ে সাইলাসের দিন কেটে যায় ব্যস্ততায়। এপ্‌পি আসবার পর থেকে সাইলাসের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ব্যতিক্রম হ'তে লাগ্‌ল—ওর সহস্র আব্দার, সহস্র দাবী আজকাল



সাইলাসকে মেটাতে হয়। এপ্‌পির মন চায় আলো-হাওয়া, মানুষের সাহচর্য্য—ওর উৎসাহের স্রোতে ভেসে যায় সাইলাসের সঙ্কীর্ণ জীবনের সমস্ত বাঁধন। দুষ্টু এপ্‌পি কখন কি ভাবে কার অনিষ্ট করে বসে—তাই হয়েছে সাইলাসের আজকাল সব চেয়ে বড় ভাবনা। উইনথ্রপ্ বলেছে, এর ভাল ওষুধ হচ্ছে শাস্তি। কিন্তু ওকে শাস্তি দিতে সাইলাসের মন সরে না, ভয় হয়, যদি এপ্‌পির ভালবাসা এতে কমে যায়। সাইলাস যখন তাঁতের কাজে ব্যস্ত থাকে তখন এপ্‌পিকে লম্বা একখানা কাপড় দিয়ে তাঁতের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয়। একদিন এপ্‌পি হাতের কাছে কাঁচি পেয়ে বাঁধন কেটে মুহূর্ত্তের মধ্যে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সাইলাস তখন মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল—এপ্‌পির এই কীর্ত্তির কথা জান্‌তেও পার্‌ল না। কাঁচির খোঁজে উঠে আস্‌তেই ওর চক্ষুস্থির—ভয় পেয়ে "এপ্‌পি, এপ্‌পি" বলে চীৎকার করে বাইরে ছুট্‌ল। এদিক্-ওদিক্ সমস্ত জায়গায় খুঁজল। শেষকালে পুকুরের ধারে গিয়ে দেখ্‌ল, এপ্‌পি খুব খুসী মনে ওর জুতোর মধ্যে জল ভ'রে আর একটা গর্ত্তের মধ্যে ঢাল্‌ছে—আর নিজের মনে বক্ বক্ কর্‌ছে। সাইলাস ঠিক করেছিল, ওকে আজ কঠিন শাস্তি দেবে; কিন্তু ওকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে সব ভুলে গেল। তখনই ওকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌ল—সব সঙ্কল্প ভেসে গেল। বাড়ী ফিরে অবশ্যি শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যাক্ সে কথা। এই ভাবে অতি সুখেই এপ্‌পি ও সাইলাসের ষোলটি বছর কেটে গেল। * * *

* * এদিকে এত দিন পর গড্‌ফ্রের অনুশোচনা এসেছে। সাইলাসের কুটীরের সামনে যে গর্ত্তটা সেটা শুকিয়ে যাওয়ায় ডানষ্টানের কঙ্কাল ও সাইলাসের টাকা পাওয়া গেল। ষোল বছর আগে সাইলাসের টাকা চুরি করে ডানষ্টান অন্ধকারে পথ ভুল করে এই গর্ত্তের মধ্যে প্রাণ দিয়েছিল। গড্‌ফ্রের আজ বিশ্বাস হয়েছে, কোন কথাই বেশী দিন গোপন রাখা যায় না। তাই সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যেদিন পিতৃত্বের দাবী নিয়ে এপ্‌পিকে ফিরিয়ে নিতে চাইল সাইলাসের জীবনে সেদিন কি একটা ভয়ানক মুহূর্ত্তই না গেছে! সুদীর্ঘ ষোল বছর পরে আজ কিনা গড্‌ফ্রে তার জীবনসর্ব্বস্ব এপ্‌পিকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে! যুক্তি প্রবল: গড্‌ফ্রেই যে এপ্‌পির বাপ! ওকে বড় ঘরের মেয়ে করে সুখী করতে চায়। একদিকে এপ্‌পির মঙ্গল, অন্য দিকে তার নিজের ভালবাসা। এর কোনটাকেই সাইলাসের অস্বীকার করবার উপায় নেই। বড় দুর্ব্বল জায়গায় আঘাত পড়েছে আজ। সে কি এপ্‌পির সুখের পথে বাধা হ'তে পারে! তাই গড্‌ফ্রের নিষ্ঠুর প্রস্তাব শুনে সে শঙ্কিত হয়ে উঠল; তার পর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল,—"এপ্‌পি, তুমি নিজেই যা ভাল বোঝ ঠিক কর—আমি কোন বাধা দেব না।"

এপ্‌পির তখন মনের কি অবস্থা? গড্‌ফ্রের পরিচয়ে ও প্রথমটা খুবই ধাক্কা খেয়েছিল। সাইলাসের মনোকষ্ট ও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর্‌ল। অবশ্যি ও যে পথ বেছে নেবে সে সম্বন্ধে ওর

সংশয় ছিল না। তাই গড্‌ফ্রের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে ওর সঙ্কল্প বিন্দুমাত্র টলে নি। কিন্তু এই নব-পরিচিত পিতার প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধায় ওর মনটা ভরে উঠল না। দুই পক্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এখন একটি ছোট মেয়ের ওপর নির্ভর করতে লাগল। এপ্‌পির মন কিন্তু অনেক আগেই ঠিক হয়ে আছে। শক্ত হয়ে সে গড্‌ফ্রেকে লক্ষ্য করে বল্‌ল—"আপনার এই অনুগ্রহ আমার আশার বাইরে—ওতে আমার কোন লোভ নেই। আমার বাবাকে ছেড়ে থাক্‌তে হ'লে জীবনে আমার কোন আনন্দই থাক্‌বে না। উনি আমাকে এতটুকু থেকে আজ এত বড় করে তুলেছেন। আমি ওঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না"—বল্‌তে বল্‌তে এপ্‌পির কণ্ঠরোধ হয়ে এল। হতাশ হয়ে গড্‌ফ্রে ফিরে গেল।

* * সাইলাস বেঁচে গেল। তিন বছরের একটি শিশু একদিন তাকে সর্ব্বনাশের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল সেই মেয়েটিই আজ আবার তাকে সংসারের সুখ ও শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চল্‌ল।

* * *

এপ্‌পির সঙ্গে মিসেস্ উইন্‌থ্রপের ছেলে আরণের বিয়ে হয়ে গেল। আগেই ঠিক হয়েছিল, ওরা বিয়ের পর সাইলাসের কাছেই থাক্‌বে। তিন জনে ছোট সংসার বেঁধে সুখে, শান্তিতে বাস কর্‌তে লাগল।

---

## সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন

এই প্রশ্নগুলির জবাব তোমরা নিজেরা দাও। না পারলে আগামী সংখ্যায় উত্তর পাবে।

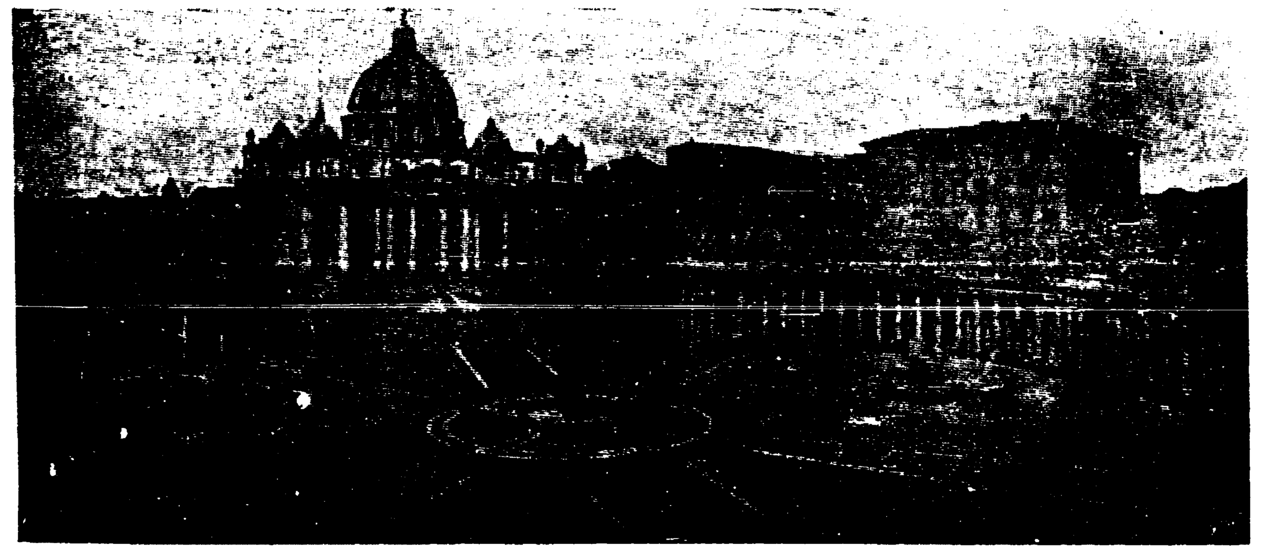

১নং



(১) এগুলি বলতে কি বোঝায় ?—

(ক) ভিক্টোরিয়া ক্রস্ (খ) ডেষ্ট্রয়ার (গ) ডেপ্‌থ্ চার্জ্জ্ (ঘ) মাষ্টার্ড্ গ্যাস্।

(২) নিম্নলিখিত সনগুলি কি জন্য বিখ্যাত ?—

বাংলা ১১৭৬ সাল, ইংরেজী ১৭৮২ খৃঃ, ১৮৮৫, ১৯১৭।

(৩) ১নং ও ২নং ছবি দু'টো কিসের চিনতে পার ?

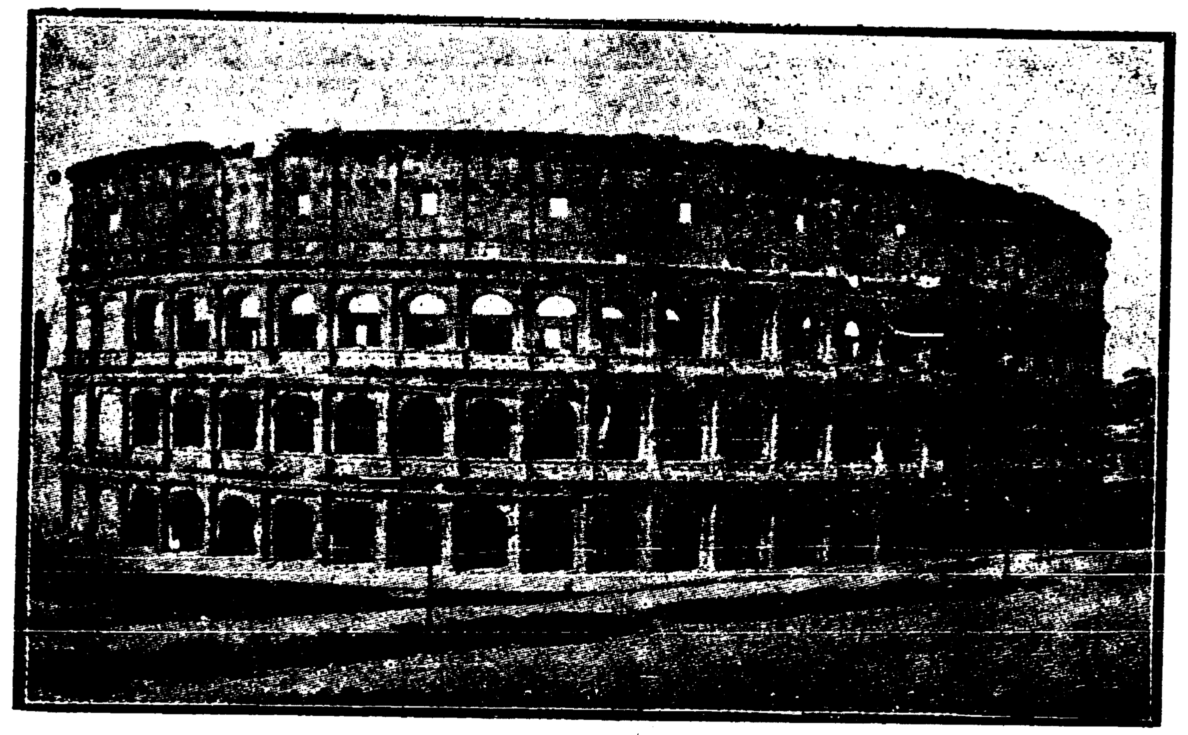

২নং

---

## আজগুবি খেয়াল

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ

পৃথিবীতে যাঁরা বড় এবং বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অনেক রকম আজগুবি খেয়াল ছিল। সেগুলির কয়েকটি তোমাদের শোনাচ্ছি।

জেম্‌স্ ব্যারি হচ্ছেন একজন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক। ইনি যখন প্রথম প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন তখন দিনের পর দিন জানালার ধারে ডেস্কের সাম্‌নে বসে কত কি আকাশ পাতাল ভেবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন। কিছুতেই, কিন্তু, কোন প্লট্ তাঁর মাথায় খেল্‌ত না। এই ব্যাপার দেখে তাঁদের পাড়ার এক অতিকর্ম্মঠ বুড়ী একবার বলে ফেলেছিল, "হতভাগা আল্‌সে ছোঁড়াটার কাণ্ড দেখ। তিন চার মাস ধরে একে ডেস্কের কাছ থেকে এক চুল সরে বস্‌তেও দেখলুম না!"

বিখ্যাত ডিটেকটিভ্ গল্প-লেখক এড্‌গার ওয়ালেসের নাম তোমরা কে না শুনেছ? প্রথমটা গল্পের প্লট্ এঁর মাথায় আসতেই চাইত না, ভেবে ভেবে হয়রাণ হয়ে যেতে হ'ত। কিন্তু একবার মাথায় খেল্‌লে আর রক্ষা নেই। রেসের ঘোড়ার মতন এঁর কলম শন্ শন্ করে কাগজের ওপর ছুটে চল্‌ত। একবার হয়েছে কি, ওয়ালেস্ সাহেব ভেবে ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছেন না, এমন সময় তাঁর সেক্রেটারী ভাব্‌ল কর্ত্তা বুঝি ঘুমে ঢুল্‌ছেন। এই ভেবে যেই না বেচারী মনিবকে তুল্‌তে যাবে অমনি এল প্রচণ্ড ধমক্। "চুপ্"—ওয়ালেস চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "খবরদার, গোলমাল ক'র না। তুমি ভাবছ যে আমি ঘুমে ঢুল্‌ছি, আসলে সবে প্লট্‌টি আমার মাথায় খেল্‌তে সুরু করেছে।"

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের নাম আজ কারও অজানা নয়। শোনা যায় আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌তে ইনি দশ বৎসর প্রতিটি দিন একাগ্র ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবে ভেবে কাটিয়েছেন। কত বিনিদ্র রজনী যে ইনি চেয়ারে বসে অতিবাহিত করেছেন তার সংখ্যা করা যায় না। রাত্রে ঘরে খাবার ঢেকে রাখা হয়েছে, সকালে দেখা গেল খাবার যেমনি ঢেকে রাখা হয়েছিল তেমনি পড়ে আছে; খাবেন কি—তাঁর যে ক্ষিদে পেয়েছে এটুকু বোধ করবার শক্তিই তখন তাঁর লোপ পেয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও একাগ্রতা ভাব ত'!

এক এক সময়ে কি রকম অদ্ভুত আবেষ্টনীর মধ্যে মনীষীরা তাঁদের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন করেন তা ভাব্‌লেও আশ্চর্য্য হতে হয়। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ফ্রান্‌জ্ শু্‌বার্ট একদিন সরাইখানায় বসে এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন। কি কথায় কথায় বন্ধুটি শেক্‌স্‌পিয়ারের সিম্‌বেলাইন্ নামক নাটকের এক ছত্র আবৃত্তি করে ফেল্‌লেন। ঐ ছত্রের শেষ শব্দটি শু্‌বার্টের মনকে এমন গভীর ভাবে স্পর্শ করল যে সেইখানে বসে বসেই খাবারের বিলের যে কাগজটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার উল্‌টো পিঠে তিনি তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান রচনা করলেন।



বিখ্যাত রাসায়নিক কেকুলের নাম শুনেছ কি? বেন্‌জিন্ নামক রাসায়নিক পদার্থের গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে ইনি যে গবেষণা করে গেছেন রাসায়নিকদের কাছে তা খুব মূল্যবান্। এই গবেষণা করবার সময় প্রথমটা তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারছিলেন না। এই সময় তিনি একদিন বাসে চেপে লণ্ডনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, গবেষণার বিষয় বিশেষ করে ভাবেনও নি। হঠাৎ তাঁর মাথা এমনি খুলে গেল যে এক মিনিটের ভেতর তিনি তাঁর গবেষণার সমস্যা সমাধান করে ফেল্‌লেন—যা তিনি দিনের পর দিন ল্যাবোরেটরীতে মাথা ঘামিয়েও করতে পারেন নি।

জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মান্ দার্শনিক কাণ্টের এক অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। দার্শনিক তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে তিনি যখন লিখতেন তখন মনের একাগ্রতা আনবার জন্য তিনি তাঁর জানালার সম্মুখস্থিত এক স্তম্ভের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে থাকতেন। ক্রমে নানা গাছ-গাছড়া গজিয়ে স্তম্ভটিকে ঢেকে দেয়। কাণ্ট্ জানালা দিয়ে স্তম্ভটিকে আর দেখতে পান না; ফলে, তাঁর মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যেতে লাগ্‌ল। তিনি বেজায় মুস্কিলে পড়্‌লেন। লজ্জায় কথাটা কারুকে বল্‌তেও পারেন না। অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে ব্যাপারটি ইনি পৌর-পরিষদের কর্ত্তাদের কর্ণগোচর করালেন। তাঁরা দেখলেন যে এই গাছগুলি কেটে না দিলে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের চিন্তাধারা নষ্ট হয়ে যায়; সুতরাং কাণ্টের অভিযোগ মেটাতে তাঁরা কার্পণ্য কর্‌লেন না। কাণ্টের মত প্রসিদ্ধ লেখক ইব্‌সেনেরও এক অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। মনোযোগ আনবার জন্য এঁকে ছোট ছোট মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'ত। তাই এঁর লেখার টেবিলের চারিধারে সাজান থাকৃত নানা রকম ছোটখাট মূর্ত্তি। পায়ে মোজা না থাক্‌লে টমাস্ হার্ডি লিখ্‌তে পারতেন না। গভীর তত্ত্বসমূহ আলোচনা করবার সময় রুশো ও ভল্‌টেয়ার সর্ব্বদা কফির বাটিতে চুমুক লাগাতেন। সামনে

চায়ের পেয়ালা না থাকলে জন্‌সন্ সাহিত্য চর্চ্চা করতে পারতেন না। বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ এবং সাহিত্যিক লর্ড বল্‌ডুইন্ পাইপ্ ছাড়া কাজ করতে পারতেন না। একটুখানি মদ না খেলে এডিসন ও সেরিডনের প্রতিভার বিকাশ হ'ত না। লেখবার সময় রুশো সর্ব্বদা তাঁর সামনের জানালা খোলা রাখতেন যাতে সূর্য্যালোক এসে তাঁর পায়ে পড়ে। এমিল জোলার অভ্যাস ছিল ঠিক এর উল্টো। ঘর অন্ধকার করে কৃত্রিম আলো না জ্বাল্‌লে ইনি লিখে আরাম পেতেন না। দেকার্তে, লাইবেনিজ্ প্রভৃতি মনীষীরা বল্‌তেন যে সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শুয়ে শুয়ে অথবা হেলান দিয়ে ভাবতে থাকা। কবি মিল্‌টনেরও এই মত এবং অভ্যাস ছিল। আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলে থাকেন যে এদিক্ ওদিক্ পাইচারী কর্‌তে কর্‌তে ভাবতে থাকলে সমস্যা অনেকটা সরল হয়ে আসে। আমি শুনেছি আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু কঠিন সমস্যা উপস্থিত হ'লে অনেক সময় গম্ভীর ভাবে পদচারণা করতেন।

আসরে নামবার আগে আমরা সকলেই রিহার্সাল বা তালিম নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বিশ্ববিখ্যাত বেহালা-বাদক ফ্রিজ্ ক্রাইসলার এক ঘণ্টার জন্যও এ রকম তালিম দেন না। অথচ কিছুমাত্র অভ্যাস না করেও ইনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত করে দিতে পারেন।

---

# বল্টিনাথের ভাঁওতা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্.এ, বি.টি

লাকটাকিয়ার রাস্তাটা যেখানে ফাঁসীবাজারের মোড়ে আসিয়া মিশিয়াছে ঠিক সেইখানটায় বহুদিনের ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এক নেড়া বটগাছ। তারি ডানদিক ঘেঁসিয়া ছোট্ট একখানি টিনের চালা। আজ চারি বৎসর ধরিয়া ঐ চালাটুকু সম্বল করিয়া চলিতেছে বল্টিনাথের বন্ধকী কারবার। চার বৎসর টুক্‌টাক্ করিয়া বল্টিনাথের দোকানের পশার যা বাড়িয়াছে তাহা নেহাৎ মন্দ বলা যায় না।



গৌহাটীর মত মফঃস্বল সহরে ইহার বেশী সে আশাও করে না। স্কুলে থার্ড ক্লাস অবধি পড়িয়াছিল সে, কিন্তু একবার পরীক্ষায় ফেল করিয়াই সরস্বতীকে নমস্কার জানাইয়া লক্ষ্মীর শরণাপন্ন হয়। এই দুর্দিনে দুইবার এক ক্লাসে পড়িবার মত ধৈর্য্য বা সঙ্গতি কোনোটাই তাহার ছিল না। আজ চার বৎসর পরে বন্ধুবান্ধব সকলেই একবাক্যে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলে—"ঠিক ধরেছিস, বটে!"

"ভোল্, দাদা, স্রেফ ভোল্"—বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলে বল্টিনাথ—"ব্যবসায় উন্নতি অবনতি সব গিয়ে তোমার নির্ভর করে ভাঁওতার উপর।"

বন্ধুরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে। স্কুলে থাকিতে যে বল্টিনাথের "পেট ফাটে তো মুখ ফোটে না" গোছের অবস্থা ছিল, তারই মুখে এবংবিধ বিজ্ঞজনোচিত হাসি ও মন্তব্য তাহাদের বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি করে মাত্র।

"হ্যাঁ, জানলি", উৎসাহের স্রোতে গড়াইয়া চলে বল্টিনাথের বুলি—"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা! একই জিনিষ—পলাশবাড়ী থেকে এনে এক দর—পানবাজার থেকে এনে অন্য দর!" অমনি অজস্র!

তা বল্টিনাথের বাক্য নেহাৎ মিথ্যা নয়। চার বৎসরে যা থেকে সুরু করিয়া সে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহাতে বন্ধুদের তাক লাগিবার কথাও। ইতিমধ্যে বাঁশের মাচান পাকা পোস্তায় এবং টিনের চেয়ার কাঠের কেদারায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ফতুয়া ছাড়াইয়া বল্টিনাথের বর অঙ্গ মুগার পাঞ্জাবীতে প্রমোশন পাইয়াছে, পায়ে চটির বদলে উঠিয়াছে পাম্প স্যু। হাতে আবার আংটী।

ইহাকেই বলে বরাত!

নিত্যকার মত পরিপাটি সাজিয়া সেদিনও বল্টিনাথ খরিদ্দারের অপেক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। নূতন বছরের মুখে মুখে সমস্ত সহরে একটা কর্ম্মচঞ্চলতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে বিচিত্র জনতা, বল্টিনাথ নিবিষ্টমনে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল।

হঠাৎ জনস্রোত হইতে আলগা হইয়া একজন গেরুয়াধারী লোক বল্টিনাথের দোকানে পদার্পণ করিলেন। বল্টিনাথ ব্যবসায়ীসুলভ আদবকায়দায় তাহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। লোকটার বৈরাগীর বেশ—ভেকধারী। বল্টিনাথ জানে তাহার দোকানের খরিদ্দার বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর। অতএব কিছু দাঁও মারা যাইবেই।

"কি চাই?" তাম্বুল-কলুষিত দন্তপঙ্‌ক্তিতে মিষ্টি হাসি ছড়াইয়া প্রশ্ন করে বল্টিনাথ।

"না—এই—ইয়ে—" লোকটি আমতা আমতা করিয়া ঝোলার ভিতরে হাত চালাইতে থাকে।

"হেঃ, দেখেন—এই জিনিষটা—", এই বলিয়া খেলনা মতন একটি ছোট্ট বেহালা বাহির করিয়া বষ্ঠিনাথের হাত-বাক্সের গায়ে দাঁড় করাইয়া রাখে।

"এডা আমার বড়ো যত্নের দেবো, দাদা! তবে কিনা, বড়ো দায়ে পইড়া গেছি—তাই—হেঁ, হেঁ…"। বলিয়া লোকটা গলাখাঁকারী দিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়ে। বষ্ঠিনাথের এ সব অভিজ্ঞতা আছে। আদ্যোপান্ত না বলিলেও ইহার আবেদন বষ্ঠিনাথের বুঝিতে বিলম্ব হইবার কথা নহে।

"দেখি?" বলিয়া বষ্ঠিনাথ বেহালাটা সন্তর্পণে হাতে নেয়।

টুং—টাং—আঙুল লাগিতেই তারগুলি বাজিয়া উঠে।

"কত চাই?" ভ্রূ কুঁচকাইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে বষ্ঠিনাথ। ভাবটা—যেন জিনিষটা নেহাৎই বাজে; তবে যখন লোকটা দায়ে ঠেকিয়াছে, তখন দয়া—

"কী আর চাইমু, দাদা—", দরদভরা স্বরে বলে বৈরাগী, "এ জিনিষের কি দাম হয়? নেহাৎ ঠেকায় পড়ছি। এট্টা কীত্তন গাইয়া বখসিষ্ পাইছিলাম এডা…দিছিলেন গিয়া রাশতলার রাণীমা—তা—" বলিতে বলিতে আবার থামিয়া যায় বাবাজী।

"তা হবে!" হতাশ ভাবে মন্তব্য করে বষ্ঠিনাথ। "তবে এ সব জিনিষ লোকে নেয় না… পয়সা দিয়ে দু' মাস ঘরে ফেলে রেখেও আমাদের কিছু লাভ নেই!"

"কথাডা ঠিকই কইছেন, দাদা, আমার নেহাৎ ঠেকা তাই। তা গোডা পাঁচেক টাকা দেন তো রাইখ্যা যাই—আর এ আমার হক্কের ধন, কাইলই আমি ছাড়াইয়া নিমু না? টাকার লাগি এ জিনিষ ত্যাগ করতে তো পারি না আমি।—" বাবাজীর চোখ দুইটা চক্ চক্ করে।

"আহা, তা বৈ কি," থতমত খাইয়া বলে বষ্ঠিনাথ।…"কিন্তু পাঁচ—টা—কা! অথচ এ তো আর কেউ দাম দিয়ে নেবেও না।"

"আহা, ছিঃ," জিভে কামড় দিয়া হাত যোড় করিয়া বলে বাবাজী—'আমি কি এডা ফেলাইয়া রাখমু? চব্বিশ ঘণ্টার ওয়াস্তা! কাইলই না ছাড়াই তো নাম নাই আমার। রাণীমার দেওয়া ধন যে!"

বেহালাটির একটি কান সোনা বাঁধানো ছিল। হিসাবী বষ্ঠিনথের বুঝিতে দেরী হইল না যে তাহাতেই এই যুদ্ধের বাজারে অন্ততঃ পক্ষে দশটি রৌপ্যমুদ্রা লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব—

"আচ্ছা, বাবাজী যখন বল্‌ছেন," তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে বষ্ঠিনাথ—"নেবেন পাঁচটি টাকা। তবে কি না যুদ্ধের বাজার—সুদটা কিছু চড়া হবে—"

বেহালাটি যথাস্থানে রাখিয়া বষ্ঠিনাথ হাত-বাক্স হইতে পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির



করে।' লেখাপড়া সারিয়া বাবাজী 'চৈতন্য চৈতন্য' বলিতে বলিতে টাকা লইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

বেলা তখন বারোটা।

২

পর দিন যথাকালে দোকান খুলিয়া বষ্ঠিনাথ খরিদ্দারের অপেক্ষায় তেমনি বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি ৯।১০ বছরের মেয়ে তার বুড়া সঙ্গীটিকে এক রকম জোর করিয়াই বষ্ঠিনাথের দোকানের কাছে টানিয়া আনিল।

"কৈ, কি?—দেখা তো?" বুড়া ভদ্রলোক মেয়েটির সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"ঐ তো"—বলিয়া মেয়েটি বাঁ হাতের অঙ্গুলি সঙ্কেতে বষ্ঠিনাথের শো-কেসে রক্ষিত সেই ক্ষুদে বেহালাটি দেখাইয়া দেয়।

বষ্ঠিনাথের দোকানে একটি শো-কেস আছে। যে সব জিনিষ ভাল, অথচ মালিকেরা নির্দ্দিষ্ট কালে ছাড়াইয়া লইতে না পারায় বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সেগুলিও ওখানে বিক্রয়ের জন্য সাজাইয়া রাখে। যে বেহালাটি বাবাজী বন্ধক রাখিয়া গেছে সেটাও নেহাৎ খেলনার সামগ্রী জানিয়াই কেবল কৌতূহলের বশেই ঐখানে রাখিয়াছিল। বাবাজীর জিনিষ বাবাজী ফিরাইয়া নিতে আজই বিকালে আসিবে। ইতিমধ্যে জিনিষটা যাচাই করিতে দোষ কী?

"হ্যাঁ হে, ওটার দাম কত?" ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন।

মিষ্টি হাসিয়া শো-কেসের মধ্য হইতে সন্তর্পণে বাহির করিয়া মেয়েটির দিকে আগাইয়া ধরে বষ্ঠিনাথ।

"জিনিষটা সত্যিই সুন্দর," জোর দিয়া বলে সে,—"তা ছাড়া কানটা স্রেফ্ সোনা বাঁধানো কিনা!"

পরম যত্নে আলগোছে বেহালাটি ধরিয়া সেটাকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করিয়া দেয় মেয়েটি।

"কত দাম?"—উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় সে বষ্ঠিনাথের দিকে।

"জিনিষটা পছন্দ হয় কি না, তাই দেখুন আগে। সাগ্রহে অগ্রসর হয় বষ্ঠিনাথ—"দামের জন্য কী আর—!"

জিনিষটা পছন্দ হইয়াছে কি না তাহা অবশ্য বদ্যিনাথের বুঝিতে বাকী নাই। এ শুধু টোপ ফেলা।

নাতনী ঠাকুরদা'র মধ্যে ইতিমধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যায়। পছন্দ তাহাদের হইয়াছে। এখন দামটা জানিতে পারিলেই হয়।

যা থাকে কপালে, মনে করিয়া বদ্যিনাথ আন্দাজে কোপ মারিল—"বেশী আর কী চাইব, বলুন, যখন পছন্দ হয়েছে তখন ওটা আমি—দিন, পঁচিশ টাকাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।"

নাতনী তাকায় ঠাকুরদা'র দিকে, ঠাকুরদা' নাতনীর দিকে।

বদ্যিনাথের বরাত ভালো। নাতনীর খাতিরে ওই ঠুনকো বেহালার জন্য পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রা জলে ফেলিতেও ঠাকুরদা' রাজী।

"বেশ!" বুড়া ব্যাগ বাহির করেন। কিন্তু বদ্যিনাথ বাধা দিয়া বলে, "এখন ওটা দিতে পারব না মশাই। আজকের দিনটা অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। ওপরের দিকে একটা জায়গা আলগা হয়ে আছে কি না, সেটা ঠিক করিয়ে রাখব'খন, কাল ঠিক এমনি সময়ে আসবেন।

"তাই"!—অগত্যা একটি দিনের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতেই হয় তাদের।

৩

বিকালের দিকে যথাসময়ে গেরুয়াপরা বাবাজী বদ্যিনাথের দোকানে আসিয়া হাজির। মুখখানি তার খুশীতে উজ্জ্বল, কিছু টাকা মিলিয়াছে হয় তো। বাবাজীকে দেখিয়াই বদ্যিনাথের প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠে। সাধারণতঃ বদ্যিনাথের খরিদ্দার শ্রেণীর বেশীর ভাগেরই বন্ধকী জিনিষ ফিরাইয়া লইবার বদ্‌অভ্যাস থাকে না; এবং বদ্যিনাথের ব্যবসায়ের ইহাই বড় সম্বল।

"কৈ দিন তো,"—বলিয়া বাবাজী ঝোলা হইতে গুণে গুণে পাঁচ টাকা চারি আনা হাত-বাক্সের উপর রাখিয়া দেয়।

"বড় যে তাড়া?" হাসিয়া বলে বদ্যিনাথ। "কি হবে ওটা নিয়ে? গাইয়ে লোক, একটা খেলনা বেহালা দিয়ে আপনার হবে কী শুনি?"

"তা বটে," হাসিয়া বলে বাবাজী,—"তবে কি না রাণীমার দানের জিনিষ।"

"দানের দক্ষিণা দিচ্ছি"—জোর দিয়া বলে বদ্যিনাথ। বলিতে বলিতে একখানি তেলচিটা পাঁচ টাকার নোট বাবাজীর দেওয়া টাকার পাশে বুড়া আঙ্গুলে চাপিয়া ধরে সে।

"কেমন, খুশী?"

ব্যাপার দেখিয়া বাবাজী হঠাৎ হকচকিয়া যায়। একসঙ্গে এতগুলি টাকার লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন বটে। তথাপি এত সহজে আত্মসমর্পণ করিতেও রাজী নহে সে। দরকষাকষি হইতে হইতে ১৫৲ টাকায় রাজী হয় বাবাজী। এতগুলি রৌপ্যমুদ্রার মুখে রাণীমার দেওয়া পুরস্কারের মর্য্যাদাটুকু সহজেই ম্লান হইয়া যায়।

'কী করবেন এটা দিয়া, দাদা?"—খুশীতে উদ্ভাসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে বাবাজী।



"এই খেয়াল"—তাচ্ছিল্যের সুরে বলে বদ্যিনাথ। আজই বিকালে নগদ ১০৲টা টাকা লাভের আশায় মনটা ভরাট হইয়া ওঠে তার। এত বড় দাঁও শীগ্‌গির বোধ হয় জোটে নাই বদ্যিনাথের অদৃষ্টে। ভাগ্যিস মেয়েটির নজরে পড়িয়া গিয়াছিল জিনিষটা! নইলে সামান্য একটা খেলনার জন্য কে আর এত টাকা জলে ফেলিতে যাইত! বদ্যিনাথ ঘুঘু ব্যক্তি; ব্যবসা করিতে করিতে বুদ্ধি নাকি পাকিয়াছে তার। ঠকিবার পাত্রই সে নয়।

পনের টাকার নোট ঝোলায় ভরিয়া বাবাজী বাহির হইয়া গেল।

৪

পরদিন বেলা দশটায় বদ্যিনাথ নিত্যকার মত রাস্তার দিকে উদগ্রীব নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে—নাতনী-ঠাকুর্দ্দার আশু শুভাগমন প্রতীক্ষায়। অদূরভবিষ্যতে কত বড় দাঁওটা জুটিবে—এই আশায় তাহার মুখমণ্ডল উৎফুল্ল।

১০টা—১০½টা—১১টা—কিন্তু কৈ?—কাহারও তো দেখা নাই! তবে কি?—

তাহাদের যথা সময়ে উপস্থিত না হওয়ার পক্ষে সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা, যুক্তি বদ্যিনাথের মনের মধ্যে ওঠানামা করিতে থাকে। বেলা ক্রমশঃ গড়াইয়া চলে! ৩টা বাজে! কিন্তু কোথায় বদ্যিনাথের বহুবাঞ্ছিত সেই খরিদ্দার যুগল!

৪টা—৫টা—৬টা।

বেচারা বদ্যিনাথের এ পর্য্যন্ত স্নানাহারেরও সুযোগ ঘটে নাই। ক্রমশঃই দুর্ভাবনা ও আশাভঙ্গজনিত দুঃখে তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া ওঠে অস্বাভাবিক বিকৃতি।

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসে।...

মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতে থাকে তার। বদ্যিনাথ আর ভাবিতে পারে না! মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে সে।

জীবনে এই প্রথম বদ্যিনাথের দাঁও ফস্কাইল, এই প্রথম তাহার ভাঁওতা গেল'ভেস্তে।*

* ইংরাজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

# অভাব

শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধীর বাবু মস্ত ধনী,—অনেক জমিদারী,
বড় বড় থাম বসান বৃহৎ দালান বাড়ী।
আশে পাশে ফুলের বাগান, গভীর সরোবর,
চাকর-বাকর মাতিয়ে রাখে বাড়ীর কলেবর।
এত সুখেও হয় না সুখী জমিদারের বউ,
মুখখানি তার শুকিয়ে বেড়ায়—নেই কো যেন কেউ।
ভিখারিণী কোলে শিশু – দ্বারের কোণে ডাকে
"ভিক্ষা কিছু দেবে কি মা, আমার বাছাটাকে ?"
গিন্নী বলে—"কি দেব মা, গরীব বড় আমি,
তোর কাছে যে রত্ন আছে সোনার চেয়ে দামী।"
"ঠাট্টা কেন কর্‌ছ মাগো ! এমন দালান বাড়ী,
ধনীর চেয়েও ধনী তুমি—টাকার আছে কাঁড়ী !"
আঁচল দিয়ে চক্ষু মুছে গিন্নী তারে কয়—
"ছেলেমেয়ে আমায় যে রে দেন নি দয়াময়।
শিশুহারা কোল নিয়ে, মা, দুঃখী চিরদিন,
মাণিক যে তোর কোলটি যুড়ে, কে বলে তুই দীন ?
চাই না সোনা, চাই না দানা, তোরই মত ভাই,
কোল যোড়া এক মাণিক পেলে গরীব হতেই চাই।"

অনেক দিন পরে তোমাদের সঙ্গে পত্রালাপ করছি। দেশের বর্ত্তমান জটিল অবস্থায় ভবিষ্যৎ ভেবে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। সামনে যাই আসুক, আমরা যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্যপথ থেকে ভ্রষ্ট না হই।

তোমাদের চিঠিপত্র ইতিমধ্যে অনেক পেয়েছি। 'লেখনী-বন্ধু' বিভাগ সম্বন্ধে তোমাদের পরামর্শ মত বিভাগটি এই ভাবে খোলার ব্যবস্থা করা হ'ল :—যারা এই বিভাগে নাম দিতে চাও তারা নিজের নিজের নাম, ঠিকানা, বয়স, কোন্ ক্লাসে পড় এবং কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌তে ভালবাস বিস্তারিত ভাবে লিখে আমাদের জানাবে। এ সব নাম রামধনুতে ছাপা হবে না কিন্তু আমাদের কার্য্যালয়ে লিপিবদ্ধ থাকবে। যারা পত্র আদান প্রদান করতে চাও তারা প্রথম বার C/o রামধনু সম্পাদক চিঠি দেবে। আমরা সে চিঠি বন্ধুত্ব স্থাপনেচ্ছু অন্য গ্রাহকের কাছে পাঠিয়ে দেব। চিঠির জবাবও C/o রামধনু সম্পাদক দিতে হবে।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তোমাদের ২।১টা কথা বলা দরকার। প্রায়ই দেখা যায় কোন কোন গ্রাহক এক মাস কি দু' মাস—কি আরও পরে জানান যে তিনি রামধনু পান নি—তাঁর রামধনু যেন নতুন ঠিকানায় পাঠান হয়। সময় মত ঠিকানা বদলের কথা আমাদের না জানান হ'লে স্বভাবতঃই বুঝতে হবে যে রামধনু তাঁদের পূর্ব্ব ঠিকানায় চলে গেছে, এবং সেখান থেকে তা খোয়া গেলে বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে সে ক্ষতি-স্বীকারের ভার আমাদের উপর চাপান কি ঠিক ? আর, এক মাস কি দু' মাস পরে খবর দিলে হারানো সংখ্যাখানি সম্বন্ধে ডাক-বিভাগে কোন রকম অনুসন্ধান করাও তো সম্ভব নয় ! আমাদের কার্য্যালয় থেকে প্রত্যেকটি ঠিকানা দ্বিতীয় বার পরীক্ষা ক'রে তবে কাগজ ডাকে পাঠান হয়—কাজেই কোন অভাবিত ঘটনা ব্যতীত পাঠাবার ভুল হবার প্রশ্ন ওঠে না।

রামধনুর মোড়ক সম্বন্ধেও একটা কথা বলা দরকার। মোড়কের কাগজ এ দেশে তৈরী হয় না। কাজেই তা দুষ্প্রাপ্য, এবং দুর্ম্মূল্য তো বটেই। সময় থাকতে মিতব্যয়িতা না করলে ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়তে হ'তে পারে ভেবেই কয়েক মাস হ'ল মোড়ক সম্বন্ধে নতুন উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। আশা করি যা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলা হয় তার জন্য গ্রাহকেরা মাথা ঘামাবেন না। কোন বিশেষ একখানা কাগজ দৈবাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে

তার জন্য আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

—ইতি রাঃ সঃ

---

২৫শে বৈশাখ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন চলে গেল। অন্যান্য বারের মত এবার আর এ দিনটিতে কবিকে আমাদের মধ্যে সশরীরে পাওয়া যায় নি, কিন্তু তাঁর অক্ষয় বাণীর ভিতর দিয়ে তিনি চিরকাল আমাদের মধ্যে জীবিত থাকবেন। ২৫শে বৈশাখ—এ দিনটিকে বাঙ্গালী কখনও ভুলতে পারবে না—বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই তারিখটি চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

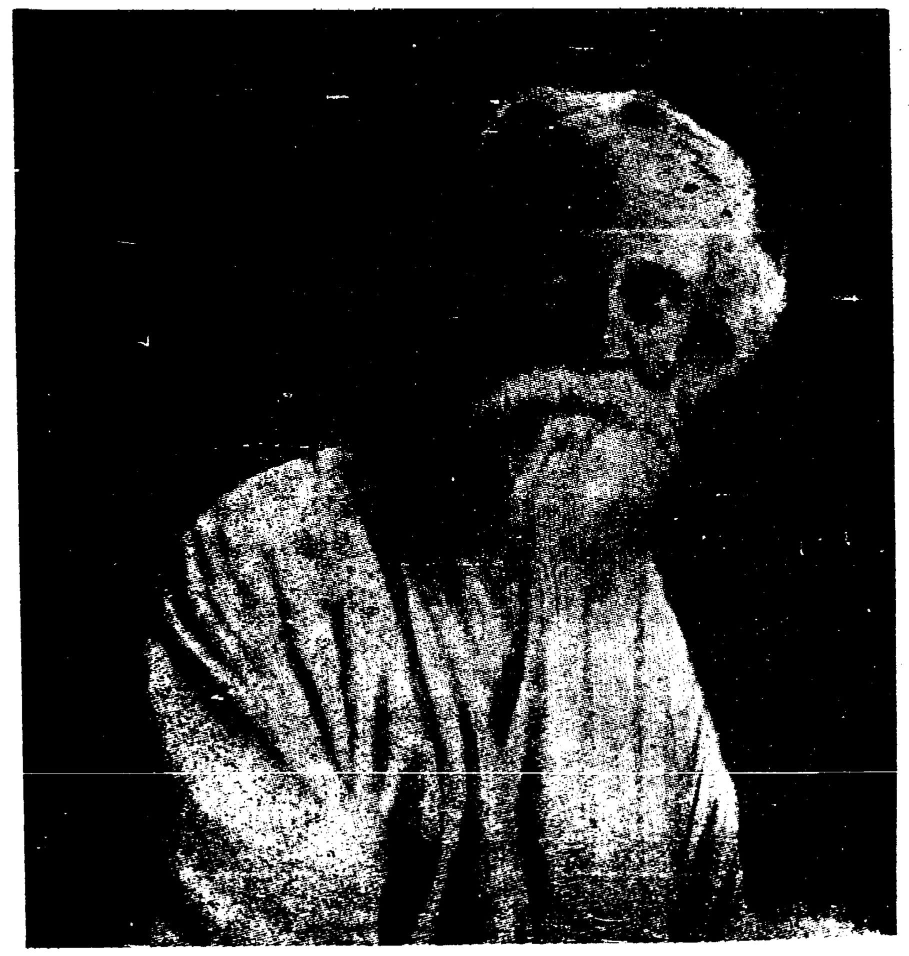

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

* * *

কলকাতার হকী মরশুম শেষ হ'ল। হকী লীগ্ বিজয়ের গৌরব এবার শেষ পর্য্যন্ত পেয়েছে পোর্ট কমিশনার্স দল। বাইটন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে রেঞ্জার্স দল। অনেকের ধারণা ছিল এবার বি. এন্. আর দলই ঐ গৌরব অর্জ্জন করবে কিন্তু ফাইনালে তাদের পরাজিত হ'তে হয়েছে।

হকীর পরই ফুটবল্ লীগ্ স্থরু হয়েছে। যুদ্ধের জন্য এ বছর খেলোয়াড়ের কিছু অভাব ঘটবে বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন। লীগের ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম বার কোনও সৈনিক দল প্রথম বিভাগ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারল না।



স্যর্ ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে হতাশ হয়েই তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে এ খবর তোমরা নিশ্চয়ই অনেক আগেই জেনে গেছ। বৃটীশ সরকার যে ধরণের শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন ভারতীয় নেতারা তা'তে সায় দিতে পারেন নি।

এদিকে যুদ্ধের জটিলতা তেমনি বেড়ে চলেছে। জাপান ব্রহ্মের মান্দালয়, লাশিও প্রভৃতি অধিকার ক'রে চীন সীমান্তের দিকে আক্রমণ স্থরু করেছে। আরাকানের আকিয়াব সহরও ( কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫০ মাইল ) তাদের হস্তগত হয়েছে, এবং সম্প্রতি তারা চট্টগ্রামে এসেও বোমা বর্ষণ করে গেছে। বাংলা দেশে এই তাদের প্রথম অভিযান।

ওদিকে দীর্ঘ দিন জাপানী শক্তিকে প্রতিরোধ করে ফিলিপাইনের করেজিডোরে মার্কিন বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। এর ফলে কার্য্যতঃ সমস্ত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জাপানের হাতে এল। কিন্তু তাদের জয় যে বরাবরই অপ্রতিহত ভাবে চলেছে তা নয়, সম্প্রতি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে এক বিরাট নৌযুদ্ধে মার্কিন বাহিনীর হাতে তাদের বহু যুদ্ধ-জাহাজ খোয়া গেছে, এবং ১১ই মে'র খবর—চীনারা মান্দালয়ে প্রবল ভাবে প্রতি-আক্রমণ স্থরু করেছে এবং মেমিও দখল করে নিয়েছে।

এদিকে নতুন ফরাসী ( ভিসি ) মন্ত্রিসভায় মঃ লাভাল প্রধান ক্ষমতা পাওয়ায় ইউরোপের অবস্থা একটু ঘোরাল হয়ে পড়্ল—কারণ ইনি জার্ম্মান্‌দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূবে মাদাগাস্কার দ্বীপটি এত দিন ফরাসীদের অধীন ছিল। দ্বীপটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে এর কর্তৃত্ব বিপক্ষের হাতে গেলে মিত্রশক্তির যথেষ্ট আশঙ্কার কথা। ফরাসীদের মতিগতি দেখে বৃটীশ বাহিনী তাই জোর করে এই দ্বীপটি দখল করে নিয়েছে। ফরাসী বাহিনী বাধা দিয়েছিল কিন্তু সফল হয় নি।

* * *

রাশিয়ায় শিশুসাহিত্য বিশেষ উন্নত। আজকাল সে দেশে প্রতি বছর প্রায় ১২ কোটি ছেলেমেয়েদের বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রত্যেক বড় বড় লাইব্রেরীতে ছোটদের বিভাগ রয়েছে। এই রকম এক-একটা বড় বড় লাইব্রেরীতে প্রত্যহ কত ছেলেমেয়ে যাতায়াত করে তা শুনলে তোমাদের বিশ্বাস হবে না। শুনবে?—প্রায় ৩০ হাজার। আর আমাদের দেশে শিশুসাহিত্যের অবস্থা?

---

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

## কাল

কলমের আঁচড় কেটে একে সকাল, বিকাল করা যাবে। সামান্য অংশ যুড়ে দেবী—কালী, মাকাল ফল, বৈকাল হ্রদ, কালনা মহকুমা, বীর কামাল ও প্রসাধন সামগ্রী কাজল বা কালাগুরু করা যাবে। পিঠে দাগ অর্থাৎ 'া' দিলে হবে কালা।

---

## উত্তরদাতাদের নাম

রত্না, জয়ন্ত ও স্বপ্না রায় ( পাটনা ); সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ); রমেশচন্দ্র, চুনী, জহর, মুক্তি, ফাল্গুনী সেনগুপ্ত পট্টনায়ক ( রামচন্দ্রপুর ); বাবু বসু ( ময়মনসিংহ ); অঞ্জলি, স্বদেশ, শ্যামল, মিঠু, টিটু, রিটু, সসীম, আশীষ ( ভবানীপুর ); পুণ্যশ্লোক রায় ( বাঁকুড়া ); হৈমন্তী দাসগুপ্ত ( নিউদিল্লী ); চণ্ডী, ধুন্দুল, বুলু, শঙ্কর ( ভিড়িঙ্গী ); বিমলেন্দু, যাদবচন্দ্র, নির্ম্মলেন্দু, নীলিমা, মীরা, ইলা ( কুরুমগ্রাম ); শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ ( রামচন্দ্রপুর ); হাসি, লিলি, গোরা, বেচু, কৃষ্ণা, রিণা, নিতাই ( তালটনগঞ্জ ); রেখা-ধীরা চ্যাটার্জ্জী ( কলিকাতা ); অজিতা ব্যানার্জ্জী ( চুঁচুড়া ); শীলা, অশোক, অমিয়, প্রভাত, অমিতাভ ( বেতিয়া ); কালিদাস পাল ( বালুভরা ); শঙ্করলাল, শান্তিগোপাল, জগৎপতি ও সুবোধকুমার (মুড়াগাছা, বাণী-মন্দির); নবেন্দু সেন ( রাজসাহী ); অরুণানন্দ চৌধুরী ( চট্টগ্রাম ); হাসিরাণী ঘোষ ( খঞ্জনপুর )।

---

## নূতন ধাঁধা

তিন বন্ধুর মধ্যে ভারী ভাব। একদিন একজন কোথা থেকে শুনে এল বাজারে শীগ্‌গিরই ময়দার দারুণ অভাব ঘটবে। তিন বন্ধু তক্ষুণি ছুটল বাজারে—আগে ভাগে কিছু ময়দা কিনে রাখবে। বাজারে ৪ মণ ২ সের ময়দা মিল্‌ল। ঠিক হ'ল তিন জনে তা সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেবে। কিন্তু ময়দা রাখার বস্তা এক মাপের পাওয়া গেল না। বস্তা ছিল তিন রকম মাপের—বড়, মাঝারি ও ছোট। এক-এক মাপের বস্তায় ঠিক সমান ওজনের ময়দা ধরে। বড় বস্তা পাওয়া গেল ৪টে, মাঝারি ৭টা আর ছোট ৯টা। এই ২০টা বস্তায় ঐ ৪ মণ ২ সের ময়দা ঠিক ঠিক ধরে যায়—বেশীও হয় না, কমও হয় না। বস্তা ভাগ নিয়ে প্রথমটা গোল বাধল, কিন্তু শেষে দেখা গেল বুদ্ধি ক'রে ভাগ ক'রে নিতে পারলে তিন জনের ভাগই পুরো বস্তা সমেত আলাদা আলাদা ক'রে বাড়ী নিয়ে যাওয়া চলে।

বল তো কোন্ মাপের বস্তায় ক' মণ ক'রে ময়দা ধরবে আর কার ভাগে কোন্ বস্তা ক'টা ক'রে পড়বে?

---


**বাহির হইয়াছে**

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

**হুকাকাশির গল্প**

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি

গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্

হুকা-কাশির

বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট

দাম মাত্র আট আনা।

**পার্ল পাউডার**

আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্প আয়াসেই চতুর্গুণ শ্রান্তিতে দেহ মন অবসন্ন হয়। অবসর কালেও শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া ক্লান্তি আসে। এই অবস্থায় সুরভিত 'পার্ল পাউডার' ব্যবহারে দেহে অনেকখানি স্নিগ্ধতা বোধ হয়, ঘামাচি সারিয়া যায়; গ্রীষ্মের ক্লান্তি দূর হইয়া মন অপূর্ব আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই


১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641.

ছোটদের উপহারের সেরা বই

বদ্যিনাথের বড়ি

লীলা মজুমদার

দাম—আট আনা মাত্র ঃ ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ। ১বি, রসা রোড, কলিকাতা।




# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি



মাত্র ৭টী
ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
আবিষ্কৃত ১৯০২
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী


প্রতি সংখ্যা

## রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতিসংখ্যা [illegible] ভি, পি, চার্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উক্ত [illegible] মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া [illegible] মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

[illegible] হাস্য ও রহস্য

হুকা-কাশির [illegible] উপন্যাস
২৬৩ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙিন মলাট। দাম ৷৵০

**পদ্মরাগ** (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

**চা'য়ের ধোঁয়া** (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷০

**এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে**

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে)

বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ৷৵০

**নূতন পুরাণ**

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৵০

প্রাপ্তিস্থান :—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)

ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে
দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় শিশুরা
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ১৲

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ॥৵৹

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৸১০

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—॥৴০

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

## ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা

-সুন্দর বই-

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

কলকাতার হালচাল ... ৸৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

দিগ্বিজয়ী বীর ... ॥০

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ

১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ... ॥০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু ... ॥৵০

শ্রীমাধব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

গল্পসপ্ত ...৶১০ ছুটীর গল্প...৶১০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ... ॥০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

আজব গল্প ·।০ অনেক গল্প...।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ॥৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং-চং ... ... ॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ ( ১বি, রমা রোড, কলিকাতা )



আমাদের ... প্রকাশিত কয়খানা বই

শ্রীযুক্ত নবীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

## পাল কীবুড়ো

মজাদার আর হাসির গল্প পড়তে যারা ভালবাসে, তাদের এ বই পড়তেই হবে। গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগাগোড়া অজস্র মজার ছবিতে ভর্ত্তি। দাম মাত্র ছয় আনা

ভারত-বিখ্যাত যাদুকর গণপতি চক্রবর্ত্তীর

## যাদু-বিদ্যা

ছুটির দিনে বসে বসে এ বই পড়ে যাদুর যাদু জেনে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের ভেল্কি লাগাতে যারা চাও, এক্ষুণি একখানা কিনে নাও। নতুন সংস্করণে বইখানিতে অনেক গুলো ছবি দিয়ে হাত সাফাইয়ের কায়দা-গুলো সহজ সরল করে দেওয়া হয়েছে। এ পড়লে তোমরা অনায়াসে ছোটখাট "যাদুকর" হতে পারবে।

দাম মাত্র বারো আনা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

"কাঞ্চন জঙ্ঘা" সিরিজের

এবছরের প্রথম বই

## মুখ আর মুখোস

দাম আট আনা

প্রফেসর ... 

সরল

## কর-কোষ্ঠী শিক্ষা

অতীতের কথা বলে দিতে পারলে লোক বিস্মিত হয় আর ভবিষ্যতের কথা জানতে পাবার জন্য মানুষ উদ্গ্রীব। এ বইখানা পড়লে হাতের রেখাগুলি দেখে তোমরা অনায়াসেই সকলের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারবে। ছুটির দিনে বসে বসে এমনি সময় নষ্ট করার চাইতে এ খেলা কি ভালো নয়?

বইখানি এমন সহজভাবে লেখা এবং ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা কেন তোমাদের চাইতে ছোটরাও অনায়াসে পড়তে এবং সব শিখতে পারবে।

দাম মোটে বারো আনা

শ্রীযুক্ত বীরেন দাস প্রণীত

## রুম-মেট

অতি অল্প দিনে নিজ শক্তিতে বীরেন বাবু শিশু-সাহিত্যে যশস্বী হয়েছেন। এ বইখানিতে এক দিকে যেমন হাসির খোরাক আছে প্রচুর, অন্য দিকে আবার ভাববার কথাও আছে তার চাইতে ঢের বেশী। সুন্দর ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদ।

দাম আট আনা

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

## দুই ভাই

দাম এক টাকা

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি।"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

মানুষের জ্ঞাতি ভাই

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৪৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# আষাঢ় এল

শ্রীআশীষ কুমার লাহিড়ী

আষাঢ় এল—আষাঢ় এল—
কালো রংএ আকাশ বোনা,
ধরার বুকে আঁধার নামে—
যতেক মেঘের আনাগোনা।
বাদলা ধারা ছুটল নেচে
ধানের সবুজ কচি পথে,
উঠল কেঁপে আমলকি-বন
চপল বায়ুর স্পর্শে মেতে।

বাঁশ-বনেতে শব্দ জাগে,
বিজ্‌লী হাসে ক্ষণে ক্ষণে,
ভিজে পাতার গন্ধটুকু
আসছে ভেসে সমীরণে।

দিগন্তে আজ বনের রেখা
মেঘের তলে হারায় নিজে,
ধেনু নিয়ে ফিরছে বাড়ী
রাখাল ছেলে জলে ভিজে।
হঠাৎ দেখি রামধনু ঐ
সাত রঙেতে উঠল রাঙি,
শ্বেত বলাকা ফিরল নীড়ে,
হরিণ নাচে চমক হানি।
নদীর জলে বান ডেকে যায়,
ঝিঁঝিঁ ডাকে বাদল সনে,
আঁধার ঘরে পাড়ার ছেলে
যক্ষ রাজার গল্প শোনে।

---

# গিরিধারী-রহস্য

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বালীগঞ্জের যে অংশটা নতুন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই একধারে বাগানওয়ালা একখানা বাড়ী। ফটকের উপরে পিতলের ফলকে ইংরাজিতে লেখা—সতীনাথ মল্লিক, প্রাইভেট্ ডিটেকটিভ।



সকাল সাতটা। সতীনাথ বাবু আরাম-কেদারায় শুইয়া খবরের কাগজ উল্টাইতেছেন। আজ প্রায় ৫।৭ দিন পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছেন—এ ক' দিন কি একটা কাজে এক অজ-পাড়াগাঁয়ে তাঁকে কাটাইতে হইয়াছে। সভ্য জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন সে দেশ, এ ক' দিনে একবারের জন্যও কোন খবরের কাগজের সঙ্গে তাঁর মোলাকাৎ হয় নাই।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একটা খবরের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। খবরটি এই রকম:

"আজ তিন দিন হইয়া গেল বিখ্যাত ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল ঠুন্‌ঠুনিয়ার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিশের সমস্ত চেষ্টাই কি বিফল হইল? গত দুই মাসের মধ্যে এরূপ আরও দুটি বড় বড় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আসামী আজও ধরা পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত গিরিধারীলাল যে ভাবে নিখোঁজ হইয়াছেন তাহাতে এ ব্যাপারটিকেও অনুরূপ রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড বলিয়া লোকে স্বভাবতঃই সন্দেহ করিবে। এ রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে না।"

খবরটি পড়া শেষ হইলে সতীনাথ বাবু চোখ তুলিলেন। সামনের চেয়ারে যে লোকটি বসিয়াছিল তার নাম চন্দ্রকান্ত। ছোকরা খুব উৎসাহী। তার বড় ইচ্ছা সতীনাথ বাবু তাকে সহকারী করিয়া লইয়া বড় বড় রহস্যের তদন্তে তাকে সঙ্গে রাখেন; সেই উদ্দেশ্যে সে প্রায় রোজই এখানে হাজিরা দেয়। সতীনাথ বাবু কহিলেন, "গিরিধারী? নামটা যেন খুব চেনা চেনা লাগছে—কে বল তো?" চন্দ্রকান্ত উৎসাহের সঙ্গে বলিল, "হ্যাঁ স্যর্, ব্যাঙ্ক্ অব্ কুভেরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যর্। তা ছাড়া আরও অনেকগুলি বড় বড় ব্যবসার সঙ্গেও এঁর যোগ আছে স্যর্। ঠুন্‌ঠুন্-চাকী কোম্পানীর সিনিয়ার পার্ট্‌নারও তো উনিই। এই কেস্‌টা নিয়ে স্যর্ সহরে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে।"

"ওঃ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কোথাকার লোক বল তো?"

"আদৎ বাড়ী ছিল স্যর্, কোথায় কনোজে না যোধপুরে—কিন্তু এখন খাঁটি বাঙ্গালী বনে গেছিলেন স্যর্। চেহারা, চালচলন—সব স্যর্ বাঙ্গালীর মত ছিল। এমন দাড়ি স্যর, কোন মাড়োয়ারীর কোন দিন দেখি নি। আপনি নিন্ না স্যর্, কেস্‌টা হাতে।"

'তা কি হয় হে? গায়ে পড়ে এ সব ব্যাপারে কি মাথা গলান যায়?" সতীনাথ বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সতীনাথ বাবু রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "হ্যালো… ?"

অপর দিক্ হইতে নারীকণ্ঠে সাড়া আসিল—"আমি প্যারীনগর থেকে বলছি। হ্যাঁ, মিসেস্ ঠুন্‌ঠুনিয়া। আপনি কি মিষ্টার মল্লিক? কাগজে মিঃ ঠুন্‌ঠুনিয়ার খবর দেখেছেন

বোধ হয়? আজ দু'দিন থেকে আপনার খোঁজ করছি। আপনার হাতে ভার দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। তার পর আমার কপাল। না, না, পুলিশের লোক আপনাকে সঙ্গে পেলে খুসীই হবেন। তা হ'লে আপনি এখনই রওনা হবেন তো? মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। ষ্টেশনে লোক রাখ্‌ব। নমস্কার।"

সতীনাথ বাবু রিসিভার রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কথাই রাখতে হ'ল চন্দ্রকান্ত। গিরিধারী-রহস্য উদ্ধার কার্য্যে ওঁরা আমার সাহায্য চান। এখনই রওনা হতে হবে। চল, তুমিও আমার সঙ্গে চল।" চন্দ্রকান্ত পুলকে বিগলিত হইয়া কহিল, "এক্ষুনি স্তর্‌। দু'মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি স্তর্‌।"

প্যারীনগর কলিকাতা হইতে ট্রেনে মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। কিছুদিন যাবৎ গিরিধারীলাল এইখানেই এক বিরাট্ বাড়ী হাঁকাইয়া বাস করিতেছিলেন। পাড়াগাঁ হইলেও জায়গাটায় সহরের প্রায় সব সুবিধাই আছে। অধিকন্তু বিরাট্ বাগান-পুকুর ইত্যাদি থাকায় স্থানটী আরও লোভনীয়।

সতীনাথ বাবু পৌঁছিতেই মিসেস্ ঠুন্‌ঠুনিয়া নিজে আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। চন্দ্রকান্ত মিথ্যা বলে নাই, পোষাক-আসাক, চালচলন—সর্ব্ববিষয়ে ইঁহারা হাল ফ্যাশানের বাঙ্গালী পরিবার বনিয়া গিয়াছেন। গিরিধারী-জায়ার সঙ্গে আরও দু'টি ভদ্রলোককে দেখা গেল, ইঁহাদের একজন মিষ্টার অধিরথ চাকী—ঠুন্‌ঠুন্-চাকী কোম্পানীর পার্ট্‌নার, অপর জন স্থানীয় দারোগা অবিনাশ বাবু। মিনিট কয়েক আলোচনার পর সতীনাথ বাবু ইঁহাদের কাছ হইতে যে যে তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহা এই :

৩রা জুন শনিবার বৈকাল পর্য্যন্ত গিরিধারীলাল প্যারীনগরে নিজের বাড়ীতেই ছিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যা সাতটায় তাঁর কাছে কলিকাতা হইতে জয়রাম নন্দীর আসিবার কথা ছিল। বিকাল প্রায় ৬টা সময় গিরিধারীলাল বাড়ী হইতে পদব্রজে বাহির হন। যাইবার সময় বলিয়া যান তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরিবেন। ইতিমধ্যে জয়রাম বাবু আসিলে তাঁকে যেন তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসিতে দেওয়া হয়। সেই যে তিনি বাহির হন আর ফেরেন নাই। সাতটার কিছু আগে জয়রাম বাবু আসেন, এবং কর্ত্তার কথামত লাইব্রেরী ঘরে তাঁকে বাসিতে দেওয়া হয়। প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি চালিয়া যান।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গিরিধারীলাল বাড়ী না ফেরায় তাঁকে খুঁজিবার জন্য লোক বাহির হয় এবং পুলিশে খবর দেওয়া হয়। প্যারীনগরের আশেপাশে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হয় কিন্তু কোন সন্ধান মেলে না। কাছাকাছি একটিই ষ্টেশন্। ষ্টেশনের সকলেই গিরিধারীলালকে



ভাল করিয়া চেনে, কাজেই ট্রেনে করিয়া যে তিনি কোথাও যান নাই তাহা নিশ্চিত। মোটরকারও গ্যারেজেই রহিয়াছে। ভাড়াটে গাড়ী বা মোটর প্যারীনগরে বেশী পাওয়া যায় না। আর যদি সেরূপ কোন গাড়ীতে তিনি গিয়াও থাকিতেন তাহা হইলেও এতক্ষণে গাড়োয়ান বা ড্রাইভার নিশ্চয়ই সে খবর জানাইত। কারণ এই অন্তর্ধানের ব্যাপার ঐ তল্লাটের কাহারও জানিতে বাকী নাই। মিসেস্ ঠুন্‌ঠুনিয়া তাঁর স্বামীর সন্ধানের জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। হাঁটা পথেও বেশী দূর যাওয়া সম্ভব নয়—যাইবার কোন সঙ্গত কারণও পাওয়া যায় না। আর একটা ব্যাপারে বিষয়টি সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। বাড়ী হইতে মাইল খানেক দূরে একটা ছোট মত বিল আছে। তাহারই ধারে গিরিধারীলালের একটি ধুতি ও একটি পাঞ্জাবী পাওয়া গিয়াছে। তিনি কি তবে আত্মহত্যা করিলেন? না কেহ তাঁকে হত্যা করিয়া বিলে ফেলিয়া দিল? কিন্তু তা যদি হইবে তবে আজ তিন দিন পরে মৃতদেহ জলে ভাসিয়া উঠিবার কথা। কিন্তু সেরূপ কিছু হয় নাই। বিলের মধ্যে জাল ফেলিয়াও কিছু পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু সব চেয়ে বড় ঘটনা আবিষ্কার করা হইয়াছে আরও পরে, রবিবার বিকালে। শনিবার ঐ ঘটনার পর কেহ অন্য দিকে মন দেয় নাই, কিন্তু রবিবার বিকালে দেখা যায় লাইব্রেরী ঘরের কোণে যে লোহার সিন্দুকটি থাকিত তাহার কপাট ভাঙ্গা এবং ভিতরের যা কিছু মূল্যবান্ সামগ্রী সব অদৃশ্য হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব্ কুভেরের অনেক জরুরী দলিলপত্র ও নগদ লাখ খানেক টাকা এবং মিসেস্ ঠুন্‌ঠুনিয়ার অনেকগুলি মূল্যবান্ হীরা-জহরতের অলঙ্কার ঐ সিন্দুকে ছিল। বছর খানেক হইল গিরিধারীলালের দামী দামী হীরা-জহরৎ সংগ্রহের কেমন যেন একটা ঝোঁক চাপিয়াছিল। গত বছর ঠিক এই সময়ে মাস কয়েকের জন্য তিনি কাশ্মীর, বোম্বাই, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। দেশ ভ্রমণ করিয়া করিয়া তাঁর একটু জাঁকজমকের দিকে নজর আসে। তার পর হইতে প্রতি মাসেই তিনি কিছু না কিছু মূল্যবান্ অলঙ্কার তাঁর স্ত্রীর জন্য কিনিতেন। সেগুলির সবই এই সিন্দুকে ছিল এবং সবই লোপাট হইয়াছে। শনিবার সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর ঝি মোক্ষদা নাকি একটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তিকে বাগান হইতে লাইব্রেরী ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল। ঐ ঘরে তখন জয়রাম নন্দী বসিয়াছিলেন।

সমস্ত শুনিয়া সতীনাথ বাবু মিনিট খানেক চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন, তারপর অবিনাশ বাবুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, এই জয়রাম বাবুটি কে তা জানা গেছে?"

"হ্যাঁ, ইনি একজন শেয়ারের দালাল। বেশ পয়সাওয়ালা লোক। মহীশূরের কাছে কোথায় নাকি একটা বড় সোনার খনি বেরিয়েছে, তারই শেয়ার বিক্রী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তার জন্য নাকি এঁকে ডাকা হয়েছিল।"

"কিন্তু এঁর ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক নয় কি? মোক্ষদা ঝি যে লোকটিকে সন্ধ্যাবেলা দেখেছিল বলছে তার সম্বন্ধে এঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, যত দূর মনে হয় ইনিই সে লোক। প্রথমটা তো স্রেফ অস্বীকারই করেছিলেন। তার পর চেপে ধরতে স্বীকার করেন যে মিনিট কয়েকের জন্য তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে গিয়েছিলেন। কিছু দূরে এক থোকা গোলাপ দেখে লোভ সামলাতে পারেন নি, ফুলটা তুলে আনবার জন্য একবার উঠেছিলেন।"

"বেশ কবি লোক দেখছি, শেয়ারের দালালী করেও এ সব দিকে মরচে পড়ে নি!"

ঘরের সবাই মৃদু হাসিল। অবিনাশ বাবুও হাসিয়া কহিলেন, "শুধু কবি নয়, চেহারাও বেশ সৌখীন; লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, গোঁফ নাকের নীচে সিকি ইঞ্চিটাক রেখে দু'পাশ সযত্নে কামান, ইত্যাদি। যাক্, কবিটিকে আমরা নজরবন্দী রেখেছি। দরকার হলেই গ্রেপ্তার করব।"

আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদির পর সতীনাথ বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—কোন নতুন তথ্য পাইলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেলিফোনে জানান হয়।

পরদিন। সতীনাথ বাবু একটা জরুরী চিঠি লিখিতে ব্যস্ত, সামনে বসিয়া চন্দ্রকান্ত পেয়ালার পর পেয়ালা চা নিঃশেষ করিতেছে, এমন সময় সশব্দে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

অবিনাশ বাবু ফোন করিতেছেন, একটা বড় রকম নতুন খবর আছে। গিরিধারীলাল আঙুলে সব সময় একটা বড় আংটি ব্যবহার করিতেন, তার ভিতর দিকটায় তাঁর নাম খোদাই করা ছিল। শনিবার রাত্রে সেই আংটীটি অদ্ভুত ভাবে রতনলাল নামে এক দাগী আসামীর কাছে পাওয়া গিয়াছে। লোকটা মাতাল অবস্থায় রাস্তার এক পাহারাওয়ালাকে ধরিয়া মারপিট করে। থানায় লইয়া তল্লাসী করায় তার কাছে ঐ আংটীটি পাওয়া যায়। আংটী পাওয়া সম্বন্ধে সে যে গল্প ফাঁদিয়াছে তাহাও বেশ মজার। শনিবার বিকালে সে নাকি প্যারীনগর হইতে সাত মাইল দূরে গোলাবাড়ীর হাটে গিয়াছিল। হাটে দু'পয়সা কামাইয়া সে হাঁটিয়া প্যারীনগর ষ্টেশনে যাইতেছিল। পথে বিশ্রাম করিবার জন্য একটা গাছের আড়ালে খানিকক্ষণের জন্য বসে। এমন সময় একটি আধাবয়সী ভদ্রলোককে সে আসিতে দেখে। ভদ্রলোককে দেখিয়া বেশ সৌখীন মনে হয়। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, নাকের নীচে সামান্য একটু গোঁফ, বাকীটা কামান। রাস্তা তখন একেবারে ফাঁকা। রতনলাল যেখানে বসিয়াছিল সে জায়গাটাও রাস্তা হইতে চোখে পড়ে না। ভদ্রলোক সেইখানে আসিয়া থামেন। তারপর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কি একটা জিনিষ দূরে মাঠের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার হন্ হন্



করিয়া চলিয়া যান। ভদ্রলোক চলিয়া যাইতে রতনলাল কৌতুহলের বশে ফেলিয়া-দেওয়া জিনিষটির খোঁজ করে—এবং অবাক্ হইয়া দেখে সেটি আর কিছু নয়—এই আংটীটি। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে তার একটু বেশী রকম ফূর্ত্তি আসে এবং তা ভাল করিয়া জমাইবার জন্য সে সহরে আসিয়াই এক পেট মদ খাইয়া ফেলে। তার পর যা ঘটিয়াছে তা তো আগেই বলিয়াছি।

সতীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এই রতনলাল লোকটির আগেকার ইতিহাস কি বলছিলেন? দাগী আসামী বলছিলেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গত বছর ঠিক এই সময়ে সে এক ভদ্রলোকের পকেট মেরে ধরা পড়ে, ফলে তাকে তিন মাস জেল খাটতে হয়। তার পর থেকেই পুলিশ তাকে চিনে রেখেছে।"

"হুঁ, আচ্ছা অবিনাশ বাবু, আমাকে দয়া করে আর একটা খবর জেনে দেবেন?"

"নিশ্চয়, সম্ভব হ'লে অবশ্যই দেব।"

"দয়া করে খবর নিয়ে আমাকে জানাবেন গিরিধারীলাল কি রাত্রে একা ঘরে শুতেন। আর একা শুলে কত দিন থেকে শুতেন। আর চশমা কি তিনি অল্প বয়স থেকে ব্যবহার করতেন? হ্যাঁ, শুধু এই খবরটুকু।" সতীনাথ বাবু টেলিফোন রাখিয়া দিয়া চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিহে চন্দর, কিছু আঁচ করতে পারলে?"

"আজ্ঞে স্যর্, বার আনা ঠিক হয়ে গেছে। এখন স্যর্ জায়গাটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারলেই মনে হয় 'ক্লু' পেয়ে যাব। স্যর্, আজ একবার যাবেন প্যারীনগর?"

"বেশ তো, ঘুরে এস না। তুমি গেলেই চলবে। আমার একটু কাজ আছে।"

চন্দ্রকান্ত শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা স্যর্, আমিই যাব।"

কয়েক ঘণ্টা পরে অবিনাশ বাবু আবার ফোন্ করিলেন। গিরিধারীলাল রাত্রে একা ঘরেই শুইতেন, গত বছর সেই যে তিনি তিন মাসের জন্য দেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন তার পর হইতেই। ঐ সময় তাঁর বয়স চল্লিশ পার হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শ মত চশমার ব্যবহার সুরু হয়। আগে তাঁর চোখ ভালই ছিল।

টেলিফোন রাখিয়া দিয়া সতীনাথ বাবু আপন মনে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। তাঁকে বিশেষ চিন্তামগ্ন বলিয়া মনে হইল।

সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রকান্ত আসিয়া কহিল, "স্যর্, সব ঠিক হয়ে গেছে। যা ভেবেছিলাম তাই। বিলের পাশে স্যর্ একটা মস্ত ইটের পাঁজা রয়েছে।" সে দম লইবার জন্য একটু থামিলে সতীনাথ বাবু কহিলেন, "কি ঠিক হ'ল?"

"সব স্তর্ ঐ জয়রাম নন্দীর কাজ। সবগুলো প্রমাণই ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে।"

"কি রকম?"

"ধরুন না স্তর্, প্রথমতঃ সিন্দুক ভাঙ্গা ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ তারই কাজ তা প্রায় প্রমাণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ স্তর্, সে মিছে কথা বলে নিজেকে এড়াবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ধরা পড়ায় উপায় না দেখে শেষে স্বীকার করে। তৃতীয়তঃ স্তর্, সেই যে গিরিধারীলালকে খুন করেছে রতনলালের এজাহার বিশ্বাস করলে তাও প্রমাণিত হয়। এমন কি গিরিধারীলালের আংটীটাও স্তর্, রতনলাল তার কাছ থেকেই পায়। আর রতন যদি মিছে কথাই বলবে স্তর্, তবে জয়রাম বাবুর অমন হুবহু বর্ণনা সে দিল কেমন করে? সে তো স্তর্ আগে তাঁকে দেখে নি!"

"কিন্তু খুন ক'রে থাকলে মৃতদেহটার কি হ'ল? সেটা তো অমন সহজে লুকিয়ে ফেলা সম্ভব নয়।"

"তাই দেখতেই তো আজ গিয়েছিলাম স্তর্। বললাম না, বিলের পাশে রয়েছে ইট পোড়াবার পাঁজা। বেমালুম লাসটা তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শুধু আংটিটা স্তর্, আগেই খুলে নিয়েছিল কারণ ওটা হয়তো তার মধ্যে থাকলেও ঠিকমত গলত না এবং ঐ থেকেই স্তর্ হয়তো ওকে ধরা পড়ে যেতে হ'ত। তাই বুদ্ধিমানের মত পথে এসে নিরিবিলি একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে স্তর্। ঘুঘু লোক সন্দেহ নেই।"

সতীনাথ বাবু একটি সিগারেট ধরাইয়া কহিলেন, "আমার কিন্তু তোমার সঙ্গে মতের মিল হচ্ছে না চন্দর। জয়রাম আর যাই হোক, এ ব্যাপারে বোধ হয় নির্দ্দোষ। সে তো আর জানত না গিরিধারীলাল তার সঙ্গে সাতটায় দেখা করবে বলে সময় ঠিক করে ছ'টায় বেরিয়ে যাবে। তা ছাড়া যে ঘরে সিন্দুক আছে সে ঘরেই যে তাকে বসতে দেওয়া হ'ল সেও তো ঘটনাচক্রে। আর লোহার সিন্দুক ভাঙ্গা তো চারটি খানিক কথা নয়। যন্ত্রপাতি ছাড়া তা অসম্ভব। জয়রাম অত যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে নিশ্চয়ই আসে নি। আর মিথ্যে কথা বলা? যখন ও শুনল যে গিরিধারীলালকে হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে এবং বিলের মধ্যে তার ধুতি-পাঞ্জাবী পাওয়া গেছে তখন স্বভাবতঃই সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে নিজেকে পাছে বিব্রত হতে হয় সেই জন্য দু'টো একটা মিথ্যে কথা তার পক্ষে বলা খুব আশ্চর্য্য নয়। আর এগুলো যদি তার দ্বারা না হয়ে থাকে তবে গিরিধারীকে খুন করতে যাওয়ারও তার পক্ষে কোন কারণ নেই। দু'জনের মধ্যে আর যাই থাক্ এ রকম শত্রুতা ছিল বলে শোনা যায় নি। যাই হোক্, আমার মাথায়ও একটা 'সমাধান' আসছে। ঠিক কি-না ২।১ দিনের মধ্যেই টের পাব। ভাল কথা, ব্যাঙ্ক অব্ কুভেরে তোমার কোন টাকা পয়সা জমা নেই তো? থাকলে কাল সকালেই তা তুলে নিও, আর বন্ধুবান্ধবদের ঐ রকম পরামর্শ দিও।"



দুইদিন পরের কথা। ভোর হইতেই চন্দ্রকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সতীনাথ বাবুর বাড়ীতে হাজির। "স্তর্, ভাগ্যিস্ আপনার কথা মত টাকা তুলে ফেলেছিলাম। এই দেখুন স্তর্, আজকের কাগজ—ব্যাঙ্ক অব্ কুভের ফেল হয়েছে। কি করে বুঝেছিলেন স্তর্? আপনি কি দেবতা?"

"হ্যাঁ হে, দেবতা—ঠিক দেবতা নই, অপদেবতা। এক কাজ কর; প্যারীনগরে অবিনাশ বাবুকে একটা ফোন্ কর তো। গিরিধারীলালকে পাওয়া গেছে। সে মরে নি। মিসেস্ ঠুন্ঠুনিয়াকে একবার কলকাতায় আনতে হবে তাকে সনাক্ত করতে। তিনি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ তাকে চিনতে পারবে না। আর মিষ্টার চাকীকেও যেন একটা খবর দেওয়া হয়। বেচারা নিশ্চয়ই বড় মুষড়ে পড়েছে—এত বড় ব্যবসা!"

চন্দ্রকান্ত ফোন্ শেষ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "ব্যাপারটা স্তর্ খুলে বলুন। আমার যে আর সবুর সইছে না!"

"সতীনাথ বাবু ধীরে ধীরে সিগারেটে একটি দীর্ঘ টান দিলেন। তার পর একটু থামিয়া কহিলেন, "রহস্য বড় জটিল হে। আচ্ছা শোন।" সতীনাথ বাবু সুরু করিলেন:

"তদন্ত করতে গিয়ে তোমার মত আমারও প্রথমেই জয়রামের উপরই একটা সন্দেহ আসে। কিন্তু তা যে ঠিক নয় একটু খুঁটিয়ে দেখবার পরই তা ধরা পড়ল। তার বিপক্ষে যুক্তি তোমাকে আগেই জানিয়েছি। সমস্ত ব্যাপারটা দেখে আমার সন্দেহ হ'ল ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজান নয় তো এবং আমাদের গিরিধারীলালের এর মধ্যে কোন হাত নেই তো? দু'টো খবর আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান্ বলে মনে হয়। প্রথম—গিরিধারীলালের এত বড় ব্যবসা ফেলে তিন মাসের জন্য দেশ ভ্রমণ এবং ফিরে এসেই ক্রমাগত মূল্যবান্ হীরা-জহরৎ কেনার বাতিক।

"যাই হোক্ সমস্ত ব্যাপার না শুনে আমি তখন কোন মতামত প্রকাশ করতে পারি নি। গিরিধারীলালকে যে কেউ খুন করে নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। খুন করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না—খুন করতে পারে এমন লোকের কথাও কারো জানা নেই। মৃতদেহের তো পাত্তা নেইই। অথচ বিলের ধারে কাপড়-পাঞ্জাবী পাওয়া থেকে ব্যাপারটাকে এমন ভাবে দাঁড় করান হয়েছে যাতে এটাকে হত্যা বলে মনে হয়। রতনলাল পকেটমার—একটা আংটীর জন্য কেউ লোক খুন করে না—করলেও মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলা অত অল্প সময়ে সহজ নয়। ইটের পাঁজার কথা বলছ, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ এটা বর্ষাকাল, বর্ষাকালে কেউ ইট পোড়ায় না—কাজেই ও পাঁজায় নিশ্চয়ই আগুন ছিল না।

"খুন যদি না হয়ে থাকে তবে কি আমেরিকার গুণ্ডাদের মত কেউ ওকে কিড্ন্যাপ্ করল?

কিন্তু কান্না করবে? করলে তারা মুক্তিপণ চাইছে না কেন? না, তাও নয়, গিরিধারীলাল নিজেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে।

"লোহার সিন্দুকে যে সব জিনিষ ছিল তার ফর্দ্দ শুনে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হ'ল। সব মূল্যবান্ জিনিষ যেন হাতের কাছে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল—দরকার হ'লেই নিয়ে সরে পড়া যায়। হীরা-জহরৎ কেনার বাতিকও কেন হয়েছিল এর থেকে সহজে আন্দাজ করা গেল। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা যাতে চট্ করে সরান যায় সে জন্য তা দিয়ে আগেই যতটা সম্ভব মূল্যবান্ অলঙ্কার কিনে ফেলা হয়েছিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর—অপরের চোখ এড়িয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত এ সব চালান সম্ভব হয়েছে—যখন ব্যাঙ্কের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এইবার ধরা পড়তেই হবে তখনই সরবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সিন্দুক ভেঙ্গে সে দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই জয়রাম বাবুকে ডাকা হয়। নইলে তার সঙ্গে দেখা করবার সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে ঠিক তার একটু আগেই বাইরে যাবার প্রয়োজন হবে কেন? আর জয়রাম বাবুকে বসাবার ঘরে না বসিয়ে লাইব্রেরী-ঘরে, যেখানে সিন্দুক রয়েছে, সেই ঘরেই বা বসতে দেওয়া হবে কেন? সিন্দুক আগেই ভাঙ্গা হয়েছিল কিন্তু কোন কৌশলে তা গোপন রাখা হয়। আর বাড়ীর কর্ত্তা নিজে নিজের সিন্দুক ভাঙবে এ তো আর কেউ স্বপ্নেও ভাবতে বা বিশ্বাস করতে পারবে না! সিন্দুকের মালপত্র কোন নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

"এই বার পালাবার পালা। এত বড় একটা ধনী লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'লে সোরগোল বড় কম হবে না—আর এত লোকের টাকা নিয়ে ভেগে পড়বার পর ধরা পড়লে শাস্তিটাও যে সহজ হবে না তা গিরিধারীলালের জানতে বাকী ছিল না। কাজেই এই পালাবার ষড়্যন্ত্র তাকে অনেক আগে থেকেই করতে হয়েছিল। তাই গত বছর তিন মাসের ছুটী নিয়ে বাইরে বেরোবার দরকার হয়ে পড়্ল। আসলে কিন্তু গিরিধারীলাল কোথাও যায় নি, ছিল কলকাতাতেই—ছদ্ম-বেশে। অমন খাসা দাড়ি, তা সে কামিয়ে ফেল্‌ল। গোঁফও সেই সঙ্গে গেল, চুল ছেঁটে ছোট ছোট করা হ'ল, এমন কি মোটা ভ্রূ যোড়াও কামাতে সে বাকী রাখল না—ফলে তার চেহারা গেল একেবারে বদলে।

"তার পর সেই ছদ্মবেশী গিরিধারীলাল যখন রতনলাল নাম নিয়ে জনৈক ভদ্রলোকের পকেট মেরে তিন মাসের জন্য শ্রীঘরে গেল এবং সেই সঙ্গে দাগী আসামীর খাতায় নাম লেখাল তখন তার অতি বড় শত্রুও বোধ হয় তা শুনলে বিশ্বাস করতে পারত না। কিন্তু গিরিধারীলাল ভবিষ্যতের পানে চেয়ে এ অপমানও সহ্য করল। কারণ ভবিষ্যতে এই রতনলাল হয়েই তাকে বাঁচতে হবে।

"তিন মাস পরে রতনলাল জেল থেকে খালাস পেল। তখন তাকে আবার গিরিধারীলাল



সাজতে হবে। কিন্তু ক্ষুরের হাতে যা বিসর্জ্জন দিয়েছে তিন মাসেই তা গজাবার কথা নয়। ফলে তাকে নকল দাড়ি-গোঁফ, নকল ভ্রূ ইত্যাদির শরণ নিতে হ'ল। নকল দাড়িগোঁফ নিয়ে আর যাই করা যাক্ না কেন, রাত্রে তা এঁটে ঘুমান বড় সহজ কাজ নয়, এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তা সরে গিয়ে বিপদে ফেলতে পারে। তাই গিরিধারীলাল "দেশ ভ্রমণ" থেকে ফিরে আলাদা ঘরে একা শোবার ব্যবস্থা করল। স্ত্রীও যাতে তার কীর্ত্তির কথা না জানতে পারে।

"তার পর চল্‌ল আট ঘাট বাঁধার পালা। ব্যাঙ্ক অব্ কুভেরের আর্থিক অবস্থা দিন দিন কাহিল হ'তে সুরু করল, ঠুন্‌ঠুন-চাকী কোম্পানীর অবস্থাও হল তাই। গিরিধারীলালই ছিল ব্যবসার প্রধান কর্ত্তা—কাজেই এত বড় ব্যাপারটা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। তার পর একদিন সময় বুঝে গিরিধারীলাল গা-ঢাকা দিলেন। নকল-দাড়ি-গোঁফ-ভ্রূ ফেলে দিয়ে, তাকে খুন করা হয়েছে এই রকম গোটা কয়েক চিহ্ন রেখে, সে আবার রতনলাল সাজল এবং ইচ্ছে করে মাতালের অভিনয় করে পাহারাওয়ালাকে মারপিট করে থানায় হাজির হ'ল; তার পর গিরিধারীলালের আংটী দাখিল করে এক রগরগে গল্প ফেঁদে দিন কয়েকের জন্য আবার শ্রীঘরে ঢুকল। সে জানত যে খুন হওয়ার ভাঁওতা দু'দিন পরেই ধরা পড়বে—ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর সমস্ত রহস্যই জানাজানি হয়ে যাবে এবং পুলিশ তার খোঁজে দুনিয়া চষে বেড়াবে। এরকম ক্ষেত্রে সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে জেলের ভিতরটা—যেখানে লুকোবার কথা পুলিশ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। তার পর হপ্তা কয়েক জেলে কাটিয়ে যখন সে বেরিয়ে আসবে তখন তাকে পায় কে? বাকী জীবনটা রতনলাল হয়ে প্রচুর সঞ্চিত অর্থ নিয়েই সে কাটিয়ে দিতে পারবে। আর স্ত্রী-পরিবার? এই সব পাপিষ্ঠদের কাছে কি ও সব কোমল প্রবৃত্তির কোন দাম আছে?"

গল্প শেষ করিয়া সতীনাথ বাবু আর একটা সিগারেট ধরাইলেন। চন্দ্রকান্ত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তার পর হঠাৎ নত হইয়া তাঁর পায়ের ধূলা লইল।

সেই দিনই বিকাল বেলা অবিনাশ বাবুর নিকট হইতে খবর আসিল—মিসেস্ ঠুন্‌ঠুনিয়া জেলে আসিয়া রতনলালকে তাঁর স্বামী গিরিধারীলাল বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। *

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

# বাঙ্গালী বীর আশানন্দ ঢেঁকী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

আমরা ছেলেবেলায় আশানন্দ ঢেঁকীর গল্প শুনিতাম। জীবিত আশানন্দের নয়, বহুকাল পরলোকগত আশানন্দের। আশানন্দ খুব বলবান্ লোক ছিলেন। অবশ্য বীর বলিতে সাধারণ লোকে যা বুঝে তা তিনি ছিলেন না—বড় বড় বীরের মত দেশ জয় করিয়া নরশোণিতে তিনি পৃথিবী রঞ্জিত করেন নাই। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে। বাড়ী শান্তিপুর। কিছু জমিজমা, বাগান ইত্যাদি ছিল, তাহাতেই কোনও রকমে চলিয়া যাইত। নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার কোন আশা বা দুরাশা তাঁহার ছিল না। স্বল্পে সন্তুষ্ট; বিরাট্, বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে লোকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সম্বন্ধে দুটী গল্প আজ শুনাইব।

একবার আশানন্দ বিদেশ হইতে দেশে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় এক ধনী ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আশানন্দের নাম শুনিয়াছিলেন খুব আদরে অভ্যর্থনা করিয়া আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। আহারান্তে আশানন্দ তাঁহাদের বাহিরের ঘরের বারান্দায় বিছানা করিয়া শুইলেন। তাঁহার অর্থ ছিল না কিন্তু অটুট স্বাস্থ্য ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

হঠাৎ সে বাড়ীতে সে সময়কার এক নাম-করা ডাকাতের দল আসিয়া আক্রমণ করিল। দলের নাম শুনিয়া বাড়ীর লোকেদের আত্মরক্ষা করিবার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইল না। ডাকাতরা যখন বাড়ীর সদর দরজা ভাঙ্গিতেছে, বাড়ীর মেয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা তখন খিড়কী দিয়া পলায়ন করিল। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা সেকেলে ধর্ম্মভীরু লোক। পাছে দস্যুদের আঘাতে বাড়ীতে ব্রহ্ম-হত্যা হয় এই ভয়ে তিনি ছুটিয়া গিয়া আশানন্দকে ঠেলাঠেলি করিয়া জাগাইলেন, অবস্থা বলিয়া তখনই তাঁহাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। আশানন্দ বলিলেন, "সে কি, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আর আমি আপনাদের বিপদের সময় ফেলে পালাব!" ইতিমধ্যে ডাকাতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।



গৃহকর্ত্তা অন্তিম সময় ভাবিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। আশানন্দ কাপড় সামলাইয়া, অস্ত্র হাতিয়ার না পাইয়া সামনে ঢেঁকীশাল হইতে ঢেঁকীটা তুলিয়া লইয়া ডাকাতদের সম্মুখীন হইলেন। তাহারা তাঁহার ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেও প্রথমটা পালাইল না, দূর হইতে ইট ও বর্শা ছুঁড়িতে লাগিল। তখন আশানন্দ সেই ঢেঁকী ঘুরাইয়া প্রবল বেগে দস্যুদলের মধ্যে ছুঁড়িয়া মারিলেন। কয়েক জন দস্যু ঢেঁকী চাপা পড়িয়া আহত হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অধিকাংশ দস্যুই ভয়ে পলায়ন করিল। কেবল দলের নেতা ও তাহার প্রধান জন দুই চেলা আশানন্দকে রিক্তহস্ত দেখিয়া লাঠি লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

আশানন্দ তখন চণ্ডীমণ্ডপের উপর লাফাইয়া উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একটা শালের খুঁটি উপড়াইয়া লইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিলেন। দুইজন দস্যু জখম হইল। আশানন্দ তখন দলপতিকে গিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার সাধ্য কি আশানন্দের কবল হইতে আত্মরক্ষা করে? দস্যুপতি আশানন্দের পায়ে পড়িয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। সে আর কখনও দস্যুবৃত্তি করিবে না এই শপথ করিলে আশানন্দ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাড়ীর লোক ও গ্রামের লোক ইতিমধ্যে ভরসা পাইয়া সেখানে আসিল, এবং আশানন্দের অদ্ভুত বীরত্বের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইল। গৃহকর্ত্তা দুই-এক দিন আশানন্দকে পরম সমাদরে রাখিয়া প্রচুর উপঢৌকন সহ লোকজন দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। শীঘ্রই এই গল্প চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, এবং সেই হইতে আশানন্দের নাম হইল "ঢেঁকী মহাশয়"।

আর একটি গল্প। আশানন্দের কয়েক দিন জ্বর হইয়াছিল। আজ একটু ভাল আছেন। কবিরাজকে বলিলেন, "বড় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু আহারের ব্যবস্থা করুন।" কবিরাজ বলিলেন, "আজ লঘ্বাহার করুন, তার পর কাল দেখা যাবে।"

"লঘ্বাহার কি?"

"যাকে বলে লঘুপথ্য। এই চারটি খই আর কিছু বেগুন পোড়া—শুধু লবণ দিয়ে মাখা।"

এক মাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কবিরাজের ব্যবস্থানুসারে একটা বেগুন এবং এক কুনকী ধান লইয়া তার খই প্রস্তুত করিতে গেলেন। এমন সময় আশানন্দের মা আসিয়া উপস্থিত। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "দিদি, ও কি করছ? আশানন্দকে তুমি চেন না; আমি ব্যবস্থা করছি।" এই বলিয়া তিনি একটি প্রকাণ্ড ধামা ভর্ত্তি ধান লইয়া তাহার খই করিতে বলিলেন। কাছের বেগুনের ক্ষেত হইতে গোটা পঁচিশ বেগুন তুলিয়া আনিলেন।

যথা সময়ে আশানন্দ এক ধামা খই এবং গোটা পঁচিশ বেগুন পোড়া খাইয়া লঘুপথ্য করিয়া বিকালে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় কবিরাজকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। কবিরাজ আসিয়া বাড়ীর পাশে ঝুড়ি খানেক ধানের খোসা দেখিয়া প্রথমটা একটু সন্দিহান হইলেন, পরে কারণ শুনিয়া অবাক্ হইলেন। আশানন্দ রাত্রের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আপনার অসুখ সেরে গেছে। এখন যা খুসী খেতে পারেন।"

কয়েক বছর হইল শান্তিপুরে আশানন্দের একটি স্মৃতিস্তম্ভ বসান হইয়াছে (আগেই বলিয়াছি আশানন্দের বাড়ী ছিল শান্তিপুর)। স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে এই রকম একটি কবিতা খোদাই করা আছে—

"দুষ্টের দমনে আর শিষ্টের পালনে
সুমহান্ ব্রত যাঁর ছিল এ জীবনে;
মুখোবংশ অবতীর্ণ আশানন্দ বীর,
"ঢেঁকী" নামে খ্যাত যিনি বক্ষে পৃথিবীর,
প্রবাদ হয়েছে এবে গরিমা যাঁহার
তাঁহারি এ স্মৃতিস্তম্ভে কর নমস্কার।"

তোমরা যদি কখনও শান্তিপুরে যাও তবে এই স্মৃতিস্তম্ভটি দেখিয়া আসিতে ভুলিও না।

---

## পাম্পায়

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

মোটর চল্‌ছে ত চলছেই। থামবার নামই নেই। চারিদিকে যত দূর চোখ যায় কেবল ঘাস, কোথাও একটাও গাছ নেই। পেছনে বিশ্রী ধূলো, আশে পাশে দু'দিকে তারের বেড়া দেওয়া যায়গা। বহু দূরে দু'টো ঘোড়ায় দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে। রাস্তা বেশ চওড়া কিন্তু তার কোথাও একটি পাথর নেই; তাই মোটর চলে চলে গর্ত্ত হয়ে গেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ আর্জ্জেনটাইন, আর তারই রাজধানী হচ্ছে বুয়েনস্ এহেরেশ্। সেই বুয়েনস্ এহেরেশ্ থেকে কিছু দূর রেলগাড়ীতে ক'রে এসে তারপর সুরু হয়েছে এই মোটর-যাত্রা। গন্তব্য স্থান—পাম্পার একটি এস্‌ট্যানসিয়া। পাম্পা বলতে যেন ভিসুভিয়াসের পাশের সেই বিখ্যাত পম্পাই-নগরী মনে ক'র না—যার কথা কয়েক মাস আগে রামধনুতে বেরিয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বৃক্ষলতাশূন্য বিশাল তৃণভূমিকে বলে 'পাম্পা'। কথাটার মানে হচ্ছে সমতলভূমি। আর এস্‌ট্যানসিয়া কি জান? যেখানে লক্ষ লক্ষ গরু পালন করা হয়।

কয়েক শ' বছর পূর্ব্বে অন্য কোন ইউরোপীয় জাত এ দেশে আসবার আগে এখানে এসেছিল স্পেনীয়গণ। তারা এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে

মিশে থাকত। তাদের যে সব বংশধর এখানে রয়েছে তাদের বলা হয় "গাউচো"; আর ওখানকার খাঁটি আদিম অধিবাসীদের বলা হয় "ইণ্ডিয়ান্"।

পাম্পার পশ্চিমে রয়েছে আন্দেজ পর্ব্বতমালা আর পূর্ব্বে রয়েছে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর। অনেকে বলেন আগে এ যায়গাটা ছিল জঙ্গল। আদিম অধিবাসীরা সেগুলো কেটে পুড়িয়ে সাফ করে দিয়ে সমতলভূমি করেছে। তারা দেখ্‌লে যে এখানে ভুট্টা আর ঘাস ভাল ভাবে জন্মাচ্ছে। পশ্চিমের বাতাস এসে আন্দেজ পর্ব্বতমালায় ধাক্কা খেলে সুরু হয় বর্ষা। কোন বার বর্ষা ভাল না হ'লে ঘাসও ভাল হয় না। ফলে অনেক পশু মারা পড়ে।

আগেই বলেছি সব চেয়ে আগে স্পেনবাসীরা এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করে আর তারা আদিম্ অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। তখন তারা ঘোড়ারই আদর করত বেশী, গরুগুলো আপন মনে মাঠে চরে বেড়াত। গাউচোরা তাদের ধরত মাংসের দরকার হ'লে। গাউচোদের সঙ্গে থাকত এক রকম ফাঁস। ঐ ফাঁস তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনো গরুর মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ত। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসে জড়িয়ে জন্তুটা পড়ে যেত। তখন গিয়ে তাকে ধরলেই হ'ল। আজও যায়গায় যায়গায় এমনি করে ফাঁস দিয়ে গরু ধরার রেওয়াজ আছে। এই ফাঁসগুলোর নাম "বোলা।"

আজকাল আধুনিক ইউরোপীয়রা এখানে এসে গাউচোদের সুদূর পশ্চিমে তাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে গাউচোরা ছিল এখন সেখানে হয়েছে মস্ত বড় বড় এসট্যানসিয়া, আর তার ভিতর রয়েছে লক্ষ লক্ষ গরু। খুব অল্প সংখ্যক গাউচো এখন আসল পাম্পায় আছে।

গাউচোদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাংস আর চা। কি চা জান? সেখানে 'মাটে' বলে এক রকম গাছ আছে তার পাতা থেকেই ঐ চা তৈরী করা হয়। এই চাকে অনেকে 'পারগ্যায়ে চা' বলে। আন্দেজ পর্ব্বতের ধারে তারা আগেকারই মত জীবন যাপন করে।

এস্‌ট্যানসিয়াগুলোয় গোপালন করা হয় তা বলেছি। কি বিরাট্ ভাবে এই গোপালন কার্য্য চালান হয় শুনলে তোমাদের অবাক্ লাগবে। এক সঙ্গে



এত অসংখ্য গরু জড় করা হয় যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এস্‌ট্যানসিয়াগুলো অনেক ছোট বড় মাঠে ভাগ করা থাকে। এই মাঠগুলো আবার ছোট ছোট বেড়া দেওয়া 'কোরালে' বিভক্ত করা হয়। এই কোরালেই, দরকার হ'লে, গরুদের এনে জড় করা হয়। এস্‌ট্যানসিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হয় আলফাল্‌ফা ঘাস। আলফাল্‌ফা ঘাস খুব উঁচু—গরুর খুব উপাদেয় আর পুষ্টিকর খাদ্য। রাস্তার পাশে অদূরে দেখ্‌তে পাবে এক-একটি টিনের ঘর। দেওয়ালগুলো কাদায় তৈরী কিংবা পাকা। সামনে হয়তো একটি সুন্দর বাগান, আশে পাশে চার পাঁচটা ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। পিছনে যদি যায়গা থাকে তবে হয়তো সেখানে দেখবে তিসির ক্ষেত। দেওয়ালে রং বেরঙের ছবিও দেখ্‌বে। হয়ত একটা উইণ্ডমিল্ বা 'বায়ু-কল'ও আছে। এই 'বায়ু-কলে' জল বার করা হয়। আবার কোন কোন ঘরের আশেপাশে হয়তো রয়েছে একখানি ক'রে ছোট ঘর—ঐ ঘরে ডায়নামো বসিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা হয়। আর প্রত্যেকের, যেহেতু ঘোড়া আছে, সেই জন্য আস্তাবলও আছে। কিন্তু গরুর জন্য কোথাও গোয়াল ঘর নাই। কেন জান? সেখানে গরুগুলি সারা বছর বাইরেই থাকে। তাদের কোনও ঘরে আট্‌কে রাখা হয় না। তাই ওখানে কথায় বলে 'গরুর দেশে গরুর ঘর নেই'। টিনের ঘরগুলিতে গাউচোরা বা মজুররা থাকে, মালিকরা এলে তারাও থাকে।

গাউচোদের পোষাক হচ্ছে ঢিলে পা-জামা। ওদেশে ওগুলোর নাম 'বোম্‌বাচো'। বোম্‌বাচোর বোতাম পায়ের কাছে থাকে। অনেক সময় তা খোলাই থাকে, তবে ঘোড়ায় চাপবার সময় ওরা বোতাম এঁটে নেয়। গায়ে একটা ফতুয়া, তারপরই হয়ত একটা কোট। গলায় একটা রুমাল জড়ান থাকে—ঠিক স্কাউটদের মত। আবার তার উপর একটা ওড়না। গোল ওড়নার মাঝখানে একটা গর্ত্ত; সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়ে তারা মাথা তোলে। ঐ ওড়না-গুলোকে তারা "পোঞ্চো" বলে। প্রখর রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করবার জন্য মাথায় একটা টুপীও দেয়। তা ছাড়া কোমরে একটা চওড়া কোমরবন্ধ থাকে। তাতে অনেকগুলি পকেট,—তার মধ্যে পয়সা, কাঁচি, কাঁটা, ছোট ছুরি—খুঁজলে অনেক

কিছু পাওয়া যাবে। এ ছাড়া সঙ্গে একটা একটা বড় ছুরি ( ১৬ কিংবা ১৮ ইঞ্চি ) সর্ব্বদা ঝোলান থাকে। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস এদের নেই বল্লেই চলে। সকলেই ভাল ঘোড়সওয়ার, তাই বলা হয় যে তারা বিশ্রাম করে দু'পায়ে আর হাঁটে চার পায়ে।

এস্ট্যানসিয়া থেকে ফিরে আসা গেল। বুয়েনস্ এহেরেশ্ বন্দরের কাছাকাছি গেলে দেখতে পাবে অমুক ফ্রিগরিফিকো, তমুক ফ্রিগরিফিকো এমনি সব খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার সামনে হয়ত জাহাজ দাঁড়িয়েছে আর হরদম লোক যাওয়া-আসা করছে। ফ্রিগরিফিকো মানে কি জান? কসাইখানা। হিন্দুর ছেলের পক্ষে জায়গাটা খুব লোভনীয় নয়। সেখানে লক্ষ লক্ষ গরু কাটা হচ্ছে, আর নানা রকমের গোজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। মাংস, চামড়া, নাড়িভুঁড়ি, হাড় কিছুই ফেলা যায় না। এগুলো সব ইউরোপে চালান যায়। কতকগুলো ক্রেন দিবারাত্র ক্যাঁ কোঁ করে এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করছে। কতকগুলো মানুষ ছাল তোলা মাংস নিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট কামরার মধ্যে ঢুকছে। কামরার মধ্যে ছাদে একটা মস্ত বড় রোলার ঝোলান রয়েছে আর তারই গায়ে তারা লট্‌কে দিচ্ছে ঐ মাংস। ঘরটা খুব বড় আর মেট্রো সিনেমার ভিতরটা গরম কালে যেমন ঠাণ্ডা তার চেয়েও ঢের বেশী ঠাণ্ডা। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে ঘরকে এই রকম ঠাণ্ডা করা হয়। আর এমনি ঠাণ্ডা ঘরে রাখা মাংসকে ইংরাজীতে বলা হয় 'চিল্‌ড বীফ্' ( Chilled Beef )।

বন্দর থেকে বেরোলেই সামনে পড়বে কোলাহলময়ী নগরী। ততক্ষণে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তায় জ্বলে উঠল আলো ( যদি ব্ল্যাক্-আউট্ না হয়ে থাকে )। বড় বড় রাস্তা, মাঝখানে লাইট-পোষ্ট। দু'দিকে উঁচু উঁচু আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী। ট্রাম, বাস্, ট্যাক্‌সি যে যার চলেছে। রেস্তরাঁগুলিতে খুব ভীড়। হোটেল, কাফেতে বেজে উঠল বিলাতী শাঁখ অর্থাৎ ব্যাণ্ড। এই সহরটি নতুন ভূখণ্ডে বা আমেরিকার মধ্যে তৃতীয় বড় সহর, দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সব চেয়ে বড় সহর। এখানেও মাটির নীচে রেলগাড়ী চলে, এবং সব কিছু খাস আমেরিকান্ ( যুক্তরাষ্ট্রের ) ছাঁচে গড়া।



এস্ট্যানসিয়া সম্বন্ধে আর দুটো কথা বলি। এখানে গাইগুলি সব সময়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। দরকারের সময় তাদের বাছাই করে নিয়ে কোরালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় নদীর ধারে। সেখানে জাহাজে তাদের নিকটস্থ বন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ফ্রিগরিফিকোর পালা। তোমরা খবরের কাগজে, বাজারে যে 'বভ্‌রিল' আর 'অক্‌সো'র বিজ্ঞাপন দেখ্‌তে পাও সে সব এই আর্জ্জেনটাইনেই তৈরী। তা ছাড়া চালানী জিনিষগুলির মধ্যে ঠাণ্ডা মাংস, টিনে-ভর্ত্তি মাংস, নাড়িভুঁড়ি ( যা দিয়ে টেনিস্ র‍্যাকেটের গাট্ তৈরী করা হয় ) আঠা, চামড়া, হাড় ইত্যাদি প্রধান। গরুর ব্যবসা ছাড়া আর্জ্জেনটাইনে তিসি গাছের চাষও করা হয়; কিন্তু তিসি গাছ থেকে সুতো বের করা এদের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য তিসি গাছের বীজ থেকে তেল ( লিন্‌সীড্ অয়েল ) বের করা। এই সব জিনিষ চালান দেওয়ার বন্দরগুলির মধ্যে পারানা নদীর উপর রসারিও, বুয়েনস্ এহেরেশ্, উরুগ্যায়ে রাজ্যের রাজধানী মণ্টেভিডেও প্রধান।

দক্ষিণাংশে গরু খুব বেশী পালন করা হয় না। তার বদলে পালন করা হয় ভেড়া। এখানে নিউজীল্যাণ্ডের মত ভাল পশম আর মাংস দুইই উৎপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পশম চালান করার প্রধান বন্দর হচ্ছে বাহিয়া-ব্লাঙ্কা।

---

## শিশু

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি.এ

ওই যে শিশু গাঁয়ের কোলে তুল্‌ছে হাসির রোল,
ওরাই মায়ের বাড়ায় শোভা, সাজায় শ্যামল কোল।
ওদের চটুল নৃত্য বিনা শূন্য গাঁয়ের ঘর,
শূন্য মায়ের আঁচলখানি নিত্য নিরন্তর।
ওদের চপল চাউনি ছাড়া রিক্ত গাঁয়ের বুক;
সিক্ত হৃদয় হয় না মায়ের—হয় না মায়ের সুখ।

ওদের ছাড়া রঙীন আকাশ হয় না গাঁয়ের ভাই,
ইন্দ্রধনুর সাতটি বরণ ওদের মাঝেই পাই।
ওরাই স্নেহের শ্যাম-সায়রের মুক্তা মাণিক ধন,
গাঁয়ের আর ওই মায়ের বুকের ওরাই তো রঞ্জন।
নয়কো শুধুই রামধনু রে—ওরাই রঙীন দোল,
তুলছে প্রাণে ফাগের খেলা—আনন্দহিল্লোল।

---

# চিত্রশালা

## বাংলার দু'টি পুণ্যস্থান

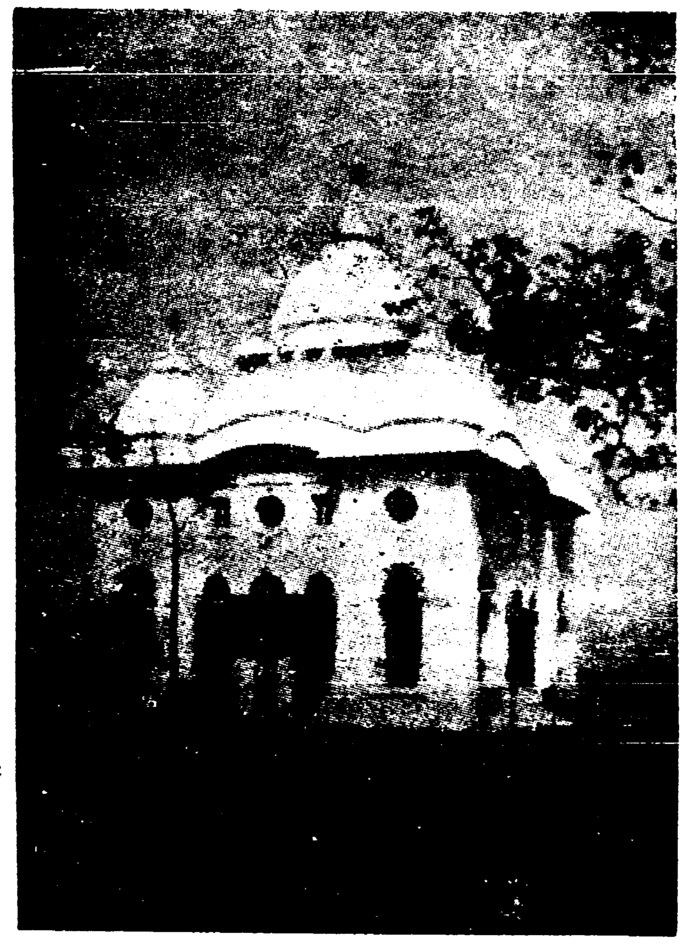

স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিমন্দির—বেলুড়

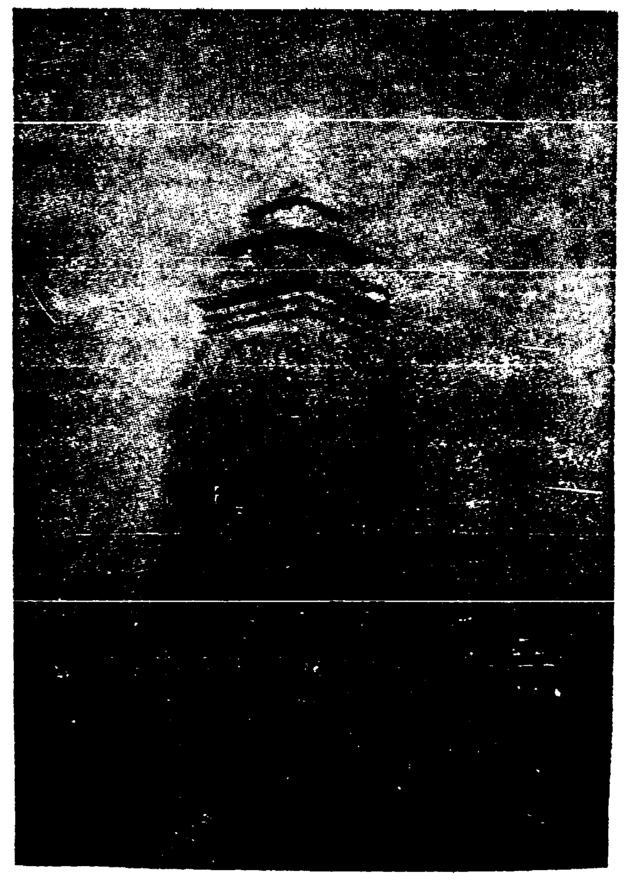

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি-মন্দির—কালীঘাট

২০

শীতের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নূতন বিপদ্ দেখা দিল। দ্বীপের চারিদিক্ এখন তুষারে আবৃত। যে সব ছোট ছোট জন্তু এত দিন মারাত্মক জন্তুদের আহার স্বরূপ হইয়া আসিতেছিল তাহারা এখন শীতের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। দ্বীপে যে অত শশক, আগুতি, কাপিবারা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুর বাস, এখন তাহাদের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মনে হয়, এ কয় মাস এখন তাহারা গুহার মধ্যে একটানা নিদ্রা দিবে। ইহাতে যে কেবল ছেলেদের খাবারের অভাব হইল তাহা নহে, দ্বীপের যত হিংস্র শিয়াল ও নেকড়ের দল ক্ষুধার তাড়নায় একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এখানকার শিয়ালগুলি খুব বৃহদাকার, এক-একটা বাংলা দেশের শিয়ালের দ্বিগুণ। প্রথমে দেখিলে নেকড়ে বলিয়া ভুল হয়। এদের গায়ের শক্তিও যেমন, সাহসও তেমনি অদ্ভুত। কাজেই গুহার চারিদিকের দুয়ার সর্ব্বদা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ওদিকে রঞ্জিৎও আর বেশী পাখী মারিয়া আনিতে পারে না। বুনোর তখন হইল মহামুস্কিল। দুই বেলা পনেরোটি ছেলের খাবার যোগানো কি সহজ কথা! তার উপর তাদের বয়স আট হইতে পনেরো বৎসর, অর্থাৎ যে বয়সে ছেলেদের প্রচুর খাওয়াইয়াও পেট ভরান যায় না। তার উপর সেই নান্‌ডু পাখীটি এখন গোদের উপর বিষফোঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা যে অষ্ট্রিচ পাখীটিকে ধরিয়াছিল তাহার কথা বোধ হয় মনে আছে? এখন এই প্রচণ্ড শীতকালে তাহার খাদ্য যোগানো হইয়া উঠিল সবচেয়ে কষ্টকর। তিনি আবার মাছ-মাংস খান না। তবে নান্‌ডুর জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইত না। তাহার সমস্ত ভার নীলাদ্রি স্বহস্তে লইয়াছিল। প্রতিদিন নদীর তীরে গিয়া দুই তিন হাত বরফ সরাইয়া সে তাহার প্রিয় বন্দিনীর জন্য ঘাস ও গাছের শিকড় লইয়া আসিত।' নীলাদ্রির খুব আশা এই নান্‌ডু পাখী একদিন পোষ মানিবে, তখন সকলে তাহার পিঠে চ'ড়িয়া দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইবে। কিন্তু কয় মাস হইয়া গেল, নান্‌ডুর বশ্যতা স্বীকারের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। কাহাকেও

সে তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে দিত না, ভাল রকম আহার করিত না, আর এক একবার ভীষণ চীৎকার করিয়া সকলের কান ঝালাপালা করিয়া দিত।

এদিকে জ্বালানি কাঠ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। থারমোমিটারও ক্রমাগত নামিতেছে। সুশান্ত মনে মনে স্থির করিল, আবহাওয়া একটু ভালো হইলেই তাহারা কয়জনে মিলিয়া ফাঁদবনে জ্বালানি কাঠের সন্ধানে যাইবে। এখন পেটের খাওয়ার চেয়ে আগুনের আবশ্যক বেশী। জাহাজে তাহাদের প্রায় কুড়ি যোড়া বরফ-জুতা ছিল—যাহাকে 'স্নো-শু' বলে। বাহিরের বরফ এখন শ্বেত পাথরের মত শক্ত ও মসৃণ হইয়া আছে; এই বরফ-জুতা এখন না পরিলে উপায় নাই। কিন্তু এত কাঠ এত দূর হইতে কে বহিয়া আনিবে? অন্য সময় না হয় তাহারা পঞ্চাশ বার যাওয়া-আসা করিতে পারিত, এখন দুইবার গেলেই প্রাণান্তকর হইয়া উঠিবে। শুধু যে শীত তাহা নয়; চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল ও হিংস্র নেকড়ে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তখন বুনো একটা উপায় স্থির করিল। ফরাসী গুহায় তাহাদের যে বড় টেবিলটা আছে তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো ফুট ও প্রস্থে প্রায় চারি ফুট হইবে; সেই টেবিলটা এখন তাহারা কাঠ বহন করিয়া আনিবার কাজে লাগাইতে পারে। টেবিলটা উল্টাইয়া লইলেই চলিবে; মসৃণ বরফের উপর দিয়া উহা অতি সহজে শ্লেজ গাড়ীর মত টানিয়া আনিতে পারিবে।

সেই পরামর্শ অনুযায়ী একদিন সকলে মিলিয়া টেবিলটা ফাঁদ-বনের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। সুশান্ত প্রথমে ভাবিয়াছিল তাহারা জন চারেক যাইবে। কিন্তু ছেলেদের অনুরোধে সে শেষে সকলকে লইয়া চলিল। বহিরে আসিয়া ছেলেরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। সে দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমনি আশ্চর্য্যজনক। চারিদিকে যত দূর চোখ পড়ে একেবারে সাদা ধবধব করিতেছে। গাছের ডালপালা তুষারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন বরফের গাছ, বরফের শাখা-প্রশাখা! শম্বর হ্রদের উপরিভাগও সাদা ধবধব করিতেছে। ফরাসী গুহা হইতে ফাঁদ-বন প্রায় আধ মাইল পথ। ফাঁদ-বনে গিয়া সকলে কুড়াল লইয়া কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিল। ছোট ছেলেরা টেবিলের চারটা পায়া লইয়া টানাটানি যুড়িয়া দিল। কেহ কেহ ভিতরে চড়িয়া বসে আর অপরে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের উল্লসিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনিতে সেই জনশূন্য তুহিনাবৃত অরণ্যভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল।

## ২১

ক্রমে আগষ্ট মাস আসিয়া পড়িল। শীত এখন আরো প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের ভিতরেই থারমোমিটারে শূন্য ডিগ্রীর ১৪° পয়েণ্ট নীচে পারা আসিয়া নামিল। সেই ভয়ঙ্কর শীতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নহে। কলসী, কুঁজার জল সব সময়েই জমিয়া বরফ



হইয়া আছে, যেমন ধারা আমাদের দেশে নারিকেল তেল জমিয়া উঠে। গরম চায়ের পেয়ালা দেখিতে দেখিতে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। আমাদের দেশে শীতকালে মুখ হইতে ধোঁয়া বাহির হয়। তাহাদের কি হইল জান? সকলের নাক হইতে নিঃশ্বাস বাহির হয়, আর তাহা গুঁড়া বরফ হইয়া মাটীতে জমিয়া পড়ে। আগুনে বা কোন গরম জিনিষে হাত দিতে কি তোমাদের ভয় হয় না? হাত দিলেই হাতে ফোস্কা পড়িবে। তেমনি ধারা ভয় ইহাদের হইত কোন ধাতব পদার্থ স্পর্শ করিতে। চাবির গোছা বা লোহার পেরেক বা কাঁসার থালা বা পিতলের হাতা ছেলেরা আর চট্ করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না। হাত দিলেই হাতে এমন ভীষণ জ্বালা অনুভূত হইত যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কাজ করা যাইত না। তাহাদের ভয় হইতে লাগিল তাহাদের কচি কিশোর দেহের উষ্ণ রক্তও বোধ করি এইবার জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। পনের দিন একটানা এই ভয়ঙ্কর শীত চলিল। রোদের আর দেখা নাই; সূর্য্য কখন উদিত হয় আর কখন অস্ত যায় তাহা জানা যায় না। বাহিরের শীতল বাতাস তীব্র আর্ত্তনাদ সহকারে বহিয়া চলিতেছে। আর কয়েকটা দিন এইরূপ চলিলে হয়তো মৃত্যু অনিবার্য্য। সৌভাগ্যবশতঃ ষোলই আগষ্ট তারিখে আবহাওয়ার ধরণ একটু বদ্‌লাইল। বাতাস আর উত্তরমুখী নয়; হাওয়া এখন পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। থারমোমিটারের পারাও ১০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত গিয়া উঠিল। তখন তাহারা পরামর্শ করিল, একদিন সুবিধামত স্কুনার উপসাগরে গিয়া দেখিয়া আসিবে সীল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি জলচর জন্তু সমুদ্র-উপকূলে আসিয়াছে কি না। সেই সঙ্গে তীরের উপর ফ্ল্যাগটাও বদলাইয়া আসিবে, কারণ এই কয় মাসে নিশ্চয়ই তাহার আর কোন চিহ্ন নাই। সুশান্ত বলিল ফ্ল্যাগ-মাষ্টের গায়ে সে তাহাদের ফরাসীগুহার অবস্থান সম্বন্ধে কিছু নিদর্শন লিখিয়া রাখিয়া আসিবে। যদি কোন দিন কাহারও নজরে পড়ে।

উনিশে আগষ্ট খুব ভোরে সুশান্ত, রঞ্জিৎ, নীলাদ্রি, রোহিতাশ্ব এবং শঙ্খচূড় স্কুনার উপসাগরের দিকে যাত্রা করিল। অস্তগামী চাঁদের ম্লান আলোয় তখনো চারিদিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বেলা নয়টার সময় তাহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইল। সমুদ্র-উপকূলস্থিত সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালার উপর বাসিয়া আছে এক প্রকার বৃহদাকার কিম্ভূতকিমাকার পাখী। সংখ্যায় তাহারা সহস্র সহস্র। অনেকটা হাঁসের মত গড়ন, কিন্তু আকারে রাজহাঁসের চতুর্গুণ—তার উপর ঠোঁটগুলি ধুচুনির মত। আর তাহাদের সে কি তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার! রঞ্জিৎ বন্দুক লইয়া অগ্রসর হইল। শঙ্খচূড় কহিল—"ও পাখীকে গুলি মেরে কোন লাভ নেই। ওগুলি পেঙ্গুইন পাখী, ওদের মাংস নিতান্ত অখাদ্য। তা ছাড়া ওরা এত মূর্খ, ওদের কাছে গিয়ে টুঁটি চেপে ধর্‌লেও নড়ে পালাবে না।" সুশান্তর মন তখন অন্যত্র ব্যাপৃত। পেঙ্গুইনের মাংস অখাদ্য—এ কথা সে জানে। কিন্তু পেঙ্গুইন ব্যতীত

সে তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে দিত না, ভাল রকম আহার করিত না, আর এক একবার ভীষণ চীৎকার করিয়া সকলের কান ঝালাপালা করিয়া দিত।

এদিকে জ্বালানি কাঠ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। থারমোমিটারও ক্রমাগত নামিতেছে। সুশান্ত মনে মনে স্থির করিল, আব্‌হাওয়া একটু ভালো হইলেই তাহারা কয়জনে মিলিয়া ফাঁদবনে জ্বালানি কাঠের সন্ধানে যাইবে। এখন পেটের খাওয়ার চেয়ে আগুনের আবশ্যক বেশী। জাহাজে তাহাদের প্রায় কুড়ি যোড়া বরফ-জুতা ছিল—যাহাকে 'স্নো-শু' বলে। বাহিরের বরফ এখন শ্বেত পাথরের মত শক্ত ও মসৃণ হইয়া আছে; এই বরফ-জুতা এখন না পরিলে উপায় নাই। কিন্তু এত কাঠ এত দূর হইতে কে বহিয়া আনিবে? অন্য সময় না হয় তাহারা পঞ্চাশ বার যাওয়া-আসা করিতে পারিত, এখন ডুইবার গেলেই প্রাণান্তকর হইয়া উঠিবে। শুধু যে শীত তাহা নয়; চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল ও হিংস্র নেকড়ে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তখন বুনো একটা উপায় স্থির করিল। ফরাসী গুহায় তাহাদের যে বড় টেবিলটা আছে তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো ফুট ও প্রস্থে প্রায় চারি ফুট হইবে; সেই টেবিলটা এখন তাহারা কাঠ বহন করিয়া আনিবার কাজে লাগাইতে পারে। টেবিলটা উল্‌টাইয়া লইলেই চলিবে; মসৃণ বরফের উপর দিয়া উহা অতি সহজে শ্লেজ গাড়ীর মত টানিয়া আনিতে পারিবে।

সেই পরামর্শ অনুযায়ী একদিন সকলে মিলিয়া টেবিলটা ফাঁদ-বনের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। সুশান্ত প্রথমে ভাবিয়াছিল তাহারা জন চারেক যাইবে। কিন্তু ছেলেদের অনুরোধে সে শেষে সকলকে লইয়া চলিল। বহিরে আসিয়া ছেলেরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। সে দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমনি আশ্চর্য্যজনক। চারিদিকে যত দূর চোখ পড়ে একেবারে সাদা ধব্‌ধব্‌ করিতেছে। গাছের ডালপালা তুষারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন বরফের গাছ, বরফের শাখা-প্রশাখা! শম্বর হ্রদের উপরিভাগও সাদা ধব্‌ধব্‌ করিতেছে। ফরাসী গুহা হইতে ফাঁদ-বন প্রায় আধ মাইল পথ। ফাঁদ-বনে গিয়া সকলে কুড়াল লইয়া কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিল। ছোট ছেলেরা টেবিলের চারটা পায়া লইয়া টানাটানি যুড়িয়া দিল। কেহ কেহ ভিতরে চড়িয়া বসে আর অপরে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের উল্লসিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনিতে সেই জনশূন্য তুহিনাবৃত অরণ্যভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল।

## ২১

ক্রমে আগষ্ট মাস আসিয়া পড়িল। শীত এখন আরো প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের ভিতরেই থারমোমিটারে শূন্য ডিগ্রীর ১৪° পয়েণ্ট নীচে পারা আসিয়া নামিল। সেই ভয়ঙ্কর শীতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নহে। কলসী, কুঁজার জল সব সময়েই জমিয়া বরফ



হইয়া আছে, যেমন ধারা আমাদের দেশে নারিকেল তেল জমিয়া উঠে। গরম চায়ের পেয়ালা দেখিতে দেখিতে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। আমাদের দেশে শীতকালে মুখ হইতে ধোঁয়া বাহির হয়। তাহাদের কি হইল জান? সকলের নাক হইতে নিঃশ্বাস বাহির হয়, আর তাহা গুঁড়া বরফ হইয়া মাটীতে জমিয়া পড়ে। আগুনে বা কোন গরম জিনিষে হাত দিতে কি তোমাদের ভয় হয় না? হাত দিলেই হাতে ফোস্কা পড়িবে। তেমনি ধারা ভয় ইহাদের হইত কোন ধাতব পদার্থ স্পর্শ করিতে। চাবির গোছা বা লোহার পেরেক বা কাঁসার থালা বা পিতলের হাতা ছেলেরা আর চট্‌ করিয়া স্পর্শ করিতে পারিত না। হাত দিলেই হাতে এমন ভীষণ জ্বালা অনুভূত হইত যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন কাজ করা যাইত না। তাহাদের ভয় হইতে লাগিল তাহাদের কচি কিশোর দেহের উষ্ণ রক্তও বোধ করি এইবার জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। পনের দিন একটানা এই ভয়ঙ্কর শীত চলিল। রোদের আর দেখা নাই; সূর্য্য কখন উদিত হয় আর কখন অস্ত যায় তাহা জানা যায় না। বাহিরের শীতল বাতাস তীব্র আর্ত্তনাদ সহকারে বহিয়া চলিতেছে। আর কয়েকটা দিন এইরূপ চলিলে হয়তো মৃত্যু অনিবার্য্য। সৌভাগ্যবশতঃ ষোলই আগষ্ট তারিখে আবহাওয়ার ধরণ একটু বদ্‌লাইল। বাতাস আর উত্তরমুখী নয়; হাওয়া এখন পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। থারমোমিটারের পারাও ১০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত গিয়া উঠিল। তখন তাহারা পরামর্শ করিল, একদিন সুবিধামত স্কুনার উপসাগরে গিয়া দেখিয়া আসিবে সীল, পেঙ্গুইন প্রভৃতি জলচর জন্তু সমুদ্র-উপকূলে আসিয়াছে কি না। সেই সঙ্গে তীরের উপর ফ্ল্যাগটাও বদলাইয়া আসিবে, কারণ এই কয় মাসে নিশ্চয়ই তাহার আর কোন চিহ্ন নাই। সুশান্ত বলিল ফ্ল্যাগ-মাষ্টের গায়ে সে তাহাদের ফরাসীগুহার অবস্থান সম্বন্ধে কিছু নিদর্শন লিখিয়া রাখিয়া আসিবে। যদি কোন দিন কাহারও নজরে পড়ে।

উনিশে আগষ্ট খুব ভোরে সুশান্ত, রঞ্জিৎ, নীলাদ্রি, রোহিতাশ্ব এবং শঙ্খচূড় স্কুনার উপসাগরের দিকে যাত্রা করিল। অস্তগামী চাঁদের ম্লান আলোয় তখনো চারিদিক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বেলা নয়টার সময় তাহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া তাহারা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইল। সমুদ্র-উপকূলস্থিত সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালার উপর বসিয়া আছে এক প্রকার বৃহদাকার কিম্ভূতকিমাকার পাখী। সংখ্যায় তাহারা সহস্র সহস্র। অনেকটা হাঁসের মত গড়ন, কিন্তু আকারে রাজহাঁসের চতুর্গুণ—তার উপর ঠোঁটগুলি ধুচুনির মত। আর তাহাদের সে কি তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার! রঞ্জিৎ বন্দুক লইয়া অগ্রসর হইল। শঙ্খচূড় কহিল—"ও পাখীকে গুলি মেরে কোন লাভ নেই। ওগুলি পেঙ্গুইন পাখী, ওদের মাংস নিতান্ত অখাদ্য। তা ছাড়া ওরা এত মূর্খ, ওদের কাছে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরলেও নড়ে পালাবে না।" সুশান্তর মন তখন অন্যত্র ব্যাপৃত। পেঙ্গুইনের মাংস অখাদ্য—এ কথা সে জানে। কিন্তু পেঙ্গুইন ব্যতীত

অন্য জন্তুও তাহার চোখে পড়িয়াছিল। ফরাসীগুহায় তেলের অভাব শীঘ্রই হইবে। এখন হইতে বাতি তৈয়ার করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে তাহাদের বড় কষ্ট পাইতে হইবে। সুশান্ত দেখিল, কিছু দূরে পাহাড়গুলার ওদিকে অসংখ্য সীল সমুদ্র হইতে তীরের উপর উঠিয়া খেলা করিতেছে। ইহাদের শরীরে প্রচুর চর্ব্বি। সেই চর্ব্বি সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহারা সহজে বাতি করিতে পারিবে। কিন্তু পেঙ্গুইন পাখী যেমন আকাট মূর্খ, সীলেরাও তেমনি ভীষণ চালাক। এতটুকু শব্দ বা ভয় পাইলে তাহারা চোখের নিমেষে ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়া সমুদ্রজলে গিয়া পড়িবে। কি করিয়া ধরা যায়? সুশান্ত ভাবিতে লাগিল।

গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া পুরানো ফ্ল্যাগ্‌টা নামাইয়া নূতন ফ্ল্যাগ উড়ান হইল। ফ্ল্যাগষ্টাফের তলায় ভাল করিয়া নামধাম লটকাইয়া দিতেও তাহারা ভুলিল না। সমস্ত কাজ সারিয়া বেলা ১টার সময় তাহারা ফরাসীগুহার দিকে ফিরিয়া চলিল।

ক্রমে শীতও একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিতে লাগিল। রোদের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকের বরফ গলিতে আরম্ভ করিল। হ্রদের উপর বরফের চাঁইগুলা যখন ভাঙ্গিয়া গলিতে আরম্ভ করিল তখন সে কি শব্দ। নদী ও হ্রদের জলে আবার প্রচুর মাছ দেখা দিল, গাছের ডালে ডালে ও জলায় প্রচুর পাখী। অরণ্যভূমি নানাবিধ মুখরোচক শিকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এখন আর খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে না।

অশোক এখন তাহাদের দলপতি, তাহার রাজত্বে বিশেষ কোন গোলমালের সৃষ্টি হয় নাই। শুধু একবার তাহাকে একটু কঠোর হইতে হইয়াছিল। বাব্‌লু বড় অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে যাহা করিতে বলা হয় তাহাই করিতে সে অনিচ্ছুক। শেষে বাধ্য হইয়া অশোক হুকুম দিল বাবলুকে ঘা কয়েক বেত লাগাইতে। রোহিতাশ্ব এ সব হুকুম তামিল করিতে ওস্তাদ্। সে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করিল। বাবলুর সেই দুর্গতি দেখিয়া অপরাপর ছেলেরা আর অবাধ্য হইতে সাহস করিল না।

(ক্রমশঃ)

---

## সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(প্রশ্ন জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সংখ্যায় দেখ।)

(১) (ক) যুদ্ধে বীরত্বের জন্য প্রদত্ত ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত পদক। (খ) দ্রুতগামী ছোট যুদ্ধজাহাজ বিশেষ, সাধারণতঃ ১—২ হাজার টনের। টর্পেডো-বোট ধ্বংস (ডেষ্ট্রয়) করবার জন্য তৈরী হয়েছিল বলে এই নাম। (গ) জলের বোমা। ইস্পাতের খোলে বিস্ফোরক ভরা



থাকে। ভিতরে এমন ভাবে যন্ত্রপাতি বসান যাতে জলের একটা নির্দ্দিষ্ট চাপে গিয়ে বোমা ফাটতে পারে। ডুবো-জাহাজ প্রভৃতি ঘায়েল করতে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) যুদ্ধে ব্যবহৃত বিষাক্ত গ্যাস। রাসায়নিক নাম 'ডাইক্লোরএথিল সালফাইড্'।

(২) ১১৭৬ বাং—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামক ভীষণ দুর্ভিক্ষ; ১৭৮২ খৃঃ—আমেরিকার স্বাধীনতালাভ, ১৮৮৫—ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন, ১৯১৭—রাশিয়ায় বল্‌শেভিক বিপ্লব।

(৩) ১নং—সেন্টপিটার্স গীর্জ্জা—রোম, ২নং—কলোসিয়াম্—রোম।

---

## সু-বাবু ও র-ডাকবাংলো

[সত্য ঘটনা]

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

আমার এক বন্ধু সু-বাবুর কাছে এ কাহিনী শোনা।

সরকারী কাজ উপলক্ষ্যে সু-বাবুকে একবার সিকিম রাজ্যে যেতে হয়। প্রথমে যে জায়গায় যান তার নাম রি—। সেখানকার কাজ সেরে তাঁকে যেতে হ'বে র— ব'লে একটা জায়গায়। ওখান থেকে র— ষোল মাইল দূরে, বরাবর পাহাড়ের চড়াই উঠে যেতে হয় প্রায় ৮০০০ ফুট্ উঁচুতে।

সকাল বেলায়ই সু-বাবু ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরোলেন। সঙ্গে একজন পাহাড়ী আরদালী, হেঁটেই চল্‌ল। পথের সুন্দর দৃশ্য আর সকাল বেলার মিষ্টি হাওয়ায় পথের কষ্ট যেন দূর করে দিচ্ছিল। যথাসময়ে তাঁরা এসে র—তে পৌঁছলেন। সেখানকার কাজ শেষ করতে করতে বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে গেল, সন্ধ্যা হয় হয়। সু-বাবু ভেবেছিলেন যে সেই দিনই রি— ফিরে যাবেন, কিন্তু তাঁর মন ঘুরে গেল র—র সুন্দর ডাকবাংলোটি দেখে।

চমৎকার ডাকবাংলোটী। পাশ দিয়ে একটী ছোট পাহাড়ী ঝরণা পাথরে পাথরে নাচতে নাচতে তরতর ক'রে নেমে বহুদূরে নীচে চলে গেছে; গাছের

ছায়ায়, পাখীর গানে জায়গাটী ভরপুর। সু-বাবুর বড় ভাল লাগল' দৃশ্যটি, তিনি সে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। আরদালী তো এ কথা শুনে মহা খুসী। ডাকবাংলোর চৌকীদার তার বন্ধু লোক, তার সঙ্গে একরাত গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদে কাটাবার তার মস্ত সুযোগ জুটে গেল। সে ঘোড়াকে চ'রে খাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে ঐ ডাকবাংলোরই একপাশে তার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে জুট্‌ল।

এদিকে চৌকীদার ঘর খুলে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল। সু-বাবু দেখলেন দিব্যি নতুন খাট, বিছানা। পরিষ্কার উঁচু পাহাড়ে জায়গা, তাতে আবার একটু বৃষ্টি পড়তেও সুরু করল। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে আস্‌ছিল, তাই সু-বাবু জানালা-দরজা বন্ধ ক'রে একখানা বই নিয়ে গিয়ে বিছানায় আরাম ক'রে শুলেন। সারাদিনের পরিশ্রম, অতটা পথ ঘোড়ায় চড়ে আসা, এতে শরীরটাও বেশ ক্লান্ত ছিল।

কিন্তু সে রাত্রে বিধাতা তাঁর কপালে আরাম লেখেন নি। একটু বাদেই তাঁর কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল। অন্ধকার ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা হয়, কতকটা সেই রকম। সু-বাবু ভাবলেন বোধ হয় দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে ঘরে আগুন জ্বালাতে থাকায় হাওয়াটা খারাপ হ'য়ে ওরকম বোধ হ'চ্ছে। এই ভেবে উঠে জানালা খুলে দিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালেন। তাতে সেই অস্থির ভাবটা একটু কমে গেল। তখন তিনি আবার এসে বিছানায় শুলেন। আবার সেই রকম ভাব। কেন যে এ রকম হ'চ্ছে বুঝতে পারছেন না, অথচ কোনও অসুখ যে শরীরে আছে তা' নয়, যেন মনটাই একটা উদ্বেগে ভ'রে গেছে। স্থির হ'য়ে বসতে পারলেন না, উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। বাইরে তখন বৃষ্টি সুরু হ'য়ে গেছে, শীতও খুব, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে, রাত্রির অন্ধকার পাহাড়ের ওপর নেমেছে।

সু-বাবু আরদালীকে ডাকালেন। বল্‌লেন যে তিনি এখনই রি— ফিরে যেতে চান। আরদালী তো শুনে অবাক্। বল্‌লে যে এই অন্ধকারে ঘোড়াই বা কোথায় খুঁজে পাবে, ঘোড়া তো কোথায় চরতে বেরিয়েছে। যদিই বা



পাওয়া যায়, তাহ'লেও ভিজে ঘোড়ার পিঠে জিন কষ্‌তে গেলে তার চামড়াই যাবে কেটে। তারপর তো অন্ধকারে পিছল পথে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ষোল মাইল উৎরাই নামবার বিপদ্ আছেই। সব শুনে সু-বাবু আবার ভাবতে লাগলেন কি করা। ওদিকে যেই আবার ঘরে এসেছেন অমনি সেই দমবন্ধ হওয়ার ভাব, কে যেন তাঁকে বিছানা থেকে, ঘর থেকে বের ক'রে দিতে চাইছে। তিনি মন ঠিক ক'রে ফেল্‌লেন। যাই হ'ক্ না কেন, তিনি ফিরেই যাবেন। এবার আর আরদালীর কোনও আপত্তিই টিঁক্‌ল না; ঘোড়া খুঁজে এনে, জিন-লাগাম ক'ষে তোড়জোড় ক'রে দু'জনে পথে বেরোলেন। বৃষ্টিও বেশ চেপে এল। পদে পদে ঘোড়ার পা পিছ্‌লে যেতে লাগ্‌ল; অন্ধকারে ভয় হ'তে লাগ্‌ল কখন না জানি একেবারে হড়্‌কে গিয়ে গভীর খাদের মধ্যে পড়ে যায়। বৃষ্টি, হাওয়া, শীত, অন্ধকার, সব মিলে তাঁকে যেন বারবার বলতে লাগ্‌ল, কাজটা ভাল কর নি। কিন্তু তিনি ফিরলেন না। অতি কষ্টে, অতি সন্তর্পণে যে ক'রে এই ষোল মাইল পার হ'য়ে তিনি রি—তে ফিরলেন তা' আর বলবার নয়। রাত তখন গভীর। যা হ'ক, রি— পৌঁছে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোলেন।

এখন পরের ঘটনা শোনো। দিন দুই-তিন বাদে একদিন সকাল বেলা সু-বাবু রি—তে বাড়ীতে বসে আছেন, এমন সময় একটি ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর কাছে সু-বাবু শুনলেন যে তিনি যে রাত্রে র—ডাকবাংলো ছেড়ে আসেন, সেই রাত্রেই সেখানে এক ভীষণ দুর্ঘটনা হ'য়ে গেছে। সেদিনকার বৃষ্টিতে সেই ছোট্ট পাহাড়ী নদীটী ভীষণ আকার ধরে প্রবল স্রোতে র—ডাকবাংলো-খানা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তার আর চিহ্ন নেই। চৌকীদারও সপরিবারে ভেসে গেছে, কোথায় কেউ জানে না, কেবল তা'র এক পাটী জুতো কয়েক মাইল নীচে এক জায়গায় পাথরের গায়ে আটকে থাকতে দেখা গিয়েছে। সু-বাবু আর তাঁর আরদালীর অবস্থাও নিশ্চয় চৌকীদারের মতই হ'ত, যদি তাঁরা সেখানে থাকতেন। তাঁর নিয়তি তাঁকে অদৃশ্য হাতে সেখান থেকে ঠেলে দিয়ে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। এর পরেও কি আর সন্দেহ থাকে যে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

TIGHT BINDING

## মিহিরকুমার

রামধনুর পাঠকপাঠিকারা 'মিহির রায়' এই নামের সঙ্গে নিশ্চয়ই অপরিচিত নও। এই তরুণ সাহিত্যিকের অনেক লেখা তোমরা রামধনুতে পড়েছ এবং পড়ে উপভোগ করেছ। আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তোমাদের জানাতে হচ্চে যে এই উদীয়মান সাহিত্যিকটি আর নেই। গত ২৭শে বৈশাখ অকালে, মাত্র ২২ বছর বয়সে, ইনি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে গেছেন।

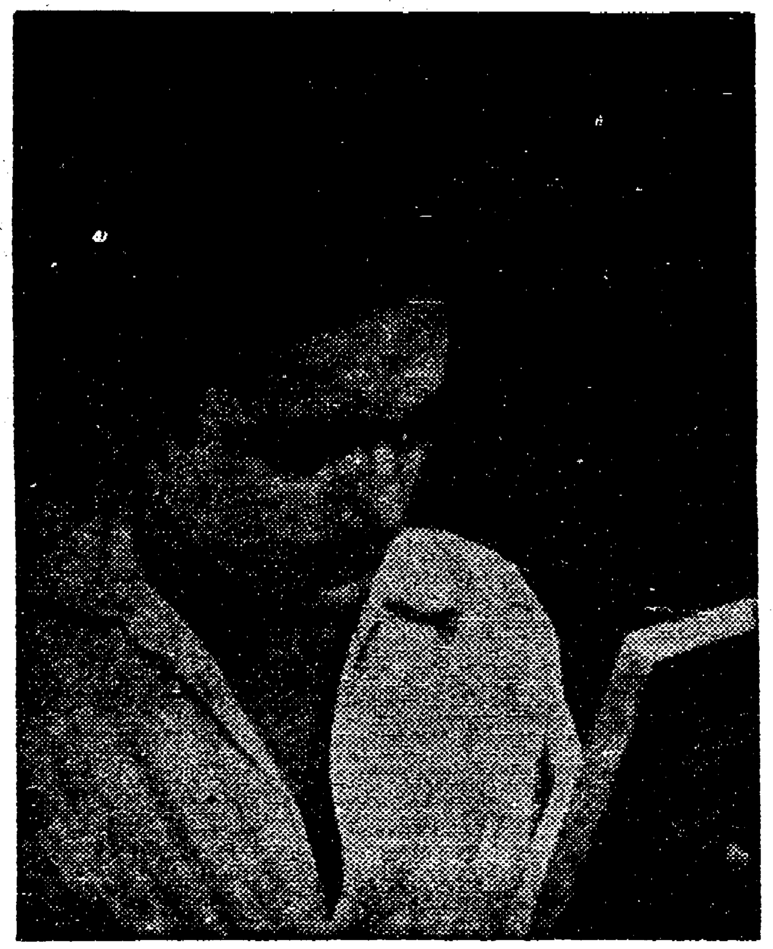

৺মিহিরকুমার রায়

বাংলা ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাসে মিহিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা প্রগাঢ় আকর্ষণ দেখা যায় এবং বয়সের সঙ্গে ক্রমশঃই তা বাড়তে থাকে। কিন্তু হঠাৎ এল বাধা। ৯ বছর বয়স থেকে তিনি দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ফলে বাকী জীবনটা তাঁকে এক রকম চিররুগ্ন অবস্থায়ই কাটাতে হয়। কিন্তু এই দারুণ রোগযন্ত্রণাও তাঁর স্বভাবজ সাহিত্য-প্রতিভা এবং রসবোধকে কণামাত্র ম্লান করতে পারে নি। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েও সাহিত্য-চর্চ্চাকেই তিনি তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মিহিরকুমার ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা ছোটদের মন সহজেই আকর্ষণ করত। তাই তাঁর অকাল বিয়োগে শুধু তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয়পরিজনেরাই ন'ন, বাংলার ছেলে-মেয়েরাও আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করবে।

---

## বিশুবাবুর মামা

শ্রীশামুক

বিশুবাবুর সঙ্গে আলাপ হয় পোষ্ট অফিসে টিকিট কিনতে গিয়ে।

বাড়ি থেকে দু'পা গেলে ছোট পোষ্ট অফিসের একখানি ঘর, ক্যাবলার তেলেভাজার দোকানের পাশে। সামনে লাল চিঠি ফেলার বাক্স, দেওয়ালে গাঁথা।

পোষ্টমাষ্টারমশাই কাঠের পার্টিসনের পিছনে বসে নিকেলের চশমা নাকের ডগায় ব্যালান্স করে মনি অর্ডার, রেজিষ্টারী, সেভিংস ব্যাঙ্ক,—সমস্ত একলাই সামলান।

পিছনে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পিওন রামমণি তাড়া তাড়া খাম, পোষ্টকার্ড, পার্শেলের উপর খটাখট্ ছাপ লাগায়। চোখ বুজে শুনলে মনে হয় মেসিন চলেছে—একবার জোরে আওয়াজ, একবার একটু আস্তে—এমনি পর পর।

বিশুবাবুর বসবার জায়গাটি ঠিক একটি লম্বা খাঁচা, দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ' পাশে। একটি টুলে নিজে বসেন, আর একটি টুলে এক ক্যাসবাক্সে টিকিট, খাম, পোষ্টকার্ড রাখা—খোপে খোপে টাকা, সিকি, দুয়ানি, পয়সা,—খুচরো ভাগ করা। ঘুলঘুলি দিয়ে দেখা যায় শুধু বিশুবাবুর বসন্তর দাগওয়ালা লম্বা কালো মুখ ও পাকিয়ে ছুঁচালো করা গোঁফের সোজা লাইন। সারা দেহ কাঠের আড়ালে থাকে। ডিঙ্গি মেরে উঠে দেখা যায় ক্যাসবাক্স ও তার মূল্যবান্ জিনিষপত্তর। আর সব সময়ে রাখা থাকে একটি সিগারেটের টিনে এক টিন কাটা সুপারী, উপরে কালিমাখানো দোয়াতের পাশেই।

একমুঠো সুপারী মুখে ফেলে বিশুবাবু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করেন,—কি চাই? একটা ডবল কার্ড, দু'খানা খাম? বেশ, পয়সা দেখি?

পয়সাকড়ি কাঠের উপর দু'বার করে বাজিয়ে গুণে নিয়ে হিসাব মত জিনিষ দিয়ে দেন। কেউ মনিঅর্ডার লেখাতে এলে আগে নিজের পাওনা পয়সা দু'টি নিয়ে বুকপকেটে ফেলে লিখতে বসেন।

—ডাকখানা কি বল্লে? দুধনা? দুধনা বলে ত' কোন অফিস নেই! ওঃ, বুঝেছি দুধনাই, তাই বল—সে ত' গোয়ালপাড়ায়।

সমস্ত নাম ওঁর কণ্ঠস্থ। আর এক মুঠো সুপারী ছুঁড়ে মুখের মধ্যে ফেলে দেন।

যখনই পোষ্ট অফিসে গেছি দেখি বিশুবাবু গল্প ফেঁদেছেন। গল্প বলা ওঁর মারাত্মক বাতিক। আর যত বারই শুনেছি হয় নিজের শিকারের গল্প, নয় মামার গল্প!

—জানেন মাষ্টারমশাই, টর্চ্চের আলো যেই বাঘের চোখে পড়া সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি দু'চোখের ফাঁকে কপালের মাঝখানে,—দুড়ুম্।

বিশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে দেখান। যে লোকটি মনিঅর্ডার লেখাচ্ছিল তার মুখের উপর আচমকা দু'হাত বন্দুকের মত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মুখে আওয়াজ করেন—দুড়ুম্।

লোকটি পিছনে হেলে পড়ে কোন গতিকে সামলে নেয়।

পোষ্টমাষ্টারমশাই লিখতে লিখতে বলেন,—হুঁ, তারপর ?

আর একদিন সেই আসামের জঙ্গলে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে—

রামমণি খটাখট্ থামিয়ে শুনছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে,—বাবু, বাঘ যখন হালুম ক'রে এল আপনার ভয় করছিল ?

—তুই থাম দিকি রামমণি, যা জানিস না তাই নিয়ে ফচ্ ফচ্ করিস না,—বিশুবাবু খিঁচিয়ে জবাব দেন।

আমরা গল্প শুনতাম এই রকম।

—আহা, মামার চেহারা যদি দেখেন মাষ্টারমশাই, চোখের পাতা পড়বে না। দেখলেই ভক্তি হয়, মনে হয় পায়ে লুটিয়ে পড়ি। পূজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন সারাদিন। পূজো করবার সময় বোম্ বোম্ করতে করতে শূন্যে উঠে যান, সেই কড়িকাঠে গিয়ে মাথা ঠেকে!

পোষ্টমাষ্টারমশাই লেখা বন্ধ রেখে কলম নিয়ে উঠে দাঁড়ান। নিকেলের চশমা নাকের ডগা থেকে তুলে কপালে আটকে চোখ বড় করে বলেন—সত্যি বলছ বিশু? এ যে দেখছি সিদ্ধপুরুষ!

বিশুবাবু এক মুঠো সুপারী মুখে ফেলে হাসতে হাসতে চিবিয়ে নেন। তারপর সমস্ত লোকেদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলেন,—সিদ্ধপুরুষ নয় ত' কি ? জানি এ কথা সকলের বিশ্বাস করা শক্ত। শুনুন বলি তবে, নিজে স্বচক্ষে দেখেছি। মামা নির্জ্জলা একাদশী করেন। ঐ দিন জলটুকুও ছোঁন না। মামার এক গরু আছে নাম কামধেনু। নিজে দুধ দোন, নিজেই তার সেবা করেন। এ বেলা দু'সের ও বেলা দু'সের দুধ দেয়। এক একাদশীর দিন দেখি মামা দুধ দুয়ে আবার গরুকে খাইয়ে দিলেন সবটুকু। বিকালেও ঠিক তাই। কৌতুহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি মামা ? বল্লেন, কাল সকালে দেখিস। দ্বাদশীর সকালে গিয়ে দেখি মামা দুধ দুইলেন আর একসঙ্গে বেরিয়ে এল পাক্কা ছ'সের দুধ! শুনলেন মাষ্টারমশাই ? আগের দিনের দু'বেলার চার সের ও সেদিন সকালের দু'সের একসঙ্গে পাওয়া গেল!



পোষ্টমাষ্টারমশাই উত্তেজিত ভাবে বলে উঠেন,—তুমি সত্যি বলছ বিশু—নিজের চোখে দেখেছ ?

বিশুবাবু সুপারী চিবাতে চিবাতে সগর্ব্বে হাসেন ও ঘাড় নাড়েন।

রামমণি চুপিচুপি হাত যোড় করে কপালে ঠেকায়।

ক্রমশঃ আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল বিশুবাবুর সঙ্গে। কাজ না থাকলেও সময় পেলেই গিয়ে জমতাম পোষ্ট-অফিসের ঘরে। সেই খাঁচার চারিপাশে ঘিরে মজার গল্প শুনতাম। পোষ্টমাষ্টারমশাইও বড় ভালমানুষ; চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু ভিড় করলে বিশেষ কিছু বলতেন না।

কিছু দিন বাদে হঠাৎ শুনি বিশুবাবুর সেই মামা এসেছেন কলকাতায়। শহরে এই প্রথম এলেন। ভাগনের বাড়িতে কিছুকাল থাকা হবে।

উঠি ত' পড়ি করে সকলে ছুটলাম ওঁর বাড়িতে এক সকাল বেলায়। গিয়ে শুনি মামা চুল কাটতে গেছেন। ধরে পড়লাম বিশুবাবুকে যে আমাদের ঐ গরুর দুধ দোওয়া ও বোম্ বোম্ করে শূন্যে ওঠা—এ দুটোই দেখাতে হবে। কিছুতে ছাড়ব না।

একটু পরে মামা চুল কেটে ফিরে এলেন মাথায় রুমাল বেঁধে। সত্যি দেখবার মত চেহারা বটে। টকটকে রং, নধর লম্বা দেহ। ঘরে ঢুকে রুমাল খুলে নিতে দেখা গেল মাথার চুল সমস্ত পরিষ্কার করে কামানো।

বিশুবাবু চমকে উঠে বলেন,—এ কি ?

মামা গর্জ্জে বলেন,—এ কি! জাননা যেন। আর যদি কখনো যাই তোমাদের ঐ ডাইংক্লিনিং সেলুনে চুল কাটতে!

বিশুবাবু বাধা দিয়ে বলেন,—হেয়ার কাটিং সেলুন মামা।

—হেয়ার কাটিং না মুণ্ডু কাটিং! অত ডলাই মলাই কেন রে বাপু ? এ হ'ল মানুষের মাথা, এ কি ঘোড়ার পিঠ যে থপাথপ্ চাপড় মেরে রগড়ালেই হ'ল ? আর আমার চুল ত' পাতাবাহারী গাছ নয় যে ঢেউ খেলিয়ে কেটে দিলেই হয়ে যাবে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই চমকে উঠি। বললাম, কাজ নেই আমার, খাবার পয়সা দিচ্ছি চেঁছে শেষ করে দাও। আর যদি কখনো যাই তোমাদের ঐ ডাইং ক্লিনিং সেলুনে—

বিশুবাবু দেখেন মামা বেজায় চটেছেন, নতুন মানুষকে সেলুনে না পাঠানোই উচিত ছিল। বলেন,—যান, আপনি চান করে আসুন, এরা অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে, একটু গল্প করতে চায়।

মামা স্নানে গেলেন। আধ মিনিট বাদে আওয়াজ হ'ল ধড়াস! বড় গাছ কেটে ফেললে যেমন শব্দ হয়।

সদলবলে দৌড়ে গিয়ে দেখি, মামা কলের মুখ এক হাতে ধরে অনন্ত শয্যা পেতেছেন। দেহ স্থির, চক্ষু মিটিমিটি।

পিছলে বার কতক পা হড়কে সকলে মিলে টেনে তুলে নিয়ে এলাম।

বিশুবাবু যেই ভয়ে ভয়ে একবার ডাকলেন—মামা, সঙ্গে সঙ্গে সে কি সিংহনিনাদ!

বলেন,—কলকাতায় একে কলতলা বলে বুঝি? বাথরুম্? আমি তঁ বলি চোরা বালির ঘূর্ণি, মানুষমারা কুমোরের চাক! পা যেই দিয়েছ ধড়টা একদিকে আর পা দুটো অন্যদিকে চরকী ঘুরে যায়। উঠবার চেষ্টা করলেই লাট্টু! হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পাহাড়ে আছড়ে মেরেও মারতে পারে নি কিন্তু এখানে ছেড়ে দিলে ছাতু হয়ে যেত বাছাধন! উঃ সারা দেহ থেঁতলে কালশিটে পড়ে গেল।

বিশুবাবু ভারী অপ্রস্তুত। আমরাও তাই। মামা একটু সামলাতে মানে মানে সরে পড়লাম। সেদিন আর জমলো না।

এর পর মামার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ আর হয় না। যত বার যাই শুনি মামা উপরে। তিনি নাকি সহরের কাণ্ডকারখানার উপর এত বেশী বিরক্ত হয়ে গেছেন যে নীচে নামতে চান না, কারুর সঙ্গে মিশতেও চান না।

বিশুবাবুকে ধরে পড়ি দুধের ম্যাজিক দেখান, বোম্ বোম্ করে শূন্যে উঠা দেখাতে হবে।

বলেন,— দুধের ব্যাপারটি হওয়া অসম্ভব, সে কামধেনু ছাড়া হবার নয়। তবে অন্যটা চেষ্টা করছি, কিন্তু মামা রাজী ন'ন।

এই সময়টা বিশুবাবু যেন আমাদের একটু এড়িয়ে চলতে লাগলেন আর বার বার উপরোধ করলে বেশ লজ্জা পাবার মতন হয়। কিন্তু আমরা একেবারে নাছোড়বান্দা—দেখাতেই হবে। পোষ্টমাষ্টারমশাই ও রামমণিকেও ক্ষেপিয়ে দেওয়া গেল। বিশুবাবুর অবস্থা বেশ সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াল।

শেষ পর্য্যন্ত রাজী করান গেল। আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যার ঠিক পরেই।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশুবাবুর বাড়ি গিয়ে নীচের ঘরে বসলাম। বিশুবাবু বললেন ঠিক সময়ে নিয়ে যাবেন। আগে থেকে ভিড় করলে পূজার ব্যাঘাত হবে। উত্তেজনায় সকলে ফিস্‌ফিস্ করতে থাকি। বিশুবাবু দু'মিনিট আমাদের কাছে বসেন, আবার উপরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসেন। আজ এত ব্যস্ত যে বার বার সুপারী খেতেও ভুলে যান।

ডাক পড়লে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যেমন সকলে ছুটে যায় আমরাও সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। ব্যাঘাত হবার ভয়ে কোন শব্দ করা হবে না ভেবেও বেশ খানিকটা গোলমালের সৃষ্টি হয়ে গেল।



বেশ বড় ঘর। সমস্ত জানালা বন্ধ। ধুনা ও গুগ্‌গুলের ধোঁয়ায় অন্ধকার। একটি ঘিয়ের প্রদীপ এক কোণে মিট্ মিট্ করে জলছে। ঠাহর করে দেখা যায় ঘরের ওপাশে ফুল ও বেলপাতার স্তূপের ভিতর মামা বসে আছেন। দেহের উপরের ভাগ শুধু দেখা যায়, তাও আবছা। পোষ্টমাষ্টারমশাই সামনে এগিয়ে যোড়হাত করে বাবু হয়ে বসলেন। আমরা চোখ বার করে ছড়িয়ে গেলাম চারিদিকে। রামমণি দরজার পাশে গরুড়ের মত হাঁটু গেড়ে বসল।

সব চুপ। কেবল মামার কোশাকুশীর ঠুনঠান্ ও চাপা সুরে গড়গড় করে মন্ত্র পড়ার আওয়াজ।

বিশুবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বললেন,—তোমরা বসে দেখ, আমি মামার খাবার ব্যবস্থাটা করি, সারাদিন উপোস করে আছেন।

বিশুবাবু মামার পিছন দিয়ে সসম্ভ্রমে নীচু হয়ে ওদিকের একটা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে দিতে দেখা গেল পাশেই দাঁড় করানো এক প্রকাণ্ড পিতলের ত্রিশূল, তার উপরে কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে, চক্‌চক্ করছে।

অন্ধকারে শিবের ত্রিশূল চক্‌চক্ করে ওঠা ভাল কথা নয়! সাবধানে চারিপাশে চোখ বুলিয়ে নিতে ভয় কেটে গেল। ঘরটির চারিপাশে মাথার উপরে অনেকগুলি ঘুলঘুলি—ভেন্টি-লেটার যাকে বলে। রাস্তার দিকের তারই একটার ভিতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছে এক টুকরো।

খানিক পরে মামা বলতে লাগলেন বোম্ বোম্ বোম্,—খুব মোটা ভারী গলায় গাল ফুলিয়ে। সমস্ত ঘর গম্‌গম্ করে উঠে। ধুনুচিতে আরও দু'টি ধুনা ফেলাতে এক রাশ ধোঁয়া বেরিয়ে আরও অন্ধকার হয়ে গেল। প্রদীপের আলোর শিখা ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে জেবড়ে গেল।

একটানা চলে সেই বোম্ বোম্। চোখ জ্বালা করছিল তবুও টেনে বড় করে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, কারণ এবার বুঝলাম আসল কাজটি সুরু হবে।

পোষ্টমাষ্টারমশাই একটা কান্না গিলে ফেলার মত আওয়াজ করলেন। চমকে দেখি মামা শূন্যে উঠছেন! বোম্ বোম্ আর একটানা নয়, মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে—যেন বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমাদের শরীর থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করে। সেই অন্ধকার ধোঁয়া-ভরা ঘরে বসে বোম বোম্ আওয়াজের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট বিরাট মানুষের মূর্ত্তিকে শূন্যে উঠতে দেখে বুক দুর্‌দুর্ করবে না এ অসম্ভব!

মামা প্রায় কড়িকাঠের কাছে গিয়ে পৌঁছে দুলতে লাগলেন। শুনলাম বোম্ বোমের মধ্যে মামা দু'বার যেন বললেন—নটং নটং! এ আবার কি মন্তর? মামা তখন বেশ দুলছেন, আরও উপরে উঠছেন, খুব আস্তে আস্তে।

হঠাৎ মামা ভীষণ চীৎকার করে উঠেন,—বিশুং আর নটং! সঙ্গে সঙ্গে, কড়াৎ করে এক বিশ্রী আওয়াজ হয়ে সশব্দে মাটিতে এসে পড়লেন।

আমরা নানা রকমের ভয়ের চীৎকার করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। পোষ্টমাষ্টারমশাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। রামমণি কোথা থেকে কট্ কট্ করে ইলেকট্রিকের সুইচ টিপে দিল সব ক'টা।

আলোতে ধোঁয়া ভেদ করে দেখি ফুল বেলপাতার স্তূপের উপর মামা আড়ভাবে একটি কালো পিঁড়ে সমেত পড়ে আছেন। উপরে কড়িকাঠে একটি কালো কপিকলে কালো দড়ির ছেঁড়া অংশ ঝুলছে! দড়ির অন্যদিক্‌টা একটা ভেন্টিলেটারের ভিতর দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেছে।

দড়াম্ করে পাশের ঘরের দরজা খুলে যায় আর সেই সঙ্গে ত্রিশূলটি ঝন্‌ঝন্ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে।

সেই ঘর থেকে বিশুবাবু দ্রুতবেগে বেরিয়ে আমাদের বেশ ক'জনকে মাড়িয়ে ও বাকীদের টপ্‌কে পার হয়ে গেলেন।

মামা একটু উঠে থপ্ করে ত্রিশূল নিয়ে বলেন,—বিশে বিশে, শুনে যা বলছি। বেটাকে বার বার বললাম এ সব ফাঁকির কাজে আমায় টানিস না—মানুষকে ধাপ্পা দিতে গেলে নিজে থাপ্পড় খেতে হয় সবার আগে। তা বেটা শুনল না কিছুতে।

নাকী সুরে বিশুবাবুকে ভেংচে বলেন,—আমি যে বলে ফেলেছি মামা, আমায় বাঁচাও।

আবার নিজের গলার মোটা আওয়াজে ফিরে আসেন,—এবারে? বেটা আমার যে হাড়গোড় ছাতু হয়ে গেল। বিশে! শীগ্‌গির আয় বলছি, তোর মুণ্ডু এই ত্রিশূলে ছিঁড়ে আজ আমি গেণ্ডুয়া খেলব।

মামা বেশ কষ্টের সঙ্গে উঠতে থাকেন আর আমরা এক এক লাফে ত্রিশূল ত্যাগ করবার আগেই রেঞ্জের বাইরে। বিশুবাবুর বড় মুণ্ডুটি নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে না পেলে নিশ্চয়ই আমাদের ছোট এক ডজনে ক্রিকেট খেলবেন!

সিঁড়ির ধাপে বার কতক টেনিস বলের মত বাম্প্ করে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। শরীরের কত জায়গায় যে ঠোক্কর লাগল তা আর হিসাব করার সময় হ'ল না।

দেখি বিশুবাবু দৌড়াচ্ছেন, বেজায় দৌড়াচ্ছেন,—সোজা রাস্তা দিয়ে। শুধু দৌড়ান নয়, সামনে যা পড়ছে হাই জাম্প্ দিয়ে টপ্‌কে যাচ্ছেন। একটা আস্ত গরুর গাড়ী রাস্তা পার হচ্ছিল, বিশুবাবু সেটা টপ্‌কে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

---

# নিওন্ গ্যাসের কাহিনী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বড় বড় সহরে আজকাল নানা রকম চটকদার বিজ্ঞাপনের রেওয়াজ হয়েছে। 'নিওন্-লাইটে' লেখা সাইন বোর্ড্ বা বিজ্ঞাপনও নিশ্চয়ই তোমাদের চোখ এড়ায় নি। স্নিগ্ধ নীলাভ, সবুজ, লালচে—কত রকম আলোয় লেখা সব বিজ্ঞাপন! কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেল, মেট্রো সিনেমা, ফার্পো রেস্তোরাঁ—এমন কি বাঙ্গালী পাড়ায় দেশী ময়রার দোকানে পর্য্যন্ত নিওন-লাইটের বিজ্ঞাপন দেখতে পাবে। অবশ্য সম্প্রতি ব্ল্যাক্ আউটের পাল্লায় পড়ে এ সব আলোর বিজ্ঞাপন বন্ধ রাখা হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ থামলেই আবার এগুলোর চলন সুরু হবে।

এই নিওন্-লাইট্‌টা কি সে সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা আছে কি? দিনের বেলা দেখলে দেখতে পাবে ঐ সব বিজ্ঞাপন আসলে ফাঁপা কাচের নল দিয়ে তৈরী আঁকা বাঁকা অক্ষর ছাড়া কিছুই না, অথচ ওর ভিতর দিয়ে অমন সুন্দর, বিশেষ করে অমন স্নিগ্ধ আলো বেরোয় কি করে? আসল ব্যাপার হচ্ছে ঐ নলগুলো মোটেই ফাঁপা নয়। ওর মধ্যে বাতাস নেই বটে কিন্তু আছে নিওন্ বলে এক রকম গ্যাস। রাত্রি বেলা ঐ গ্যাসের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালেই ঐ গ্যাস বিচিত্র আলোকচ্ছটা বার করতে থাকে, আর মজা এই, গ্যাসের চাপ কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত ক'রে ইচ্ছামত সবুজ, হলদে, নীল, লাল, বেগুনী ইত্যাদি আলো বার করা যায়। নিওন্ গ্যাসের সাহায্যে আলো বার করা হয় বলেই ওর নাম 'নিওন্-লাইট্'।

নিওন গ্যাসের চালচলন কিন্তু বড় অদ্ভুত। রাসায়নিকরা একে বলেন 'নিষ্ক্রীয় বা ইন্‌য়্যাক্‌টিভ্' ( Inactive ) গ্যাস। শুধু ইন্‌য়্যাক্‌টিভ্ গ্যাস নয়—

ইন্‌য়্যাকৃটিভ্‌ এলিমেণ্ট্‌। কারণ নিওন আসলে একটি 'এলিমেণ্ট্‌' বা মৌলিক পদার্থ। অন্যান্য মৌলিক পদার্থ যেমন অপর মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলে মিশে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ( Compound ) সৃষ্টি করে নিওনের বেলা কিন্তু সেটি হবার যো নেই। নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অপরের সঙ্গে মেলা এর কোষ্ঠিতে লেখে নি। তা ছাড়া জিনিষটিকে সংগ্রহ করাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। আগে তো লোকে এর নামই জানত না—১৮৯৮ সনে প্রথম এর আবিষ্কার হয়। কেমন করে বলছি।

তোমরা বোধ হয় জান আমাদের চারদিকে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তার উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন, আর সেই সঙ্গে খানিকটা জলীয় বাষ্প, ওজোন ও কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড্‌ গ্যাস। প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশ সাহেব একবার বাতাসের নাইট্রোজেন নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন—যে অংশটার সবটাই নাইট্রোজেন বলে তাঁর ধারণা ছিল তার সবটাই যেন নাইট্রোজেন নয়—আর কোন কিছু দিয়ে ঐ নাইট্রোজেনটুকু টেনে নিলেও যেন অতি সামান্য পরিমাণ গ্যাস পড়ে থাকে বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তখন ঐ পর্য্যন্তই গড়ায়। এর প্রায় একশ' বছর পরে লর্ড্‌ র‍্যালে নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, বাতাসে যে গ্যাস যতটা পরিমাণ আছে বলে জানা ছিল ঠিক সেই গ্যাস সেই পরিমাণ নিয়ে একটা কাচের নলে ভরে কৃত্রিম বাতাস তৈরী করবার চেষ্টা করেন এবং তার বিভিন্ন গুণাবলী পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যে আসল বাতাস আর এই নকল বাতাসের ঘনতায় ( Density ) সামান্য একটু তফাৎ দাঁড়াচ্ছে। বাতাস থেকে সংগৃহীত নাইট্রোজেন আর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'তৈরী' নাইট্রোজেনের ঘনতায়ও ঐ রকম তফাৎ দেখা গেল। র‍্যালের তখন ক্যাভেণ্ডিশের পরীক্ষার কথা মনে পড়ল, তিনি আবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ফলে তাঁর ধারণা হ'ল বাতাসে শুধু ঐ ঐ গ্যাসই নেই, নিশ্চয় আরও কোন নতুন রকমের গ্যাস খুব সামান্য পরিমাণে মিশে আছে। তখন র‍্যালের সঙ্গে কাজে নামলেন উইলিয়াম র‍্যাম্‌জে। দুই বৈজ্ঞানিকের কঠোর পরিশ্রমের পর ধরা পড়্‌ল সত্যি সত্যি বাতাসের মধ্যে আরও এক রকম গ্যাস অতি অল্প পরিমাণে মিশে আছে, আর



এই গ্যাসটি এমনি অদ্ভুত যে অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন কোন যৌগিক পদার্থ গড়বার ক্ষমতা এর আদপেই নেই। রাসায়নিক জগতে তখন পর্য্যন্ত এ ধরণের কোন পদার্থের কথা লোকের জানা ছিল না—কাজেই আবিষ্কারটা হ'ল বেশ বড় দরের। র‍্যাম্‌জে ঐ গ্যাসের নাম রাখেন 'আরগন্‌'। কথাটা গ্রীক্‌,—ওর মানে 'অলস'।

কিন্তু নিষ্ক্রিয় হ'লে কি হবে, বৈজ্ঞানিকেরা আরগন্‌কে কাজে লাগিয়ে দিতে ছাড়লেন না—কাজ জুটল বিজলী-বাতির বাল্‌ব্‌ তৈরীর ব্যবসায়ে। আগে ঐ বাল্‌ব্‌গুলির ভিতরটা একেবারে বায়ুশূন্য থাকৃত—যাকে বলে 'ভ্যাকুয়াম্‌'; ওতে বাল্‌বের ভিতরকার সূক্ষ্ম ধাতুর তার খানিকটা ক'রে উবে গিয়ে বাল্‌বের কাচের গায়ে জমা হ'ত—ফলে বাল্‌ব্‌ হয়ে যেত কালচে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন একেবারে বায়ুশূন্য না করে বাল্‌বের ভিতরটা যদি আরগন্‌ দিয়ে ভরে দেওয়া যায় তা হ'লে হাঙ্গামা অনেকটা চুকে যায়। এই ব্যাপারে আরগনের চাহিদা বেড়ে গেল।

বাতাসকে তেমন ভাবে ঠাণ্ডা করতে পারলে গালিয়ে জলের মত তরল করতে পারা যায় এ তোমরা আগে শুনেছ। এই তরল বাতাস থেকে আরগন্‌ সংগ্রহের ব্যবস্থা হ'ল। ১৮৯৮ সনে, এই তরল বাতাস নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে, র‍্যাম্‌জে সাহেব আবিষ্কার করলেন যে ওর মধ্যে শুধু আরগন্‌ই নেই, আরও কয়েকটা ঐ জাতের নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছে। সেগুলির নাম দেওয়া হ'ল—ক্রিপ্‌টন্‌ ( অর্থাৎ লুকান ) জেনন্‌ ( অর্থাৎ অপরিচিত ) নিওন্‌ ( অর্থাৎ নতুন ) এবং হিলিয়াম্‌ ( হিলিওস = সূর্য্য; সূর্য্যের আলো যন্ত্রে পরীক্ষা করে দু'জন বৈজ্ঞানিক এটির অস্তিত্ব আগেই সন্দেহ করেছিলেন )। যাক্‌, এই ভাবে 'নিওন্‌' গ্যাসের পরিচয় জানা গেল।

এক লক্ষ ভাগ বাতাসের মধ্যে এক ভাগ নিওন্‌ আছে, কাজেই নিওন্‌ সংগ্রহ করা খুব সহজ নয় তা তো বুঝছই। তরল বাতাস থেকে অক্সিজেন ইত্যাদি পৃথক্‌ ক'রে এই নিষ্ক্রিয় গ্যাস সংগৃহীত হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি এক সঙ্গে মেশান থাকে। কাঠ-কয়লাকে শূন্যের চেয়ে ১০০ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে রেখে

TIGHT BINDING

তার উপর দিয়ে ঐ নিষ্ক্রিয় গ্যাস চালিয়ে দিলে কয়লা আরগন্, ক্রিপটন্ আর জেনন্ শুষে নেয়—পড়ে থাকে হিলিয়াম্ আর নিওন্। এর পর কয়লাকে আরও ঠাণ্ডা ক'রে, শূন্য থেকে ১৮৫ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে নামিয়ে, ঐ গ্যাস ফের তার উপর দিয়ে নিয়ে গেলে এবারে কয়লা শুধু নিওন্‌টুকু শুষে নেবে। তার পর সেই কাঠ-কয়লাকে একটু গরম করলেই হ'ল—সমস্ত নিওন্ বেরিয়ে আসবে।

বিজ্ঞাপনে আলোর লেখা দেখান ছাড়া বৈজ্ঞানিকেরা আরও নানা কাজে নিওন্‌কে লাগাচ্ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিওন্ দিয়ে তৈরী 'নিওন্ ল্যাম্প'এর নাম করা যেতে পারে,—যা টেলিভিশন্‌এর একটা অতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। তা ছাড়া আধুনিক রাসায়নিক গবেষণার কাজেও নিওন্ যথেষ্ট সাহায্য করছে।

---

## ডিওন্ কুইন্

এরা পাঁচ বোন—সব এক সঙ্গে জন্মেছে। এদের বাপের নাম ডিওন্, তাই এদের সংক্ষেপে
বলা হয় 'ডিওন কুইন্'—অর্থাৎ ডিওনের পঞ্চ যমজ।

# সন্দেশ

কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ সুরু হয়েছে এবং তার প্রথমার্দ্ধ শেষ হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গল দল যেমন খেলছে বরাবর তেমনটি রাখতে পারলে এবারের লীগ্ বিজয়ের সম্মান তারাই অর্জ্জন করবে। ১২টা ম্যাচ্ খেলে তারা পেয়েছে ২২ পয়েণ্ট, মহামেডান্ স্পোর্টিং পেয়েছে ১৮। ৩য় যাচ্ছে মোহনবাগান—১২টা খেলে তারা পেয়েছে ১৭ পয়েণ্ট্। গোড়ায় অনেকে ভেবে-ছিল যে মোহনবাগানই বোধ হয় এবারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল হবে কিন্তু তারা একাধিক বার পরাজয় বরণ করে সে খ্যাতি নষ্ট করেছে। মহামেডান্ স্পোর্টিং ১ম খেলায় ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়েছে কিন্তু মোহনবাগানের কাছে হেরেছে। ইষ্ট বেঙ্গল আবার মোহনবাগানকে হারিয়েছে। এখন পর্য্যন্ত তালিকার সর্ব্বনিম্নে রয়েছে কাষ্টমস্।



অনেকে আশঙ্কা করেছিল জাপান বোধ হয় এর পর ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ সুরু করবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে রকম কিছু ঘটে নি—যদিও আসামের ২।১ জায়গায় তারা বোমাবর্ষণ করেছে বলে কাগজে বেরিয়েছে। জাপান এখন চীনের বিরুদ্ধে শক্তিব্যয় করছে, এবং চীনের আরও কিছু কিছু অংশ দখল করেছে। ব্রহ্মেও তাদের আক্রমণ বন্ধ হয় নি। চীনারা সর্ব্বত্র প্রবল বাধা দিচ্ছে।

জার্ম্মেনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার বহুঘোষিত বসন্ত-অভিযান সুরু করেছে, ফলে রাশিয়ার খারকভ, লেনিনগ্রেড, সেবাষ্টপল ইত্যাদি জায়গায় দুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলছে।

* * *

এবারের রামধনুতে তোমরা তরুণ সাহিত্যিক মিহির রায়ের অকালমৃত্যুর খবর পেয়েছ। তার কিছুদিন পরেই ঠিক অমনি ধারা আর একটি তরুণ সাহিত্যিকের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমরা মর্ম্মাহত হলাম। তোমরা নিখিলেশ সেনের অনেক লেখা রামধনুতে পড়েছ। রামধনু ছাড়া অন্যান্য শিশুমাসিকেও তাঁর লেখা প্রায়শঃই বেরোত। প্রবন্ধ লেখার হাত ছিল তাঁর সুন্দর। হঠাৎ, মাত্র ১৯।২০ বছর বয়সে, এই তরুণ সাহিত্যসেবীটিও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। দীর্ঘজীবী হলে তিনি বাংলা শিশু-সাহিত্যে অনেক কিছু পরিবেশন করে যেতে পারতেন কিন্তু সে সময় আর হ'ল না। আমরা নিখিলেশের আত্মীয়পরিজনকে কি বলে সান্ত্বনা দেব জানি না—সে শোক আমাদের বুকেও যে তেমনি ভাবে বেজেছে।

আগেকার মান্দালয়ের ২টি দৃশ্য : যুদ্ধের হাত থেকে মান্দালয়ও রেহাই পায় নি।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রতি বড় বস্তায় ১৮ সের, মাঝারি বস্তায় ৯ সের ও ছোট বস্তায় ৩ সের করে ময়দা ধরবে।

১ম বন্ধুর ভাগে পড়বে—১টা বড় বস্তা, ৩টে মাঝারি বস্তা ও ৩টে ছোট বস্তা। ২য় বন্ধুর ভাগে—২টো বড় বস্তা, ৬টা ছোট বস্তা এবং ৩য় বন্ধুর ভাগে—১টা বড় বস্তা ও ৪টে মাঝারি বস্তা পড়বে।

---

TIGHT BINDING

তার উপর দিয়ে ঐ নিষ্ক্রিয় গ্যাস চালিয়ে দিলে কয়লা আরগন্, ক্রিপটন্ আর জেনন্ শুষে নেয়—পড়ে থাকে হিলিয়াম্ আর নিওন্। এর পর কয়লাকে আরও ঠাণ্ডা ক'রে, শূন্য থেকে ১৮৫ ডিগ্রী নীচেকার উত্তাপে নামিয়ে, ঐ গ্যাস ফের তার উপর দিয়ে নিয়ে গেলে এবারে কয়লা শুধু নিওন্টুকু শুষে নেবে। তার পর সেই কাঠ-কয়লাকে একটু গরম করলেই হ'ল—সমস্ত নিওন্ বেরিয়ে আসবে।

বিজ্ঞাপনে আলোর লেখা দেখান ছাড়া বৈজ্ঞানিকেরা আরও নানা কাজে নিওন্‌কে লাগাচ্ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিওন্ দিয়ে তৈরী 'নিওন্ ল্যাম্প'এর নাম করা যেতে পারে,—যা টেলিভিশন্‌এর একটা অতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। তা ছাড়া আধুনিক রাসায়নিক গবেষণার কাজেও নিওন্ যথেষ্ট সাহায্য করছে।

---

## ডিওন্ কুইন্

এরা পাঁচ বোন—সব এক সঙ্গে জন্মেছে। এদের বাপের নাম ডিওন্, তাই এদের সংক্ষেপে লা হয় 'ডিওন কুইন্'—অর্থাৎ ডিওনের পঞ্চ যমজ।

## সন্দেশ

কলকাতার ফুটবল্ লীগ্ সুরু হয়েছে এবং তার প্রথমার্দ্ধ শেষ হয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গল দল যেমন খেলছে বরাবর তেমনটি রাখতে পারলে এবারের লীগ্ বিজয়ের সম্মান তারাই অর্জ্জন করবে। ১২টা ম্যাচ্ খেলে তারা পেয়েছে ২২ পয়েণ্ট, মহামেডান্ স্পোর্টিং পেয়েছে ১৮। ৩য় যাচ্ছে মোহনবাগান—১২টা খেলে তারা পেয়েছে ১৭ পয়েণ্ট্। গোড়ায় অনেকে ভেবেছিল যে মোহনবাগানই বোধ হয় এবারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দল হবে কিন্তু তারা একাধিক বার পরাজয় বরণ করে সে খ্যাতি নষ্ট করেছে। মহামেডান্ স্পোর্টিং ১ম খেলায় ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়েছে কিন্তু মোহনবাগানের কাছে হেরেছে। ইষ্ট বেঙ্গল আবার মোহনবাগানকে হারিয়েছে। এখন পর্য্যন্ত তালিকার সর্ব্বনিম্নে রয়েছে কাষ্টমস্।



অনেকে আশঙ্কা করেছিল জাপান বোধ হয় এর পর ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ সুরু করবে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে রকম কিছু ঘটে নি—যদিও আসামের ২।১ জায়গায় তারা বোমাবর্ষণ করেছে বলে কাগজে বেরিয়েছে। জাপান এখন চীনের বিরুদ্ধে শক্তিব্যয় করছে, এবং চীনের আরও কিছু কিছু অংশ দখল করেছে। ব্রহ্মেও তাদের আক্রমণ বন্ধ হয় নি। চীনারা সর্ব্বত্র প্রবল বাধা দিচ্ছে।

জার্ম্মেনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার বহুঘোষিত বসন্ত-অভিযান সুরু করেছে, ফলে রাশিয়ার খারকভ, লেনিনগ্রেড, সেবাষ্টপল ইত্যাদি জায়গায় তুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলছে।

* * *

এবারের রামধনুতে তোমরা তরুণ সাহিত্যিক মিহির রায়ের অকালমৃত্যুর খবর পেয়েছ। তার কিছুদিন পরেই ঠিক অমনি ধারা আর একটি তরুণ সাহিত্যিকের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আমরা মর্ম্মাহত হলাম। তোমরা নিখিলেশ সেনের অনেক লেখা রামধনুতে পড়েছ। রামধনু ছাড়া অন্যান্য শিশুমাসিকেও তাঁর লেখা প্রায়শঃই বেরোত। প্রবন্ধ লেখার হাত ছিল তাঁর সুন্দর। হঠাৎ, মাত্র ১৯।২০ বছর বয়সে, এই তরুণ সাহিত্যসেবীটিও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। দীর্ঘজীবী হলে তিনি বাংলা শিশু-সাহিত্যে অনেক কিছু পরিবেশন করে যেতে পারতেন কিন্তু সে সময় আর হ'ল না। আমরা নিখিলেশের আত্মীয়পরিজনকে কি বলে সান্ত্বনা দেব জানি না—সে শোক আমাদের বুকেও যে তেমনি ভাবে বেজেছে।

আগেকার মান্দালয়ের ২টি দৃশ্য: যুদ্ধের হাত থেকে মান্দালয়ও রেহাই পায় নি।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রতি বড় বস্তায় ১৮ সের, মাঝারি বস্তায় ৯ সের ও ছোট বস্তায় ৩ সের করে ময়দা ধরবে।

১ম বন্ধুর ভাগে পড়বে—১টা বড় বস্তা, ৩টে মাঝারি বস্তা ও ৩টে ছোট বস্তা। ২য় বন্ধুর ভাগে—২টো বড় বস্তা, ৬টা ছোট বস্তা এবং ৩য় বন্ধুর ভাগে—১টা বড় বস্তা ও ৪টে মাঝারি বস্তা পড়বে।

---

TIGHT BINDING

### উত্তরদাতাদের নাম

বিমলেন্দু, যাদবচন্দ্র, নির্ম্মলেন্দু, নীলিমা, মীরা, ইলা ( কুরুমগ্রাম ) ; অজিত, জ্যোৎস্না, মীরা ও দেবেশ ( বানিয়া খামার ) ; অমু, বাবুন, বুলু, তপন, দেবী গাঙ্গুলী ( সাওরা—বরিশাল ) ; শীলা, অশোক, অমিয়, প্রভাত, অমিতাভ ( বেতিয়া ) ; পরেশ দা, চণ্ডী, সনৎ, আরতি ( ভিড়িঙ্গী ) ; কালিদাস পাল ( বালুভরা ) ; ছত্র, শক্তি, রামেন্দু, তাসু, বাবু, পরিমল সরকার ( গোলাঘাট ) ; জগৎ, শান্তি, শঙ্কর, সুবোধ ( বাণীমন্দির—মুড়াগাছা ) ; গোষ্ঠ, সুকুমার, কালীপদ, রমাপদ, বিষ্ণুপদ, ধীরেন, সুধীর ( বালিঘাই ) ; অঞ্জলি, স্বদেশ, আশীষ, অসীম, মিঠু, টিটু, রিটু, বিজু, বাচ্চু, তুলু, নীলা, খেলা, হেলা ( ভবানীপুর ); হাসি, লিলি, গোরা, বেতু, নিতাই, কৃষ্ণা, রিণা ( ডালটনগঞ্জ ) ; মোহনলাল ( মণিরাম ) আগরওয়ালা ও সুপ্রকাশচন্দ্র ( বৈদ্যনাথ ) চক্রবর্ত্তী ( সুজানগর—পাবনা ) ; অনিমা, মহুয়া, সীমা ( করিমগঞ্জ ) ; সেবা, বাপ্পা, গৌতু, সিপ্রা, কালাচাঁদ বাবু ( করিমগঞ্জ ) ; হাসিরাণী ঘোষ ( খঞ্জনপুর ) ; রমেশচন্দ্র, বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত ( পট্টনায়ক ) ; গিরিজাপ্রসাদ সরকার ( রামচন্দ্রপুর ) ; প্রসিত ও প্রদ্যোৎ বাগচী ( বালুভরা ) ; সুনীলকুমার চ্যাটার্জ্জি ( কলিকাতা ) ; সলিল বসু ( হাজারীবাগ ) ; যূথিকা চন্দ্র ( চন্দ্রগিরি—রাজমহল ) ; মঞ্জু, বুবু, মেজমামা, পিন্টু, বাণী, গোপাল, মা, বাবা ও মেজদাদু ( মুর্শিদাবাদ ) ; নিরুপমা দেবী ( কৃষ্ণনগর ) ।

---

## নূতন ধাঁধা

এক দোকানদার হাট থেকে ৯ ঝুড়ি ফল কিনল। প্রত্যেক ঝুড়ির গায়ে ভিতরে যতগুলি ক'রে ফল আছে তত নম্বর লেখা ছিল। নম্বরগুলি এই রকম :—১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২৪, ২৫, ২৮, ৩২, ৪০। ফলের মধ্যে ৮ ঝুড়িই আম, বাকীটা লিচু ; কিন্তু ঠিক কোন্ ঝুড়িটায় লিচু আছে জানা ছিল না।

বাজারে গিয়ে দোকানদার ঝুড়ি না খুলে সব ফলই আম বলে বেচতে সুরু করল। এক ভদ্রলোক এসে কতকগুলি ফল নম্বর দেখেই কিনে নিলেন। তার পর আর একজন এলেন; ১ম ভদ্রলোক যা নিয়েছিলেন ইনি তার দ্বিগুণ সংখ্যক ফল কিনলেন। শেষে আর একজন এসে ১ম ও ২য় ভদ্রলোক দু'জনে মিলে যতগুলি ফল কিনেছিলেন ঠিক ততগুলি ফল নিয়ে চলে গেলেন। কেউই ঝুড়ি খুলে দেখলেন না। তখন দেখা গেল আর মাত্র একটি ঝুড়ি পড়ে আছে। দোকানদার খুলে দেখে সেটারই মধ্যে রয়েছে লিচু। তোমরা বলতে পার কোন্ নম্বরের ঝুড়িতে লিচু ছিল ?

---

**ভ্রম সংশোধন** :—এ মাসের ২১৬ ও ২১৮ পৃষ্ঠার শিরোনামায় মাসের নাম 'জ্যৈষ্ঠ' ছাপা হয়েছে, ওখানে 'আষাঢ়' বসবে। গত সংখ্যায় ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ ) ১৭৪ পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ লাইনে 'মক্' স্থানে 'সক (Suq)' হবে।


ছোটদের উপযোগী ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী

সুলেখক শ্রীঅমলশঙ্কর রায় প্রণীত

# ইউরোপের আলো

সম্বন্ধে দু'টি অভিমত

"ইউরোপ ভ্রমণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তবু ইউরোপের অনেকখানি অমলশঙ্করের রচনার মধ্যে জীবন্ত চলচ্চিত্রের মত দেখতে পেয়ে সুখী হয়েছি। বাংলা ভাষায় ইউরোপ ভ্রমণ সম্বন্ধে অল্প যে কয়খানি উল্লেখযোগ্য বই আছে অমলশঙ্করের এই বইখানি তাদের মধ্যেই গণ্য হবে বলে বিশ্বাস করি।"

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

"To read such a book is to feel the joy of travelling—also the joy of reading."

—Advance

সুন্দর পুরু কাগজে সুদৃশ্য ছাপা। উপহারের উপযোগী মনোজ্ঞ রঙ্গিন প্রচ্ছদপট।

দাম—এক টাকা

---

শ্রীলীলা মজুমদার এম্.এ

প্রণীত

নূতন ধরণের গল্পের বই

# বদ্যিনাথের বড়ি

'মৌচাক' বলেন

"সব গল্পগুলোই বেশ হাসির ও মজার। ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে।"

লেখিকার স্বহস্ত-অঙ্কিত সুন্দর সুন্দর কার্টুন ছবি।

সুন্দর বহুবর্ণরঞ্জিত বাঁধান মলাট, পাতায় পাতায় হাসি।

দাম আট আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ। ১বি, বসা রোড, কলিকাতা।


১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641.

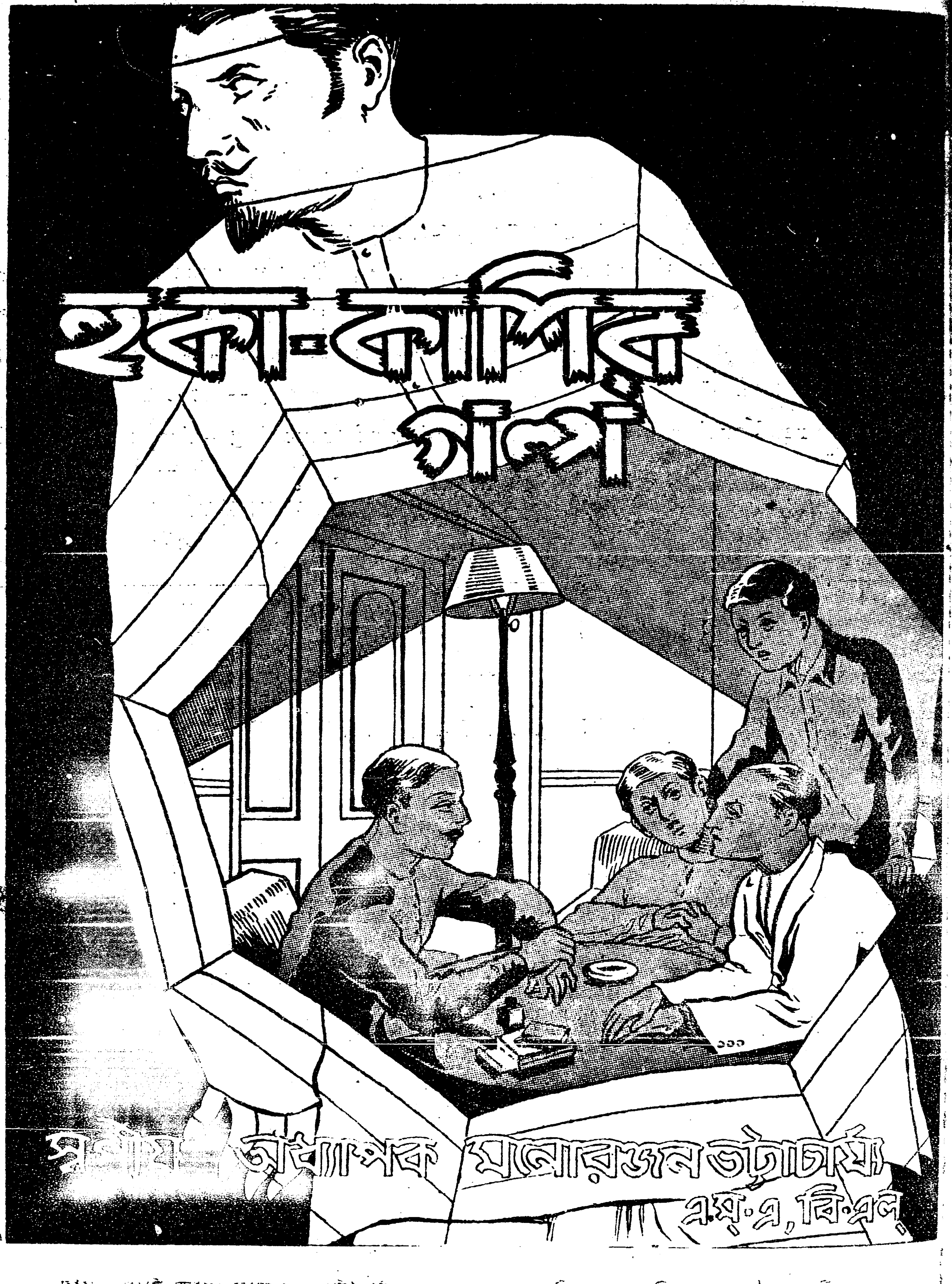


দাম—আট আনা মাত্র : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ। ১বি, রমা রোড, কলিকাতা।

বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৪৯ ৭ম সংখ্যা

# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস-সি

মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
আবিষ্কৃত ১৯০২]
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা

Regd. No. C—1641.

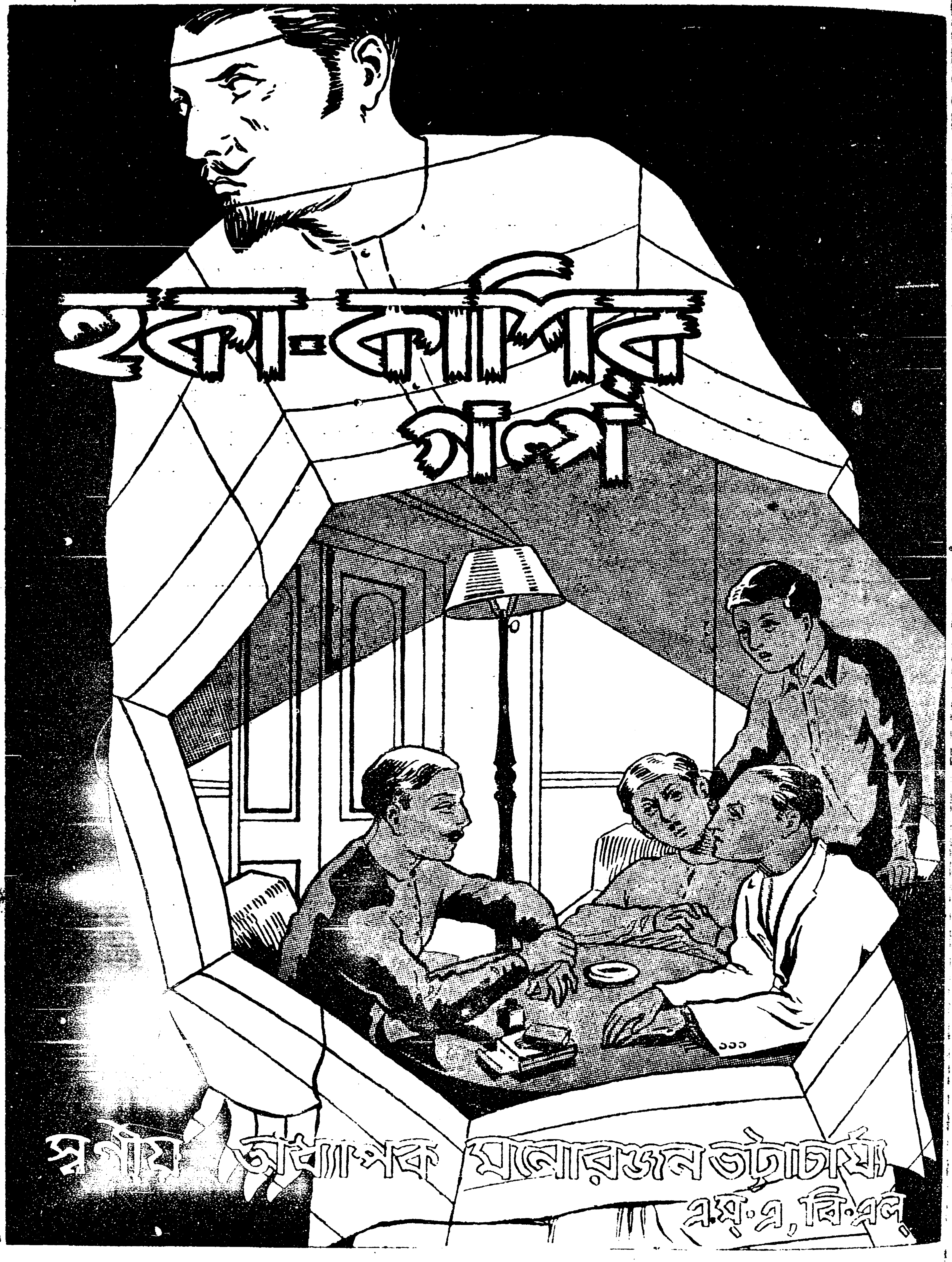


দাম আট আনা মাত্র : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ । ১বি, রমা রোড, কলিকাতা।

…শ বর্ষ শ্রাবণ, ১৩৪৯ ৭ম সংখ্যা

# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
[আবিষ্কৃত ১৯০২]
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOS

# রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতিসংখ্যা ।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চার আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না. এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

## সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

## পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

## নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ৷৵০

## হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙিন মলাট। দাম ৷৵০

## চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ৷০

## এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

( শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে )
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ৷৵০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড ( ১বি, রসা রোড, কলিকাতা )

ডোঙ্গরের বালামৃত সেবনে
দুর্ব্বল ও শীণকায় শিশুরা,
অল্প-দিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য
লাভ করে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৷

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৶০

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

## আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ।৹

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—৷৴০

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

### ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা

-সুন্দর বই-

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

**কলকাতার হালচাল** ... ৸৶০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

**দিগ্বিজয়ী বীর** ... ৷৹

**মহাভারতের গল্পগুচ্ছ**

১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ... ৷৹

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

**নতুন কিছু** ... ৷৷৶০

শ্রীমাধব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

**গল্পসল্প**···৶১০ **ছুটীর গল্প**···৶১০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

**ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি** ··· ৷৹

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

**আজব গল্প** · ।০ **অনেক গল্প**···।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

**ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন** ··· ৷৷৶০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

**অনুসন্ধানী** (সাধারণ জ্ঞান) ··· ১৷৹

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

**রং-চং** ... ... ৷৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ ( ১বি, রমা রোড, কলিকাতা )

### বর্ষায় চুপচাপ ঘরে বসে পড়বার দু'চার খানা বই

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

## পাল্কীবুড়ো

মজাদার আর হাসির গল্প পড়তে যারা ভালবাসে, তাদের এ বই পড়তেই হবে। গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগাগোড়া মজার মজার ছবিতে ভর্ত্তি।

দাম মাত্র **ছয়** আনা

ভারত-বিখ্যাত যাদুকর গণপতি চক্রবর্ত্তীর

## যাদু-বিদ্যা

বন্ধু-বান্ধবদের ভেল্কি লাগাতে যারা চাও, এক্ষুণি একখানা কিনে নাও। নতুন সংস্করণে বইখানিতে অনেক গুলো ছবি দিয়ে হাত সাফাইয়ের কায়দাগুলো সহজ সরল করে দেওয়া হয়েছে। এ পড়লে তোমরা অনায়াসে ছোটখাট "যাদুকর" হতে পারবে।

দাম মাত্র **বারো** আনা

প্রফেসর আর. পি. দের

## সরল কর-কোষ্ঠী শিক্ষা

অতীতের কথা বলে দিতে পারলে লোক বিস্মিত হয় আর ভবিষ্যতের কথা জানতে পারার জন্য মানুষ উদ্‌গ্রীব। এ বইখানা পড়লে হাতের রেখাগুলি দেখে তোমরা অনায়াসেই সকলের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারবে। ছুটির দিনে বসে বসে এমনি সময় নষ্ট করার চাইতে এ খেলা কি ভালো নয়?

বইখানি এমন সহজভাবে লেখা এবং ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা কেন তোমাদের চাইতে ছোটরাও অনায়াসে পড়তে এবং সব শিখতে পারবে।

দাম মোটে **বারো** আনা

### "কাঞ্চন জঙ্ঘা" সিরিজের

**দ্বিতীয় বছরের প্রথম গ্রন্থ**

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

## মুখ আর মুখোস

দাম **আট** আনা

**দ্বিতীয় গ্রন্থ**

শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত

## হত্যার প্রতিশোধ

দাম **আট** আনা

**তৃতীয় গ্রন্থ**

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

## নীল আলো

দাম **আট** আনা,

দেব সাহিত্য-কুটীর—২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

রামধনু—

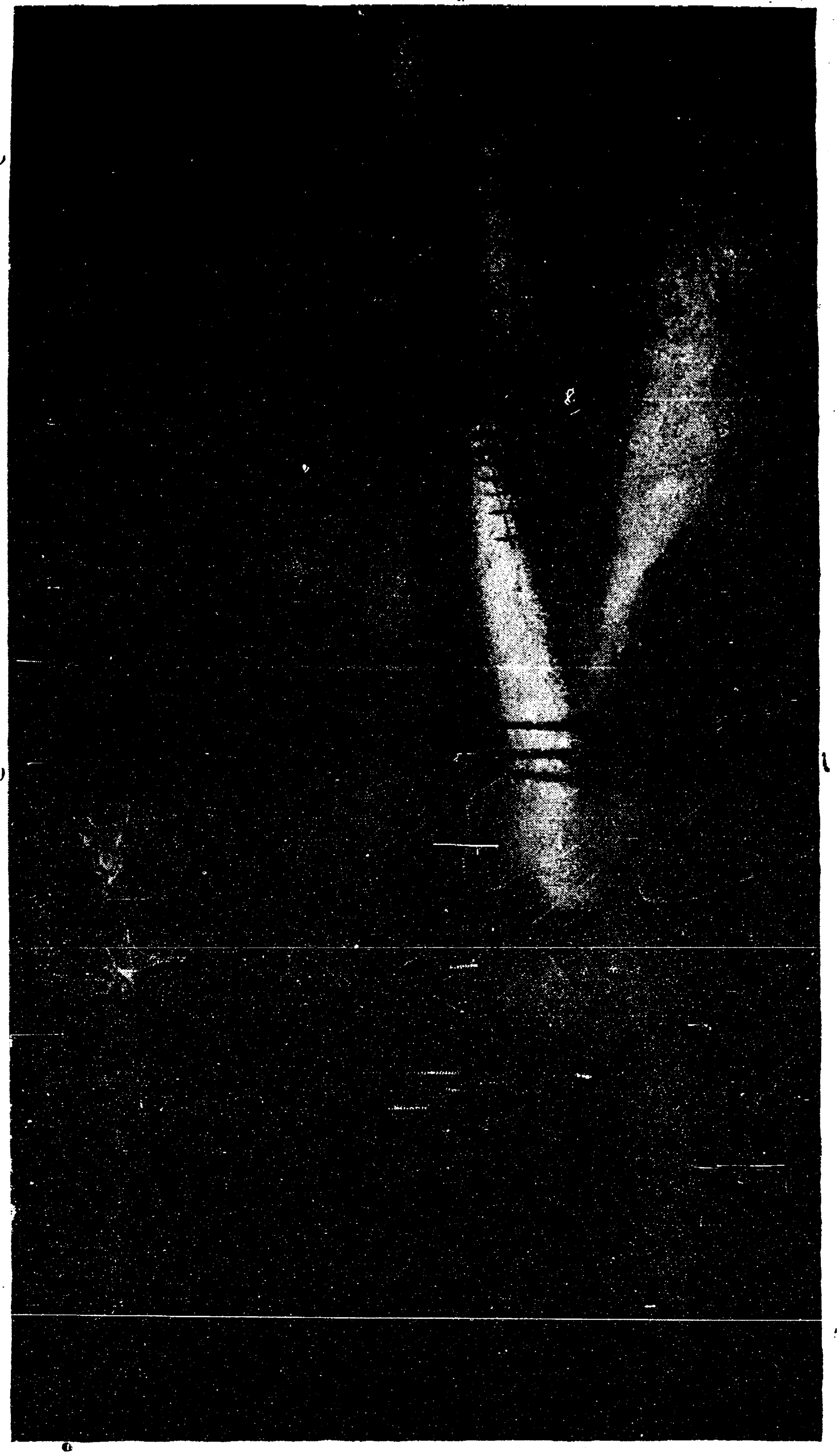

বর্ষায়

শিল্পী—শ্রীনবীন ভট্টাচার্য্য

# রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৯ { ৭ম সংখ্যা

## মেঘের দেশে

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অনু, বাবুন, যাই চল না—আজকে মেঘের দেশে,
আম কুড়োনোর পথে সে নয়, নীল সায়রের শেষে।
পাকা আমের গন্ধে হেথা আজ ভরেছে দিক্,
মাল্‌সী ফুলের কুঁড়িগুলি তাকায় নির্নিমিখ ;
পুকুর-পাড়ে আনারসের চোখের তারা দু'টি
অবাক্ হ'য়ে রইবে চেয়ে,—আমরা যাব ছুটি'
মেঘ পেরিয়ে, চাঁদ পেরিয়ে সুদূর মেঘের দেশে।

মেঘের দেশের ধূসর পথ রঙীন হ'ল আজ,
ধূলায় ঝড়ে যাই না চল আজকে তারই মাঝ।
শিউলি-ঝরা পথে পথে আজ যাব না দূরে,
যাব না আর মেঠো পথে রাখাল-বাঁশীর সুরে ;
হেলা ভরে ছাড়িয়ে যাব ক্লান্ত ঝাউয়ের শাখা,
ব্যর্থ হবে ধানের শীষের দুলিয়ে মাথা ডাকা।
—রঙীন পথে মেঘের দেশে ছুটব মোরা আজ।

মেঘের পরী ডাক দিয়েছে,—দিচ্ছে যে হাতছানি,
চল না আজ দেখেই আসি তার সে হাসিখানি।
কাজল দীঘির কালো জলে আর তো নহে পাড়ি,
সাত সাগরের ডাকাডাকির সঙ্গে হবে আড়ি ;
বাঁশের ঝাড়ে, বেতের বনে ঘুঘু পাখীর ডাক,
স্তব্ধ রাতে উদাস বাঁশী,—আজকে না হয় থাক্।
মেঘের পরী মেঘের দেশে দিয়েছে হাতছানি।

রঙীন করা ধূসর পথে আজকে মেঘের দেশে
যাই না চল অনু, বাবুন,—নীল পাহাড়ের শেষে।
ঝড়ের মাঝে ধূলার রথে আঁকাবাঁকার পারে,
মন ভুলানো, চোখ ঢুলানো, ঘুম্‌তি নদীর ধারে,
স্বপ্ন-জাগা, আলোক-লাগা, ঝিমিয়ে-পড়া মনে
জাগিয়ে নিয়ে ছুটব জোরে রঙীন মেঘের বনে—
অনু, বাবুন, চল না যাই আজকে মেঘের দেশে।

---

# বিচার

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ.

রঙ্গ-নিকেতনের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক অভিনেতা রবীশ ও কমল পার্কের এক কোণে গম্ভীরভাবে যেন কি পরামর্শ করছে। দিনের পর দিন যারা জনসাধারণের হাসির খোরাক যুগিয়ে এসেছে তাদের মুখ আজ গম্ভীর। ওরা দু'জনে যখন ষ্টেজে এসে দাঁড়ায় তখন দর্শকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে। যাই হোক, ওদের এই বিমর্ষতার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ওরা দু'জনেই আজ রুক্মিণী দেবী নামে একটি মেয়ের কাছে (সেও ভাল অভিনয় করতে পারে) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ; সে জবাব দিয়েছে,—"আপনাদের মধ্যে 'সিরিয়াস্ পার্ট' অভিনয় করে যিনি বেশী সাফল্য দেখাতে পারবেন তাঁর প্রস্তাবই আমি মেনে নেব ; আর এ-বিষয়ে জনসাধারণের মতামত চূড়ান্ত হবে।"

এই সমস্যাই আজ ওদের ভাবিয়ে তুলেছে। অভিনয়নৈপুণ্যে ওদের মধ্যে কে বেশী বড় এটা বলা সত্যি শক্ত। যাই হোক, আজ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লেও রবীশ ও কমল দু'জনে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে ওরা মীমাংসা করতে চায়। কিন্তু কথা এই যে, সিরিসাস্ পার্ট্ করবার সুযোগ তো ওদের কর্ত্তৃপক্ষ দেবেন না, কারণ 'কমেডিয়ান্' হিসেবেই ওরা আজ এত জনপ্রিয়।

রবীশ ও কমল যখন এইভাবে কথাবার্ত্তা বলছিল তখন অদূরে দাঁড়িয়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওদের লক্ষ্য করছিলেন ; তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "যদি কিছু মনে না করেন তো একটা বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ নিতে চাই। আমি এখানে নতুন। আপনাদের অভিনয়-কৌশলের কথা শুনে আপনাদের কাছে এলাম। কিছু দিন হ'ল দ্বীপান্তর থেকে ফিরেছি—বিশ বছর পরে। সুদীর্ঘ কারাবাসের পর আজ বুঝতে পেরেছি, হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা আসতে পারে না। দেশের লোকেরা যাতে এই সত্যটা বুঝতে পারে সেজন্য চারিদিকে প্রচার করতে চাই। কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে—লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আমার একেবারেই নেই। আপনারা যদি আমায় এ-বিষয়ে সাহায্য করেন তা হ'লে খুব উপকার হয়।"

ভদ্রলোকটির কথাগুলো শুনে রবীশের মাথায় এক অভিনব ফন্দি খেলে গেল। সে-ভাব গোপন করে সে বলল,—"আচ্ছা, আপনার বক্তৃতায় কি কি বিষয় থাকবে, একটু বলবেন ?"

"এতে থাকবে আমার বিপ্লবী জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা, আর থাকবে নিজের হাতে মানুষ খুন করা কি ভয়ানক অমানুষিক কাজ তারই প্রতিচ্ছবি। এই ভ্রান্ত আদর্শের জন্য আমাদের দেশের কত ছোট ছোট ছেলেরা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছে। সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে এই সর্ব্বনাশা পথের কি ভীষণ পরিণতি।"

"আপনাকে তো এই জায়গায় কেউ চেনে না; আমি যদি আপনার হ'য়ে এই বক্তৃতাটি দেবার বন্দোবস্ত করি তা হ'লে কোন আপত্তি আছে কি? আপনার নিজেরও কোন কষ্ট করতে হয় না, আর আপনার যে উদ্দেশ্য, মানে মতবাদ প্রচার করা, তাও হবে।"

এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে ভদ্রলোকটি রাজী হলেন। আপত্তি করবার কি বা থাকতে পারে? রবীশের মত একজন সুদক্ষ অভিনেতা নিশ্চয় প্রাণ দিয়েই কথাগুলো বলতে পারবে।

এই দায়িত্ব নিয়ে রবীশ তার সমস্ত ক্ষমতা ও কৌশল প্রয়োগ করে চরম অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। মনে মনে ভাবল, অভিনয় যদি সফল হয় তবে কমলের সাধ্য কি ওকে পরাজিত করে। সারা রাত জেগে রবীশ তার বক্তৃতা তৈরী করল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সহরের করোনেশান্ হলে জনসভার আয়োজন করা হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যে হল্‌টি ভর্ত্তি হ'য়ে গেল—দ্বীপান্তর-ফেরৎ বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা আজ বক্তৃতা দেবেন—লোকের কৌতূহলের অন্ত নেই—যদিও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে এখানে কেউ চেনে না। যাই হোক, রবীশ যথাসম্ভব তাঁর চেহারার অনুকরণ ক'রে মেক্-আপ্ করল। এখানে বলা দরকার, এই অভিনয়ের কথা রুক্মিণী দেবী ও কমল ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না।

শ্রোতৃমণ্ডলী তার কথা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রবীশ আস্তে আস্তে বলতে উঠ্‌ল। সকলের দৃষ্টি সেই বিপ্লবী নেতার ওপর নিবদ্ধ। গুরু-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে কম্পিত-স্বরে বক্তা বলে চল্‌ল—"এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিল, বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে, মানুষকে হত্যা করে, আস্‌বে আমাদের স্বাধীনতা। সেই আদর্শ নিয়ে বিপ্লবী-দল গঠন করে নিজেদের ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করেছিলাম; কত অবুঝ ছেলেকে ঘর থেকে বের করে এনে হিংসার মন্ত্র দিয়ে মানুষ খুন করতে শেখালাম। কিন্তু আজ বিশ বছর বাদে আমাদের সে-ভুল ভেঙ্গেছে। আমারই জন্য কত ছেলে ফাঁসির মঞ্চে আর দ্বীপান্তরে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু যারা গেছে তারা আর আস্‌বে না। ফাঁসিতে যাবার আগে মানুষের কি মর্ম্মান্তিক যাতনা তা যদি আগে জান্‌তাম!......"

সমস্ত হল্ নিস্পন্দ হয়ে শুনে যেতে লাগ্‌ল। রবীশ যখন চুপ করল তখন কেউ হাততালি দিল না। এইটেই বোধ করি তার সাফল্যের সব চেয়ে বড় নিদর্শন। সবাই নিঃশব্দে হল্



থেকে বেরিয়ে গেল। লোকের মুখে মুখে আজ এই বিপ্লবী নেতার কথা। সহরে একটা অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়ে গেল।

কমল রবীশের বাড়ী গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এল। রবীশের সব চেয়ে আনন্দ হ'ল, যখন মিহিরপুরের জমিদার রাজা জগৎনারায়ণ তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য চিঠি দিয়ে তাকে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালেন। রবীশ বলল,—"এত বড় একজন লোকও আমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়েছেন! এ-থেকেই বোঝা যায়, সিরিয়াস্ ভাবটা কি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছি।" কমল বলল, "আশ্চর্য্য, একটি লোকও এই ফাঁকিটা বুঝতে পারল না! আচ্ছা, মিহিরপুরের জমিদারটি কে? এঁর নাম তো আগে কোন দিন শুনি নি!"

রবীশ বলল,—"নাম শুনে আমার কোন দরকার নেই। একজন জমিদার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি নিশ্চয়ই যাব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।" * *

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রবীশের গাড়ী এসে জমিদার-বাড়ীর সাম্‌নে থাম্‌ল। অতি সাধারণ একখানা বাড়ী। রবীশের মনটা একটু দমে গেল। ওকে অভ্যর্থনা করবার জন্য বিশেষ কোন আয়োজন দেখ্‌তে পেল না। কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে অপেক্ষা করার পর রাজা বাহাদুর বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক খুবই বুড়ো—একেবারে নুয়ে পড়েছেন। শরীরের চামড়া সব ঝুলে পড়েছে। চোখ-মুখ একেবারে ব'সে গেছে। মাথার পাতলা চুল একেবারে সাদা, কিন্তু তাঁর চোখ দু'টো উন্মাদের মত অস্বাভাবিক। অভিবাদনের পর বৃদ্ধ একটু রুক্ষ স্বরে বললেন,—"আপনার বক্তৃতাটি অতি চমৎকার হয়েছে, অনেক কিছু জানবার ও ভাব্‌বার আছে—কথাগুলো আমি কোন দিন ভুলব না।" রবীশ কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করল।

"আপনার অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষ করে একটি ঘটনা সম্বন্ধে আরও কিছু শোনবার জন্যই আপনাকে এখানে ডেকেছি। বক্তৃতার মধ্যে অজয়কুমার নামে একটি ছেলের কথা বলেছিলেন, যে আপনার প্ররোচনায় বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল। সে তো মারা গেছে; তাই না?"

চাকর একটা সরবতের গ্লাস রেখে গেল। ভদ্রলোক সেটা রবীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"এটা খেয়ে ফেলুন। হ্যাঁ, ভাল কথা, অজয়ের কথায় আপনি বলেছিলেন, ও রকম বেপরোয়া ছেলে আপনি কখনো দেখেন নি। সে নাকি বীরের মত ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছিল। আর আপনিই তো তাকে ও-পথে ডেকে নিয়েছিলেন, কেমন?" বলতে বলতে রাজা বাহাদুর উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। ভীত হ'য়ে রবীশ জবাব দিলে,—"হ্যাঁ, বের করে এনেছিলাম সত্যি, কিন্তু সে দেশের জন্যই। তখন আমাদের এ আদর্শ যে ভুল—তা তো বুঝতে পারি নি।" রাজা বাহাদুর তিক্ত স্বরে বল্‌লেন,—"আর আজ সে ভুল বুঝতে পেরেও পারবেন কোন প্রতিকার করতে? পারবেন আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে?"

"অজয় আপনার ছেলে ?"

"হ্যাঁ, ওই আমার একমাত্র ছেলে, বড় আদরের ছেলে—আপনিই তাকে বিপথে টেনে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারেন দেখছি। সহস্র বড় কথায়ও আর আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। যাক্‌, সরবৎ সবটাই খেয়ে ফেলুন—ওতে বিষ মেশান আছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।"

"বিষ!" বলেই রবীশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে তার পা কাঁপতে লাগল, সমস্ত শরীর অবশ বোধ হ'তে লাগল, মনে হ'ল শরীরের সমস্ত রক্ত জমে গেছে।

"আমি আপনাকে ভয় করি না। বুড়ো হয়েছি, নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবু গায়ের জোর দেখাবেন না, ওতে কোন লাভ হবে না। মরণ আপনার সুনিশ্চিত।"

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। রবীশ ভয়ে কাঁপছে, আর রাজা বাহাদুরের মুখে পাগলের হাসি। হঠাৎ রাজা বাহাদুরের দাড়ি, গোঁফ, পরচুলা খুলে পড়ল, রবীশ দেখ্‌ল তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কমল।

* * * *

এই ঘটনাটি যখন আগাগোড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল তখন সহরের সকলেই কমলকেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব'লে স্বীকার করল। রবীশ কেবল করোনেশন্ হলের শ্রোতাদের প্রবঞ্চনা করেছিল—কিন্তু আজ সে নিজেই কমলের কাছে প্রবঞ্চিত হ'ল। রুক্মিণী দেবীর কাছে কে বেশী যোগ্যতর হয়েছিল তা' বলাই বাহুল্য। *

---

# সাধুর কিস্‌মিস্‌ প্রদান

[ ম্যাজিকের কৌশল ]

শ্রীদেবকুমার ঘোষাল ( বালক যাদুকর )

কিছুদিন পূর্ব্বে ( বৈশাখ, ১৩৪৮ ) রামধনুতে আমি "সাধুর অদ্ভুত ধূমপান" শীর্ষক একটী ম্যাজিক-কাহিনী বলিয়াছিলাম। ঐ আখ্যানের দু'টী অংশ ছিল, একটী "সাধুর ধূমপান", অপরটী "সাধুর কিস্‌মিস্‌ প্রদান"। ধূমপান সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে।



সেবারেই বলিয়াছিলাম, বাকীটুকু পরবর্ত্তী সংখ্যায় বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু নানা কারণে সে সুযোগ পাই নাই। আজ সে কথাই বলিব।

আগেই বলিয়া রাখি—ম্যাজিক আসলে একটা সাধারণ স্তরেরই জিনিষ; তবে একান্ত সাধনা ও অবিরত অভ্যাসসাপেক্ষ। ম্যাজিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে 'হাত সাফাই'—"পামিং" ( Palming ) ইহা এখন সকলেই জানে। গত সাত বৎসরে আমি অন্ততঃ প্রায় জন কুড়ি সাধু দেখিয়াছি যাহারা একমাত্র এই হাত সাফাই ( Palming ) বিদ্যায় সাফল্য লাভ করিয়া কবচ, মাদুলী, কিস্‌মিস্‌, ভোগ, মিষ্টান্ন, ফল, নাভিশঙ্খ, রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ প্রদান করিয়া নিরীহ ধর্ম্মভীরু ভক্তবৃন্দকে অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিত করিয়াছে। যাহা হউক, এখন আসল কথায় ফিরি। ঐ সাধু যখন একমুঠা করিয়া খড়ের কুচি তুলিয়া লইয়া ভক্তের হাতে কিস্‌মিস্‌ দিতে লাগিলেন তখন আমি দু'-একবার দেখার পরই আসল ব্যাপারটী বুঝিতে পারিয়া হাত পাতিয়া বসিয়া সাধুকে বলিলাম, "সাধুজি! আমাকে দয়া ক'রে দুটো প্রসাদ দিন না!" পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সব সাধুদের মানুষ চিনিবার শক্তি আমার বা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী এবং সব ক্ষেত্রেই ইহারা "ক্ষেত বুঝে পাট করেন"। সাধু একবার মাত্র আমার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন, আমার কথায় কোন কর্ণপাতই করিলেন না। আমি তখন নিরুপায় হইয়া সঙ্গী বন্ধুকে হাত পাতিতে বলিলাম। সাধু যখন খড়ের টুক্‌রাগুলি লইয়া তাহার হাতে দিলেন তখন সকল ব্যাপারই স্পষ্ট হইয়া গেল। সাধুর বসিবার আসন ও ভঙ্গীটি ছিল এইরূপ যাহাতে তাহার কোলের ভিতরেই কাপড়ের এক অংশে কতকগুলি কিস্‌মিস্‌ দর্শকের অগোচরে লুকাইয়া রাখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে দর্শকের পক্ষে তাহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। আর খড়ের কুচিগুলি ছিল একেবারে সম্মুখে। সাধু পূর্ব্ব হইতেই কৌশলের সঙ্গে ২।৪টী কিস্‌মিস্‌ হাতের উপরের দিকে 'পাম্‌' করিয়া রাখিয়া খড়ের কুচির ভিতর হাত ডুবাইয়া দিয়া উহা তুলিয়া দিবার ছলে একটুখানি দর্শককে দেখাইয়া হাত পাতিতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই কতকটা খড় সেইখানেই ছাড়িয়া দিয়া এবং আর কতকটা ক্ষিপ্রতার সহিত হাতের মধ্যে ( নিম্নদেশে ) পাম্‌ করিয়া রাখিয়া উপর হইতে কিস্‌মিস্‌ কয়টী লইয়া

TIGHT BINDING

আমার বন্ধুর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। এতখানি লিখিয়া বুঝাইতে আমার যে সময়টুকু লাগিল ব্যাপারটী অবশ্য তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। বলা বাহুল্য আমার বন্ধু ও অন্য সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। এখানে কিন্তু বিদ্যাটী কেবল মাত্র 'পামিং'। কিন্তু এই পাম্ করাটা একদিকে যেমন ম্যাজিকের বড় অঙ্গ অন্য দিকে তেমনি আয়াসসাধ্য। আমার গুরুদেব গণপতি বাবু বলিতেন, প্রথমেই বড় জিনিষ পাম্ করিতে চেষ্টা করিবে না – অতি ক্ষুদ্র জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষার্থীকে ক্রমে পয়সা, টাকা, সন্দেশ ইত্যাদি পাম্ করার চেষ্টা করিতে হইবে'। ইহাই পামিংএর মূলমন্ত্র; কিন্তু শুধু বর্ণনা বা পুস্তকের সাহায্যে পামিং জিনিষটী আয়ত্ত হওয়া সম্ভব নহে, এ বিষয়ে গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ ও হাতে কলমে শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

'উপসংহারে একটী কথা। অন্যান্য ম্যাজিক তোমরা যত শেখ আর নাই শেখ এই রকম দু'-একটী ম্যাজিক শিখিয়া রাখিও। ইহাতে বাহাদুরি দেখাইয়া নিজের আনন্দ লাভ যত হউক আর না হউক অন্ততঃ এইরূপ ভণ্ড প্রতারক সাধু-সন্ন্যাসীর হাত হইতে নিজেকে বা অপরকে মুক্ত করা সম্ভব হইবে।

---

২২

ছাব্বিশে অক্টোবর তারিখে একটা বেশ মজার কাণ্ড হইয়া গেল। নীলাদ্রি আগের দিন বলিয়া রাখিয়াছিল কাল সে নান্‌ডুর পিঠের উপর চড়িবে। সকাল বেলায় সে অনেক কষ্টে পাখীটার পিছনে গিয়া তাহার গলায় একটা লাগাম ও মাথায় একটা ঢাকনি পরাইয়া দিল। এগুলি সে



বহু পরিশ্রমে নিজেই তৈরী করিয়াছিল। অশোক প্রথমটা অনেক বারণ করিয়াছিল, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। পাখীটার পায়ের দড়ি ধরিয়া সে তাহাকে গুহার বাহিরে আনিল। সঙ্গে সঙ্গে আর সমস্ত ছেলেরাও চলিল। না জানি, নান্‌ডুর পিঠে চড়িতে কি মজা! নীলাদ্রি যদি প্রথমে চড়িতে পারে তাহা হইলে তাহারাও চড়িবার চেষ্টা করিবে। শঙ্খচূড় ও প্রদ্যোৎ পাখীটাকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল; নীলাদ্রি হেঁট হইয়া তাহার পায়ের দড়ি খুলিয়া দিল। নান্‌ডু এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। অদূরেই নিবিড় অরণ্য, তাই শঙ্খচূড় ও প্রদ্যোৎ পাখীটার দুইপাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রাণপণে ধরিয়া রহিল। তখন অনেক কষ্টে নীলাদ্রি নান্‌ডুর পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া তাহার লাগাম ধরিল। প্রদ্যোৎ ও শঙ্খচূড়কে ছাড়িয়া দিতে বলিলেই তাহারা ছাড়িয়া দিবে; কিন্তু 'ছেড়ে দাও' কথাটি আর নীলাদ্রির মুখ হইতে বাহির হয় না। তাহার কেমন ধারা ভয় হইতে লাগিল। শেষে অনেক সাহস করিয়া সে বলিল, "এইবার ছেড়ে দাও"। শঙ্খচূড় ও প্রদ্যোৎও পাখীটাকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু এ কি, ছাড়া পাইয়াও পাখী নড়ে না কেন! পাখীর চোখ দু'টা বন্ধ বলিয়া পাখী চলিতেছে না, তাই নীলাদ্রি হাতের সরু ছড়ি দিয়া তাহার মাথার ঢাকনিটা খুলিয়া দিল। চোখ খোলা পাইতেই নান্‌ডু দুই পাখা ছড়াইয়া একেবারে তীরের মত বনের দিকে ছুটিয়া চলিল। নীলাদ্রি দুই পায়ে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুই হাতে লাগাম ধরিয়া রহিল। পাখী উল্কার গতিতে লাফাইতে লাফাইতে সোজা ছুটিয়া চলিল। পিছনে ছেলের দল চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নীলাদ্রিকে লইয়া এই সর্ব্বনেশে পাখী কোথায় চলিয়াছে! সকলেরই ভয় হইতে লাগিল নীলাদ্রিকে বুঝি তাহারা চিরজীবনের মত হারাইল। পাখীটা যে ক্রমশঃই চোখের অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে! হঠাৎ সকলের চোখে পড়িল নীলাদ্রি কেমন করিয়া পাখীর পিঠ হইতে হঠাৎ মাটীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই নান্‌ডু-সুন্দরী লাগাম সমেৎ দূরে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা নীলাদ্রির কাছে আসিয়া পড়িল। বেচারী তখন উঠিতে পারিতেছে না। পাখীর পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়া হয়ত তাহার কোমরটাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সবাই মিলিয়া নীলাদ্রিকে টানিয়া তুলিল; দেখা গেল তেমন কিছু গুরুতর আঘাত তাহার লাগে নাই। দুই হাতে কাঁকাল টানিতে টানিতে নীলাদ্রি কহিল—"পাখীটাকে কেউ তোমরা ধরতে পারলে না। হায় হায়, আমার অমন সুন্দর নান্‌ডু পাখীটা গেল!" রঞ্জিৎ হাসিতে হাসিতে কহিল—"তুমি যে প্রাণে বেঁচে গেছ তার জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেও। নান্‌ডুর কথা আর মুখে এন না।" নীলাদ্রি তখন গভীর বনের দিকে চাহিয়া কহিল—"ওরে পাপিষ্ঠ অকৃতজ্ঞ পাখী, তোকে এত দিন ধরে খাওয়ালাম, এত সেবা কর্‌লাম, আর তার এমন প্রতিদান দিয়ে গেলি!" তখন সকলে হাসিতে হাসিতে ফরাসী গুহায় ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে নভেম্বর মাস আসিয়া পড়িল, ছেলেরা ঠিক করিয়া ফেলিল এইবার দ্বীপটিকে একটু ভাল করিয়া পরিদর্শন করিয়া দেখা উচিত। সমগ্র সিন্ধুদ্বীপের কোথায় কি আছে তাহা তাহাদের নখদর্পণে থাকা দরকার। সময় নষ্ট না করিয়া ছেলেরা তখনই আয়োজন সুরু করিল এবং পাঁচই নভেম্বর তারিখে অশোক, রঞ্জিৎ, শঙ্খচূড়, রোহিতাশ্ব, কুণাল, কমলাক্ষ এবং নীলাদ্রি এই সাত জনে মিলিয়া অভিযানে রওনা হইল, আর চলিল বিয়্যার। সরঞ্জামের মধ্যে অশোক, রঞ্জিৎ ও রোহিতাশ্ব তিনজনে লইল তিনটা বন্দুক ও তিনটা রিভলভার, আর দলের প্রত্যেকের সঙ্গে রহিল একটা করিয়া বড় ছোরা। এ ছাড়া দু'টা কুড়াল, একগাছা লাস্‌সো ও একগাছা বোলাস, আর একটা স্যুটকেসের মধ্যে সেই রবারের নৌকাটা। ভারী সুন্দর এই নৌকা, ওজনে বড় জোর পাঁচ সের হইবে, ব্যাগের মধ্যে তাহা পাট করিয়া লওয়া যায় আবার দরকার মত জলের উপর ভাসানোও চলে। বদোয়াঁ সাহেবের ম্যাপের একটা নকলও অশোক সঙ্গে লইল।

কয়েক দিন ক্রমাগত হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে তাহারা সেই হ্রদের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। এ কয় দিন তাহারা বুনো খরগোস, পেকারি এবং জংলী পাখীর মাংস খাইয়া কাটাইয়াছে, কখনও বা তাঁবু খাটাইয়া কখনও বা মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটাইয়াছে, আর নতুন নতুন দৃশ্যও দেখিয়াছে অনেক। রঞ্জিতের ইচ্ছা—হ্রদের ও-পাড়টাও গিয়া তাহারা দেখিয়া আসে কিন্তু অশোক কহিল, "না, এবার ফিরতে হবে।" দলপতির আদেশ, কাজেই রঞ্জিৎ চুপ করিল, কিন্তু এ রকম জীবন তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

ফিরিবার পথে এক জায়গায় দেখা গেল নিবিড় বন। এক একটা গাছ প্রায় আশী ফুট উচ্চ। আর কি প্রকাণ্ড তাদের ডালপালা! এইখানে অশোক একপ্রকার চারা গাছ দেখিতে পাইল। দাঁত দিয়া চিবাইয়া দেখিল তাহা সভ্য জাতির অতি প্রিয়—অতি পরিচিত চা গাছ। কয়েকটা গাছ তাহারা তুলিয়া লইল, পরে সুবিধামত আসিয়া আরও পাতা তুলিয়া লইয়া গেলেই চলিবে।

আবার চলিতে চলিতে হঠাৎ অশোক শঙ্খচূড়ের বাহু ধরিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—"শঙ্খচূড়, ঐ দেখ পাহাড়ের কোলে মাঠের উপর কি সব জন্তু চরে বেড়াচ্ছে।" শঙ্খচূড় সেই দিকে দেখিয়া তেমনি নিঃশব্দে কহিল—"ছাগল!" অশোক কহিল—"ও ছাগল নয়, তবে ছাগল জাতীয় কোন জন্তু নিশ্চয়; যাই হোক, তুমি একটাকে ধরবার চেষ্টা দেখ।" বাস্তবিক বনের আড়ালে কিছু দূরে এক সুবিস্তৃত মাঠের উপর ছয়টা ছাগল জাতীয় জন্তু চরিতেছিল। তাহারা তখনো পর্য্যন্ত ছেলেদের দেখিতে পায় নাই, নিঃশঙ্কচিত্তে ঘাস খাইতেছিল। অশোক ও শঙ্খচূড় পা টিপিয়া টিপিয়া তাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ দেখা গেল সব চেয়ে বড় ছাগলটা শূন্যে মুখ তুলিয়া নাক দিয়া কি যেন শুঁকিবার চেষ্টা করিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই



সেটা পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া পালাইবার উপক্রম করিল, সঙ্গে সঙ্গে বাকি কয়টাও ছুটিল। তখন শঙ্খচূড় নিমেষে তাহাদের সামনে ছুটিয়া গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সেই সুদীর্ঘ বোলা একটার উপর নিক্ষেপ করিল। অদ্ভুত তাহার হাতের লক্ষ্য, অব্যর্থ সেই বোলার নাগপাশ! বোলাটা চোখের পলকে একটা ছাগলের উপর পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল। বাকি কয়টা সঙ্গে সঙ্গে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। অশোক ও শঙ্খচূড় তখন ত্বরিৎপদে সেই ছাগলটার নিকট গিয়া দেখে—সেটা একটা ছাগলী, মাটির উপর পড়িয়া বোলার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিতেছে। তাহার দুইটা বাচ্ছাও মাতার সেই দুর্গতি দেখিয়া সেইখানে থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। অশোক তাড়াতাড়ি বাচ্ছা দু'টাকে ধরিয়া ফেলিল, শঙ্খচূড় মাকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিল। শঙ্খচূড়ের তখন সে কি বিকট উল্লাসধ্বনি! হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে অশোককে জিজ্ঞাসা করিল—"এগুলো কি সত্যি ছাগল? কি অদ্ভুত গড়ন এদের!" অশোক কহিল—"না, এদের বলে ভিকোনিয়া (Vicugna), পার্ব্বত্য ছাগল বিশেষ। এরা খুব দুধ দেয়"। ভিকোনিয়াগুলি দেখিতে বাস্তবিকই অদ্ভুত। ছাগলের মত আকার হইলেও তাহাদের পায়ের খুরগুলা ভয়ঙ্কর লম্বা, গায়ের লোমগুলি একেবারে সিল্কের মত মসৃণ, মাথা নিতান্ত ছোট, মাথায় কোন শিংও নাই।

পরদিন আর এক ব্যাপার! রঞ্জিৎ, কুণাল ও কমলাক্ষ বিয়্যারকে লইয়া আগে আগে চলিয়াছে; পিছন পিছন আসিতেছে বাকি চারিজন। দুই দলের মধ্যে একশত গজের ব্যবধান। নিবিড় গাছপালার দরুণ এক দল অপর দলকে দেখিতে পাইতেছিল না। হঠাৎ পিছনের দলস্থিত ছেলেগুলির কানে আসিল এক অতর্কিত চীৎকারধ্বনি—"রঞ্জিৎ, দেখ দেখ, কি অদ্ভুত জন্তু!" ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু বেশীদূর তাহাদের যাইতে হইল না। পর মুহূর্ত্তেই শোনা গেল আগাছা জঙ্গল মাড়াইয়া কি একটা প্রকাণ্ড জন্তু হুড়মুড় করিয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই ডালপালা ভাঙ্গিয়া ঘোড়ার মত কি একটা প্রকাণ্ড জন্তু একেবারে তাদের সামনে আসিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খচূড়ও তাহার বোলা ছুঁড়িয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"গুলি ছুঁড় না, গুলি ছুঁড় না। ব্যাটাকে জ্যান্ত ধর্‌ব!" ওদিকে রঞ্জিৎও ছুটিয়া আসিতে আসিতে বলিতে লাগিল—"আমার গুলিটা বড় জোর ফস্‌কে গেছে; রোহিতাশ্ব, আর দেরী করূছ কেন; গুলি মার, গুলি মার।" অশোক রঞ্জিতের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—"খবরদার, কেউ গুলি ছুঁড় না, এটা আমাদের ভারবাহী পশু হবে।" শঙ্খচূড়ের বোলার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া সেই অদ্ভুত জন্তুটা তখন মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িয়াছে। তাহার তখন সে কি চার পা ছোঁড়া, সে কি অসহায় আর্ত্তস্বর! সকলে তফাতে দাঁড়াইয়া জন্তুটাকে দেখিতে লাগিল। নীলাদ্রি কহিল—"এ কি জন্তু অশোক? খানিকটা

ঘোড়ার মত দেখ্‌তে, খানিকটা উটের মত?" অশোক কহিল—"ঐ নিশ্চয়ই গুয়ানাকো; দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস্‌ প্রান্তরে এই জন্তুকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।" গুয়ানাকো উটের মত দেখিতে হইলেও অশ্ব জাতীয় জন্তু। ঘোড়ার মত ইহারও সুন্দর দীর্ঘ গ্রীবা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল আয়ত চক্ষু, পেশল মসৃণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তবে ইহার গায়ের রং ফিকে হলুদ বর্ণ, তার উপর সাদা সাদা ফুটকি। বড় শান্ত ও ভয়-তরাসে জন্তু এই গুয়ানাকো। দশ মিনিটের মধ্যেই তাহার পা ছোঁড়া শেষ হইল। এখন যেন সাহায্যের জন্য করুণ নয়নে ছেলেগুলির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল এই গুয়ানাকো সহজেই পোষ মানিবে; তখন তাহাকে দিয়া মাল বহনের কাজ ত চলিবেই, উপরন্তু তাহার পৃষ্ঠেও আরোহণ করা যাইবে। তখন তাহার গলায় লাস্‌সো বাঁধিয়া শঙ্খচূড় ধীরে ধীরে বোলার ফাঁস খুলিয়া দিল। কি আশ্চর্য্য, গুয়ানাকো ছাড়া পাইয়াও এতটুকু পালাইবার চেষ্টা করিল না। আর দেরী না করিয়া সকলে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। তাহাদের এই অভিযান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহারা চা-গাছ আবিষ্কার করিয়াছে, দুটা শাবক সমেত ভিকোনিয়া ধরিয়াছে ও সর্ব্বশেষে এমন একটা নিরীহ অথচ বলশালী গুয়ানাকো ধরিতে সক্ষম হইয়াছে। রঞ্জিতের বন্দুক অপেক্ষা এই আদিম পুরাকালীন লাস্‌সো ও বোলা যে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তাহা সকলে, এমন কি রঞ্জিৎ শুদ্ধ, মানিতে বাধ্য হইল।

(ক্রমশঃ)

---

# সত্যিকারের রত্নদ্বীপ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌.এস্‌-সি

তোমরা অনেকেই বোধ হয় 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বা রত্নদ্বীপের বিখ্যাত গল্প শুনেছ। লোকচক্ষুর আড়ালে, জনশূন্য সুদুর্গম দ্বীপের মধ্যে ডাকাতরা কেমন ক'রে তাদের লুঠ-করা ধনরত্ন লুকিয়ে রাখত সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। আমাদের দেশেও গল্প আছে—যক্ষেরা নাকি মাটীর তলায় টাকাকড়ি পুঁতে রাখে, আর দিবারাত্র তা পাহারা দেয়। গুপ্তধনের লোভে কেউ কাছে গেলেই ঘাড়টি দেয় মটকে। গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টায় নানা রকম মন-গড়া



'য়্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী নিয়ে লেখা বইও বাংলা শিশু-সাহিত্যে ইদানীং খুব বেশী দেখা দিয়েছে; তোমরা নিশ্চয়ই তার কিছু না কিছু পড়েছ—অন্ততঃ আমার চেয়ে বেশী।

কিন্তু আজ তোমাদের এমন একটা জায়গার কথা বল্‌ব যেটাকে সত্যি সত্যিই 'রত্নদ্বীপ' বলা চলে এবং সে জায়গাটিতে যে প্রচুর গুপ্তধন পোঁতা রয়েছে সে বিষয়েও কারো সন্দেহ নেই।

উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে পানামা যোজক—যদিও এখন আর তাকে ঠিক যোজক বলা চলে না,—খাল কেটে তার ভিতর দিয়ে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা হয়েছে,—সেই পানামা থেকে প্রায় পাঁচশ' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কোকোস্‌ দ্বীপ। এক সময় নাকি এখানে খুব নারকেল গাছ (কোকোনাট্‌) হ'ত—তাই এই নাম। ছোট্ট দ্বীপ,—লম্বায় মাইল পাঁচেক, চওড়ায়ও তিন মাইলের বেশী নয়; আর বেড় হবে তার বড় জোর চৌদ্দ কি পনেরো মাইল্‌। এই দ্বীপটিকে সত্যিকার 'রত্নদ্বীপ' বলা যেতে পারে। কেন জান? প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে এই দ্বীপের উপরকার পাহাড়গুলিতে অসংখ্য ছোট-বড় গহ্বর হয়ে রয়েছে—আর এই সব গহ্বরের মধ্যে আগেকার দিনের জলদস্যুরা প্রচুর ধনরত্ন পুঁতে রেখে গেছে। এমন কি, শ' দেড়েক বছর আগেও এখানে গুপ্তধন পুঁতে রেখে যাওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তোমরা বোধ হয় জান, ২।৩ শ' বছর আগে জলদস্যুদের উৎপাতে সমুদ্রপথে যাওয়া-আসা করা কি রকম বিপজ্জনক ছিল। ইংরেজিতে ঐ সব দস্যুদের বলা হ'ত 'পাইরেট্‌স্‌'—আমরা যাদের বলি 'বোম্বেটে'। স্প্যানিশ, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ সব জাতের লোকই তাদের মধ্যে ছিল। এই সব দস্যুরা দল বেঁধে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, জাহাজে চড়ে সারা জীবনটাই সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত—আর সুবিধা পেলেই যাত্রীবাহী জাহাজ আক্রমণ ক'রে তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে নিত। দরকার হ'লে বে-পরোয়া হত্যা করতেও তাদের বাধত না।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। এক সময় এই পেরু দেশের সমৃদ্ধির তুলনা ছিল না,—লোকে বল্‌ত, মাটীর দেশ তো নয়,

স্বর্ণভূমি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করত। যেখানে সেখানে সোনার ছড়াছড়ি—এমন কি কিছুটা সোনা না থাকলে কোন আসবাবপত্রই নাকি লোকের পছন্দসই হ'ত না। ভেবে দেখ সেখানকার লোকেরা ছিল কেমন ধনী। এ হেন যে সোনার পেরু, বিদেশী স্প্যানিশরা এসে তা দখল ক'রে নিল। শুধু দখল করা নয়, বিদেশীরা এসেই সেখানে যা ধনরত্ন পেল লুঠপাট ক'রে নিজেদের দেশে পাঠাতে লাগ্‌ল। ঐ সব স্বদেশগামী ধনরত্নবাহী জাহাজ সমুদ্র-পথে চলবার সময় যে সহজেই জলদস্যুদের নজরে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? হ'তও তাই। দস্যুরা জাহাজ আটকে, লোকজন হত্যা ক'রে সেই সব ধনরত্ন নিয়ে সরে পড়ত। কিন্তু সরে পড়লেই তো হয় না—ঐ প্রচুর ধনরাশি কোনও নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা চাই তো। তখনকার দিনে তো টাকা রাখবার ব্যাঙ্ক আর টাকা খাটাবার এত সহজ সহজ উপায় ছিল না। দস্যুরা কোন সুবিধামত নির্জ্জন দ্বীপে ঐ টাকা পুঁতে রাখত—এমন ভাবে রাখত যে ম্যাপ্ বা চার্ট্ না দেখে তারা নিজেরাও পরে এসে তার সন্ধান না পায়। এবং এই দিক্ দিয়ে কোকোস্ দ্বীপটা ছিল ভারী সুবিধার।

কোকোস দ্বীপের চারিদিক্ খাড়া পাহাড়ে ঘেরা—তিনশ'—চারশ', এমন কি ছ'শ' ফুট উঁচু পাহাড়। কাজেই সে পাহাড় এড়িয়ে দ্বীপের ভিতর ঢোকা খুব সহজ নয়। শুধু দু' জায়গায় দু'টো সরু সরু খালের মত আছে, তারই ভিতর দিয়ে দ্বীপে ঢুকতে হয়। চারদিকের সমুদ্র যেমনি গভীর, তেমনি তরঙ্গসঙ্কুল। দ্বীপে কোন রকমে ঢুকতে পারলেও সেখানে গিয়ে বাস করা একেবারে অসম্ভব। কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই—আছে শুধু গভীর জঙ্গল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাস, আগাছা, খানা, গর্ত্ত আর বড় বড় পাথর। জীবজন্তুর মধ্যে আছে বুনো শূয়োর, মশা, মাছি, পিঁপড়ে এবং ঐ রকম অগুণ্তি বিষাক্ত পোকামাকড়; আর আছে বিরাট্ বিরাট্ রাক্ষুসে মাকড়সা। গুপ্তধন লুকিয়ে রাখার পক্ষে এমনি ধারা সৃষ্টিছাড়া জায়গাই তো চাই। তাই ছোট বড় যত রাজ্যের বোম্বেটের দল এই দ্বীপটাকেই পছন্দ করত সব চেয়ে বেশী।

সেকালকার বিখ্যাত বিখ্যাত জলদস্যুদের বর্ণনা থেকে এবং অন্যান্য



প্রমাণ থেকে যা জানা গেছে তাতে অনেকে মনে করেন এখানে যে সব ধনরত্ন পোঁতা আছে তার পরিমাণ অন্ততঃ কুড়ি কোটি টাকার বেশী ছাড়া কম নয়। প্রায় আড়াই শ' বছর আগে ডেম্পিয়ার, কুক্ ও ডেভিস্ প্রভৃতি কয়েক জন জলদস্যু এখানে প্রায় চার শ' মণ রূপা, সাত শ' থলি মোহর আর সাত শ' তেত্রিশ খানা সোনার ইট পুঁতে রেখে গেছে বলে জানা যায়। প্রায় শ'দেড়েক বছর আগে বেনিটো নামে আর একজন জলদস্যু এখানে প্রায় দশ হাজার মণ ধনরত্ন পুঁতে রেখে যায়; তা ছাড়া নগদ আরও নাকি ৩ লক্ষ টাকার সোনা-রূপা বেনিটো এখানে রেখে গেছে। তার কয়েক বছর পরে টম্‌সন্ নামে আর একজন ইংরেজ দস্যু কম করে চার কোটি টাকার সোনা-রূপা-জহরৎ এনে এখানে পোঁতে। এর মধ্যে সোনাই ছিল নাকি প্রায় তিন কোটি টাকার। তা ছাড়া যীশু আর মেরীর দু'টি পূর্ণাবয়ব সোনার মূর্ত্তি ও অন্যান্য হীরা-জহরৎও ছিল। শোনা যায় লিমা সহরের লোকেরা একবার বিপদে পড়ে পালাবার সময় টম্‌সনের জাহাজ মারফৎ এগুলো আর এক জায়গায় পাঠাচ্ছিল—পথের মধ্যে টম্‌সন্ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে জাহাজ শুদ্ধ লোককে রাতারাতি হত্যা করে এবং এই বিপুল ধনরাশি নিয়ে উধাও হয়। পরিশেষে সে এই কোকোস্ দ্বীপে এনে সেগুলি লুকিয়ে রাখে। এমনি ধারা আরও কত জলদস্যুর লুণ্ঠিত ধন যে কোকোস্ দ্বীপে পোঁতা হয়েছিল তার হিসাব কে রাখে?

এমন যে অফুরন্ত গুপ্তধনে পূর্ণ দ্বীপ তা যতই দুর্গম আর যতই বিপজ্জনক হোক্ না কেন আধুনিক ধনলোভীদের নজর যে তার উপর পড়বেই এ তো জানা কথা। কত নাবিক, কত অভিযাত্রীর দল যে এই দ্বীপে এসে গুপ্তধনের আশায় তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করে গেছে তা আর কি বল্‌ব! অনেকে নানা রকম বিপদে পড়েছে, কেউ কেউ প্রাণও দিয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ কোন গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারে নি;—অথচ গুপ্তধন যে সেখানে আজও তেমনি ভাবে রয়েছে সে বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরাও প্রায় নিঃসন্দেহ। এই সব অভিযানকারীরা কোকোস্ দ্বীপ সম্বন্ধে যে সব ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছে তা পড়লে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে একজনের কথা আজ বল্‌ব।

তোমরা ম্যাল্‌কম্ ক্যাম্বেলের নাম শুনেছ কি? ডাঙ্গার ওপর ঘণ্টায় তিনশ’ মাইল বেগে মোটরকার চালিয়ে যিনি পৃথিবীর রেকর্ড্ করেছিলেন সেই ক্যাম্বেলের কথা বল্‌ছি। বছর সতেরো আগে ইনি একবার কোকোস্ দ্বীপে গুপ্তধনের খোঁজে গিয়েছিলেন।

ছেলেবেলায় ক্যাম্বেল্ ওয়েফার নামে এক বিখ্যাত জলদস্যুর লেখা একখানি ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এই আশ্চর্য্য দ্বীপের কথা পড়েন। সেই থেকে তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করেন—যে ক’রেই হোক্ এ দ্বীপে একবারটি ঘুরে আসতেই হবে। সৌভাগ্যক্রমে এই রকম গুপ্তধনের সন্ধান লেখা একটা ম্যাপ্ তাঁর হাতে পড়ল এবং ১৯২৫ সনে একদল সঙ্গী সহ একটা ছোট জাহাজ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

পথে নানা বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে, অসংখ্য অতিকায় কূর্ম্ম ও অতিকায় হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক’রে তাঁরা দ্বীপের উত্তর-পূব কোণে গিয়ে নামলেন। ম্যাপে আছে এখানে একটা ছোট নদী পাওয়া যাবে। নদীর মুখ থেকে এত পা উত্তরে গিয়ে আবার পশ্চিমে বেঁকতে হবে। সেখান থেকে একটু এগুলে একটা নেড়া পাহাড় মিলবে। এই পাহাড়ের মধ্যেই একটা গহ্বরে ঢুকতে পারলে পাওয়া যাবে গুপ্তধন। যাত্রার আগে ম্যাপ্ দেখে ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল আসল জায়গায় গিয়ে দেখা গেল তা অতটা সহজ নয়। সেই দুর্গম দ্বীপের ভিতর দিয়ে কার সাধ্য ইচ্ছামত চলাফেরা করে? গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছুরি দিয়ে প্রতি ইঞ্চি রাস্তা কেটে কেটে সাফ ক’রে তবে চলতে হয়। রাস্তা বল্‌লাম, কিন্তু আসলে সেখানে পা ফেলে কার সাধ্য? প্রতি পদক্ষেপে খানা, ডোবা, পাথর আর বড় বড় গভীর গর্ত্ত (কে জানে তার কতক পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তধনলোভীদের খোঁড়া কিনা)। সেগুলো আবার ঝোপে-জঙ্গলে এমন ভাবে ঢাকা যে বাইরে থেকে দেখে তার স্বরূপ আন্দাজ করা অসম্ভব। একবার তো ক্যাম্বেল্ আর তাঁর সঙ্গী দুই ইঞ্চির জন্য নিশ্চিত মরণ থেকে রক্ষা পেলেন। সামনে ছিল একটা চোরা খাদ—প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর, অথচ দূর থেকে দেখে তা ঠাহর করা অসম্ভব। জায়গাটার জল-হাওয়াও তেমনি বিশ্রী—যেমন স্যাঁৎসেঁতে তেমনি ভাপসা গরম।



প্রত্যহ জাহাজ থেকে নেমে চারিদিক্ ঘুরে ঘুরে আবার তাঁরা জাহাজে ফিরে আসতেন। কয়েক দিন ক্রমাগত এই ভাবে ঘুরে ঘুরে বিফল হয়ে ক্যাম্বেল্ ঠিক করলেন, এবার কয়েক জন মিলে ডাঙ্গায় নেমে তাঁবু গেড়ে থাকবেন—তা হ’লে খোঁজাখুঁজি করতে অনেক বেশী সুবিধা হবে। কিন্তু সঙ্গীদের মধ্যে মাত্র দু’জন ছাড়া আর কেউ সেই ভয়াবহ দ্বীপের ডাঙ্গায় নেমে রাত্রিবাস করতে রাজী হ’ল না। ক্যাম্বেল্ সেই দু’টি সঙ্গী আর তাঁদের আদরের কুকুর পিন্টোকে নিয়ে দ্বীপে তাঁবু গাড়লেন। সে কি সহজ ব্যাপার? জঙ্গল সাফ করে, ট্রেঞ্চ (খাদ) কেটে তার মধ্যে ওষুধ ছড়িয়ে পোকামাকড় তাড়িয়ে কত রকম কসরৎই না করতে হ’ল! তবু কি রেহাই আছে? পিঁপড়ে, মশা আর নানা জাতের নাম-না-জানা উড়ন্ত পোকামাকড় তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ ক’রে তুল্‌ল। কার সাধ্য রাত্রে একটু ঘুমোয়? তার ওপর অসহ্য গরমের কথা তো বলেছিই। খাবার-দাবার সে গরমে সব গেল পচে নষ্ট হয়ে—রইল শুধু শুক্‌নো বিস্কুট আর জল। তাই খেয়ে কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক’রে তাঁরা অদম্য উৎসাহে তন্ন তন্ন ক’রে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে একদিন একটা শুক্‌নো নদীর মুখ মিল্‌ল। পরিশ্রম বুঝি এবার সফল হয়। কিন্তু ও হরি, পা মেপে প্রথমে উত্তরে এগিয়ে তার পর পশ্চিমে বেঁকে তাঁরা দেখলেন সামনে একটা ছেড়ে অন্ততঃ ডজন খানেক পাহাড় রয়েছে! আর তার কোনটাই নেড়া নয়, সব গভীর জঙ্গলে ভর্ত্তি। যাই হোক্, সেই পাহাড়গুলির কোনটাই তাঁরা খুঁজতে বাকী রাখলেন না; কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই না করতে হ’ল! দিবারাত্র জঙ্গল সাফ করে, পাথর কেটে,

খাড়া পাহাড়ে ঘেরা কোকোস্ দ্বীপ

ডিনামাইট্‌ দিয়ে উড়িয়ে কত রকমে চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু গুপ্তধনওয়ালা গহ্বরের কোন হদিসই মিল্‌ল না। শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হয়ে হতাশ ভাবে তাঁদের ফিরতে হ'ল। ইতিমধ্যে আবার রাত্রে ছু'টি বিস্ময়কর ঘটনা ঘট্‌ল। কিছুর মধ্যে কিছু না—হঠাৎ কুকুরটা ভীষণ ভাবে ডেকে উঠ্‌ল আর ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল। ক্যাম্বেল্‌ আলো আর বন্দুক নিয়ে চারদিক্‌ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু মনে হ'ল, অন্ধকারে কে যেন তাঁর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—তাঁর প্রতিটি কাজ লক্ষ্য করছে। পর দিন রাতেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার। ক্যাম্বেল্‌ ও তাঁর সঙ্গীদের মনের অবস্থা তো বুঝতেই পার। এই দ্বীপে কত নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে তার তো ঠিক নেই। তার ওপর এই অলৌকিক ব্যাপার। অবশেষে বাধ্য হয়ে গুপ্তধনের আশা ছেড়ে তাঁদের ফিরতে হ'ল।

কিন্তু কোকোস্‌ দ্বীপের গুপ্তধনের আশা লোকে এখনও ছাড়তে পারে নি। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে নানা রকমে মাথা ঘামাচ্ছেন ব'লে শোনা যাচ্ছে,—বিশেষ ক'রে ভূতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা। তাঁরা এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী করিয়েছেন যা দিয়ে মাটীর নীচে সোনা-রূপা থাকলে যন্ত্রে তা ধরা পড়বে। এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কোকোস্‌ দ্বীপে অনুসন্ধান চলেছে। কে জানে কার কপালে কোন্‌ দিন সত্যি সত্যি ঐ যক্ষের ধনের ( অন্ততঃ কতকটাও ) জুটে যাবে!

---

# বংকুবাবুর ব্যতিক্রম

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্‌.এ, বি.টি

একটা না একটা বিশেষত্ব সব ব্যক্তিরই আছে—অন্ততঃ থাকাটা উচিত। কাজেই আমাদের বস্তিপাড়ার বংকুবাবুরও যে একটা বিশেষত্ব থাকিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। হ্যাঁ, সকলের মত ( কিংবা সকলের চেয়ে অন্য রকমের ) একটা কিছু বিশেষত্ব বংকুবাবুরও আছে, অর্থাৎ ঠিক যেই জন্যই বন্ধু-সমাজে তিনি সবিশেষ পরিচিত।



বাপদাদার আমল হইতে বংকুবাবুদের বাড়ীতে শাক্ত মতের প্রচলন। প্রসাদী পাঁঠার মাংস না হইলে মাস কাটে না, এমনি অবস্থা। অথচ সেই বংশের সন্তান হইয়াও বংকুবাবু যে নিষ্ঠাবান্‌ নিরামিষাশী হইলেন এ ব্যাপার অদ্ভুত হইলেও সত্য। বংকুবাবু তো বংকুবাবু—তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানায় কোন প্রকার আমিষের "প্রবেশ নিষেধ"। ঝি-চাকরেরাও এজন্য সহজে বংকুবাবুর বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়াইতে রাজী নয়। ভাগ্য ভাল যে সংসারে এক অনাথ ভাগিনেয় ব্যতীত বংকুবাবুর অপর কোন পোষ্যের বালাই নাই। বিবাহ তিনি এখনও করেন নাই এবং যেরূপ অবস্থার গতিক, তাহাতে করিবার বিশেষ ভাবনাও নাই। নিত্য সেই আলু আর কাঁচকলার ঘ্যাঁট সিদ্ধ করিতে কেই বা তাঁহাকে কন্যাদান করিবে?

কিন্তু বংকুবাবুর সেজন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। তাঁহার ও তস্য ভাগিনেয় ঘেণ্টুরামের নিত্যসাথী রামকানাই তাঁহাদের সমস্ত অভাব মিটাইয়া দিয়াছে। রামকানাইটি বংকুবাবুর খাস্‌ বাট্‌লার ( থুরি, পাচক ঠাকুর )। শ্রীমান্‌ রামকানাই বংকুবাবুর কম্‌বাইণ্ড্‌ হ্যাণ্ড্‌, একাধারে দুই—ঠাকুর ও চাকর; বাজার করা, হিসাব রাখা, এবং 'রসুই পাকান' সবই তার কাজ।

বংকুবাবু, নিরামিষ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর হইতে, এই সুদীর্ঘ সাত বৎসর রামকানাই-এর সযত্ন আওতায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ নিশ্চিন্ত আরামেই ভবিষ্যৎটা তাঁহার কাটিয়া যাইতে পারিত—

কিন্তু গোল বাধিল যখন হঠাৎ সেই রামকানাই কাজে ইস্তফা দিল। বলা নাই, কহা নাই, এত দিনের 'পুরাতন ভৃত্য' হঠাৎ কেন যে নোটিশ দিয়া বসিল তাহা মামা-ভাগিনেয় কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। অনেক সাধ্য সাধনায়ও কোন ফল হইল না। রামকানাইএর এক গোঁ—সে অনেক দিন নিরামিষ রাঁধিয়াছে, আর তাহার এ কাজ পোষাইবে না। এবার সে দেশে যাইবে—ব্যস্‌!

মোট কথা, বংকুবাবু এতদিনে বুঝিলেন ছোট লোকের ( অর্থাৎ ঠাকুর-চাকর ইত্যাদির ) বিশ্বাস নাই। নহিলে যে এত দিন নির্ব্বিবাদে তাঁহার নিমক খাইল সেই কিনা হঠাৎ—ইত্যাদি।

একদিন পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া সাত বৎসরের পুরানো লোক রামকানাই বংকুবাবুকে অকূলপাথারে ডুবাইয়া নিজেও ডুব মারিল। হয়তো দেশেই রওনা হইল, কিংবা হয়তো পাশের গলিতেই অপেক্ষাকৃত বেশী বেতনে বহাল হইল।

তা সে যাহাই করুক, বংকুবাবুকে যে অকূলে ডুবাইল ইহা নিঃসন্দেহ।

পাচক রামকানাই ছিল বংকুবাবুর ভাগ্যগগনের তুঙ্গী নক্ষত্র। হঠাৎ তাহার অন্তর্দ্ধানে বংকুবাবুর সমস্ত দিকেই অশুভ সূচনা দেখা দিল। রামকানাইএর রান্নাটা বিশেষ করিয়া বংকুবাবুর প্রিয় ছিল। রোজ নিরামিষ আহারেও তাই তাঁহার অরুচি ধরিতে পারে নাই। বাহিরের লোকে যাহাই ভাবুক, রামকানাইএর রান্নার গুণেই শত অসুবিধাকেও অগ্রাহ্য করিয়া এত কাল তাঁহার বহাল তবিয়তে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন?

সেই কথা লইয়াই এ গল্প। রামকানাইএর বিদায় লইবার পর তিন মাসে তের জন পাচক বহাল এবং বরখাস্ত হইল, কারণ ইহাদের কাহারও রামকানাইএর মত রান্নার হাত নাই। এই তিন মাসে বংকুবাবুর যেমন স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে বিড়ালের মত বেজায় খিটখিটে, তেমনি শরীর হইয়া উঠিয়াছে পাঁকাটির মত রোগা টিম্‌টিমে। যে আলু-কাঁচকলার ঘ্যাট নিত্য গলাধঃকরণ করিয়াও তাঁহার ইতিপূর্ব্বে কখনও অভক্তি জন্মে নাই সেই জিনিষই এখন পাতের কাছে পরিবেষণ করিবা মাত্র তিনি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। বেচারা পাচকের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মুণ্ডপাত করিয়াও ক্ষান্ত হ'ন না, হাতের কাছে যাহা পান তাহা দিয়াই এই মারেন তো এই মারেন অবস্থা। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় কোন লোকই তাঁহার জন্য আলু সিদ্ধ করিতে ধৈর্য্য ধরিয়া টিকিতে পারে না—ফলে এই তিন মাসে তের বার হাত বদল হইয়াছে।

প্রত্যেকেই বংকুবাবুর প্রীতিভাজন হইবার আশায় নিরামিষ পর্য্যায়ের নানা বিচিত্র সংযোগের পরীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু হায়, রামকানাইএর মত "মিষ্টি হাত" বুঝি কাহারও অদৃষ্টে নাই! ঘি, তেল, মসলার শ্রাদ্ধ করিয়াও বংকুবাবুর রসনার তৃপ্তিসাধন সম্ভব হয় না। এক সপ্তাহের বেশী আর কেহই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না—না বংকুবাবু নিজে, না তাঁহার পাচক গোষ্ঠি! অগত্যা বংকুবাবুকে চতুর্দ্দশ নম্বরের খোঁজ করিতে হয়।

চতুর্থ মাসে চৌদ্দ নম্বরে যিনি আসিলেন, তাহার নাম চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী। চন্দ্রকান্তের বয়স চব্বিশ—অতি সৎ অথচ চতুর বলিয়া সে বন্ধুমহলে সুপরিচিত। সুতরাং সহজেই আশা করা যায় যে চন্দ্রকান্ত অনায়াসেই 'হাতা'র গুণে বংকুবাবুকে হাত করিতে পারিবে।

'হইলও তাহাই। প্রথম দিনই তাহার রান্না ডাল্‌নায় রীতিমত গলিয়া গেলেন বংকুবাবু।

"আরে!" প্রথম গ্রাস মুখে পুরিয়াই সোল্লাসে বলিয়া উঠেন তিনি, "এ যে স্রেফ্ রামকানাই হে!" সাত বৎসরের স্মৃতি বংকুবাবুর সুখালস চিত্তে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ঠিক সেই স্বাদ, সেই গন্ধ, সেই স্পর্শ! "হ্যাঁ, এ পারবে।"

"নিরামিষ রান্নায় একটা আর্ট আছে হে, আর্ট আছে! ও সবার কর্ম্ম নয়।"—বন্ধুদের



কাছে নবনিযুক্ত পাচক চন্দ্রকান্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া মন্তব্য করেন তিনি। "তেল-মশলা তো সবাই ঢালে, কিন্তু হাতের গুণ কি সকলেরই থাকে?"

কিন্তু চন্দ্রকান্তর এই 'আর্টের' গোড়ায় একটু গোপন ইতিহাস আছে। এবার তাহাই বলি। বংকুবাবুর পাচকবিভ্রাটের সমস্ত ঘটনাই চন্দ্রকান্ত চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিল। চালাক লোক চন্দ্রকান্ত,—চাকুরী স্থির হইতেই বংকুবাবুর পয়লা নম্বর রামকানাইএর শরণ লইয়াছিল সে, এবং কথায় কথায় আলু-কাঁচকলার ঘ্যাটের গূঢ় রহস্যটি জানিয়া লইয়াই আসিয়াছিল। সুতরাং প্রথম পরিবেষণেই সে যে প্রভুর প্রাণ হরণ করিবে তাহা একটুও বিচিত্র নয়।

চন্দ্রকান্তের প্রতি বংকুবাবুর স্নেহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে বংকুবাবু ঠিক করিলেন, এইবার চন্দ্রকান্তকে একটু পুরস্কৃত করিবেন। পুরস্কারটা আকস্মিক ভাবে আসিলেই চন্দ্রকান্ত বোধ হয় খুসী হইবে বেশী।

সন্ধ্যার পর বংকুবাবু নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিলেন। উনানে কি একটা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে—একটা মিষ্টি গন্ধ সমস্ত জায়গাটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। চন্দ্রকান্তর হাতে খুন্তি, মুখে আত্মপ্রসাদ।

বংকুবাবু হাতের মুঠির মধ্যে চকচকে রৌপ্যখণ্ড দু'টির প্রতি একবার সহাস্যে চাহিয়া লইয়া দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করিলেন। হঠাৎ ও কি! চন্দ্রকান্তর পাশে টুক্‌রির মধ্যে থরে থরে সাজান ও কি! পেঁয়াজ আর রসুন বলিয়া বোধ হইতেছে না? কতক আবার সদ্য কাটা, চন্দ্রকান্ত যে তারই কতকগুলি লইয়া কড়াইএর মধ্যে ছাড়িয়া দিল! বংকুবাবু মুহূর্ত্তের জন্য একবার চোখ বুঁজিলেন। চোখ খুলিয়া দেখেন বিস্ময়ের বস্তু শেষ হয় নাই। অদূরে কয়েকটি অর্দ্ধভগ্ন ডিমের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে। নিকটে থালায় মশলা মাখা খানিকটা পাঁঠার মেটে, তার পাশে আর একটা কি যেন—বংকুবাবু ঠিক চিনিতে পারিলেন না।

"চন্দ্রকান্ত!"—জলদগম্ভীর স্বরে তাঁহার প্রশ্ন আসিল, "ওগুলো কি?"

ঘরের মধ্যে বাজ পড়িয়াছে। চন্দ্রকান্তর মাথাও চকিতের জন্য কেমন ঘুলাইয়া গেল—আমতা আমতা করিয়া সে কহিল—"আজ্ঞে, ওর মধ্যে একটু রামপাখীর ইয়ে—" পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কহিল, "আজ্ঞে, রামকানাইও তো ঠিক এই ভাবেই রাঁধত।"

"মানে?"

"মানে ঐ নিরামিষ ডালনা ও যা দিয়ে এতদিন পাকিয়েছে তাতে আলু-কাঁচকলা বাদ আর কিন্তু কোনটাই, ঠিক যাকে বলে নিরামিষ, থাকে নি। আর আপনিও নাকি এ সব দিলেই বেশী করে চেয়ে চেয়ে খেতেন—তাই আমিও—"

TIGHT BINDING

বংকুবাবুর মুখের প্রতি আর একবার চাহিয়া চন্দ্রকান্ত কথা শেষ করিতে পারে না। "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে" নীতি মানিয়া লইয়া সে একলাফে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া পড়ে—তার পর সোজা দৌড়।

চন্দ্রকান্ত চালাক লোক।

---

# ছবির কথা

[ ভারতীয় চিত্রশিল্প ]

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

নানা দেশ-বিদেশের চিত্রকলা সম্বন্ধে তোমরা হয়ত অনেক পড়েছ বা শুনেছ। এইবার তোমাদের কাছে ভারতীয় চিত্রশিল্পের কথা কিছু বলব। একটা কথা জানিয়ে রাখলে বোধ হয় ভুল হবে না যে এই ভারতীয় চিত্রশিল্পের নয়া সংস্করণ মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের মত, এবং তার প্রথম ভিত-পত্তন হয়েছিল শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের হাতে।

তোমাদের জানা আছে—ইতিহাসেই পড়েছ—যে, অতীত ভারত সর্ব্বসংস্কৃতির আদর্শস্থল ছিল। বেদ, উপনিষদ্, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, কলা, সঙ্গীত, নৃত্য—সর্ব্বশাস্ত্রেই গভীর অনুরাগ ছিল তখনকার ভারতীয়দের। তার পর বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কৃতিও বিস্তার লাভ কর্‌তে থাকে।

ভারতের মত ইউরোপে তখন গ্রীস্ রাজ্যও উন্নতির চরম শিখরে। সক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি মহাপণ্ডিতেরা তখন জন্মেছেন। শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ ভেনাসের মত অপরূপ প্রেমময় মূর্ত্তি, হারকিউলিসের মত পুরুষের পরিকল্পনা তখন হয়েছে। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-অভিযানের পর এই গ্রীক্ সংস্কৃতির ঢেউ ভারতেও এল, ফলে গ্রীক্-ভারতীয় সংমিশ্রিত এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি হ'ল।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের অনেকে স্থির করলেন তাঁকে বিশ্বসমক্ষে স্মরণীয় ও বরণীয় করবার জন্য মঠ বা বিহারগুলোতে রং-তুলির



সাহায্যে সমগ্র বুদ্ধচরিত ও জাতকের গল্পাংশ চিত্রিত করবেন। সেই মত তাঁরা কার্য্যে ব্রতীও হয়েছিলেন বিস্তৃতভাবে। সুদূর জাপান, চীন, মালয়, শ্যাম, বোর্ণিও, সুমাত্রা, বালি, কম্বোজ, সিংহল, নেপাল, তিব্বত এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের সুমহান্ প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হয়েছিল। বৌদ্ধযুগীয় শিল্পনমুনা যে-সব স্থানে বেরিয়ে পড়েছে—অর্থাৎ অজণ্টা, ইলোরা, এলিফেণ্টা, বাগগুহা প্রভৃতিতে, তা যদি তোমাদের কেউ ভাল মত দেখে থাক তবে একটা প্রশ্ন নিজেকেই নিজে করে বস্‌বে যে, মূর্ত্তিগুলোর দেহানুপাত যেন সঠিক নয়, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কিছু অস্বাভাবিক রকমের সরু ও লম্বা, না-খেতে-পাওয়া দেহ, বড় বড় কেমন চোখ, বিসদৃশ নাক আর মুখ—এমনি কত কি! তোমাদের এ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর আছে। বৌদ্ধরা ছিলেন ধর্ম্মপ্রবণ, সুতরাং তাঁদের অঙ্কিত চিত্রসম্ভার যে অতিমানব বা দেবদেবতার মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাবে তাতে সন্দেহ নেই। বড় হয়ে যখন মহাকবি কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ পড়বে তখন দেখবে তাতে দেবতা (এবং মানুষেরও) রূপবর্ণনা অতি সুন্দর ভাবে দেওয়া আছে,

ভারতীয় চিত্রশিল্পের একটি নমুনা :
রাণীর প্রসাধন ( অজণ্টা )

কপাটবক্ষ, চম্পকঅঙ্গুলি, হরিণনয়না, কাদম্বরীসদৃশ কুন্তল, সিংহকটি, কদলীবৃক্ষবৎ উরু ইত্যাদি অনেক দেহগত উপমার কথা তাতে দেখবে। প্রকৃতি ও জীবজগতের যে সব সুন্দর বস্তুর সঙ্গে মানুষের দেহের সাদৃশ্য রয়েছে তাকেই সরাসরি টেনে আনা হয়েছে অতিমানব বা দেবতার দেহে,—কল্পনার দৌড়টা দেখ!

কাব্যজগতের মত চিত্রজগতেও হয়েছে ঠিক তাই। কাব্যপ্রাপ্ত উপমাগুলো চিত্রের দেবদেবতার মূর্ত্তির ভিতরই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিষয়-বস্তু মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গীর মধ্যে, হস্তপদের মুদ্রায়, চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

বৌদ্ধযুগের শেষে মোগল-পাঠানের যুগ। বৌদ্ধযুগীয় শিল্পকলা হ'তে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যায় হচ্ছে এই যুগের শিল্পকলা। বলতে গেলে মোগলাই আর্টের মূল প্রেরণা এসেছে সুদূর তুরস্ক ও পারশ্য থেকে। তোমরা জান মুসলমানেরা এই সব অঞ্চল থেকেই ভারত অভিযানে বহির্গত হন। দেশ জয়ের পর তাঁদের দেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সর্ব্বস্থানে প্রসার লাভ করে, ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতির মিলন ঘটে। 'ইণ্ডো-পার্শিয়ান্' কথাটার উৎপত্তি এই ভাবে। এই ইণ্ডো-পার্শিয়ান্ ধরণে চিত্র আঁকা ছাড়াও সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্যেও মোগল আর্টের সৃষ্টি হয়েছে। আবার একে অনুসরণ ক'রে আর এক জাতের চিত্রকলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে-ছিল—যা রাজপুতিয়ান বা রাজস্থানী বলে খ্যাত। এগুলিতে রাজা-রাজড়াদের চিত্র, শিকার-কাহিনীর নমুনা, রাধা-কৃষ্ণ-গোপিনীদের বিরহ-মিলন এই সবই বেশী। কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আর্ট গ্যালারিতে এই ধরণের অনেক ছবি দেখতে পাবে।

পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের একটি নমুনা:
মায়ের কোলে যীশু ( র‍্যাফেলের আঁকা )

বাবর থেকে আরম্ভ করে আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, প্রত্যেকেই ছিলেন ভাল চিত্র-সমজদার, এবং তাঁদের প্রত্যেকেরই দরবারে দু'একজন করে রাজশিল্পী



উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাতা ছিল। আওরঙ্গজীবের পর হ'তে এ মোগলাই আর্টের পতন আরম্ভ হয়। তার পর ইংরেজদের আগমনের ফলে দেখা দেয় পাশ্চাত্য শিল্প, যদিও তার মূলে রয়েছে উপরোল্লিখিত গ্রীসিয়ান্ আর্টের প্রভাব। এই পাশ্চাত্য শিল্পকে 'ফাইন আর্টস্' বলা হয়। প্রকৃতি কিংবা কোন প্রাণীকে দেখে হু-বহু অথবা সেই রকম করে আঁকাই হ'চ্ছে এ আর্টের সার্থকতা। কতকগুলো ছবিতে তাদের কল্পনার প্রসারতা আছে বটে কিন্তু সে হচ্ছে তাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্তর্গত।—যেমন যীশুর সমগ্র জীবন-চরিতের চিত্রাবলী, জুপিটর, ভেনাস দেবীর ইতিকথা, ম্যাডোনা, আদম ও ইভের সৃষ্টি-রহস্য, খৃষ্ট-বিরোধীদের অত্যাচারের নানারূপ দৃশ্য, স্বর্গের দেবদূত বা এঞ্জেল—এমনি অনেক।

সমগ্র ইউরোপ চতুর্দ্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি অবধি শিল্পচর্চ্চায় অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে, যখন মাইকেল এঞ্জেলো, দা-ভিঞ্চি, র‍্যাফেল, ভ্যান্ দাইক প্রভৃতির মত সুবিখ্যাত শিল্পীগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদেরই অঙ্কিত চিত্রের ব্যাপকতা ইংরেজ আমলে ভারতের ঘরে ঘরে প্রাধান্য লাভ করতে লাগ্‌ল। ভারতীয় শিল্পীরা ঘটা করে রং-তুলি নিয়ে সেই সমস্ত পাশ্চাত্য চিত্র দেখে হাত মক্‌স করতে বসে গেলেন। জাতীয় শিল্পকলা বলে ভারতে তখনও যতটুকু অবশিষ্ট ছিল এইবার তা' চিরতরে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। রবিবর্ম্মার ছবি হয়তো তোমরা দেখে থাকবে। এই রবিবর্ম্মাই ছিলেন ভারতে ফাইন আর্টসের অগ্রদূত। অনুকরণ তিনি করেছেন সত্যি, কিন্তু তার ভেতর নিজস্বতার অভাব ছিল না। এর পরেই পুরোদস্তুর ভাবে সর্ব্বভারতে ফাইন আর্টের চর্চ্চা হ'তে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তা হীন পর্য্যায়ে নেমে আসে। শিল্পকলা যদি কেবলমাত্র ব্যবসায়ের খাতিরে ব্যবহৃত হয় তবে তার মূল্য থাকে না, ভারতের এমনি দুর্দ্দিন এল শিল্পের জগতে। বিদেশীয় বণিকেরা এ সুযোগ অবহেলা করলে না। ভারত ধর্ম্মের দেশ; এরই সুযোগ নিয়ে তারা নানা প্রকার দেবদেবতার ছক্ এঁকে দেশে পাঠিয়ে নানা রঙের জৌলুষ মাখিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে লাগ্‌ল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এ কাণ্ড চল্‌ল, তার পর নূতন

যুগ-সন্ধিক্ষণে নূতনের আবির্ভাব ঘটল। দেশীয় মনীষীদের প্রচেষ্টায় এই সময় পুরাতত্ত্ববিভাগ স্থাপিত হ'ল। এর কাজ হ'ল ভারতের সর্ব্বস্থানে প্রাচীন যুগের কীর্ত্তিকলাপ সন্ধান। ফলে আবিষ্কৃত হ'য়ে পড়্‌ল—কত ভাস্কর্য্য, কত মন্দির, কত দেবমূর্ত্তি, কত চিত্রকলা, স্তম্ভ, বৌদ্ধবিহার।

অবনীন্দ্রনাথ তখন পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণ করে হাত পাকাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, নানা দেশের ছবি সংগ্রহ কর্‌তে অত্যন্ত ব্যস্ত। হঠাৎ তাঁর ভেতর নিজস্বতা দেখা গেল। তখনকার কলকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এবং লর্ড কার্জ্জনের সহায়তায় অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কলকাতা মিউজিয়াম্ তখন ছিল বিলাতি তৈলচিত্রে পূর্ণ, হ্যাভেল সাহেব তাদের সরিয়ে মোগল ও রাজস্থানী চিত্রদ্বারা সুশোভিত করে তুল্‌লেন। তিনি অবসর নিলে অবনীন্দ্রনাথ, ভারতীয় রীতিতে ছবি আঁক্‌বেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁর স্থানে আসীন হলেন এবং তাঁরই কাছে নন্দলাল বসু, ৺সুরেন্দ্র গাঙ্গুলী, অসিত হালদার, মুকুল দে, ভেঙ্কটাপ্পা, হাকিম মহম্মদ, সামি উজ্জমা প্রভৃতি শিল্পীরা প্রথম শিক্ষা পেলেন। অধুনা তাঁদেরও শিষ্য-প্রশিষ্যেরা চিত্রজগতে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

এই ত গেল ভারতীয় শিল্পের গোড়ার কথা, এখন একটা কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব। সেটা হ'চ্ছে এই,—ভারতীয় চিত্রকলার পরমায়ু ত বেশী নয়, মোটে ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছরের মত। এত অল্প কালের ভেতর ভারতে—এমন কি সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সুনাম অর্জ্জন—কম কথা নয়। তবু দুঃখ এই, এই ভারতেই এমন একদল লোক এখনও আছেন যাঁরা ভারতীয় শিল্পকলার নাম পর্য্যন্ত শুন্‌তে পারেন না। অনেক সময় নাসা কুঞ্চিত করে বলে থাকেন: 'হাত পা সরু সরু, সাত দিন না-খেতে-পাওয়া রুগীর মত প্যাঁকাটে শরীর, অষ্টাবক্র মুনির মত ভঙ্গী, এ সব কি আবার আর্ট? এই যদি ভরতীয় চিত্রের নমুনা হ'য় তবে তার ভেতর আমরা নেই।' আসল কথা হচ্ছে, যে ধারা বা নীতির ওপর ভারতীয় চিত্রের আঙনে কাজ চল্‌ছে তা তাঁরা ভেবে দেখেন না।



অক্ষমের হাতে পড়ে সময় বিশেষে কিছু কিছু ত্রুটী-বিচ্যুতি সব জিনিষেরই হতে পারে কিন্তু তারই দোহাই দিয়ে জাতীয় শিল্পকলার ওপর বিতৃষ্ণা দেখান উচিত নয়।

---

# আসামে ঘড়িয়াল শিকার

[ শিকার-কাহিনী ]

শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত

দূরে আব্‌ছা গারো পর্ব্বত। কত শত গুহা, গহ্বর নির্জ্জনে হয়ত পড়ে আছে! কত শত ঝরণা কল কল করে ছুটে চলেছে কত শত ফুট নীচে! তার পর ক্রমে সব এক হয়ে সৃষ্টি করেছে জিঞ্জীরাম নদী। ক্রমে সে বড় হয়ে গেছে। কত গভীর! কত চওড়া! ভীম বেগে কত বড় বড় গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে ঢেলে দিচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বুকে! অসংখ্য ছোট বড় মাছ গভীর জল থেকে পাকের ওপর ভেসে উঠছে থেকে থেকে। মাছের লোভে প্রায় সারাটা নদী যুড়ে ঘড়িয়াল আর গভিয়ালগুলো জলের নীচে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। কখনও হয়ত কিছু তফাতে তফাতে দু'তিনটী জলের ওপর ভেসে চলেছে। কোথাও বা দুপুর রোদে চরাতে পড়ে আছে।

সে আজ চার-পাঁচ বছর আগেকার কথা। বিকেলে বাংলোর বারান্দায় বসে আছি। অজস্র লোক বাজার করে ফিরে চলেছে নিজ ঘরে। তাদের মধ্য থেকে দু'জন দরিদ্র বলিষ্ঠ মুসলমান এসে বল্লে, 'বাবু, আউজ্‌কা হকালে বড় ঘৈড়ালট ঠিক আগের জায়গায় আরও এউগ্যা হালের গরু মাইরা ফেলাইছে। বাবু, এ বিপদ্ থনে আমোগ রক্ষা করেন।'

বাবার আর যাওয়া হ'ল না। তিনি ব্রাঞ্চ ফরেষ্ট অফিসগুলো ইন্‌স্‌পেক্‌শন্ করতে চলে গেছেন। অগত্যা—পরদিন আমি আর গারো ফরেষ্টার মিঃ বীরেল

থাংমা দু'টো বন্দুক নিয়ে সকাল আটটায় বেরিয়ে গেলাম। সঙ্গে গেল সেই মুসলমান দু'টি। নদীতে তখন কিছুটা জল বেড়েছে।

নদীর পারে পারে কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, তীরে আমাদের জন্য দু'টো শক্ত ডিঙ্গি নৌকো বাঁধা রয়েছে। আমরা উঠতেই তীরবেগে ডিঙ্গি আমাদের নিয়ে স্রোতের সাথে সাথে ছুটে চল্‌ল। দু'টো ডিঙ্গিতে দু'জন শিকারী। দু'জনেই অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি জলের দিকে। তিন-চার ঘন্টা পর আমরা বেকা বাঁকের কাছাকাছি এলাম। এখানে উভয় তীরে জলের কি ভীষণ স্রোত আর পাক! কিন্তু মাঝখানে জল কি সুন্দর শান্ত! ঠিক যেন মাকাল ফল। বাঁ দিকে গারোপর্ব্বতের শেষ প্রান্ত। চূড়ায় গাছপালায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে আছে শাখামল বাবার পরিত্যক্ত পুরোন মস্‌জিদটা।

ডিঙ্গি থেকে নেমে সারাদিন নদীর তীরে ঝাউগাছের নীচে আত্মগোপন করে বসে রইলাম। কিন্তু ঘড়িয়ালের দেখা নেই। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিন কাবার হয়ে গেল। আকাশে জ্বলে উঠল অসংখ্য তারকা; সামনে অসংখ্য জোনাকী। অনতিদূরে বনের ভেতরে থেকে থেকে হরিণ অনেকক্ষণ ধরে ডেকে যাচ্ছিল। সঙ্গে খাবার ছিল, তাই খেয়ে নিলাম। জায়গাটায় শুধু জলে কুমীর নয়, ডাঙ্গায় বাঘ এবং বুনো শূয়োরের ভয়ও আছে। ঘুম প্রায় হ'লই না।

তখন সকাল প্রায় ন'টা হ'বে। আছমত্‌ আলী এসে সজোরে আমাকে ঠেলতে সুরু করে দিল। আমিও থতমত খেয়ে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আছমত্‌ আলী বনের ফাঁক দিয়ে দেখিয়ে দিল, 'ঐ যে!' কিন্তু ওটা যে জীব তা আমার মোটেই বিশ্বাস হ'ল না। সে কি ভীষণ মাথা!

তীর থেকে এক হাত নীচেই দীর্ঘ কিন্তু অপ্রশস্ত চরা,—দূর্ব্বাঘাস আর বেঁটে বেঁটে ঝাউগাছে সমাচ্ছন্ন। এই চরা থেকে আবার আর একটী অনতিদীর্ঘ শাখা-চরা ক্রমে সূক্ষ্ম হয়ে সোজা বেরিয়ে গেছে নদীর মাঝের দিকে। কিন্তু ঝাউগাছগুলো ওখানে কিছুটা দীর্ঘ বলেই মনে হ'ল। ঠিক এই শাখাটার অগ্রভাগে সেই অতিকায় ঘড়িয়ালটী জল থেকে শুধু মাথাটা বের করে বসে ছিল। মিঃ থাংমা বড় চরাটার ওপর উপুড় হয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরলেন। আর আমি শাখা-চরাটাতে ঝাউগাছের নীচ দিয়ে নত হয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চল্‌লাম। শিকার পাল্লার ভেতর আস্‌তেই শুয়ে পড়ে যেমনি বন্দুকের ঘোড়া টিপলাম, অমনি ঘড়িয়ালটী জল আলোড়িত করে চকিতে জলের ভেতর চলে গেল। নিজের ওপর ভারী রাগ হ'ল। আমার বোকামিতেই সে চলে গেছে।



দশ পনের মিনিট পর থাংমা শীষ্‌ দিয়ে উঠলেন। চেয়ে দেখি ঘড়িয়ালটী মাঝ নদী ছাড়িয়ে একেবারে পাল্লার অনেক বাইরে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর কিছু সময় নিঃশব্দে বসে রইলাম। কিন্তু তবুও আর কাছে এল না। অগত্যা আবার গুলি ছুঁড়লাম। কিন্তু গুলি প্রায় এক হাত তফাতে পড়ল। সে আবার ডুব দিল। এবার দুজনে দুটো ভোরা নিয়ে দু'দিক্‌ থেকে এগুলাম, কিন্তু নৌকা নিলাম না; কারণ ডুবে যাবার ভয় আছে। এবার সে যদিও ভেসে উঠল, কিন্তু ভোরা দেখে ক্রমে ডুবতে সুরু করে দিল। সাথে সাথে দু'টো বন্দুক দু'দিক্‌ থেকে গর্জ্জে উঠল 'গুড়ুম্‌ গুড়ুম্‌'। কিন্তু গুলি লাগল না। তার পর নতুন চেষ্টা। থাংমা ওপারে আর আমি এপারে আত্মগোপন করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। আধ ঘণ্টা চলে গেছে। ঘড়িয়ালটা ঠিক মাঝ নদী ছাড়িয়ে প্রায় আমার পাল্লার ভেতর আবার ভেসে উঠেছে। মনে সন্দেহ রইল, তবুও যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার হাতের বন্দুক ডেকে উঠল 'গুড়ুম্‌'। থাংমা অপর পার থেকে চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন; অপর সাথী দু'জন 'লাইগা গেছে, লাইগা গেছে' বলে মহানন্দে লাফিয়ে উঠল। গুলি খাওয়ার সাথে সাথে ঘড়িয়ালটা জল কাঁপিয়ে সশব্দে ডুব দেওয়া মাত্র একজন ভোরায় চড়ে ভাটীতে ছুটে চল্‌ল। অপর মুসলমানটী ভীষণ লম্বা গুণে বাঁধা একটী তীক্ষ্ণ বর্শা হাতে বাম তীর থেকে প্রায় হাত পঁচিশেক দূরে অপর একটী ভোরার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। ডান তীরে বন্দুক হাতে থাংমা রইলেন নৌকার ওপর আর আমি নদীর মাঝখানে আর একটী ভোরা নিয়ে নিশ্চল গভীর জলের ওপর ঘুরতে সুরু করে দিলাম। আহত ঘড়িয়ালকে কে প্রাণে বধ করে নাম করবে এই হ'ল সকলের চিন্তা। তাই জল থেকে আর কারও দৃষ্টি ওঠে না।

বেলা প্রায় দু'টো হয়ে গেল, কিন্তু ঘড়িয়ালের সঙ্গে আর মোলাকাৎ হ'ল না। প্রায় সাড়ে তিনটায় দেখি, আছমত্‌ আলী ভেলাটাকে বর্শার দড়ি দিয়ে

বেঁধে তীর দিয়ে জোরে হেঁটে আসছে। ভাঙ্গা বর্শাটা শুধু ভেলার ওপর পড়ে আছে। বর্শার এই অবস্থা দেখেই আমি ব্যাপার বুঝে নিলাম। আহত হয়ে পালাবার সময় হয় ঘড়িয়ালেয় শুঁড়ে লেগে কিংবা তার লেজের প্রচণ্ড ঝাপটায় এই কাণ্ডটি হয়েছে।

কিছু দিন পর শোনা গেল যে গুলিবিদ্ধ একটা মৃত ঘড়িয়ালকে জেলেরা প্রদ্যোৎনগরের কাছে পেয়েছিল, ওরা নাকি সেটা পঞ্চাশ টাকায় বেচে দিয়েছে।

---

# মুসারের দান

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন আগেকার কথা।

ব্যাবিলন দেশে এক সম্রাট্‌ ছিলেন, তাঁর নাম মুসার। যেমন তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, তেমনি ধনদৌলত। রূপসী, রূপবান্‌দের বড় আদর সম্রাটের কাছে। তাঁর অযাচিত দানে তাদের রূপ যেন আরো বেড়ে উঠত। রাজার দিয়েই তৃপ্তি। সম্রাটের সভায় ছিল কবির দল। তাঁরা গান লিখতেন, পেতেন প্রচুর ধন-রত্ন। সে কবিতা, সে গান নাই বা কারো ভালো লাগল, তবু গান আর কবিতার মর্য্যাদা তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। ফকিরদের ডেকে তাঁদের কাছে তিনি শুনতে চাইতেন তত্ত্বকথা। সে কথায় যুক্তি না থাকলেও সম্রাট্‌ তা শুনতেন; শুনে তাঁদের ধনদৌলত দিতেন।



সম্রাটের দয়া-দাক্ষিণ্যের কাহিনী দিকে দিকে প্রচারিত হ'ল।

একদিন সকালে ব্যাবিলনের প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে চলেছেন সম্রাট্‌ মুসার। পথে চলেছিল সদাগরের গাড়ী—কোন গাড়ীতে কমলালেবু, কোন গাড়ীতে লাল, হলদে গোলাপ ফুল, স্তূপীকৃত হয়ে চলেছে। পথে লোকের ভিড়—তাদের গায়ে নানা পোষাক,—নীল, লাল, সবুজ। সকালের রৌদ্র পড়ে পোষাকের সে রঙ দিকে দিকে যেন বর্ণরশ্মির পিচ্‌কিরি ছুঁড়ছে। ছেলেমেয়ে—তরুণ-তরুণীর দল পথের ধারে বাগানে ফুল তুলছে, সেই সঙ্গে সুরু করেছে প্রাণের আনন্দে কলরব—গান।

ফুলের এই বর্ণগন্ধ, বাতাসে এই সুরের ছন্দ·········সম্রাট্‌ খুশীমনে বললেন,—'খাসা! চমৎকার! পৃথিবী এমন সুন্দর!

হঠাৎ সম্রাট্‌ দেখেন, সামনে একটি চার-পাঁচ বছরের মেয়ে—মুখখানি যেন টাটকা গোলাপ ফুল;—মুখের মধ্যে আঙুল পুরে মেয়েটি সম্রাটের লম্বা সাদা দাড়ির পানে তাকিয়েছিল; ভাবছিল হয়তো বা ঐ দাড়ির ঝোপে কত জন্তু-জানোয়ার-পাখী আছে লুকিয়ে!

মেয়েটি দেখতে যেন পরী! সম্রাটের ভালো লাগল মেয়েটিকে। আদর ক'রে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে তিনি তার দু'হাতে দিলেন দু'টি সোনার মোহর।

সম্রাট্‌ চলেছেন পথে। আরো খানিক এসে দেখেন একটি ছেলে,—ছেলেটির বয়স বছর দশেক। ছেঁড়া ময়লা পোষাক গায়ে, মুখে-চোখে কালি। সম্রাট্‌কে দেখে ছেলেটি হাত বাড়াল, মিনতি-ভরে বললে,—'মায়ের অসুখ। আমরা দু'ভাই; আজ তিনদিন পেটে আহার জোটে নি সম্রাট্‌···'

সম্রাট্‌ মুসার তার পানে চাইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করে তার হাতে দিলেন একটি মোহর।

সম্রাট্‌ চললেন পথে। আরো খানিক দূর এসে দেখেন, এক ভিখারী। বয়স হয়েছে,—খোঁড়া, বিশ্রী, বীভৎস বেশ, কদর্য্য মূর্ত্তি। ভাঙ্গা গলায় সে চাইল ভিক্ষা, 'কাজ করবার শক্তি নেই হুজুর, দয়া করুন জাঁহাপনা······"

সম্রাট্‌ তার পানে চেয়ে ক্ষণকাল দাঁড়ালেন। তার নিঃশ্বাসে কেমন দুর্গন্ধ! নাকে রুমাল চাপা দিয়ে সম্রাট্‌ পাঁচ-সাত পা সরে' গিয়ে পিছন পানে বুড়োর উদ্দেশ্যে ফেলে দিলেন একটা রূপোর টাকা। বেঁকে শুয়ে ভিখারী সে টাকা কুড়িয়ে নিলে পথ থেকে।

আরো খানিকটা পথ এসে সম্রাট্‌ দেখলেন, এক নারী। তার বয়স বোঝা যায় না। নারীর বুকে এক শিশু। শিশুর ঘা দেখে শিউরে শিউরে সম্রাট্‌ দু'চোখ বুজে সরে এলেন। পিছনে জানাল সেই নারীর মিনতি-ভরা কণ্ঠ,—"দয়া হোক্‌ জাঁহাপনা······"

অনেক দূর এগিয়ে এসে সম্রাট্‌ ফেলে দিলেন নারীর দিকে একটা তামার পয়সা।

আরো কয়েক পা এগিয়ে সম্রাট্ দেখেন, পা-কাটা এক ভিখারী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে গান গাইছে। কবি হোমারের লেখা গান; গানের ভাষায় ভালোবাসার গভীর আবেগ—গানের সুরে কত ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, চাঁদের আলো বয়ে চলেছে……

সম্রাট্ মুসার দাঁড়ালেন, লোকটির পানে তাকালেন, যেন মাংসপিণ্ড! দেখলে মন ঘৃণায় রী-রী করে ওঠে। সম্রাট্ দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চলে এলেন……পথের বাতাস অসহ্য ভারী বোধ হ'ল। সম্রাট্ ভাবলেন—'বড় নোংরা পথ। এ পথে মানুষ চলতে পারে না।'

সম্রাট্ ফিরে এলেন প্রাসাদে। এসে উজীরকে ডেকে বললেন—"তুমি নিজে একবার পথে যাও। দেখবে, পথে কুয়োর ধারে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে এক খোঁড়া ভিখারী গান গাইছে। কবি হোমারের লেখা গান। গিয়ে তাকে দেবে এই একটি মোহর। আরো এগিয়ে পথে দেখবে এক স্ত্রীলোক—তার কোলে একটি শিশু। তাকে দেবে দু'টি মোহর। আর দেখবে একজন বুড়ো ভিখারী—তাকে দেবে তিনটি মোহর।"

এর পর থেকে সম্রাট্ মুসার নিত্য পথে বেরোন, তাঁর সঙ্গে চলে একজন নফর। ভিখারীদের সে দেয় পয়সা-টাকা-মোহর—সম্রাট্ যাকে যা দেবার হুকুম দেন।

দানে সম্রাটের হাত দিনে দিনে মুক্ত হ'ল। তাঁর দানে ব্যাবিলনে দীন-দুঃখীর দৈন্য-দুঃখ গেল ঘুচে। দিন দিন প্রাসাদের সামনে ডাক পড়ে—"কোথায় কে আছে টাকার প্রত্যাশী, খাদ্যের প্রত্যাশী, এস।"……

দলে দলে লোক আসে। সম্রাট্ থাকেন এধারে ওধারে। তাঁর আদেশে ভিখারীদের দান করা হয়—পয়সা, টাকা, মোহর, চাল, ডাল, গম।

সম্রাট্ তৈরী করিয়ে দিলেন ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ীর জন্য বিনা-পয়সার দাওয়াইখানা। যেখানে যত ছিল অন্ধ, আতুর, পীড়িত, সকলে এসে সেখানে নিলে আশ্রয়।

সম্রাট্ তাঁর ধনদৌলত দিলেন দুঃখীর দুঃখমোচনে বিলিয়ে। শিল্পের শ্রীসম্পাদনে সম্রাটের তোষাখানা রাখলেন উন্মুক্ত, কবির পূজায় ব্যয়িত হ'ল ধনরত্ন।

পথে বেরুলে কৃতজ্ঞ দীন-দুঃখী সম্রাটের চারিদিকে এসে জড় হয়—সকলে মিলে জয়ধ্বনি করে। সম্রাটের ভাল লাগে না এ কলরব। তিনি বিরক্ত হন, বলেন—"আমার আছে, তাই দিয়েছি ধন। তোমাদের নেই, তোমরা নিয়েছ ধন। এত বাড়াবাড়িটার কি দরকার?"

এমনি করে দিন যায়। ব্যাবিলনের ইতিহাস সম্রাট্ মুসারের দানের কাহিনীতে ভরে ওঠে। কবি লেখে দানের কথা, দার্শনিকের দল দান-তত্ত্বের মহিমা প্রচার করে।



অবশেষে একদিন সম্রাট্ মুসারের ডাক এল। তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। সারা ব্যাবিলন চোখের জলে তাঁর কবরের মাটি দিলে ভিজিয়ে।

সম্রাটের আত্মা এল ওরমুজের সামনে; কাজের বিচার করেন ওরমুজ।

ওরমুজ প্রশ্ন করলেন—"পৃথিবীতে কি তুমি করেছ? তোমার কাজের হিসাব দাও।"

বিনয়-নম্র বচনে মুসার বললেন—"আমি দুর্ব্বল মানুষ। ললিতছন্দে, বিচিত্র মনোহর বর্ণে, গন্ধে-রূপে-রসে আমি প্রচুর আনন্দ লাভ করেছি প্রভু! সুন্দর দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সুন্দরের উপাসনা করেছি চিরদিন। তবু তারই মধ্যে তৈরী করিয়েছি আতুরাশ্রম, দাওয়াইখানা। দীন-দুঃখীকে অকাতরে দান করেছি—পয়সা-টাকা-মোহর। আমার তোষাখানা থেকে পনেরো আনা করেছি দান, এক আনা মাত্র রেখেছি নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য।"

এ কথা শুনে ওরমুজ বললেন,—"হুঁ, তুমি লোকটি মন্দ ছিলে না। লোকের দুঃখে তোমার মনে বেদনা জাগ্ত। তবু তোমাকে স্বর্গে আসতে দিতে পারলাম না বাপু! তোমাকে আবার মর্ত্ত্যে ফিরে যেতে হবে। এখনও তোমাকে বহু শিক্ষা, বহু প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

মুসার বিস্মিত হলেন, বললেন—"কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রভু?"

ওরমুজ বললেন—"নিজের মনকে প্রশ্ন কর মুসার। ওদের দেখবামাত্র তোমার মনে জেগেছিল বিরক্তি আর বিস্ময়। তোমার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে এত ব্যথা মানুষ পায়! ওদের সে কদর্য্য মূর্ত্তি তোমার চোখে বিঁধেছিল সূচের মত—ওদের পানে ঘৃণায় তুমি চাইতে পার নি। ঘৃণাভরে ওদের দিকে ক'টা পয়সা ফেলে দিয়ে তুমি দানের মহিমায় পুণ্য সঞ্চয় করতে চেয়েছিলে। সে দানের সঙ্গে তোমার সমবেদনার বা প্রীতির যোগ ছিল না। তাদের দুঃখে দুঃখ বোধ ক'রে তুমি ওদের দৈন্য-দুঃখ মোচন করতে পার নি। ওদের দুঃখ-দৈন্য ঘুচলে তুমি দুঃখ-বেদনা পাবে না—এই কথা বুঝে বুঝে তোমার দানের হাত মুক্ত হয়েছিল। সত্য ক'রে বল দেখি, যে দিন সেই বুড়ো ভিখিরী, সেই শিশু কোলে নারী, হাত-পা-কাটা গায়ক ভিখারীকে দেখেছিলে, সে দিন তোমার মনে কি অনুভূতি জেগেছিল?"

মুসার বললেন—"মানুষের বেদনা দেখে আমার মনে জেগেছিল অনুকম্পা।

ওরমুজ বললেন—"মিথ্যা কথা। তোমার এ দানের অন্তরালে ছিল মনের বিরূপতা।"

মুসার বললেন—"কিন্তু সব দীন-দুঃখীর ওপর আমার বিরাগ জাগে নি প্রভু। মানুষের চিরশত্রু যে দুর্ভাগ্য, সেই দুর্ভাগ্যের ওপর জেগেছিল আমার বিতৃষ্ণা।"

ওরমুজ বললেন—"তোমাকে আবার ফিরতে হবে মুসার। আমি নিরুপায়।"

TIGHT BINDING

সঙ্গে সঙ্গে মুসারের চোখের সামনে থেকে সব ছায়ায় মিলিয়ে গেল—শুধু অন্ধকার—অন্ধকার!

পরজন্মে মুসার জন্ম নিলেন এক মিস্ত্রীর ঘরে।

অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটল। শাসন আর প্রহারের সীমা ছিল না। গরীবের ঘরে যে ক'টি গুণ দেখা যায় তার সব গুণগুলি ছিল মুসারের। অর্থাৎ মুসার ছিল সাধু, মনে দর্প-অহঙ্কার-বোধ ছিল না, আর ছিল না শিক্ষার অহমিকা।

যথা সময়ে মুসারের বিবাহ হ'ল। দু'টি ছেলে হ'ল। মুসারের কাজ মেলে না, সংসারে দারুণ অভাব। স্ত্রী ও ছেলে দু'টি অভাবের তাড়না সয়ে বাঁচতে পারল না; অকালে তাদের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হ'ল। তার পর একদিন ভারায় উঠে কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ মুসার গেল পড়ে—ফলে দু'খানি পা গেল জন্মের মত এবং একখানি হাত হ'ল পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

ভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না। প্রথম প্রথম ভিক্ষা চাইতে লজ্জা হ'ত—ক্রমে মৃদুকণ্ঠে ভিক্ষা চাইত। যদি কেউ সে প্রার্থনা শুনে কিছু দিত, ভালো, না হলে দ্বিতীয়বার মুখ তুলে ভিক্ষা চাইবে—মুসার তা পারত না।

ক্রমে হাত পেতে ভিক্ষা চাইবার অভ্যাস হ'ল। ভিক্ষা যা মিলত তা'তে কোন মতে অন্নের সংস্থান হতে লাগ্‌ল।

দুনিয়ার কোন কিছুতে রুচি ছিল না। মানুষ আনন্দ তবু চায়। অন্ন কিনে যে পয়সা বাঁচত সে পয়সায় মুসার তাড়ি কিনে খেয়ে নেশা কর্‌ত।

রাস্তায় থাকত একটি গরীব মেয়ে। মুসারের এ নিঃসহায়তায় তার মনে জাগত দয়া। প্রত্যহ সকালে সে এসে মুসারের ঘা ধুয়ে দিত। ঘায়ে ওষুধ দিয়ে দিত—তার কাপড়-জামা সেলাই ক'রে দিত। এ-সবের বিনিময়ে মেয়েটি কোন কিছু চায় নি মুসারের কাছে।

মেয়েটির নাম জিন্। মেয়েটি রূপসী নয়, বরঞ্চ অতি কুৎসিৎই বলা যেতে পারে—কিন্তু তার চোখ দু'টী ছিল চমৎকার।

সেদিন চৌমাথায় দাঁড়িয়ে মুসার ভিক্ষা করছে, এমন সময় দেখে—সামনে দিয়ে চলেছেন এক ওমরাও। মুসার দু'হাত পেতে ভিক্ষা চাইল। ওমরাও তার পানে তাকালেন, তাঁর দু'চোখে কি বিরক্তি! ভ্রূভঙ্গী ক'রে ওমরাও ছুঁড়ে দিলেন মুসারের দিকে একটা মোহর। দিয়ে, দু'চোখে অগ্নিবাণ হেনে, চলে গেলেন।

সে মোহর মুসার ছুঁতে পারল না। এ দানে কি ঘৃণা-বিরক্তি! ও তো মোহর নয়, আগুন! সে আগুনে মুসারের মনে জাগল তীব্র দাহ!



পরের দিন সকালে জিন্ এল মুসারের ঘা ধুয়ে দিতে। কি যত্নে ঘা ধুয়ে দিচ্ছে! মুসার দেখ্‌লে, জিনের চোখে-মুখে এতটুকু ঘৃণা নেই, বিরক্তি নেই—সহজ আনন্দে, সযত্নে সেবা করছে! মুসারের দু'চোখ জলে ভ'রে এল। জিনের ঘা ধোয়ানো যখন শেষ হ'ল, সে জিনের হাত ধরল কৃতজ্ঞতা-ভরে।

সে দিন রাত্রে আবার মৃত্যু এসে দাঁড়াল মুসারের শিয়রে।

ওরমুজ বললেন—"এ জন্মে কি শিক্ষা ক'রে এলে মুসার?"

মুসার বললেন—"দীন-দুঃখীকে সেবা কর্‌ব তাদের মনে প্রবেশ করে, তাদের মনে নিজের মন মিশিয়ে। তারা ছোট, আমি কৃপা করছি, আমার কৃপায় দীন-দুঃখী কৃতার্থ হবে, এমন কথা আভাসেও যেন দাতার মনে না জাগে! তাদের ভালবাসতে হবে...ভালবেসে তাদের দুঃখ দূর করতে হবে। দীন হয়ে দীনের সঙ্গে মিশতে হবে। আমি বড়, ও ছোট, আমি দাতা, ও গ্রহণ করছে—এ কথার ছায়া যেন মনে না থাকে। সৌন্দর্য্য নয়, কল্যাণ হবে আমাদের কাম্য,—এ-জন্মে এই শিক্ষা পেয়েছি প্রভু।"

ওরমুজ বললেন—"এস, স্বর্গ আজ সাদরে তোমাকে আহ্বান করছে। *

---

## চিত্রশালা

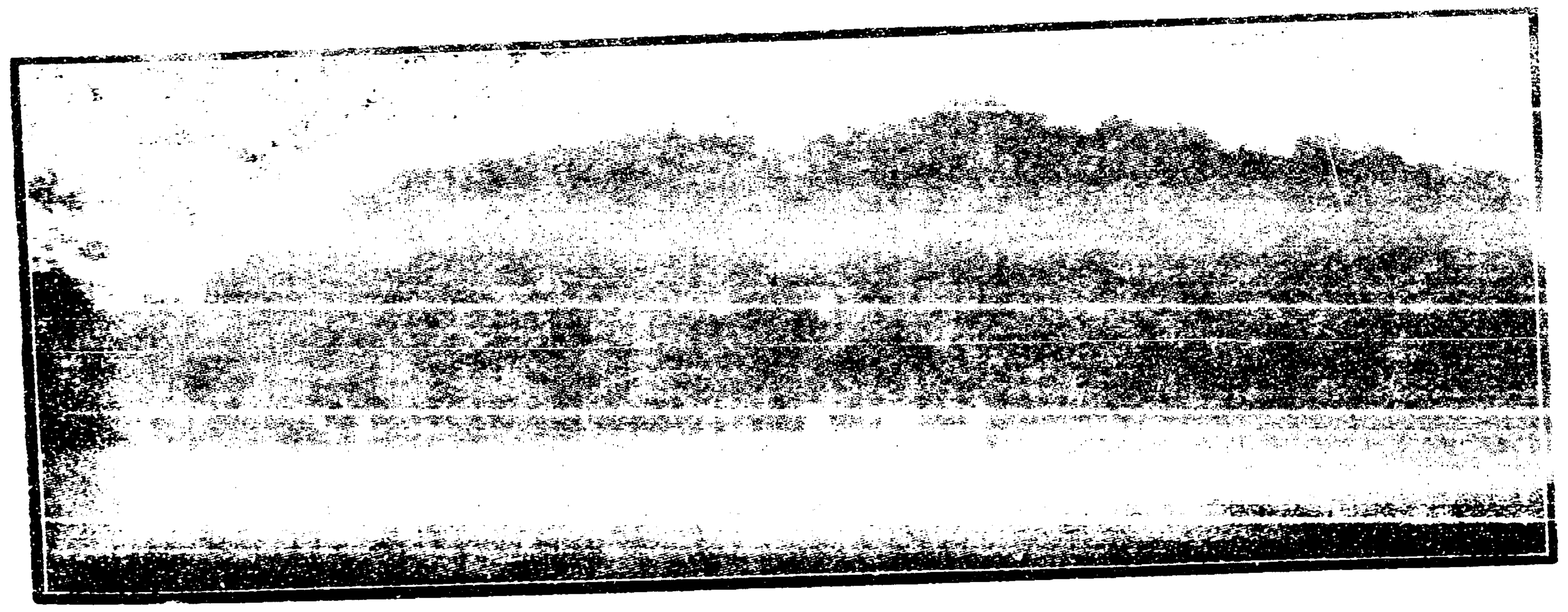

শিবপুরের বিখ্যাত বটগাছ
এটির বয়স প্রায় ১৫০ বছর।

* জো নোদেয়ার গল্প থেকে।

TIGHT BINDING

# ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

## ভগবানের দূত

শ্রীনিমাইকুমার চট্টোপাধ্যায়

কয়েকজন ভূ-পর্য্যটক নানান্ দেশ ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে এসে পড়্‌লেন এক অজানা দ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীরা সভ্যতা শেখে নি, তারা হিংস্র নরখাদক।

পর্য্যটকেরা বিপদে পড়্‌লেন। অসভ্য লোকেরা তাঁদের হত্যা করতে উদ্যত হ'ল।

তখন পর্য্যটকদের দলপতি বল্‌লেন, "তোমরা আমাদের মের না, আমরা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত। আমাদের মারলে তোমরা সবংশে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

নরখাদকেরা বল্‌লে, "আপনারা যে ভগবানের দূত তার একটা প্রমাণ চাই।"

পর্য্যটকেরা পাঁজি উল্টেপাল্টে দেখলেন, আসছে কাল সকালে সূর্য্য-গ্রহণ। তখন দলপতি বল্‌লেন, "আমরা যে ভগবানের দূত, তা' বিশ্বাস হচ্ছে না? আমরা পৃথিবীর সব কিছু ওলট্-পালট্ ক'রে দিতে পারি। একটা প্রমাণ দেখাব। কাল সকালে সূর্য্য ক্রমশঃ অর্দ্ধেক হয়ে যাবে।"

পরের দিন সকালে সূর্য্য-গ্রহণ ছিল, কাজেই সূর্য্য ক্রমশঃ অর্দ্ধেকটা দেখা যেতে লাগল।

অজ্ঞ, বর্ব্বর সেই লোকগুলো তো চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ বোঝে না, তারা এই ব্যাপার দেখে অবাক্ হয়ে গেল। তার পর তারা পর্য্যটকদের কাছে গিয়ে পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইলে; তাঁরাও হাসি-মুখে ক্ষমা করলেন। বুদ্ধিবলে তাঁরা অনিবার্য্য মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে গেলেন।*

* ইংরেজী থেকে।

## শ্রাবণে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রাবণের জলধারা আল্‌পনা আঁকে রে,
অনাগত বাঞ্ছিত দেবতারে ডাকে রে।
সমীরণে কি বারতা!
আশা, অভয়ের কথা,
তৃষিত নয়ন কার পথ চেয়ে থাকে রে!

দূরকে নিকট করে সুদূরের বাঁশরী,
শুনি সাড়া দুখহারা সব ব্যথা পাসরি।
সুধাসাগরের দোল
হৃদি করে উতরোল,
ভাবী ফুল উৎসব শীর্ণ এ শাখে রে।

বজ্রের খর শিখা আঁখি করে অন্ধ,
শুনি শঙ্খের সাড়া, পাই ধূপগন্ধ।
বিভীষিকা চারি পাশে
শবাসনা মৃদু হাসে,
রাঙা চরণের আভা আঁধারেতে জাগে রে।

# শিশুসাহিত্য-সংবাদ

**পাল্কীবুড়ো**—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক দেব সাহিত্য-কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম ।৵৹

পাল্কীবুড়োর মধ্যে আছে কতকগুলি ছোট ছোট, কিন্তু ভারী মজাদার গল্প। তার মধ্যে কয়েকটি রূপকথাও আছে। ননীবাবুর লেখার সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত। তাঁর পাকা হাতে লেখা এই সুন্দর গল্পগুলি তোমাদের খুব ভাল লাগবে। বইএর মলাটটি যেমন মজার, ভিতরের ছবিগুলিও তেমনি সুন্দর।

---

তোমরা শুনে দুঃখিত হবে, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আর ইহলোকে নেই। রমাপ্রসাদ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে দীর্ঘ দিন কাজ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ও সুলেখক হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর অভাবে বাংলা দেশ একজন সত্যিকারের পণ্ডিত লোক হারাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স সত্তর বছর হয়েছিল।

*　　*　　*

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বোম্বাই গিয়েছিলেন। বোম্বাইএর ধনী অধিবাসীরা তাঁকে এ জন্য দু' লক্ষ টাকা দিয়েছেন। বাংলার রবীন্দ্রনাথ ভারতের কি রকম প্রিয় ছিলেন এ থেকে তা বোঝা যায়। আশা করি রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্বপ্ন 'বিশ্বভারতী'কে রক্ষার জন্য বাংলার বিত্তশালী ব্যক্তিরাও এই রকম মুক্তহস্ত হবেন।

*　　*　　*

সম্প্রতি আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিসকো অলিম্পিক্ ক্লাবের সভ্য কর্ণেলিয়াস ওয়ারমারডাম পোল্ ভল্টে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি বাঁশের লগির সাহায্যে ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি টপ্‌কে পার হয়ে গেছেন। এর আগেকার রেকর্ড ছিল দু'জনের—আর্ল্ মেডোজ্ ও সুএওহে'র। শেষের জন জাপানী। সম্প্রতি তিনি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। ওয়ারমারডাম একজন স্কুলের শিক্ষক।

*　　*　　*

জাপান ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ ক'রে চীনের সঙ্গে লেগেছে এ খবর তোমাদের গতবারেই বলেছি। ভারতবর্ষের দিকে এখন তাদের নজর নেই বলে



অনেকে মনে করছেন। ওদিকে কিন্তু জার্ম্মান্ বাহিনী প্রবল উদ্যমে লড়াই সুরু করেছে। আট মাস ক্রমাগত যুদ্ধের পর বিখ্যাত রুশ নৌঘাঁটি সেবাষ্টপলের পতন হয়েছে। খারকভ্, কার্স্ক প্রভৃতি অঞ্চলেও জার্ম্মান্‌রা অনেকটা সুবিধা পেয়েছে। সম্প্রতি ডন্ নদীর এলাকায় তাদের সঙ্গে রুশদের প্রবল যুদ্ধ চলছে। ওদিকে লিবিয়ার তব্রুক দখল করে জার্ম্মান্ বাহিনী রোমেলের নেতৃত্বে মিশর সীমান্ত পার হয়ে এসেছে। সোল্লুম, মুর্সা মাট্রু, ফুকা, এল্ ডাবা ইত্যাদি পার হয়ে এল্ আলামিনে বৃটীশ সেনাপতি অচিন্‌লেকের অষ্টম বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধেছে এবং এখন পর্য্যন্ত তাদের আটকে রাখা হয়েছে। তোমরা আফ্রিকার ম্যাপ্ খুলে মিশর দেশটা ভাল করে দেখলে অবস্থাটা কিছু আন্দাজ করতে পারবে।

লিবিয়ায় ইংরেজ বাহিনীর অসাফল্যের জন্য বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্টে খুব হৈ-হৈ হয়ে গেল। এমন কি স্যর্ জন্ মিল্‌নে ও আরও ২০ জন পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। তুমুল বিতর্কের পর ২৫-৪৭৫ ভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়েছে,—বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্ট চার্চ্চিলের প্রতি তাঁদের দৃঢ় আনুগত্য জানিয়েছেন।

ওদিকে রোমেলের সাফল্যের জন্য হিট্‌লার তাঁকে ফিল্ড্ মার্শালের পদে উন্নীত করেছেন।

*　　*　　*

কলকাতার ফুটবল লীগ্ প্রায় শেষ হয়ে এল। তোমরা শুনে সুখী হবে এবার ইষ্ট বেঙ্গল দল লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। ২৪ টা ম্যাচ্ খেলে তারা পেয়েছে ৪৩ পয়েণ্ট। ইতিপূর্ব্বে মহামেডান্ স্পোর্টিং আর মোহনবাগান ছাড়া আর কোন ভারতীয় দল এ সম্মান পায় নি। রানার্স্ আপ্ সম্ভবতঃ মহামেডান স্পোর্টিংই হবে। মোহনবাগানই দ্বিতীয় যাচ্ছিল কিন্তু তারা ২য় বারে মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে হেরে গিয়ে রানার্স আপ্ হবার আশা প্রায় হারিয়েছে। কাষ্টমস্ এখনও তালিকার সর্ব্বনিম্নে রয়েছে।

---

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

২৮ নং ঝুড়িতে লিচু ছিল।

---

### উত্তরদাতাদের নাম

নীলমণিপতি ও লক্ষ্মণচন্দ্র সাধু খাঁ ( গাড় লিয়া ) ; মঞ্জু, বুবু, বাণী, পিণ্টু, গোপাল প্রভৃতি ( মুর্শিদাবাদ ) ; মোহনলাল আগরওয়ালা ( জাপান ) ও সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী ( সুজানগর—পাবনা ) ; অঞ্জলি, গোপাল, খোকা, বিজু, বাচ্চু প্রভৃতি ( ভবানীপুর ) ; রমেশচন্দ্র, রণেন্দ্র, রথীন্দ্র, রণেশ সেনগুপ্ত পট্টনায়ক ( রামচন্দ্রপুর ) ; সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ) ; অভিমন্যু দাশগুপ্ত ( কালিম্পং ) ; কালিদাস পাল ( বালুভরা ) ; চণ্ডীপদ, সনৎকুমার, আরতি, নারায়ণচন্দ্র,

বাবলু ( ভিড়িঙ্গি ) ; অরুণ, তরুণ, প্রতিমা, নির্ম্মল, অমল মিত্র ( মুজাফরপুর ) ; ইভা, খুকু, অরুণ, উ-বাহাদুর ও সুনীল চট্টোপাধ্যায় ( কালীঘাট ) ; রঞ্জন ও দীপক দাশগুপ্ত ( ভাগলপুর ) ; তরুণশঙ্কর বাগচী ( মাথাভাঙ্গা ) ; মিনতি, অশোক দত্ত ( বাবু ) ( হায়দ্রাবাদ ) ; শঙ্কর, পেন্টো, খেঁদি, বুচি ও ক্যাবলা ( কানপুর ) ; জ্যোতির্ম্ময় ও অমল গুপ্ত ( পাইল ) ; শক্তিপ্রকাশ, পরিমল, সুধাংশু, রামেন্দু ও ছত্র সরকার ( গোলাঘাট ) ; লতিকা, যুথিকা চন্দ্র ( চন্দ্রগিরি ) ; অনিমা, মিঠু, সীমা ( করিমগঞ্জ ) ; অজিত, জ্যোৎস্না, মীরা, ডলি, সুজিৎ প্রভৃতি ( বানিয়াখামার ) ; অরুণানন্দ চৌধুরী ( সরাইল ) ; শুভাশীষ সরকার ( রঙ্গপুর ) ; ছবি রায় ( নিউদিল্লী ) ; প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগচী ( বালুভরা ) ; শঙ্কর, শান্তি, জগৎ ( বাণীমন্দির—মুড়াগাছা ) ; নবেন্দু সেন ( রাজসাহী ) ; বাদল, দেবল, কানু, ভানু ( হবিগঞ্জ ) ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ ( রামচন্দ্রপুর ) ; নাদিরা খাতুন ( ময়মনসিংহ ) ; নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ) ; নির্ম্মলেন্দু-কুমার মৈত্র ( পাটনা ) ; সলিল বসু ( হাজারীবাগ ) ; হরিহর, শান্তি, গৌরী, পুষ্প, চাঁদু ( ইংলিশ বাজার—মালদহ ) ।

---

## নূতন ধাঁধা

নীচে একখানি সাঙ্কেতিক চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠির জায়গায় জায়গায় কথা পালটিয়ে তার প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসিয়ে নিতে পারলে চিঠিখানা পড়া যাবে।

ভাই সেকালকার বীর সেকালকার অস্ত্র,

জননী ওজন বিশেষ না দিন সম্প্রদায় বিশেষের তীর্থের লাঙ্গল আজ অকালাইরে কোথায় ? ও পদবী বিশেষর খোনববধূর কাহাতী তো কত মৃত্যু এ সর্ব্বনাম বিশেষ পাঠ করেছে ! বৃদ্ধা, কেশহীন—ওশব্দও নয়কি ঠিক সমানয়ে পেয়েছে। আমি বেছোটগাছ কি অন্যঅর্দ্ধেক হাতলাম ?

তো মোট কি হাতে ভারব পতুচ্ছ যদি তোজননীকে নয় মুদ্রা বিশেষ তবে একটি মিষ্টি ফলাদের সষস্ত্রকার অবস্থা কেমানস ঘোড়া ? পাটবস্ত্র করে এ সম্মেলনস্থানই !

তোমার সঙ্গীহীনস্ত পশ্চাৎশোণিত

পদবী বিশেষ কাত্তিক বন্ধু

---


## বাহির হইয়াছে

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

# হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি

গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্‌

**হুকা-কাশির**

বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।

সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট

**দাম মাত্র আট আনা**

---

শ্রীলীলা মজুমদার এম্.এ

প্রণীত

নূতন ধরণের গল্পের বই

# বদ্যিনাথের বড়ি

'মৌচাক' বলেন

"সব গল্পগুলোই বেশ হাসির ও মজার। ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে।"

লেখিকার স্বহস্ত-অঙ্কিত সুন্দর সুন্দর কার্টুন ছবি।

সুন্দর বহুবর্ণরঞ্জিত বাঁধান মলাট, পাতায় পাতায় হাসি।

**দাম আট আনা**

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ ( ১বি, বসা রোড, কলিকাতা )


১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641.

মন-গড়া য়্যাড্ভেঞ্চার-কাহিনীর চেয়ে এই

সত্যিকার বীরের সত্যিকার বীরত্ব-কাহিনী তোমাদের বেশী ভাল লাগিবে।

দাম— আট আনা মাত্র : ভট্টাচার্য্য ...

মাত্র ৭টী

ঔষধে সব রোগ সারে

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

আবিষ্কৃত ১৯০২

... আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641.

মন-গড়া য়্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর চেয়ে এই
সত্যিকার বীরের সত্যিকার বীরত্ব-কাহিনী তোমাদের বেশী ভাল লাগি

বর্ষ ভাদ্র, ১৩৪৯ ৮ম সংখ্যা

মাত্র ৭টী
আবিষ্কৃত ১৯০২

ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSU

# রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৵০, ষাণ্মাসিক ১।৵০ ; প্রতিসংখ্যা।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান

## হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।
সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট
দাম মাত্র আট আনা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা )

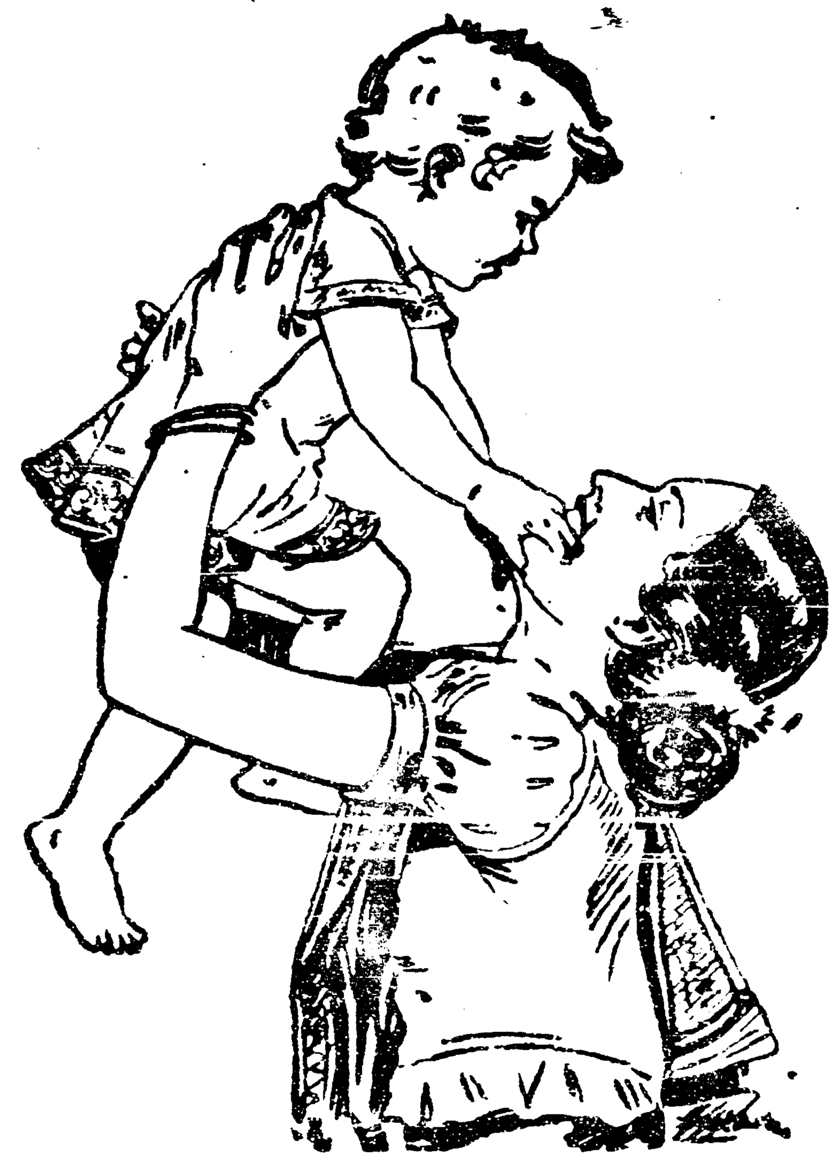

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

আমাদের সর্ব্বজন সমাদৃত **পূজাবার্ষিকী**

## মধু মেলা

পূজার পূর্ব্বে যথাসময়ে বাহির হইবে। এবারকার পূজা-বার্ষিকী সম্পাদনার ভার লইয়াছেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক **শ্রীবুদ্ধদেব বসু**

এই দুর্ব্বৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত প্রবন্ধ-গৌরবে ও চিত্র-সম্পদে উহাকে সমৃদ্ধ করিবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজনই চলিতেছে।

---

আমাদের সদ্যপ্রকাশিত একখানি চমৎকার বই---

**মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী** প্রণীত

## ছোটদের শাহ্‌নামা

ইরাণ, তুরাণ, পারশ্যের রাজা বাদ্‌শাহ্‌দের বিচিত্র কাহিনী। সুন্দর সুন্দর চিত্রে ভূষিত।

বিচিত্র প্রচ্ছদ, সুদৃশ্য বাঁধাই

দাম বারো আনা মাত্র

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৷৶৹

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

## আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৷৹

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—৷৷৴৹

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক্ টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা )

## ক্যান্থারাইডিন

### হেয়ার অয়েল

পোষণের উপযোগী পদার্থের অভাবে যখন কেশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে থাকে, এবং মস্তকে খুস্‌কি, মরামাস প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করিলে কেশমূল নীরোগ এবং বিরলতা ও পতন নিবারিত হইয়া কেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী পরিবর্দ্ধিত হয়।

একাধারে কেশচর্য্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

আমাদের সর্ব্বজন সমাদৃত পূজাবার্ষিকী

# মধু মেলা

পূজার পূর্ব্বে যথাসময়ে বাহির হইবে। এবারকার পূজা-বার্ষিকী সম্পাদনার ভার লইয়াছেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু

এই দুর্ব্বৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত প্রবন্ধ-গৌরবে ও চিত্র-সম্পদে উহাকে সমৃদ্ধ করিবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজনই চলিতেছে।

---

আমাদের সদ্যপ্রকাশিত একখানি চমৎকার বই—

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রণীত

# ছোটদের শাহ্‌নামা

ইরাণ, তুরাণ, পারশ্যের রাজা বাদ্‌শাহ্‌দের বিচিত্র কাহিনী। সুন্দর সুন্দর চিত্রে ভূষিত।

বিচিত্র প্রচ্ছদ, সুদৃশ্য বাঁধাই

দাম বারো আনা মাত্র

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্‌. এস্‌-সি প্রণীত

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৶১০

## আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক্ টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্‌ কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড্‌, কলিকাতা )

## ক্যান্থারাইডিন

### হেয়ার অয়েল

পোষণের উপযোগী পদার্থের অভাবে যখন কেশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে থাকে, এবং মস্তকে খুস্‌কি, মরামাস প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করিলে কেশমূল নীরোগ এবং বিরলতা ও পতন নিবারিত হইয়া কেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী পরিবর্দ্ধিত হয়!

একাধারে কেশচর্য্যা ও কেশচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি।"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

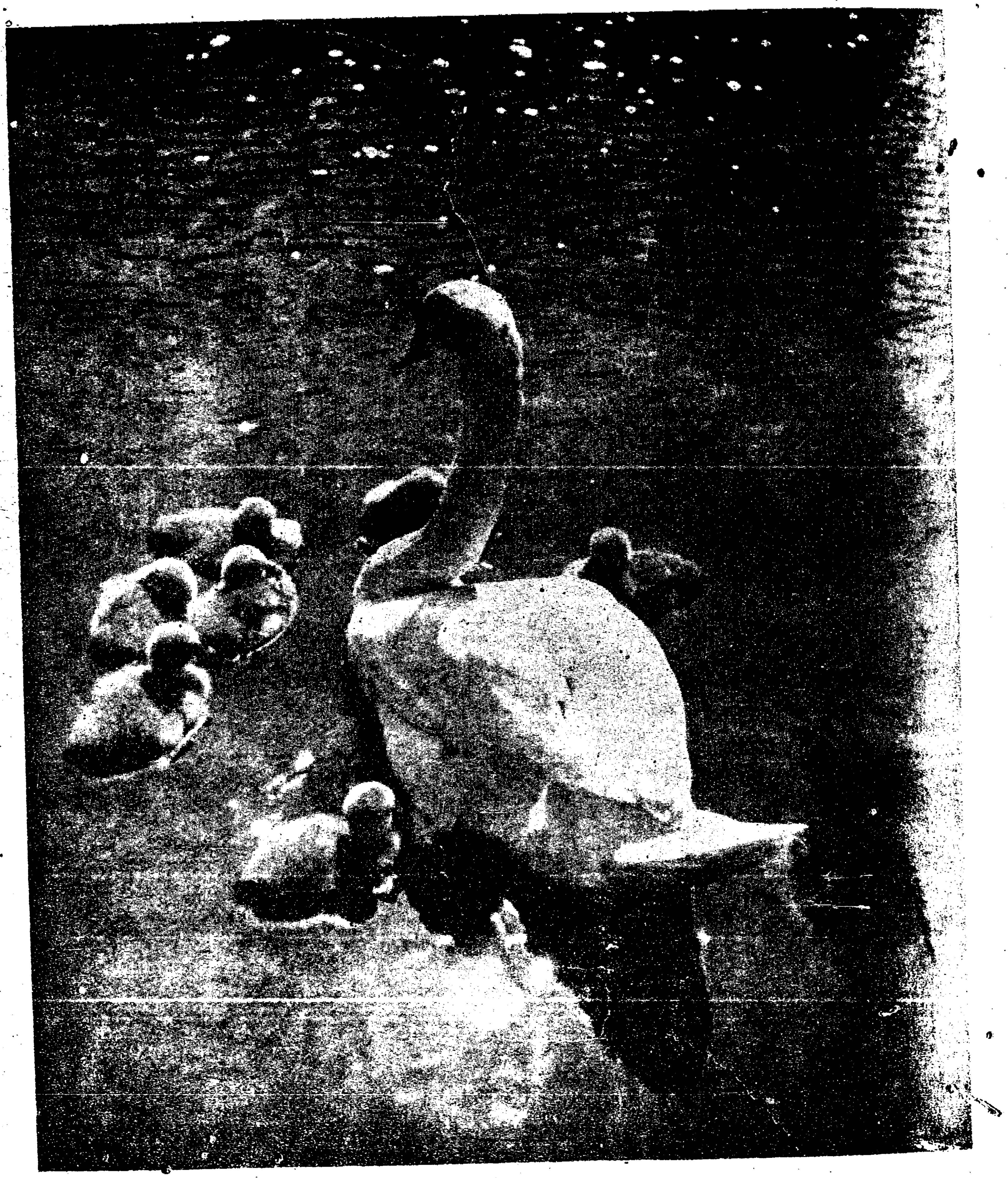

আদুরে ছেলের দল

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৯ { ৮ম সংখ্যা

## ভাদর

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদরের বাদরের অপরূপ রূপ—
দীপ-জ্বালা নীপবনে গন্ধের ধূপ।
মেঘ ফাটা ঝিক্‌মিক্
আলো ঝরে চারদিক্,
ক্ষণেকে বাদল নামে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্;
অপরূপ খেলা তার অপরূপ রূপ।

আদুরে ছেলের দল

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪৯ { ৮ম সংখ্যা

## ভাদর

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদরের বাদরের অপরূপ রূপ—
দীপ-জ্বালা নীপবনে গন্ধের ধূপ।
মেঘ ফাটা ঝিক্‌মিক্
আলো ঝরে চারদিক্,
ক্ষণেকে বাদল নামে ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্;
অপরূপ খেলা তার অপরূপ রূপ।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

নব শ্যামলিমা মাখা পল্লীর কোল—
মাঠে মাঠে সবুজের ঢেউ উল্লোল।
নদী বহে তর্ তর্,
পুলকিত অন্তর,
বকুলেরি ডালে পাখী খায় শুধু দোল;
অপরূপ রূপে ভরা পল্লীর কোল।

স্বর্গের লক্ষ্মী কি নাম্‌ল রে বল্
রামধনু সেতু বেয়ে আজ ধরাতল?
সোনার ঝাঁপিটি হাতে,
করুণা আঁখির পাতে—
ফুটিছে চরণ ঘেরি শত শতদল;
লক্ষ্মী কি এল আজ মর্ত্ত্যেতে বল্?

মাঠে, বনে হাসি আর ঘরে ঘরে সুখ,
ফসলে ও জলে ভরা ধরণীর বুক।
ভরা গাঙে তরী যায়—
মাঝি সুখে গান গায়—
রাখাল বাজায় বাঁশী হরষিত মুখ;
ভরা ভাদরেতে ধরা ভরা আজি সুখ।

# যা হয়ে থাকে

শ্রীমতী বাণী নিয়োগী

বাসে উঠেই রেবা নেস্‌ফিল্ডের গ্রামারটা খুলে বস্‌ল। বাবাঃ, পুরো এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে হবে, আর এখনও কিচ্ছুই হয় নি। সেদিন কেউ পড়া পারে নি তাই লতিকাদি রোজকার আধ পৃষ্ঠার জায়গায় এক পৃষ্ঠা দিয়েছেন। রেবা নিজের ওপর ভীষণ চটে গেল—কেন যে ও অত জোরে মাথা নেড়ে বলেছিল সবটা পারবে! লতিকাদি তা দেখেছিলেন আর আজ উত্তর না দিতে পারলে কি আর আস্ত রাখবেন? অথচ তখন তো এত বেশী মনে হয় নি! আর কখনও স্কুলের পড়া শেষ না করে নেমন্তন্ন খেতে যাবে না প্রতিজ্ঞা করে রেবা মুখস্থ আরম্ভ করল্। প্রিপোজিশানগুলি যেন কি! কিছুতেই মুখস্থ হয় না। আচ্ছা, লতিকাদি যদি আজ না আসেন? কি মজাই না হয় তা হলে। কিন্তু সে হবার নয়। স্বাস্থ্য ভাল বলে ওঁর খুব গর্ব্ব। মেয়েদের বলেন, "তোমাদের এই অল্প বয়সেই নানা রকম রোগ লেগে আছে। আমাকে দেখ তো, অসুখের জন্যে কোনদিন য়্যাব্‌সেণ্ট্ হতে দেখেছ?" অসুখ না হয় না হ'ল, য়্যাক্সিডেণ্টও তো হতে পারে? না, না, এ সব রেবা কি ভাবছে! কারুর কোন অনিষ্ট কামনা করা ভীষণ খারাপ। যা তা ভেবে মিছামিছি ও সময় নষ্ট করছে, এতক্ষণে কয়েকটা মুখস্থ হয়ে যেত। রেবা আবার বইয়ে মন দিল আর সেই সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল যে আজ যেন লতিকাদি শীলাকে আগে প্রশ্ন করেন। তা হলে ঘুরতে ঘুরতে ওর পালা আসবার আগেই ঘণ্টা পড়ে যেতে পারে। ওদের আবার সেকেণ্ড ট্রিপ্। গিয়ে হয়ত দেখবে ক্লাস্ বসে গেছে, আর প্রথম পিরিয়াডেই তো গ্রামার।

বাসে একটী মেয়ে উঠ্‌তে রেবা মুখ তুল্‌ল। এ কি, এত তাড়াতাড়ি রমাদের বাড়ী এসে গেল! এর পর মাধবীকে নেবে, তারপরেই স্কুল। রেবা প্রাণপণে মুখস্থ করতে লাগল। খানিক পরে স্কুলের দরজায় এসে বাস্‌টা থামল। রেবা গলা বাড়িয়ে দেখল মেয়েরা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ ঘণ্টা এখনও পড়েনি। কিন্তু রেবার ভাগ্য নেহাৎই খারাপ বলতে হবে—সবে ক্লাসের দরজায় পা দিয়েছে আর ঢং ঢং করে প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। কোন রকমে ডেস্কে বইগুলো রেখে রেবা আবার গ্রামারটা নিয়ে বসল। তখন ক্লাসে মন দিয়ে কিছু পড়া শিবেরও অসাধ্য (যদিও শিব নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার পড়েন কিনা সন্দেহ)। মেয়েরা দলে দলে ক্লাসে ঢুকছে। লতিকাদি যা ষ্ট্রিক্ট্, ক্লাসে একেবারে চুপ করে বসে থাকতে হয়। তাই এখন সবাই প্রাণ ভরে চেঁচিয়ে নিচ্ছে। ললিতা একটা কলম নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে আর তার পিছনে শান্তা। ঘরে ঢুকে দু'জনের ঝুটোপুটি লেগে গেল কলমটা নিয়ে। সুজাতা

গান গাইছে আর নীলি মনোরমাকে কালকের সিনেমায় কোন্ জায়গাটা ভাল লাগে নি তাই বিশদভাবে বোঝাচ্ছে। রেখাকে ঘিরে সাত আটটি মেয়ে মনোযোগ দিয়ে কি শুনছে। প্রতিমা প্রতিভা দু' বোন রুটিন মত ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢুকল। রেবা চেষ্টা করল ওদের থামাতে কিন্তু কে কার কথা শোনে? সবাই বলে, "আমরা তো কত আস্তে বলছি, ওদের চুপ করতে বল না।" আরও কয়েকটি মেয়ে বই নিয়ে বসেছিল। রেবা জিজ্ঞেস করল, "তোর সবটা মুখস্থ হয়ে গেছে?" রেণু বল্ল, "হ্যাঁ, হয়েছে। তবে খুব ভাল করে হয় নি তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।" রেবা দেখল ওদের সবাইকারই একটু আধটু হয়েছে। ওর মত একেবারে কিছু না পড়ে কেউ আসে নি। রেবা মহাভাবনায় পড়ল। একেবারে যে একলা পড়ে যাবে তা ও ভাবে নি। অন্ততঃ একজনও পড়া না শিখে আসবে আশা করেছিল। বড় নমিতা ঘরে ঢুকল, "জানিস, মিস্ মুখার্জ্জি আজ আসেন নি, অসুখ করেছে।" সবাই হৈ হৈ করে উঠ্ল। ছোট নমিতা বল্ল, "ভালোই হ'ল। কালকেও অঙ্কের কোন পড়া থাকবে না।" রেবা খালি ভাবল মিস্ মুখার্জ্জি এসে লতিকাদি যদি য়্যাব্সেন্ট্ হতেন তা হলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত?

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ে গেল। রেবা পাশের মেয়ে ছবিকে বল্ল, "তোর ত বেশ ভাল করে মুখস্থ হয়ে গেছে, আমাকে একটু বলে দিস। আস্তে আস্তে বল্লেই শুনতে পাব কিন্তু একটু ওধার ঘেঁসে বসিস, লতিকাদি যেন দেখতে না পান।" তার মুখের কথা ফুরতে না ফুরতে লতিকাদি এসে উপস্থিত। কয়েকটি মেয়ে যারা তখনও বাইরে ছিল, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। চেয়ারে বসেই লতিকাদি তাদের বল্লেন, "বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করবার ত কোন দরকার ছিল না, দ্বিতীয় ঘণ্টা কি শুনতে পাও নি? কত বার বলা হবে প্রথম ঘণ্টা পড়লেই তোমরা ক্লাসে এসে চুপ করে বসে থাকবে?"—ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর "বই বন্ধ করে ডেস্কের উপর রাখ" বলে লতিকাদি একটু থামলেন। নিজের বইটা খুলে এদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল শীলা হাসছে। অম্‌নি ওকে আক্রমণ করলেন, "শীলা—'সাফার'এর সঙ্গে কি প্রিপোজিশান্ লাগবে?" রেবা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভগবান্ তা হলে ওর ডাক শুনেছেন। ও একটু নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসল। কিন্তু শীলার পর দু'টি মেয়ে একেবারে নির্ভুল উত্তর দিয়ে ওকে ঘাবড়ে দিল। সবাই যদি এ রকম ভালো মেয়ে হয়ে গিয়ে থাকে তবে ওর পালা আসতে তো একটুও দেরী হবে না! ও ভেবেছিল কয়েকজন ভুল করবে আর লতিকাদি বকবেন, এ রকম করে খানিকটা সময় কেটে যাবে। ভগবান্ যে ওর ডাক শুনে শীলাকে দিয়ে আরম্ভ করালেন তাতে লাভটা আর কি হ'ল? বোধ্ হয় এইটুকু করেই কর্ত্তব্য করা হয়ে গেছে ভেবেছেন!

"এবার, শান্তির পালা। রেবা উদ্‌গ্রীব হয়ে শান্তির মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভগবান্‌কে ও যতটা খারাপ ভেবেছিল ততটা ন'ন তা হ'লে। শান্তি তিনটে ভুল করল আর



তারপরেই আশা ধরা পড়ে গেল—ক্লাসে সুপুরী খাচ্ছিল। লতিকাদি আশাকে মুখ ধুয়ে আসতে বল্লেন। ফিরে এলে ওকে দাঁড় করিয়ে খুব বকতে লাগলেন। রেবা মন দিয়ে শুনছে কি বলছেন, এমন সময়ে ছবি ওকে একটা কাগজ দিল। তাতে লেখা—"অঙ্কের ক্লাসে পেছনের ছাতে তেঁতুলের আচার খাওয়া হবে, যার ইচ্ছে আসতে পার। আজ মিস মুখার্জ্জি আসেন নি।" হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারল লিখেছে শেফালী। শেফালীদের বাড়ীর তেঁতুলের আচার খুব সুন্দর হয়। মনে মনে খুসী হয়ে উঠলেও রেবা মুখে কিছু প্রকাশ না করে লতিকাদির মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে রইল আর ডেস্কের নীচ দিয়ে কাগজটা ওর সামনের মেয়েকে দিয়ে দিল। তখন একবারও ওর মাথায় আসে নি যে এতটুকু একটা কাগজ ওকে সাহায্য করতে পারে। যখন সুপ্রিয়ার কাছে পৌঁছেছে তখন একটা কাণ্ড হ'ল। সুপ্রিয়ার সামনের মেয়ে তখন উত্তর দিচ্ছিল। ওর উচিত ছিল যতক্ষণ না লতিকাদি অন্য দিকে মুখ ফেরান ততক্ষণ কাগজটা নিজের কাছেই রাখা। তা না করে লতিকাদি বইয়ের দিকে চোখ নামাতে না নামাতে ও রেখাকে কাগজটা দিতে গেছে আর অমনি লতিকাদির ডাক, "সুপ্রিয়া দাঁড়াও।" সুপ্রিয়া দাঁড়াল। লিলি ওর পাশে বসে। ও তক্ষুণি খাতা থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে আড়ালে কি লিখতে বসে গেল। লতিকাদি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার হাতে কি?" সুপ্রিয়া লিলির কীর্ত্তিকলাপ সব দেখতে পেয়েছে, তাই ওকে সময় দেবার জন্য মুখটা খুব করুণ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। "কি, কথা বলছ না যে? তুমি জান না তোমার হাতে কি?" সুপ্রিয়া চুপ। "আচ্ছা, আমি বলছি, শোন। তুমি এক্ষুণি একটা কাগজ রেখাকে দিচ্ছিলে। বল সত্যি কি না?" সুপ্রিয়া একটু পরে বল্ল, "হ্যাঁ।" তখন লতিকাদি বল্লেন. "সে কাগজে কি লেখা আছে দেখতে চাই। নিয়ে এস।" সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে রইল। সেই সময়ের মধ্যে লিলি ওর হাতে নিজের কাগজটা গুঁজে দিল। লতিকাদি আর একবার ডাকতে সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে গিয়ে কাগজটা ওঁর হাতে দিল। লতিকাদি চেঁচিয়ে পড়লেন—"আজ মিস্ মুখার্জ্জি আসেন নি।" যারা আগের কাগজটা পড়েছে তারা অতি কষ্টে গম্ভীর হয়ে বসে রইল। মীরা ত হাসি চাপতে না পেরে ভীষণ কাসতে আরম্ভ করে দিল। লতিকাদি জিজ্ঞেস করলেন, "কে লিখেছে এটা?" শেফালী দাঁড়াল। আর একজনকে ধরেছেন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সুপ্রিয়া বসতে যাচ্ছিল, লতিকাদি এক ধমক দিলেন, "বসছ কেন? ভেবেছ তোমার কোন দোষ নেই?" তার পর সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "ছি ছি, টীচারের অসুখ করেছে বলে কোথায় তোমরা দুঃখিত হবে তা না কাগজে লিখে সবাইকে জানান হচ্ছে যেন একটা শুভসংবাদ! তোমাদের মতন——"

রেবা খুব খুসী হ'ল অনেকটা সময় কেটে গেল বলে। কিন্তু এততেও বুঝি কিছু হয় না। ওর পালা যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে! এদিকে ঘণ্টা পড়বার আর নাম নেই। দ্বারোয়ানটা

করে কি ? রেবা ঠিক করল এবার পূজোর সময় দ্বারোয়ানকে বখ্‌সিস্ দিতে মাকে বারণ করে দেবে। কোন কাজ করবার নেই, আর পূজোর সময় একগাল হাসি নিয়ে বাড়ী গিয়ে হাজির হয়। এখন মণিকার পালা। মাঝে আর তিনটি মেয়ে। রেবার মুখ শুকিয়ে গেল। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়বার চেষ্টা ও অবশ্যি করবে কিন্তু যদি না লাগে ? দুদিন পর পর পড়া না পারলে কি আর লতিকাদি অম্‌নি ছেড়ে দেবেন ? যখন নীলি উত্তর দিচ্ছে তখন মনে মনে ও প্রায় নাস্তিক হয়ে উঠেছে। ভগবান্‌কে কেন যে বিপদ্‌ভঞ্জন বলে! আজ রেবাকে ত উদ্ধার করতে পারলেন না। নীলির পর বীণা তার পরেই যে রেবা তা কি ভগবান্ জানেন না ? অথচ সবই নাকি দেখতে পান। কিন্তু রেবার এ মত বদলাতে হ'ল। যেই নীলি বসেছে অমনি—ঢং ঢং ঢং। লতিকাদি বললেন, "আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত থাক, এবার পড়া নিয়ে নাও।" রেবা খুসীর চোটে এত জোরে নতুন পড়ায় দাগ দিল যে পেন্সিলের শীষটাই গেল ভেঙ্গে। পড়া দিয়ে লতিকাদি চলে গেলেন আর রেবা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে শেফালীকে জিজ্ঞেস করল, "আচার কতখানি এনেছিস রে ?"

---

# একটি সত্যিকার বীরের কাহিনী

(ইতিহাসের কথা)

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ.

১৮৬০ সাল। একটি সৈনিক এক বস্তা শস্য পিঠের ওপর ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধক্ষেত্র পেরিয়ে, লোকালয় ছাড়িয়ে সে এসে উপস্থিত হ'ল ছোট্ট একটি নির্জ্জন দ্বীপে। সৈনিকটির বলিষ্ঠ দেহ—চোখে-মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। শান্ত অথচ তেজোদীপ্ত সে মূর্ত্তি। কর্ম্মজগৎ থেকে দূরে, নির্জ্জন পল্লীতে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই সে আজ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। লাঙ্গল চষে' আর ঘর-বাড়ী তৈরী করে সে ভুলতে চেষ্টা করবে তার অতীত জীবনের কথা।

ভাবতেও অবাক্ হ'তে হয় যে এই সৈনিক-পুরুষটি আর কেউ ন'ন, ইতালীর বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি গ্যারিবল্‌ডি। মাতৃভূমির জন্য যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের



জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, গ্যারিবল্‌ডির নাম তাঁদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে। ইনি ছিলেন ইতালীর মুক্তিদাতা। কিন্তু তাঁর বীরত্বের চেয়ে মহত্ত্বের জন্যই জগৎ তাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধা করবে।

আজ ইতালীকে ইউরোপের একটা হোমরা-চোমরা দেশ বলেই লোকে মনে করে। কিন্তু ৭০ বছর আগেও ইতালী ভূগোলে একটা নাম মাত্র দেশ ছিল। সমস্ত দেশটা ছিল বিদেশীর অধীনে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। কতক অংশ ছিল অষ্ট্রিয়ান্ সাম্রাজ্যের অধীনে, কতক ছিল ধর্ম্মগুরু পোপের সম্পত্তি, আর নেপল্‌স্ ও সিসিলি ছিল অন্য বিদেশী শক্তির শাসনে। স্বাধীন ইতালী বলতে সার্ডিনিয়া—পীড্‌মণ্ট্ রাজ্যকেই বোঝাত। বিদেশীরা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে চালাত তাদের খামখেয়ালী ব্যবস্থা। লোকের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না, এবং ক্রমেই তা অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে লাগল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি কোন লোকের ছিল না। তাই নিতান্ত অসহায় ভাবে তারা এ সব সয়ে যেতে লাগ্‌ল।

এই সময় হ'ল গ্যারিবল্‌ডির আবির্ভাব। নাবিকের ছেলে তিনি—জন্ম হয় তাঁর ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নাইস্ নগরীতে। লেখাপড়া তাঁর বেশী শেখা হয় নি। ছেলে-বেলা থেকেই আরম্ভ হয় ভবঘুরে জীবন। নাবিকের ছেলে—ঘরের শান্তির চেয়ে বাইরের য়্যাড্‌ভেন্‌চারের মোহ ছিল তাঁর কাছে বেশী লোভনীয়। তাই ছেলেবেলায় তিনি বহুদিন কাটিয়েছেন সমুদ্রের উপকূল ঘুরে। একবার জলদস্যু-দের হাতে পড়ে প্রাণ যেতে বসেছিল। এই সময় তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ম্যাৎসিনির সঙ্গে—স্বাধীনতা আন্দোলনের আর একজন নায়ক। গ্যারিবল্ডি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং দেশে ফিরে এসে যোগ দিলেন বিপ্লব আন্দোলনে। সার্ডিনিয়ার সরকার তাঁকে বেশী পছন্দ করলেন না। গ্যারিবল্ডির ওপুর আদেশ হ'ল দেশ ত্যাগ করবার। আবার তিনি বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্র-যাত্রার উদ্দেশ্যে। ম্যাৎসিনির আহ্বানে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে এলেন রোম উদ্ধার করবার সঙ্কল্প নিয়ে। বীর বিক্রমে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন—ব্যর্থ হ'লেন বটে, কিন্তু তাঁর বীরত্ব সকলের মনে এক নতুন আশা জাগিয়ে তুল্‌ল।

তিনি পালিয়ে পীড্‌মণ্ট্‌ এসে উপস্থিত হলেন। পীডমণ্ট্‌ ইতালীর জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। জনসাধারণ গ্যারিবল্ডিকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে আশ্রয় দেওয়া হ'ল না। মাথা পেতে তিনি সেই ব্যবস্থাই মেনে নিলেন। তিনি জানতেন, জনসাধারণ তাঁকে চায়, কিন্তু সমগ্র দেশের অকল্যাণের আশঙ্কায় তিনি তাঁর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিলেন না, পীড্‌মণ্ট্‌ ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি দেশবাসীকে বলে গেলেন—"কারও বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই, এখন আমাদের দুঃসময়, তাই এটা আত্মত্যাগের সময়।"

আবার সুরু হ'ল তাঁর নির্ব্বাসিত জীবন। রাজনীতি থেকে কিছুদিনের জন্য ছাড়া পেয়ে তিনি ইতালী ত্যাগ করে তাঞ্জিয়ার গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। এই বনবাসে দিন কাটে তাঁর সুখেই। জাহাজের পাল, মাছ ধরবার ছিপ, সিগারেট্‌ ইত্যাদি বানিয়ে ও শিকার ক'রে তিনি ভুলে থাক্‌তে চেষ্টা করেন মাতৃভূমির পরাধীনতার কথা। কিন্তু সুদূর প্রবাসে থেকেও তিনি শুধু স্বপ্ন দেখেন এক অখণ্ড স্বাধীন ইতালীর। এই স্বপ্ন সফল করার আশা নিয়েই তিনি কাজ করে যান।

আমেরিকা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া হয়ে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌" জাহাজের ক্যাপ্‌টেন হয়ে আবার তিনি দেশে ফিরে এলেন। সঙ্গে যে সামান্য অর্থ ছিল তাই দিয়ে কাপ্রেরা নামে ছোট দ্বীপটি কিনে সেখানে বাস করতে লাগলেন। এখানে দিনের বেশীর ভাগ সময় তিনি ব্যস্ত থাকেন জমি চাষ ক'রে আর বাগান নিয়ে। মেষপালন করা ছিল তাঁর একটা সখ। একদিন তাঁর ছোট্ট মেষশাবকটি হারিয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃষ্টি মাথায় করে ছুটলেন তিনি তার খোঁজে। ইতালীর ভাবী ডিক্টেটার ঘুরে বেড়াচ্ছেন বনের মধ্যে মেষশাবকের সন্ধানে! শুন্‌লে গল্প বলে মনে হয়।

১৮৬০ সাল। এই সময় সিসিলি রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। জনসাধারণ গ্যারিবল্ডিকে নেতৃত্ব করবার জন্য আবেদন জানাল। এতদিন পরে আজ তাঁর সাধনা সফল হতে চলেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এই বিদ্রোহের আগুন



শীগ্‌গিরই সমস্ত ইতালীতে জ্বলে উঠবে। এটাই হবে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়। গ্যারিবল্ডি এক সহস্র সৈনিক নিয়ে প্রস্তুত হলেন। এই সৈনিকদের বেশীর ভাগ ছিল ইউনিভারসিটির ছাত্র। বিপুল অভ্যর্থনার মধ্যে গ্যারিবল্ডি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে নাম্‌লেন মার্সালা বন্দরে। সেখান থেকে এগিয়ে চল্‌লেন রাজধানী পালার্মোর দিকে। অতি দুর্গম সে পথ। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে গ্যারিবল্ডির সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে; মনে তাদের অটল সঙ্কল্প। পথের দু'ধারে স্ত্রী-পুরুষ সবাই নতজানু হয়ে বীর সেনাপতিকে জানাচ্ছে তাদের শ্রদ্ধা। ওদের বিশ্বাস, ওদের মুক্তি দিতে যীশু আবার ফিরে এসেছেন।

ক্যালাটাফিমি পাহাড়ে শত্রু-সৈন্যেরা গ্যারিবল্ডির বাহিনীকে প্রথম বাধা দিল। বিশ হাজার শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে এক সহস্র সৈন্যের প্রচণ্ড লড়াই হ'ল। গ্যারিবল্ডির জয় হ'ল—তিনি সিসিলির ডিক্টেটার হয়ে বস্‌লেন। তারপর এগিয়ে চল্‌লেন নেপ্‌ল্‌সের দিকে। প্রথম আঘাতেই নেপ্‌ল্‌সের সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। এখানেও জনসাধারণ রাজ্যের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দিল।

ঠিক এই সময় ইতালীয় রাজনীতিতে এক সমস্যা দেখা দিল। আগেই বলেছি, ইতালীর জাতীয় জাগরণের কেন্দ্র সার্ডিনিয়া-পীড্‌মণ্ট্‌ রাজ্য। এখানকার বিচক্ষণ মন্ত্রী কাভূরের উদ্দেশ্য, রাজা ভিক্টর ইম্যান্নুয়েলের পতাকার নীচে আন্‌তে হবে সমগ্র ইতালীয় জাতির একতা। এদিকে ম্যাৎসিনির শিষ্য গ্যারিবল্ডি প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাই কাভূর গ্যারিবল্ডির অসামান্য সাফল্যে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন গ্যারিবল্ডির জয় হলে ইতালীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবে। সেই জন্য তিনি তাঁকে রোম আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করতে বল্‌লেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, রাজা ইম্যানুয়েলের অধীনেই ইতালীয় জাতিকে এক করা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক।

তারপর কি হ'ল? তারপর যা হ'ল তার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে নেই বল্‌লেই চলে। যে বীর বিজয়-গৌরবে রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করে চলেছেন, যিনি ইচ্ছা করলেই সমগ্র ইতালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হতে পারতেন, তিনি আজ হঠাৎ অস্ত্র ত্যাগ করে মাত্র এক বস্তা শস্য সম্বল করে রওনা হলেন তাঁর নিজের

গ্রামের দিকে। রাজনীতির সম্মান বা যশোগৌরব তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। যাবার আগে তিনি দেশবাসীদের ভিক্টর ইম্যানুয়েলের পাশে এক হয়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করে গেলেন। এর পর গ্যারিবল্ডির অসমাপ্ত কাজ কাভুরের নেতৃত্বে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ হ'ল। ইতালী এক জাতিতে পরিণত হ'ল।

আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে গ্যারিবল্ডি আরও বিশ বছর কাপ্রেরা গ্রামে শান্তিতে কাটিয়েছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

---

## বিচিত্র ভারত

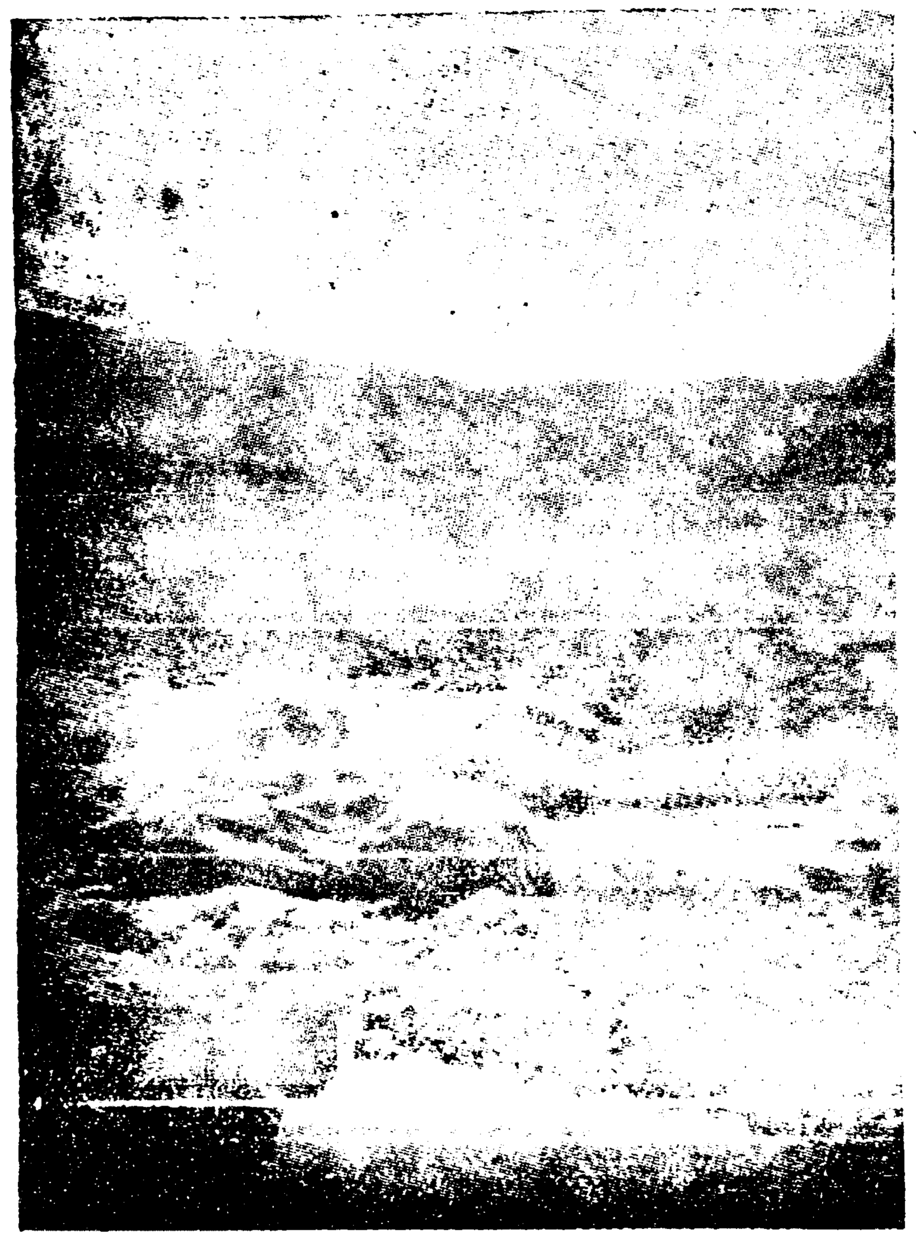

ছোটনাগপুরের
পাহাড়ী নদী

"চলিয়াছ তুমি সড়কের রাজা
কলিকাতা হ'তে পেশোয়ার।"

# মা-কালী দর্শন

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি

সেদিন শ্রাবণ রাতি—
বন্ধু ক'জনে বসেছি বিজনে দালানে মাদুর পাতি'।
এধারে ওধারে আঁধারে সবারি কালো মুখ একাকার,
গল্পের ঘোড়া সময়ের সীমা নিমেষে হতেছে পার।

অমাবস্যাই হবে বোধ করি তিথি—
সুনীল একটা প্রেত-কাহিনীতে জাগায়ে তুলেছে ভীতি :
'মোদের গাঁয়ের পশ্চিম পারে শ্মশানের মাঝখানে
যোগী ছিল এক পিশাচ-সিদ্ধ, কবে আজ কে বা জানে!
মড়ার উপরে বসিয়া সে যোগী করিত ভীষণ হোম,
বহ্নিতে দিত রক্তাহুতি সে চীৎকারি' 'ব্যোম্ ব্যোম্'।
সহসা শ্মশানে হিহি-রব করি' জুটিত ডাকিনী-দল,
মা-কালী স্বয়ং আসিয়া শিয়রে হাসিতেন খলখল্।
মড়াটা বাঁচিয়া নাচিয়া উঠিত ধিন্-তাতা-ধিনা-ধেই,
যোগী উল্লাসে উড়িত আকাশে!—আজি আর কিছু নেই।

নেই কিছু, তবু অমাবস্যার রাতে
আজিও মা-কালী আসেন শ্মশানে ডাকিনী-যোগিনী সাথে।
যদি কেহ যায়, দেখে নিশ্চয়। কিন্তু সাহস কা'র?
দশ টাকা বাজী!—অমাবস্যায় যে-ই যাবে হবে তার।'

আমরা শুনিয়া অবাক্ হইনু—এ যে গো বিষম বাজী,
প্রাণ নিয়ে যেথা টানাটানি, সেথা একাকী যেতে কে রাজী?

কিছু খ্যাতি ছিল সাহসী বলিয়া আমার গাঁয়ের মাঝে,
মাছ-চুরি হ'তে আম পাড়া তক্ দুঃসাহসিক কাজে।

কিন্তু শ্মশানে মা-কালীর দর্শন—
ভাবিতেও গা-টা কাঁটা দিয়ে ওঠে, স্তম্ভিত ভীত মন।
তবু হেসে বলি, "নিশ্চয় পারি শ্মশানে যাইতে রাতে,
শুধু নিয়ে যাব একখানি ছড়ি ছিপ্ছিপে এই হাতে।
দশ টাকা দিয়া ফীষ্ট্ হবে ভালো, দশ জনে খাওয়া যাবে,
ঘি চুরি করিয়া খিচুড়ি রাঁধিব, কচুরিও কিছু পা'বে।

আজকেই যদি অগ্রিম কিছু পাই—"
হেন কালে পাশে চামেলী গাছের পাতা করে শাঁই শাঁই!—
বাতাস বোধ হয়! ফিরে দেখি চেয়ে—গোঁ-গোঁ গোঁ-গোঁ যাই কোথা!
স্বয়ং মা-কালী দাঁড়িয়ে আছেন তিন হাত দূরে হোথা।
মিশ্মিশে কালো করাল মূরতি, গলায় মুণ্ডমালা,
হাতে ইয়া খাঁড়া, কাঁক্ড়ার দাড়া দন্তে রক্ত ঢালা,
মুখে মৃদু হাসি! সর্ব্বনাশী যে আঁধারের বুক চিরে
কোথা হ'তে এল, শুকাইয়া গেল হৃদয়ে শোণিত ধীরে,—
প্রাণবায়ু এসে নাকের ডগায় ক্ষীণ তরঙ্গে দুলে
এখনি মিলায়ে যাবে বুঝি, হায়! মস্তকে খাড়া চুলে
মহারোমাঞ্চ! একি মা ভয়ংকরী,
অবোধ ছেলের বাজী রাখা শুনে এসেছিস্ শঙ্করী!

দুনিয়াটা এল ঝাপ্সা হইয়া,—আঁধার শ্রাবণ রাত্রি,
আকাশের তারা নিবিল চকিতে, মিলায় গ্যাসের বাতি!
মা-কালী তখন পিছু হটিছেন কালো পায়ে চুপি চুপি।
আঁখি মুদিলাম; কাণে পৌছিল,—"আমি এক বহুরূপী।"

---

# নিরুদ্দিষ্টের দল

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম,এ,বি,এল

## ২৩

এ কয় দিন ফরাসী গুহায় সকলেই ভাল ছিল, তবে মননের আচরণে সুশান্ত রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রাণখোলা সদানন্দময় মননের মানসিক জগতে এ কি বিপর্য্যয় আসিল! ভাইএর জন্য সুশান্তরও যেন কিছু ভাল লাগে না। একদিন সুশান্ত মননকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মনন, কি হয়েছে তোমার বল, আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না।" মনন বলিল, "কি হবে? আমার কিছুই হয় নি।" অনেক পীড়াপীড়ির পর সে বলিল, "আচ্ছা, আর একদিন বলব, আজ নয়।"

ধৃত জানোয়ারদের জন্য এইবার একটা ঘরের দরকার। দ্বীপে গাছের অভাব নাই, ছেলেদেরও যন্ত্রপাতির অভাব নাই। কয়েক দিন ধরিয়া ছেলেরা করাত, রাঁদা, বাটালি লইয়া পালিত জন্তুদের জন্য একটি কাঠের ঘর তৈরী করিয়া ফেলিল। ঘরটা তাহারা বেশ বড় রকমেরই করিল, অন্ততঃ গোটা ত্রিশেক জন্তু যাহাতে ভিতরে থাকিতে পারে। ভবিষ্যতে পালিত জন্তুর সংখ্যা যে বাড়িবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? ওদিকে রোহিতাশ্ব রোজ ফাঁদ পাতিয়া রাখে। সেদিন ফাঁদে একটা গুয়ানাকো পড়িল। তারপর সাত দিন যাইতে না যাইতেই একদিন ফাঁদের মধ্যে একসঙ্গে দু'টা ভিকোনিয়া পড়িল। আর একদিন ফাঁদে পড়িল একটা নান্ডু। তাহাকে দেখিয়া সকলে জ্বলিয়া উঠিল। নীলাদ্রি কিন্তু তাহাকে পুনরায় পুষিবার জন্য লইয়া গেল। তারপর ছেলেরা আর একটা কাজ করিল। ফাঁদ দিয়া যখন বনের জন্তু ধরা যায়, আকাশের পাখীই বা কেন ধরা যাইবে না? এ বিষয়ে বুনোর সাহায্য লইয়া তাহারা পাখী ধরিবার ফাঁদ পাতিল। একবেলা ফাঁদের উপর কিছু খাবার রাখিয়া আসিয়া ওবেলা গিয়া দেখে ফাঁদে তিন চারটা পাখী পড়িয়াছে। এইরূপে প্রতিদিন তাহারা নানারকমের পাখী ধরিতে লাগিল—ফেজাণ্ট্, গিনি-ফাউল, টিনমূ, বন্য কপোত, বন-মোরগ, বাস্টার্ড্; সকলের নাম তাহারা জানে না। জাহাজে প্রচুর লোহার জাল ছিল; তাহা দিয়া তাহারা

একটা বড় পাখীর ঘর করিল। যে সব পাখী ফাঁদে পড়িত তাদের আনিয়া তাহারা সেই ঘরে রাখিতে লাগিল। এক মাসের মধ্যেই তাহারা ডিম দিতে লাগিল। কতক ডিম বাচ্চা হইবার জন্ত রাখিয়া দিয়া তাহারা কতক ডিম নিজেদের খাইবার জন্য লইয়া আসিত। এখন তাহাদের বড় সুখের সংসার। খাইবার কোন অভাব নাই। মাংস, ডিম ত' নিত্যই আছে। তার উপর গুহার দুই পাশে সুশান্তর স্বহস্তরোপিত সেই সব্জীবাগান,—এখন এক রকম জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। কত আর তাহারা খাইয়া শেষ করিবে? তার উপর বুনো প্রতিদিন ভিকোনিয়াদের দুধ দুহিয়া আনিত। একটু বোদা গন্ধ হইলেও খাইতে মন্দ নয়। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, শাকপাতা খাইয়া ছেলেদের চেহারা ফিরিয়া গেল। পনেরোটি কিশোর যেন পনেরোটি দেবশিশু,—এক-একটি স্বর্গের এপোলো!

একদিন বুনো বলিল—"তোমরা গুলি করে পাখী মার কেন? তীর-ধনুক ছুঁড়তে পার না? তীর-ধনুকের কথা শুনিয়া রঞ্জিৎ ব্যতীত সমস্ত ছেলেরই হৃদয়ে সেই প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের গোপন অনুরণন জাগিয়া উঠিল। কঙ্কণা নদীর উভয় তীরে নল-খাগড়ার জঙ্গল, তাহার বেত হইতে তীর ও য়্যাশ্ গাছের ডাল হইতে ধনুক প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে দুই চারিদিনের মধ্যেই শঙ্খচূড়, কুণাল ও রোহিতাশ্ব তীর ছুঁড়িতে একেবারে ওস্তাদ্ হইয়া উঠিল। গাছের ডালে কোন পাখী বসিয়া আছে দেখিলেই তাহারা তাহাকে তীর মারিয়া মাটিতে ফেলে। অশোক এখন সকলের উপর কড়া হুকুম জারি করিয়াছে কেহ আর মিছামিছি গুলি-বারুদ নষ্ট করিতে পারিবে না।

আলো জ্বালিবার বাতি প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। জাহাজের পিপা ভর্ত্তি তেলও আর নাই। সুশান্ত স্থির করিল এইবার একদিন সমুদ্রতীরে গিয়া সীল ধরিতে হইবে। আগামী শীতের জন্য এখন হইতেই আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। পরামর্শ মত একদিন সকলে বন্দুক লইয়া সমুদ্রতীরে সীল মারিতে চলিল। প্রথমে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ছোট ছেলেগুলিকে গুহার মধ্যে রাখিয়া যাওয়া হইবে, কিন্তু অশোক কহিল, "সবাই চলুক, ছেলেরা অনেক দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায় নি।" সেদিন আকাশ ছিল অতি পরিষ্কার। সঙ্গে তাহারা দুইটি গুয়ানাকো ও সেই গাড়ীখানা লইয়া চলিল। গুয়ানাকোগুলি এখন বেশ পোষ মানিয়াছে, গাড়ীতে যুড়িয়া দিলে বেশ সুন্দর গাড়ী টানে। গাড়ীর উপর তাহারা গোটা বারো পিপা তুলিয়া দিল। উদ্দেশ্য সমুদ্রতীরেই সীল হইতে তেল বাহির করিয়া পিপা ভর্ত্তি করিয়া গুহায় লইয়া আসিবে। গুহার কাছে সীলগুলিকে আনিলে পচা গন্ধে আর টেঁকা যাইবে না। কঙ্কণা নদীর তীর ধরিয়া তাহারা সমুদ্রের দিকে চলিল। গাড়ীটা দিব্য চলিয়াছে। চার মাইল পথ চলিবার পর আশীষ, রাজীব ও বাব্লু আব্দার ধরিল আর তাহারা হাঁটিতে পারিতেছে না। সুশান্ত



তখন তাহাদের গাড়ীর উপর চাপাইয়া দিল। বেলা দশটার সময় তাহারা স্কুনার উপসাগরের তীরে আসিয়া পৌছিল। দূর হইতে দেখা গেল একেবারে শত শত সীল সুবিস্তৃত বালুচরের উপর খেলা করিতেছে; কেহ কেহ পাথরের উপর হাত-পা ছড়াইয়া রোদ পোহাইতেছে। তাহারা এমন ভাবে পরস্পরকে তাড়া করিতেছিল যেন একপাল ছেলে চোর-চোর খেলিতেছে। ইহারা হয়ত জীবনে কখনো মানুষের মূর্ত্তি দেখে নাই; তাহা না হইলে কি আর অমন নিঃশঙ্ক মনে খেলা করিতে পারে? আর্ক্‌টিক ও য়্যান্‌টার্ক্‌টিক প্রদেশের সীলগুলি কিন্তু এ রকম নির্ভাবনায় খেলা করে না। তাহাদের দলের এক-একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বি চারিধারে বসিয়া মাথা উঁচু করিয়া পাহারা দিতে থাকে, তাহাদের সতর্ক নয়ন কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে দূর সমুদ্রবক্ষে কোন শিকারীর নৌকা আসিতেছে কি না। কিন্তু এই দ্বীপের সীলগুলির সেরূপ কোন সতর্ক ভাব দেখা গেল না। তাহা হইলেও ছেলেদের খুব সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমে তাহারা সেইখানে তাঁবু ফেলিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া লইল। এইবার সীল-বধের আয়োজন করিতে হইবে। বুনোর কাছে ধ্রুব, আশীষ, রাজীব ও বাব্লু বসিয়া থাকিবে। খিয়্যারকেও তাহারা সঙ্গে লইবে না।

এই রকম বন্দোবস্ত করিয়া বাকী কয় জনে বন্দুক হস্তে সমুদ্রতীরে অগ্রসর হইল। আজ আর গুলির মায়া করিলে চলিবে না। এখন যত সীল মারা যাইবে ততই ভালো। প্রথমে তাহারা পরস্পরের মধ্যে পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রাখিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে দুই দিক্ হইতে সমুদ্রতীরে জড় হইতে লাগিল। তারপর রঞ্জিতের সঙ্কেত পাইবা মাত্র সকলে দমাদম্ গুলি চালাইতে লাগিল। একটা গুলিও ব্যর্থ হইল না; প্রত্যেক গুলিতেই এক-একটা সীল বালির উপর শুইয়া পড়িল। যাহারা আহত হইল না, তাহারা মাথা উঁচু করিয়া লেজ ও পা নাড়িতে নাড়িতে সমুদ্রজলে হুড়মুড় করিয়া গিয়া পড়িল। রঞ্জিতের মধ্যে তখন ক্ষাত্রতেজ পরিপূর্ণ রূপে দেখা দিল। বন্দুক ফেলিয়া রিভলভার হস্তে সে তখন চরকির মত সীলদের পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল। দৃঢ় দুর্দ্দমনীয়তায় তাহার সমস্ত শরীর-মন তখন কঠোর, দুই পায়ে তখন সরীসৃপের লঘুতা। সে তখন একাই একশ'। সাহস, বিক্রম ও তৎপরতায় সে সকলকে অবাক্ করিয়া দিল। রঞ্জিতের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে সভয়ে পিছনে সরিয়া গেল; শেষে সীল মারিতে গিয়া একটা ছেলে রঞ্জিতের হাতে প্রাণ দিবে? পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সীল শিকার শেষ হইল। তখন গণিয়া দেখা গেল গোটা ত্রিশেক সীল বালির উপর মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সীলগুলিকে তখন সকলে আর স্পর্শ [illegible] করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল। কঙ্কণা নদীর জলে স্নান করিয়া সকলে একটু বিশ্রাম করিতে বসিল। বেলা দুইটার সময় তাহারা ছুরি ও কুড়াল লইয়া পুনরায় সমুদ্র-

তীরে চলিল। এইবার আরম্ভ হইল এক বীভৎস কার্য্য। সমস্ত বিকাল ধরিয়া তাহারা সীলগুলিকে ছাড়াইয়া ভিতরকার মাংস খণ্ড খণ্ড করিল। রক্ত, চর্ব্বি ও মাংসের টুক্‌রায় সকলের দেহ পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এখন ঘৃণা করিলে চলিবে কেন? ওদিকে কিছু দূরে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া উনানের মত করিয়া তার উপর বুনো প্রকাণ্ড কড়া চাপাইয়াছে। কড়াতে জল দিয়া উনানে সে আগুন ধরাইল। তারপর সীলগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া সেই বড় বড় মাংসের টুক্‌রা তাহারা কড়ায় চাপাইয়া দিল। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই উপরে পরিষ্কার তেল ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। একটু মোটা পর্দ্দা মতন হইলেই তাহারা হাতা দিয়া সেই তেল কড়া হইতে পিপাতে ঢালিতে লাগিল। দুর্গন্ধে সেখানে তখন দাঁড়ানোই কষ্টকর। নাক টিপিয়া তাহারা কোনক্রমে অতিকষ্টে সেই দুরূহ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিল। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত মাংস সিদ্ধ হইল। তখনো অর্দ্ধেক মাটীতে পড়িয়া আছে। পরের দিন সকালে তাহারা পুনরায় মাংস সিদ্ধ আরম্ভ করিল। বিকাল পর্য্যন্ত সেই কার্য্য চলিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ আর কোন সীল দ্বীপে উঠিল না! বেচারীরা ভয়ানক ভয় পাইয়াছে। সন্ধ্যার সময় বারোটা পিপা তেলে ভর্ত্তি হইল। সেই শত শত গ্যালন তেলে তাহাদের সারা শীতটা চলিয়া যাইবে। বাতির জন্য আর তাহাদের ভাবিতে হইবে না।

দেখিতে দেখিতে বড়দিন আসিয়া পড়িল। এ দ্বীপে তখনও ভরা গ্রীষ্মকাল। বড়দিন শুধু খৃষ্টানদের উৎসব হইলেও সব ধর্ম্মের লোকই ইহাতে যোগ দেয়। ছেলেরাও ঠিক করিল তাহারা ঐ দিন উৎসব করিবে। সমস্ত কাজ বন্ধ রাখিয়া দিয়া সকলে বড়দিন করিতে বসিল। ফরাসী গুহার দুয়ারটি তাহারা রঙ্-বেরঙের নিশান ও লতাপাতার শিকল দিয়া সাজাইল, চারিদিকে রঙিন ফানুষ ঝুলাইয়া দিল। সকালে রঞ্জিৎ, কামানে বারুদ পূরিয়া ফাঁকা শব্দ করিল। তাহাদের সঙ্গে যে দুইটা বড় পিতলের কামান আছে তাহার কথা তোমরা বোধ করি ভোল নাই। সেই দুইটা তাহারা বন্দুকের ঘরে রাখে নাই; ফরাসী গুহার দুয়ারের দুই দিকের দুইটা ঘুল্‌ঘুলির মধ্যে মুখ দুইটা ঢুকাইয়া তাহাদের রাখিয়া দিয়াছিল। এ দুইদিন ছেলেরা ভালো পোষাক পরিয়া চারিদিকে হল্লা করিয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দুইটা আগুতি দিয়া বুনো সুন্দর কুর্ম্মা রাঁধিয়াছিল; সকলে তাহা পেট ভরিয়া খাইল। সারা দুপুর ও বিকাল ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা চলিল। খেলিবার সমস্ত সরঞ্জামই জাহাজে ছিল। রাত্রিতে থিয়েটারের আয়োজনও হইল। সেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস্ সিজর' ও 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস্' গ্রন্থদ্বয়ের বাছাই বাছাই দৃশ্য অভিনীত হইল। তক্তা পাতিয়া তাহারা একটা ষ্টেজের মত করিয়াছিল; জাহাজের পাল দিয়া ড্রপ্ সিনেরও



ব্যবস্থা হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে রঞ্জিতের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া সকলে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

ক্রমে ইংরাজী নববর্ষ আরম্ভ হইল। দ্বীপে যে তাহাদের কতগুলা নববর্ষ উৎযাপন করিতে হইবে তাহা শুধু ভগবান্‌ই জানেন। আজ দশ মাস তাহারা এই নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব দ্বীপে আসিয়া উঠিয়াছে, পরিত্রাণের কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না। জীবনযাত্রার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তাহারা নিজেদের বুদ্ধিবলে সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু দেশের মায়া আজও ভুলিতে পারে নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের কত শত শত জাহাজ দিবারাত্র পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু এমন দ্বীপে তাহাদের নির্ব্বাসন হইল যাহার ত্রিসীমানা দিয়াও কোন জাহাজ যায় না! যাই হোক্, ভগবানের অসীম দয়া যে আজ পর্য্যন্ত কাহারও তেমন বড় অসুখ হয় নাই। ওদিকে আর কয়েক মাস পরেই শীত পড়িতে আরম্ভ করিবে। দক্ষিণ মেরুর সেই ভয়ঙ্কর শীত কি তাহাদের পুনর্ব্বার ভোগ করিতে হইবে?

(ক্রমশঃ)

---

## সেলুলয়েডের কথা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

তোমরা সেলুলয়েডের তৈরী জিনিষপত্র সর্ব্বদাই ব্যবহার কর্‌ছ। চিরুণী, টুথ্‌ব্রাশ, সাবানের কেস্, পাউডারের কৌটো, চুলের কাঁটা, বোতাম, ছুরির বাঁট, ছাতার বাঁট—সব কিছুই আজকাল সেলুলয়েড্ দিয়ে তৈরী হচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলা দেখতাম ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সরঞ্জাম ছিল, সাধারণতঃ চীনে-মাটী আর টিনের তৈরী; কিন্তু আজকাল তার বদলে দেখা যায় সেলু-

লয়েডের তৈরী খেলনাতেই তাদের পুতুলের বাক্স ভর্ত্তি। গত ২৫।৩০ বছরের মধ্যে সেলুলয়েডের ব্যবহার অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে।

সেলুলয়েড্ জিনিষটা কেমন ক'রে তৈরী হয় জান কি? এর আবিষ্কারের গল্পটা বেশ মজার। তোমরা বিলিয়ার্ড্ খেলা নিশ্চয়ই দেখেছ, কেউ কেউ হয়ত খেলতেও অভ্যস্ত। বিলিয়ার্ড্ খুব পোষাকী খেলা—অর্থাৎ এর সাজ-সরঞ্জাম খুব ব্যয়বহুল। আগেকার দিনে এই বিলিয়ার্ড্ খেলায় যে সব বল্ ব্যবহার করা হ'ত তা তৈরী হ'ত হাতীর দাঁত (ইংরেজীতে যাকে বলে "আইভরী") দিয়ে। হাতীর দাঁত খুব সুলভ জিনিষ নয়, তা ছাড়া বিলিয়ার্ড্ বল্ তৈরী করতে হ'লে খুব মোটা মোটা দাঁত না হ'লে চল্‌ত না। অথচ বিলিয়ার্ড্ বলের চাহিদা ছিল প্রচুর—কারণ বিলিয়ার্ড্ খেলাটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে পড়ছিল। তখন চেষ্টা হ'তে লাগ্‌ল আর কোনও জিনিষ দিয়ে বিলিয়ার্ড্ বল্ তৈরী করা যায় কিনা—যা হবে হাতীর দাঁতের মত শক্ত, হাতীর দাঁতের মত মজবুত এবং হাতীর দাঁতের মতই সুন্দর; অথচ দামে হবে হাতীর দাঁতের চাইতে অনেক সস্তা। এক কথায় নকল্ হাতীর দাঁত চাই। একদিন আমেরিকার এক কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা গেল—যে এই ধরণের সব চেয়ে ভাল জিনিষ আবিষ্কার করতে পারবে তাকে নগদ দশ হাজার ডলার (অর্থাৎ প্রায় ৩০ হাজার টাকা) পুরস্কার দেওয়া হবে।

জন্ হায়াট্ নামে একটি অল্পবয়সী আমেরিকান্ ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করতেন। কম্পোজিটারের কাজ করতেন বটে কিন্তু তাঁর নজর ছিল নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে। শুধু যে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তা নয়—কি ক'রে দু'পয়সা আয় বাড়ে সেই মতলবে। এদিকে তাঁর মাথাও বেশ খুল্‌ত। কাগজে ঐ বিজ্ঞাপনটা দেখে আর পাঁচ জনের মত তাঁরও সাধ হ'ল—একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে দোষ কি!

কথায় বলে পুরুষকার জিনিষটা যার আছে দৈবও তাকে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। একদিন হায়াট্ ছাপাখানায় কাজ করছেন, হঠাৎ কি ক'রে খোঁচা লেগে তাঁর আঙ্গুলটা গেল কেটে। কাটা যুড়বার একটা



ভাল ওষুধ হচ্ছে কলোডিয়ন্। প্রাথমিক শুশ্রূষার ওষুধ হিসাবে জিনিষটা কারখানা প্রভৃতিতে সব সময়ে হাতের কাছে মজুত রাখা হয়। হায়াট্ তাড়াতাড়ি হাতে কলোডিয়ন্ লাগাতে গিয়ে দেখেন কে যেন সমস্ত কলোডিয়ন্ টেবিলে ঢেলে ফেলেছে। প্রথমটা তাঁর হ'ল রাগ, কিন্তু একটু পরেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে তাঁর রাগ জল হয়ে গেল। টেবিলের ওপরে যে কলোডিয়ন্ পড়ে ছিল তা একটু বাদেই জমাট বেঁধে শক্ত জিলেটিনের মত হয়ে গেছে। হায়াটের খেয়াল হ'ল—এ জিনিষটার সাহায্যে নকল আইভরী তৈরী করা যায় না কি! যেমনি ভাবা অমনি সুরু হ'ল পরীক্ষা। কলোডিয়নের সঙ্গে হাতীর দাঁতের গুঁড়ো মিশিয়ে পরীক্ষা চল্‌ল। দেখা গেল, ভাল করে মিশিয়ে সেই মিশ্রণ যদি গালিয়ে নেওয়া যায় তবে ছাঁচে ফেলে তা দিয়ে বিলিয়ার্ড্ বল্ তৈরী করা কষ্টকর নয়। ঠাণ্ডা হ'লেই জিনিষটা দাঁড়াবে আইভরীর মত শক্ত।

হায়াটের বল্ তৈরী হ'ল, কিন্তু গোল একেবারে চুক্‌ল না। আসল হাতীর দাঁতের চাইতে এই জমানো আইভরী-গুঁড়ো অনেক সস্তা হ'লেও খুব নিরাপদ নয়। তোমরা গান্ কটনের নাম শুনেছ কি? তুলোর সঙ্গে নাইট্রিক্ এসিড্ মিশিয়ে এটি তৈরী হয়। তুলোর আসল উপাদানকে বলে সেলুলোজ্, তাই রাসায়নিক ভাষায় গান্ কটন্‌কে বলা হয় নাইট্রোসেলুলোজ্ বা আরও ঠিক ভাবে—সেলুলোজ্ হেক্সানাইট্রেট্। নানা রকম বিস্ফোরক তৈরী করতে হ'লেও এই নাইট্রোসেলুলোজ্ ব্যবহার করতে হয় (যেমন কর্ডাইট্, ব্লাষ্টিং জিলেটিন্ প্রভৃতি)। কলোডিয়ন্ জিনিষটাও আবার তৈরী হয় এই গান্ কটন্ জাতীয় সেলুলোজ্ নাইট্রেট্‌কে য়্যাল্‌কহল্ ও ইথারে ভিজিয়ে। কাজেই তা দিয়ে তৈরী বিলিয়ার্ডের বল্ যে সময় সময় আচম্‌কা ফেটে গিয়ে ভয়াবহ কাণ্ড বাধাবে না তা কে বলতে পারে? একবার নাকি হ'লও তাই। এক ভদ্রলোক সিগারেট খেতে খেতে বিলিয়ার্ড্ খেলছিলেন, হঠাৎ সিগারেটটা আল্‌গা হয়ে পড়্‌ল হায়াটের তৈরী বলের ওপর—অমনি সে বল্ বোমার মত ফেটে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌ল। কাজেই হায়াট্‌কে আবার নতুন ক'রে গবেষণা সুরু করতে হ'ল।

হায়াট্ একাই যে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তা যেন মনে ক'র না। আরও অনেক বৈজ্ঞানিক সেই সময় নকল আইভরী আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন। ১৮৫৫ সনে আলেক্‌জাণ্ডার পার্ক্‌স্ নামে একজন ইংরেজ নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর আর ক্যাষ্টর অয়েল মিশিয়ে এক রকম নকল আইভরী তৈরী করেন। তার কয়েক বছর পরে ড্যানিয়েল স্পিল্ নামে আর এক ভদ্রলোক অনেকটা ঐ ভাবে আর একটু উন্নত ধরণের জিনিষ তৈরী করলেন। কিন্তু নিখুঁত কোনটাই হ'ল না। খবরটা হায়াটের কানে গেল। কর্পূরের ব্যবহারটা তাঁর মনে বড় ধরল। পরীক্ষা করতে করতে দেখা গেল শুধু কর্পূর আর নাইট্রো-সেলুলোজ্ মিশিয়ে গালিয়ে ফেলতে পারলে তা পরস্পর মিশে এক হয়ে যায় এবং তা ফেলে রাখলে এক রকম স্বচ্ছ অথচ হাতীর দাঁতের মত শক্ত জিনিষে পরিণত হয়। জিনিষটা গরম করলে নরম হয়ে যায়, তখন তাকে ছাঁচে ফেলে তা দিয়ে যেমন খুসী জিনিষ গড়া যায়। ঠাণ্ডা হ'লেই আবার তা' হয় দারুণ শক্ত। হায়াট্ দেখলেন, এ দিয়ে শুধু বিলিয়ার্ড বল্ই তৈরী করা যাবে না—আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য এর সাহায্যে করা যেতে পারবে। এই আশ্চর্য্য জিনিষটার নাম দেওয়া হ'ল সেলুলয়েড্। হায়াট্ আর বেশী দেরী না ক'রে তাঁর ভাইদের নিয়ে নিউ ইয়র্ক্ সহরে সেলুলয়েডের এক কারখানা খুলে বসলেন। সেটা ১৮৬৮ সন।

আজকাল পৃথিবীর নানা দেশে সেলুলয়েড্ তৈরী হচ্ছে। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যাণ্ড এবং বিশেষ ক'রে জাপান এ ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করেছে। আমাদের দেশেও এর কারখানা বসেছে।

আজকাল সেলুলয়েড্ কয়েক রকম প্রণালীতে তৈরী হয়। তার একটা শোন। প্রথমে তূলো, কাঠ কিংবা কাগজ ( এগুলোর সবেরই আসল উপাদান সেলুলোজ্ ) নিয়ে খুব ঘন নাইট্রিক্ এবং সালফিউরিক্ এসিডের সঙ্গে মিশিয়ে অনেকটা গান্ কটন্ জাতীয় একটা পদার্থ তৈরী করা হয়। তার পর সেটা পরিষ্কার করে, ধুয়ে, শুকিয়ে একটা বড় পাত্রে কর্পূরের সঙ্গে খুব ভালো করে মেশান হয়, আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয় এমন কোন তরল পদার্থ যার মধ্যে দু'টো



জিনিষই 'গলে যেতে পারে অথচ যা গরম করলেই উড়ে যায়। কেউ কেউ এসিটোন ব্যবহার করেন। এর পর মেশান হয় আরও কতকগুলো মশলা ( রঙ্গিন সেলুলয়েড্ তৈরী করতে হ'লে নানা রকম রং )। সমস্ত জিনিষটা হয় তখন জিলেটিনের মত চট্‌চটে। এইবার সেটাকে নিয়ে গরম রোলারে চাপ দিয়ে সহজেই লম্বা লম্বা চাদর তৈরী ক'রে ফেলা যায়। কাজ অবশ্য এখানেই শেষ হয় না। এর পর ঐ সেলুলয়েডের চাদরে চাপ দিয়ে, শুকিয়ে, ভিতরের তরল পদার্থ সবটা তাড়িয়ে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করে নিতে হয়।

সেলুলয়েডের গুণের কথা তোমরা কিছু কিছু জান। গরম জলে দিলে সেলুলয়েড্ নরম হয়ে যায়, তখন তাকে ছাঁচে ফেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়। সেলুলয়েড্ রং করাও বেশী কষ্টকর নয়,—স্বাভাবিক অবস্থায় জিনিষটা থাকে স্বচ্ছ কাচের মত, ঈষৎ পীতাভ,—রং মেশালে যে কোনও রং গ্রহণ করতে পারে। উপরের অংশ রং ক'রে ভিতরটা স্বচ্ছ রাখা কিংবা ভিতরটা রং ক'রে উপরটা স্বচ্ছ রাখাও কঠিন নয়। ইচ্ছে করলে আবার নানা রকম রংএর কারিকুরিও খেলান যায়। রাতদিন ব্যবহারের পক্ষে শক্ত হ'লেও সেলুলয়েড্‌কে ইচ্ছামত কাটাকুটি করা চলে। দরকার হ'লে কাগজের মত পাৎলা করা যায়। যায় ব'লেই আজ বায়স্কোপে দেখান সম্ভব হচ্ছে। বায়স্কোপের যে ফটো তা খুব পাৎলা সেলুলয়েডে তৈরী ফিতের ওপর তোলা হয় তা বোধ হয় জান। সেগুলিকে বলে ফিল্ম্। ও রকম পাৎলা ব'লেই শত শত ফুট ফিল্ম কাঠিমে জড়িয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছে, নইলে সাধারণ ফটোর মত কাচের প্লেটের ওপর তুলতে হ'লে আর তা পারা যেত না। বায়স্কোপ্-ফিল্মের জন্য সেলুলয়েডের ব্যবহার বিখ্যাত ইষ্টম্যান্ সাহেবের আবিষ্কার। সেলু-লয়েড্‌কে কত পাৎলা করা সম্ভব সে সম্বন্ধে এটুকু বল্‌লেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে একবার এক্স-রে নিয়ে গবেষণা করবার জন্য এক ইঞ্চির আড়াই লক্ষ ভাগ, পুরু সেলুলয়েডের ফিতে তৈরী করা হয়েছিল। বায়স্কোপের ফিল্ম ছাড়া আরও অনেক বড় বড় ব্যবসায়ে সেলুলয়েড্ ব্যবহৃত হচ্ছে,—যেমন ধর, নানা রকম বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে, টেলিফোনের মাউথ্‌পীস্

তৈরীর কাজে, ইত্যাদি। সাধারণের ব্যবহার্য্য ছোটখাট জিনিষের কথা তো আগেই বলেছি।

সেলুলয়েডে সব চেয়ে বড় অসুবিধা—জিনিষটা বড় সহজেই জ্বলে ওঠে। এর প্রতিকারের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা নানা রকম চেষ্টা করছেন। যেমন ধর—সেলুলয়েড্ তৈরীর সময়ে যদি তা'তে এমন কোন মশলা মিশিয়ে দেওয়া যায় যা গরম হ'লেই তা থেকে এমন একটা গ্যাস বেরোবে যা আগুন নেভাতে সাহায্য করবে। কেউ কেউ নাকি কিছুটা সফল হয়েছেনও তবে এখনও সম্পূর্ণ 'নিরাপদ সেলুলয়েড্' বার করা যায় নি। সেলুলয়েডের দ্বিতীয় অসুবিধা—তার কর্পূর। এই কর্পূরের গন্ধ সেলুলয়েড্ তৈরী হবার পরও তা'তে থেকে যায়। তা ছাড়া জিনিষটার দামও অনেক। কর্পূরের পরিবর্ত্তে ঐ জাতীয় অথচ ওর চাইতে সস্তা অন্য জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা তাই নিয়েও যথেষ্ট পরীক্ষা চলছে।

---

## "পরের উপকার ক'র না"

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

নিধু খুড়োর বাইরে ঘরে বসে আছি সেদিন—নিধু খুড়ো আর আমরা কয়েকটী বন্ধু। সামনে চায়ের কাপ্; গল্প জমেছিল বেশ জমাটী ভাবেই।

গল্পের মাঝে, দত্তপাড়ার নিবারণ কোথা থেকে হঠাৎ ধূমকেতুর মত এসে উদয় হ'ল।

খুড়ো জিজ্ঞাসা করলে—"কি হে, খবর কি? হঠাৎ অসময়ে হাজির যে?"

নিবারণ বল্লে—"ভীষণ বিপদে পড়েছি, খুড়ো!"

নিবারণ প্রায়ই ভীষণ বিপদে পড়ে থাকে—ওটা ওর অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা তাই মোটেই চিন্তিত না হয়ে একটু হেসে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ও সে সব কিছু লক্ষ্য না করে' খুড়োর দিকে অতি কাতর ভাবে তাকিয়েই বল্লে



—"বিশ্বাস কর খুড়ো, সত্যিই ভীষণ বিপদে পড়েছি। তোমাকে আমার একটু উপকার করতেই হ'বে।"

খুড়ো হঠাৎ যেন আঁতকে উঠল মনে হ'ল। হাত দুটো যোড় করে বল্লে—"ঐটে আর করছি না—ক্ষমা করতে হবে আমাকে।"

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে বল্লাম—"কোন্‌টা কর্‌ছ না?"

খুড়ো বল্লে—"ঐ পরের উপকার ব্যাপারটা।"

জনার্দ্দন হেসে বল্লে—"সে কি হে খুড়ো, পরের উপকার না করলে তুমি বাঁচবে কি ক'রে? পরের উপকার করাটা ত' তোমার একটা প্রাত্যহিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।" বিনয় বল্লে—"পরের উপকার ক'রে সেই পরের কাছে গালাগালিও ত' খেয়েছ যথেষ্ট,—তবুও ত' হার মান নি। তবে? এবার হ'ল কি হে?"

খুড়ো মুখটাকে বাংলা পাঁচের মত বিকৃত করে' বল্লে—"বড়ই ঘা খেয়েছি হে, সেদিন পরের উপকার করতে গিয়ে। পরের ভাল করতে গিয়ে অনেক দুর্নাম কিনেছি সত্যি, কিন্তু এতদিন তাতে কিছু যায় আসে নি, কারণ মনের মাঝে একটা সান্ত্বনা ছিল সব সময়েই যে—দিক না আমাকে গালাগালি, পরের ভাল করতে পেরেছি ত'। কিন্তু, সেদিন—ছিঃ ছিঃ! একজনের উপকার করতে গিয়ে তার মহা অপকার ক'রে এলাম হে! অনিচ্ছাসত্ত্বে,—একেবারে অজানতে ভদ্রলোকের ছেলেটীর একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে এলাম—এ দুঃখ আমার আর মরলেও যাবে না।"

ব্যাপারটা শুনবার জন্য সকলেই আমরা বেশ উৎসুক হয়ে উঠলাম, এমন কি নিবারণও।

খুড়ো একটু চুপ করে থেকে আবার সুরু করলে—"ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছি আজ প্রায় বিশ বৎসর—নওগাঁ থেকে কলকাতা। ট্রেনে কত রকমের লোককে কত রকম ভাবেই না উঠ্‌তে, নাম্‌তে দেখি—কত লোককে বিপদে পড়তে দেখেছি ট্রেনে উঠ্‌তে গিয়ে বা ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে।

"সেদিনও চলেছি কলকাতায়, আমাদের কামরাটায় কি অসম্ভব ভীড়, পণ্ডিতেরা যাকে বলেন "ন স্থানং তিল ধারণে" আমি বসে আছি কামরাটার দরজার একেবারে ধারে। এক একটী ষ্টেশন আস্‌ছে, আর ঐ দরজার সামনে হৈ হৈ কাণ্ড বেধে যাচ্ছে। ঐ দেড় হাত চওড়া দরজার মধ্যে দিয়ে বহুলোক একসঙ্গে প্রবেশ করার কি আপ্রাণ চেষ্টা রে বাবা! কত রকম লোক—মোটা, রোগা, লম্বা, বেঁটে, বুড়ো, বাচ্চা—সবাই চায় ট্রেনের মাঝে আগে ঢুক্‌তে; এর মধ্যেই দু' একজন লোকের আবার নামাও চাই ট্রেন থেকে।

"বিজনপুর ষ্টেশন। আমার দরজার সামনে সেই একই রকম ঠেলাঠেলি। আমি নির্ব্বিকার ভাবে বসে দেখ্‌ছি।

"হঠাৎ দেখি, ভীড়ের মধ্যে একটী সতেরো-আঠারো বৎসরের ছেলের সে কি আকুলি বিকুলি ট্রেনে ওঠ্‌বার জন্য! সতেরো আঠারো বৎসরের ছেলে—দুর্ব্বল নয়, বেশ যোয়ান। তবুও সে যে কি অসহায়! বাহুবলই মানুষের বল। কথায় বলে, "বলং বলং বাহুবলম্—" সেই বাহু দুটীই তার অকর্ম্মণ্য, থেকেও নেই;—দেখি কি, হাত দুটী তার সামনে দিকে প্রসারিত, দুটী হাতের মাঝে হাত দেড়েক ফাঁক। হাত দুটী তার একেবারে অনড়, দেখ্‌লে মনে হয় তার সে হাত দুটী বুঝি কাঠের।

"বুঝলাম—বেচারার হাত দুটীতে পক্ষাঘাত হয়েছে, কিংবা কোনও রকম আঘাত লেগে ঐ রকম অনড় হয়ে গেছে। মনটা মহা এক ব্যথায় ভরে উঠ্‌ল। ভাবলাম,—বিধির মার দুনিয়ার বার। অমন সুন্দর সুস্থ ছেলেটী—অথচ কতখানি অসহায় বেচারা এই বয়স থেকে। হয়ত ওর আপনার বল্‌তে নেইও বিশেষ কেউ। তা না হ'লে ঐ রকম পঙ্গু ছেলেকে কেউ ট্রেনে যাওয়ার জন্য এমনি একা ছেড়ে দেয়!

"কিন্তু, ভাববার আর তখন সময় ছিল না। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে, সকলেই একরকম করে উঠে পড়েছে। ছেলেটী তখন অতি কষ্টে দরজার উপর দু'হাতের কনুই দুটো রেখে বুকে ভর করে' উঠবার চেষ্টা করছে। সর্ব্বনাশ! ট্রেন ছেড়ে দিল!! ছেলেটা কাটা পড়ে যে!!! লাফিয়ে উঠে গিয়ে নিরুপায় হ'য়ে ছেলেটীর ঐ হাত দুটো ধরেই হেঁচকা টান দিয়ে ট্রেনের ভিতরে এনে ফেললাম।

"আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমার ঐ টানের চোটে ওর হাত দুটো সোজা হয়ে গেল! শুধু সোজা হয়ে গেল তাই নয়, হাত দুটো নিজে থেকে তুলেই দেখলাম—ও ওর নিজের চোখ দুটো ঢাকল—কামরার মেঝেতে বসে বসেই!

"আমার মনটা এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরে' গেল। ছেলেটীর শুধু প্রাণরক্ষা করতে পারলাম তাই নয়, ওর এত দিনের ব্যাধিগ্রস্ত হাত দুটীও আজ এই আকস্মিক ঘটনাচক্রে পড়ে আরাম হয়ে গেল। এ রকম হয়—শুনেছিলাম গল্প দু'-একটা। আকস্মিক কোনও কারণে মানুষের কোনও অঙ্গ আটকে গিয়ে কাঠের মত অনড় হয়ে যায়—আবার আকস্মিক ভাবেই তা অনেক সময় এমনি কোন আঘাতে সেরেও যায়। যাক, আমি নিমিত্ত মাত্র, তবুও ছেলেটী সেরে গেল ত'! বড় আনন্দ পেলাম, বড় আনন্দ পেলাম মনে।

"কিন্তু, ছেলেটীর দিকে তাকিয়ে দেখি—ও দুই চোখে হাত দিয়ে কাঁদছে যে! দারুণ কাঁদছে! চোখের জলে ওর বুক ভেসে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না প্রথমে—আমি কেন, সেখানে উপস্থিত কেউই বুঝ্‌ল না।

"মনে করলাম,—বেচারার বোধ হয় লেগেছে হাত দু'টোয়, কিংবা, কিংবা হয়ত



ওটা আনন্দাশ্রু। অপ্রত্যাশিতভাবে হাত দুটো সেরে যাওয়ায় আনন্দেই হয়ত' ওর চোখে অশ্রুর বান ডেকেছে।

"আমি বল্‌লাম—'হ্যা হে! কাঁদছ কেন তুমি? কাঁদবার কি হয়েছে?'

"ছেলেটী মুখ থেকে হাত না সরিয়েই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে শুধু—'কেন—কেন আপনি আমাকে হাত ধরে টেনে তুল্‌তে গেলেন?'

"একজন ভদ্রলোক বল্‌লেন—একটু যেন চটেই বল্‌লেন, 'আরে, ভাল করলে মন্দ হয়। ও ভদ্রলোক তোমার হাত দুটী ধরে টান দিয়ে না তুল্লে যে ট্রেনের চাকার তলায় চলে যেতে এতক্ষণ!'

"ছেলেটী বল্‌লে—'এর চেয়ে আমার ট্রেনের চাকার তলায় যাওয়াও ভাল ছিল।'

"একজন আমার পাশ থেকে বল্‌লেন—'আচ্ছা ত্যাঁদোড় ছেলে তো মশায়! ছোঁড়াটাকে প্রাণে বাঁচালেন, অথচ—'

"তাঁর কথায় বাধা দিয়ে আমি বল্‌লাম—'আহা, ওর হাত দুটীতে হয়ত ভয়ানক লেগেছে—' বলে ছেলেটীকে বল্‌লাম—'তোমার হাতে লেগেছে খুব? যন্ত্রণা হচ্ছে কি ভাই, ভয়ানক? একটু সহ্য কর—ও যন্ত্রণা একটু পরেই সেরে যাবে। মনে কর দেখি, তোমার হাত দুটো কি রকম অনড় হয়ে আটকে গিয়েছিল, আজ এই আকস্মিক ব্যাপারে একেবারে সেরে গেল তোমার হাত দুটো—'

"ছেলেটী এবার প্রায় আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠ্‌ল, বল্‌লে, 'কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি আমার হাতে। আপনাদের সকলের মতই আমার হাত সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ—'

"আমি এবং অন্যান্য সকলে যেন আকাশ থেকে পড়লাম। ছোকরা বলে কি!

"ভাবলাম,—পাগল নয় ত? তক্ষণি মনে হ'ল, পাগলেও নিজের প্রাণের মায়া রাখে। কিন্তু, এ ছোকরা যে হাত দুটোকে অমনি করে রেখে ট্রেনে উঠ্‌তে গিয়ে প্রাণটা দিতে বসেছিল—

"একজন জিজ্ঞাসা করলেন—'হাত দুটী যদি সুস্থ সবলই ছিল, তবে ও রকম করে হাত দুটোকে রেখেছিলে কেন? মর্‌তে বসেছিলে যে!'

"ছেলেটী বল্‌লে—'পিসীমা……' বলেই ও হঠাৎ থেমে গেল। ওর ফরসা মুখটা কালো হয়ে কি রকম যেন কুঁচকে গেল। ও যেন কি একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি দেখে শিউরে উঠ্‌ল মনে হ'ল।

"সকলে চুপ্। ও যেন একটু ধাতস্থ হ'ল খানিক পরে। বেশ বুঝ্‌ল, সকলেই ব্যাপারটা শুন্‌তে চায় ওর কাছ থেকে। বোধ হয় তাই আস্তে আস্তে সুরু করল: 'আমার

পিসীমাকে আপনারা কেউই জানেন না নিশ্চয়, জানলে পরে আর তাঁর নাম উচ্চারণ করার পরও আপনাদের মুখের ভাব ও রকম থাকৃত না—বুকের মধ্যে এতক্ষণ গুড়্ গুড়্ করতে সুরু করত ভয়ে। বুঝলেন? ভাবছেন হয়ত, একটু বেশী ভারিক্কে, কিংবা একটু বেশী রাগী, কিংবা একটু বেশী খিটখিটে? উঁহু, তা নয়, ও সব ত' সাধারণ ব্যাপার। আমার পিসীমা—এক কথায় যাকে বলে—"স্পেশাল্ পিসীমা"। পিসীমার ভয়ে বাড়ীতে কাক-চিল বস্‌তে সাহস পায় না। সেই কবে ছোট বেলায় বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এসেছেন। সেই থেকে তাঁর ইচ্ছামত আমাদের বাড়ীর সকলকে চল্‌তে হচ্ছে। আমাদের বাড়ীর সকলে কেন—পাড়ার সকলকেও চল্‌তে হয় প্রায়। আমার মনে হয়, তিনি ইচ্ছা করলে জগৎ-সংসারকেই তাঁর ইচ্ছামত চালাতে পারেন। তিনি যদি সূর্য্যদেবকে একটা হুমকি দিয়ে বলেন—"কাল থেকে পূব দিকে না উঠে পশ্চিম দিকে উঠবি" সূর্য্যদেবও, বোধ হয়, তা হ'লে ভয়ে ভয়ে পর দিন থেকে পূব দিকে না উঠে পশ্চিম দিকেই উঠ্‌বেন। কি দুর্দ্দান্ত প্রতাপ! ভাবতে পারেন—একজন মানুষ জীবনে কোনও দিন হাসে নি? তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে এমন লোক ত' আজ পর্য্যন্ত দেখি নি। তাঁর আদেশ অর্ডিন্যান্স জারিরও বাবা; বুঝলেন? সেই পিসীমা আমাকে আজ সকালে ডেকে বল্‌লেন—"বিশু, তুই কলকাতায় যাচ্ছিস ত'? আসবার সময় খুকীর (মানে পিসীমার একমাত্র আদরের নাতনীর) জন্য একটা জামা নিয়ে আস্‌বি, বুঝলি?"

"'বুঝলাম ত' ছাই, কি জামা, কত মাপ কিছুই ত' বল্‌লেন না। মহা মুস্কিলে পড়লাম।'

"আমাদের মধ্যে একজন বল্‌লেন—'তা সেটা জিজ্ঞাসা করতে ত' পারতে। তা জিজ্ঞাসা করলেও কি—'

"তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লে ছেলেটী—'বলেন কি মশায়? প্রাণের মায়া নেই আমার? একবার জিজ্ঞাসা করি আর বজ্রনির্ঘোষে পিসীমার 'বম্বার্ডমেণ্ট' সুরু হোক আর কি! যদি জিজ্ঞাসা করতাম কি রং, কি রকমের জামা বা কতখানি লম্বা তা হ'লেই সুরু হ'ত—"অত ব্যস্ত কেন—বলছি'খন। ব্যস্তবাগীশগিরির একটা সীমা আছে। কোনও একটা কাজ বলবার যো নেই—সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটা কথা জিজ্ঞাসা। ভেবেছিস কি তুই, যঁ্যা! একটু দাঁড়াতে পারিস্ না। আমি কি তোর দাসী যে এক মিনিট দম নিয়ে একটা কথা বল্‌তে পারব না—" এমনি কত কি!

"'অপেক্ষা করতে লাগলাম। এদিকে ট্রেনের সময় হ'ল, মিস করলেই মুস্কিল,—তা হলেও গালাগালি খেতে হবে। যাই হোক, অদৃষ্ট দেবতা বুঝি সদয় হলেন।

"'সদয় বল্‌তে পারেন, নিদয়ও বল্‌তে পারেন। ডাক দিলেন পিসীমা—"বিশু, অ বিশু!"



"'গেলাম ওঁর কাছে। ঝড় বয়ে গেল,—গালাগালির ঝড়। "হ্যাঁরে জামা ত' আন্‌বি—কি রকম জামা, কি রং, কত মাপ, সে সব জানার দরকার নেই? আমি যদি না বলি, বা বল্‌তে ভুলেই যাই, তা বলে কি তুই জিজ্ঞাসা করবি না? কি আকাট মুখ্যু হয়েই জন্মেছিস—বংশের কলঙ্ক! বংশের কলঙ্ক!! লজ্জা করে না—তোর এটুকু বুদ্ধি নেই!"

"'বুঝুন অবস্থা। জিজ্ঞাসা করলে গালাগালি, না করলেও গালাগালি। শুধু গালাগালি নয়,—তার সঙ্গে তাঁর দাঁত খিঁচুনি এবং রক্তচক্ষু। বুঝলেন, আমাদের বাড়ীর ছেলেপিলেগুলো ভাল করে বাড়তে পায় না, ঐ পিসীমার ভয়ে।

"'যাক, গালাগালি খেলেও দুশ্চিন্তা গেল। পিসীমা বল্‌লেন, "লাল রংএর ফ্রক্, কি রকম দেখ্‌তে হবে তাও বল্‌লেন, বল্‌লেন না খালি শেষ পর্য্যন্ত কি মাপের জামা।

"'খানিকক্ষণ কেটে গেল—খাওয়াদাওয়া সেরে প্রস্তুত হলাম—আর একটী মিনিট সময়ও নেই। পিসীমা তখনও বল্লেন না, কি মাপের জামা।

"'শেষ পর্য্যন্ত মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"পিসীমা, খুকীর জামার মাপটা?"

"'ওরে বাবা! সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রনিনাদ। পিসীমা গর্জ্জে উঠ্‌লেন—"মাপটা! মাপটা কি তুমি মনে করিয়ে দেবে তবে বল্‌ব? আমার যথেষ্ট মনে আছে, তোমার কর্ত্তাত্ব করার দরকার নেই। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে—আর ঐটুকু ছোকরা এসেছেন আমার ওপর মোড়লি করতে! পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গ্যাছো যে!!"

"'বজ্রনিনাদ থামল শেষ পর্য্যন্ত; পিসীমা ঘরের মধ্যে গেলেন চলে এবং একটু পরেই ফিরে এসে তাঁর হাত দুটো খানিকটা ফাঁক করে দেখালেন—"এই এতখানি লম্বা—"

"'বুঝুন ব্যাপার! গজ নয়, ফুট নয়, হাত নয়, আঙ্গুল নয়—এমন কি একটা সূতো বা কাগজের মাপও নয়; শুধু ঐ হাতের ফাঁকটুকু সম্বল আমার।

"'বুঝ্‌তেই পারছেন আর কোন কিছু বলবার বা জিজ্ঞাসা করবার সাহস আমার আর হ'তে পারে কি? আমার কেন, কোনও মানুষের পারে? একটু আগে যে তাড়া খেয়েছি, তাতে আমার বুকের মাঝে তখনও মুগুর পিটুচ্ছে। নিরুপায় হয়ে করলাম কি—পিসীমার হাত দু'টোর কাছে আমার হাত দু'টো নিয়ে গিয়ে উনি যতখানি হাত ফাঁক করেছিলেন—আমার হাত দু'টীও ঠিক ততখানি ফাঁক করে নিয়ে বল্‌লাম—"এই এতখানি লম্বা? আচ্ছা।" ব'লে হাত দু'টীকে ঠিক তেমনি অবস্থায় নিয়ে সারা রাস্তা এসেছি। পথে একজনকে পেলাম না যে মাপটা নেবে। ষ্টেশনে এসেও দেখলাম গাড়ী এসে গেছে, টিকিট না করেই ছুটে এসেছি। ভাবলাম, ট্রেনে ওঠার পর দয়া করে যদি কেউ মাপটা নিয়ে নেন—আর যদি ভীড়ের জন্য তা না হয় তা হ'লে ঐ হাত ফাঁক অবস্থাতেই দোকান

পর্য্যন্ত হয়ত যেতে হবে। কিন্তু, সমস্ত মাটী হয়ে গেল, সর্ব্বনাশ করলেন আপনি আমার মশায়! বাড়ী ফেরা আমার বোধ হয় আর হবে না এ জীবনে। অন্ততঃ পক্ষে পিসীমা যত দিন বেঁচে থাকবেন।'

"এক ভদ্রলোক বল্লেন—'আরে, আন্দাজে একটা নিয়ে যাও না, তোমার পিসীমা কি অত মনে করে বসে আছেন?'

"ছেলেটী হেসে উত্তর দিল, 'তাইলেই হয়েছে। আমার পিসীমাকে চেনেন না ত'। হিসাবনিকাশ—মাপজোকে তিনি যে কোনও অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের গুরুগিরি করতে পারেন। এক ইঞ্চি ছোট বড় হ'লে আর রক্ষে নেই।'

"ছেলেটী থাম্‌তে আমি হতাশ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হ'লে সত্যিই কি তুমি বাড়ী ফিরবে না?'

"আমার কথায় বাধা দিয়ে ছেলেটী বল্লে—অতি করুণ ভাবেই বল্লে—'সে সাহস আমার নেই; আমি এখন আমার মামার বাড়ীতে আশ্রয় নেব—অন্ততঃ পক্ষে পিসীমার রাগ যত দিন একটু না পড়ে।'"

নিধু খুড়ো একটু চুপ্ ক'রে থেকে বল্লে—"সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, পরের উপকার আর করব না কোনও দিন। আর তোমাদের বল্‌ছি, তোমরাও কোন দিন আর পরের উপকার ক'র না।"

নিধু খুড়োর উপদেশ মাথায় করে বাড়ী ফিরলাম সেদিন। সারা রাস্তা শুধু মনে হ'তে লাগল—সকলের বাড়ীতে যদি একটী করে ঐ রকম পিসীমা থাক্‌তেন, তা হ'লে——?

---

## তৃপ্তি

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

পাওয়ার আশা জগৎ-যোড়া
দুঃখ মিলায় তাই,
দেওয়ার মাঝে তৃপ্তি আছে,
চাওয়ার মাঝে নাই।

---

## রাশিয়ায় যেখানে যুদ্ধ চলছে

শ্রীগৌরী দেবী

তোমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই জান জার্ম্মান্‌রা এখন রাশিয়ার ষ্টালিনগ্রাডের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচণ্ড রকম চেষ্টা করছে, এবং ডন্ নদীর ধারে রুশদের সঙ্গে তাদের বড় রকম সংঘর্ষ চলছে। যারা আরও ভাল ক'রে কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই ঐ জায়গাটার ম্যাপ্ নিয়েও নাড়াচাড়া করেছ, এবং কোথায় রষ্টভ্, কোন্ দিকে ষ্টালিন্‌গ্রাড্, আর ডন্ নদীই বা কোন্ দিকে বয়ে চলেছে এ সব খবরও ভাল ক'রেই রাখ।

রণদানবের এই তাণ্ডবলীলা আজ যেখানে চলেছে প্রকৃতি কিন্তু সেখানে অকৃপণ হাতেই তাঁর ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই জায়গাটার প্রধান সম্পদ্ হচ্ছে কৃষি, যদিও আস্তে আস্তে দেশটাকে যন্ত্রযুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা চল্‌ছিল। ভূগোলে ককেশাস্ পর্ব্বতের নাম তোমরা সবাই মুখস্থ ক'রে আসছ—তারই উত্তর দিকে এই দেশ। ঐ পাহাড়ের নাম থেকেই তাকে বলা হয় উত্তর, ককেশাস্ অঞ্চল। রুশ সরকারের অধীনে এটা একটা মস্ত প্রদেশ। এর এক দিকে রয়েছে কৃষ্ণসাগর, আজভ্ সাগর এবং ইউক্রেন প্রদেশের কিছুটা, অন্য দিকে রয়েছে ক্যাস্‌পিয়ান্ সাগরের তীরবর্ত্তী কালমুক্, ডাঝেষ্টান্ প্রভৃতি জায়গা। দক্ষিণটা ককেশাস্ পাহাড়ের ঢালু উত্তরাংশের মধ্যে মিশে

গেছে, আর উত্তরে তোমাদের পরিচিত ষ্টালিন্‌গ্রাড্‌, ভোরোনেজ্‌ প্রভৃতি। কাজেই জায়গাটা নেহাৎ ছোট হ'ল না। এর লোক-সংখ্যা ১৯২৬ সনের গণনায় ছিল ৮৩ লক্ষ, এখন বোধ হয় ১ কোটির কম নয়।

একদিকে কৃষ্ণসাগর ( ব্ল্যাক্‌ সী ) ও অন্য দিকে ক্যাস্‌পিয়ান্‌ সাগর—ফলে জায়গাটার উর্ব্বরতা সম্বন্ধে কোন সংশয় জাগতে পারে না। সত্যিই তাই; শস্য-সম্পদে এই "কালো মাটীর দেশ" অতুলনীয়। গম, বার্লি, ভুট্টা, যব, সর্ষে প্রভৃতি শস্য, চিনির জন্য বীট, মদের জন্য আঙ্গুর এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া আলু, কাঁকুড় প্রভৃতি তরিতরকারী, তামাক এবং বিশেষ ক'রে সান্‌ফ্লাওয়ার সীড্‌ ( যা থেকে একাধারে খাবার, তেল, জ্বালানী এবং পটাশ পাওয়া যায় ) যথেষ্ট জন্মায়। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সব জিনিষ নিয়মিত চালান যায়।

পশুপালনের জন্যও এ প্রদেশটির খ্যাতি আছে। ভেড়া, ছাগল, গরু, শূয়োর প্রভৃতি পশু এবং মুরগী, হাঁস, টার্কী প্রভৃতি পাখীর কথা বল্‌ছি। তবে পশুপালনটা আগের তুলনায় অনেক কমে আসছে। গত মহাযুদ্ধের আগে একবার হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল শুধু ষ্টভরোপোল আর সাল্‌স্ক্‌ নামে দু'টি অঞ্চলেই ৪০ লক্ষ ভেড়া প্রতিপালিত হচ্ছিল; এখন তা কমে ৩।৪ লক্ষে এসে ঠেকেছে। তবে পাখীর চাষ এখনও জোর চলছে। এ ছাড়া হেরিং, ব্রিম্‌, কার্প্‌ প্রভৃতি মাছেরও প্রাচুর্য্য আছে। তবে সে মাছ বাইরে খুব বেশী চালান যায় না।

কৃষিসম্পদ্‌ ছাড়া খনিজ সম্পদ্‌ও দেশটির বড় কম নয়। রূপো, সীসে, দস্তা, লোহা প্রভৃতি ধাতু এবং কয়লা ও বিশেষ ক'রে খনিজ তেলের ( ন্যাফ্‌থা ) প্রাচুর্য্যও নাম করবার মত। তবে কল-করখানায় কৃষিজাত জিনিষগুলির সদ্ব্যবহারের চেষ্টাই বেশী হয়ে থাকে। পশম, সুতো, চামড়া, দড়ি, সাবান, পটাশ, কাচ, কাগজ প্রভৃতি হরেক রকম শিল্পদ্রব্যও আজকাল নানা কারখানায় তৈরী হচ্ছে। কয়েক বছর হ'ল রুশ সরকার থেকে দেশের সর্ব্বত্র রেল-লাইন বসিয়ে, খাল কেটে, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে এ অঞ্চলের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ্‌ সদ্ব্যবহারের সুযোগ যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।



জমির উর্ব্বরতা ও শস্যসম্পদের জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রদেশটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তুর্কী, পারসিক, তাতার, মোঙ্গোল প্রভৃতি নানা জাতের লোক এসে এখানে ব্যবসার খাতিরে বাস করত। বর্ত্তমানে অবশ্য অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৩ ভাগের ওপরই রুশ। বাকী ১৬।১৭ ভাগে গ্রীক্‌, জার্ম্মান্‌ ( শতকরা ১ জন ), আর্ম্মেনিয়ান্‌, চেকেন, অসেটীয়ান্‌, জর্জ্জিয়ান্‌, ইহুদী, পোল, তাতার, তুর্কী, পারসিক প্রভৃতি অনেক রকম জাতই আছে।

ডন্‌ নদীর ধারে রষ্টভ্‌ই সব চেয়ে বড় সহর। এর জনসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। এ ছাড়া ৫০ হাজারের ওপর লোক বাস করে এমন সহর আরও ৮।৯টা আছে। বড় বড় সহরের আধিক্য থাকলেও দেশের পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোকই চাষবাসের ওপর নির্ভর করে।

রাশিয়ার এই বিত্তশালী প্রদেশটি নিয়ে আজ চরম সংগ্রাম বেধেছে। এ দেশ যদি তাদের হাত-ছাড়া হয়ে যায় তবে সেটা তাদের পক্ষে কত বড় ক্ষতি হবে বোধ হয় বুঝতে পারছ?

২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯

---

# এবারের লীগ্‌বিজয়ী ইষ্টবেঙ্গল দল

শ্রীদেবলাল সেন

তোমরা গত মাসের রামধনুতেই পড়েছ এবারে কলকাতা ফুটবল্‌ লীগের ১ম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্‌ হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল। এর আগে মহামেডান্‌ স্পোর্টিং আর মোহনবাগান ছাড়া আর কোনও ভারতীয় দলের ভাগ্যে এ

সম্মানলাভ ঘটে নি। এমন কি এক সময় ছিল যখন কোনও ইয়োরোপীয় দল ছাড়া কোনও ভারতীয় দল যে লীগ্‌বিজয়ী হ'তে পারে তা যেন কেউ ভাবতে পারত না। তার পর মহামেডান্ স্পোর্টিং এসে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়—এবং কয়েক বছর এ সম্মান তাদেরই একচেটিয়া হয়ে থাকে। মাঝে একবার শুধু মোহনবাগান কাপ্ পেয়েছিল। কিন্তু এবারে আবার নতুন এক ভারতীয় দল এ সম্মানের অধিকারী হয়েছে জেনে নিশ্চয়ই তোমাদের খুব আনন্দ হচ্ছে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম হয়েছে আজ থেকে প্রায় ২২ বছর আগে। ময়মনসিংহের জমীদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ভাগ্যকুলের জমীদার শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল রায় ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়, ঢাকার উয়ারী দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন (নসা বাবু) প্রভৃতি ভদ্রলোকরা ছিলেন এর প্রধান উদ্যোগী। সুরেশ বাবু এবং বনোয়ারী বাবু গোড়া থেকেই নানা ভাবে এই ক্লাব্‌টিকে সাহায্য করেন। তাজহাট ক্লাব্ উঠে গেলে ইষ্টবেঙ্গল দল তার জায়গায় দ্বিতীয় বিভাগ লীগে খেলতে থাকে। সে সময় লীগে ৩য় বিভাগ ব'লে কোনও বিভাগ ছিল না। প্রথম বিভাগে, তখন নিয়ম ছিল, ২টির বেশী ভারতীয় দল থাকতে পারবে না। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় কর্ত্তৃপক্ষ এই বৈষম্যমূলক অদ্ভুত আইন বদলাতে বাধ্য হ'ন এবং নিয়ম হয় ২য় বিভাগে যে দল চ্যাম্পিয়ন্ হবে পরের বছর তারা ১ম বিভাগে খেলবে, এবং ১ম বিভাগে যে দল সর্ব্বনিম্নে হবে পরের বছর তাদের ২য় বিভাগে নেমে যেতে হবে। ফলে ইষ্টবেঙ্গল দল ২য় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হয়ে ১ম বিভাগে উন্নীত হয়।

কিন্তু কয়েক বছর ১ম বিভাগে খেলবার পর ভাগ্যদেবতা ইষ্টবেঙ্গল দলের প্রতি বিরূপ হ'লেন। তাদের আবার ২য় বিভাগে নেমে আসতে হ'ল। এই সময় দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হওয়ায় এক বছর খেলা অর্দ্ধ-পথে বন্ধ হয়ে যায়। ইষ্টবেঙ্গল সেবার ২য় বিভাগে ১ম যাচ্ছিল, তাদের আর সেবার ১ম বিভাগে ওঠা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু পরের বছরই আবার তারা ২য় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হয়ে ১ম বিভাগে উঠল।



প্রথম বিভাগে উঠেই কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল দল অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাল—এবং সে বছরই তারা মাত্র ১ পয়েন্টের জন্য ১ম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ল। দুর্দ্ধর্ষ ডারহাম্‌স্ দল তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশী পেল। এই ভাবে মাত্র এক পয়েন্টের জন্য তারা আরও দু'বার ১ম বিভাগের চ্যাম্পিয়ন্-শিপ্ পেতে পেতে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্ না হ'লেও রানার্স্ আপ্ তারা হয়েছে বোধ হয় ৪ বার কি ৫ বার।

কলকাতার বাইরে সিমলার বিখ্যাত ডুরাণ্ড্ কাপ্ ও বোম্বাইএর বিখ্যাত রোভার্স্ কাপেও তারা খেলে এসেছে। কাপ্ বিজয়ী হ'তে না পারলেও ঐ সব জায়গায় তারা কম কৃতিত্ব দেখায় নি। ভারতের অন্যান্য সহরে এবং দু'বার ব্রহ্মদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েও তারা তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে এসেছে।

ইষ্টবেঙ্গল দল থেকে যে সব বিখ্যাত খেলোয়াড় এক সময় বেরিয়েছিলেন (যাঁদের নাম ক্রীড়ামোদীরা বহুকাল মনে রাখবেন), তাঁদের কয়েক জনের নাম শোন: মনা দত্ত, এম্ দাস, প্রশান্ত বর্দ্ধন, জিতু মুখার্জ্জি, মণি তালুকদার, ননী গোস্বামী, পূর্ণ দাস, সূর্য্য চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও দুলাল, আবদুল মজিদ্, নূর মহম্মদ, লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্গেশ, বীরেন সেন প্রভৃতি খেলোয়াড়রা ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসাবেই নাম কিনেছেন।

এবারে যে দল বহু আকাঙ্ক্ষিত লীগ্ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করলেন তাঁদের আমরা অভিনন্দিত করছি। তবে এর আগে যাঁরা ইষ্টবেঙ্গল দলে খেলে গেছেন দল হিসাবে যে তাঁরা বর্ত্তমান দলের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন তা যেন কেউ মনে ক'র না। ক্রীড়ামোদীরা তাঁদের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করবে। কিন্তু ভাগ্য যেন বরাবরই ছিল তাঁদের ওপর বিরূপ, যা এবারে হয় নি। এবারকার দলের তরুণ অধিনায়ক সোমানার প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। এ বছর এবং গত বছরও ইনি ১ম বিভাগের সমস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চাইতে বেশী সংখ্যক গোল দিয়েছেন। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। গত বছর আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায়ও ধরতে গেলে এঁরই জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে হারাতে পেরেছিল।

ইষ্টবেঙ্গল বরাবরই খুব জনপ্রিয় দল। এঁদের সভ্যসংখ্যা মোহনবাগানের পরই। এবারকার সাফল্যের পর এঁদের জনপ্রিয়তা যে খুবই বাড়বে তা'তে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে এবারকার ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশ চন্দ্র গুহকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব। যাঁরা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন কি রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কি অসম্ভব কৃতিত্বের সঙ্গে ইনি এবার ক্লাবের পরিচালনা করেছেন।

---

# বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

## শ্রীআনন ঘোষাল

[শ্রীযুক্ত আনন ঘোষাল—আসল নাম শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্.এস্-সি প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি গল্পচ্ছলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলতে চান। আশা করি তোমরা এই গল্প ও ভ্রমণ-কাহিনী থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বেছে নিতে পারবে ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হবে।]

সায়ান্স্ কলেজের ল্যাবোরেটারী হল্। তুই পাশে সারি সারি উঁচু টেবিল ও টুল। মাঝখানটায় যাওয়া-আসার পথ। টেবিলগুলোর উপর কাঁচের জারে সাপ, মাচ প্রভৃতি জীবজন্তুর মৃতদেহ স্পিরিটের মধ্যে ডোবান রয়েছে। চারিদিক্‌কার শো-কেস্‌গুলিতে নানান্ জীবজন্তুর মৃত কঙ্কাল। দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙান জীবজন্তুর ছবি।

প্রত্যেক টেবিলেই এক-একটা জন্তু-কাটা ট্রে। আশে পাশে ছুরী, কাঁচি, নানা রকম শিশি বোতল, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি সাজানো। ল্যাবোরেটারীর এই দিক্‌টায় তখন মৎস্য-বিশারদ্ ছাত্র দেবেশ একা কাজ করছিল। চারিদিকে কোনও সাড়া শব্দ নেই। প্রফেসার ও অপরাপর শিক্ষকেরা তখনও আসেন নি। অধিকাংশ ছাত্রই তখনও পর্য্যন্ত অনুপস্থিত।

অদূরে একটা টেবিলের উপর একটা ল্যাটা মাছ জারের ভিতর জিয়ান ছিল। সেই মাছটাই ছিল তখনও পর্য্যন্ত একমাত্র জীবন্ত প্রাণী।

ছাত্র দেবেশ একটা কৈ মাছের কর্ত্তন-কার্য্য শেষ করে, এগিয়ে এসে ল্যাজে ধরে ল্যাটা



মাছটাকে উঠিয়ে নিল। তার পর মাছটাকে ল্যাজে ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জয়দেবী স্বরে, প্রথমে গুণ্ গুণ্ করে, পরে উচ্চৈঃস্বরে গাইতে সুরু করল—

'প্রলয়পয়োধিজলে
ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মৎস্যশরীর,
জয় জগদীশ হরে।"

এদিকে ছু'টো করে সিঁড়ির ধাপ এক সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করে প্রফেসার সাহেব কলেজ ল্যাবোরেটারীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রফেসার সাহেব বিলাতে মানুষ। ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি অনেক ভাষাই তিনি জানেন, কিন্তু সংস্কৃত জানেন না। অদ্ভুত ভাষার অদ্ভুত সুরের গানের ছত্র কয়টা তাঁর ভালই লাগছিল। নীরবে দাঁড়িয়ে তিনি গানটা শেষ পর্য্যন্ত শুনলেন। এদিকে ছাত্রের দল যথাসময়ে উপরে উঠে এসে দেখ্‌ল প্রফেসার গান শুনছেন। একে একে প্রফেসারের পিছনে এসে তারা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ পিছনের দিকে নজর পড়ায় প্রফেসার বলে উঠলেন—"হোয়াট্ আ—ইউ ডুইং? কা-ম্ ইন্।"

প্রফেসার হন্ হন্ করে ভিতরে ঢুকে একেবারে ছাত্র দেবেশের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেবেশ চমকে উঠে চেয়ে দেখল, সামনে খোদ প্রফেসার, ডক্টর মুখার্জ্জি। ব্যস্ত হয়ে দেবেশ বলে উঠল—"ফিশ্ স্যর। এ ভার্টিব্রেট্। অস্থিক জীব। সংস্কৃতে বলে, অস্থিকা।"

ধমকে উঠে প্রফেসার বললেন—"শাট্ আপ্ লাইক্ ইউ। জান, আজ ইন্‌ভার্টিব্রেট্ ক্লাশ হবে।—ইন্‌ভার্টিব্রেট্, যাকে বাংলায় বলে নিরস্থিক জীব, বুঝলে?"

বকাবকি, উপদেশ বর্ষণ ইত্যাদি বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই হয়ত কিছুক্ষণ চল্‌ত। কিন্তু ছাত্র দেবেশের কপাল ছিল ভালই। হঠাৎ কলেজের উড়ে বেয়ারা একজন সাপুড়েকে সঙ্গে করে হলে এসে ঢুকল। সাপুড়ের হাতে মস্ত একটা বাক্স। বাক্সের ডালাটা খুলে দিতেই মস্ত একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে এসে হলের মসৃণ মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপর আছড়ে পড়ল।

সাপুড়ে ফরমাস মত দশটা টাকার বিনিময়ে সাপটা কলেজে বিক্রী করতে এসেছে। ছাত্র হিতেন সভয়ে লাফিয়ে উঠে বলল—"স্যর, গোখ্—, অস্থিক জীব।"

সভয়ে প্রফেসার ও ছেলের দল পেছিয়ে দাঁড়াল। উড়ে বেয়ারা একটু বেশী ভয় পেয়েছিল। সে একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল—"উঁহুঁ, সে শঙ্খচূড়্ অছি।"

চাপরাশী বড় মিয়া অনেক দিনের লোক। বহুদিন ধরে সে কলেজের জন্ত 'স্পেসিমেন্' অর্থাৎ 'নমুনা' সংগ্রহ করে আসছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মজা দেখছিল। এইবার সে কায়দা করে সাপটাকে ধরে একটা জারের মধ্যে পূরে দিয়ে, জারের মুখের ঢাকনাটা এঁটে দিল। তার পর এক বোতল ক্লোরোফর্ম্ এনে ঢাকনাটা একটু তুলে ধরে, সবটুকু ক্লোরোফর্ম্'ই তার মধ্যে ঢেলে দিল।

কিছুক্ষণ আছাড়ি পিছাড়ি করে সাপটা জারের মধ্যেই নীরব হ'ল। বড় মিয়া সেটাকে লেজে ধরে বার করে এনে, মেঝের উপর শুইয়ে দিল। প্রফেসার এইবার এগিয়ে এসে বললেন—"রাস্‌ল্ ভাইপার।" তার পর আশ্বস্ত ভাবে ছাত্রদের জানালেন—"বাট্ ডেড্।"

ছাত্র দেবেশ এতক্ষণ ভয়ে একটা টেবিলের উপরে উঠে বসেছিল। সে এইবার তাড়াতাড়ি নেমে এসে ফ্যানের সুইচ্‌গুলো বন্ধ করে দিতে দিতে বলল—"সাবধান, হাওয়ায় ওরা বেঁচে উঠে।"

বিরক্ত হয়ে প্রফেসার বললেন—"নন্‌সেন্স্। ডোণ্ট্ বি সুপার্‌সটিশাস। কুসংস্কার ছাড়। কাম্ টু দি ইন্‌ভার্টিব্রেট্ ক্লাশ নাউ।"

একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করল—"ক্লাশ কি বাংলাতেই হবে স্যর?"

ইউনিভারসিটির নূতন কানুন অনুসারে বাংলাতেই ক্লাশ হওয়ার কথা। বিলাত-ফেরত প্রফেসারকে তাই মাঝে মাঝে বাংলাতেই বলতে হয়। বিক্ষুব্ধভাবে ফরাসী কায়দায় হাতের আঙুল উল্টিয়ে প্রফেসার সাহেব জানালেন, "কাণ্ট্ হেল্প্। য়ুনিভারসিটী ওয়াণ্ট্‌স ইট্। ক্লাশ বেঙ্গলীতেই হবে।"

সছাত্র প্রফেসার পাশের ক্লাশরুমে ঢুকে পড়লেন। চাপরাশী বড় মিয়া সাপটাকে একটা লম্বা মোমে ভরা ট্রের উপর শুইয়ে দিয়ে, তার মাথায় ও লেজের দিকে গোটা কতক পিন পুঁতে দিল। কিছুক্ষণ পরেই সেটা চেরাই হবে।

(ক্রমশঃ)

---

## শোক-সংবাদ

রামধনু ছাপা যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন আর একটি দুঃসংবাদ আমাদের কানে এল। তরুণ কবি ফাল্গুনী রায়ের কবিতা তোমরা রামধনুতে অনেক বার পড়েছ। গত ৪ঠা আগষ্ট তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৪ বছর। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কি ব'লে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না।

---

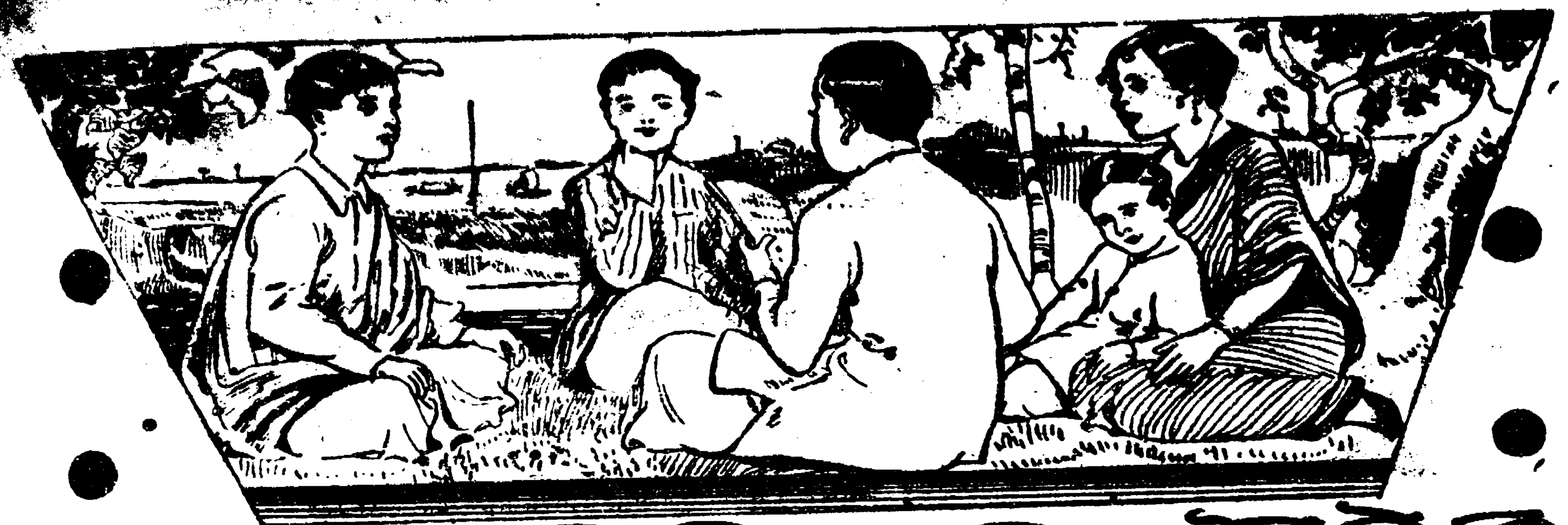

# ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

## স্মরণে

শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল

এই পৃথিবীর ফেলে-চলা দিনের পারাবারে
সাঁঝের ছায়ায় মিলিয়ে যে যায় আপন-হারা কত,
তারা ফেরে না হায় চিরকালের আলো-অন্ধকারে
হারিয়ে-যাওয়া শেষ গোধূলির রক্ত-আলোর মত।

ক'টি দিনের আলো-ছায়ার একটু ছোট প্রাণ,
ফুটে ওঠার আশা যাদের ছিল আসীম মনে,
কুঁড়ির বেলাই ঝরে গেল—কেড়ে-নেওয়া দান
মহাকালের পায়ের তলায় লুপ্ত অন্ধ-কোণে।

এই বেদনাই সকল ঢেকে জাগছে বারে বারে—
বাঁচার মত বাঁচবে ব'লে চল্‌ত পথে যারা,
তাদেরই ডাক পড়্‌ল কোথায় অজানা কোন্ পারে!—
নিরুদ্দেশের দেশে গিয়ে হ'ল কি পথ-হারা?

বৃষ্টি-ঝরা পথিক দিনের সন্ধ্যা এল নেমে,
পথিক রাত্রি এমনি করেই চলবে নিজের পথে,
চিরদিনের মত শুধু তারাই গেল থেমে,
আর কোন দিন আসবে না হায় আলোর রাঙ্গা রথে! *

* ৺মিহির রায় ও ৺নিখিলেশ সেনের স্মরণে

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের রামধনুতে শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখিত 'নবযুগের কবি' শীর্ষক একটি গল্প বেরিয়েছিল। অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা আমাদের জানিয়েছেন যে ১৯২৯ সালে মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'ছেলেদের পাততাড়ি' বিভাগে ঐ গল্পটি হুবহু ঐ ভাষায় বেরিয়েছিল। একই বিদেশী গল্প দুই লেখকের পক্ষে অনুবাদ করা কিছু বিচিত্র নয়—কিন্তু একটি অপরের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়া খুব আশ্চর্য্য নয় কি? শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, গত ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসের রামধনুতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর 'লা শিলারিও' নামে যে মৌলিক গল্পটি লিখেছিলেন—শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামে সে গল্পটি শ্রাবণ মাসের শিশুসাথীতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য ভাবে বেরিয়েছে। শুধু 'স্পেনযুদ্ধ'কে 'চীনযুদ্ধ' করা হয়েছে, এবং ১ম ২।৩টি প্যারাগ্রাফ 'খণ্ডযুদ্ধ' নামে ধীরেন বাবুর অন্য একটি গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। এই লেখকটিকে (?) তোমরা ভাল ক'রে চিনে রেখ।

গত মাসে 'বংকুবাবুর ব্যতিক্রম' গল্পটি পড়ে শ্রীমাধুরী দেবী (ঢাকা) একটি চিঠি দিয়েছেন। নিরামিষ তরকারীকে শুধু "আলু-কাঁচকলার ঘ্যাট" ধলায় তিনি উক্ত গল্পের লেখকের ও সেই সঙ্গে সম্পাদকের রুচির ওপর কটাক্ষ করেছেন।

নিরামিষ তরকারী যে সুযোগ্য হাতে রান্না হ'লে কত লোভনীয় হয় তা বাঙ্গালী মাত্রেই, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা, জানে। লেখকের উদ্দেশ্য মোটেই নিরামিষ রান্নাকে ঠাট্টা করা নয়। গল্পের নায়ক ভিতরে ভিতরে আমিষভক্ত হয়েও নিজের মনকে কি ভাবে প্রতারিত করেছেন তারই একটি হাস্যোদ্দীপক চিত্র তিনি আঁকতে চেয়েছেন এবং অযোগ্য হাতের (অর্থাৎ—মেয়েদের হাতের নয়) নিরামিষ রান্নাকেই ঠাট্টা করেছেন।

৺নিখিলেশ সেনের অকালবিয়োগের খবর রামধনু-পাঠকদের অবিদিত নেই। নিখিলেশ বৈদ্যবাটী মাহামায়া সাহিত্য-মন্দিরের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ঐ সমিতি থেকে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। উক্ত সমিতির সম্পাদকের নামে (পোঃ শেওড়াফুলি, জেলা হুগলী) অর্থসাহায্য পাঠালে তা সাদরে গৃহীত হবে। উক্ত সমিতি থেকে 'নিখিলেশ-স্মৃতিপদক' নামে বাংলা ভাষায় এ বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিককে একটি পদক দেওয়া হবে। কে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তা ভোটে ঠিক হবে। তোমাদের অভিমতও তাঁরা চেয়েছেন। ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে উক্ত সমিতিকে অভিমত পাঠাতে হবে।

—রাঃ সঃ

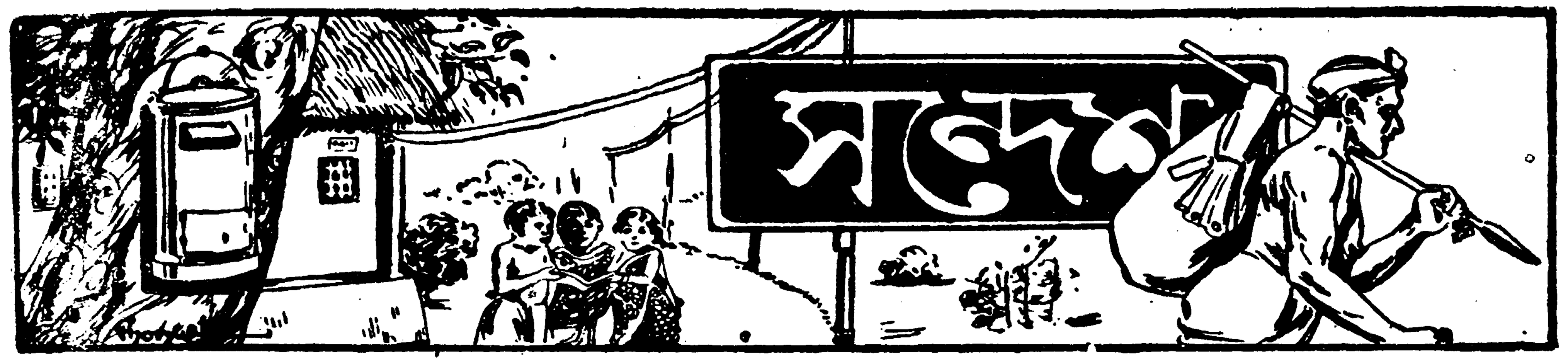


সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে স্যর্ ফ্রান্সিস ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ডের মৃত্যু হয়েছে। বিখ্যাত ভূপর্য্যটক ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রী হিসাবে এঁর নাম চিরকাল লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। মাঞ্চুরিয়া, চীনা তুর্কীস্থান, পামীর, হুঞ্জা, আফ্রিকার নানা স্থান এবং তিব্বতে ইনি পরিভ্রমণ করেন। নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত তখন বিদেশীর পক্ষে কি রকম বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল তা বোধ হয় তোমরা শুনেছ। কিন্তু ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ডের গুণে তিব্বতীরা ইংরেজের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। তার পর সুরু হয় তাঁর কাশ্মীর ও হিমালয় অভিযান। এই সুদুর্গম ও ভয়াবহ অভিযানে তাঁকে কত বার বিপদে পড়তে হয়েছিল সে সবের কথা তিনি তাঁর কয়েকখানা বইএ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পরিণত বয়সে ইনি রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল্ সোসাইটি নামে সুবিখ্যাত সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন।

* * *

এ বছরের কলকাতার প্রথম বিভাগের লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ ইষ্ট বেঙ্গল দলের কথা অন্যত্র বলা হ'ল। লীগে রানার্স আপ্ হয়েছে মহামেডান্ স্পোর্টিং দল। ২য় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে এরিয়ান্স্ হাড্‌সন্ দল। আই. এফ্. এ শীল্ডের খেলা আজ (১১ই আগষ্ট) পর্য্যন্ত শেষ হয় নি। সেমিফাইনালে উঠেছে ইষ্ট বেঙ্গল, মহামেডান্ স্পোর্টিং, মহীশূর রোভার্স এবং রেঞ্জার্স দল। শেষ পর্য্যন্ত কে জিতবে বলা কষ্টকর। মোহন-বাগান গোড়ার দিকেই রেঞ্জার্সের কাছে হেরে গিয়ে তার অসংখ্য ভক্তদের হতাশ করেছে। আর. এ. এফ্. ও বর্ম্মা দল সম্বন্ধে গোড়ায় অনেকে আশা পোষণ করলেও শেষ পর্য্যন্ত তারাও পরাজিত হয়েছে।

* * *

সম্প্রতি হাওয়াইবাসী লিও নাকামা এক মাইল সাঁতারে (ফ্রী ষ্টাইল্) পৃথিবীর রেকর্ড্ ভঙ্গ করেছেন। তাঁর সময় লেগেছিল ২০ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড। পূর্ব্বের রেকর্ড্ (২০ মিঃ ৫৭·৮ সেঃ) ছিল জ্যাক্ মেডিকার। তাঁর বাড়ী আমেরিকা।

* * *

রুশিয়ার যুদ্ধে জার্ম্মান্‌রা অনেকটা এগিয়ে চলেছে। উত্তর ককেশাস্ অঞ্চলে অনেক স্থান তারা দখল করেছে—এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ্ হস্তগত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। রুশিয়া মরণ পণ ক'রে তাদের বাধা দিচ্ছে। মিশরের যুদ্ধ আর বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নি। ওদিকে জাপান চীন নিয়েই ব্যস্ত।

## রবীন্দ্র-স্মরণে

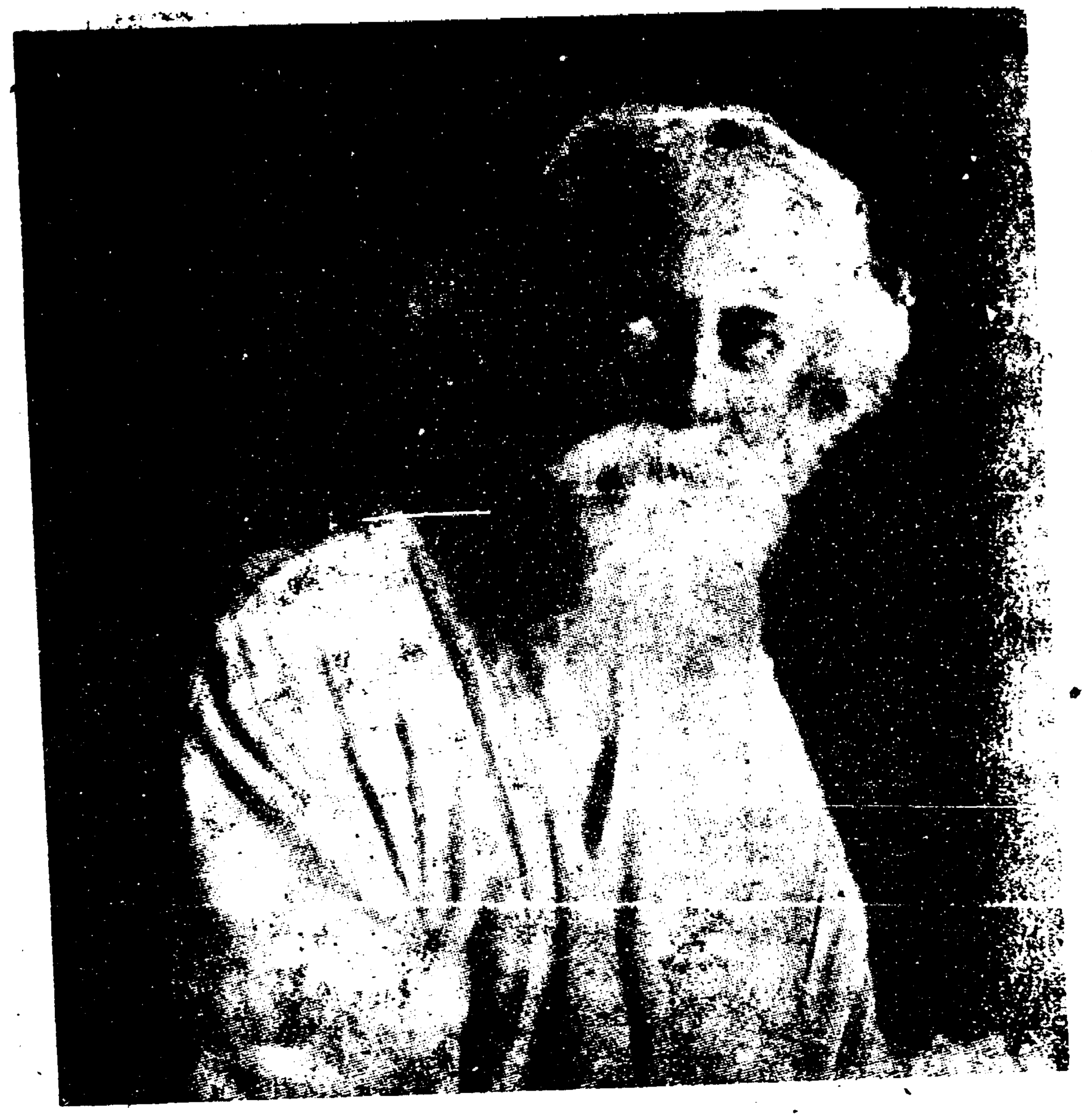

২২শে শ্রাবণ। আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেছেন। আজ তাঁর মৃত্যু-তিথিতে সমস্ত ভারত অবনত মস্তকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর মৃত্যু হয়েছে? আমাদের জন্য তিনি যে অক্ষয় সুধা-ভাণ্ডার রেখে গেছেন তাঁরই প্রাণশক্তিতে কি তা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে না? রবীন্দ্রনাথকে আমরা তারই মধ্যে খুঁজে পাব। তাঁর আদর্শ যুগে যুগে আমাদের প্রেরণা যোগাবে।

"বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে?"

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ভাই রামধনু,

মাসের নয় দিন কাবার হল আজ অবধি রইলে কোথায়? ওদের খোকনের 'কাগজ তো কত কাল এসে পড়েছে! বুড়ী, নেড়া—ওরাও নাকি ঠিক সময়ে পেয়েছে। আমি বেচারা কি অপরাধ করলাম?

তোমায় কি করে বোঝাব পহেলা যদি তোমাকে না পাই তবে আমাদের সকলকার অবস্থা কেমন হয়? চট করে এস ভাই!

তোমার একান্ত অনুরক্ত দেবকুমার মিত্র

(উত্তরদাতাদের নাম স্থানাভাবে এবার দেওয়া হ'ল না, আসছে মাসে বেরোবে।)

## নূতন ধাঁধা

নীচের শব্দগুলি থেকে অক্ষর নিয়ে অন্ততঃ দশটা সহরের নাম তৈরী কর। একই অক্ষর একাধিক বার ব্যবহার করা যাবে। :—

পানা, বারি, লোহা, পুর, লাট, গজা, হোরী, দল, শায়া, পেশী, একা, ,শোব।


শ্রীলীলা মজুমদার এম্.এ
প্রণীত
নূতন ধরণের গল্পের বই

# বদ্যিনাথের বড়ি

'মৌচাক' বলেন
"সব গল্পগুলোই বেশ হাসির ও মজার। ছোট গল্প ছোট ছোট কথায় বাহুল্য বাদ দিয়ে কেমন সুন্দর করে লেখা যায় তা লেখিকার লেখায় বেশ ফুটে উঠেছে।"

লেখিকার স্বহস্ত-অঙ্কিত সুন্দর সুন্দর কার্টুন ছবি।

সুন্দর বহুবর্ণরঞ্জিত বাঁধান মলাট, পাতায় পাতায় হাসি।

দাম আট আনা

ছোটদের উপযোগী কয়েকখানা
–সুন্দর বই–

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কলকাতার হালচাল ... ৵৶০
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর ... ॥০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ... ॥০
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
নতুন কিছু ... ॥৶০
শ্রীমাধব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
গল্পসল্প ...৵১০ ছুটীর গল্প...৵১০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ... ॥০
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
আজব গল্প ...।০ অনেক গল্প ...।০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ॥৶০
শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১॥০
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং ... ... ॥০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড, কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)



১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No C–1641


# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী

ঘি'এর মত কিছুই নয়।

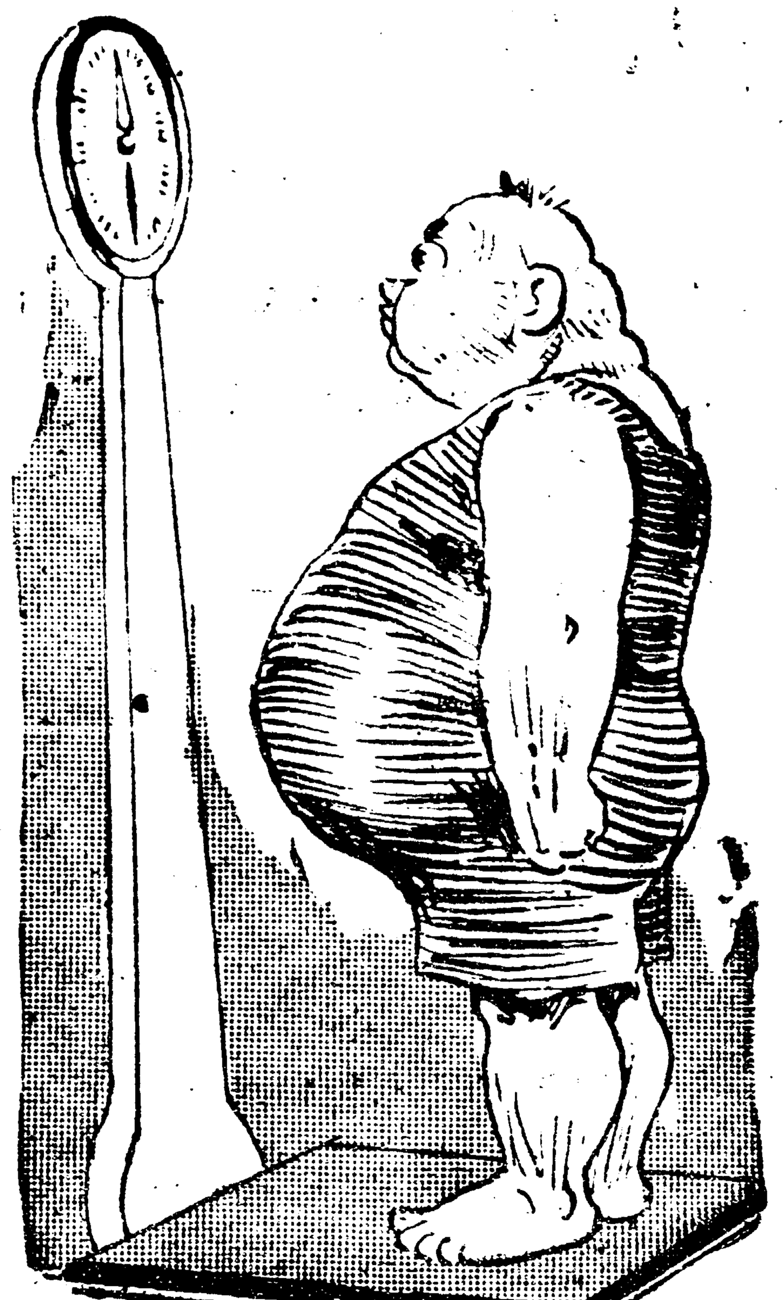

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বড়বাজার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

ফোন : কলি: ৩৬৬০


আশ্বিন, ১৩৪৯ ৯ম সংখ্যা

# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি


মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

[আবিষ্কৃত ১৯০২]

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

Regd. No C-1641


# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী

ঘি'এর মত কিছুই নয়।

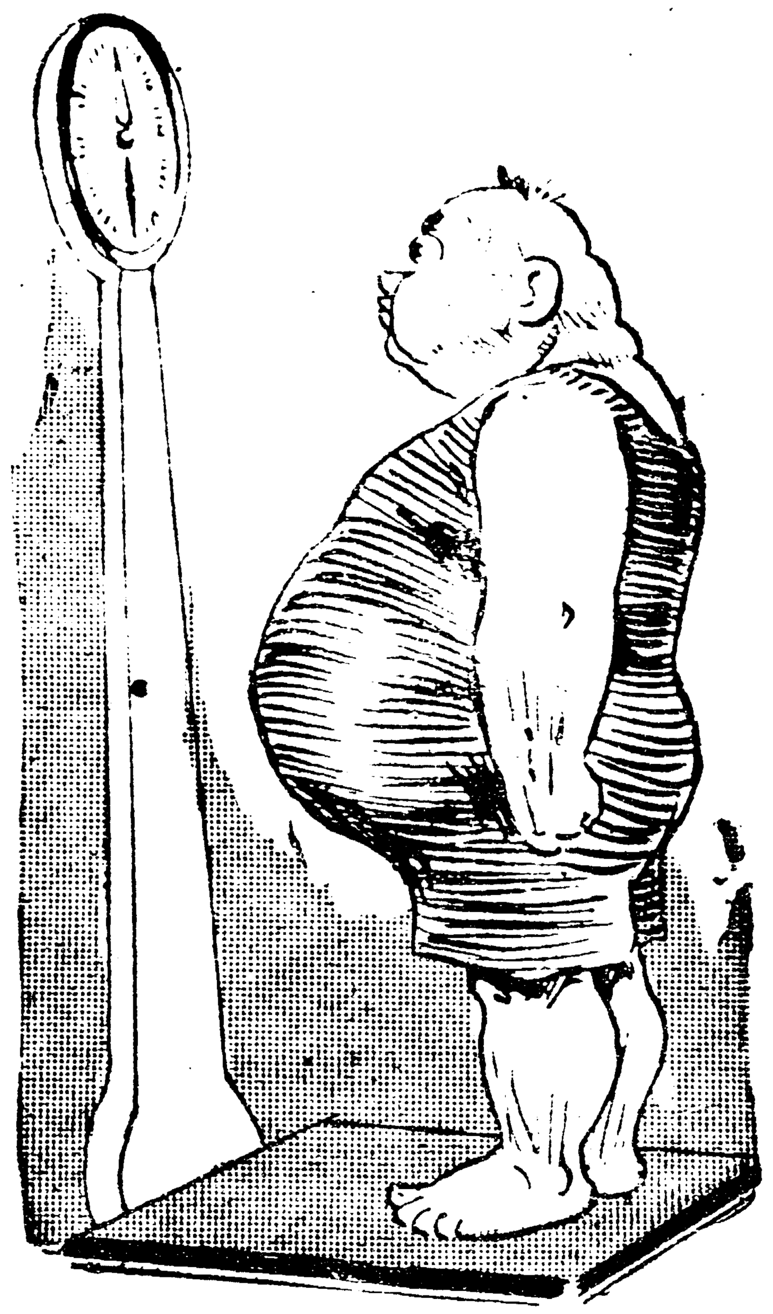

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

**লক্ষ্মীদাস প্রেমজী**

৮, বড়বাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০




# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম.এস-সি


মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

আবিষ্কৃত ১৯০২]

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।


INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

# রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০ ; প্রতিসংখ্যা।৶ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চার আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরুসঃ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না. এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

দেব-সাহিত্য-কুটীরের এবছরের—

## পূজার উপহার !

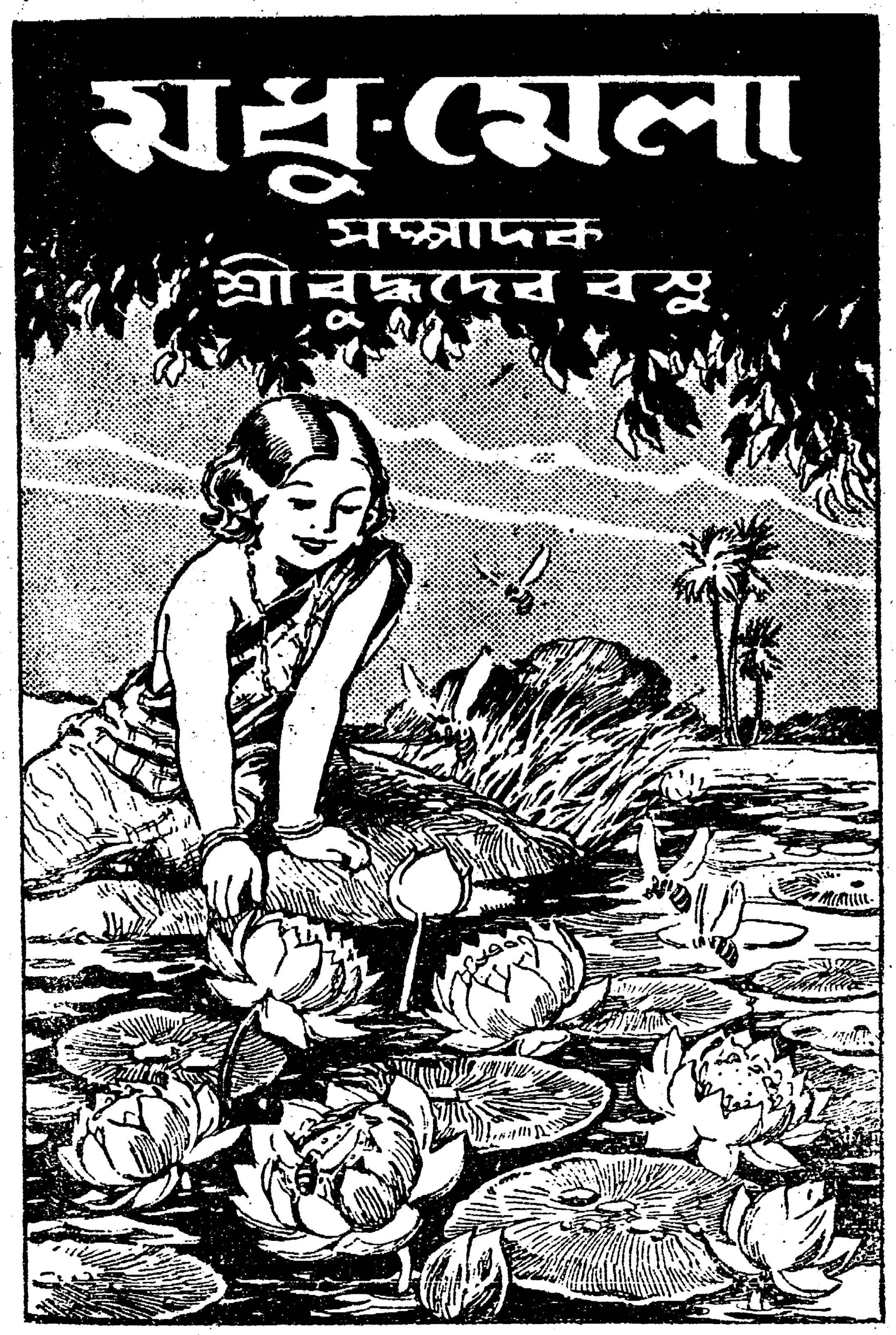


লিখেছেন :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
( অপ্রকাশিত রচনা )
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ( বীরবল )
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
কাজী নজরুল্ ইস্লাম
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীসুনির্ম্মল বসু
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীঅখিল নিয়োগী
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
শ্রীআশালতা সিংহ
যাদুকর—শ্রীপি, সি, সরকার প্রভৃতি…

দেশের একডাকে-চেনা লেখক-লেখিকা ও শিল্পীর লেখায় ও ছবিতে এবার পূজায় 'মধু-মেলা' শিশুরাজ্যে আনন্দের হট্টগোল তুলিবে।

**দাম সেই দেড় টাকা**

দেব-সাহিত্য-কুটীর ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

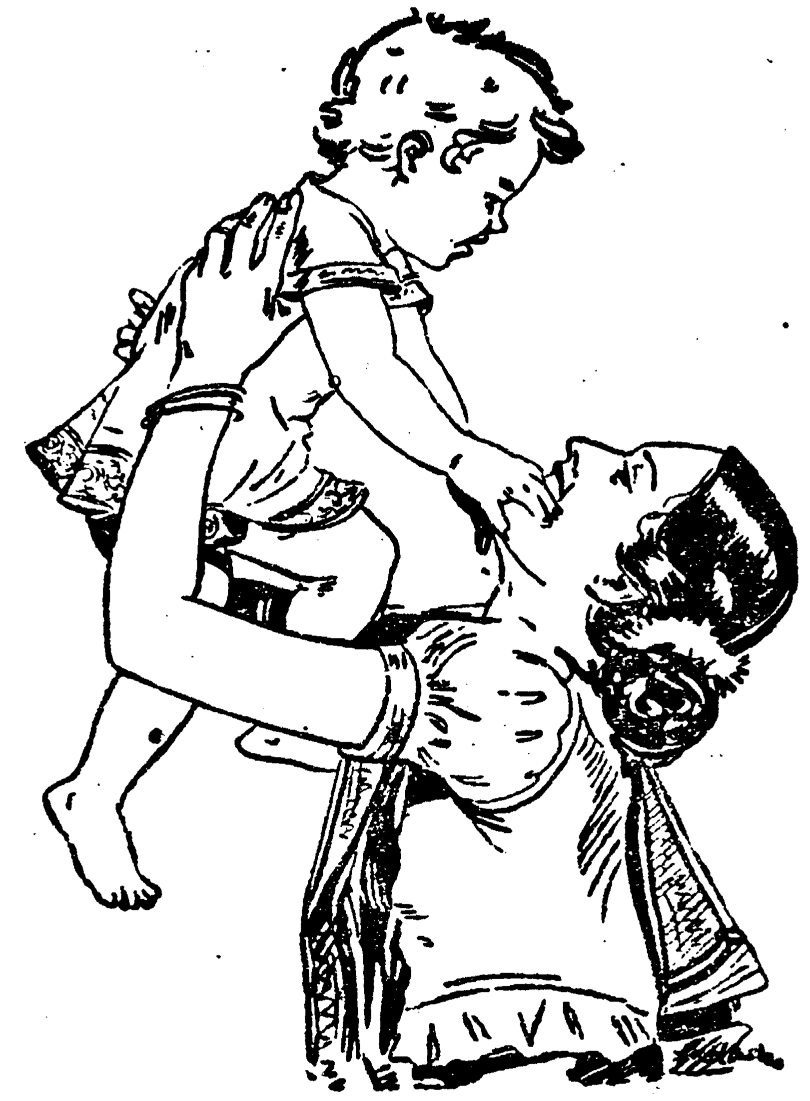

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

## ক্যান্থারাইডিন
### হেয়ার অয়েল

পোষণের উপযোগী পদার্থের অভাবে যখন কেশ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইতে থাকে, এবং মস্তকে খুস্কি, মরামাস প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করিলে কেশমূল নীরোগ এবং বিরলতা ও পতন নিবারিত হইয়া কেশের স্বাস্থ্য ও শ্রী পরিবর্ধিত হয়।

একাধারে কেশচর্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

**বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ**

কলিকাতা :: বোম্বাই



শারদীয় মহোৎসবে ছোটদের

শ্রেষ্ঠ উপহার

# বার্ষিক শিশুসাথী

বার্ষিক শিশুসাথী
বার্ষিক শিশুসাথী
বার্ষিক শিশুসাথী

আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই বাহির হইবে।

**এবারের বার্ষিকীর বৈশিষ্ট্য—**

সরস গল্প—সুললিত কবিতা—বিজ্ঞানের কথা—ইতিহাস—প্রাণিতত্ত্ব এবং আধুনিক যুদ্ধসংক্রান্ত গল্প-প্রবন্ধ; আর রাশি রাশি একবর্ণ ও বহুবর্ণ ছবি!

—সম্পাদক—

শ্রীআশুতোষ ধর

বার্ষিক শিশুসাথী
বার্ষিক শিশুসাথী
বার্ষিক শিশুসাথী

o o o o

**সদ্য-প্রকাশিত উপহার পুস্তক**

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত
**পুরাণো গল্প**
মূল্য ॥৵০ আনা

আবদুর রশিদ প্রণীত
**আরবের গল্প**
মূল্য ॥৵০ আনা

প্রত্যেকখানা
।৴০
জয়ডঙ্কা
রুনুঝুনু
ঝুমঝুম
আলপনা
পারিজাত
পরশমণি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত
**সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ**
সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত—কবিগুরুর প্রথম স্মৃতিবাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি :: মূল্য ১৲ টাকা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত
**হাবুল চন্দোর**
মূল্য ॥৵০ আনা

আবদুর রশিদ প্রণীত
**প্রকৃতির পরাজয়**
মূল্য ॥৵০ আনা

প্রত্যেকখানা
॥০
ঠাকুর্দ্দা
রণজিৎ
বাজিকর
তারাবাই
কালকেতু
রাজকুমার

o o o o

পত্র লিখিলেই উপহার পুস্তকের তালিকা প্রেরিত হয়

**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা    ৩৮নং জনসন রোড, ঢাকা।

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি!"
লিলি
কার্নিভ্যাল
বিস্কুট
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

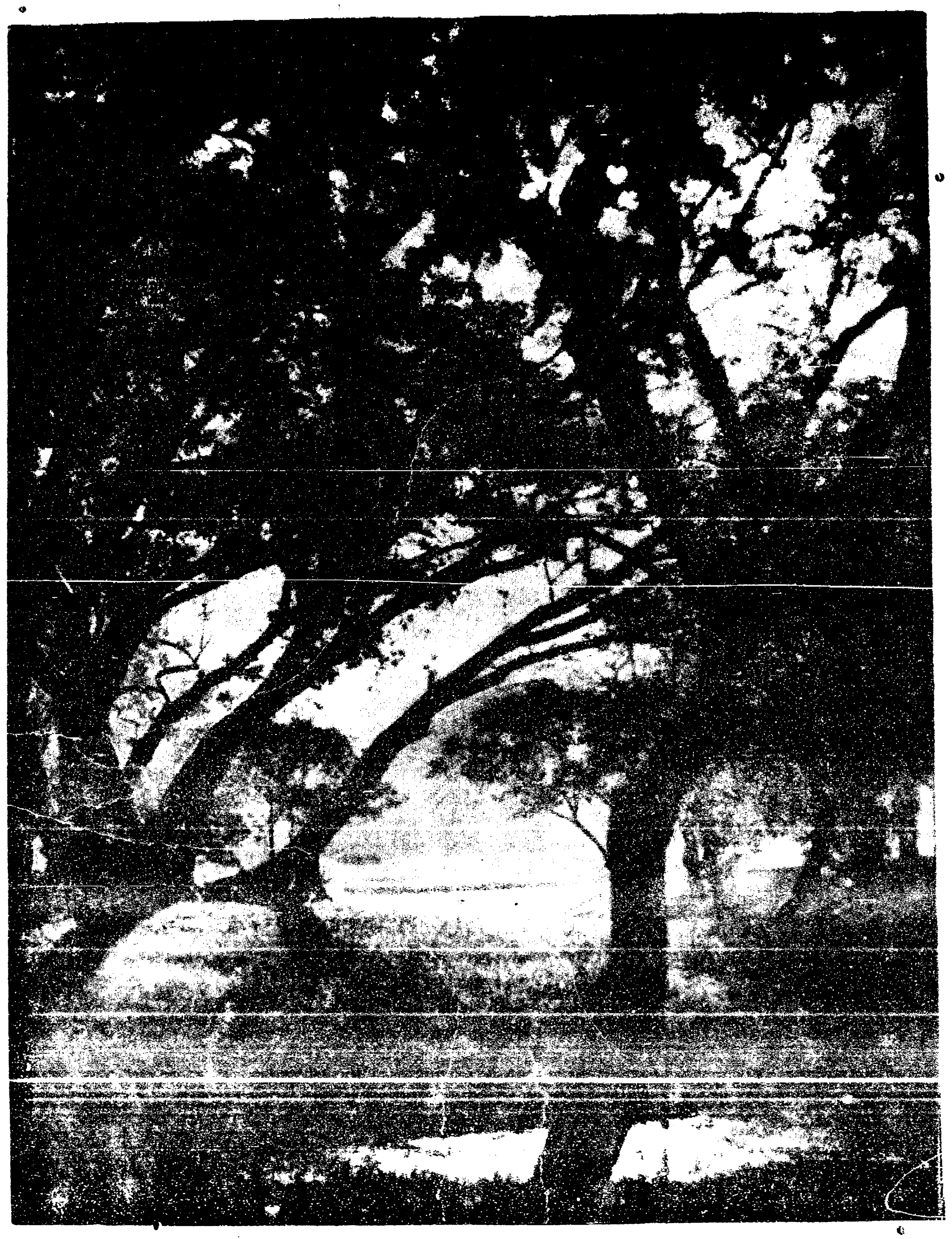

বর্ষণ-শেষে

আলোকচিত্র—শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৯ { ৯ম সংখ্যা

## এক যে ছিল ফুলের পরী

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক যে ছিল ফুলের পরী রামধনুকের দেশে—
ভোরের বেলা ভাব করে সে খুকুর কাছে এসে।
খুকু তখন যায় যে ভুলে প্রথম ভাগের পড়া,
ভালো লাগে না ত' তার আর মায়ের মুখের ছড়া।
তার সঙ্গে চলে যে তার কেবল ভাব আর আড়ি—
দুই জনেতেই যায় ভুলিয়া কার বা কোথা বাড়ী।

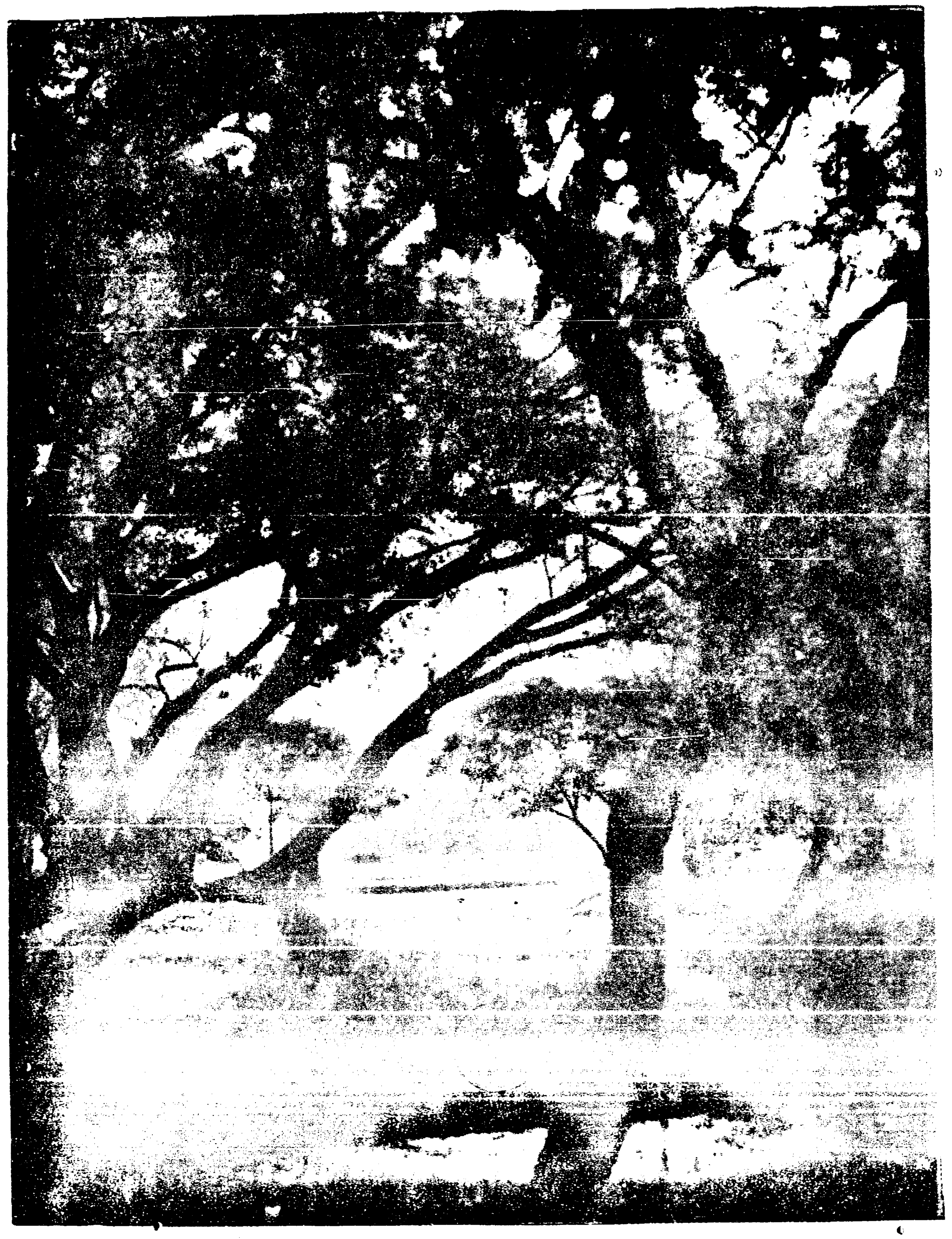

বর্ষণ-শেষে

আলোকচিত্র—শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এস্-সি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৯ { ৯ম সংখ্যা

# এক যে ছিল ফুলের পরী

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক যে ছিল ফুলের পরী রামধনুকের দেশে—
ভোরের বেলা ভাব করে সে খুকুর কাছে এসে।
খুকু তখন যায় যে ভুলে প্রথম ভাগের পড়া,
ভালো লাগে না ত' তার আর মায়ের মুখের ছড়া।
তার সঙ্গে চলে যে তার কেবল ভাব আর আড়ি—
দুই জনেতেই যায় ভুলিয়া কার বা কোথা বাড়ী।

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

সাঁঝের বেলায় উজল তারা চুপি চুপি ডাকে,
ঘুম ঢেলে দেয় ঘুমের মাসী খুকুর চোখের ফাঁকে।
ফুলের পরী আসে তখন ঘুমের পরী হয়ে—
প্রজাপতির পিঠে চড়ে' খুকুরে যায় লয়ে।
স্বপ্ন-নদীর পারে যেথায় রামধনুকের দেশে—
ফুলের মেয়ে ফুলের ভেলায় বেড়ায় ভেসে ভেসে,
চাঁদের আলোর ঝরণা ঝরে হাজার বরণ তার—
মিষ্টি সুরে বাঁশী বাজে অনেক দূরের পার,
কোন্ কন্যা যায় রূপালি মেঘের তরী বেয়ে—
ঘুম-ভরা দুই চোখে খুকুর আশ মেটে না চেয়ে।

চোখ মেলে সে দেখে ভুবন আলোয় গেছে ভরি',
ডাক্‌ছে তারে হাতছানিতে আবার ফুলের পরী।

---

# বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

শ্রীআনন ঘোষাল

২

সায়ান্স্ কলেজের ক্লাশ্‌রুম। সামনে দুই দুইটা প্রকাণ্ড আধুনিক বোর্ড্। একটা নামান'র সঙ্গে অপরটি কপি-কলের সাহায্যে উপরে উঠে যায়। একটী বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে চক্ দিয়ে লেখা ছিল—"উই পোকা"।

প্রফেসার মুখার্জ্জি প্রাণিবিজ্ঞান বোঝাচ্ছিলেন। ক্লাশের টেবিলের উপর কতকগুলি শিশি ও বোতল। একটী বোতলে অসংখ্য উই পোকা ভর্ত্তি।

প্রফেসার মুখার্জ্জি একটা উই-ভরা বোতল উঠিয়ে নিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, এই উই পোকা, বুঝলে? এদের মত বুদ্ধিমান্ জীব আর পৃথিবীতে নেই।"

ছাত্র দেবেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। আচম্বিতে তার মুখ থেকে বার হয়ে এল—"ঁয়্যাঃ—!"



"হ্যাঁ, অবশ্য মানুষ ছাড়া। এদের জীবন-পদ্ধতি ঠিক মানুষের মতন।" প্রফেসার নাকি সুরে বললেন—"ফার্ বেটার দ্যান্ দা য়্যাভারেজ্ ইণ্ডিয়ান্, ইউ সী—" (সাধারণ ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশী ভাল)। ছাত্র অজিত জিজ্ঞেস করল—"এদের বাড়ী-ঘর নেই স্যর্?"

প্রফেসার সাহেব অজিতের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে উত্তর করলেন—"আ ইউ। আমার কথা শেষ করতে দাও। এদের বাড়ী—? বাড়ী শুধু কেন, এদের দুর্গ আছে, নগর আছে, সৈন্য আছে, সামন্ত আছে, রাজা আছে, রাণী আছে। এদের সবই আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহও এরা কম করে না। এদের সহর বা দুর্গকে সাধারণ লোকে ভুল করে উই-ঢিবি বলে,—য়্যাণ্ড্ ইউ নেভার নিউ ইট্ (এবং তোমরা এ কখনও জানতে না)।"

ছাত্র নরেন এতক্ষণ অবাক্ হয়ে প্রফেসারের কথা শুনছিল। সে মাথা নেড়ে জানাল—"না স্যর্।"

য়ুরোপের জ্ঞান-গরিমার তুলনায় এখানকার অজ্ঞতার কথা ভেবে প্রফেসার অনেক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। বিলাতের ছোট ছোট ছেলেরাও যা বোঝে, এ দেশের বড়রাও তা জানে না—এ সম্বন্ধে প্রফেসারের বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল। বিক্ষুব্ধভাবে নাকি সুরে প্রফেসার উত্তর করলেন—"বাট্ ইন্ আওয়ার লণ্ডন, ইচ্ য়্যাণ্ড এভ্‌রি বয় নোজ্ ইট্। ইউ সী—" (কিন্তু আমাদের লণ্ডনে প্রত্যেকটি ছেলে এ কথা জানে)।

ছাত্র নীরেন লজ্জিত হয়ে উত্তর করল—"হ্যাঁ স্যর্, বুঝেছি।"

"আঃ, কিচ্ছু বোঝ নি। শোন, এই পোকা—"

প্রফেসারের বক্তব্য আর শেষ হ'ল না। হঠাৎ একটা চাপরাশী লাল রঙের একখানা বাঁধান খাতা হাতে ক্লাশে এসে ঢুকল। প্রফেসার শশব্যস্তে খাতাখানি তার হাত থেকে তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করলেন। ছাত্ররা উদ্‌গ্রীব হয়ে ভিতরের খবর জানবার জন্য প্রফেসারের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

প্রফেসার তাড়াতাড়ি খাতার লেখাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে সানন্দে বলে উঠলেন—"মাই ঘঃ! ভেরী গুড্ নিউজ্ বয়েজ, ভেরী গুড্ নিউজ্। মাই প্রোপোজাল্ য়্যাট্ লাষ্ট্ য়্যাক্‌সেপ্‌টেড্।" (খুব ভাল খবর। আমার প্রস্তাব অবশেষে গৃহীত হয়েছে।)

ছাত্রের দল উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ভিতরের খবর জানবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। হঠাৎ প্রফেসার সাহেব বলে উঠলেন—"এতে কালই ষ্টুডেণ্ট্‌সদের—অর্থাৎ ইউ বয়েজ্, ইউ, তোমাদের নিয়ে এক্স্‌কারশনে যাবার জন্য বলা হয়েছে।"

ছেলেদের দল এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে প্রফেসারের বক্তব্য শুনছিল। এইবার সোৎসাহে, আনন্দবিহ্বল ভাবে, একসঙ্গে তারা চেঁচিয়ে উঠল—"স্য-র্। স্যর্। স্য—!"

ইসারায় ছাত্রদের নিরস্ত হতে বলে প্রফেসার এক নিঃশ্বাসে বলে চললেন—"এইবার কিছু নতুন নতুন জীব—স্পেসিমেন্ কলেজের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে উই-ঢিবি, সংগ্রহ করতে হবে উইদের বৃহৎ-আকার রাজারাণী। ঘুরতে হবে আমাদের সহর থেকে অনেক দূরে বনে ও জঙ্গলে। আর ইউ রেডি, উইলিং, বয়েজ্?"

উত্তরে একজন ছাত্র বলল—"ইয়েস্ স্যর্।" সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সকলে বলে উঠল—"সার্টেন্‌লি", "হোয়াই নট্?" "নিশ্চয়।"

বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। হঠাৎ প্রফেসার টেবিলে হাতুড়ী ঠুকে চেঁচিয়ে উঠলেন—"অর্ডার অর্ডার!" ছেলেরা চুপ করল। প্রফেসার বল্লেন, "উইলিং বয়েজ্ রেইজ্ দেয়ার হ্যাণ্ড্স।"

এ বিষয়ে ছাত্রদের মত ছিল অভিন্ন। তারা অনেকেই আশৈশব কলকাতাতেই মানুষ হয়েছে। কলকাতার বাইরে যে বিরাট্ বাংলা দেশ আছে, তাদের অনেকেরই কাছে তা তখনও অজ্ঞাত। তাদের কেউ কেউ দার্জ্জিলিং বা পশ্চিমের কোনও কোনও সহরে গিয়ে থাকলেও বাংলার কোন গ্রাম পরিদর্শন তাদের অদৃষ্টে তখনও ঘটে ওঠে নি। প্রফেসারের অবস্থাও ছিল তাই। তিনি বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু বাংলার রাজধানী কলকাতাতে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হলেও, এক ম্যাপে ছাড়া, বাংলা দর্শন তাঁর ভাগ্যেও ঘটে ওঠে নি।

ছাত্ররা সানন্দে হাত তুলে তাদের সম্মতি জানাল।

ছাত্র অজিত জিজ্ঞেস করল—"কোথায় যাওয়া হবে স্যর্?"

সামনের দেওয়ালের উপর বাংলা দেশের একটা মানচিত্র ঝুলান ছিল। প্রফেসার সাহেব মানচিত্রটির দিকে তাকিয়ে উত্তর করলেন—"হ্যালি সহর।"

রমেন জিজ্ঞেস করল—"হ্যালিসহর! সে কোথায় স্যর্?"

টেবিলের উপর থেকে একটা লম্বা ছড়ি উঠিয়ে নিয়ে, প্রফেসার ছড়ির অগ্রভাগ ম্যাপের একটা অংশে ছুঁইয়ে উত্তর করলেন—"দেয়ার্'স্ ইট্ (ঐখানে)।"

ছাত্রগণ উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জায়গাটা দেখতে সুরু করল। একজন আবার উঠে গিয়ে একটা ফিতের সাহায্যে ম্যাপের নীচে আঁকা স্কেলের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, কলকাতা থেকে হ্যালিসহরের দূরত্ব মাপতে লাগল।

হঠাৎ প্রফেসার সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন—"ক্লা—শ!"



প্রফেসারের আদেশ কানে যাওয়া মাত্র ছাত্ররা স্ব স্ব স্থানে ফিরে এসে মিলিটারি কায়দায় য্যাটেন্‌শন্ হয়ে দাঁড়াল। প্রফেসার তাঁর শেষ হুকুম শোনালেন—"ডিস্-মিস।"

পাশের ল্যাবোরেটারী হলে ডিমন্‌ষ্ট্রেটার ডি. রায় তখন সেই গোখুরা সাপটার পেটের নীচে থেকে সুরু ক'রে হৃদ্‌পিণ্ড পর্য্যন্ত কাঁচি চালাচ্ছিলেন। কোনও দিকে আর দৃক্‌পাত না করে, ছাত্রের দল হৈ চৈ করতে করতে একেবারে কলেজের কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়াল। সকলেরই মন খুসীতে ভরপুর।

৩

শিয়ালদহ ষ্টেশনটায় সেদিন ভীড় ছিল খুব বেশী। অতি কষ্টে বুকিং অফিসের ভীড় ঠেলে, আধখানা চশমা হাতে বেরিয়ে এসে মিঃ রায় ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন, —"টু সেকেণ্ড য়্যাণ্ড থার্ট্টি থার্ড্। কাম্ কুইক্‌লি।"

গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাত্ররা যে যার লগেজ্ নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। চাপরাশীরা বড় বড় সরকারী বাক্সগুলো কুলির মাথায় চাপিয়ে দিল। শশব্যস্তে ছাত্রের দল 'হ্যালিসহর'-গামী ট্রেন্‌টায় উঠে পড়ল। প্রফেসার মুখার্জ্জি ও মিঃ রায় পাশের সেকেণ্ড্ ক্লাশ্‌টায় ঢুকে পড়লেন। গাড়ীও চলতে সুরু করল। ছেলের দল চীৎকার করে উঠল—"হুর্‌রা।"

গাড়ীতেও সেদিন কম ভীড় ছিল না। তার পর এই খাকি হাফ্ প্যাণ্ট্ ও রঙ-বেরঙের শার্ট্-পরা ছাত্রদের উৎপাত। মানচিত্র, মাইক্রস্‌কোপ্, যন্ত্রপাতি ও লগেজ দিয়ে তারা গাড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা ভরিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের উদ্দাম গতি সত্ত্বেও কয়েকটী পোকা জাতীয় জীব গাড়ীর ভিতর এসে ঢুকছিল। ছাত্র দেবেশ তাড়াতাড়ি একটা টেষ্ট্ টিউব্ বার করে পোকাগুলোকে তার মধ্যে ভরে নিয়ে, কর্কের ছিপিটা এঁটে দিতে দিতে বল্‌ল—"স্পিসিস্ অব্ ইন্‌সেক্টা।"

আশে পাশের বেঞ্চ কয়টায় কয়েকজন গোঁড়া প্রবীণ ভদ্রলোক বসেছিলেন। ট্রেনের ভিতর ছাত্রদের এই কীট-শিকার রূপ বিসদৃশ ব্যবহারে সকলেই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলেন। অনেক সলাপরামর্শের পর একজন গলাবন্ধ কোটওয়ালা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"মশাইদের করা হয় কি?"

ছাত্র দেবেশ হাতের টেষ্ট্ টিউব্‌টার পোকাগুলো পরীক্ষা করতে করতে উত্তর দিল —"আজ্ঞে, আমরা সব বৈজ্ঞানিক,—এই হবু-বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ বিজ্ঞানের ছাত্র।"

সহযাত্রীদের মধ্যে একজন নামাবলী গায়ে পণ্ডিত গোছের ভদ্রলোক সবেমাত্র তাঁর গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছিলেন। এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষেপে উঠে বললেন—"বলি এই ভুয়ো বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ ধরা আর মানুষ মারা

কল তৈরী ছাড়া পৃথিবীর আর কি উপকার তোমরা করলে বল ত'? এই জন্যই না গুরুজী বলেছেন, বিজ্ঞান ছেড়ে দর্শন চর্চ্চা কর। বুঝলে, একটা গোটা সমুদ্র গিলে ফেলতে পারবে, অগস্ত্য ঋষির মত, এই দর্শনের সাহায্যে।"

বিস্মিত হয়ে দেবেশ পোকা সংগ্রহ কিছুক্ষণ স্থগিত রেখে জিজ্ঞেস করল—"মুখ দিয়ে? বাঃ, তা সম্ভব হ'লে ত' এক সঙ্গে অনেক ফনা—জীবাদি, নানা জাতীয় মাছ, কুমীর, অক্টো-পাস্, হাঙ্গর প্রভৃতি কত জলজন্তু নজরে পড়ত; আর আমরা চট্‌পট্‌ তাদের শ্রেণী-বিভাগ শেষ করে আরও কত নতুন নতুন জীবের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিতে পারতাম। সমুদ্রের অতল তলের কত ম্যামেল, রেপ্‌টেলিয়া, ফিশ্‌ (স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, মাছ)—! আহা, এও কি সম্ভব?"

ঠিক এই সময় একখানা উড়ো-জাহাজ আকাশে উড়তে দেখা গেল।

(ক্রমশঃ)

---

# আমেরিকার একটি ছোট্ট ছেলে

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার একটি ছোট্ট ছেলের কথা তোমাদের আজ বলব। এই ছোট্ট ছেলেটির বাল্যজীবনের কয়েকটি ঘটনা শুনলে মানুষের জীবন যে কত বৈচিত্র্যময় হতে পারে তার আভাস তোমরা পাবে। বিশেষতঃ সাধারণতঃ আমরা যা চারদিকে দেখি এই ছেলেটির তারই প্রতি কিরূপ অসম্ভব কৌতূহল ছিল এবং সেই কৌতূহল কেমন ক'রে জিজ্ঞাসা এবং সেই জিজ্ঞাসা কেমন ক'রে সত্যানুসন্ধানের মহাসাধনায় পর্য্যবসিত হ'ল, তার পরিচয় পেলে অবাক্ হবে। তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাবে তাঁর বাল্যের হাস্যকর ও অনাবশ্যক কৌতূহলই ভবিষ্যতে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে যুগান্তর এনেছে।

ছেলেটি যখন ছোট্ট একটি শিশু তখন তার বোনটি একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দেখতে পেল যে তার ভাই এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে বসে আছে। সে



কি করছে জিজ্ঞাসা করায় ভাই বল্‌লে, "আমি একটা হাঁসের ডিমে তা দিচ্ছি। দেখ, আমি ঠিক এর মার মত ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বার করতে পারি কি না।"

বলা বাহুল্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সে নিস্ফল হ'ল, কিন্তু তার মা তখন এই ব্যাপার দেখে হাসেন নি, বরং ছেলের মতিগতি বুঝেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেটির ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। সিঁড়ির পাশের ঘরটাকে সে তার ল্যাবোরেটরী করে পয়সা বাঁচিয়ে নানা রকম ওষুধ-বিষুধে তাক একেবারে ভর্ত্তি করে ফেলেছিল। সে আর তার বোন সময় পেলেই গিয়ে ঐ সমস্ত ওষুধপত্র নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করত। তাদের মা-বাপ এ রোগ ছাড়াবার চেষ্টা করতেন না, বরং উৎসাহই দিতেন।

দুই ভাইবোন গ্রামের পাঠশালায় যেত। পড়া বলতে যাতে ভুল না হয় সেইজন্য তারা নিজেদের মধ্যে পেন্সিলের আওয়াজ দিয়ে একটা সাঙ্কেতিক 'কোড্' স্থির করেছিল (ইংরেজীতে যাকে বলে 'সিগ্‌নালিং')। একজন পড়া বলতে বলতে ভুল করলেই আর একজন পেন্সিলের আওয়াজে সেটা বলে দিত। কি দুষ্টুমি বুদ্ধি দেখেছ? একদিন তা'দের গুরুমা তা'দের কারসাজি ধরে ফেলে আচ্ছা করে মার লাগান। তার পর থেকে তাদের 'সিগ্‌নালিং'ও বন্ধ হয়ে যায়।

ছেলেটির বিজ্ঞানের প্রতি এমনই ঝোঁক ছিল যে এই ঝোঁকের জন্য সে নিজের জীবনও একবার সংশয় ক'রে তুলেছিল। একদিন সে একটা ভীষণ বিস্ফোরকে আগুন লাগিয়ে মজা দেখতে থাকে। ফলে বিস্ফোরণের শব্দে তার কানের বিকৃতি ঘট্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিস্ফোরকের ভীষণ শব্দে পালিয়ে না গিয়ে আগুন লেগে জিনিষটার কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে তাই সে দেখতে থাকে একমনে। ঘর ধোঁয়ায় একেবারে ভর্ত্তি হয়ে যায় এবং পাড়ার লোকেরা ঠিক সময়ে এসে না পড়লে তাকে বোধ হয় শ্বাসরোধেই মরতে হ'ত। এর পর থেকে পাঠশালায় পড়া তার বন্ধ হয়ে যায়। এবার থেকে বাড়ীতে বসেই সে মনের সুখে বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ কর্‌ল।

এমনি মারাত্মক পরীক্ষা সে আরও করেছে। এক রকম পাউডারের

কথা সে পড়েছিল যেটাতে জল দিলে খুব বুদ্বুদ্ কেটে গ্যাস বেরোত। এক দিন সে করল কি, তার এক বন্ধুকে ডেকে এনে ঐ পাউডার জলে গুলে খাইয়ে দিল। কেন জান? সে ভাব্‌ল যে তার বন্ধুর পেটে ঐ পাউডার গেলে সেখানে অনেক গ্যাস্ জমবে আর তা হ'লেই সে হাল্‌কা হয়ে উড়তে থাকবে।

কিন্তু অতি অল্প বয়সেই সংসারের কর্ম্মচক্রের আহ্বানে ছেলেটিকে সাড়া দিতে হয়। তার পিতা ছিলেন গরীব। কাজেই কিশোর বয়স পেরোতে না পেরোতেই উপার্জ্জনের চাপ তার উপর পড়ায় সে একটা ট্রেনে ফেরিওয়ালা বা 'হকারে'র কাজ নিল। আমেরিকার ট্রেনগুলিতে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় যাওয়া যায়, আর সে সময় প্রত্যেক ট্রেনে একজন ক'রে 'হকার' নির্দ্দিষ্ট থাকত; তাকে ট্রেনের সঙ্গেই চলাফেরা করতে হ'ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাগজ, ফল প্রভৃতি নিয়ে ছোট্ট এই ছেলেটিকে সকল যাত্রীই চিনে ফেল্‌ল। তোমরা হয়ত' ভাব্‌ছ যে রেলে কাজ আরম্ভ ক'রে ছেলেটি বিজ্ঞানের চর্চ্চা বুঝি ছেড়েই দিল। মোটেই তা' নয়। ঐ রেলগাড়ীর গার্ড্ সাহেবকে ধরে লাগেজ ভ্যানের এক কোণে সে তার ল্যাবোরেটরী বসিয়ে সেখানেই অবাধে তার পরীক্ষা চালাতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে আবার কোথা থেকে সে একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড হ্যাণ্ড-প্রেস কিনে এনে তাই দিয়ে "উইক্‌লি হেরাল্ড" নামে একটা কাগজ ছাপাতে লাগ্‌ল। তার মানে, রেলগাড়ীতে চড়ে যেতে যেতেই সে হ'ল একাধারে বৈজ্ঞানিক, সম্পাদক আবার হকার-বয়। তার কাগজ এত জনপ্রিয় হয় যে ষ্টেশনে ষ্টেশনে লোক জমা হয়ে থাক্‌ত তার কাগজ পড়ার জন্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দুর্ঘটনায় তার ল্যাবোরেটরী ও প্রিন্টিং প্রেস সে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়। একদিন গাড়ীর ঝাঁকুনীতে ফস্ফরাসের একটা বোতল তাক থেকে পড়ে যাওয়ায় গাড়ীতে আগুন লেগে যায়। তার পর থেকে হকারের কাজ সে করতে লাগল বটে কিন্তু ঐ সমস্ত পরীক্ষা করা ও কাগজ ছাপা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। কি আর করবে সে? বাড়ীতেই বসে পরীক্ষা চালাতে লাগ্‌ল আর কি। ইতিমধ্যে সে টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে পড়ে ঐ বিষয়ে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়ে।



একদিন একটি টেলিগ্রাফ-অপারেটারের ছোট্ট মেয়েকে সে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে বাঁচায়। তার পর থেকে সে ঐ অপারেটারের খুব প্রীতিভাজন হয়ে পড়ে এবং ঐ অপারেটার তাকে টেলিগ্রাফি ভাল করে শিখিয়ে দেন। ছেলেটি এই বিদ্যা এত ভাল ভাবে আয়ত্ত করেছিল যে তার বয়স ষোল পূর্ণ হ'বার আগেই সে তাদের গ্রামের 'নাইট অপারেটার' হয়। এখন থেকে তার আসল কর্ম্মজীবন আরম্ভ হ'ল এবং এর পরে তার জীবনের ইতিহাসের প্রত্যেকটি পাতা অসংখ্য আবিষ্কার এবং অসাধারণ মেধার পরিচয়ে পূর্ণ। প্রথমে সে আবিষ্কার করল টেলিগ্রাফেরই আনুষঙ্গিক একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি কেউ সংবাদ পাঠালে সে এই সংবাদ ধরে রাখত এবং পরে আস্তে আস্তে চালিয়ে তার অর্থোদ্ধার করত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা এই ব্যাপার জানতে পেরে তাকে ঐ কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন।

তার পরের পাঁচ বছর সে বিভিন্ন জায়গায় খুঁটিনাটি কাজ করেই কাটাল। অবশেষে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে এক ষ্টক্ ব্রোকারের কাছে কাজ নিল। কিছুদিন পরেই ব্রোকারদের অফিসে ব্যবহারের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করে আট হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেল এবং ঐ টাকা দিয়ে নিজের ল্যাবোরেটরী খুলে স্বাধীন-ভাবে পরীক্ষা কার্য্য চালাতে লাগল।

ধীরে ধীরে ছেলেটির জীবনের বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ অধ্যায়ের শেষ হয়ে আসে। সে এখন আর আমাদের সেই চঞ্চল, চপল ও কৌতূহলী বালক নয়। একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের যাত্রাপথে সে আজ পা বাড়িয়েছে। এখন সে দেশবিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু গল্প আমরা আরম্ভ করেছিলাম "আমেরিকার একটি ছোট্ট ছেলে"কে নিয়েই, অতএব তার গল্প এখানেই থামাতে হবে। যদি কোন দিন সুযোগ হয় তবে ছেলেটির জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা জেনে নিতে তোমরা ভুল না।

যাই হোক্, তাঁর আবিষ্কারক-জীবনের গল্পও কম চমকপ্রদ নয়। তাই আজ তাঁর আবিষ্কারের গোটা কয়েক উদাহরণ দিয়েই এই গল্প আপাততঃ

স্থগিত থাকবে। সেকালে টেলিগ্রাফ ছিল বটে কিন্তু এককালীন একটির বেশী সংবাদ পাঠান যেত না। তিনি এমন এক উপায় আবিষ্কার করলেন যার সাহায্যে চারটি সংবাদ—দু'টি পাঠান এবং দু'টি গ্রহণ করা যেতে পারে। এর কিছুদিন পরেই স্যর্ হামফ্রী ডেভীর 'আর্ক্ ল্যাম্পের অনুপ্রেরণায় তিনি বহু বৎসরের অধ্যবসায়ের পর আবিষ্কার করলেন ইলেক্‌ট্রিক লাইট্। আজ তাঁরই কল্যাণে তোমাদের ঘরে জ্বলছে আলো,—নগরীর তমসা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আলোক-মালার তীব্র শরাঘাতে। আজ তোমরা যে সিনেমা দেখ তাও তাঁরই অক্লান্ত অধ্যবসায়ের দান। তবে তাঁর উদ্ভাবনগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেছে ফোনোগ্রাফ—যার বর্ত্তমান রূপ গ্রামোফোন। আরও কত যে আবিষ্কার তিনি করেছেন তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে একটি বিরাট্ বইয়ের প্রয়োজন হবে। কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁর অতীত জীবনের জীর্ণ ক'টি পাতা ওল্টান এখানেই বন্ধ রাখতে হবে। তোমরা সকলেই তাঁর সম্বন্ধে বড় হয়ে প'ড়।

ভাল কথা, এই ছোট্ট ছেলেটি কে তা বলা হয় নি, কিন্তু বুঝেছ নিশ্চয়ই? "বিজ্ঞানের যাদুকর" টমাস্ আল্‌ভা এডিসনের নামটা কি আর শোন নি?

'ইয়ং টমাস্ এডিসন' নামে এডিসনের বাল্যজীবন নিয়ে সুন্দর একটা ফিল্ম বেরিয়েছে। তোমরা সুবিধা পেলে সেটা দেখে নিও।

---

# "একবিন্দু নয়নের জল"

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্ এ.

২৪শে এপ্রিল—১৯৪২!

'সহরের' আবালবৃদ্ধবনিতা ঐ একটি দিনের আগমন প্রতীক্ষায় সোৎসাহে বসিয়া আছে যেন! ছোট্ট সহরের জনসাধারণ—পৃথিবীর জবর খবর জানিবার জন্য ঔৎসুক্য তাহাদের



যতটা থাকুক বা না থাকুক, গদীয়ান পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের উইল্-এর রহস্য জানিবার আগ্রহ সকলেরই সমান—ষোল আনার উপর আঠারো আনা। উইল্-এর বিস্তৃত বিবরণ এস্-ডি-ও'র এজলাসে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হইবে—ঐ ২৪শে এপ্রিল।

বাজারে গুজব, সিরাজগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড নাকি টাকার আণ্ডিল বাঁধিয়াছিলেন! কথাটা স্রেফ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারা যায় না। সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিলেন তিনি নিজে, আর তাঁর পাটের আড়ত। বিশ্ব-সংসারে ইহার বাহিরে কিছু ভাবিবার অবসরও বোধ হয় তাঁহার ছিল না। পাট পাট করিয়া ভদ্রলোক (?) এমনি 'কাঠ' বনিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাণে দয়ামায়ার বালাই ছিল বলিয়া কেহ কোন প্রমাণ দিতে পারিবে না। অথচ এত ধনসম্পদ্ কাহার জন্য? আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখিবার পক্ষপাতীও কোন দিন তিনি ছিলেন না। অযথা অর্থব্যয় করার দুর্ভাগ্য তাঁহার বরাতে লেখা ছিল না। সুতরাং এই প্রকার যোগাযোগের মধ্যে তাঁহার সিন্ধুক-গুলি যে টাকায় ফাঁপিয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মোট কথা পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড যে অসাধারণ বড়লোক (অর্থাৎ টাকার কুমীর) ছিলেন, একথা দেশের আপামরসাধারণ একবাক্যে মানিয়া লইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর সহরের একমাত্র সাপ্তাহিক 'হরকরা' পত্রিকা পুতিতুণ্ডের পরলোকগমনে "কুবের পতন" হইল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল। এ হেন পুণ্ডরীকাক্ষ বাবুর যকের ধন কাহার ভাগ্যে লাগে সে খবর জানিবার কৌতূহল হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

বেওয়ারীশ পুতিতুণ্ডের মাসীপিসি ইত্যাদির সম্পর্কে অধস্তন তিনচারি পুরুষের সাতজন দূর-আত্মীয় (দুরাত্মীয়?) তাঁহার মরণাপন্ন অসুস্থতার সংবাদ পাইবামাত্র সারা বাংলার বিভিন্ন দিক্ হইতে, শকুনের মতই, উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু, কি দুর্ভাগ্য! এত কাছে থাকিয়াও উইল্‌টির খবর পাওয়া তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই! শুনা যায়, পীড়ার ঘোরে পুতিতুণ্ড একবার অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তার পর সম্বিৎ ফিরিয়া পাইবামাত্র সরকারী উকীল লাহিড়ী মহাশয়কে জরুরী কাজে আহ্বান করাইয়া আনেন এবং একাকী শয়নকক্ষে থাকিয়া তাঁহার 'দানপত্র'টি লিখাইয়া নেন এবং তৎসঙ্গেই উহা শীলমোহরাঙ্কিত করাইয়া যথাস্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

সেই হইতে উহা স্থানীয় এস্-ডি-ও'র হেফাজতে নিরাপদেই রক্ষিত আছে। দুরাত্মীয় সপ্তরথী শত ইচ্ছাসত্ত্বেও সেই রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই। মিট্-সেফ-এ রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের চারিদিকে ব্যর্থকাম মূষিককুলের মত মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সারা বাড়ী ঘুরিয়া মরিয়াছে মাত্র।

তথাপি আশা কেহই ছাড়িতে পারে না, তাহারাও ছাড়ে নাই। সকলেই পুণ্ডরীকাক্ষ-সদনের ত্রিতল সৌধে বসিয়া অশৌচ উদ্‌যাপন করিতে করিতে সেই সুদিনের অপেক্ষায় দিন গণিতেছে।

আজ সেই বহুবাঞ্ছিত ২৪শে এপ্রিল।

বেলা দশটার মধ্যেই সমস্ত সহর এস্‌-ডি-ও'র এজলাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যেন। সকলেই একান্ত উদ্‌গ্রীব। সপ্তরথীর সাতজনেই নিজস্ব বৃত্তি ও রুচি অনুসারে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া যে যার নির্দ্দিষ্ট আসনে সমাসীন।—স্থির, গম্ভীর—তরঙ্গ-গর্ভ সমুদ্র ! :

১ম—বৈষ্ণবাচার্য্য বগলানন্দ। ২য়—প্রকাশক পরমেশ পাকড়াশী।
৩য়—দারোগা দিগম্বর দীক্ষিত। ৪র্থ—প্রচারক পঞ্চানন্দ পাঁড়ে।
৫ম—মোক্তার মন্মথ মুকুটমণি। ৬ষ্ঠ—পাটের দালাল পার্ব্বতী পণ্ডিত।
৭ম—বাউণ্ডুলে বিচিত্র-বিলাস।

উপস্থিত জনতার নজরবন্দী হইয়া সাতজন পর পর সাতখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

যথাকালে পেশকার ও উকীলবৃন্দ পরিবৃত হইয়া এস্‌-ডি-ও মহাশয় এজলাস-গত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট বাক্স হইতে শীলমোহরাঙ্কিত সুপুষ্ট পত্রাধার বাহির করা হইল। উদ্‌গ্রীব জনতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল একটা অস্ফুট আবেগ চঞ্চলতা। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষীদের সম্মুখে শীলমোহর ভাঙ্গিয়া মৃত মহাজনের দানপত্র উদ্‌ঘাটিত হইল। যথারীতি ঘোষণান্তে এস্‌-ডি-ও ধীরগম্ভীর কণ্ঠে পাঠ সুরু করিলেন :

"আমি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড, পিতার নাম প্রসন্ন পুতিতুণ্ড, সাকিন সিরাজগঞ্জ, থানা ঐ, অদ্য ৩রা এপ্রিল ১৯৪২, আমার নিজ বাসভবন "পুণ্ডরীকাক্ষসদনে" উপস্থিত থাকিয়া সজ্ঞানে এবং সহজ বুদ্ধিতে আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দফাসমূহে এই দানপত্রের বিধান করিতেছি :—

"১ম দফা—দান ও খয়রাৎ : আমার জীবিতকালে আমি দান ও খয়রাৎ দুই-ই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ 'তথা বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছি। তথাপি আমার মৃত্যুর পর এই সহরের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য যৎকিঞ্চিৎ খয়রাৎ বরাদ্দ প্রয়োজন বিধায় ইহা ধার্য্য করা যাইতেছে যে, আমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্থানীয় ময়দানে দরিদ্র-বিদায়ের জন্য আমার গচ্ছিত অর্থ হইতে তিন হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে। যাহাতে দরিদ্ররা সকলেই উহাতে সমান অংশীদার' হইতে 'পারে, মহামান্য এস্‌-ডি-ও বাহাদুর তৎপ্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং তাঁহার ব্যবস্থাই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।



"২য় দফা—উত্তরাধিকার : আমি সংসারে একা। আইন মতে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমার কোন ওয়ারিশ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। বর্ত্তমানে আমার দূর সম্পর্কের সাতটি আত্মীয় আমার মুমূর্ণাপন্ন পীড়ার সংবাদে অধীর হইয়া, সেবাকার্য্যের জন্য অত্র সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমি যার-পর-নাই কৃতজ্ঞ——"

সমুৎকণ্ঠিত সপ্তরথী হঠাৎ নড়িয়া চড়িয়া বসিল। উপস্থিত সকলেই তাহাঁদিগকে দৃষ্টি-পাতে অভিষিক্ত করিল। বিড়ালের ভাগ্যে এতক্ষণে 'শিকা' ছিঁড়িবার উপক্রম হইল বুঝি!

"তাহাদের সরল স্নেহপূর্ণ সেবা ও শুশ্রূষায় আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে যে আমার সম্পত্তি অপেক্ষাও আমার আত্মীয়তার প্রতিই তাহাদের আকর্ষণ অধিকতর ; সুতরাং আমার সম্পত্তির অংশ বিশেষ এই সব নিঃস্বার্থপর আত্মীয়ের নামে উত্তরাধিকারসূত্রে বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের অকৃত্রিম স্নেহের অমর্য্যাদা করিতে চাহি না—"

হঠাৎ একটা বায়ুপূর্ণ বেলুন ছিদ্রপথে চুপসাইয়া গেলে যে অবস্থা হয়, সপ্তরথীর সাতখানি মুখের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই মনে মনে স্বর্গীয় পুতিতুণ্ডের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। উঃ, কি ছোটলোক!

এস্‌-ডি-ও পড়িয়া চলিলেন :

"৩য় দফা—"পুণ্ডরীকাক্ষ-সদন" :—এই বসতবাটী আমার আজীবন অর্থসঞ্চয়ের সামান্য নিদর্শন মাত্র। কিন্তু জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাল আমি এই গৃহে কাটাইয়াছি, এই জন্য ইহা আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী। পূর্ব্বোক্ত স্নেহময় সাতটি আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে আমি আসবাবপত্র সহ এই গৃহ একটিমাত্র সর্ত্তে উৎসর্গ করিতে চাই—"

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া এস্‌-ডি-ও একটু ঢোক গিলিয়া থামিলেন। সপ্তরথীর মানসিক, তথা মৌখিক অবস্থা অবর্ণনীয়, অতএব অনুমেয়। বলাবাহুল্য, সকলেরই কৌতূহল এতক্ষণে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

"সর্ত্তটি এই"—এস্‌-ডি-ও গম্ভীর কণ্ঠে অগ্রসর হ'ন, "এই তৃতীয় দফা পাঠ শেষ হইবার পর হইতে ঠিক অর্দ্ধঘণ্টা পরিমিত কালের মধ্যে উক্ত সাতজনের মধ্যে যিনি আমার স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থ সর্ব্বাগ্রে একবিন্দু অশ্রুপাত করিতে পারিবেন, উক্ত বসতবাটী তাঁহারই প্রাপ্য। এ বিষয়েও স্বয়ং এস্‌-ডি-ও বাহাদুরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যদি এবম্বিধ সংঘটন একান্তই অসম্ভব হয়, তবে আমার অপরাপর সম্পত্তি সহ এই বাসগৃহে নিম্নলিখিত ৪র্থ দফায় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের অবিসম্বাদী স্বত্ব জন্মিবে।"—

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া এস্-ডি-ও এক মুহূর্ত্তের জন্য দেয়াল-বিলম্বিত ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিনিবেশ করিলেন। "এখন সাড়ে এগারটা"—তিনি সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "সর্ত্তটি আপাততঃ অদ্ভুত এবং বিসদৃশ বোধ হ'লেও বে-আইনী বলা যায় না। অতএব এখন থেকে আধঘণ্টা অর্থাৎ বারোটার মধ্যে এই সর্ত্ত পূরণের পরীক্ষা হবে। আপনারা তৈরী হ'ন!" এই বলিয়া তিনি হাতের রিষ্ট্‌ওয়াচের দিকে তাকাইয়া সপ্তরথীর প্রতি নেত্রক্ষেপ করিলেন। বলাবাহুল্য, উপস্থিত জনতা অপার বিস্ময়ে তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই এতটা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল যে একটা অভূতপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা সমস্ত এজলাস ঘরটা ভরিয়া ফেলিল। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে, দুইচারি মিনিট উঁহাদের সকলের মধ্যে এমন একটা সচেষ্ট অগ্রাহ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল যেন ভাবটা এই যে "পুণ্ডরীকাক্ষ-সদন" প্রাপ্তির জন্য তাহাদের কাহারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। অথচ অন্তরে অন্তরে কাহারও প্রলোভনের অন্ত নাই। বৈষ্ণবাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বাউণ্ডুলে অবধি প্রত্যেকেরই প্রাণপণ চেষ্টা চলিতে থাকে—কে সর্ব্বাগ্রে সর্ত্ত-পূরণে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু 'মুণ্ডপাত' হইতে সহসা 'অশ্রুপাতের' চেষ্টা যে কী নিদারুণ দুর্ঘটনা তাহা কে কল্পনা করিতে পারিত?

দেখিতে দেখিতে ৩০ মিনিটের মূল্যবান্ সাত মিনিট পার হইয়া যায়। কিন্তু হায়, 'কা কস্য পরিবেদনা!'

বগলানন্দ মহারাজ মনে মনে নানা ক্ষেত্রে তাঁহার ভাবোদ্বেল বক্তৃতারাশির পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন। কোথায় কবে ভক্তি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাঁহার দুইচক্ষু অশ্রু-জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল তাহারই রোমন্থন চলিতে থাকে। প্রকাশক পাকড়াশী এ যাবৎ প্রকাশিত যত সব রোমাঞ্চ-লেখকের লেখা সুকরুণ দৃশ্যসমূহ স্মৃতির পটে একে একে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকেন। দারোগা দীক্ষিত ভাবিতে থাকেন, অন্ধকুঠুরীতে আবদ্ধ বেত্রদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর আর্ত্ত চীৎকারের কথা। প্রচারক পঞ্চানন্দ ধর্ম্মপ্রচারের তোড়ে গত বৎসর কত শত পাষণ্ডের পাষাণ বক্ষে প্রেমের উৎস বহাইয়াছেন তাহারই সালতামামী হিসাব কষিতে থাকেন। কিন্তু হায়, পরের চোখে জল বাহির করা যত সহজ নিজের চোখে বুঝি তত সহজ নয়! মোক্তার মুকুটমণি ভাবিতে থাকেন—শাঁসালো মক্কেল তমিজুদ্দীনের ফাঁসির হুকুমের দৃশ্যটা। উঃ! আনাড়ি পরামাণিকের অনভ্যস্ত হাতে নূতন অস্ত্রের মুখে গাল ছাড়িয়া দিয়া দাড়ি-গোঁফ কামাইবার নিদারুণ অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট চিত্রটিও সেই সঙ্গে ফুটিয়া উঠে মুকুটমণির সুগোল মুখমণ্ডলে। সেবার ব্যবসায়ে ঝাড়া চার হাজার



টাকা খেসারৎ দিয়া যে দারুণ মনঃ-কষ্টে নীরবে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, পাটের দালাল পার্ব্বতী পণ্ডিত বারংবার তাহারই স্মৃতি মনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করিতে যত্নবান্ হ'ন। বাউণ্ডুলে বিচিত্র-বিলাসের মনশ্চক্ষে ভাসিতে থাকে তাহার বিগত বাইশ বছরের জীবনে ধরণীর ঘাটে ঘাটে ঘায়েল হওয়ার বিচিত্র কাহিনী! কিন্তু হায়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও কাহারও নয়নকোণে একবিন্দু অশ্রুপতনের কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

১১—৫০! আর দশ মিনিট!!

বাউণ্ডুলে বিচিত্র-বিলাস হঠাৎ "হোঃ হোঃ" শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—"এমন পাগ্‌লামো কি মানুষের সাজে? ফুঃ! জোর করে চোখের জল!—হেঃ"—

"কিন্তু, দাদা," হাসিয়া মন্তব্য করেন দারোগা বাবু, "আপনি যে হেসে হেসে কাঁদতেই চেষ্টা করছেন এটা কারো বুঝতে বাকী নেই। হেঃ হেঃ……তবে কিনা—ও ফন্দীটা…"

এদিকে প্রচারক পঞ্চানন্দের প্রাণপণ প্রচেষ্টা এতক্ষণে সার্থক হইবার উপক্রম হয়। শত শত নিদারুণ কারুণ্যের চিত্র চিত্রপটে ভাসিতে থাকে তাঁর। বন্ধুবিচ্ছেদ—পুত্রবিচ্ছেদ—স্ত্রীর মৃত্যু—নিজের মৃত্যু!…যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মর্ম্মভেদী চীৎকার……ছিঃ ছিঃ ছিঃ—সামান্য একটা তিনতলা বাড়ীর জন্য এই কৌতূহলী জনতার সমক্ষে এ কি হাস্যকর অপচেষ্টা!……সবটা ভাবিয়া বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠে পঞ্চানন্দের শিক্ষিত অন্তঃকরণ।

এদিকে ঘড়ীতে তখন ১১—৫৮ মিনিট!……"নাই—নাই—সময় যে নাই!"

"উঃ! পুণ্ডরীকাক্ষদা'!" বুকে হাত দিয়া, বাষ্পবিগলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন বগলানন্দ—"আহা! একদিন তোমারই মত আমার এই নশ্বর দেহ—"

আড়-চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আর একবার দৃষ্টিপাত করেন তিনি চতুর্দ্দিকে। না, তখনও চতুর্দ্দিকেই শুষ্ক মরু!

এদিকে ব্যাপার সঙ্গীন দেখিয়া পঞ্চানন্দের প্রাণটা সত্যসত্যই কাঁদিয়া উঠে। হায় হায়, এমনি করিয়া হাত-ছাড়া হইয়া যাইবে, নিজে এত করুণ উপন্যাসের প্রকাশক হইয়াও শেষে কিনা—

"হুজুর!" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ফুৎকার করিয়া উঠেন পঞ্চানন্দ, "বোধ হচ্ছে,—হ্যাঁ,—বোধ হচ্ছে—যেন—আমি আর সামলাতে পারব না—আঃ—" বলিতে বলিতে সত্য সত্যই প্রকাশক পঞ্চানন্দের দুইটি কুৎকুতে চক্ষু হইতে তপ্ত অশ্রুবিন্দু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে। আসন হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া

একবার সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। তার পর, দুই গণ্ডে হস্ত স্থাপন করিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়েন চেয়ারে।

সমবেত জনতার সহিত স্বয়ং এস্-ডি-ও অবাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন—পঞ্চানন্দের সেই অপরূপ "মুখে হাসি, চোখে জল!"

ঢং ঢং করিয়া ১২টার ঘড়ি বাজে! *

---

# পালিয়েও পার নেই

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

কিছুদিন আগে কাগজে দেখছিলাম, আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকে হিংস্র জন্তুদের নিরাপদ্ জায়গায় সরাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কলকাতায় যদি সত্যি সত্যি বিমান-আক্রমণ হয় তবে দু'-চারটে বোমা আলিপুরের বাগানে পড়া কিছু বিচিত্র নয়, এবং বোমার হাত থেকে বাঘ বা সিঙ্গীমামাদের বাঁচান'র জন্য না হোক্, তাঁদের হাত থেকে স্থানীয় লোকদের বাঁচান'র জন্যই ঐ রকম সতর্কতা দরকার। মনে কর, বোমার টুক্‌রো লেগে যদি ঐ সব জানোয়ারের খাঁচা ভেঙ্গে যায়, আর তারা খোলা রাস্তা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তবে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে?

কিন্তু বিমান-আক্রমণ ছাড়াও হিংস্র জন্তুরা মাঝে মাঝে খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে। হয়তো রক্ষকের বা চিড়িয়াখানার কর্ত্তাদের অতি সামান্য অসাবধানতায় এই রকম কাণ্ড ঘটতে পারে—এবং সময় সময় ঘটেও, যদিও তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। এই রকম ব্যাপারের ২।৪টি গল্প আজ বল্‌ব।

তোমরা জান, সরকারী চিড়িয়াখানা ছাড়া বড় বড় লোকদের অনেকের সখের চিড়িয়াখানাও থাকে। বড় বড় সার্কাস্-দলের সঙ্গে তো থাকেই।

* বিদেশী গল্পের ছায়ায়।



তা ছাড়া যাঁরা বুনো জানোয়ার নিয়ে কারবার করেন তাঁদেরও এই রকম ছোট-বড় চিড়িয়াখানা রাখতে হয়।

হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট্ সহরের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? বছর পঁচিশেক আগের কথা। এক সার্কাস্-দল সেখানে গিয়ে তাঁবু ফেলেছে। দলের সঙ্গে রয়েছে এই রকম একটি ছোট-খাট চিড়িয়াখানা। এক-দিন হয়েছে কি, সার্কাসের সিংহটি যে খাঁচায় থাক্‌ত তার দরজাটা বোধ হয় ভাল ক'রে আট্‌কান হয় নি—ফলে হঠাৎ সিংহ মশাই দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। তার পরই এক লাফে সার্কাসের ঘেরা প্রাচীর টপ্‌কে একেবারে এসে পড়লেন এক পার্কের মধ্যে। পার্কে একদল ছেলে বল্ খেল্‌ছিল, হঠাৎ বলের জায়গায় একটা আস্ত জ্যান্ত সিংহ দেখে তাদের অবস্থা কেমন হ'ল তা তো বুঝতেই পারছ। কিন্তু অতগুলো রং-চংএ পোষাক-পরা ছেলে দেখে সিংহমশাই ঘাব্‌ড়ালেন আরও বেশী, তাদের ঘাড় ভাঙ্গবার কথা তাঁর মনেই এল না। এদিকে খবর পাওয়া মাত্র সার্কাসের কর্ত্তাও প্রাচীর টপ্‌কে মাঠে এসে নেমেছেন। এতক্ষণ পরে চেনা মুখ পেয়ে পশুরাজের ধড়ে প্রাণ এল। তিনি নিতান্ত লাজুক ছেলের মত লেজ গুটিয়ে চুপি চুপি রক্ষকের পিছু পিছু খাঁচার দিকে রওনা হ'লেন।

পশুরাজ
খাঁচা ছেড়ে ইনি যদি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন তা হ'লে—

আর একবার এই ধরণের এক ব্যাপার হয়েছিল আমেরিকার এক বড় সহরে। বোষ্টক্ নামে এক সাহেবের বুনো জানোয়ার ধরার কারবার ছিল।

একবার তাঁর চিড়িয়াখানা থেকে একটা সন্ত-ধরা সিংহ কি ক'রে বেরিয়ে আসে—এবং ছুটতে ছুটতে এসে পড়ে একেবারে সহরের বড় রাস্তায়। কিন্তু এসেই বেচারা বুঝ্‌ল এ তার আফ্রিকার জঙ্গল নয়; চার দিকে ট্রাম, মোটর, বাস্ গিস্‌গিস্ করছে, এখানে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করা সহজ নয়। বেচারা ভয় পেয়ে খানিকক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি ক'রে শেষটায় এক পুরোনো নর্দ্দমার মোটা পাইপের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে তার মালিক তাঁর কর্ম্মচারীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন। কিন্তু কার সাধ্য সেই পাইপের ভিতর থেকে পশুরাজকে বার করে? বন্দুকের আওয়াজ, কুকুরের চীৎকার এবং আরও হরেক রকম ফন্দীফিকির ক'রেও কিছু হ'ল না। এমন সময় হঠাৎ একটা মজার ব্যাপার ঘট্‌ল। ভীড়ের মধ্যে ছিল এক ঝাড়ুদার, তার হাতে বালতি আর ঝাঁটা। হঠাৎ আচম্‌কা তার হাত থেকে বালতিটা পাইপের সামনে পড়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজ যা করতে পারে নি বালতি-পতনের ঝম্ ঝম্ আওয়াজ তাই কর্‌ল। সিঙ্গী মশাই সেই অদ্ভুত আওয়াজ শুনে পরিত্রাহী ডাক ছাড়তে ছাড়তে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন নিজের খাঁচায়;—বোধ হয় বুঝেছিলেন, ওর চেয়ে নিরাপদ্ জায়গা জঙ্গলের বাইরে নেই।

চিড়িয়াখানা থেকে যত জানোয়ারকে পালাতে শোনা গেছে তার মধ্যে বানরের পালান'র গল্পই সব চেয়ে বেশী শোনা যায়। লণ্ডনের চিড়িয়াখানার ওরাংওটাং 'জেকবে'র বিখ্যাত গল্প হয়তো কেউ কেউ শুনেছ। জেকবের বাড়ী সুমাত্রায়, জাতে বনমানুষ হ'লে কি হবে, পেটে তার ভীষণ বুদ্ধি। একদিন সে দেখ্‌ল তার খাঁচার সামনে একটা লোহার ডাণ্ডা পড়ে রয়েছে—বোধ হয় কোন মিস্ত্রী কাজ করতে এসে ফেলে গেছে। আশপাশে কেউ নেই দেখে জেকব্ কৌশলে হাত বাড়িয়ে ডাণ্ডাটি সংগ্রহ কর্‌ল। তার পর গায়ে তো তার জোর কম নয়, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে খাঁচার শিকে এক চাড় দিতেই শিক গেল বেঁকে, জেকব্ তার ভিতর দিয়ে টুক্ করে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু তখনও সে একদম্ মুক্ত নয়—কারণ ওরাং গরম দেশের প্রাণী, তাকে লণ্ডনের শীতের মধ্যে রাখলে অসুখ-বিসুখ ক'রে একটা কাণ্ড বাধতে পারে।



তাই কর্ত্তৃপক্ষ জেকবের খাঁচাটা রেখেছিলেন আর একটা কাচের ঘরের মধ্যে। কিন্তু লোহার খাঁচা যে ভেঙ্গে বেরিয়েছে কাচের ঘর ভাঙ্গতে তার কি? সে ঘরের জানালাও অনায়াসেই ভেঙ্গে জেকব্ বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু তার পরেই মজাটা টের পেলেন যাদুধন। ওঃ, কি শীতরে বাবা! কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে যখন তখন কি আর ফিরে গেলে আত্মসম্মান থাকে? জেকব্ এক লাফে গিয়ে উঠ্‌ল একটা উঁচু গাছে, ডালপালার আড়ালে বসে যদি একটু গরম হওয়া যায়! এদিকে জেকবের অন্তর্ধানের খবর রটতে দেরী হয় নি। চিড়িয়াখানার কর্ত্তারা সদলবলে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। খুঁজে খুঁজে গাছের ওপর তাকে দেখা গেল, কিন্তু তাকে নামায় কার সাধ্য? জেকব্‌ও নড়বার পাত্র নয়। এমন সময় একজনের মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি এল। বড় বড় সহরে রাস্তায় জল দেবার জন্য লম্বা লম্বা পাইপ্ (হোস্) ব্যবহার করা হয় তা বোধ হয় তোমরা দেখেছ। দমকল থেকে আগুন নেভাবার জন্যও এগুলো ব্যবহার করা হয়। লোকটি

পলাতক ক্যাঙ্গারু—কুকুরের পাল্লায় পড়েছে।

সেই রকম একটি পাইপ্ (হোস্) যোগাড় করে এনে জেকবের ডালে জল ছিটানো সুরু কর্‌ল। ঐ শীতে ঠাণ্ডা পিচকিরির জল কি রকম আরামদায়ক তা তো বুঝতেই পার। মিনিট কয়েক পরেই দেখা গেল, জেকব্ বাবাজী নিতান্ত সুবোধ বালকের মত গুটিগুটি গাছ থেকে নেমে নিজের খাঁচায় ঢুকছেন।

আমেরিকার এক চিড়িয়াখানায় একবার একটা ছোট জাতের বানর খাঁচা

TIGHT BINDING

থেকে কি ক'রে বেরিয়ে আসে। বেরিয়েই সে দিব্যি মুরুব্বি চালে যেন অন্য জানোয়ারদের প্রতি কৃপার চক্ষে চাইতে চাইতে বাগানময় ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। বেচারার খেয়াল ছিল না যে তার সামনেই গোটা কয়েক হাতী বাঁধা রয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে পড়বি তো পড়্‌ একেবারে এক পেট-মোটা হাতীর মুখে। হাতী, একটা নতুন ধরণের জিনিষ দেখে, তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে নিল, তার পর চোখের সামনে তুলে ধরে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে শেষে কি মনে ক'রে তাকে সজোরে ছুঁড়ে ফেল্‌ল। বানর ছিট্‌কে গিয়ে যেখানে পড়্‌ল তার কয়েক ইঞ্চি দূরে ছিল বাঘের খাঁচা—খাঁচার মাথার দিক্‌টা আবার ফাঁকা। এর পর আর বানরটির উদ্যান-ভ্রমণের উৎসাহ রইল না—টলতে টলতে কোন রকমে নিজের খাঁচায় গিয়ে সে ঢুক্‌ল। তখন তার মুখের ভাবটা—"বড্ড বেঁচে গেছি বাবা!"

ঠিক এই রকম আর একটা গল্প শোনা যায়—জার্ম্মেনীর এক চিড়িয়াখানায়। একদল বানর খাঁচা খোলা পেয়ে বেরিয়ে আসে, তার পর খানিক দূর গিয়ে একটা গাছের ডালে দল বেঁধে বসে থাকে। চিড়িয়াখানার কর্ত্তারা কিছুতেই তাদের বাগে আনতে না পেরে শেষে কিছু দূরে একখানা কাপড় পেতে দিলেন, আর তার ওপর রইল লাল লাল পাকা পাকা কতকগুলো আপেল। পেটুক বানরদের পক্ষে অমন লোভনীয় ফলের লোভ সামলান সম্ভব নয়। কাছাকাছি কেউ নেই দেখে তারা তিন লাফে এসে দাঁড়াল সেই কাপড়ের ওপর। কিন্তু কাপড়ের ওপর যে এক রকম ভীষণ চট্‌চটে আঠা মাখান ছিল তা তো তারা জান্‌ত না। আপেল ভক্ষণের পর আর কেউ পা টেনে তুলতে পারে না। কাজেই আবার তাদের গুটি গুটি খাঁচার মধ্যে না গিয়ে উপায় রইল না।

এইবার একটা উটপাখীর পলায়নের গল্প শোন। হল্যাণ্ডের এক চিড়িয়াখানায় ব্যাপারটা ঘটেছিল। পাখী হ'লেও উটপাখীর গায়ে ভীষণ জোর, আর ছুটবার ক্ষমতাও অসীম। তোমরা দেখেছ, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কিছু পয়সা দিলেই রক্ষক হাতীর পিঠে চড়তে দেয়, এই উটপাখীর পিঠেও



সেই ভাবে লোকদের চড়ান হ'ত। একদিন পাখীটার কি খেয়াল হ'ল, এক সাহেবকে পিঠে নিয়ে সে তার নির্দ্দিষ্ট ঘরের রেলিং টপ্‌কে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল. তার পর চোঁচা দৌড়। উটপাখী ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে ছুটতে পারে—অর্থাৎ পাঞ্জাব মেল্‌ও গতিবেগে তার কাছে হার মেনে যায়। সাহেবকে পিঠে নিয়ে সে অমনি বেগে পুরো দশ মাইল্‌ রাস্তা পার হয়ে শেষে কি মনে ক'রে থাম্‌ল। এই দশ মাইল সাহেব কি ভাবে কাটিয়েছিলেন ভা ব তে পার?

উটপাখী—ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে ছুটতে পারে।

চিড়িয়াখানা থেকে ভালুক, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, বাইসন্‌, শেয়াল, হায়না, চিতা, অজগর, বেজী প্রভৃতি প্রায় সব রকম জানোয়ারেরই পলায়নের খবর শোনা গেছে। আলিপুরের চিড়িয়াখানা থেকেও একবার এক যোড়া নেকড়ে পালিয়েছিল। তবে এদের কেউই কারো বিশেষ ক্ষতি করেছে বলে শোনা যায় নি এবং একটু চেষ্টার পর প্রায় সকলেই নিজে থেকেই খাঁচার মধ্যে ফিরে এসেছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, খাঁচার জন্তু খাঁচার বাইরে গিয়ে কেমন যেন বিব্রত বোধ করে এবং খোদ্‌ জঙ্গলে পৌঁছবার রাস্তা না জানা থাকায় বাইরের হট্টগোলের চেয়ে পরিচিত খাঁচাকেই বেশী নিরাপদ মনে করে।

## ২৪

সকলেই বেশ নির্ভাবনায় দিন কাটাইতেছে, কিন্তু সুশান্তর মনে আর শান্তি নাই। কবে যে এই রাক্ষুসে দ্বীপ হইতে উদ্ধার পাইবে,—এ জীবনে পাইবে কিনা তাই বা কে জানে? এদিকে আবার শীত আসিতেছে। পোষা জন্তুগুলি এখন সংখ্যায় অনেক বাড়িয়াছে, শীতের সময় তাদেরও নিরাপদে রাখা দরকার। সুশান্ত সকলকে লইয়া তাদের জন্য আরও ভাল করিয়া গৃহ নির্ম্মাণে লাগিয়া গেল।

শীত আসিবার আগে আর একটা কাজ করা দরকার। হ্রদের পূর্ব্বতীরটা একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একদিন সুশান্ত অশোককে আড়ালে ডাকিয়া কহিল, "দেখ অশোক, বর্দোয়া সাহেবের ম্যাপ্ যতই বলুক না কেন দ্বীপের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের ওপারে কাছে-পিঠে কোন ডাঙ্গা নেই, তবু আমাদের নিজেদের ওদিকটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। সঙ্গে আমাদের ভালো দূরবীণ রয়েছে যা খুব সম্ভব বর্দোয়া সাহেবের সঙ্গে ছিল না।" অশোকেরও আপত্তি নাই। ঠিক হইল, এবারে শুধু সুশান্ত আর তার ভাই মনন যাইবে, আর সঙ্গে থাকিবে বুনো। নৌকায় করিয়া যাইবে—বুনো খুব পাকা মাঝি।

সেই ব্যবস্থা মত চৌঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় তিনজনে নৌকা ছাড়িয়া দিল। দক্ষিণ পশ্চিম হইতে বেশ বাতাস আসিতেছিল। নৌকায় পাল তুলিয়া দিয়া বুনো হাল ধরিয়া বসিল। নৌকা ক্রমে মাঝ হ্রদে আসিয়া পড়িল। এখানে বেশ বড় বড় ঢেউ; মনে হয় এ যেন সামান্য হ্রদ নয়, এক অপার অগাধ মহাসমুদ্রের উপর দিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। বেলা তিনটার সময় সুশান্ত দূরবীণ চোখে লাগাইয়া হ্রদের অপর পাড় দেখিতে চেষ্টা করিল। মনে হইল কুয়াসার মত যেন অস্পষ্ট ডাঙ্গা দেখা যাইতেছে। বেলা চারিটার সময় হ্রদের তীরস্থ গাছপালা স্পষ্ট দেখা গেল। হ্রদের পশ্চিমাংশ বেশ গভীর,



কিন্তু পূর্ব্বদিকে হ্রদের জল খুব কম। কাচের মত পরিষ্কার জলের ভিতর দিয়া হ্রদের তলদেশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। নানা আগাছা, জলীয় ঘাস তলদেশে তাল পাকাইয়া রহিয়াছে, আর তাহার মধ্যে হাজার হাজার ছোটবড় মাছ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। এক একবার নৌকা থামাইয়া তাহারা সেই অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

সুশান্তের দৃঢ় বিশ্বাস, উত্তর দিকে গেলে ম্যাপের সেই নদীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। শেষে সুশান্তর অনুমানই সত্য হইল। কিছুক্ষণ পরেই নৌকা সেই নদীর মুখে আসিয়া পড়িল। এ নদী হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মনন বলিল—"দাদা, এ নদীর একটা নাম দেবে না?" সুশান্ত কহিল—"নিশ্চয়, এর নাম হোক পূর্ব্ব-নদী। কাল সকালে আমরা পূর্ব্বনদীর উপর নৌকা চালিয়ে যাব।" একটা প্রকাণ্ড ওক্ গাছের তলায় তাঁবু ফেলিয়া সাম্‌নে প্রচুর শুক্‌না ডালপালা জড় করিয়া তাহারা আগুন ধরাইল।

পরদিন ভোর ছয়টার সময় সুশান্ত বুনো ও মননকে ঘুম হইতে জাগাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নদীর স্রোত বেশ প্রবল; হ্রদের প্রচুর জল তর্ তর্ করিয়া নদী দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাই এখন আর দাঁড় টানিতে হইল না। বুনো কহিল—"এই এক জোয়ারেই আমরা নদীর এ ছয় মাইল দূরত্ব পেরিয়ে যাব।" নৌকা প্রথমটা গহন অরণ্য দিয়া চলিতেছিল কিন্তু বেলা এগারটার পর হইতে দুই দিকের গাছপালা বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। বাতাসেও বেশ তীক্ষ্ণ লোনা গন্ধ; ঘণ্টা খানেক পরেই দূর দিগন্তকোলে এক বঙ্কিম নীলাম্বুরেখা ভাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা সমুদ্র ও নদীর সঙ্গমমুখে আসিয়া পৌঁছিল। বাঁ দিকের তীরে নৌকা বাঁধিয়া সকলে সুবিস্তৃত বেলাভূমির উপর গিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, এখানে সমুদ্রের ধারে এত বেশী পাহাড় কেন! চারিদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় চলিয়াছে, তবে সমস্তই ছোট ছোট। ঘুরিতে ঘুরিতে সুশান্ত প্রায় কুড়িটা গহ্বর আবিষ্কার করিল। আহা, জাহাজটা যদি এদিকে আসিয়া ভাঙিত, তাহা হইলে আর তাহাদের ভাবনা ছিল না। এইবার তাহারা নদীর তীর ধরিয়া সমুদ্রের বিপরীত দিকে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে নানা রকমের পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সুশান্ত গুলি করিয়া দুই চারিটা মারিতে ভুলিল না, কারণ নৌকায় যে খাবার আছে তাতে তাহারা এখন হাত দিবে না। বন হইতে বাহির হইয়া তাহারা পুনরায় সেই পাহাড়গুলির মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। সে সব প্রকৃত পাহাড় নয়, কে যেন বড় বড় পাথর জড় করিয়া রাখিয়াছে, ঠিক যেমন ধারা পুরীর নিকটস্থ কোণারকে দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প পরিবেশের মধ্যে সুশান্ত এই রকম ছোটবড় দশ বারোটা ঘর আবিষ্কার করিল। সুন্দর সুন্দর গ্র্যানাইট পাথরের ঘর—দক্ষিণ ভারতে অনেক তপোবনে যেমন দেখা যায়।

বেলা প্রায় তুইটা। মাথার উপর সূর্য্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছে। একটা উঁচু পাহাড়ে উঠিয়া তাহারা দেখিল দ্বীপের দক্ষিণ দিকে সুদূরবিসারী বালির পাহাড়, উত্তর দিকে দূরে বহুদূরে এক অসীম বিস্তৃত রুক্ষদর্শন মরুভূমি। অর্থাৎ দ্বীপের মধ্যস্থল ছাড়া আর চারিদিক্ই সম্পূর্ণ বাসের অনুপযোগী। মধ্যস্থলে সেই বিশাল হ্রদটী অবস্থিত বলিয়াই তার আশেপাশে অমন গভীর জঙ্গল, অমন প্রফুল্ল শ্যামলশ্রী! আর পূর্ব্বদিকে ত' এই অসীম অগাধ সমুদ্র। আচ্ছা সমুদ্রের ওদিকে কি কোন ডাঙ্গাই নাই?

দূরবীণ লাগাইয়া তিন জনে বার বার দেখিতে লাগিল। সুশান্ত আবার দেখে, মনন আবার দেখে, বুনো আবার দেখে। হঠাৎ বুনো চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও কি! ওটা কি দেখা যায়?" সুশান্ত তাহার হাত হইতে দূরবীণ ছিনাইয়া লইয়া নিজে দেখিতে লাগিল। হাঁ, এ যে বড় আশ্চর্য্য! এতক্ষণ তাহারা দেখে নাই কেন? দূরে বহুদূরে সুদূর পূর্ব্বাচলে নীলাকাশের মেঘকোলে ঐ যে স্পষ্ট দেখা যায়—ঠিক যেন এক পিঙ্গলবর্ণ মেঘ—না, বোধ হয় ধূসর পাহাড়ই হইবে। যাই হোক্ না কেন, সমুদ্রের শেষে যে আর একটা কিছু ধূসরবর্ণ দেখা যাইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেই তিনজনে পূর্ব্ব-নদীর মোহানার নিকট ফিরিয়া আসিল। কিছু শুক্না পাতা জড়: করিয়া ও আগুন জ্বালাইয়া তাহারা পাখী কয়টাকে পোড়াইয়া খাইল। তখনও জোয়ার আসে নাই বলিয়া তিন জনে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে বাহির হইল। ক্রমে সাতটা বাজিল, চারিদিক্ বেশ অন্ধকারে ঘিরিয়া আসিয়াছে। বুনো নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ওরা তুইজন এখনও ফেরে নাই। বনের মধ্যে তাহারা কোনও বিপদে পড়ে নাই ত'? হঠাৎ তাহার কানে গেল অদূরেই কে যেন ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। কান্না আসিতেছিল বনের মধ্য হইতে; আর ঠিক যেন সুশান্তর গলার শব্দ! বুনো তৎক্ষণাৎ বনের মধ্যে অগ্রসর হইল। খানিকটা গিয়া দেখে, আশ্চর্য্য কাণ্ড! সুশান্ত নিতান্ত গম্ভীর বদনে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর তাহার সম্মুখে তাহার ছোট ভাই মনন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তুই হাত যোড় করিয়া দাদার কাছে আকুল হইয়া মাপ চাহিতেছে। সুশান্তর মুখে কোন কথা নাই। সেই অতর্কিত দৃশ্য দেখিয়া বুনো আর অগ্রসর হইল না; একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া তুই ভাইএর কাণ্ড দেখিতে লাগিল। তারপর তাহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা, তিরস্কার, অনুযোগ, ক্ষমাভিক্ষা চলিতে লাগিল তাহা হইতে বুনো সমস্ত ব্যাপারই বুঝিল। বুঝিয়া সেও যেন কাঠ হইয়া পড়িল। তার পর নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল।

তুই ভাই ফিরিয়া আসিয়াছে। তখনও জোয়ার আসে নাই। মনন দূরে তীরের



উপর বসিয়া। চারিদিকে তুনিরীক্ষ্য অন্ধকার। নৌকার গলুইএর উপর কেবল একটা লণ্ঠন টিম্‌টিম্ করিয়া জ্বলিতেছে। নৌকার উপর সুশান্ত ও বুনো। সকলেই নির্ব্বাক্। হঠাৎ বুনো বলিয়া ফেলিল—"আমি সমস্ত কথা শুনেছি সুশান্ত!" সুশান্ত চম্‌কাইয়া উঠিল—"কি শুনেছ বুনো?"—"মনন যে কাণ্ড করেছে।"—"তুমি বুঝি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছ?" —"হাঁ, শুনেছি; কিন্তু তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত।"—"আমি ত' ক্ষমা করেছি, কিন্তু অপরে কি ক্ষমা করবে, বুনো?"—"করা ত' উচিত, কিন্তু তারা এ কথা নাই বা জান্‌ল।"—"বুনো, বুনো, তুমি আমার ভাইকে ক্ষমা ক'র, সে মহাপাপ করেছে।" বলিতে বলিতে সুশান্ত বুনোর তুই হাত নিজের হাতের ভিতর চাপিয়া ধরিল। বুনো নীরবে সুশান্তর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার রেশম কোমল সুদীর্ঘ চুলগুলি কপালের তুই পাশে সরাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল; নৌকার কাছিতে টান পড়িতে লাগিল। মননকে নৌকায় ডাকিয়া তাহারা লগি ঠেলিয়া মাঝ নদীতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। বেলা দশটার মধ্যে তাহারা একেবারে ফরাসী গুহার নিকট গিয়া নৌকা বাঁধিল। প্রদ্যোৎ তখন সেখানে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল। সে উচ্চ চীৎকার করিয়া সকলকে তাহাদের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল।

সুশান্ত তাহাদের অভিযানের সমস্ত কাহিনীই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। বলিল না শুধু মননের কথা। সকলেই বুঝিল, তাদের এই নিঃসঙ্গ দ্বীপটি পৃথিবীর সমস্ত সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাহির হইতে সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

এদিকে পঁচিশে এপ্রিল বিকালে একটা তুচ্ছ ঘটনা লইয়া সুশান্ত ও রঞ্জিতের মধ্যে এক ভীষণ কলহ হইয়া গেল। দোষটা রঞ্জিতেরই বেশী। তাহারা একটা নতুন ধরণের খেলা খেলিতেছিল। একদলের ক্যাপ্‌টেন ছিল রঞ্জিৎ, অপর দলের সুশান্ত। রঞ্জিতের দল হারিয়া গেলে রঞ্জিৎ সুশান্তকে অযথা জুয়াচোর বলিয়া গালি দিল। সুশান্ত ইহাতে প্রথমটা খুবই উত্তেজিত হইয়া পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া নম্রভাবে প্রতিবাদ করিল। রঞ্জিৎ বন্য বিড়ালের মত ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া কহিল—"আর এখন অত ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে না, কাপুরুষের মত এখন পিছিয়ে যাচ্ছ।" সুশান্ত কহিল—"আমি কাপুরুষ? তবে এই দেখ রঞ্জিৎ!" এই বলিয়া এক প্রচণ্ড ঘুঁষি সে রঞ্জিতের মুখের উপর বসাইয়া দিল। গোলমাল শুনিয়া অশোক ছুটিয়া আসিল ও তুইজনকে তুই দিকে টানিয়া ধরিল। রঞ্জিৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "সুশান্ত আমাকে মিথ্যুক বলেছে, অশোক!" সুশান্তও তেমনি আকুল স্বরে বলিল—"আর ও আমাকে জুয়াচোর, কাপুরুষ বলেছে।"

অশোক রঞ্জিৎকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "রঞ্জিৎ, এ ক্ষেত্রে দোষ তোমার।" রঞ্জিৎ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "বটে? দোষ আমার! তোমার মত এক-চোখো লোক আমার দোষ ত' দেখ্‌বেই।" অশোক এইবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"হাঁ, দোষ তোমার। তোমার মত এ রকম বদ্‌-মেজাজী, হিঁসকুটে ছেলে দুনিয়ায় নেই।" রঞ্জিৎ তখন হো হো করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল—"সুশান্ত, অশোককে ধন্যবাদ দেও, ধন্যবাদ দেও। এতগুলো সুমিষ্ট কথা কি ওর এমনি বৃথায় যাবে?" এই বলিয়া সে সুশান্তর হাত ধরিতে গেল। অশোক মাঝখানে দাঁড়াইয়া কহিল—"খবরদার, সুশান্তকে তুমি এখন ছুঁতে পারবে না। জান, আমি তোমাদের দলপতি, আমার কথা তোমাদের মেনে চল্‌তেই হবে। যে না শুন্‌তে চায় সে এখান হ'তে দূর হয়ে যাক্‌। রঞ্জিৎ, আমি তোমায় আবার বল্‌ছি, তুমি যদি ঠাণ্ডা ভাবে এখানে থাকৃতে না পার, তুমি চলে যাও এখান হ'তে; তোমার দলবল নিয়ে তুমি অন্যত্র আলাদা বাস কর গে যাও।" অশোকের অমন কঠোর কথা শুনিয়া রঞ্জিৎ আর কথা কহিল না; সে সেখান হইতে নীরবে চলিয়া গেল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; ফরাসী গুহায় একে একে সকলেই ফিরিয়াছে, ফেরে নাই কেবল রঞ্জিৎ। বিকালের ঘটনার জন্য সকলেরই মন অত্যন্ত খারাপ। এমন একটা নিরানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি যে হইবে তাহা প্রথমে কেহই ভাবে নাই। রাত্রি আটটার সময় রঞ্জিৎ গুহায় ফিরিল ও আহার সমাপ্ত করিয়া তখনকার মত নীরবে শয়ন করিতে গেল, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা গেল যে অশোকের উপর সে একটা ভীষণ প্রতিশোধ লইবে। (ক্রমশঃ)

---

# কলকাতার কুকুর

শ্রীশামুক

আমাদের গ্রামে প্রায়ই চুরি হয় কিন্তু চোর ধরা পড়ে না। গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। দারোগা বাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একটা কিছু না করলে যে আর চলছে না এ বিষয়ে সকলে একমত হয়ে পড়ে।

এই সময়ে মাণিক বোসের গায়ের শালখানি চুরি গেল। গরম শাল, দামী শাল, তুলতুলে, নরম, যেন ফুল। শীতের দিনে মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে হাত ভিতরে ঢুকিয়ে বসে থাকলে শীতের কন্‌কনে বাতাস ছুঁতেও পারে না। এমন শাল চুরি গেল।



মাণিক বোস চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রে ফেলে। শাল তার চাই। চোর ধরে তার মুখ থেঁৎলে দিয়ে জিনিষটি কেড়ে নিতে হবে—তা সে যে কোন উপায়ে হোক আর যত টাকাই খরচ হয়।

দারোগা বাবু দু'হাত সামনে পেতে বলেন,—'কি করবো আমি? এ সব চোরকে ধরা শিবের বাপেরও অসাধ্য। আমি ত' কোন্‌ ছার। তবে হ্যাঁ, খরচ দিতে পারো ত' কলকাতা পুলিশ-আফিস থেকে চোর-ধরা ডালকুত্তা আনাতে পারি। সে গন্ধ শুঁকে বার করে দেবে কে চোর, পালাতে গেলে কামড়ে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে।'

তাই তাই। মাণিক বোস খরচের ভয় করে না।

ডালকুত্তা এল। পরের দিন মাণিক বোসের উঠানে গিস্‌গিস্‌ করতে থাকে মানুষ, সমস্ত গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে। আসবে না ত' কি? অদ্ভুত চোর-ধরা এ কলকাতার কুকুর, গন্ধ শুঁকে জানিয়ে দেবে দোষী কে। ধরা পড়লে হয় স্বীকার কর চট্‌পট্‌, নইলে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে তক্ষুণি।

দারোগা বাবু কুকুর সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখে মনে হ'ল অতি সাধারণ কুকুর। গায়ে হলদে রংএর ছাপ, নাক লম্বা, শিংএর মত সোজা খাড়া কান, পিটির পিটির আধবোঁজা চোখ।

দারোগা বাবু, যে দিক্‌টায় পায়ের একটা অস্পষ্ট ছাপ ছিল কুকুরকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে, বলেন, 'চুঃ চুঃ'—তার পর পিছিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

ডালকুত্তা মাটি শুঁকলো, হাওয়া শুঁকলো, পিট পিট করে লোকদের দেখে নিল। তার পর লেজ নেড়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসে মাণিক বোসের ঝি রজনীর কাছে, তার শাড়ির ধার শুঁকতে থাকে। রজনী ভিড়ের মধ্যে লুকাতে যায়, কুকুর আঁচল কামড়ে ধরে। রজনী বেঁকে চুরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়াতে চায় সে বেঁকে চুরে ঠিক ধরে থাকে। কামড়ে ধরেছে, পালাতে দেবে না।

রজনী হুমড়ি খেয়ে দারোগা বাবুর সামনে মাটিতে পড়ে বলে,—'হ্যাঁ, আমি ধরা পড়ে গেছি। অস্বীকার করবো না। বলছি, সব বলছি। সের দুই আমের আচার নিয়েছি না বলে, আর নতুন গুড়ের পাটালি একটা চাকি। সব ঠিক। আমার শোবার ঘরের চালিতে লুকানো আছে। ধর্ম্মাবতার, যা খুশি শাস্তি দিন আমাকে।'

লোকেরা একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে উঠে,—'আর শালখানি?'—'শালের সম্বন্ধে আমি কিচ্ছু জানি না। দিব্যি করে বলছি। অন্য যা বললাম সব সত্যি। আমায় ধরে নিয়ে যান, শাস্তি দিন।'

রজনীকে এক পাশে নজরবন্দী রাখা হ'ল।

দারোগা বাবু আবার কুকুরকে পায়ের ছাপের কাছে নিয়ে গিয়ে চুঃ চুঃ ব'লে পিছিয়ে আসেন।

ডালকুত্তা মাটি শোঁকে, বাতাস শোঁকে, পিট পিট করে লোকেদের দিকে তাকায়। লেজ নাড়তে নাড়তে গুড় গুড় করে এগিয়ে আসে নায়েব মশাই এর সামনে। নায়েব মশাই মোটা মানুষ, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধড়াস্ করে মাটিতে বসে পড়েন। বলেন,—'ভগবান্, রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলছি, সব বলছি। হ্যাঁ, জমিদারের নামে খাজনা আদায় করে নিজের জন্য খরচ করে ফেলেছি।'

বিব্রতভাবে দারোগা মশাই জিজ্ঞাসা করেন,—'য়্যাঁ—শালখানি কি আপনি—'

—'না, না, সত্যি বলছি শাল আমি নিই নি, অত ছোট নজর আমার নয়।'

লোকেরা নায়েব মশাইকে তুলে ধরাধরি করে রজনীর পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ডালকুত্তা কিন্তু চুপ করে নেই। সোজা গ্রামের মহাজন বিরিঞ্চি দাসের কাছে গিয়ে কোঁচার খুঁট ধরে টানাটানি সুরু করে দেয়।

বিরিঞ্চি দাসের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। বলে,—'দোষী, আমিও দোষী। সুদের হিসাব গোলমাল করে দিয়ে বেশী টাকা আমি নিয়েছি, অনেক গরীবের টাকা খেয়েছি। আমায় যা খুশি শাস্তি দাও তোমরা।'

—'শাল?'

—'না, শালের কথা আমি জানি না।'

সমস্ত লোকে অবাক্। কি অদ্ভুত কুকুর! করে কি!

মাণিক বোসের চোখের পাতা ঘন ঘন উঠতে নামতে থাকে। পকেট থেকে ফস্ করে টাকা বের করে দারোগা বাবুকে বলে,—'এই নিন খরচের টাকা। কুকুর আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। শালের খোঁজে আর দরকার নেই, যা গেছে গেছে! মিছামিছি লোকেদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি?'

কিন্তু ডালকুত্তা মাণিক বোসের সামনে ততক্ষণ এগিয়ে এসেছে, ঘন ঘন লেজ নাড়ছে। হতভম্ব, মাণিক বোস সরে যায় পাশে। কুকুর কাছে গিয়ে ওর পায়ের জুতো শুঁকতে থাকে। মাণিক বোসের মুখ শুকিয়ে গেল, কথা জড়িয়ে যায়।

তো—তো করে বলে,—'ভগবানের কাছে কারুর রেহাই নাই। আমি শয়তান, আমিও চোর। সত্যি কথা বলছি—শালখানি যে হারিয়েছে সেটি আমার নিজের নয়। দাদা বিদেশে চাকরী করতে গেলেন, তাঁর বাক্স থেকে না জানিয়ে নিয়ে গায়ে দিয়ে চাল মারছিলাম এত দিন। স্বীকার করছি আমি, অনুতাপে আমার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।'



এধারে লোকেরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে থাকে। নিস্তার কারুর নেই যে! ডালকুত্তা ধীরেসুস্থে শোঁকবার ফুরসৎ পায় না। যাদের সামনে পায় তাদের জামা-কাপড় লাফিয়ে লাফিয়ে কামড়ে ধরে, পালাতে দেয় না। তারা সবাই নিজের নিজের অপরাধ স্বীকার ক'রে তবে ছাড়ান পায়।

ছিদাম মুদি মেনে নিতে বাধ্য হয় যে সে আজকাল দাঁড়িপাল্লার কেরামতি ক'রে সকলকে বেশ কম ওজনে জিনিষ দিয়ে লাভ করছে। আনন্দ চাষী ব'লে ফেলে যে সে বিনা দোষে একদিন তার ছোট ভাইকে খুব মেরেছে। পানু স্বীকার ক'রে বসে যে পাঠশালায় যাবার পথে সে ভট্চাষের বাগান থেকে প্রায়ই পেয়ারা নিয়ে খায়।

লোকেরা যে যেদিকে পারলো পালালো। মাণিক বোসের উঠান খালি। বাকী থাকে দারোগা বাবু ও তার অদ্ভুত কুকুর। লেজ নাড়তে নাড়তে ডালকুত্তা এগিয়ে আসে!

দারোগা বাবুর মুখের রং বদলে গেল। কুকুরের সামনে বসে পড়ে বলেন,—'ওরে বাবা! আমারও যে নিস্তার নেই! আমার যে আবার বাতের ব্যথা, দৌড়াতে পারি না। কামড়াও ভাই, কামড়ে ছিঁড়ে শেষ করে দাও দাদা আমার! বলছি সব। অন্যায়, ভয়ানক অন্যায় আমও করেছি। তোমার উপর শয়তানী করবার সাহস হ'ল আমার! তোমার খাবার জন্য রোজ একটাকা করে সরকারে বরাদ্দ। আমি গতকাল মাত্র চার আনা খরচ ক'রে খাইয়েছি—বাকী বারো আনা নিজের পকেটে ভরেছি।'

এই সময় দারোগা বাবুর চাপরাশী একখানা টেলিগ্রাম হাতে ক'রে এনে দিল। কলকাতা পুলিশ-আফিস থেকে এসেছে। তাতে লেখা,—"ভুল করে একটা বাজে রাস্তার কুকুরকে পাঠানো হয়েছে। আমাদের চোরধরা আসল কুকুরটি ক'দিন কোথায় পালিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর একটি বিলাত থেকে আনানো হবে। কিছুদিন সবুর করতে হবে।" *

---

## ছিঁটে ফোঁটা

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ—
এঁরা হচ্ছেন চারটি বামুন,
দেখছেন না কি মাথায় টিকি?
মিথ্যে কেন হাসছেন? থামুন।

---

* বিদেশী লেখার সাহায্য নিয়ে।

# লেজাঁ

শ্রীসীতা দেবী

প্যারিস্ থেকে রেলে ক'রে জেনেভা হ্রদ পেরিয়ে এগল্‌এ এসে নামলাম। এগল্ একটি ছোট্ট ষ্টেশন, এখান থেকে ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেনে লেজাঁ যেতে হয়। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে রেল লাইন্ চলে গেছে চার হাজার ফুট উঁচুতে। এইখানেই পাহাড়ের গায়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস লেজাঁ গ্রাম (বা সহর)।

জায়গাটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চারদিক্ ঘিরে রয়েছে আল্‌প্‌স্‌এর পর্ব্বতশ্রেণী। তাদের বরফে ঢাকা সুউচ্চ চূড়া সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে। একটু নীচে সার বাঁধা পাইন গাছের দল ভীড় করে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দেখা যায় রোন্ নদীর উপত্যকা,—সবুজ শাড়ীর গায়ে রূপালী পাড়ের মত রোনের ক্ষীণ জলধারাও সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করছে। তার ওদিকে আবার চলেছে পাহাড়ের পর পাহাড়।

লেজাঁর নাম তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য এমন জায়গা পৃথিবীতে অল্পই আছে। আজকালকার চিকিৎসকদের মতে সূর্য্যের আলো মানুষের জীবনীশক্তি বাড়াতে অদ্বিতীয়। সূর্য্যের আলোয় যে 'অতি-বেগুনী' বা 'আলট্রাভায়োলেট্' রশ্মি আছে আমাদের শরীরের পক্ষে তা বিশেষ উপকারী। ক্ষয়রোগে,—বিশেষ ক'রে যাদের হাড়ে যক্ষ্মা হয়েছে তাদের পক্ষে, সূর্য্যালোক-চিকিৎসা অদ্ভুত কাজ দেয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা



বলেন, যক্ষ্মারোগ তাদেরই বিশেষ ক'রে আক্রমণ করে যাদের সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ—যক্ষ্মা-জীবাণু শরীরে ঢুকলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত শক্তি যাদের নেই। কাজেই যক্ষ্মারোগের প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে শরীরকে ঐ রোগ-জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযোগী শক্তি দেওয়া—সাধারণ দুর্ব্বলতা যাতে নষ্ট হয় সেই ভাবে চলা। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চাই প্রচুর মুক্ত বাতাস আর প্রচুর সূর্য্যালোক। অবশ্যি সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যের অন্যান্য প্রাথমিক নিয়ম-কানুনও মেনে চলতে হবে—যেমন, অতি পরিশ্রম কিংবা একেবারেই ব্যায়াম না করা, পুষ্টিকর খাদ্য না খাওয়া,—এ সব ত্যাগ করতে হবে।'

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রচুর মুক্ত বাতাস আর প্রচুর সূর্য্যালোক—এই দু'টির জন্যই লেজাঁ গ্রামটিকে ডাক্তারেরা এত পছন্দ করেন। সমতলভূমির চাইতে উঁচু পাহাড়ের উপরকার সূর্য্যকিরণ অনেক বিশুদ্ধ তা' বোধ হয় তোমরা জান। অতি-বেগুনী রশ্মিও সে আলোয় পাওয়া যায় অনেক বেশী, কারণ সূর্য্য-কিরণকে সেখানে অত মেঘ-কুয়াসা প্রভৃতি পেরিয়ে আসতে হয় না। সমতলভূমির বাতাস ধূলো, ময়লা প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে নানা ভাবে দূষিত হ'তে পারে—কিন্তু পাহাড়ের উপরকার বাতাস একেবারে নির্ম্মল। আরও কতকগুলি কারণে লেজাঁ ডাক্তারদের এত মনোমত হয়েছে। চারদিক্ পাহাড়ে ঘেরা ব'লে এখানে ঝোড়ো হাওয়ার বিশেষ উৎপাত নেই; বাতাস বেশ শুক্‌নো খট্‌খটে, কুয়াসা বা অতি-বৃষ্টির ভয় নেই। সূর্য্যালোক-চিকিৎসার পক্ষে এর সবগুলিই সমান দরকারী।

জায়গাটা ছোট হ'লে কি হবে লেজাঁয় আধুনিক ইয়োরোপীয় সহরের সব কিছু সুবিধাই দেখতে পেলাম। দোকানপাট, সিনেমা, ব্যাঙ্ক, টেলিফোন, বিদ্যুৎ-সরবরাহ সবেরই ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে এখানকার অসংখ্য স্যানিটেরিয়াম্। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে রোগীরা এখানে চিকিৎসার জন্য আসে। প্রায় প্রত্যেকটি স্যানিটেরিয়াম্ই আধুনিক কায়দায় তৈরী—রোগীদের সর্ব্ববিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা তাতে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ঘরের সামনে সূর্য্যালোক সেবনের জন্য খোলা বারান্দা। কোন কোন স্যানিটেরিয়ামে লিফ্‌টের সাহায্যে রোগীকে বিছানা সমেত এ ঘর থেকে ও ঘর, এক তালা থেকে আর

এক তালায় নেবার ব্যবস্থা আছে। এই ভাবে রোগীরা পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশা, গল্পগুজব, আমোদপ্রমোদ করতে পারে। কোন কোন স্যানিটেরিয়ামে মস্ত হল্ ঘরে রোগীদের একত্র ক'রে গান-বাজনা শোনান, অভিনয় বা বায়স্কোপ দেখান প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে তাদের প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করা হয়। মনের আনন্দ স্বাস্থ্যরক্ষার একটা বড় কথা। গরীব রোগীরা কিছুটা সুস্থ হ'লে বেশী পরিশ্রম না করেও কিছু কিছু রোজগার করতে পারে। এজন্য তাদের বেতের ঝুড়ি, বাস্কেট, চামড়ার কাজ, খেলনা ইত্যাদি তৈরী করা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যালোক সেবন করতে করতেই তারা এ সব কাজ করতে পারে। ঐ সব জিনিষ ওষুধ দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিয়ে বাজারে বিক্রী করা হয়।

খোলা মাঠে প্রচুর সূর্য্যালোকের মধ্যে ছেলেদের ক্লাস্ বসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য একটি আলাদা স্যানিটেরিয়াম্ দেখলাম। শুনলাম, সুইট্জারল্যাণ্ডের সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষক এটি চালাবার জন্য নিয়মিত চাঁদা দিয়ে থাকেন। এখানে ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও চলতে থাকে। রেডিওর সাহায্যে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনার ব্যবস্থা দেখলাম। মাঝে মাঝে অধ্যাপকরা এখানে এসেও বক্তৃতা দেন। এই স্যানিটেরিয়ামে খুব ভাল একটা লাইব্রেরী আছে। সুইস্ ছাড়া অন্য দেশী ছাত্রও রয়েছে দেখলাম।

লেজাঁ থেকে কিছুটা দূরে 'সিপেতে' সান্-স্কুল্ বা সূর্য্য-বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল আছে। এখানে দুর্ব্বল ছেলেমেয়েরা নানা জায়গা থেকে সূর্য্যালোকে চিকিৎসিত হ'তে আসে। কিন্তু তাই ব'লে তাদেরও পড়াশুনা বন্ধ হয় না।



এই স্কুলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা পড়াশুনা করতে পারে। খালি গায়ে, খোলা মাঠে প্রচুর সূর্য্যালোকের মধ্যে খেলা ক'রে, শীইং ক'রে, স্কেটিং ক'রে, ব্যায়াম ক'রে এবং সেই সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে পূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে তারা দেশে ফিরে যায়। আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন তাদের ক্লাস হচ্ছিল। দেখলাম, বরফ-ঢাকা খোলা মাঠে খালি গায়ে, শুধু কোমরে ছোট্ট এক-একটু কাপড় জড়িয়ে আর সাদা সাদা টুপি মাথায় দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট চেয়ার-টেবিল পেতে তারা শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়া বুঝে নিচ্ছে। এই মধুর দৃশ্য বহুদিন ভুলতে পারি নি।

---

# রামধনুর প্রতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অস্থির আমি কপোতের মত
স্বস্তি আমার নাই,
জ্যা নির্ঘোষেই চঞ্চল আমি
জেনো রামধনু ভাই।
ত্যক্ত করিছে নিত্য আমারে নূতন পরিস্থিতি,
নরের বাসের অযোগ্য হয়ে ক্রমশঃ উঠিছে ক্ষিতি;
হিংসার এত জঘন্য ছবি
দেখিতে বেদনা পাই।

আকাশে মরণ বেঁধেছে কুলায়,
শকুনি বহর ছুটে,
চক্ষু ভরিয়া অশ্রু জমিছে,
ধৈর্য্য আমার টুটে।

রামধনু রূপ মনোরঞ্জন শোভার প্রস্রবণ
নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারে না উদ্বেগ ভরা মন,
অনুভূতি আনে কি যে আলোড়ন,
সব গান ভুলে যাই।

যদি কোন দিন নির্ম্মল হয়
উদার নীলাম্বর,
তোমার রঙের মহিমায় ফিরে
পাব কণ্ঠের স্বর।
আনন্দে সেই বকম বকম, উর্দ্ধে নোটন বাজি—
যেন আলো রঙে বুকের দেহের হর্ষ কুসুম রাজি,
সেই সুন্দর সুদিনের আহা
আমি আশাপথ চাই।

## পুস্তক-পরিচয়

**সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ**—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম—১৲

পদ্মার তীরে শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার একটি পীঠস্থান। জমীদারী দেখা-শোনার কাজে কবিকে অনেক সময় সেখানে কাটাতে হ'ত। গ্রন্থকারও ঐ পুণ্যভূমি শিলাইদহের অধিবাসী। সেই সূত্রে 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথকে দেখবার এবং জানবার অনেক সুযোগ তাঁর ঘটেছে, এবং এ বইএ তাই তিনি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। জমীদার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কৌতুককর কাহিনীও তিনি এ বইএ লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখকের ভাষা সুন্দর ও সরস, আর বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়ে বইখানি অমূল্য। তোমরা অবশ্যই বইখানি পড়ে দেখবে।

## শারদীয়া

শ্রীসতী মুখোপাধ্যায়

অদেখা শিল্পী বুলিয়ে দিয়েছে তুলি
বনানীর দেহে, দূর প্রসারিত মাঠে,
সান্ধ্য আকাশ কুঙ্কুম দিয়ে রাঙা,
উৎসব সুরু প্রকৃতির ভাঙা হাটে।

হাল্কা ফেনায় আকাশের দেহ ছেয়ে
বর্ষা দিয়েছে বহু দূর দেশে পাড়ি,
সোনালী রৌদ্র ঝরিছে হাসির মত,
সোনালী রৌদ্র—নতুন রেশমী শাড়ী।

হেনার গন্ধে ব্যাকুল মধুর হাওয়া
রাত্রিতে আনে অপরূপ শিহরণ,
তারায় তারায় ইসারা ছড়ানো যেন,
হাওয়ার দোলায় কাশফুল উন্মন।

চাঁদের মদিরা পাত্র ছাপায়ে পড়ে—
শুক্লা রজনী বিহ্বল রূপে রূপে,
রূপালী জোয়ারে মুখর আজিকে নদী,
দুই তীরে তার কানাকানি চুপে চুপে।

স্নিগ্ধ প্রভাত, উষ্ণ রঙিন দিন,
স্তব্ধ সন্ধ্যা—বলে যায় বারে বার
শরৎ এসেছে কাশফুল হয়ে হেসে
দুলিয়ে গলায় শিশির-হীরার হার।

# খোস-গল্প

শ্রীকৌটিল্য

[ বিলাতী সাময়িক পত্রে অনেক সময় বেশ মজার মজার ছোট্ট ছোট্ট গল্প দেখা যায়। তারই কতকগুলি সংগ্রহ ক'রে এখানে দেওয়া হ'ল। ]

১

মফঃস্বলের ছোট্ট ইস্কুল। সহর থেকে ইন্‌স্পেক্টার সাহেব পরিদর্শন করতে এসেছেন। ছেলেদের মধ্যে খুব তটস্থ ভাব। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে নানা রকম প্রশ্নবাণে ছাত্রদলকে জর্জ্জরিত ক'রে ইন্‌স্পেক্টার যেন একটু খুসী হয়েই বল্লেন, "আচ্ছা, এতক্ষণ তো তোমাদের নানা রকম প্রশ্ন করলাম, এবার তোমরা আমাকে ইচ্ছামত প্রশ্ন কর তো,—দেখ, আমি জবাব দিতে পারি কি না।"

খানিকক্ষণ সব চুপ্‌চাপ্। তার পর প্রশ্ন এল। একটি ছোট্ট ছেলে প্রশ্ন কর্‌ল, "আপনার ট্রেনের আর কত দেরী?"

২

আমেরিকায় আজকাল চিকিৎসকদের মধ্যে এক-একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যারামের বিশেষজ্ঞ হয়ে শুধু সেইটে নিয়ে আঁকড়ে থাকার খুব ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ফলে যে ডাক্তার পেটের ব্যারামের চিকিৎসা করেন, বুকের ব্যারামের তিনি কিছুই জানেন না; যিনি ভাঙ্গা পা যুড়তে ওস্তাদ্ তিনি হাত ভাঙ্গা দেখলে মাথা চুলকোতে থাকেন।

নিউ ইয়র্ক্ সহরে সব বাড়ীই খুব উঁচু উঁচু। কোনটা ৩০ তলা, কোনটা ৪০ তলা, কোনটা বা ৫০ তলা। একবার হয়েছে কি, একজন ভদ্রলোক ৩৭ তলার ওপর থেকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি ক'রে তাঁর মূর্চ্ছিত দেহ তুলে ডাক্তার ডাকতে পাঠাল—যে ডাক্তার হাত-পা ভাঙ্গা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সেই রকম ডাক্তার চাই। ডাক্তার এলেন; রোগীকে নেড়েচেড়ে দেখে বল্লেন, "এ তো আমি পারব না, যে ডাক্তার ছাদ-থেকে-পড়া রোগী নিয়ে কারবার করেন তাঁকে ডাকুন।" আবার লোক ছুটল, এবার সেই রকম এক ডাক্তার এলেন। ডাক্তার এসেই প্রশ্ন করলেন, "ক' তলা থেকে পড়েছে?" উত্তর এল ৩৭ তলা থেকে।" ডাক্তার



গম্ভীর মুখে ব্যাগ্ তুলে নিয়ে বল্লেন, "তবে তো আমিও পারব না। আমি ৩৬ তলার পর্য্যন্ত চিকিৎসা করে থাকি; ৩৭ তলা-থেকে-পড়া রোগীর জন্য অন্য ডাক্তার আছেন, তাঁকেই ডাকতে হবে।"

৩

বিলাতের এক প্রধান মন্ত্রীর খেয়াল হ'ল, তিনি ছদ্মবেশে নানা জায়গা ঘুরে দেখবেন। সাধারণ লোকের মত পোষাক পরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন, এবং ঘুরতে ঘুরতে একেবারে পাগলা-গারদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল ভিতরে ঢুকে একবার দেখাশুনা করেন, কিন্তু পাগলা-গারদের মধ্যে তো যাকে তাকে ঢুকতে দেবে না, তাই দ্বারোয়ানের কাছে পরিচয় দিয়ে বল্লেন, "আমি একবার ভিতরে যাব। আমি এখানকার প্রধান মন্ত্রী।" দ্বারোয়ান্ শুনে কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না; গলাটাকে যথা সম্ভব কোমল ক'রে বল্‌ল, "তাই নাকি? এস বাছাধন, এস। তোমার জন্যেই বসে আছি। আরও তিনটি প্রধান মন্ত্রী এর আগেই এসে গেছেন।"

৪

এক ভদ্রলোক নতুন ব্যবসা করছেন। বড় রাস্তার ওপর বেশ ঝক্‌ঝকে একটি ঘর নিয়ে তাঁর আপিস বসেছে। সাজান-গোছান সব হয়ে গেছে, শুধু টেলিফোনের কানেক্‌শন্‌টা এখনও পাওয়া যায় নি এই যা, যদিও টেলিফোনের যন্ত্রটি ইতিপূর্ব্বেই টেবিলে এসে গেছে।

নতুন আপিস খুলে টেবিলের সামনে ভদ্রলোক বসে আছেন, এমন সময় ব্যাগ্ হাতে স্যুট্ পরা একটি লোককে দরজায় দেখা গেল। আপিসের কর্ত্তা তাঁকে দেখেই খুব ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে টেলিফোনের যন্ত্রটা কানে তুলে নিলেন, তার পর 'হ্যালো হ্যালো' বলে এক কাল্পনিক খরিদ্দারের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা রকম আলাপ করতে লাগলেন। খানিক পরে, নবাগতকে যেন সবে দেখতে পেয়েছেন এমনি ভাব দেখিয়ে, জিজ্ঞাসা করলেন, "আসুন, আপনার কি চাই?"

নবাগত লোকটি সহাস্য মুখে বল্লেন, "আজ্ঞে, আমি টেলিফোন কোম্পানী থেকে আসছি,—আপনার টেলিফোনটায় কানেক্‌শন্ করে দেব। কিন্তু দেখছি, কানেক্‌শন্ ছাড়াও ওতে দিব্যি কথা বলা যায়!"

---

ভারতীয় শিল্পকলায় এবং বাংলা শিশু-সাহিত্যে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নেই। তাঁর দেশবাসী ব'লে আমরা গর্ব্ব অনুভব করি। এই ভাদ্র মাসে তিনি ৭০ বছরে পড়লেন। তোমরা শুনে সুখী হবে, এই উপলক্ষ্যে তাঁকে উপযুক্ত ভাবে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য শিশু-সাহিত্যসেবীদের চেষ্টায় একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হচ্ছে, এবং ডাঃ কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে এক সভায় একটি অভ্যর্থনা সমিতি ও পরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছে। স্বামী প্রেমঘনানন্দ ও শ্রীবিমলচন্দ্র বসু এই সমিতির সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

পরিচালক সমিতি এ জন্য সাহিত্যানুরাগীদের সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্য চান। তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন যে 'উৎসবে শিল্পাচার্য্যকে একটি টাকার তোড়া শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট স্কুল্ অব্ আর্ট্স্-এর যে কক্ষে অবনীন্দ্রনাথ অধ্যাপনা করতেন সেখানে দু'টি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হবে। একটিতে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলা ও অন্যটিতে তাঁর রচিত গ্রন্থের ১ম সংস্করণগুলি প্রদর্শিত হবে। শ্রীযুক্ত মুকুল দে ও শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রদর্শনীর ভার নিয়েছেন। যাঁদের কাছে অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রাবলী বা তার ছাপা অনুলিপি আছে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা তা সাদরে প্রার্থনা করেন এবং তার জন্য যথাসাধ্য দায়িত্বভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। অভ্যর্থনা সমিতির চাঁদা বড়দের জন্য ১৲ ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ।।০ ধার্য্য হয়েছে। উৎসবে শুধু সভ্য ও দাতারাই যোগ দিতে পারবেন। সভ্য হবার জন্য সম্পাদক, অবনীন্দ্র-উৎসব সমিতি, ৮৯, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় চাঁদা সহ পত্র দিতে হবে। উৎসব-অনুষ্ঠানে অভিনয়, সঙ্গীত, আবৃত্তি, কৌতুক-কথা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে ও আসন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকবে।' —রাঃ সঃ

## সন্দেশ

কলকাতায় আই-এফ্-এ শীল্ডের খেলা শেষ হয়েছে। এবারও ফাইনালে উঠেছিল দু'টি ভারতীয় দল—ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং—যারা এবার লীগে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেছে। লীগ্ বিজয়ী হওয়ার পরই শীল্ডেও ফাইনাল পর্য্যন্ত যাওয়ায় অনেকেই আশা



করেছিলেন ইষ্ট বেঙ্গল দল হয়তো এবার শীল্ড্ও দখল ক'রে চরম গৌরব অর্জ্জন করবে; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং তাদের হারিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে নিরাশ করেছে। বিজয়সূচক গোলটি পেনাল্টি থেকে হ'লেও বিজয়ী দলের খেলাই ভাল হয়েছিল। মহমেডান্ স্পোর্টিং এই নিয়ে পর পর দু'বার শীল্ড্ জয়ী হ'ল। ফলে ভারতীয় দল হিসাবে তাদের অসংখ্য রেকর্ডের সঙ্গে আর একটি রেকর্ড্ যোগ হ'ল।

* * * *

সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ্জের ছোট ভাই ডিউক্ অব্ কেণ্ট সম্প্রতি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। রাজ-পরিবারের এই শোকে সমস্ত বৃটীশ সাম্রাজ্য ব্যথিত। ডিউকের আগেকার নাম ছিল প্রিন্স জর্জ্জ্; তিনি গ্রীসের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের মৃত্যু হয়েছে। কলারসিক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল এবং ভারতের ও বিলাতের অনেক বড় বড় বিদ্বজ্জন-সভার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত ছিল।

* * * *

বিখ্যাত দেশপ্রেমিক মহাদেব দেশাইও আর ইহলোকে নেই। ইনি মহাত্মাজীর সেক্রেটারী ছিলেন, এবং নানা ভাষায়—বিশেষতঃ বাংলায় সুপণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক বাংলা বই ইনি গুজরাটীতে অনুবাদ করেছিলেন।

* * * *

রাশিয়ার যুদ্ধ তেমনি ভীষণ ভাবে চলছে। সম্প্রতি (২২শে ভাদ্র) ষ্টালিনগ্রাডের উপকণ্ঠে প্রবল লড়াই হচ্ছে এবং জার্ম্মান্রা সহর দখলের জন্য প্রচুর শক্তি নিয়োজিত করেছে। রুশরা মরণপণ ক'রে আত্মরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণ করছে।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

পাটনা, হাজারিবাগ, এলাহাবাদ, লাহোর, পুনা, পেশোয়ার, বরিশাল, গয়া, কাশী, পুরী।

### উত্তরদাতাদের নাম (ভাদ্র)

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য ও মনোরমা দেবী (ভবানীপুর); সত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর); অমিতাভ গুপ্ত (যশোহর); নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরীন্দ্র, গোপাল, গৌরী, শোভা, শম্ভুদা, বৌদি (নিমপুরা); অবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (গোচারণ); সুলেখা ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা); সুপ্রকাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মোহনলাল জালান (সুজানগর—পাবনা); জ্যোতির্ম্ময় গুপ্ত ও বাণী গুপ্তা (কলিকাতা); অজয় ও রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (মহিমাগঞ্জ); সুশীলকুমার দাশগুপ্ত (কলিকাতা); বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (বাতু); অভিমন্যু দাশগুপ্ত (কালিম্পং); অমলেন্দু মিত্র (বীরমিত্রপুর); নাদিরা খাতুন (ময়মনসিংহ); বীরেশ্বরী লাহিড়ী (পূর্ব্বধলা); লতিকা লাহিড়ী ও সত্যনারায়ণ লাহিড়ী (বগুড়া); কুমুদ, কল্যাণ, মীরা, মণি ও কুশল বাগচী (বালিগঞ্জ); অরুণকুমার ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা); অসীমকুমার বসু (শোভেনালী); শঙ্কর, শর্ম্মিলা, উর্ম্মিলা, শীলা (কানপুর); কেবু, উকো, কচা, বদু, বলাই, বিশ্বজিৎ, বাণী (কলিকাতা); শেফালী ও প্রতিমা বসু (সসারাম)';

প্রতিভা দেবী ( আসাম ); শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের খোকা ছাত্রবৃন্দ ( সালিখা, হাওড়া ); অশোক দত্ত, মিনতি দত্ত, অজয় দত্ত ( হায়দ্রাবাদ ); রত্না, স্বপ্না ও জয়ন্ত রায় ( বাঁকিপুর ); উমেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বুলু, টুলু, সুধাংশু, দেবরাণী, শিবরাম, কানন প্রভৃতি ( সিংভূম ); অনিমা, ছবি, অপু ও সীমা ( করিমগঞ্জ ); পুণ্যশ্লোক রায় ( বাঁকুড়া ); বনতোষ, কমলেন্দু, বাবাজী, শম্ভু, কানু, বুলবুল, বোকন, সত্যব্রত প্রভৃতি ( বেলতলী ); শঙ্কর, জগৎ, শান্তি, সত্য, প্রণব ( বাণীমন্দির, মুড়াগাছা ); নীলিমা, হাসি, নমিতা, আভা, জটাই, গজ গজী মুখোপাধ্যায় ( নিউ দিল্লী ); মঞ্জুশ্রী, দাদা, বাণী, ছোড় দা, বুবু ( হার্দোই ); গৌরী সেন ( করিমগঞ্জ ); রিণা রায় ( টালীগঞ্জ ); সুবীরকুমার রায় ও সুজিৎকুমার রায় ( শ্রীহট্ট ); কালিদাস পাল ( বালুভরা ); শৈলেশ, অনিল, নিখিল, নিরু, প্রভা, বিভা, মঞ্জুশ্রী ( জলপাইগুড়ি ); বিজলী ঘোষ ( চন্দ্রভাগ ); নির্ম্মলেন্দুকুমার মৈত্র ( পাটনা ); সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ); সৌমেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি, নারু, দ্বিজু, হেনা, নোনা ( গৌরীপুর ); অর্চ্চনা, টুলু, শচীন, উমা, রমা (নীলফামারী); নির্ম্মাল্য মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র, দেবনাথ (চাঁদপুর); নবেন্দু সেন ( বালীগঞ্জ ); সন্তোষ, মনোতোষ, সলিল, সমীর, জ্যোৎস্না, রুবী, শ্যামল, শৈবাল, স্নিগ্ধা (বহরমপুর); রামানন্দ সাহিত্য সদনের সভ্যবৃন্দ (রামচন্দ্রপুর); প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

## উত্তরদাতাদের নাম ( শ্রাবণ )

রত্না, স্বপ্না ও জয়ন্ত ( বাঁকীপুর ); সুশীলচন্দ্র নিয়োগী ( আদমদীঘি ); রিণা রায় (টালীগঞ্জ); বুলু, শিবু ( জামসেদপুর ); রামানন্দ সাহিত্য সদনের সভ্যবৃন্দ ( রামচন্দ্রপুর ); শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যা-মন্দিরের ছাত্রবৃন্দ ( রামচন্দ্রপুর ); প্রসিত ও প্রদ্যোত বাগছী ( বালুভরা ); কুন্তলা মজুমদার ( শিশু লাইব্রেরী, রায়পুর ); বেবো, পচা, হুনো ও শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য ( মথুরা )।

---

## নূতন ধাঁধা

শীলা, ইলা, নীলা তিন বোন। শীলার বয়স উল্‌টে দিলে তার বয়স ইলার সমান হবে। শীলার বয়সে যে যে রাশি আছে তা যোগ ক'রে তাকে ইলার বয়সে যে যে রাশি আছে তার যোগফল দিয়ে গুণ করলে নীলার বয়স পাওয়া যাবে। ইলার বয়সের রাশির যোগফলের সঙ্গে নীলার টা যোগ করলে শীলার বয়স পাবে, আর শীলার বয়সের সঙ্গে নীলার টা যোগ করলে পাবে ইলার বয়স। বল তো কার বয়স কত ?

---

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**ঃ—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে, তাই কার্ত্তিক সংখ্যা (পূজা-সংখ্যা) আগামী ২২শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। কাহারও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ১৭ই আশ্বিনের পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। রাঃ কাঃ

---

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক
৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অমর দান
হু কা কা শি র গ ল্প
'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি
গ্রন্থের নায়ক কূটবুদ্ধি জাপানী ডিটেক্‌টিভ্‌
হুকা-কাশির
বিস্ময়কর রহস্যভেদের কয়েকটি কাহিনী।
সুন্দর ছাপা, সুন্দর ছবি, সুন্দর বাঁধান রঙ্গিন মলাট
দাম মাত্র আট আনা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

বিজ্ঞান-বুড়ো
—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥৵০

আকাশের গল্প
—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৶১০

আবিষ্কারের গল্প
—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ॥০

জন্মদিনের উপহার
—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট,
চমৎকার ছবি। দাম—॥/০

ফুলের মূল্য
বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড, কলিকাতা )

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No C—1641


# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

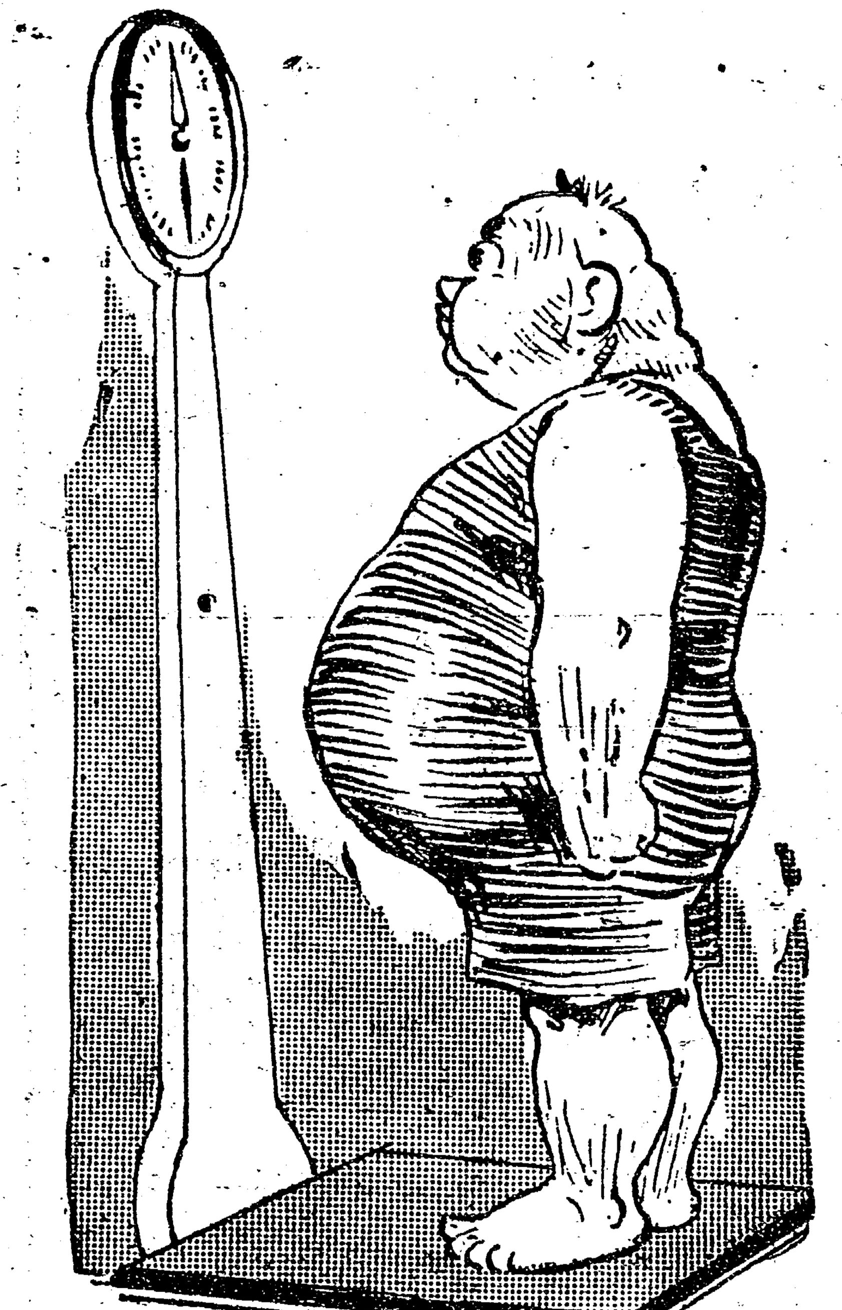

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮৽, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ফোন: কলি: ৩৬৬৽



বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯ কার্ত্তিক


# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি



মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
আবিষ্কৃত ১৯০২
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

Regd. No C—1641


# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস, আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী

ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

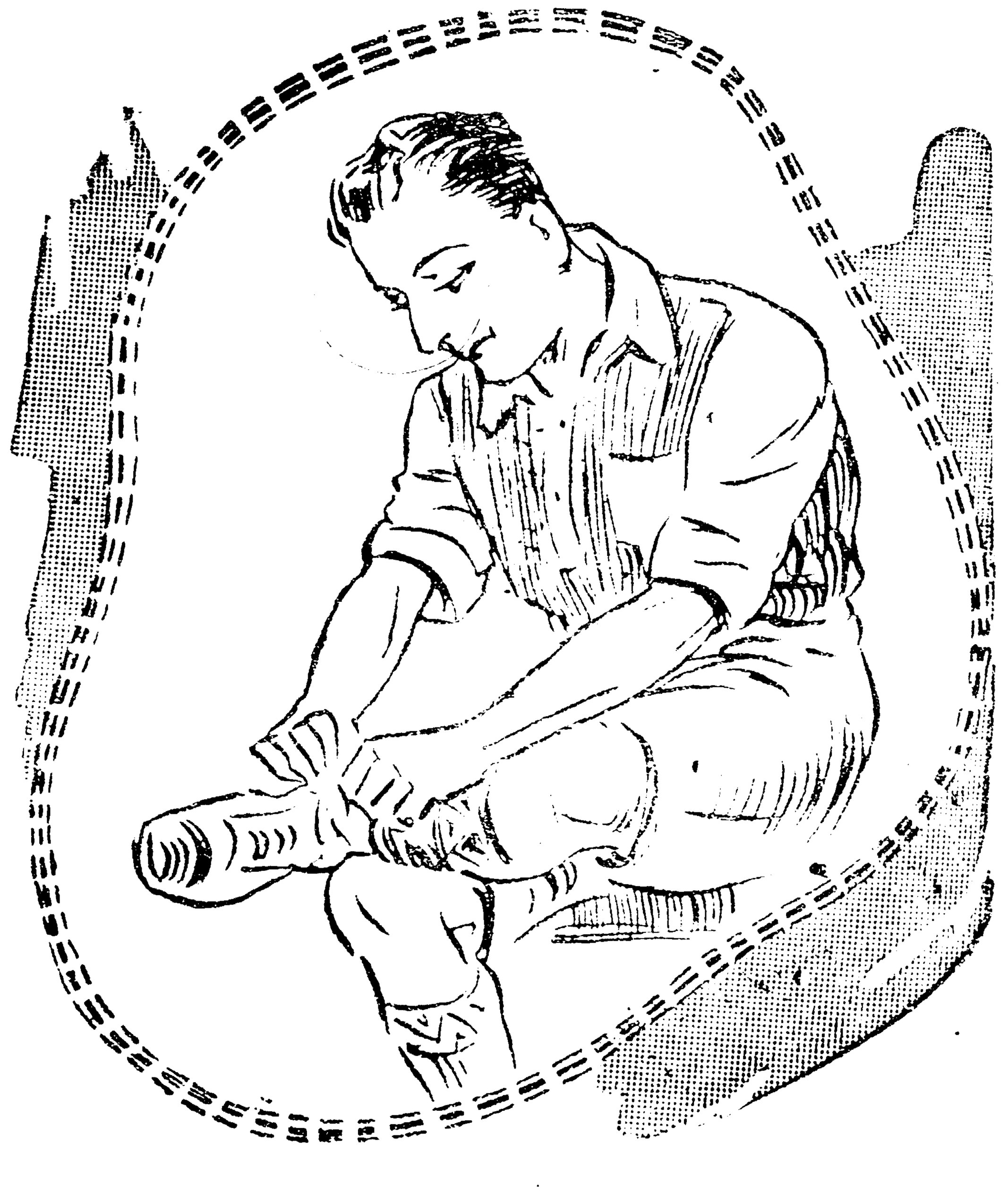

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০


১৫শ বর্ষ　　শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯　　কার্ত্তিক

# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস.সি


মাত্র ৭টী
[আবিষ্কৃত ১৯০২]

ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী


INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

# রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸৶০, ষাণ্মাসিক ১৶০; প্রতিসংখ্যা ।৹ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ্ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

## এবছরের পূজা-বার্ষিকী বাহির হইল—

অসংখ্য রং-বেরঙের ছবি, গল্প, কবিতা, ঐতিহাসিক কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, নাটক, রঙ্গরস ও ম্যাজিক ইত্যাদি ;

এ ছাড়াও

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত লেখা আছে।

ঝকঝকে প্রকাণ্ড বই—মূল্য সেই ১।০ টাকা।

### অন্যান্য বছরের পূজা-বার্ষিকী

১। ছোটদের চয়নিকা
২। ছোঃ গল্প সঞ্চয়ন
৩। ঝলমল
৪। আজব বই
৫। শিশুগল্পিকা
৬। সোনার কাঠি
৭। যাতুঘর
৮। চিত্রদীপ
৯। মায়া মুকুর
১০। সোনালী ফসল

### এ বছরের নূতন প্রকাশিত

অন্ধকূপের বন্দী—যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ৸০
উড়ো জাহাজে কয়েদী—ভূপেশ সেনগুপ্ত ৸০
ছানাবড়া—সুনির্ম্মল বসু ।৵০
ছোটদের শাহ্‌নামা—মঃ ওয়াজেদ আলী ৸০
পাল্কীবুড়ো—ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ।৵০
দ্বাদশ সূর্য্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৲
দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন ( জীবনী )—হেমেন রায় ॥০
স্বর্গে থিয়েটার—অশোক শাস্ত্রী ॥৵০
রুমমেট—বীরেন দাস ॥০
নিশির ডাক—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৸০
তুই ভাই—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৸০

### =কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=

আজ পর্য্যন্ত ১৮নং "ঘোর পাঁচ" বই বাহির হইল।

মূল্য প্রত্যেকটি আট আনা

দেব-সাহিত্য-কুটীর ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা



## পূজায় ছেলেমেয়েদের নূতন বই

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

### ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে

দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল্য ১৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **মৃত্যুদূত** ১৲ — রবীন্দ্রনাথ সেনের **আজব গল্প** ॥০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

### অ্যাটলান্টিকের তীরে ৸০

অধ্যাপক মনীন্দ্র দত্তের

### ঘরছাড়া দিকহারা

Hall Caine এর Deemstarএর সহজ ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ মূল্য ৸০

কমলা বুক ডিপো। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

এবার পূজায় **নীহাররঞ্জন গুপ্তের** নতুন ধরণের রোমাঞ্চকর রহস্য উপন্যাস

### ১। রক্তলোভী নিশাচর

বিখ্যাত দস্যু **"কালো ভ্রমরের"** নূতন অভিযান। কালোভ্রমর ১ম ও ২য় ভাগের পরবর্ত্তী ঘটনা। মূল্য—১৲টাকা।

### ২। রাত্রি যখন গভীর হয়

গভীর রাত্রে কয়লার খনির মধ্যে পর পর খুন। সুব্রতর এ্যাড্‌ভেঞ্চার। মূল্য ৸০

### ৩। কিরীটি রায়ের বাহাদুরী ১৲

কলিকাতার সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

**এবার পূজোয় এই দু-খানা বই নিশ্চয়ই কিন্‌বে !!**

তোমাদের প্রিয় লেখক

প্রবোধকুমার সান্যালের

# সত্যি বল্‌ছি !

মনে হবে বাজে কথা—কিন্তু তা নয়, গল্পগুলো সত্যিই ! বিশ্বাস না করো, কি করব কিন্তু এমনিই সব ঘটেছিল। এক নিঃশ্বাসে পড়তে হবে—হয়ত হাসবে কিন্তু তবু সব সত্যি—সত্যি বল্‌ছি !

**চমৎকার ছাপা, অগন্‌তি ছবি**

—আট আনা—

তোমরা যাঁর বই পেলে আহার নিদ্রা ভোলো

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

# দেশ-বিদেশে

নানা দেশের গল্প। একাধারে ভ্রমণ কাহিনী ও গল্প। কত মজার মজার দেশ, কত আশ্চর্য্য তার সব কাহিনী। পড়তে পড়তে মনে হবে, তোমরাও সেই সব দেশে গেছো—এসবই চোখে দেখ্‌ছ। রাণা প্রতাপের দেশ থেকে শুরু করে সেই দূর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত কত দেশ আর কত মানুষের গল্প !!

**অসংখ্য ছবি—রঙীন মলাট**

—দাম মোটে চৌদ্দ আনা—

**প্রাপ্তিস্থান—ঈষ্টার্ণ-ল-হাউস লিঃ**—৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

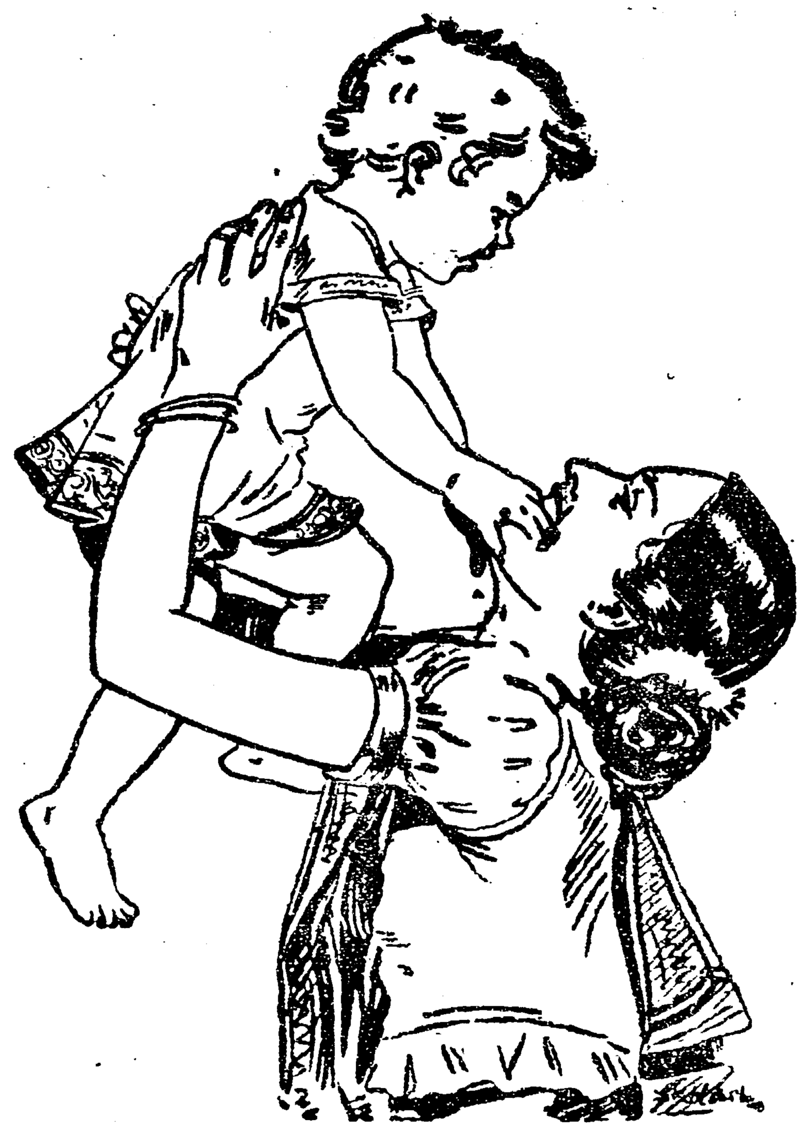

**ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।**

**পূজার উৎসবে ছোটদের নূতনতম উপহার !**

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত প্রণীত

## হে বীর কিশোর

কিশোরদের বীরত্ব গাথার মনোরম গল্প। ছবি, ছাপা নিখুঁত।

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত

## তুমি কোন্ দলে ?

ছোটদের মনস্তত্ত্ব গল্পের মত সরস ভাষায় বর্ণিত—চিত্র সাহায্যে পরিস্ফুট

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

## গল্প-সপ্তক

সাতটি সরস ও সচিত্র গল্প

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত

## শঙ্কর

প্রথম ভাগ

ছোটদের সচিত্র উপন্যাস

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

## সীমান্ত-পারে

ভারত-সীমান্তে ভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

মূল্য ১৲ টাকা

ছোটদের শ্রেষ্ঠ পূজা-বার্ষিকী—

১৭শ বর্ষ ১৩৪৯

# বার্ষিক শিশুসাথী

১৭শ বর্ষ ১৩৪৯

**শুভ ১লা আশ্বিন বাহির হইয়াছে !**

—সম্পাদক—

**শ্রীআশুতোষ ধর**

মূল্য ১৸০ আনা : মাশুল স্বতন্ত্র

৭২টি রস-রচনা ও প্রায় ১৫০ ছবিতে এবছরের বার্ষিকী সুশোভিত ! পুরু কাগজে ঝরঝরে ছাপা—৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ !!

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

## পুরানো গল্প

পুরানের ও বেতালের কয়েকটি সচিত্র গল্প।

মূল্য ॥০ আনা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত

## হাবুল চন্দোর

হাবুলের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরিবে।

মূল্য ॥৵০ আনা

আবদুর রশীদ প্রণীত

## প্রকৃতির পরাজয়

প্রকৃতিও যে মানুষের বশীভূত হয় তাহারই সচিত্র কাহিনী।

মূল্য ॥৵০ আনা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত

## সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবিকে সহজ মানুষরূপে জানিতে হইলে এ বইখানা পড়িতেই হইবে। সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত

## বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

—প্রথম ভাগ—

ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছবি, ছাপা, বাঁধাই অতুলনীয়। মূল্য ॥৵০ আনা।

**আশুতোষ লাইব্রেরী—**

৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা : : ৩৮ নং জন্‌সন্ রোড, ঢাকা।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
ছেলেমেয়েরাই সুশ্রী
তাদের সবাই ভালবাসে
তোমরাও ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো
সোপ দিয়ে নিয়মিত স্নান করবে আর হাত-পা
ধোবে। দেখবে, তোমাদেরওসবাইখু-উ-উব ভাল-
বাসবে! কারণ—মার্গো সোপ জীবাণু নষ্ট ক'রে
খোস-পাঁচড়া দূর করে, চামড়া মোলায়েম করে।
MARGO SOAP
CONTAINS ACTIVE
PRINCIPLE
MEDICINAL
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা।

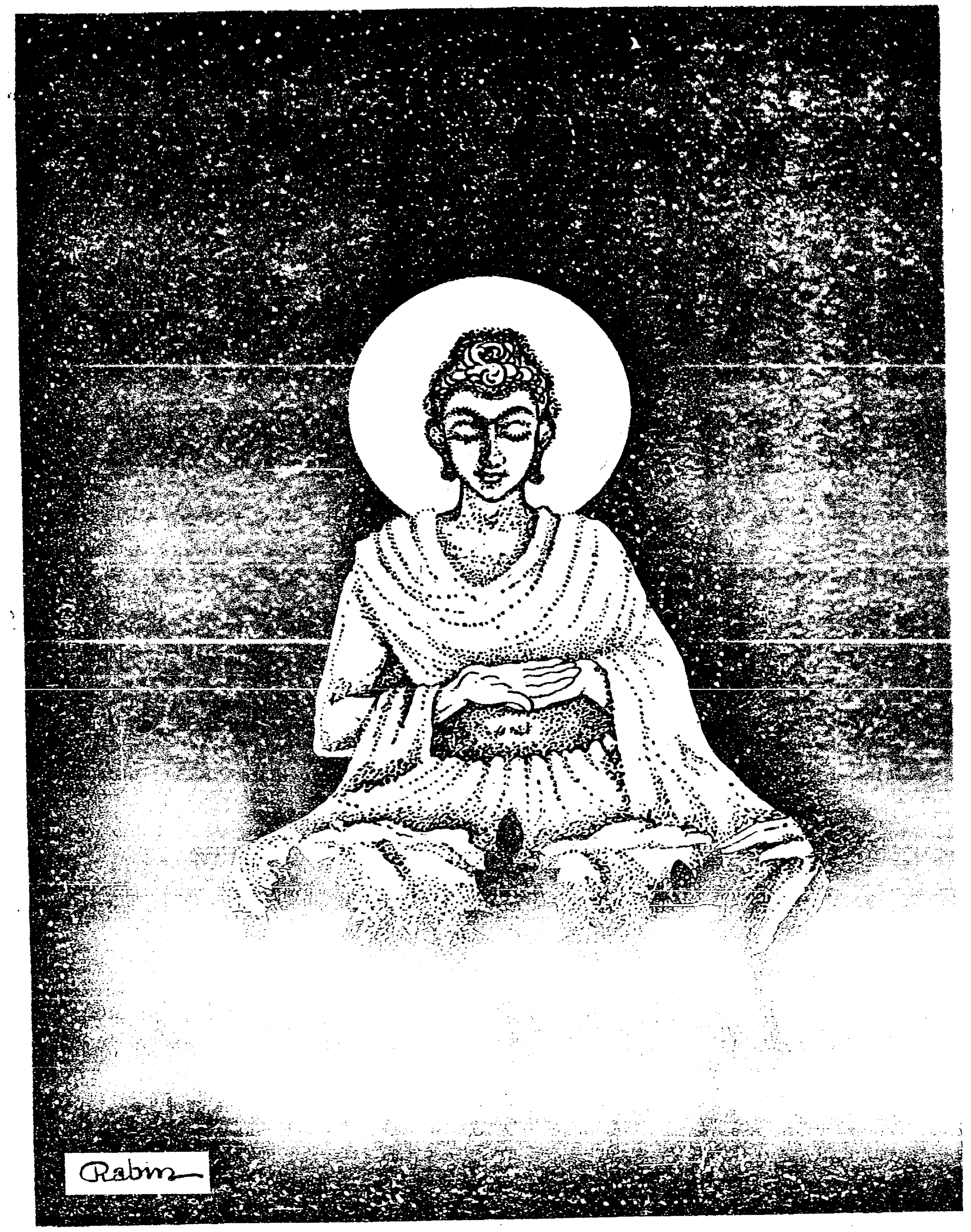


বুদ্ধের তপস্যা

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু-নিষ্যন্দ।"

—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর

## হাওড়া আমতা রেলের দুর্ঘটনা ॥৵০

## শঙ্কর আমাদের সব পারে ॥০

মামার জন্মদিন—॥০ কৃতান্তের দন্তবিকাশ—৸০
ফুটবলের দৌড়—।৵০ বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি—॥৵০

প্রবোধকুমার সান্যালের ছেলেদের উপন্যাস

## দুরাশার ডাক ১৲

সুধীর সেনের

## বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ ১॥০

—আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই—

হেমেন্দ্রকুমার রায়
ভয় দেখানো ভয়ানক—৸০
অমৃত দ্বীপ—॥৵০
জেরিনার কণ্ঠহার—১৲

বুদ্ধদেব বসু
দস্যুর দলে ভোমরা—১৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র
পৃথিবী ছাড়িয়ে—১৲

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
যক্ষপুরী—৸০
রাক্ষুসে মুলুকের
শাদা শয়তান—॥০
আশ্চর্য্য দেশের ভয়ানক রহস্য—৸০

অতিশ মজুমদার
২৭শে নভেম্বর—॥৵০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
কাউন্ট অব মন্টেক্রিষ্টো—১৲
ডিকেন্সের গল্প—॥৵০

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ
পাগলা মহেশ্বর—॥৵০
আদি মানুষ—॥০

রবীন্দ্র সেন
গল্পের বেলুন—॥০

রমেশ দাশ
চম্পা দ্বীপ—১॥০
পাতাল নগরী—১৲

হারাণ চট্টোপাধ্যায়
ল্যাঙরাই আম—।৵০

হেম বাগচী
মায়া প্রদীপ—॥০

সুধাংশু দাশগুপ্ত
মায়া দ্বীপ—॥৵০

সুমথনাথ ঘোষ
থ্রি মাস্কেটিয়ার্স—১৲
ট্রেজার আইল্যাণ্ড—॥৵০

সুধীর রায়
সোনালী পদ্ম—।৵০

জ্যোতিশ চক্রবর্ত্তী
বহুরূপীর বিপদ—॥

শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৯ | ১০ম সংখ্যা

# ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্নাতে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আমার দাওয়ায় পড়ছে এসে
ফিনিক-ফোটা জ্যোৎস্না রে,
উছ্‌লে পড়ে চাঁদের আলো,—
একটু তোরা বোস্ না রে।
দিগন্তে ঐ দূর সীমানায়
খোলা মাঠের কানায় কানায়

দুধের যেন বান ডাকে আজ
ঝল্‌মলানো রোশ্‌নায়ে,—
আয় রে তোরা দেখবি যদি
বাঁধ্‌-ভাঙা কোন্‌ জ্যোৎস্না এ!

উপ্‌ছে পড়ে রূপ যে চাঁদের,—
চাঁদ-বাদলের নীর ঝরে,
স্নান করে আজ থির-প্রকৃতি
সেই রূপালী নির্ঝরে।
আমার দাওয়ায় ছিট্‌কে আসায়
আলোর বানে সব যে ভাসায়,
সব্‌জে ঝাড়ে ছোপ লাগে আজ
চাঁদের আলোয় শুভ্র সে,—
সন্ধ্যা বেলায় এই নিরালায়
দেখছি যে তার রূপ বসে।

কোথায় যাবি? কোথায় পাবি
প্রাণ-ভরা এই শান্তি রে?
মনের আঁধার ঘুচ্‌বে সকল,
ঘুচ্‌বে সকল ভ্রান্তি রে।
চাঁদের আলোয় মনের আলোয়
মিল্‌বে আজি ভালোয় ভালোয়,
ভিতর বাহির উজল হবে,—
আয়রে আমার চত্বরে,
গাঁয়ের ডাকে মায়ের ডাকের
আভাস পাবি সত্বরে।

---

# সবই এক

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

রাসায়নিক বল্‌বেন, "আরে!—কাঠ, পাতা, বাঁশ, ঘাস, তূলো, খড়, শণ, আখের ছিব্‌ড়া, ধানের তুষ, ভুট্টার ছিব্‌ড়া, এ সবই তো এক জিনিষ;—সবই সেলুলোজ। কোনটা প্রায় খাঁটি সেলুলোজ, যেমন তূলো; আর কোনটাতে অন্যান্য জিনিষ অল্প পরিমাণে মিশানো আছে;—আসলে জিনিষ একই।"

পরীক্ষাগারে পরীক্ষা ক'রে এঁরা দেখেছেন, এই সব উদ্ভিজ্জ জিনিষেরই প্রধান উপকরণ সেলুলোজ নামে এক রকম আঁশাল পদার্থ। আজ এই সেলুলোজ মানুষের যে কত আবশ্যকীয় জিনিষ হ'য়ে পড়েছে, তা' হয়তো তোমরা ধারণাও কর্‌তে পার না। যত দিন যাচ্ছে, সেলুলোজের ব্যবহারও তত বেশী বাড়্‌ছে।

প্রথম যুগে সেলুলোজের ব্যবহার

সেলুলোজের প্রথম ব্যবহার কাঠ এবং পাতা হিসাবে। আদিম মানুষ পৃথিবীতে এসে পাথর আর গাছের ডাল দিয়ে (সেলুলোজ) আত্মরক্ষা করে। ক্রমে কাঠের অন্যান্য ব্যবহার আরম্ভ হয়; পাতার ছাউনিও তৈয়ারী হয়। কাঠ আজ আমাদের কত কাজে লাগে তা' তোমরা জানই।

তবে, এ যুগে কাঠের সেলুলোজ কত কাজে লাগছে সে কথা হয়তো তোমরা জান না। পরে সে কথা বলছি।

কাপড় হিসাবে সেলুলোজের ব্যবহার কাঠের পরই। আদিম মানুষ গাছের ছাল পরনে ব্যবহার করত। তার পর বহুকাল বাদে এল তুলো, পাট প্রভৃতি। তা' থেকে সুতা হ'ল; ক্রমে কাপড়ও বোনা হ'ল। তুলার কাপড়কে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্চকে ক'রে 'মার্সিরাইজড্' (Mercerised) কাপড় তৈয়ারী হ'ল —অনেকটা রেশমের নকল। রেশমও গুটিপোকার মুখে সেলুলোজ থেকেই জন্মগ্রহণ করে। গাছের পাতা (সেলুলোজ) খেয়ে গুটিপোকা রেশমের সূতার আকারে মুখের লালা দিয়ে সেটিকে বের করে।

এর পর এল কাগজ। প্রায় সব রকম কাগজ এবং বোর্ডের জন্মই সেলুলোজ থেকে। প্রথম কাগজ তৈয়ারী হয় চীন দেশে,—ধানের তুষ থেকে (Rice Paper)। তার পর শুকনো ঘাস, তুলো, পুরানো কাপড় প্রভৃতি থেকে কাগজ তৈয়ারী হয়। ক্রমে, খড় থেকে "পিচ্-বোর্ড" (Straw Board), শণ প্রভৃতি মজবুত জিনিষ থেকে প্যাকিং কাগজ প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। তার পর, কাঠ থেকে মণ্ড (Wood Pulp) তৈয়ারী ক'রে তা' দিয়ে কাগজ আর কার্ড-বোর্ড তৈয়ারী হয়। কাঠের মণ্ডের কাগজেব রং একটু ময়লা, আর মজবুতও কম হয়। আজকাল এর অনেক উন্নতি হ'য়ে কাঠ থেকে বেশ সাদা কাগজও হচ্ছে। সংবাদপত্রের জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হয় তা'র অধিকাংশই কাঠের মণ্ড থেকে তৈয়ারী। এ কাগজ দামে সস্তা হয়; তা' ছাড়া, ওজনে হাল্কা অথচ মোটা হয়। কাগজ মজবুত না হ'লে সংবাদপত্রের কিছু আসে যায় না। আজকাল বাঁশ, ভুট্টার ছিব্ড়া প্রভৃতি থেকেও কাগজ তৈয়ারী হচ্ছে। এ সবই কিন্তু সেলুলোজ।

রসায়নের যুগে সেলুলোজ থেকে (তুলা থেকে) বিস্ফোরক, "গান্ কটন", ফটোগ্রাফির 'কলোডিয়ন' প্রভৃতি তৈয়ারী হ'ল। সেলুলয়েড তৈয়ারী হ'ল শ্বেতসার থেকে;—তারও জন্ম সেলুলোজ থেকেই। এ সম্বন্ধে তোমরা আগেই "রামধনু"তে পড়েছ।



এবার এল সেলুলোজের এক নূতন যুগ। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা দেখ্লেন, গুটিপোকা যেমন সেলুলোজ (গাছের পাতা) খেয়ে তা' থেকে রেশম বের করে, তেমনি ক'রে যদি সেলুলোজকে কোন দ্রাবক বা আরকের সাহায্যে গলিয়ে তরল ক'রে নেওয়া যায় তা' হ'লে তা'কে ইচ্ছামত কাগজের আকারে বা অন্য কোন আকারে ঢেলে শুকিয়ে নেওয়া যায়, তা' থেকে সুতা কাটা যায়, অন্যান্য নানা জিনিষও তৈয়ারী করা যায়। অমনি তাঁরা পরীক্ষাগারে পরীক্ষায় লেগে গেলেন।

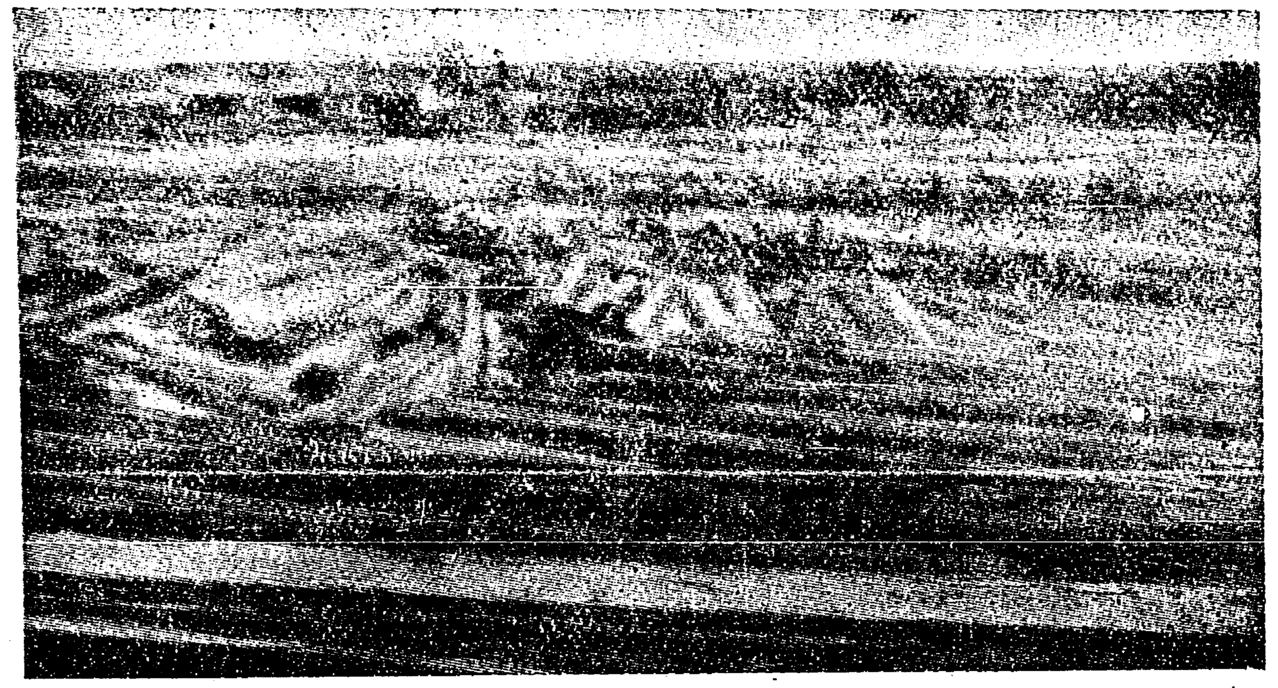
নকল রেশম তৈয়ারীর জন্য সংগৃহীত কাঠ

বহু পরীক্ষার ফলে তাঁরা সেলুলোজ থেকে এক রকম তরল জিনিষ বের করলেন, যাকে ইচ্ছামত সুতার আকারে টেনে শুকিয়ে নিলে ঠিক রেশমের মত সুতা জন্মায়। অমনি নকল রেশম তৈয়ারী আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু, পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, সে রেশম গরম জলে অল্পে অল্পে গ'লে যায়। কি বিপদ্! ধোপার বাড়ী কাপড় পাঠিয়ে হয়তো তুমি নিশ্চিন্ত আছ;—ধোপা কাপড় নিয়ে এলে দেখা গেল ঠাস-বোনা কাপড় একেবারে জালজেলে! ধোপা খুব বকুনি খেল, কিন্তু আসল ব্যাপার কেউ বুঝ্তে পারল না। পরের ধোপে হয়তো সে কাপড় একদম গ'লে গেল!

কাজেই আবার পরীক্ষা চল্তে লাগ্ল। এবার যে পদার্থ তৈয়ারী করা হ'ল সেটির আর ও সব দোষ নাই,—তা' দিয়ে যে সূতা তৈয়ারী হয় সে সূতা জলে গলে না, ইচ্ছামত সরু-মোটা করা যায়, যথেষ্ট মজবুত এবং দামেও সস্তা। একে ইচ্ছামত পাকা রংও করা যায়। তার ফল আজ আমরা দেখ্তেই পাচ্ছি। 'রেয়োঁ', 'রেডিও-সিল্ক' প্রভৃতি নকল রেশমের কাপড়

দামে কত সস্তা, অথচ কেমন সুন্দর! এখন নকল পশমও সেলুলোজ থেকে তৈয়ারী করার চেষ্টা হচ্ছে।

যে পদার্থ থেকে নকল রেশম তৈয়ারী হয় সেই জাতীয় আর একটি পদার্থের নাম য়্যাসেটিল-সেলুলোজ। একে পাতলা কাগজের মত ঢেলে এক রকম স্বচ্ছ কাগজ তৈয়ারী হয়, তার নাম 'সেলোফেন' ( Cellophane )। এ কাগজ একেবারে কাচের মত স্বচ্ছ, বেশ মজবুত, জলেও সহজে নষ্ট হয় না। এই কাগজ ইচ্ছামত রংএরও তৈয়ারী করা যায়। আজকাল শিশি, বোতল, সাবানের বাক্স, খাবার জিনিষ প্রভৃতি মুড়্‌বার জন্য এ জিনিষ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বইএর মলাটের উপরও এই জিনিষের মোড়ক দেওয়া হয়;—তোমরা অনেক বইএ দেখেও থাকৃবে।

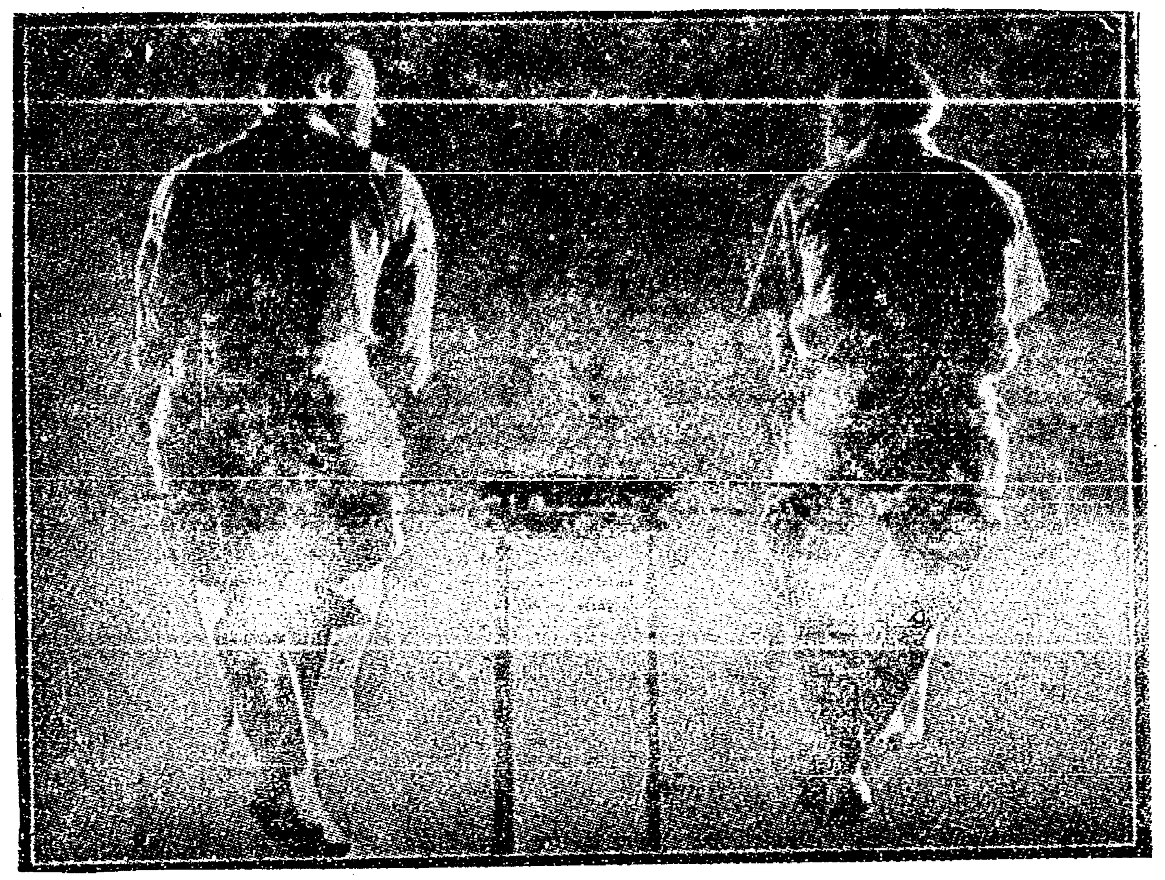

একটি বিশেষ ধরণের অভঙ্গুর কাচ—এত শক্ত যে দু'জন লোক দু'দিকে বসা সত্ত্বেও কাচ ভাঙ্গছে না।

এই সেলোফেন-জাতীয় জিনিষ থেকেই আজকাল ফটো বা সিনেমা-ফটোর অদাহ্য ফিল্‌ম্ তৈয়ারী করা হচ্ছে। এই জিনিষ অনেক জায়গায় কাচের বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে; কারণ, এ জিনিষ ভেঙে গেলে কাচের মত কোন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে না। ঘড়ির জন্য আজকাল যে অভঙ্গুর কাচ (Unbreakable glass ) ব্যবহার করা হয় তা'ও এই জাতীয় জিনিষ থেকে তৈয়ারী। এই জিনিষ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ; রং এবং অন্যান্য জিনিষ মিশিয়ে একে অস্বচ্ছ এবং যে-কোন রংএর করা যায়। তখন তা' দিয়ে নানা রকম সুন্দর এবং রং-বেরংএর কৌটা, বাক্স, অলঙ্কার, বোতলের ছিপি, আসবাব, বাসন, ছুরির বাঁট, সিগারেট্-কেস্, পাতলা তক্তা বা চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।



এই জিনিষ এখন সেলুলয়েডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একটি মস্ত সুবিধা, সেলুলয়েডের মতন এতে সহজে আগুন লাগে না।

এর ব্যবহার কিন্তু এখানেই শেষ হ'ল না। এ জিনিষকে স্পিরিট জাতীয় জিনিষে ( ইথারে ) গলিয়ে এক রকম অতি চমৎকার আঠা তৈয়ারী করা হয়, যা' দিয়ে কাচ, চীনামাটি, চামড়া, কাঠ, এমন কি পাতলা ধাতুর চাদরও যোড়া যায়। একবার যুড়ে গেলে, জল লাগ্‌লে এ আঠা খোলে না, গরমেও এর কিছু হয় না। এ আঠা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং রং-বিহীন।

এই জিনিষ 'এমিল এসিটেট' ( Amyl Acetate ) নামে এক রকম তরল জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে এক জাতের বার্নিশ তৈয়ারী করা হয়, তা'রও নানা গুণ আছে যা' অন্য বার্নিশের নাই। মোটর গাড়ী, আসবাব প্রভৃতির জন্য যে "ডিউকো" ( Duco ) প্রভৃতি রং বা বার্নিশ ব্যবহার করা হয়, তা' এই জাতীয় জিনিষই। এই বার্নিশ লাগাবা মাত্র শুকিয়ে যায়, সহজে ফাটে না, ধুয়ে বা উঠে যায় না। "স্প্রে-পেন্টিং"এর ( Spray painting—অর্থাৎ, কলের সাহায্যে রংএর ফিন্‌কি দিয়ে বার্নিশ বা রং করা ) কাজে এই রং ব্যবহার করা হয়। মোটরের কারখানার কাছ দিয়ে গেলে অনেক সময় চাঁপাকলার মত গন্ধ ( এমিল এসিটেটের গন্ধ ) পাওয়া যায়। তখনই বুঝ্‌বে "স্প্রে-পেন্টিং" হচ্ছে।

প্রকৃতির ব্যবস্থায় সেলুলোজ থেকে চিনি তৈয়ারী হয়। আখের মধ্যে রসের জন্ম এই সেলুলোজ থেকেই। শ্বেতসারও ( Starch ) জন্মায় এই সেলু-লোজ থেকেই। এ যুগের রাসায়নিক তাই নানা গবেষণা, পরীক্ষা ইত্যাদি ক'রে সেলুলোজ থেকে চিনি তৈয়ারী করার উপায় বের করেছেন। শ্বেতসার সস্তা জিনিষ, তাই কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী করার দরকারও নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আগেই নাকি জার্ম্মেনীতে কৃত্রিম চিনি ( Glucose ) তৈয়ারীর এক বিরাট কারখানা খোলা হয়েছিল। কাঠের গুঁড়ো থেকে এই চিনি তৈয়ারী করা হয়। কাঠের গুঁড়ো থেকে গরু, ঘোড়া প্রভৃতির খাদ্যও তৈয়ারী করা হচ্ছে।

এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ, সেলুলোজ আমাদের কত দরকারী জিনিষ। এক

মুহূর্ত্ত আমাদের সেলুলোজ (বা তা' থেকে তৈয়ারী জিনিষ) না হ'লে চলে না। আমরা সেলুলোজ খাই, পরি, সেলুলোজের উপর লিখি, সেলুলোজে ছাপা বই পড়ি, সেলুলোজের উপর বসি, কাজ করি। মানুষ জন্মিয়ে সেলুলোজের (কাঠের) খাটে শোয়, মর্‌বার পর সেলুলোজ (কাঠ) দিয়ে তা'কে পোড়ান হয়।

---

# বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

শ্রীআনন ঘোষাল

৩

প্লেনখানা আকাশবে বোমা বর্ষণ ক'রে কলকাতায় ফিরছিল। পণ্ডিত মশাইয়ের কথায় একটু হেসে, প্লেনটার দিকে আঙুল দেখিয়ে দেবেশ জিজ্ঞেস করল,—"শুনেছি দর্শন-সম্মত ধ্যান-ধারণার দ্বারা মাটি থেকে বড় জোর চার বা পাঁচ ইঞ্চি, মানুষ, যোগ করতে করতে উপরে উঠেছেন। কিন্তু প্লেনখানা শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যেই ৫০০ ফুটেরও উপরে উড়ছে, আশ্চর্য্য নয় কি? তার পর এই ট্রেনখানাও ত'—"

একটিপ্ নস্যি নাকে গুঁজে পণ্ডিত মশাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"রেখে দেন মশাই, ভারি আশ্চর্য্য। আরে, উড়বার জিনিষ উড়্ছে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ওড়ার জন্যই ত' ওর সৃষ্টি। ওড়াও ত' দেখি বাবা, ঐ চেয়ার বা টেবিলটা, কত বড় তোমার বিজ্ঞান দেখি! আর এদিকে দর্শনে কি না হয়, শুনুন বলি—

—"হাঁ আপনারা শুনুন। আমি তখন দানাপুরের ষ্টেশন মাষ্টার, বুঝলেন? আফিসে বসে হিসেব মেলাচ্ছি। এদিকে মেল ট্রেনও এসে পড়েছে। সকলেই খুব ব্যস্ত। হঠাৎ বাইরে এক মহা হট্টগোল সুরু হ'ল। সাড়ে সাত ফুট লম্বা একজন ভারী সাধুকে চার-পাঁচ জন য়্যাংলো চেকারে মিলে নামিয়ে আনল। এ বাবাজীবনদের মত সাড়ে তিন পো ওজনের বৈজ্ঞানিক নয়। প্রকাণ্ড এক সাধু দার্শনিক, যোগী। সাধু কি করলেন জানেন? চুপ ক'রে ইঞ্জিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্যস্, ইঞ্জিন নিশ্চল, আমরা ঘণ্টি মারি, ইঞ্জিন সিটি দেয়, কিন্তু চলে না।

"বেশ বোঝা গেল সবই সাধুর কীর্ত্তি। চেকাররা সাধুকে টেনে এনে ষ্টেশনের বাইরে বার ক'রে দিল, গাড়ীও চলতে সুরু করল।"



দেবেশ হেসে উত্তর করল—'কিন্তু এতে কি প্রমাণ হ'ল দর্শন বড় আর বিজ্ঞান ছোট? ইঞ্জিন না চলার অন্য কারণও ত' থাকতে পারে!"

বক্তা ভদ্রলোক বিরক্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"আরও আছে হে ছোকরা, সব কথা আগে শোন। এ তোমার তারে তারে ঘষে আলো জ্বালান নয়। চকমকি ঘষলেও আলো জ্বলে।

—"হাঁ, সাধু ত' প্লাটফর্ম্মের বাইরে এলেন। এসে করলেন কি জানেন? তিনি দু'হাতের দশটা আঙুল তাঁর লম্বা সাদা দাড়ির ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে টিকিট বার করতে সুরু করলেন।

"ভিড়ও জমে গেল বিস্তর। সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কোথায় যাবে?' লোকটা উত্তর দিল—'আজ্ঞে দিল্লী।' সাধু দাড়ির ভিতর থেকে একটা দিল্লীর টিকিট বার ক'রে বললেন—'লাও। আর তুমি?' একজন বলল—'পুরী।' দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে সাধুবাবা বললেন—'লাও।'

"এমনি ক'রে কাউকে দিলেন তিনি মোগল-সরাইয়ের টিকিট, কাউকে বেনারসের। টিকিট আর কেউ কেনে না। টিকিট-ঘর বন্ধ করে আমরা এজেণ্টকে তার করলাম। এজেণ্ট এল, ম্যাজিষ্ট্রেট এল; ডি, টি, এস, পুলিশ সাহেব ত' এলই। অনেক সলা-পরামর্শ হ'ল। তার পর এজেণ্ট নিজে সই করে, হাতীর দাঁতের প্লেটের উপর খোদাই করে, সাধুকে ইচ্ছামত ঘোরাফেরার জন্য চার জনের একটা পাশ লিখে দিলেন।"

আশপাশের সকলে আশ্চর্য্য হয়ে বক্তার কথাগুলো হাঁ ক'রে এক রকম গিলে গিলেই শুনছিল। ছাত্ররা তাদের সবটুকু বিদ্যা ও বুদ্ধি নিয়েও কম আশ্চর্য্য হয় নি।

বক্তা ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে সগৌরবে ছাত্রদের দিকে আড় চোখে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন—"হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম দর্শন;—খাঁটি ভারতীয় দর্শন। আরও বলি শুনুন: তখন আমি হেড্ অফিসে বদলী হয়েছি। দরকারী কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখি এক সন্ন্যাসী। জিজ্ঞেস করলাম—'আপ্ হিঁয়া! আপ্ কৌন?'

"কোন কথার উত্তর না দিয়ে সাধুবাবা টেবিল থেকে কয়েকটা দরকারী চিঠি উঠিয়ে নিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠে বললাম—'কাগজ দে দিয়ে মহারাজ, বহুৎ জরুরী কাগজ। মেরা নোকরি চলা যায়গা।'

"মহারাজ বেশ একটু হেসে নিলেন, কি মিষ্টি সে হাসি! সস্নেহে তাঁর একটা হাত আমার পিঠের উপর রেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কিস্‌কা ওআস্তে নোকরি করতা বেটা?' আশ্বস্ত হয়ে উত্তর করলাম—'রূপেয়া কো ওআস্তে মহারাজ!'

"সাধুবাবা বললেন—'রুপেয়া কো ওআস্তে ? হুঁ,' তার পর হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে, সাধুবাবা সেই দরকারী চিঠিগুলোকে তু'ভাঁজ করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে, মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—'লেও', আর সঙ্গে সঙ্গে কাগজের কুচিগুলো ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে বেজে উঠল। চমকে উঠে চেয়ে দেখি, খাস সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের আমলের টাঁকশালে তৈয়ারী গরম গরম সিকি, তুয়ানি আর আধুলি এধার ওধার গড়িয়ে পড়ছে !"

গল্পটি শেষ ক'রে বক্তা ভদ্রলোক ছাত্রদের দিকে চেয়ে বললেন—"কিহে বৈজ্ঞানিক ছোকরারা, কথা কও। এর কাছাকাছি যায় এমন একটি বৈজ্ঞানিক নজির দাও। কি হে—?"

দেবেশ অনেকক্ষণ ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিল। টেষ্ট টিউব্‌টা বেঞ্চের উপর নামিয়ে রেখে, একটু হেসে নিয়ে উত্তর করল—"শুনুন তবে :

"আমেরিকায় কেণ্ট বলে একটা জর্নাল আছে, বিষয়টা তাতেই বেরিয়েছিল। মিঃ হজ্‌পজ্‌ ব'লে একজন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটির আবিষ্কারক। যন্ত্রটার মধ্যে একটা বক্‌না বাছুর ঢুকিয়ে দিয়ে যদি হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দেন ত' দেখবেন, তার একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরীর বাঁট, নস্যির কৌটো,—অর্থাৎ শিং ও ক্ষুর থেকে যা তৈরী হয়; আর একটা মুখ থেকে বার হচ্ছে—চপ্‌, কাটলেট্‌, সুপ্‌,—অর্থাৎ মাংস দিয়ে যা তৈরী হয়; অপর মুখ থেকে বার হচ্ছে—স্যুটকেস্‌, মনি ব্যাগ, বেল্ট্‌,—অর্থাৎ যা চামড়ায় তৈরী হয়। আর শেষের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ছানা, ঘি, মাখন, সন্দেশ, দই ইত্যাদি, —অর্থাৎ তুধ থেকে যা তৈরী হয়।

"আর শেষে হয় কি জানেন ? শেষে নীচের দিক্ থেকে একটা দরজা ঠেলে একটা আস্ত বাছুর বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ নো লস্‌ অব্‌ এনার্জ্জি—শক্তির ক্ষয় নেই, বুঝলেন ? এই সদ্যপ্রসূত বাছুরটাকে ঘাস পানি খাইয়ে, আবার যন্ত্রটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন, সেই একই ফল পাবেন। বলুন ত' এইবার এই বিজ্ঞান বনাম দর্শনের যুদ্ধে কে জিতল ? এ যন্ত্রটা একজন মেকানিক্যাল্‌ প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ আবিষ্কার করেছেন—মিঃ হজ্‌পজ্‌ তাঁর নাম।"

ছাত্র কয়জন ছাড়া আশপাশের শ্রোতাদের মধ্যে অবিশ্বাসী কেউ ছিল না। তাদের বিশ্বাসী মন গল্পটা বিশ্বাস করতেই চাইল। কিন্তু দার্শনিক বক্তাটি হঠাৎ ক্ষেপে উঠে ঘুঁষি পাকিয়ে এগিয়ে এলেন। তার পরে দেবেশকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—"বাঘ মারার জায়গা পাওনি ? অর্ব্বাচীন মূর্খ ! ভট্টপল্লীর মধ্যে প্রাপ্ত হ'লে গাত্র হ'তে তোমার চর্ম্ম স্খলিত করে নিতাম, জান ?"

দেবেশ তাড়াতাড়ি একটা জন্তুর হাড়-কাটা বড় কাঁচি বার করে উত্তর করল—"এগুবেন না পণ্ডিত মশাই ! এতে নাসিকা ও শিখা উভয়েরই বিপদ্‌ আছে।"



হঠাৎ দেবেশকে ঐরূপ সাংঘাতিক অস্ত্র হাতে হুঙ্কার দিতে দেখে তিনি 'বাপরে !' ব'লে পিছিয়ে এসে দেহটাকে বেঞ্চির অপর পারে গড়িয়ে দিয়ে বললেন—"স্বদেশী ডাকাত ! ওঃ !"

পাশেই একজন তিলক-পরা ভদ্রলোক এতক্ষণ নাম জপছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীর শিকলটা টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"দিলে ভট্‌চায্যির ভূঁড়ীটা ফাঁসিয়ে রে ! ওরে বাপ, পুলিশ, পুলিশ !"

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও থেমে গেল। দেখতে দেখতে সেখানে গার্ড্‌ এলেন, প্রফেসার এলেন, আরও অনেকে এলেন। শেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর গার্ড্‌ সাহেব ভট্টাচার্য্য মশাইদেরই নামগুলো টুকে নিয়ে নেমে গেলেন।

গাড়ী আবার চলতে সুরু করল।

(ক্রমশঃ)

---

## অশথ চারার মিনতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষমা কর, আর টবে রাখিয়ো না মোরে,
এত পরাধীন, এতখানি খাটো ক'রে।
আমি পেতে চাই স্তন্য ধরিত্রীর,
সূর্য্যের আলো লুফে লব পাতি শির,
পত্রপুটেতে সুধাধারা লব ধ'রে।

আকাঙ্ক্ষা—করি' শাখা-বাহু বিস্তার
ছায়ামণ্ডপ গড়ি আমি বসুধার।
    রচিবে কুলায় দূর হ'তে এসে পাখী,
    মুখরিত হবে কলরবে শাখাশাখী,
লব পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি হ'রে।

লোকে বলে আমি তরুরূপ নারায়ণ,
কঠিন গণ্ডী মন করে উচাটন।
    স্বাধীনতা মোর জন্মের অধিকার,
    পত্র আমার বিজয়-পতাকা তার,
আমারে বেঁধ না দগ্ধ মাটির ডোরে।

জীবন আমার কাতর ব্যাকুল চায়
চিরবাঞ্ছিত সে পরিপূর্ণতায়।
    দিক্-বধূদের সোহাগের টিপ লয়ে
    কিশলয় দল উঠেছে রঙিন হয়ে,
রেখ না রুধিয়া, রাঙা রবি ডাকে জোরে।

---

# বিদ্যার্থী হাবুল

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ

কত দূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে হাবুল বলিত,—'আপ টু প্রি-ম্যাট্রিক্ ক্লাশ'—অর্থাৎ ম্যাট্রিক্ ক্লাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। কথাটির অর্থ যাহাই হউক; হাবুল কিন্তু মনে করিত ক্লাশ ওয়ান্ হইতে নাইন্ পর্য্যন্ত সবই প্রি-ম্যাট্রিক্।—এই হিসাবে সে যে নিজেকে 'আণ্ডার-গ্রাজুয়েট' বলিয়া পরিচয় দেয় না ইহাই যথেষ্ট!



সারাটি বছর হাবুল মাছ ধরিয়া, গান করিয়া এবং এ-ও পাঁচজনের ফাই-ফরমাস খাটিয়া কাটাইয়া দেয়। পরীক্ষার কথা বলিলে উত্তর দেয়,—'ঠিক মেরে দেব।'

পরীক্ষার শেষ কাণ্ডে 'মারিয়া দিবার' যত রকম কসরৎ আছে, হাবুল তাহা প্রয়োগ করিতে ক্রুটি করে না; কিন্তু শেষ-রক্ষা করাই তাহার পক্ষে চিরদিনই দুঃসাধ্য!

প্রশ্নপত্রে ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ করিতে দিয়াছে—"সক্রেটিস্ ওয়াজ্ এ গ্রেট্ ফিলজফার। হিজ্ পিউপিল্—" ইত্যাদি।

হাবুল থুথু ফেলিবার ভাণ করিয়া জানালার ধারে গিয়া একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এই, এটা কি রে?'

সে বলিল,—'সক্রেটিস্।'

'উচ্চারণ দিয়ে আমার কাজ কি?—মানে কি তাই বল্।'

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল, 'চেতল মাছ।'

'আর এটা?'

'ফিলজফার।'

'আরে দূর্', হাবুল বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মানেটা বল্।'

সে বলিল,—'বোকা'।'

ব্যস্। হাবুলের আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। সে লিখিয়া গেল,—চিতল মাছ মস্ত বড় বোকা। ইহার চোখের মণি খুব ছোট। চিতল মাছ লেজ দিয়া জলের উপর শব্দ করিয়া থাকে ইত্যাদি।

হাবুলের বাংলার খাতা আমরা দেখিয়াছি। পরীক্ষায় "পৌরজনের কর্ত্তব্য" রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল। হাবুল তিন পৃষ্ঠাব্যাপী—মানুষ প্রৌঢ় হইয়া গেলে তাহার যে বনবাসই শ্রেয় এবং ইলিশ মাছ ও খেজুর রস প্রভৃতি খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে তার যে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য এই কথাই লিখিয়াছে!

অঙ্ক জিনিষটা হাবুলের মাথায় কেমন ঢুকিতে চায় না। দশ বৎসর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের পাঁচগুণ হইবে এবং কুড়ি বৎসর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিন গুণ হইবে; আবার চল্লিশ বৎসর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হইবে—এখন পিতা-পুত্রের বয়স কত?

হাবুল মাথায় হাত দিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতে বসে,—'এও আবার হয় নাকি! পিতার বয়স, ছিল পাঁচগুণ, তার পর হ'ল তিণগুণ—শেষে দ্বিগুণে এসে দাঁড়াল! তা' হ'লে ত' আরও কয়েক বৎসর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের সমানও হ'য়ে যেতে পারে!

তার পর আরও কয়েক কুড়ি বৎসর পরে পুত্রের বয়স ত' পিতাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে! —তাই আবার হয় নাকি কখনও!'

হাবুল উত্তর লিখিল,—'অঙ্ক ভুল। এরূপ হয় না—হইতে পারে না, অসম্ভব।'

ইংরাজী ভাষাটা হাবুলের নিকট অঙ্কের চাইতেও বেশী গোলমেলে বলিয়া মনে হয়। কে এমন বিদ্‌ঘুটে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে?

'আই' (I) টা একবচন, অথচ 'আই হ্যাজ্‌' না হইয়া 'আই হ্যাভ্‌' কেন হইবে হাবুল বুঝিতে পারে না। আমার আছে—ইহার ইংরাজী—'মাই হ্যাজ্‌'ই বা কেন হইবে না? ইস্কুলের পূর্ব্বে 'গো টু স্কুল' হয় কিন্তু বাড়ীর বেলায় 'গো টু হোম' হইবে না! এর কোন মানে হয়? ইংরাজীর উচ্চারণগুলিও কি অদ্ভুত! এ টি ই (Ate) এট্, কিন্তু এ এক্স ই (Axe) য়্যাক্‌স্ না বলিয়া একস্ বলিলে ক্লাশশুদ্ধ সকলে হাসিয়া উঠে!

হাবুল ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্কুল ছাড়িয়া দিল; কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িল না। সে এক পণ্ডিতের টোলে গিয়া ভর্ত্তি হইল।

তার পর তিন-চার বছর হাবুলের আর কোনও সংবাদ জানি না। শুনিতে পাই, হাবুল খুব বড় পণ্ডিত হইয়া আসিতেছে। ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী, প্রাতঃস্নান—এই সব হাবুল অভ্যাস করিতেছে।

ওপারে মথুরাপুরে নূতন হাট বসিয়াছে। হাট দেখিয়া ফিরিতেছি। ফিরিতেছি বলিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে না—ছুটিতেছি। আষাঢ় মাস। পিছন হইতে শোঁ শোঁ করিয়া বৃষ্টি আসিতেছে—ছাতিতে সে বৃষ্টি মানিবে না মনে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে আশ্রয়ের আশায় ছুটিতেছি। বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। আর একটু ছুটিয়া যাইতে পারিলেই গাঁয়ের পাঠশালা-ঘর।

সম্মুখে দেখিতেছি, একটি লোক ঠায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে!—একি, এ যে আমাদেরই হাবুল! বলিলাম, 'চ',—এইটুকু দৌড়ে গেলেই পাঠশালা-ঘর।'

হাবুল নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।—'আপনি যান ছোটকাকা, বৃষ্টি থামলে আমি যাব।'

'তার মানে?—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবি এখানে?'

হাবুল গম্ভীর হইয়া বলিল,—'ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।'

'সে কি রে বাবা!'

'বৃষ্টির সময় দৌড়ে যাওয়া মনুতে নিষেধ আছে।'

অগত্যা আমাকেই একটু ভিজিতে হইল। হাবুলকে ছাতির মধ্যে আনিয়া দুইজনে



আস্তে আস্তে চলিলাম। হাবুল কিন্তু হঠাৎ ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি আমার বাঁ দিকে গিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, 'কি হ'ল?'

হাবুল পণ্ডিতের মত উত্তর করিল, 'শাস্ত্রে বলে—ঘৃত, বিপ্র এবং চৌমাথা পথকে সব সময়ে ডান দিকে রেখে চ'লবে।'

হাবুলের চটি জুতাটি কাদা ছিটাইয়া ভূত সাজাইয়া দিতেছিল। বলিলাম,—'চটি খুলে হাতে ক'রে নে'—'

হাবুল অমনি শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিল,—'জুতা কখনও হাতে ক'রে নেবে না।'

বৃষ্টি থামিয়া গেল; কিন্তু গরম গেল না। দুই জনেরই খুব জল পিপাসা পাইল। অনেকখানি পথ আসিবার পর রাস্তায় একটি টিউব ওয়েল পাওয়া গেল।

হাবুলকে হাতলটি দেখাইয়া বলিলাম,—'ঠ্যালো দেখি পণ্ডিত মশাই!'

আমি অঞ্জলি পূরিয়া জল খাইলাম কিন্তু হাবুলের জল খাওয়া হইল না; সে বলিল, 'মনু বলেছেন—"ন কার্য্যঞ্জলিনা পিবেৎ", অর্থাৎ হাত দিয়ে অঞ্জলি পূরে কখনও জল খাবে না।'

মনে মনে বলিলাম,—'তবে শুকোও।'

ছোট নদীটির ধারে যখন আসিলাম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একখানি নৌকাও দেখা যাইতেছে না,—কি করিয়া পার হইব ভাবিতেছি।

একটি তাল গাছের ডোঙ্গা পাওয়া গেল; কিন্তু হাবুলকে লইয়া তাল গাছের ডোঙ্গায় উঠিতে সাহসও হয় না।

হইলও তাই!

মাঝ দরিয়ায় আসিয়া ডোঙ্গা ডুবিল।

আমি সে জন্য প্রস্তুতই ছিলাম।

হাবুল দুই-চার ঢোক জল খাইয়া বলিল, 'ছোটকাকা, এখন?'

বলিলাম,—'সাঁতরাও।'

হাবুল তখনও মনু আওড়াইতেছে!—'"ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ", অর্থাৎ হাত দিয়ে কখনও নদী সাঁতরিয়ে পার হবে না।'

বড় রাগ হইল। বলিলাম, 'পণ্ডিত, মনুর অর্থ যদি এই ক'রে থাক তবে মর।'

কিন্তু প্রাণের চাইতে মনু বড় নয়।

সেই হইতে হাবুল মনুর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে।

---

# প্রায় ভূতের গল্প

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

**ভোম্বল** ঘরে ঢুকতেই ডলি, লিলি, বাবলু, নবা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—ভোম্বল-দা, আজ একটা গল্প বল-তেই হবে।

আমি হাত তুলে বললুম—আহা, ওকে একটু জিরোতে দে। এইমাত্র সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ; দেখছিস না, এখনো হাঁপাচ্ছে ?

ওরা বললে—ক্যাবলা-মামা, তুমি চুপ করো, আজ আমরা গল্প না শুনে ছাড়বো-ই না।

যাই বলো, এই ছেলেমেয়েগুলো ভোম্বলকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে। ওর গল্পগুলি আমার তো মোটে স্থবিধের লাগে না, অথচ ওরা হাঁ ক'রে চোখ পাকিয়ে প্রত্যেকটি কথা গোগ্রাসে গিলবে! এদিকে আমি ওদের সাক্ষাৎ পিসতুতো মামা, তা'র উপর আস্ত একটা ইংরেজির এম. এ., দেশ-বিদেশের কত বই থেকে কত ভালো-ভালো গল্প ওদের শোনাতে যাই—মিনিটখানেক পরেই কারো জলতেষ্টা পায়, কেউ বা হঠাৎ তিড়িং-তিড়িং ক'রে খামকা লাফাতে থাকে, কারো বা চোখ ঘুমে ঢুলে আসে। দিদি কথাটা শুনলে খুশি হবেন না, কিন্তু এ-কথা না ব'লেও পারি নে যে ছেলেমেয়েদের তিনি মোটে স্থশিক্ষা দিতে পারেন নি।

ভোম্বল একটা ইজি-চেয়ারে ব'সে রুমালে মুখ মুছে বললে—কিসের গল্প শুনতে চাও ?

নবা তৎক্ষণাৎ বললে—ভূতের।

লিলি ছু'হাত তুলে বললে—ওরে ব্বাবা—ভূতের গল্প শুনে কাজ নেই, রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ভয়ে ঢোল হ'য়ে থাকবো।

—তুই শুনতে না চাস তুই এখান থেকে পালা, বললে বাবলু। এই মেয়েগুলো এমন ভীরু যে তাদের সঙ্গে মিশতেই লজ্জা করে।

বাবলু এ-বছর প্রোমোশন পেয়ে আটের কেলাশে উঠলো, মেয়েদের প্রতি এখন তার অসীম অবজ্ঞা।

লিলি ফোঁস ক'রে উঠে বললে,—ছু'চক্ষে দেখতে পারি নে এই ছেলেগুলোকে। আস্ত হনুমান।

বাবলু লম্ফ দিয়ে বললে—কী বললি ?

বেগতিক দেখে ভোম্বল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—এই, চুপ করো, চুপ করো সব! গল্প বলছি।



চক্ষের পলকে ওরা ভোম্বলের ইজি-চেয়ার ঘিরে ফেললো। কেউ মেঝেতে, কেউ চেয়ারের হাতলে, কেউ বা ভোম্বল-দার পাশেই বসবার জায়গা ক'রে নিলে। ভোম্বল বললে—তা হ'লে ভূতের গল্পই শুনবে ?

বাবলু বললে, নিশ্চয়ই!

—ভয়-টয় পাবে না তো ?

ডলি বললে, বাঃ! ভয় তো পাবোই, তা না হ'লে মজা কিসের ?

—তা হ'লে শোনো। একবার হয়েছিলো কী—

বাবলু বাধা দিয়ে বললে—ভোম্বল-দা, তুমি ভূত দেখেছো ?

—ভূত কি সত্যি-সত্যি আছে যে দেখবো ?

—ভূত যদি না থাকে তা হ'লে ভূতের গল্প কেমন ক'রে হয় ?

—শক্ত প্রশ্ন। তবে সেবারে প্রা—য় ভূত দেখেছিলুম, বলতে পারো।

—প্রায়-ভূত-দেখা আবার কী রকম ?

—ওরে বাবা, প্রায়-ভূতেই আমার যা অবস্থা হয়েছিলো, পূরো-ভূত হ'লে একেবারে চচ্চড়ি হ'য়ে যেতুম।

নবা বললে—ও মা! ভোম্বল-দা কী বোকা! মানুষ আবার চচ্চড়ি হয় কেমন ক'রে ? চচ্চড়ি তো খায়—আর মানুষ তো মানুষ।

লিলি ধমক দিয়ে বললে—তুই চুপ কর্।

নবা বয়সে সব চেয়ে ছোট, তাই তাকে কেউ আমলে আনে না।

ভোম্বল বলতে লাগলো—উঃ, সে-কথা মনে করতে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাগবাজারে আমাদের পুরোনো বাড়িতে আমি তো আর কখনো রাত কাটাচ্ছি না।

—কী হয়েছিলো ?

—প্রথমে বিশ্বাস করি নি, কিন্তু আমাদের জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে অনেককেই বলতে শুনেছি যে ও-বাড়িতে কিছু-একটা গোলমাল আছে। অনেক সব জোয়ান-জোয়ান ছেলে এক রাত্তির কাটিয়ে পরের দিনই চম্পট দিয়েছে, আর ছু'রাত্তির যারা কোনো রকমে টিঁকে গেছে, তারা হ'লো একেবারে ডানপিটে ষণ্ডামার্কর দল। কিন্তু তাদেরও তিন রাত্তির কাটাতে হয় নি।

বাবলু ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করলে—কী হ'তো ?

—তা ঠিক জানি না, কিন্তু ছু'রাতের পরে টিঁকতে যে কেউ পারে নি সেটা জানি। আমাদের বাড়িটা এমনিতেই পোড়ো গোছের হ'য়ে আছে—বারো মাস কেউ তো বড় থাকে না; একতলায় কিছুটা ভাড়া, আর বাকি ঘরগুলিতে একজন গোমস্তা থাকে পুরোনো

ছ'জন চাকর নিয়ে। দোতলা তেতলার ঘরগুলি হাঁ হ'য়ে প'ড়ে আছে—কখনো কেউ গিয়ে যদি বা উঠতো এ-সব নানা কথা কানাকানি হ'বার পর থেকে তাও বন্ধ হ'লো। এর মধ্যে শুধু আমিই একবার সাহস দেখাতে গিয়ে কী মুশকিলেই পড়েছিলুম! ওদের কথা বিশ্বাস করলেই ভালো করতুম দেখছি।

ছেলেমেয়েরা ন'ড়ে-চ'ড়ে ভোম্বলকে ঘিরে আরো ঘন হ'য়ে বসলো, কেউ কিচ্ছু বললে না।

ভোম্বল বলতে লাগলো—সেবার কাশ্মীর থেকে ফিরে কলকাতায় এসে নিজেদের পুরোনো বাড়িতেই উঠলুম। আমার বাঁধা ঘরটি তেতলার এক কোণে, আর চাকররা থাকে এক-তলায়;—সমস্ত দোতলায়, তেতলায় আর-একটি মনিষ্যি নেই—চেঁচিয়ে ম'রে গেলেও কেউ টের পাবে না। যাই হোক, প্রথম রাত্রে কোনো ভয়ের কথা আমার মনেই হ'লো না; খেয়ে-দেয়ে আলো নিবিয়ে গায়ে লেপটি টেনে শুয়ে পড়লুম। ভারি আরাম বোধ হ'লো, প্রায় ঘুমিয়েও পড়েছি, এমন সময় হঠাৎ ঠাস ক'রে একটা শব্দ হ'লো। চমকে জেগে উঠলুম। সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা শব্দ হ'লো। মনে হ'লো আমার মাথার উপর এক পাল দস্যি ছেলেমেয়ে চেয়ার-টেবিল নিয়ে পাগলের মত টানাটানি করছে। কিন্তু আমার মাথার উপরে ছাদ, সেখানে চেয়ার-টেবিল থাকবার কথা নয়, আর ছেলেপুলেই বা আসবে কোত্থেকে? ও কিছু নয়, বেড়াল-টেড়ালের কাণ্ড, এই মনে ক'রে পাশ ফিরে আবার চোখ বুজেছি এমন সময় আবার শব্দ। এবার মনে হ'লো আমার পাশের ঘরে, যেখানে আগের বছর এই সময়ে ন'কাকা মারা গিয়েছিলেন সেখান থেকে, শব্দটা আসছে। এর পর দু'তিন মিনিট পর পর ক্রমাগতই শব্দ হ'তে লাগলো—কখনো মাথার উপর, কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। এই শব্দটা কেন হচ্ছে এবং কোত্থেকে হচ্ছে ভেবে-ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। সত্যি বলছি তোমাদের, রীতিমত ভয় পেয়ে গেলুম, কিন্তু গল্পে পড়েছি এ-রকম অবস্থায় ভয় পেলেই লোকের সর্ব্বনাশ হয়, তাই ঘরের আলো জ্বেলে বিছানার উপর শক্ত হ'য়ে ব'সে-ব'সে সমস্তটি রাত জেগে কাটিয়ে দিলুম—যতক্ষণ না ভোরের আলো ফুটলো ততক্ষণ কিছুতেই শুলুম না।

পরের দিন সকালবেলা কিন্তু ব্যাপারটা মনে-মনে ভেবে ভারি হাসি পেলো। শব্দ হবার কত রকম কারণই তো হ'তে পারে,—রাস্তার শব্দ, হাওয়ার শব্দ, গাছের শব্দ, গাড়ির শব্দ, মোটর মেরামতের শব্দ—কলকাতার শহরে শব্দের কি শেষ আছে? চাকরদের কাউকে কিছু বললুম না, এবং সেদিন রাত্রেও ঐ ঘরেই ঐ বিছানাতেই শুলুম—তবে একটা টর্চ আর একটা লাঠি সঙ্গে রাখতে ভুললুম না।

ভোম্বল হঠাৎ চুপ ক'রে গিয়ে ফ্যাসফেসে গলায় বললে—আরো শুনবে?



কেউ কিছু বললে না, শুধু বাবলুর একবার চোখের পলক পড়লো, আর লিলি একবার জোরে নিঃশ্বাস নিলে।

ভোম্বল ফিসফিস ক'রে বলতে লাগলো: সেই রাত্রেও আবার সেই শব্দ। কখনো মনে হয় ঠিক মাথার উপর, কখনো মনে হয় বুঝি ঘরের মধ্যেই। ঠাস্-ঠাস-দ্রাম্-ধাম্—ধাম্-ধ্রাস্—ঠাস্!—চারদিক্ থেকে কত রকম বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ যে হ'তে লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে দেয়ালে ঝোলানো আমার ন'কাকার ছবিটা—

—উ-উ-উ-উ—হ্, ব'লে লিলি দু'হাতে ভোম্বলের হাঁটু জড়িয়ে ধরলো। ভোম্বল সেটা লক্ষ্যই করলে না, একই ভাবে ব'লে যেতে লাগলো—ন'কাকার ছবিটা হাওয়ায় দুলে-দুলে প্রায় মেঝেতে ছিটকে পড়ে আর কি—ঠিক মনে হ'তে লাগলো ছবিটা হঠাৎ প্রাণ পেয়ে লাফাচ্ছে, ন'কাকা ছবির কাচ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। তোমাদের বলবো কী—ভয়ে আমি প্রায় পাগল হ'য়ে গেলুম। শব্দটা কোনো চেনা শব্দের মতই নয়—কখনো মনে হয় কেউ যেন কাউকে মেরে শেষ ক'রে দিচ্ছে, কখনো মনে হয় কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে প'ড়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা প্রত্যেক সিঁড়িতে ঠাস ঠাস্ ক'রে ঠুকে যাচ্ছে। আমি আর টিঁকতে পারলুম না, টর্চ্ আর লাঠি নিয়ে বেরোলাম ঘর থেকে—ভয় পেলে মানুষ কী না পারে! শব্দটা কোত্থেকে আসছে তা আমার জানাই চাই। বিশ্বাস করো তোমরা, দোতলা তেতলার প্রত্যেকটি ঘর ভালো ক'রে তল্লাস করলুম, কোনো ঘর থেকে পেত্নীর মতো কালো একটা বেড়াল লাফ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, কোনো ঘরে ইঁদুরের হুটোপুটি আমি ঢোকবা মাত্র বন্ধ হ'য়ে গেলো, কোনো ঘরে শুধুই বা ধুলোর আর চামচিকের গন্ধ। এদিকে শব্দটা সমানেই হ'য়ে যাচ্ছে—যখন যে-ঘর থেকে বেরিয়ে আসি তক্ষুণি মনে হয় শব্দটা আসছে বুঝি সেখান থেকেই। আবার গিয়ে ঢুকি, তখন আবার মনে হয় পাশের ঘরে। নাঃ—কিছুতেই কোনো হদিশ করা যাচ্ছে না।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, এখন কি করি। আবার ফিরে যাবো তেতলার ঘরে? নাঃ, সে অসম্ভব। তার চাইতে নীচেই যাই, গোমস্তার ঘরে কোনো রকমে বাকি রাতটা কাটিয়ে দি। পা টিপে-টিপে নেমে এলুম একতলায়। ওরা সব মড়ার মত ঘুমুচ্ছে—কোনোদিন যে ওরা বেঁচে ছিলো তা মনে হয় না। গোমস্তার ঘরের দরজায় প্রথমে টোকা, পরে দড়াম্-দড়াম্ ধাক্কা মেরেও কোনো ফল হ'লো না। আমার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো। যাক্ গে—এই বারান্দাতেই ব'সে থাকি, তবু তো কাছাকাছি একটা জ্যান্ত মানুষ থাকবে। কোঁচা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে বসতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো রাস্তার দিকে একটা ঘর থেকে একটুখানি হলদে আলো যেন বিষের ছুরির

মত বেরিয়ে আসছে। বুক কেঁপে উঠলো, কিন্তু মনে-মনে স্থির করলুম ওখানে কী ব্যাপার তা আমার জানাই চাই। টর্চ্ লাঠি নিয়ে চুপি-চুপি এগিয়ে গেলুম। ঘরের দরজা আধখানা বন্ধ, ভিতরে নড়াচড়া, চুপি-চুপি কথার শব্দও শোনা যাচ্ছে। এত রাত্রে এখানে কে? এরা কারা? আমার মনে হ'লো যেন এর ভিতরে কী একটা ভয়ঙ্কর পৈশাচিক্ ষড়্যন্ত্র চলেছে। এগিয়ে গিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি, হু'টো কালো, রোগা, লম্বা, লিকলিকে—

—ওমা—! ব'লে বাবলু চীৎকার ক'রে ভোম্বলের গলা জড়িয়ে ধরলো।

—লিকলিকে হু'টো মূর্ত্তি টকটকে লাল চোখ গোল-গোল ক'রে পাকিয়ে কটমট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি মনে-মনে ভাবলুম যে এই পিশাচদের পাল্লায় যখন পড়েইছি তখন তো আর রক্ষে নেই, এখন ভীরুর মত না ম'রে বীরের মত মরা যাক্। আমি তাই মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কে তোমরা? এত রাত্রে এখানে কী করছো? তারা বললে—হুজুর, আমরা ধোপা, কাপড় ইস্তিরি করছি—এতদিন হুই মোড়ে ছিলুম, কাল থেকে হুজুরের এই ঘরটিতে উঠে এসেছি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মাথায় ঠিক যেন একটা লাঠির বাড়ি পড়লো, প্রচণ্ড শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখি ওদের একজন একটা জামার ইস্তিরি শেষ ক'রে ইস্তিরিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো।

একটুক্ষণ সবাই চুপচাপ, তার পর নবা বললে—নাঃ, ভোম্বল-দা, তোমার এ গল্প একদম ফাঁকি। সত্যিকারের ভূত না হ'লে আর হ'লো কী?

ডলি বললে—ভারি মজার কিন্তু! সত্যি তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে? ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

লিলি আর বাবলু কিছুই বললে না, তাদের মুখ তখনো ফ্যাকাশে, ঠোঁট কাঁপছে।

---

## "পঁচিশ বছরের আগেই"

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

বেশী দিনের কথা নয়, বছর ১৫ আগেকার কথা বলিতেছি। কেম্ব্রিজের এক জনবিরল অঞ্চলে হু'টি যুবকের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। একজন, তার বয়স বছর কুড়ির বেশী হইবে না, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখে দৃঢ় সংকল্পের



ছাপ, হাসিমুখে কহিল, "জীবনে যদি কিছু করতেই হয় তবে পঁচিশ বছর বয়স হবার আগেই তা করা উচিত। সত্যিকারের ইচ্ছা থাকলে মানুষের অসাধ্য কিছু আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।" অপর যুবকটিও হাসিয়া উত্তর দিল, "দেখা যাবে, তোমার ইচ্ছার দৌড় কত দূর।"

প্রথম যুবকটি, তার নাম জিনো ওয়াট্‌কিন্স্, আবার হাসিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু মনে রেখ, আমার হাতে এখনও পূরো পাঁচ পাঁচটি বছর জমা আছে—বড় কম সময় নয়।"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ছেলে হু'টিকে আবার একসঙ্গে দেখা গেল এক সভায়। বায়স্কোপ্ দেখিতে যাইবে বলিয়া হু'জনে বাহির হইয়াছিল, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, কে একজন আসিয়াছেন—মেরু ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাহাই আজ তিনি বক্তৃতায় শুনাইবেন।

কি ভাবে যে সময় কাটিয়া গেল তার আর হুঁশ নাই, সভা ভাঙ্গিলে পর মনে হইল জিনো যেন এক নতুন মানুষ। এত ভাবে বিভোর আর তাকে কোন দিন দেখা যায় নাই। বন্ধু কহিল, "কি হে, মুখটা অমন ক'রে আছ কেন? তুমিও মেরুর দেশে ছুটবে নাকি?" জিনো কোনও উত্তর দিল না।

কয়েক দিন পরে কিন্তু শোনা গেল জিনো ওয়াট্‌কিন্স্ সত্যি সত্যি মেরু ভ্রমণে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভাবা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয়। ঠাণ্ডা দেশ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতাই বা কি? শুধু কয়েক বার সুইট্জারল্যাণ্ডে গিয়া আল্‌প্স্ পাহাড়ে ওঠা-নামা করিয়াছে আর পায়ে লম্বা লম্বা নৌকার মত কাঠের জুতা পরিয়া 'শী' বা 'স্কি' করা শিখিয়াছে এই যা! তা ওরকম তো ওদেশে কত লোকই শেখে—তাই বলিয়া একেবারে সেই চির-তুষারে ঢাকা উত্তর দেশে অভিযান করিবার সখ চাপিলে চলিবে কেন?

কিন্তু ওয়াট্‌কিন্স্ নাছোড়বান্দা। মেরুর দেশের যত রকম হুঃখ-কষ্ট সব সে সহ্য করিতে শিখিয়া লইবে। মেরু সম্বন্ধে যেখানে যত বই ছিল সব সে পড়িয়া ফেলিল। তার পর সুরু হইল নানা রকম কষ্ট সহার অভ্যাস। বাহিরে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বরফ পড়িতেছে, উত্তাপ শূন্য ডিগ্রীর তলায় নামিয়া

গিয়াছে, ওয়াট্‌কিন্‌স্ একটা ফিন্‌ফিনে পাৎলা জামা গায়ে খোলা জানালার পাশে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিতে লাগিল; শীতকে সে ভয় করিবে না। এমনি ধারা নানা রকম ভাবে 'রিহার্সাল্' বা মহড়া দিতে দিতে ওয়াট্‌কিন্‌স্ বরফের দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এদিকে আর এক গোল বাধিল। ওয়াট্‌কিন্‌স্‌কে লইয়া মেরু-অভিযান করিবে এমন লোক পাওয়া গেল না। এই সব অভিযানে দলের নায়ক হইতে হইলে তার অনেক রকম অভিজ্ঞতা থাকা দরকার—অনেক গুণও থাকা চাই। এই ধরণের এক-একটি অভিযান খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিতে হয়—কারণ শীতের সময়, বরফ জমিতে সুরু করিলে, ও দেশে তিষ্ঠান সম্ভব নয়। তাই এক-এক দলে বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক-একজন লোক রাখিতে পারিলে ভাল হয়। যেমন—তাড়াতাড়ি মাপঝোঁক করিয়া ম্যাপ্ আঁকিয়া লইতে পারে এমন লোক, ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন লোক, আব্‌হাওয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে পারে এমন লোক। এই সব অভিযানের আয়োজন তো শুধু মানুষের খেয়াল বা সখ মিটাইবার জন্যই করা হয় না, —মানুষের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই এর আয়োজন করা। অনেক বড় বড় সমিতি এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। কাজেই এই রকম একটা অভিযান সুষ্ঠু ভাবে চালাইতে হইলে খুব বিচক্ষণ নায়কের দরকার।

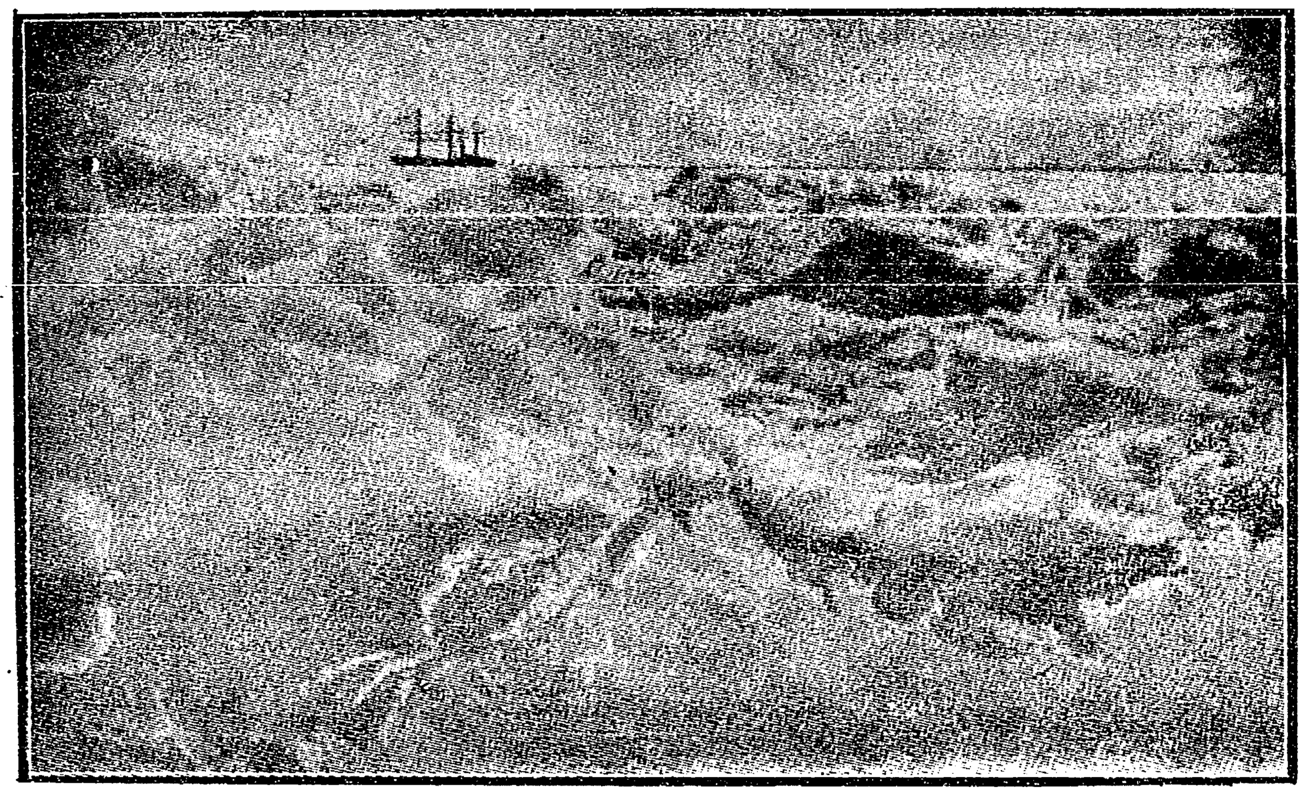

তুষারের দেশ



ওয়াট্‌কিন্‌সের বেলা সে রকম কোন লোক জুটিল না। কিন্তু ওয়াট্‌কিন্‌স্ দমিবার পাত্র নয়, সে ঠিক করিল নিজেই অভিযানের নেতৃত্বের ভার লইবে। তার পর সুরু করিল দলে অন্যান্য লোক জুটাইবার চেষ্টা।

১৯২৭ সনে কুড়ি বছরের ছেলে ওয়াট্‌কিন্‌স্ আট জন সঙ্গী লইয়া সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইল। নরওয়ের উত্তরে লাপল্যাণ্ড—তারও ৫০০ মাইল্ উত্তরে 'এজ্' দ্বীপ। ওয়াট্‌কিন্‌স্‌এর গন্তব্য এই প্রায়-অনাবিষ্কৃত দ্বীপটি।

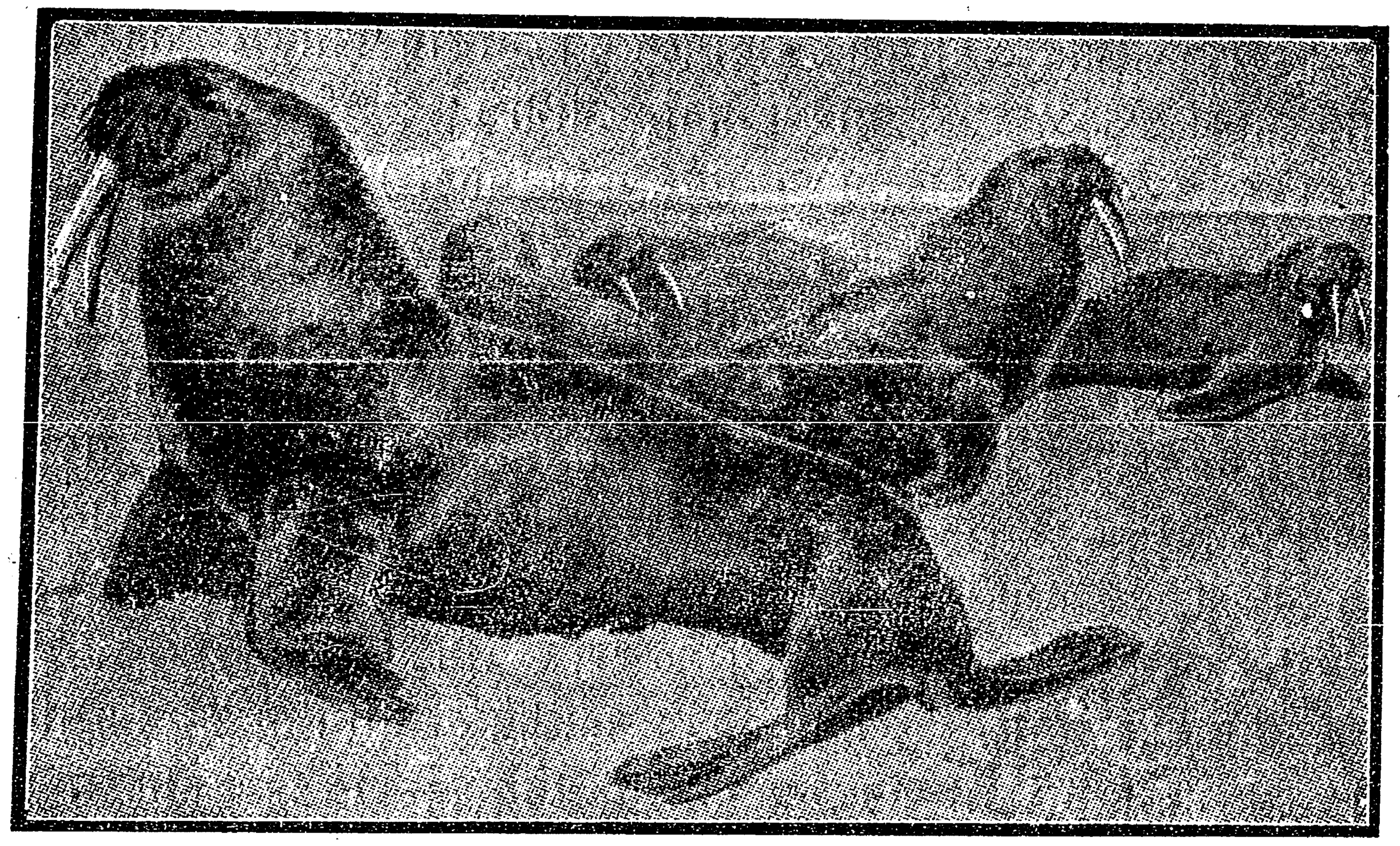

তুষার-দেশের অধিবাসী

কিন্তু, যাত্রার আরম্ভেই দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। ছোট্ট জাহাজখানি কাঠের তৈরী, তার তলাটা আবার গোল (নহিলে বরফের চাপে ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে)। এই ঝড়ের মধ্যে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইয়া তার যা অবস্থা হইল তা না বলাই ভাল। প্রতি মুহূর্ত্তে যাত্রীদের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। অবশেষে জাহাজটি কোনক্রমে বরফের রাজ্যে ঢুকিয়া তবে রেহাই পাইল। বরফের রাজ্যে সমুদ্র অনেকটা ঠাণ্ডা।

ডাঙ্গায় নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর—মানুষের

তৈরী। এই জনহীন তুষার-প্রান্তরে মানুষের তৈরী ঘর আসিল কোথা হইতে! ঘরের সামনেই কয়েকটা নরকঙ্কাল পাওয়া গেল। কে জানে, কত দিন আগে কোন হতভাগ্য সীল-শিকারীর দল শিকারের লোভে এখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছিল, আর ফিরিতে পারে নাই!

একমাস সময় সেই দুর্গম দ্বীপে কাটাইয়া নানা তথ্য সংগ্রহের পর ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ সেবারের মত ফিরিয়া আসিল। এই একমাস তারা দলের লোক ছাড়া অন্য কোন মানুষের মুখ দেখে নাই। জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে সাদা ভালুক, সীল আর রেইন্‌ডীয়ার মাঝে মাঝে দেখা যাইত। কখনও কখনও হরিণগুলি এত কাছে আসিত যে বেশ বুঝা যাইত তারা এর আগে কোন দিন মানুষ দেখে নাই। বলা বাহুল্য এই সব জন্তু শিকার করিয়াই ওয়াট্‌কিন্‌সকে দলের জন্য টাটকা খাবারের ব্যবস্থা করিতে হইত। তবে সুখের বিষয় এই এক মাস ছিল ক্রমাগত দিন—গ্রীষ্মকালে উত্তরাঞ্চলে যেমনটা হয়।

দেশে ফিরিয়া কিন্তু ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে রাজী হইল না। নতুন নতুন আবিষ্কার—নতুন নতুন য়্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশায় তার মন তখন পাগল।

অবশেষে আবার সুরু হইল তার অভিযান। উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডার পূবদিকে ল্যাব্রাডোরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। ম্যাপে জায়গাটা ভাল করিয়া আর একবার দেখিয়া লইতে পার। এবারকার অভিযান হইল এই ল্যাব্রাডোরে। কখনও গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া ছোট্ট ডিঙ্গিতে চাপিয়া, কখনও গভীর পুরু বরফের উপর দিয়া কুকুর-টানা শ্লেজে করিয়া কম করিয়া প্রায় ২০০০ মাইল জায়গা ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ এবারে চষিয়া বেড়াইল। সঙ্গী হইল, শীতকালে—দুরন্ত রক্ত-জমান ঠাণ্ডা, আর গ্রীষ্মকালে—ততোধিক দুরন্ত মশা আর বিষাক্ত পোকার কামড়। খাবার তো প্রায়ই জুটিত না। পর্কুপিন, সীল এবং ঐ ধরণের অদ্ভুত অদ্ভুত কোন কোন জন্তুর মাংস কালেভদ্রে মিলিত। সেদিন তো মস্ত ভোজ। অনেক সময় বুনো কলা খাইয়া দিনের পর দিন কাটাইতে হইত—সময় সময় তাও জুটিত না,—একেবারে উপবাসে দিন কাটিত।



এই অভিযানে ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ শুধু ল্যাব্রাডোরের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধেই তথ্য যোগাড় করিল না, ল্যাব্রাডোরের অধিবাসী এস্কিমোদের সঙ্গেও বেশ ভাব পাতাইয়া লইল। এস্কিমোদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, বরফের তলা হইতে সীল খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া শিকার করিবার কৌশল ইত্যাদি নানা ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিল। কখনও সে এস্কিমো-পরিবারের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া তাদের বরফের বাড়ী ইগ্‌লুর মধ্যে বেড়াইয়া আসিত। কখনও 'কায়াকে' চড়িয়া মনের আনন্দে সীল শিকারে ছুটিত। শীতকালে এস্কিমোরা বরফ দিয়া গোল গোল উপুড় করা গামলার আকারের বাড়ী তৈরী করিয়া তার মধ্যে বাস করে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এইগুলিকেই বলে 'ইগ্‌লু'। এই ঘরে কোন দরজা-জানালা থাকে না, ঘরে ঢুকিবার জন্য সরু একটা সুড়ঙ্গের মত থাকে, তাহারই ভিতর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়। ঘরের ভিতরটা বেশ গরম—সীলের চর্ব্বি দিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া সে ঘর আলোকিত রাখা হয়। আর 'কায়াক্‌' এক রকম অদ্ভুত নৌকা—লম্বায় প্রায় ১৬।১৭ ফুট, কিন্তু চওড়ায় মাত্র ২ ফুট। এত বড় নৌকা, কিন্তু তাতে একজনের বেশী লোক ধরে না। তিমির হাড় দিয়া কাঠামো তৈরী করিয়া তার উপর সীলের চামড়া হরিণের পেশী দিয়া সেলাই করিয়া এই অদ্ভুত নৌকা তৈরী করা হয়। নৌকাগুলি ভীষণ রকম দ্রুতগামী।

এর পর ওয়াট্‌কিন্সের আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথা বলিব। ইয়োরোপ হইতে এরোপ্লেনে আমেরিকা, গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, উত্তর ক্যানাডা প্রভৃতি অঞ্চলে যাইবার উপযোগী রাস্তার সন্ধান করিবার জন্য একটা সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সভ্যরা উত্তর অঞ্চলের নানা জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেখানকার প্রাকৃতিক রূপ—কোথায় আছে কোন্‌ ডাঙ্গা, কোথায় আছে কোন পাহাড়ের চূড়া, কোথায় বা আছে বরফ-নদী ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিতেন। একবার একজন সভ্য এই ভাবে খবর সংগ্রহ করিতে গিয়া আটকা পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে আর কেউ নাই,—তাঁবু বরফের স্রোতে নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছাড়িয়া কোথায় ভাসিয়া আসিয়াছে; এ অবস্থায় কেউ গিয়া তাঁকে উদ্ধার না করিলে জীবনের আশা করা বৃথা।

সারা শীতকাল ঐ ভাবে কাটিলে পর বসন্তের প্রারম্ভে সন্ধানকারী দল ছুটিল তাঁর খোঁজে, কিন্তু প্রচণ্ড মেরু-ঝড়ের পাল্লায় পড়িয়া তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে খবর শুনিয়া অদ্ভুত সাহসী ওয়াট্‌কিন্‌স্‌ ছুটিল, এবং ৬০০ মাইল্‌ পথ একটা ছোট্ট খোলা নৌকায় পার হইবার পর লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিল। আর কিছু দেরী হইলে বেচারাকে না খাইয়াই মরিতে হইত।

এর কিছু দিন পরেই, ঐ অঞ্চলেই, বীর ওয়াট্‌কিন্সের জীবন শেষ হয়। একদিন তার প্রিয় কায়াকে চড়িয়া সে সীল শিকারে বাহির হইল, আর ফিরিল না। তার পর আজ পর্য্যন্ত আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তার কথা মত, পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হইবার আগেই, এই অসমসাহসিক যুবক একটা করার মত কিছু করিয়া পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইল।

---

# অভিভাষণ

শিশুবৃদ্ধ ও বৃদ্ধশিশুরা,
লহ লহ মোর ধন্যবাদ,
এ মহাসভায় সভাপতি ক'রে
মিটালে মনের লুকান সাধ।

যা কিছু আজ হবে হেথায় চলিবে তায় আমার মতই,
কারণ আমায় সবাই জুটে বানিয়ে দিলে সমাজ-পতি।
আমি এখন ক'রব স্নুরু সভাপতির অভিভাষণ—
তোমরা ভয়ে জড়সড়, ভাব্‌ছ সেটা কী না ভীষণ!
দাঁতভাঙা সব শব্দ যুড়ে কড়মড়িয়ে আউড়ে যাব,
কেউ বা খাবে ভ্যাবাচাকা, কেউ বা রবে জবস্থব;
হাই তুলবে ছেলেরা সব, মেয়েরা সব পড়বে ঢুলে—
ভয় নাই গো, ব'লব যাহা সহজ ক'রেই ব'লব খুলে।



রবি ঠাকুর ছিলেন দেশের মস্ত বড় মহাকবি—
কাব্য কতই লিখে গেছেন, এঁকে গেছেন কতই ছবি।
নাটের গুরু নাচিয়ে গেছেন দেশের যত ছেলেমেয়ে;
সুরের আগুন ছড়িয়ে গেছেন বাংলা দেশের আকাশ ছেয়ে।

নদী-পাহাড়, ফুলের বাহার, বর্ষামেঘের স্নিগ্ধ শোভা
কাব্যেতে তাঁর রূপ পেয়েছে কী অপরূপ চিত্তলোভা!
শিশুর মুখের সরল হাসি, কিশোর মনের রঙীন নেশা,
বৃদ্ধ আঁখির সৌম্য বিভা, স্নিগ্ধ হাসি অশ্রু-মেশা,
নির্ঝরিণীর ঝরঝরানি, উড়ো হাঁসের পাখার ধ্বনি,
ভরা পালে নদীর বাঁকে যায় ভেসে যায় যেই তরণী,—
যেথায় যত রূপের বিকাশ—যেথায় যত প্রাণের খেলা,
কাব্যে তিনি গেঁথে গেছেন আকাশপ্রদীপ তারার মালা।

শুন্‌ছি নাকি মর্ত্ত্য ছেড়ে গেছেন তিনি কোন্‌ সুদূরে!
মিথ্যে কথা, আমরা জানি আছেন তিনি হৃদয় যুড়ে।
জগৎ পারাবারের তীরে নিত্য যেথা শিশুর মেলা—
নিত্যকালের ঠাকুরদাদা আজও সেথায় করেন খেলা।
চোখ পাকিয়ে, উঁচিয়ে ভুরু, গোঁফে চাপা দুষ্টু হাসি,
সাম্‌নে ঝুঁকে ঐ ত আসেন, হ'লই বা তাঁর বয়স আশী।
বাউল নাচের ছন্দ পায়ে, তুলে ধরেন একতারাটি,
ঐ ত মোদের প্রেমের ঠাকুর, নাচের তালে কাঁপছে মাটি।
দূর থেকে সব জোয়ান বুড়ো প্রণাম করে দু'হাত তুলি,
তোমরা চ'ড়ে কাঁধে পিঠে লুট কর তাঁর রসের ঝুলি।

রবি-সমাগমে শিশু-উৎসবে সভাপতি দাদু সম্ভাষিলেন,
ছোট হাতে মোরা লিখে নিয়ে তাই ছাপাবার তরে পাঠিয়ে দিলেম।

প্রতিমা, গোপাল, কানু, হাবি, রেবা, কান্ত, রাণু,
খুকু, লোটু, খোকন প্রভৃতি,
লেখন পাঠায়ে দিনু আমরা হাজির ছিনু—
যত সব নাতনী ও নাতি। *

---

## "হুঁসিয়ার"

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্. এ

যখন সামনের লোকটার লোমওয়ালা ঘেমো ঘাড়টার দিকে আর চেয়ে থাকা অসম্ভব, মনে হ'ল, চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলাম। অমনি কার জানি একরাশ খোঁচা খোঁচা গোঁফ আমার ডান দিকের কানের ভেতর ঢুকে গেল। চম্‌কে গিয়ে ফিরে দেখি ভীষণ রোগা, ভীষণ লম্বা, ভীষণ কালো একটা লোক গলাবন্ধ কালো কোট পরে ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। তার পেছনে আরও অনেক লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য কোন্ পা যোড়া তা'র বুঝে নিতে আমার একটু সময় লাগ্‌লো। শেষটা টের পেলাম খুব সরু, খুব লোমওয়ালা, আর খুব কালো ঠ্যাং দুটো ওর। তায় আবার একযোড়া দাঁত-বের-করা ছেঁড়া চটি পরা, তার ফুটো দিয়ে নোংরা বুড়ো আঙ্গুল বেরিয়েছে।

এই লোকটা হাসি হাসি মুখ ক'রে আস্তে আস্তে আমার কানের মধ্যে থেকে তার গোঁফটাকে সরিয়ে নিতে নিতে বল্ল, "মণিব্যাগ্‌টা আরেকটু থাম্‌চে ধরুন, যা চোর-চামারের উপদ্রব।" লোকটার কথাগুলো যেন কত দূর থেকে এলো, কি রকম একটা হাল্কা ফিস্‌ফিস আওয়াজ। তা'র চোখ দুটোও যেন আর কিছুতেই গর্ত্তের মধ্যে থাক্‌ছিলো না, একেবারে বেরিয়ে এসে আমার মানিব্যাগের ভিতরের খোপের মধ্যে পড়ে যেতে চাচ্ছিলো।

সবাই এক জনের পেছনে একজন দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে শেয়ালদা ষ্টেশনের ইণ্টার ক্লাশ টিকিট-ঘরের দিকে এগোচ্ছিলাম। খুব সাবধানে, কারণ একটু এক পাশে সরলেই ধাক্কার চোটে লাইন থেকে বেরিয়ে পড়বার ভয়। এম্‌নি ক'রে যখন খাঁচার ভিতরে বেশ কালো-কোলো মেমসাহেবের কাছে পৌঁচলাম, তখনও টের পাচ্ছিলাম পিছনে সেই লোকটার ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস আর আস্তে আস্তে গোঁফ-নাড়া।

* গত ১লা জ্যৈষ্ঠ দিনাজপুরে শিশুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত অভিভাষণ।



লোকটা দেখ্‌লাম আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। মেমসাহেবকে যখন টাকা দিলাম লোকটা ঝুঁকে ব্যাগের মধ্যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্ল—"চেঞ্জ গুণে নেবেন, বেটিরা ভারী ছ্যাঁচড়।" মেম রেগে এ গাল থেকে ও গালে চুইং-গাম্‌টা ঠুসে দিয়ে বল্ল—"চোপ্‌রাও বাবু।" তার পর লোকটা আমাকে সেই রকম যত্ন ক'রে উপদেশ দিতে দিতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে নিয়ে চল্ল। একটা কলার খোসা আর কি যেন খানিকটাকে খুব কসরৎ ক'রে এড়িয়ে বল্ল—"সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। সবাই সবারটা গিল্‌বার ফিকিরে আছে।" গেটের কাছে চেকার বাবু চিকিৎ-চিকিৎ করে টিকিট ছেঁটে দিলে পর আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকলো। বল্ল—"এই যে গাড়ী"—অবিশ্যি সেটা বল্‌বার কিছু দরকার ছিলো না।

আমার সঙ্গে একটা ইণ্টার ক্লাশ গাড়ীতে ঢুকে আমার পাশে বসে বল্ল—"জিনিষপত্র আগ্‌লে রাখুন; সুটকেসটা দূরে রাখ্‌বেন না, নিজের সীটের তলায় রাখাই ভালো। এটা জেনে রাখ্‌বেন শিয়ালদা ষ্টেশন চোর-বাট্‌পাড়ের আড্ডা!" তার পর আমরা দু'জনেই জুতো খুলে পা তুলে আরাম করে বসলে পর বল্‌তে লাগ্‌লো—"সংসারে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিজে যতগুলো চোর জোচ্চোর দেখেছি সবগুলোকে একটার পেছনে একটা দাঁড় করালে এখান থেকে বোলপুর ষ্টেশন অবধি লম্বা একটা লাইন হয়।" এ কথা শুনে আমি বিস্মিত হ'লাম। তখন সে আরও বল্‌তে লাগ্‌লো, "আর ছিঁচ্‌কে চুরির জন্য তারা যে অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও বুদ্ধি দেখিয়েছে, ভালো কাজে যদি লাগাত এতদিনে ভারতবর্ষ উদ্ধার হ'য়ে যেতো।"

তার পর তা'র কালো কোটের পকেট থেকে একটা চারকোণা পানের ডিবে বের করে বল্ল,—"গিরিডির মতন সভ্য সহরে, যে জায়গা সজ্জনের বাস ব'লে বিখ্যাত এমন সহরে, সেবার পূজোর সময়ে সচ্চিদানন্দ জ্যাঠামশাইএর পাজামা সুটের ইজের গা থেকে খুলে চোরে নিয়ে চলে গেলো, এর বেশী আর কি বলা যায়!"

আমি নিবিষ্ট মনে শুনতে লাগ্‌লাম। আর সে গোটা দুই পান মুখে পূরে, একটু চূণ দাঁতে লাগিয়ে বলে যেতে লাগ্‌লো—"গরমের জন্য বাইরে মাদুর পেতে, তায় চাদর বিছিয়ে, বালিশ মাথায়, চাদর গায়, পায়ের কাছে চটি, বালিশের নীচে হাতঘড়ি, মাথার কাছে জলের গেলাশ নিয়ে, ভগবানের নাম করে রোজকার মতন শুয়ে পড়েছেন। আর সকালে উঠে দেখেন কিনা চটি নেই, গেলাশ নেই, বালিশ নেই, হাতঘড়ি নেই, এমন কি পরনের ইজেরটা পর্য্যন্ত কখন যেন আস্তে আস্তে খুলে নিয়েছে!!"

শুনে আমিও আশ্চর্য্য হ'লাম।

তখন সে বল্ল—"কাউকে মশাই বিশ্বাস করা যায়? অরুণ বাবু ট্রেনে ক'রে আসছেন।

সেকেন্ কেলাশ গাড়ী, সঙ্গে উঠ্‌লেন দিব্যি খাকী প্যান্ট শার্ট হ্যাট্ পরা বাঙ্গালী সাহেব। ক্যায়সা ভাব জমে গেলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে। ইনি ওঁর বিস্কুট খেলেন, আবার উনি এঁর সিগারেট্ টান্‌লেন। তার পর মুড়িসুড়ি দিয়ে দু'জনে ঘুম। সকালে উঠে অরুণ বাবু দেখ্‌লেন বাঙ্গালী সায়েবও নেই, তার জিনিষপত্রও নেই, আর অরুণ বাবুর স্যুট্‌কেস্‌ও নেই।"

আমি একবার আমার স্যুটকেস্ ও পুঁটুলিটা দেখে নিয়ে ঠ্যাং বদ্‌লে বস্‌লাম। আর সে বাইরে এঁদো পুকুরে ধোপাদের কাপড় কাচা দেখ্‌তে দেখ্‌তে নীচু গলায় বল্‌তে লাগ্‌লো :

"ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে পিসিমার কাছে থাকৃতাম। গ্রামের একধারে বাঁশঝাড়ের কাছে খড়ের চালের বাড়ী। যেই না সন্ধ্যা হওয়া আর অমনি বাড়ীর আর উঠানের আনাচে কানাচে ভয়ভীতিরা ভীড় ক'রে আস্‌ত। বাঁশঝাড়ের শুক্‌নো পাতা খসার শব্দ থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের মেনি বেড়ালটার ক্যাঁক্ ক'রে ইঁদুর ধরার আওয়াজটা পর্য্যন্ত সূর্য্য ডোবার পর কেমন যেন অন্য রকম লাগ্‌তো। আর পিসিমা শোবার আগে প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেকটা খিল্ ভালো ক'রে দেখে নিতেন, বাক্স প্যাঁট্‌রার উপরে নানান্ ভাবে ঘটা বাসন সব এমন ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌তেন যাতে একটু সরালেই সব দুম্‌দাম্ প'ড়ে আমাদের কেন, পাড়ার অন্য লোকদেরও ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। এই সব করতে করতে পিদ্দীমের তেলটুকু পুড়ে যেত আর আলো নিবে যেতো। পিসিমাও অম্‌নি খচ্‌মচ্ ক'রে বিছানায় ঢুক্‌তেন। মাঝে মাঝে ওঁর ঠাণ্ডা খড়খড়ে পা আমার পায়ে লেগে যেতো, আমি শিউরে উঠ্‌তাম। শুয়েই আবার পিসিমার মনে হ'ত—কি হ'বে, খাটের তলা দেখা হয় নি, যদি কোন ধূর্ত্ত চোর ছোরা হাতে সেখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে! আমাকে বল্‌তেন—'এই, তোর একটা মার্ব্বেল খাটের তলা দিয়ে গড়িয়ে দে না, ও দিক্ দিয়ে বেরোলে বুঝ্‌ব খাটের তলায় কেউ নেই।' ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যেতো, পিসিমা যা বল্‌তেন তাই করতাম। একবার খাটের পায়ায় মার্ব্বেল আট্‌কে গেলো, আর সারারাত পিসিমা আর আমি জেগে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌লাম। আর কখনও যদি পিসিমা আগে শুতেন আর আমাকে অন্ধকারে পরে শুতে হ'ত, খাটের তিন হাত দূর থেকে এক লাফ মেরে খাটে উঠে পড়তাম, যাতে খাটের তলায় লুকিয়ে-বসা বদ্‌মায়েসটা তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমার ঠ্যাং ধরে টেনে নিতে না পারে। একদিন হিসেব ভুল হওয়াতে পিসিমার পেটের উপর ল্যাণ্ড করেছিলাম, আর পিসিমা আমার কাণটাণ মলে বার বার বল্‌তে লাগ্‌লেন যে 'উনি পষ্ট টের পাচ্ছেন ওঁর নাড়ীভুঁড়ি সব এলিয়ে গেছে!"

এতটা ব'লে লোকটা একবার আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্ল—"ছোটবেলা থেকে



এম্‌নি আমার ট্রেনিং যে কোনও শা—র চোরও আমার কাছ থেকে কাণাকড়িটিও পায় নি! এই দেখুন নোটের তাড়া নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে যাচ্ছি!"

এই অবধি বলেই হঠাৎ সে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে সটাং শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলো। গাড়ীতে আর যে দু' চার জন ছিলো তারাও সবাই এক সঙ্গে নেমে গেলো। আর আমিও আমার যে দু'-একটা কাজ ছিলো সেরে নিয়ে অন্য একটা বেঞ্চিতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম ও একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন ভোর হ'য়ে এসেছে, চোখ ঘষে উঠে দেখি আমার সঙ্গীটি কখন জানি নেমে গেছে। তার কথা মনে উঠতেই আর তার চোরের ভয় মনে করতেই বেজায় হাসি পেলো। ঠিক এই সময় চোখ পড়লো বেঞ্চির তলায় আমার স্যুট্‌কেস্, পুঁটুলি ও চটি কিচ্ছু নেই। আছে কেবল তা'র সেই দাঁত-বের-করা ছেঁড়া চটি যোড়া!

ভীষণ রাগ হ'ল। ভণ্ড, জোচ্চোর, বকধার্ম্মিক কোথাকার! রাগের চোটে হঠাৎ নিজের ট্যাঁকের উপর হাত পড়ে গেলো। ট্যাঁক্ খুলে দেখলাম, কাল রাত্রে লোকটা ঘুমিয়ে পড়বার পর তা'র বুক-পকেট থেকে যে নোটের তাড়াটা সরিয়েছিলাম,—আমার স্যুট্‌কেস ইত্যাদি চুরি যেতে পারে,—কিন্তু সেটি ঠিকই আছে।

বেশ একটু খুসি মনে আবার শুয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠলাম।

---

# বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

## মুড়ি চিবাইতে থাকিলে মিষ্টি লাগে কেন?

একমুঠা মুড়ি প্রথম মুখে দিলে মনে হয় উহার বিশেষ কোনও আস্বাদ নাই; কিন্তু যদি উহা কিছুক্ষণ ধরিয়া চিবান যায় তাহা হইলে বেশ মিষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায়। প্রথম কয়েক মুঠা মুড়ি খাওয়ার পর পরের গুলির মিষ্ট আস্বাদ যেন আরও বাড়িয়া যাইতে থাকে। এক টুক্‌রা রুটী বা পাঁউরুটীও ঐ ভাবে ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইলে উহার সুস্বাদ বাড়ে।

মুখ-প্রাচীরের গায়ে কতকগুলি গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড) আছে। ঐ সকল গ্রন্থি

লালা ক্ষরণ করে। থুথু এই লালার অন্য নাম। খাদ্যদ্রব্য চিবাইলে ঐ লালার সহিত মিশ্রিত হয়। মুখ-লালায় এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য থাকে তাহাকে 'টায়ালিন' বলে। টায়ালিন জীর্ণক (এন্‌জাইম্) জাতীয় বস্তু। জীর্ণকগুলি খাদ্যদ্রব্যের সহিত জল মিশাইয়া উহার অণুগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত করে। টায়ালিন মুড়ি বা রুটীর শ্বেতসারময় খাদ্যের উপর কার্য্য করিয়া উক্ত শ্বেতসারের কতক অংশ 'মল্‌টোজ্' নামক এক জাতীয় চিনিতে পরিণত করে। ঐ চিনির জন্যই মুড়ির মিষ্ট আস্বাদ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে।

ভাতও যদি বেশীক্ষণ ধরিয়া চর্ব্বণ করা যায় তাহা হইলে উহারও মিষ্ট আস্বাদ বাড়ে। তবে ভাত অত্যন্ত নরম বস্তু বলিয়া উহাকে বেশীক্ষণ চিবাইবার সুবিধা হয় না, একটু চিবাইলেই গলার ভিতর চলিয়া যায়। মুখে খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া যখন উহার মিষ্ট আস্বাদ বর্দ্ধিত হয় তখন আমাদের আমাশয়ের (ষ্টমাক্) পাচক রস নির্ম্মাণকারী-গ্রন্থিগুলি উক্ত মিষ্ট আস্বাদের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বেশী পরিমাণে পাচক রস নির্ম্মাণ করে। উহাতে ভুক্ত খাদ্য পরিপাক হইবার বিশেষ সুবিধা পায়।

## অম্ল (য়্যাসিড্) ও ক্ষার (য়্যাল্‌কালি)

অম্লদ্রব্যের আস্বাদ টক তাহা তোমরা জান। সালফিউরিক্, নাইট্রিক্ প্রভৃতি উগ্র য়্যাসিড্ মুখে দিলে মুখ পুড়িয়া যায়; কিন্তু ঐ সকল অম্ল যদি প্রচুর জল মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় লাগান যায় তাহা হইলে উহাদের টক আস্বাদ বুঝা যায়। ক্ষারবস্তুর আস্বাদ চুণের মত,—বেশী উগ্র হইলে উহাতেও মুখ পুড়িয়া যায়। কিন্তু যদি অম্ল ও ক্ষার সমান ভাবে মিশান যায় তাহা হইলে আর মুখ পোড়ে না। উহার আস্বাদ অনেকটা লবণের মত হয়। আমাদের সাধারণ লবণ হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্ এবং কষ্টিক্ সোডা নামক ক্ষার মিলিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুখ দিয়া চাখিয়া অম্ল ও ক্ষার নিরূপণ করা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক এবং কখনও কখনও বিপজ্জনক। এ জন্য রাসায়নিকরা অপর সোজা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কতকগুলি রং আছে তাহারা অম্ল ও ক্ষারের সংস্পর্শে



আসিয়া নিজেদের বর্ণ পরিবর্ত্তন করে। একটু লিট্‌মাস্ নামক রঙের দ্রবে একটু ক্ষার দিলে উহা নীল থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি উহাতে একটু অম্ল দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা লাল হইয়া যায়। লাল জবা ফুলের রঙ লিট্‌মাসের মত। একটা জবা ফুল এক টুক্‌রা কাগজে ঘষিয়া লও। কাগজখানি নীল রং-এর হইল। কাগজখানি কাটিয়া তিন-চার টুক্‌রা কর। এক টুক্‌রা ঐ কাগজের উপর একটু লেবুর রস দাও, উহার বর্ণ লাল হইবে। একটু ক্ষার (যেমন চুণ, কষ্টিক সোডা বা কাপড়-কাচা সোডা) দাও রঙ নীল থাকিয়া যাইবে। জবা ফুল-রঞ্জিত কাগজের উপর করমচার রস, আমড়ার রস, কচি আমপাতা, আমড়া পাতা ঘষিয়া দাও—লাল হইয়া যাইবে। ঐ সকল দ্রব্যে অম্ল আছে।

ফিনোলথ্যালিন নামক বস্তুর অল্প মদ্যযুক্ত জলীয় দ্রব অম্লের সংস্পর্শে বর্ণহীন থাকে, কিন্তু উহার সহিত ক্ষার সংযোগ করিলে উগ্র রক্তবর্ণ ধারণ করে। ইহার সাহায্যে কৌতুকের উদ্ভব হইয়াছে। এক ভদ্রলোক একটি ছেলেকে ধরিয়া লইয়া পুলিসে উপস্থিত; দোলের খেলায় ছেলেটি নাকি তাঁহার জামার পিছনে লাল রঙ দিয়াছে। অনুসন্ধানে পুলিস লাল রং পায় না; বিনা অপরাধে ছেলেটিকে হয়রাণ করায় ভদ্রলোককেই উল্টা মুশ্‌কিলে পড়িতে হয়। ছেলেটি কিন্তু সত্যই লাল রং দিয়াছিল। সে ফিনোলথ্যালিনের সহিত য়্যামোনিয়া (ক্ষার) মিশাইয়া লাল রঙ করিয়াছিল। পথিমধ্যে য়্যামোনিয়া উপিয়া যায়, কাজেই ফিনোলথ্যালিন আর লাল থাকিতে পারে না—কারণ উহার ক্ষার উপিয়া গিয়াছে।

যাদুকর দুইটি কাচের গ্লাস হাতে লইয়া দর্শকদিগকে দেখায়। "দেখুন একটি সাদা জল আর অপরটি খালি। একটা কাগজের ঠোঙ্গা দিয়ে খালি গ্লাসটি ঢেকে রাখছি, এবং এর মধ্যে এই সাদা জলটুক ঢেলে দিচ্ছি। আমার মন্ত্রের বলে এটি লাল মদে পরিণত হবে।" পরে সে গ্লাসটি বাহির করিয়া দর্শকদিগকে দেখায়—উহা লাল জলে ভর্ত্তি হইয়াছে। খালি গ্লাসটির গায়ে একটু ফিনোল-থ্যালিন দ্রব লাগান ছিল, আর জলপূর্ণ গ্লাসে ছিল য়্যামোনিয়া মিশান জল।

যাদুকর দর্শকবৃন্দকে একটি গ্লাস দেখায়, উহাতে একটু ঘোলাটে সাদা

জলবৎ বস্তু রহিয়াছে। পরে দর্শকদিগকে বলে, "আপনারা একজন এই গ্লাসটিকে নিয়ে আলোয়ান দিয়ে ঢেকে রাখুন। আমি ওটিকে স্পর্শ না ক'রে শুধু মন্ত্রের বলে বদলে দেব।" মিনিট দশ পরে গ্লাসটিকে আলোয়ানের ভিতর হইতে বাহির করা হইল। উহার জল লাল রংএর হইয়া গিয়াছে। গ্লাসে আদতে ছিল (১) ফিনোল-থ্যালিন্, (২) মাখন-সীমের বীজের গুঁড়া, (৩) ইউরিয়া নামক রাসায়নিক পদার্থ ও জল। মাখন-সীমের বীজের গুঁড়ায় ইউরিয়েজ নামক জীর্ণক (ফার্মেণ্ট) থাকে; উহা ইউরিয়াকে য়্যামোনিয়াতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। য়্যামোনিয়া ফিনোলথ্যালিনকে লাল করিয়াছে।

হলুদ ক্ষারের সম্পর্কে আসিলে লাল বর্ণ ধারণ করে। চূণে হলুদে মিশাইলে লাল হয় তা তোমরা জান। পান খাইলে ঠোঁট দুটি টুক্‌টুকে হয়। তাহার কারণ বুঝিলে? খয়েরের রং ক্ষার—চূণের সম্পর্কে আসিয়া লাল বর্ণ ধারণ করে।

---

# ভূষণের মা

শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ

মোটর ষ্টেশন থেকে ডানদিকের রাস্তাটা প্রায় আধ মাইল পথ গিয়ে শেষ হয়েছে ঠিক নদীর কিনারায়। জায়গাটি খুব নির্জ্জন—স্থানীয় কয়েকজন কুলী-মজুর ছাড়া আর কোন লোকের বসতি নেই। এখানেই ভূষণরা ছোট একটি কুঁড়ে-ঘরে থাকে। ওদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের অনেক দিনের। চড়ুইভাতি করতে কত বার এসেছি এখানে। সত্যি, এ জায়গাটা কোনদিন পুরানো হবে না; পুরানো না হবার একটা বিশেষ কারণও আছে। সেই কথাই আজ বলছি।

ভূষণদের সংসারে ওরা ছ'টি ভাইবোন আর মা লছ্‌মী—ভূষণই সব চেয়ে ছোট। এক সময় অবস্থা ওদের বেশ ভালই ছিল। প্রায় ত্রিশ বছর আগে পশ্চিম থেকে এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করে—এখন থাকবার মধ্যে আছে একটা কমলা-বাগান। লছ্‌মী রোজ দেড় মাইল হেঁটে বাজারে গিয়ে কমলা বিক্রী ক'রে আসে—যা দু'পয়সা আসে তাই দিয়েই ওদের সংসার কোন রকমে চলে।



বারে বারে যাওয়া-আসায় আমাদের সঙ্গে ওদের আলাপ হয়েছিল খুব। এখানে এলেই ওদের সঙ্গে দেখা করতাম, ওরাও আমাদের চড়ুইভাতির সময় এটা-ওটা দিয়ে সাহায্য করত। লছ্‌মী লোক ভাল। কিন্তু প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি, ছোট ছেলের ওপর ওর টান একটু বেশী। কেবল ভূষণ আর ভূষণ—ভূষণ ছাড়া আর কোন ছেলেমেয়ের কথা ওর মুখে শোনা যেত না। একদিনের কথা বলছি—সেদিন ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে গেলাম। ওরা কেউ কাছে না থাকায় লছ্‌মী খাবারটা ঢেকে রেখে দিল। বিকেলের দিকে আসবার সময় ভূষণদের সঙ্গে দেখা হ'তে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করায় দেখলাম, ওরা ও-সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কিন্তু ভূষণের হাবভাব দেখে আমাদের বুঝতে দেরী হ'ল না সবই ওর পেটে গেছে। এ-ছাড়া, আর সবাই দেখতাম বাগানের কাজে মাকে সাহায্য করত—কেবল ভূষণ ঠায় বসে বসে কাটাত। লছ্‌মী কক্ষণো ওকে দিয়ে কোন মেহনতের কাজ করাত না, কিন্তু ভাগের সময় ব্যবস্থা ছিল অন্য রকম। যে কমলা অন্য কারো ছোঁয়া বারণ ছিল, সেই কমলাও লছ্‌মী লুকিয়ে লুকিয়ে দু'-একটি ভূষণকে দিত—এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ছেলেটার মাথা এইভাবে খাচ্ছে, ভবিষ্যতে যখন কেঁদে কাটাতে হবে তখন বুঝবে আহ্লাদ দেওয়ার কি সুখ!

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, লছ্‌মীও বুড়ো হয়েছে। কিন্তু ওদের স্বভাব বদলায় নি। যত বার গিয়েছি—সেই একই ভাব দেখেছি। লছ্‌মীর কাজের অন্ত নেই—এক মুহূর্ত্ত তার বিশ্রাম নেই। আর বুড়ো ছেলে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছে। বুড়ো মা ঝুড়ি মাথায় করে রোদে পুড়ে বাজারে যাচ্ছে; কেন, এ কাজটা তো ও অনায়াসে করতে পারে! করবেই বা কেন? যেমন ছেলে বানিয়েছে, তেমনি কর্ম্মভোগ।

তবু বুড়ীর মুখে এতটুকু ক্লান্তি নেই। ছেলের সঙ্গে কথা বলবার সময় ওর মুখ হাসিতে ভরে উঠত। কাজের সময় ভূষণ কাছে থাকলে ও আর কিছু চায় না। এই বয়সে এত যে খাটুনি, সে তো ওরই মুখ চেয়ে।

আমরা অনেক সময় ভেবেছি, এতটা আদর দেওয়া কি ভাল হচ্ছে? বুড়ীর অদৃষ্টে কি আছে ভেবে আমাদের ভয় হ'ত। ছেলের 'পর মায়ের ভালবাসা হয়তো এ রকমই হয়। কিন্তু তাই বলে কি ছেলে ছেলে করে ওরকম অস্থির হতে আছে? কে জানে, ঐ ছেলেই হয় তো একদিন ওর সর্ব্বনাশ করবে।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। আমরা ওদের কথা এক রকম ভুলেই গেছি; কেই বা আর কুলী-মজুরদের কথা নিয়ে অত মাথা ঘামায়? সেবার শীতকালে একবার কোন কাজে ওদিকে যেতে হয়েছিল। ফেরবার পথে ভাবলাম, ভূষণদের সাথে একবার দেখা করে যাই। কত দিন দেখা হয় না ওদের সাথে—ওরা সব কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে? বুড়ী

হয়তো এতদিন আর বেঁচে নেই। আস্তে আস্তে সেই রাস্তা ধরে রওনা হলাম। যদিও সে রাস্তাটা আজ আর ছোট নেই—মোটর-বাস্ চলাচলের বড় রাস্তা হয়েছে; দু'ধার দোকান-পাটে ভর্ত্তি।

ভূষণদের কুঁড়ে-ঘরখানি কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। অবাক্ হলাম লছ্‌মীকে দেখে। সুদীর্ঘ বারো বছর পর এখানে এসে আজও ওকে ঠিক সেই অবস্থায় দেখব, তা' স্বপ্নেও ভাবি নি। দেখলাম, বুড়ী উপুড় হয়ে বাগানে কাজ করছে। তবে হ্যাঁ, চেহারা দেখে ওকে চেনা যায় না—বার্দ্ধক্যে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে। মুখটুক ভেঙ্গে চোয়ালটা সামনের দিকে বেরিয়েছে। ও-ভাবে ওকে কাজ করতে না দেখলে চিনতেই পারতাম না। আমাকে দেখে অবিশ্যি ও চিনতে পারেনি—চোখ-কান দুই-ই গেছে বুড়ীর। চীৎকার করে আমার পরিচয় দিতেই আমার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে, "কে, দীনেন বুঝি? ভাল আছ তো? কতদিন পর তোমার সাথে দেখা হ'ল!"

তারপর একথা ওকথার পর ওর তৈরী নতুন শাকসব্জীর বাগান, সেই পুরানো কমলা-বাগান—এসব আমাকে বেশ উৎসাহ করে দেখাল। তারপর ওর ঘরে গিয়ে বসলাম। ঘরখানি ঠিক আগের মতই আছে; পাশাপাশি দুটো খাটে দু'খানা বিছানা বেশ পরিপাটি করে পাতা রয়েছে। একখানা লছ্‌মীর, আর একখানা তার ছেলে ভূষণের বোধ হয়। এক কোণে জলচৌকির ওপর কি যেন ঢাকা রয়েছে।

আমাকে বসতে বলে লছ্‌মী একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে রইল। আমার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বল্‌ল, "ভাগ্যিস, এ সময় এসেছ, ও আর একটু পরেই আসবে—শেষ বাসেই ও আসে।"

"কে, ভূষণ?"

"হ্যাঁ, ও রাত ন'টার আগে কোন দিন ফেরে না।" আমি ওর মেয়েদের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তারা সব কোথায় আছে? লছ্‌মী কিন্তু সে-কথায় কোন কান দিল না। আবার ভূষণের কথা বলতে আরম্ভ করল। আর সহ্য করতে পারলাম না, তক্ষুণি উঠে দাঁড়ালাম। ছেলের 'পর সেই পক্ষপাতিত্ব এখনো যায় নি, দেখছি।

বের হবার সময় জলচৌকির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম, "ঐ বুঝি ভূষণের খাবার ঢাকা রয়েছে?"

"হ্যাঁ, ও যা ভালবাসে আমি তাই ওর জন্য তৈরী করে রাখি।"

এই বলেই ঢাকনাটা সরিয়ে দিল, চেয়ে দেখলাম, অনেক কিছু সাজানো রয়েছে থালে; নানা রকমের পিঠে, ফল, দুধ ইত্যাদি। বুঝলাম, পৌষপার্ব্বণ উপলক্ষ্যে বোধ হয় শ্রীমানের জন্য



বানান হয়েছে। বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। ঘরের চেহারা ও খাবারের আয়োজন দেখে মনে হ'ল, ওদের অবস্থা ফিরেছে—ভূষণ বোধ হয় ভাল চাকরী করে। আসবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাল কথা, ও আজকাল কি কাজ করে?"

"ও এখনি আসবে, যা ভালবাসে সবই বানিয়েছি, ও নিশ্চয় আসবে।"

ধুত্তোরি' ছাই, ভাল লাগে না। বেরিয়ে চলে এলাম। রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে মনে হ'ল, 'ধন্যি বুড়ী! এখনো তেমনি কোলের খোকাটি করে আগলে রেখেছে। তবু ওর ভালবাসার প্রশংসা না করে পারলাম না। একবার জানতে ইচ্ছা হ'ল, ভূষণ কি চাকরী করে, কেমন হয়েছে আজকাল। ...এই সব ভাবতে ভাবতে আসছি; সামনে এক চায়ের দোকান ছিল—সেখানে গিয়ে বসলাম। কথায় কথায় দোকানের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, ভূষণ আজকাল কি করে বলতে পার?"

"ভূষণ বলে কাউকে এখানে চিনি না তো!"

"তুমি এখানে কত দিন আছ?"

"তা প্রায় বছর ছয়েক হবে।"

কুঁড়ে-ঘরের দিকে দেখিয়ে বললাম, "ওখানকার লছ্‌মীকে চেন?"

"খুব চিনি। ও তো রোজ রাত্রে বাস্-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে বসে থাকে।"

তারপর লোকটি ওদের সম্বন্ধে যা জানে আমাকে বল্‌ল। কয়েক বছর আগে ভূষণ কাজের চেষ্টায় বিদেশে বের হয়। প্রথমে নাকি কাছেই কি একটা কাজ করত। তখন ও প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই ওর আসা-যাওয়া কমতে লাগ্‌ল। শেষের দিকে বছরে একবারের বেশী ওর দেখা পাওয়া যেত না। একটা জিনিষ দেখেছি, ও সব সময়েই রাত্তিরের শেষ বাসে আসত। লছ্‌মীও ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে এসে ওর জন্য অপেক্ষা করত। তারপর প্রায় ছ' বছর কেটে গেছে, কিন্তু ওর কোন খোঁজ নেই। ও যে কি কাজ করত কেউই ঠিক করে বলতে পারে নি। কেউ বলে কলকাতায় পানের দোকান দিয়ে বসেছিল, কেউ বলে জেলে গেছে। অনেকে আবার সন্দেহ করে, পালিয়ে যুদ্ধে গেছে; বেঁচে আছে কি না কে জানে? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে—এদিক্ ওদিক সবাই ছড়িয়ে পড়েছে। যাই হোক্, লছ্‌মী কিন্তু রোজই রাত্তিরে শেষ বাসের অপেক্ষায় বসে থাকে। শীত-গ্রীষ্ম, রোদ্দুর-বৃষ্টি—কোন দিনও বাদ যায় না। এখনও ও কমলার ঝুড়ি মাথায় করে বাজারে যায়; কমলা বিক্রী করে যা পায় তাতে হাত দেয় না—জমিয়ে রেখে দেয়। ওর নিজের পেট চলে বাগানের শাকসব্জী বিক্রী করে। এখনো কোন জিনিস কিনবার সময় বলে, "ভূষণ আমার এটা বড় ভালবাসে, ওর জন্যই কিনছি।" এই পর্য্যন্ত বলে লোকটি থামল।

আমার চোখের ওপর থেকে একটা পরদা সরে গেল। সমস্ত পৃথিবীর চেহারাটা বদলে গেল। অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি, অনেক উঁচু মনের খবর রাখি; কিন্তু লছ্মীর কাছে তাদের সবাইকে অতি ছোট, অতি খেলো বলে মনে হ'ল। নব্বুই বছরের ন্যুব্জদেহ বুড়ী—তার নিরুদ্দিষ্ট ছেলের আশায় অন্ধকারে পথের পানে চেয়ে থাকে; সেই আশায় বুক বেঁধেই এখনো সঞ্চয় করে যাচ্ছে, সেই বিশ্বাসটুকু সম্বল করে আজও সে কমলা, শাকসব্জীর চাষ কুরে, এখনো রোদ্দুর-বৃষ্টি মাথায় করে বাজারে গিয়ে দু' পয়সা ঘরে আনছে। একদিন নয়, দু দিন নয়, বছরের পর বছর কাটছে এই ভাবে। সামনে আমার ভেসে উঠল ভূষণের জন্য পরিপাটী করে সাজানো সেই খাবারের থালা, সেই বিছানা! লছ্মীর ভূষণ কি ওর মাকে ছেড়ে থাকতে পারে? আসবে, ও নিশ্চয় আসবে।

ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে গেল। তখন বলেছিলাম, এত আদরের পরিণামে কেঁদে কাটাতে হবে একদিন। কিন্তু তখন কি জানতাম যে মানুষের কান্নাও কখনো এত সুন্দর হতে পারে! *

---

## পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচে যাঁদের নাম দেওয়া হ'ল মানব-সভ্যতার জন্য তাঁদের মধ্যে কার প্রয়োজন কার পরে, পর পর উল্লেখ করতে হবে। সব চেয়ে আগে যাঁর প্রয়োজন তাঁর নামই প্রথম দিতে হবে, তার পর ২য়, ৩য় এই ভাবে। সকলের ভোট নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি যাঁর উত্তর হবে তিনিই ১ম পুরস্কার পাবেন। তার পর ২য় ও ৩য় এই ভাবে সবশুদ্ধ ৩টি পুরস্কার দেওয়া হবে। কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকারাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে প্রেরকের নাম, **নিজের** গ্রাহক নং ও ঠিকানা দিতে হবে। উত্তর ২০শে কার্ত্তিকের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

নামগুলি এই :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কবি | বৈজ্ঞানিক | শিল্পী | রাজনীতিক | ব্যবসায়ী | অভিযাত্রিক |
| সাহিত্যিক | চিকিৎসক | সাংবাদিক | ধর্ম্মোপদেষ্টা | ঐতিহাসিক | যোদ্ধা |

---

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে

এই সেরেছে! দোর আগ্‌লে আছেন বাবা ব'সে,
ঢুকতে গেলেই কাণটি ধরে গাঁট্টা দেবেন ক'ষে।

পাইপ্ বেয়ে শোবার ঘরে বরং উঠে যাই,
পেয়াদা হয়ে ওৎটি পেতে কেউ তো সেথা নাই।

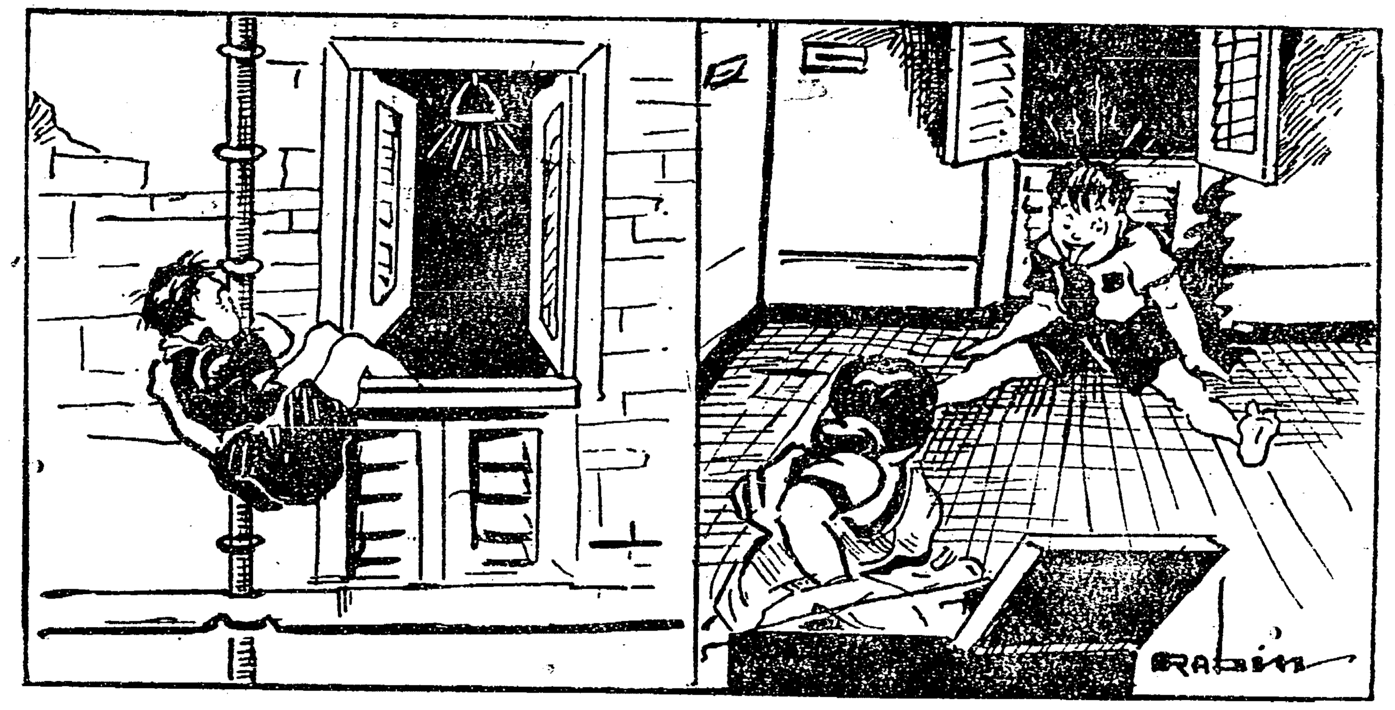

ব্যস, এইবারেতে গেছি বেঁচে,
ধরবে এবার কে?
শুধু আস্তে ক'রে একটি লাফ,—
কেমন মজা রে!

য়্যাঁ? মা! হেথায় তোমার এমন সময়
থাকার কথা নয়,
হায়, যেখানটাতে বাঘের ভয়
সন্ধ্যে সেথাই হয়!

# অনেক—অনেক দূরে

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"আমি অনেক দূরে চলে যেতে চাই, অনেক—অনেক দূরে। পৃথিবীর এই অশান্তি আমাকে পাগল করে তুলেছে—' মৃত্যুর ঠিক আগে তরুণ কবি ফাল্গুনী রায় আমাদের কাছে বার বার এই কথা বলেছিল। অবশেষে তার ইচ্ছেই পূর্ণ হ'ল। অনেক—অনেক দূরেই সে চলে গেল!

৺ফাল্গুনী রায়

ভাদ্রের রামধনুতেই সেই ছোট্ট অথচ নিদারুণ খবরটা তোমরা পেয়েছ। 'রামধনু'তে কবি ফাল্গুনী রায়ের অনেক কবিতা বেরিয়েছিল। শুধু লেখায় নয়, মনে-প্রাণেও সে ছিল সত্যিকারের কবি। কোন রকম সংকীর্ণতা তার মধ্যে ছিল না। নিজের কবিতা প্রকাশ করবার জন্যও তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, আমরাই জোর করে তার লেখা নানা জায়গায় পাঠিয়ে দিতাম।

আজ বন্ধু ফাল্গুনীর মৃত্যু-সংবাদ লিখতে গিয়ে বার বার চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠছে। শুধু মনে পড়ছে তার সেই সরল, অমায়িক প্রাণখোলা হাসি, তার সেই শিশুর মত স্বভাবের কথা।

কিন্তু সত্যিই সে কি আমাদের মাঝে নেই?

"নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!"

---

# পূজার ম্যাজিক

শ্রীদেবকুমার ঘোষাল (বালক যাদুকর)

## গ্লাশ উড়ানো

অনেক দিন তোমাদের কাছে আসিতে পারি নাই। আজ একটা নতুন ম্যাজিক্ শেখান যাক্। একটি রুমাল, একটি গ্লাশ ও একটি টুপি চাই। এক হাতে রুমাল দিয়া গ্লাশটি ঢাকিয়া অপর হাতে টুপিটি ধরিয়া দর্শকদের দেখাও যে টুপিতে কোন কৌশল নাই। এইবার টুপিটি টেবিলের উপর রাখিয়া বল, 'এই দেখ এখন আমার হাতে শুধু গ্লাশ রইল।' তারপর রুমালটি ধরিয়া নাড়া দাও, সবাই অবাক্ হইয়া দেখিবে, রুমালের নীচে তো গ্লাশ নাই, কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! এইবার টুপিটি তুলিয়া দেখাও, গ্লাশ টুপির ভিতর গিয়া হাজির হইয়াছে!

কৌশলটি শিখাইয়া দেই। কৌশল রুমালে। খেলা দেখাইবার আগে গ্লাশের মুখের মাপে একটি সরু চাকা লইয়া রুমালের মাঝখানে বসাইয়া খুব সরু সূতা দিয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে। প্রথম বার টুপি ও গ্লাশ দেখাইবার সময় চাকাটি গ্লাশের ঠিক মুখে বসাইয়া, চাকা সহ গ্লাশটি তুলিবে। চারদিকে রুমাল ঝুলিয়া পড়িয়া গ্লাশটিকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিবে। তারপর টেবিলে টুপি রাখিবার সময় কৌশলে অলক্ষ্যে গ্লাশটিকেও টুপির মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এইবার চাকার উপর হাত দিয়া ঠিক গ্লাশ ধরার মত করিয়া ধরিয়া রুমালটি তুলিয়া দেখাইলে লোকে বুঝিতে পারিবে না যে ভিতরে গ্লাশ নাই, চাকাটাকেই গ্লাশের মুখ বলিয়া ভুল করিবে। রুমালের বাকী অংশ ঝুলিয়া থাকায় মনে হইবে গ্লাশটি বুঝি রুমালে ঢাকা পড়িয়াছে। এইবার রুমাল ঝাড়া দিলেই দেখা যাইবে তার ভিতরের গ্লাশ উড়িয়া গিয়াছে; তারপর টুপির ভিতর হইতে আসল গ্লাশ বাহির করা তো কিছুই নয়। রুমালটি কিন্তু, খবর্দ্দার, কাহারও হাতে দিও না।

কৌশলে বক্তৃতা সহ দেখাইতে পারিলে এই ম্যাজিকটি দেখাইয়া যথেষ্ট বাহবা পাওয়া যাইতে পারে।

---

## বৃষ্টির হিসাব

একজন পণ্ডিত হিসেব করে বলেছেন পৃথিবীতে প্রত্যহ যত বৃষ্টি হয় তা যদি কেউ একটা ট্যাঙ্কে জমা ক'রে রাখতে চায় তবে তার জন্য সওয়া লক্ষ মাইল লম্বা, সওয়া লক্ষ মাইল চওড়া এবং সওয়া লক্ষ মাইল উঁচু একটা ট্যাঙ্কের প্রয়োজন হবে। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় আসামের চেরা-পুঞ্জী অঞ্চলে—বছরে প্রায় ৫০০ ইঞ্চি। ২।১ বার ৮০০ ইঞ্চিও হয়েছে। সব চাইতে কম বৃষ্টি হয় দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম দিকটায়। ১৯১৭ থেকে ১৯৩৪ সন—এই ১৭ বছরের মধ্যে সেখানে মাত্র তিন বার বৃষ্টি হয়েছিল।

## মেরুর দেশে সবই অদ্ভুত

মেরুর দেশের সবই অদ্ভুত। অদ্ভুত যেমন সেখানকার আবহাওয়া, তেমনি অদ্ভুত সেখানকার হালচাল। তোমরা সবাই জান, আমাদের যে সব অসুখবিসুখ হয় তার সবই হয় নানা রকম রোগ-জীবাণুর দৌলতে। খুব ঠাণ্ডায় এই সব জীবাণু বাঁচতে পারে না—কিংবা তাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা লোপ পায়। কাজেই মেরুর দেশে অসুখবিসুখের উৎপাত খুব কম। এমন কি অত শীতেও নাকি সেখানে তেমন শর্দ্দী-কাসি হবার আশঙ্কা নেই। কারণ শর্দ্দী-কাসি যে জীবাণুর জন্য হয় তারাই সেখানে শীতে কাবু হয়ে পড়ে। খুব গুরুতর রকম ঘা বা ক্ষত—যা আমাদের গরম দেশে সুচিকিৎসা ক'রেও সারাতে বহুদিন লাগ্‌ত, সে দেশে দু'দিনে সেরে গেছে এ রকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

## রাজত্বের ইতিহাস

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ রাজা অতি দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করেছেন জান?



ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই-ই বোধ হয় এদিক্ দিয়ে সকলের ওপর টেক্কা মেরে গেছেন। তিনি রাজত্ব করেছিলেন ৭২ বছর, ১৬৪৩ খৃঃ থেকে ১৭১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ৬৪ বছর রাজ্য শাসন করেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রায় হাজার খানেক বছর আগে অমোঘবর্ষ নামে এক রাজার ৬২ বছর রাজত্ব করবার সৌভাগ্য হয়েছিল—দক্ষিণ ভারতে।

আমার ছোট বন্ধুরা,

প্রতি বারের মত পূজোর 'রামধনু' হাতে তোমাদের কাছে হাজির হ'লাম। সমস্ত পৃথিবী যুড়ে চলেছে রণদানবের তাণ্ডব নৃত্য, নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর কই? চারিদিকে অশান্তি—জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষগুলি পর্য্যন্ত শুধু দুর্ম্মূল্য নয়, দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় তোমাদের মনের মত ক'রে রামধনুকে সাজিয়ে তোলা যে কি রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার তা তো বুঝতেই পার। তবু জানি, রামধনুকে তোমরা আজও তেমনি স্নেহ কর; তোমাদের সেই স্নেহদৃষ্টির আড়ালেই তার সমস্ত ত্রুটী ঢাকা পড়ে যাবে। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জেন।

লেখনী-বন্ধু বিভাগটি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে কেউ কেউ আবার পত্র দিচ্ছেন। এ বিষয়ে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পরিকল্পনা মত আমরা অপেক্ষা করছি। আশানুরূপ নাম এখনও পাওয়া যায় নি। সে রকম হ'লেই পত্র-লেখকদের জানাবার ব্যবস্থা করা হবে।

বিশেষ বিশেষ লেখকের লেখা বেশী ক'রে দেবার জন্য কেউ কেউ লিখেছেন। যেমন অনুপম রায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অলকা দেবী, উৎপলা সরকার প্রভৃতি। এঁদের এ অনুরোধ আমরা সাধ্যমত রাখবার চেষ্টা করব; তবে অবশ্য এটা মনে রাখতে হবে যে কোন লেখকেরই ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, এবং উপরোধের ফলে জোর করে লিখতে গেলে লেখার মাধুর্য্য ব্যাহত হ'তে পারে। অনেক শক্তিশালী লেখকও পাঠকের ফরমাসে অতিমাত্রায় সাহিত্য-

সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়েছেন এ রকম দৃষ্টান্ত তো অহরহঃই দেখছ।

আমরা যে সময় সময় একটু নতুন নতুন ধরণের চিঠি পাই তা তোমরা জান। আর একবার এই রকম চিঠির কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছিলাম। এবারেও সেই রকম কিছু কিছু করা গেল। বলা বাহুল্য লেখকের নাম প্রকাশ করা হ'ল না। —রাঃ সঃ

( ১ ) রামধনুতে রচনা প্রকাশিত না হওয়ায়ঃ—"আপনার ব্যবহারে দিনের পর দিন আমি মর্ম্মাহত হইয়া চলিয়াছি। আমি প্রতি মাসে অন্ততঃ ৬০।৭০টা পদ্য লিখিতে পারি—তাহার অর্দ্ধেকই আপনার পত্রিকায় পাঠাই। অথচ তাঁহার কোনটাই নাকি আপনার মনঃপূত হইল না! পত্র দিলে আপনার কর্ম্মচারীদের সেই এক বুলি—"রামধনুর উপযোগী হয় নাই, অনুগ্রহ করিয়া টিকেট পাঠাইবেন না।" উপযোগী না হইলে উপযোগী করিয়া লইবার জন্যই তো আপনি আছেন। না হইলে সম্পাদকের কর্ম্মটা কি? যে মুকুল ফুটবার জন্য এমন আকুলি-বিকুলি করছে আপনার সামান্য একটু উৎসাহ-বারি সিঞ্চনের অভাবে তা অকালে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। এটা কি আপনার ন্যায় মহত্তর ব্যক্তির উপযুক্ত? আপনি সুবিবেচক, সুলেখক ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিশুমাসিকের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, তাই এত কথা লিখিলাম।..."

( ২ ) অন্য পত্রিকা লেখকের রচনা প্রকাশ না করায়ঃ—"পুরাকালে রামচন্দ্র গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়া একদিন রাক্ষসকুল নিধনিত করিয়া গিয়াছেন। আপনার হাতেও ভগবৎ-কৃপায় নূতন যুগের রামধনু শোভা পাইতেছে। একবার টঙ্কার দিন...এই সব...ভূঁইফোঁড় পুত্রিকাগুলির সম্পাদককুল সবংশে উচ্ছন্ন যাক্। আমরা সুগ্রীবের ন্যায় আপনার সহায় হইব।..."

( ৩ ) ব্যক্তিগত—

( ক ) দেব, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার নমস্য। আমাকে একখানি আশীর্ব্বাদলিপি প্রেরণ করিবেন না কি? আমার মন বলিতেছে আপনার আশীর্ব্বাদ পাইলে আমি এবার পরীক্ষায় পাশ করিব। শুক্রবার আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ, অতএব দয়া করিবেন...পুঃ, এই সঙ্গে ২টি কবিতা পাঠাইলাম. ছাপাইবেন।..."

( খ ) রামধনুতে তো কত লেখকের ছবি দেন আপনার নিজের ছবি কেন দেন না? আমাদের যে দেখতে ভী-ষণ ইচ্ছা করে। আচ্ছা, আপনি কি দাদুর মত বুড়ো? অনেক সম্পাদক তো দাড়ি রাখেন, আপনারও কি তেমনি আছে? হাসবেন না, আমাদের মধ্যে এ নিয়ে প্রায়ই তর্ক হয় তাই জানতে ইচ্ছা করে। বাবা বলেন, আপনি হয়তো তেমন বুড়ো ন'ন। তাই কি? লিখবেন, লিখবেন, লিখবেন।..."

---

## শিশুসাহিত্য-সংবাদ

**বার্ষিক শিশুসাথী,** ১৩৪৯—সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ধর। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও ৩৮ জনসন রোড, ঢাকা। মূল্য ১৷৵০



প্রতি বারের মত এবারেও সারা বাংলার ছোটদের কামনার সামগ্রী এই সুন্দর বার্ষিকীখানি যথা সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিকদের লেখায় এর প্রতিটি পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ। যুদ্ধের দরুণ নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এমন একখানি বই প্রকাশ করে প্রকাশক দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নয়নলোভন প্রচ্ছদপট এবং ভিতরের ছবিগুলি বইখানির একটি বড় আকর্ষণ। এই দুর্দ্দিনেও এমন একখানি বই ঘরে ঘরে হাসি ফোটাতে পারবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

---

সম্প্রতি বঙ্গজননী তাঁর কয়েকটি সুসন্তানকে হারিয়েছেন। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম তোমরা সবাই জান। সম্প্রতি ৭০ বছর বয়সে এঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র, দেশপ্রেমিক ও বড় দরের সলিসিটর ছিলেন না—বাংলা ভাষাও তাঁর কাছে চিরদিন ঋণী থাকবে। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত দার্শনিক প্রবন্ধগুলির কথাই বলছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছিল। বাঙ্গালীর গর্ব্বের সামগ্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তিনিও তাঁদেরই একজন। শেষ জীবনেও তিনি এই পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রবীণ দেশকর্ম্মী হরদয়াল নাগ মহাশয়ও আর নেই। দেশের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মৃত্যুর ৫।৬ দিন আগে তাঁর বয়স ৯০ বছর পূর্ণ হওয়ায় দেশবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, কে জানত এত শীঘ্র তিনি চলে যাবেন!

স্যর্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সুপরিচিত। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির পদে তিনি অনেক দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু সে জন্যই তাঁর নাম নয়. তাঁর নাম আরও বেশী সাহিত্যামোদী হিসাবে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তিনি ছিলেন প্রাণ-শক্তি। সম্প্রতি তাঁকেও আমরা হারিয়েছি।

নাট্যকার ও নট যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। কি সুন্দর অভিনয় তিনি করতেন! বিশেষ করে হাস্যরসের অভিনয়। নাট্যকার হিসাবে

তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ী অভিনীত বিখ্যাত 'সীতা' নাটকখানিও ছিল তাঁরই লেখা। ইনিও সম্প্রতি মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ইহলোক ছেড়ে গেছেন।

* * *

ফুটবলে আই-এফ্-এ শীল্ডের পর ট্রেডস্ কাপ্, কুচবিহার কাপ্, লেডি হার্ডিঞ্জ শীল্ড্ ইত্যাদি প্রতিযোগিতাও শেষ হয়েছে। ট্রেড্স কাপে মহালক্ষ্মী দল ৪-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত ক'রে কাপ্ পেয়েছে। ইয়ংগার কাপের ফাইনালেও এই দল ২-১ গোলে রয়াল এয়ার ফোর্সকে হারিয়েছে। কুচবিহার কাপ্ পেয়েছে ইষ্টবেঙ্গল দল—মোহনবাগানকে ১ গোলে হারিয়ে; আর লেডি হার্ডিঞ্জ শীল্ড্ পেয়েছে মোহনবাগান দল ৩-১ গোলে ইষ্ট-বেঙ্গল দলকে হারিয়ে। বোম্বাইএ রোভার্স কাপ্ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। বাংলা থেকে বাটা কোম্পানীর এক শক্তিশালী দল (এ দলে কলকাতার প্রথম বিভাগের অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় আছেন) এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে এবং ফাইনালে উঠেছে।

* * *

লাটভিয়ার বার্নহার্ড ৬ মিনিট ২১½ সেকেণ্ডে ১ মাইল হেঁটেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের উডার্সন্ ৪ মিনিট ৬¾ সেকেণ্ডে এক মাইল দৌড়েছিলেন। বৈমানিক ওয়েণ্ডেল্ ৭·৬৭ সেকেণ্ডে এক মাইল্ উড়ে গিয়েছিলেন (এরোপ্লেনে)। ইংল্যাণ্ডের জন্ কব্ ৯·৯ সেকেণ্ডে এক মাইল মোটর হাঁকিয়ে পার হয়েছিলেন।

* * *

পি.ই.এন্ (P.E.N.) কা'কে বলে জান? 'পি' অর্থাৎ 'পোয়েট্স্ ও প্লেরাইট্স্' (কবি ও নাট্যকাররা), 'ই' অর্থাৎ 'এডিটর্স ও এসেইষ্ট্স্' (পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রবন্ধ-লেখকরা) এবং 'এন্' অর্থাৎ 'নভেলিষ্ট্স্' (ঔপন্যাসিকরা), —সংক্ষেপে হ'ল পি. ই. এন্। এই সব চিন্তাশীল লোকদের একটি আন্তর্জ্জাতিক মিলনী গড়বার উদ্দেশ্যে এই সভার সৃষ্টি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এর শাখা বা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এখন এর সভাপতি হচ্ছেন সুবিখ্যাত লেখক এইচ্. জি্. ওয়েল্স্। পৃথিবীর বহু নাম-করা সাহিত্যিকই এর সভ্য আছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে এর সহ-সভাপতি ছিলেন।

* * *

ইংরেজীতে 'ও. কে.' কথাটি আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায়। 'সব ঠিক আছে' এই অর্থে ওটি ব্যবহৃত হয়। কথাটার উৎপত্তি হ'ল কেমন ক'রে জান? আসলে কথাটা হচ্ছে 'অল্ কারেক্ট্' (All Correct)। সেই হিসাবে 'এ. সি.' হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু চলতি কথায় তাড়াতাড়িতে 'অল কারেক্ট্' হয়ে পড়ল 'ওল্ ক্রেকট্' (Oll Krect)। তাই থেকে সংক্ষিপ্ত 'ও. কে.' দাঁড়িয়েছে।

* * *

ষ্টালিনগ্রাড্ সহরের উপকণ্ঠে এবং রাস্তায় রাস্তায় জার্ম্মান্দের সাথে রুশদের ভীষণতম যুদ্ধ চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম যুদ্ধের বোধ হয় তুলনা নেই। 'নগর রক্ষার জন্য রুশদের এই বীরত্ব-কাহিনী লোকে চিরকাল মনে রাখবে। জার্ম্মান্রাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যে ভাবে হোক্—যত শক্তিক্ষয় ক'রেই হোক্, ষ্টালিন্গ্রাড



দখল করতেই হবে। কোন একটি সহরের ভিতরে ঢুকেও এ রকম প্রবল বাধা তারা কখনও পায় নি। আজ যে রাস্তা—যে গৃহ অধিকার করছে, কালই আবার হয়তো তা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে! ওদিকে ককেশাস্ রণাঙ্গনেও তাদের আক্রমণ চলছে।

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে গোলমাল চলছে তার কথা তো তোমরা জানই।

---

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

শীলার বয়স ১২ বছর, ইলার ২১ বছর এবং নীলার ৯ বছর।

## উত্তরদাতাদের নাম

মঞ্জু ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); অঞ্জলি মুখার্জ্জি (ভবানীপুর); শক্তি, পাঁচু, মহাদেব, শ্রীমন্ত, পুলকিত, জহর (সালিখা); টুকু, খুসী, দাদা (কটক); সত্যপ্রভাত ও সত্যপ্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর); নমিতা, রুবী, বেবী, শান্তি, ছবি ও সিপ্রা (ক্যানিং টাউন); প্রতিভা ও কমলরাণী (বর্দ্ধমান); রত্না, স্বপ্না ও জয়ন্ত রায় (বাঁকীপুর); নির্ম্মাল্য মুখোপাধ্যায় ও পরেশচন্দ্র দেবনাথ (চাঁদপুর); শঙ্কর, চিত্রা, রমা, শীলা (কানপুর); বিজলী ঘোষ (চন্দ্রভাগ); মীরা, বিলু, মণ্টু, মিনু, পাইলট দাদা, শান্তি চট্টোপাধ্যায় (খড়দহ); বীরেশ্বর লাহিড়ী; (পূর্ব্বধলা); কালিদাস পাল (বালুভরা); হাসিরাণী ঘোষ (বগুড়া); সুশীল কুমার দাশগুপ্ত (কলিকাতা); মোহনলাল (মণিরাম) জালান ও সুপ্রকাশচন্দ্র (সুজানগর); অজয়, রণজিৎ, মণীন্দ্র, জগৎ, অমূল্য, রামমোহন (মহিমাগঞ্জ); ইন্দিরা ও সরোজ (কলিকাতা); নীলিমারাণী ও নীরেন্দ্রনাথ সিংহ (ডুবরাজপুর); গোপাল, শ্যামল, বিশ্বনাথ. বিশ্বময়, বিশ্বরূপ, বিশ্বজিৎ (কলিকাতা); সৌমেন্দ্রলাল মুখার্জ্জি, নোনা, হেনা, নারু, নানু, মাণিক, ছন্দা (গৌরীপুর); রামানন্দ সাহিত্য সদনের সভ্যবৃন্দ (রামচন্দ্রপুর); সুখু, অনিল, দীপু, অপু, বেবী, রেখা, মমতা (জামসেদপুর); নির্ম্মলেন্দুকুমার মৈত্র, গোপাল, গদাই, কেষ্ট, সুশীল, সুধী, নাদু (পাটনা); শীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ ও প্রভাত (বাঁকুড়া); নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরীন্দ্র, কনকেন্দ্র, গৌরী, শোভা ও মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি (নিমপুরা); শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ (রামচন্দ্রপুর); যূথিকা, লতিকা, খোকন চন্দ্র (রাজামহল—চন্দ্রগিরি); বিষ্ণুপদ স্মৃতি-পাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ (শালিখা); রামপ্রসাদ গাঙ্গুলী, আলোকনাথ চ্যাটার্জ্জী, অরুণ, ধূলা, খুকু, গীতা (হাওড়া); পঞ্চানন দাস ও সুধীর মুখোপাধ্যায় (ত্রিবেণী); শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য,

বাবু, বুবুল, বুকু, গীতা ( মথুরা ) ; অমলেন্দু মিত্র ( কলিকাতা ) ; সুনীতি, গীতা, দীপালি, শ্যামলকুমার, সন্ধ্যা মুখার্জ্জি, রমণী দা ; বনতোষ সেন, নির্ম্মল, খোকন, খোকন, তাতা, বুলাই, বুলবুলি, কুট্টী ( বেলতলী ) ; প্রসিত, প্রদ্যোত বাগচী ( বালুভরা ) ; জ্যোতির্ম্ময় গুপ্ত ও বাণী গুপ্তা ( কলিকাতা ) ; জ্ঞানময়, পতু, শম্ভু, পুনু, রণু, রবি, বিশু, দাদু, শুক্লা ( কাঁথি ) ; জাহ্নবী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (কোকডহরা ) ; আর্য্যকুমার মিত্র ( যশোহর ), হরপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ কুশারী ( কুমিল্লা ) ; অশোক, মিনতি দত্ত, সিরাজ, বিবি দত্তগুপ্ত ( বেগমপেট ) ; গৌরী সেন ( শিলচর ) ; সুনীল, সুব্রত, সুপর্ণা ও সুদীপ্ত ( কাশী ) ; দাদা, দিদি, ছোড়দা, বুবু, মা, বাবা, মাষ্টার মশাই ও মঞ্জুশ্রী ( হারদোই ) ; রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( মেঘলীবাঁধ ) ।

## নূতন ধাঁধা

ছাপাখানায় একখানা অঙ্কের বই ছাপা হচ্ছে। কম্পোজিটর একটা গুণ অঙ্ক সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল, পরদিন এসে দেখে কোথা থেকে একটা ইঁদুর এসে সমস্ত টাইপ্ ভেঙ্গেচুরে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে, এবং সেই সঙ্গে যা দেখে কম্পোজ করা হয়েছিল সেই পাণ্ডুলিপিটাও কেটে ফেলেছে। এখন উপায় ? অঙ্কের অল্প কয়েকটা সংখ্যা ঠিক জায়গায় বসান ছিল ; যেগুলো ছড়িয়ে গেছে তার জায়গায় আমরা একটা করে × চিহ্ন দিয়ে দিলাম। তোমরা হারানো সংখ্যাগুলোকে ঠিক মত বসাতে পারবে ?

```
      ৩××১××১
          ২×১
      -------
      ৩××১××১
    ১××৮××৪×
   ৬××৩××২
  -----------
   ৮×××৯×××১
```


= দারজিলিং চা =

সুবোধ ব্রাদার্স

দারজিলিং : কলিকাতা



ছোটদের অতিবাঞ্ছিত বই

বাহির ও ভিতরের অপরূপ সৌন্দর্য্যে প্রত্যেক বইখানি অনুপম এবং উপহার দিবার উপযুক্ত :

ছেলেদের টিফিন—বীণাপাণি দেবী ১।০
গল্পদাদুর বৈঠক—মণি বন্দ্যোপাধ্যায় ৸০
ভদ্রতা কাকে বলে—বুদ্ধদেব বসু ৸০
ঘুমের আগের গল্প— " ৸০
ঝিলিমিলি—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ।৶০
রঙ্গিন মলাট—আশাপূর্ণা দেবী ৸০
হাফ হলিডে— " ৸০
চীনের পাখী—হেমদা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৷৶০
স্বর্গ হইতে বিদায়—( 'প্যারাডাইস লষ্টে'র অনুবাদ ) ৷৷৶০

বৈজ্ঞানিক আলোচনা

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা— ১৷৷০
বাংলা গদ্যের চার যুগ— ৩৲
মাষ্টার টেলর—উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৷৷০
মোটর বিজ্ঞান—ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত ২৷৷০

শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

সাধনা ও উপদেশ

মহাপুরুষের সাধক-জীবনের বিচিত্র আখ্যান ও অমৃতোপম উপদেশগুলি বিশদভাবে এই বিরাট গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

১৮ খানি চিত্র সহ ৭০০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত

মূল্য—চারি টাকা

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি

মন্ত্র ও বিবরণ সহ পূজার সমস্ত পদ্ধতি এমন সরল ভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে সহজেই নিজে নিজে পূজা করিতে পারিবেন। উত্তম কাগজে ভালভাবে নির্ভুল ছাপা।

মূল্য—দেড় টাকা।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং—প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা



এ বৎসর পূজায় এই কয়খানি শ্রেষ্ঠ বই ছেলেমেয়েদের পড়িতে দিন।

সদ্য প্রকাশিত দুইখানি যুগান্তরকারী পুস্তক
'আধুনিক যুদ্ধ' প্রণেতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহের

নানা কথা

আধুনিক যুগের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এবং বিশ্বের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত মনীষীগণের ধারাবাহিক বিস্তৃত বিবরণ সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী—৸৶০

মহাযুদ্ধের সপ্তরথী

হিটলার, মুসোলিনি, ষ্ট্যালিন, চার্চ্চিল প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিশারদগণের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। —১।০

১। ছেলেদের রাজপুত্তুর ৷৷০
২। কুমীর মামা ৷৷০
৩। আলোর পাহাড় ৷৷০
৪। ভুত না মানুষ ৷৷০
৫। বাঘের পাল্লায় ৷৷০
৬। আলেয়া বা ভৌতিক রহস্য ৸০
৭। জঙ্গলের খবর (বন্দে আলী) ৸০

প্রাপ্তিস্থান—ভারত সাহিত্য ভবন, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

## বিজ্ঞান-বুড়ো

—বিজ্ঞানের গল্প—

প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ১৲

## বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

—বিজ্ঞানের গল্প—

পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি,
সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৷৵০

## আকাশের গল্প

—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—

অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৸১০

## আবিষ্কারের গল্প

—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী
অভিযান-কাহিনী—

পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙীন মলাট—দাম ৷০

## জন্মদিনের উপহার

—সরস, মজাদার গল্পের বই—

চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙীন বাঁধাই মলাট,
চমৎকার ছবি। দাম—৷৴০

## ফুলের মূল্য

বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের"
মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

## ছোটদের উপহারের উপযোগী কয়েকখানা বই

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের
**ইউরোপের আলো** ... ১৲

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
**দিগ্বিজয়ী বীর** ... ৷৷০
**মহাভারতের গল্পগুচ্ছ**
১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ... ৷৷০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
**হালকা হাসির খাতা** ... ৷৷০
**নতুন কিছু** ... ৷৷৵০

শ্রীমাধব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার
**গল্পসল্প** ...৵১০ **ছুটীর গল্প**...৵১০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
**কলকাতার হালচাল** ... ৸৵০
**ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি** ... ৷৷০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
**আজব গল্প**...।০ **অনেক গল্প**...।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
**ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন** ... ৷৷৵০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
**অনুসন্ধানী** (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৷০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
**রং-চং** ... ... ৷৷০

পুরাতন বাঁধান **রামধনু**: ১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট্ ১৷৷০, ৭ম—১৪শ বর্ষ—প্রতি সেট্ ২৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা )



## ৺পূজায় উপহার দিবার বই

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

**যান্ত্রিক আবিষ্কার**—(Stories of Inventions) রঙীন মলাট এবং বহু চিত্র শোভিত হইয়া বাহির হইল। মূল্য—১৲

**জীবন ও সাহিত্য**—সর্ব্বজন প্রশংসিত উচ্চাঙ্গের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী। মূল্য—১৲

**আবিষ্কার যাত্রী**—(Heroes of Exploration) মূল্য—১।০

সুসাহিত্যিক কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের

**হিমালয়ের হিমতীর্থে— ১।০**

৺অমরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

**বাংলার নবরত্ন**—( Nine Gems of Bengal) শ্রীঅপরাজিতা বসু কর্ত্তৃক সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ বাহির হইল। মূল্য—৷৶০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত

**কাশ্মীরের কথা**—বহু চিত্র শোভিত ১৲

শ্রীশিশিরকুমার রাহা প্রণীত

**আচার্য্য শঙ্কর**—( শঙ্করাচার্য্যের জীবন চরিত ) মূল্য—৷৵০

সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা রাধারাণী রায়ের

**রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা**

ভারতের দুইটী বীরাঙ্গনার পবিত্র জীবন কথা।
মূল্য—।০ ইংরাজীতে মূল্য—।০

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

**বাংলার বীর** ... ১১০ **বাংলার বীরাঙ্গনা** ... ৸০

গোল্ডকুইন কোং লিঃ— কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা



বাঙ্গালীর বিরাট উৎসব ৺পূজায় বাঙ্গালার বিরাট পুরুষের জীবনী-ই হইবে শ্রেষ্ঠ উপহার

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
ও
শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত
কৃত

## "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ"

সরল ভাষায় কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের বহুচিত্র-সুশোভিত বিস্তৃত জীবনী ও কাব্য সমালোচনার একত্র সমাবেশ। মূল্য ১।০

ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স

৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা



পূজায় চাই-ই

শ্রীলীলা মজুমদার, এম্.এ প্রণীত

## বদ্যিনাথের বড়ি

অজস্র ছবি অজস্র হাসি
অজস্র মজা
দাম আট আনা

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

## হুকাকাশির গল্প

'পদ্মরাগ', 'ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি গ্রন্থের নায়ক সুবিখ্যাত হুকাকাশির আর কয়েকটি অদ্ভুত রহস্যভেদের কাহিনী,

দাম আট আনা

## —তোমরা নিজেরা পড়বে ও ভাইবোনদের পড়তে দেবে—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক রচিত

ষ্টালিন—॥০ ভরোশিলভ—॥০ মলোটভ—॥০

আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী—১৲

[ বিজ্ঞানে ] সপ্তর্ষি—দশ আনা

তৈমুরলঙ্গের দেশে—বার আনা

সত্যিই যা ঘটেছিল—বার আনা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্ত্তৃক রচিত

মার্কিন জাতির কর্ম্মবীর—১৲

শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্ত্তৃক বিরচিত

ছেলেদের একাঙ্কিকা—১৵০

[ ইহাতে আছে সাতটী পৌরাণিক নারীচরিত্র বর্জ্জিত একাঙ্ক শিশু নাটিকা ]

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত

চার্চ্চিল—॥০ ট্রটস্কী—॥০ লেনিন—॥০

মোসলেম জাতির কর্ম্মবীর—১৲

জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা কথা—১৲

নূতন যুগের নূতন মানুষ—১৵০

রুশ জাতির কর্ম্মবীর—১৲

বিজ্ঞানের আবিষ্কার—১৲

মেবারের বীর তনয়—১৲

মোসলেম জগৎ—১৲

যুগে যুগে—১৲

মজার গল্প—॥০

### —বাংলা ভাষায় জগতের সেরা বই—

হুগোর হান্‌চ্‌ব্যাক অফ নৎরদাম—১।০

শেক্‌স্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডী (গল্প)—১৲

শেক্‌সপীয়ারের কমেডী (গল্প)—১৲

টল্‌স্‌টয়ের ছোটদের গল্প—১।০

লাস্‌ট ডেজ অব পম্পেই—১।০

আংকল টম্‌স কেবিন—১।০

এনডারসেনের গল্প—১৲

ডন্ কুয়িক্‌জোট—১৲

লা' মিজারেব্‌ল—১৲

বেন হুর—১।০

প্রকাশক :—ইউ. এন. ধর এণ্ড কোং ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শারদীয় উৎসবের শ্রেষ্ঠ উপহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

নন্দলাল বসু চিত্রিত

# ছড়ার ছবি

মূল্য কাগজের মলাট ১।।০, বোর্ড বাঁধাই ২৲

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

শ্রীনিকেতন শিল্পভবন
৩৬, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

## সোনার হরিণ

হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট উপন্যাস

২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

## পদ্মরাগ (২য় সংস্করণ)

হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস

রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

## নূতন পুরাণ

একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প

সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৵০

## হাস্য ও রহস্য

একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।

সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ॥৵০

## চা'য়ের ধোঁয়া (২য় সং)

অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

## এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে

( শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে )

বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায়, পাতায় হাসি। দাম ॥৵০

**প্রাপ্তিস্থান** ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড ( ১বি, রসা রোড্, কলিকাতা )


১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড্, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে

Regd. No. C—1641


# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

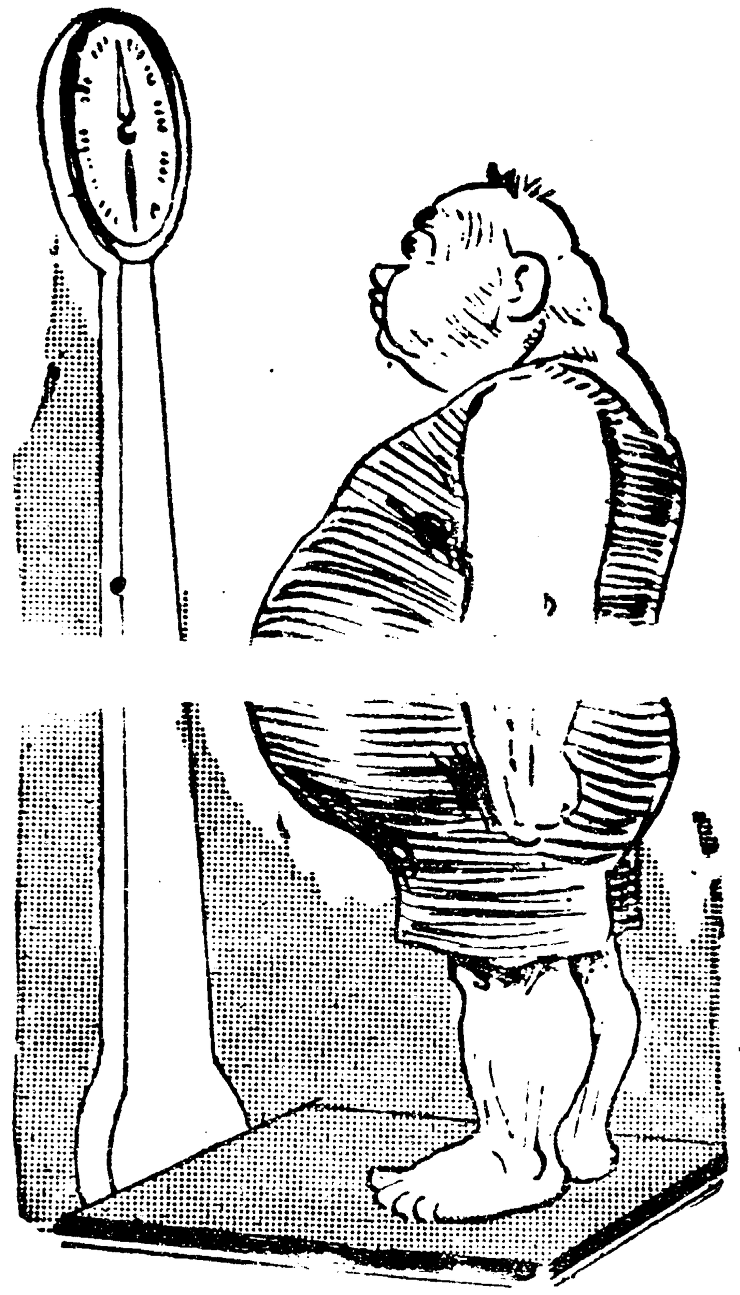

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

**লক্ষ্মীদাস প্রেমজী**

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০



...শ বর্ষ   অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯   ১১শ সংখ্যা


# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম-এস্‌-সি



মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

[আবিষ্কৃত ১৯০২]

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী

ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

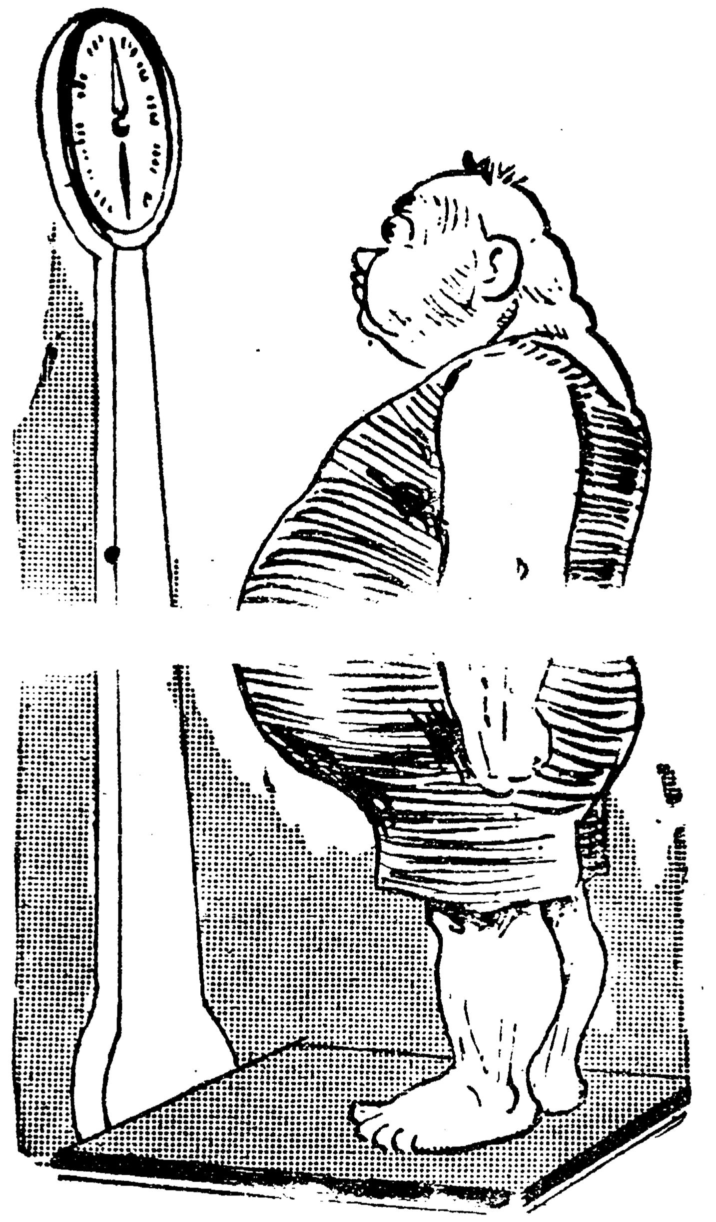

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে

সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

**লক্ষ্মীদাস প্রেমজী**

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০

১৫শ বর্ষ　　অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯　　১১শ সংখ্যা

# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম.এস-সি

মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে

পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

[আবিষ্কৃত ১৯০২]

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOS

# রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৶০, ষাণ্মাসিক ১।৶০ ; প্রতিসংখ্যা।৹ ভি, পি, চার্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরমাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

লাইমজুস অ্যাণ্ড গ্লিসারিন

কেশ পরিচর্য্যা ও প্রসাধনের উপযোগী সুস্নিগ্ধ ক্রীম

স্নানের পূর্ব্বে অথবা পরে নিত্য ব্যবহার করিলে নিতান্ত অবাধ্য কেশও বশে আসে এবং রুক্ষ কেশ মসৃণ হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান পছন্দ করিবেন।

চার আউন্স ও ছয় আউন্স শিশি

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এল্ প্রণীত

**সোনার হরিণ**
হুকা-কাশির নতুন রহস্যময় সুবিরাট্ উপন্যাস
২৬৪ পৃষ্ঠা। দাম ১৲

**হাস্য ও রহস্য**
একাধারে রহস্য—রোমাঞ্চ, আবার হাসি।
সুন্দর ছবি, রঙ্গিন মলাট। দাম ॥৶০

**পদ্মরাগ** (২য় সংস্করণ)
হুকা-কাশির সুবিখ্যাত রহস্যময় উপন্যাস
রামধনু-গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই। দাম ১৲

**চা'য়ের ধোঁয়া** (২য় সং)
অনাবিল হাসির ভাণ্ডার। দাম ॥০

**এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে**
( শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী সহযোগে )
বাংলা শিশুসাহিত্যের দুই প্রতিভাবান্ লেখক একযোগে এ বই লিখেছেন। পাতায় পাতায় হাসি। দাম ॥৶০

**নূতন পুরাণ**
একেবারে নতুন ছাঁচে লেখা অভিনব হাসির গল্প
সুন্দর মলাট, মজাদার ছবি—দাম ॥৶০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিমিটেড ( ১বি, রসা রোড, কলিকাতা )

আমাদের সর্ব্বজন সমাদৃত পূজাবার্ষিকী

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত **মধু মেলা** মূল্য মাত্র দেড় টাকা

এই দুর্ব্বৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত প্রবন্ধ-গৌরবে ও চিত্রসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
চয়নিকা
গল্প সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু-গল্পিকা
প্রত্যেকখানি ১৷৷৹

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
সোনার কাঠি
যাদুঘর
চিত্রদীপ
মায়া মুকুর
সোনালী ফসল
প্রত্যেকখানা ১৷৷৹

## পূজায় উপহার দিবার ভাল ভাল বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| দুই ভাই | ১৲ | দৌলৎখানা | ৸৹ |
| হারানো দিন | ১৲ | তাতারের বন্দী | ৸৹ |
| দেড়শো খোকার কাণ্ড | ১৲ | আধুনিক রবিনহুড | ৸৹ |
| পাল্কী বুড়ো | ।৶৹ | সাহারার আতঙ্ক | ॥৶৹ |
| ছানা বড়া | ।৵৹ | স্বর্গে থিয়েটার | ॥৶৹ |
| অন্ধকূপের বন্দী | ৸৹ | ছেলেধরা সার্কাস্ | ॥৶৹ |
| ছোটদের শাহনামা | ৸৹ | রোমাঞ্চকর কাহিনী | ॥৹ |
| উড়োজাহাজে কয়েদী | ৸৹ | কম্যাণ্ডার কবুতর | ৸৹ |
| বোম্বেটে দ্বীপ | ৸৹ | আকাশ গঙ্গা | ৸৹ |
| খ্যাতির বিড়ম্বনা | ৸৹ | ঝিলে জঙ্গলে | ॥৶৹ |
| নিশির ডাক | ৸৹ | ঋষি অরবিন্দ | ॥৹ |
| বিষের তীর | ॥৹ | দানবীর কার্ণেগী | ॥৹ |

বিস্তারিত পুস্তকের তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইয়াছে

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

**এবার পূজোয় এই দু-খানা বই নিশ্চয়ই কিন্‌বে !!**

তোমাদের প্রিয় লেখক

প্রবোধকুমার সান্যালের

# সত্যি বল্‌ছি !

মনে হবে বাজে কথা—কিন্তু তা নয়, গল্পগুলো সত্যিই ! বিশ্বাস না করো, কি করব কিন্তু এমনিই সব ঘটেছিল। এক নিঃশ্বাসে পড়তে হবে—হয়ত হাসবে কিন্তু তবু সব সত্যি—সত্যি বল্‌ছি !

**চমৎকার ছাপা, অগন্‌তি ছবি**

—আট আনা—

তোমরা যাঁর বই পেলে আহার নিদ্রা ভোলো

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের

# দেশ-বিদেশে

নানা দেশের গল্প। একাধারে ভ্রমণ কাহিনী ও গল্প। কত মজার মজার দেশ, কত আশ্চর্য্য তার সব কাহিনী। পড়তে পড়তে মনে হবে, তোমরাও সেই সব দেশে গেছো—এসবই চোখে দেখ্‌ছ। রাণা প্রতাপের দেশ থেকে শুরু করে সেই দূর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত কত দেশ আর কত মানুষের গল্প !!

**অসংখ্য ছবি—রঙীন মলাট**

—দাম মোটে চৌদ্দ আনা—

**প্রাপ্তিস্থান—ঈষ্টার্ণ-ল-হাউস লিঃ—৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

**ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।**

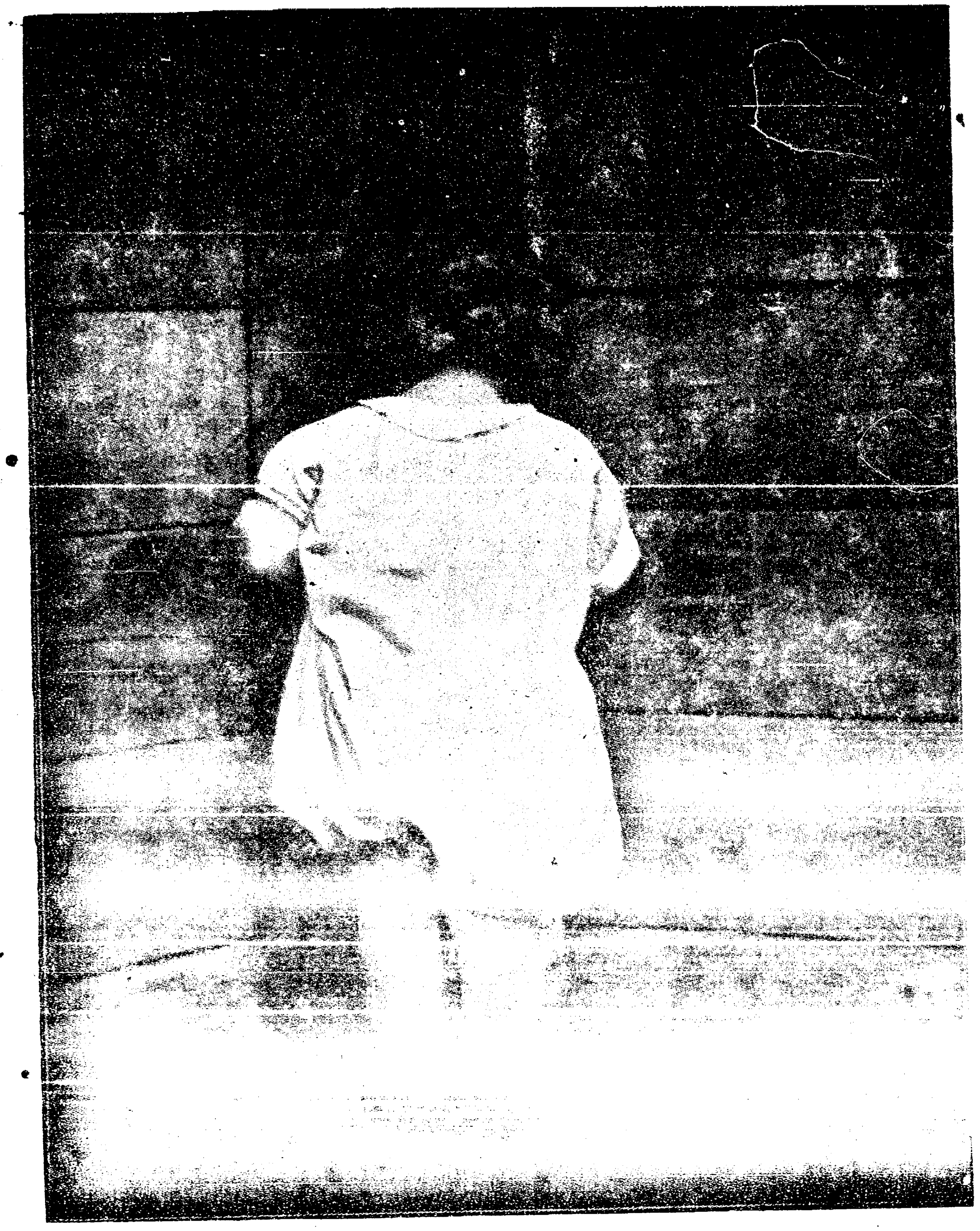

অভিমান

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ { ১১শ সংখ্যা

## রামধনু

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি

ঝড়ের ডমরু বাজিছে মত্ত সিন্ধুতে ঘন গর্জ্জনে,
ক্ষ্যাপা নর্ত্তকী নাচে তরঙ্গ-তনু।
প্রলয়-সূচনা কষায় লোচনে, ধ্বংস-শায়ক-সর্জ্জনে
ক্রুদ্ধ বাহুতে উদ্যত রামধনু।
তীরতরুগণ দুলিছে সঘন কাঁপিয়া,
মেঘাড়ম্বরে অম্বর গেলো ছাপিয়া,
জ্বলে দিগন্তে বিদ্যুৎ-শিখা, শঙ্কিত ত্রিভুবন;
রামধনু ভরি' টঙ্কার বাজে—প্রলয়-প্রভঞ্জন।

দূর হতে ভেসে আসে হাহা-রব কাহার করুণ ক্রন্দনে,
বন্দিনী সীতা রাক্ষস-কারাগারে !
ধনু-টঙ্কারে হুঙ্কারে তাই মহাপণ সেতু-বন্ধনে,
প্রতিধ্বনি সে চলে পারাবার-পারে।
লঙ্কাপুরে কি আগুন উঠেছে জ্বলিয়া ?
পাপ-বিলাসের স্বর্ণ পড়িছে গলিয়া ?
সীতার বুকের বিলাপ কি বাজে এ-পারের বনময় ?
রামধনু ভরি' উঠে মর্ম্মরি'—নাহি ভয়, নাহি ভয়।

লঙ্ঘি' সাগর যেতে হবে সেই রাক্ষস-পুর-চত্বরে,
সীতার কণ্ঠে পরাতে মুক্তি-মালা ;
মহাবাহু রাম নয়নাভিরাম, এসো এসো তবে সত্বরে,
ধরো তব ধনু, শরাসন খর-জ্বালা।
বন্দিনী সীতা কাঁদিছে রাবণ-ভবনে,
ভারত ভরিয়া হাহাকার উঠে পবনে।
কূলে কূলে ওকি জ্বলে ধকধকি' বহ্নি-বিধুর প্রাণ !
রামধনু ভরি' বাজে ভৈরবে সিন্ধু-শাসন গান।

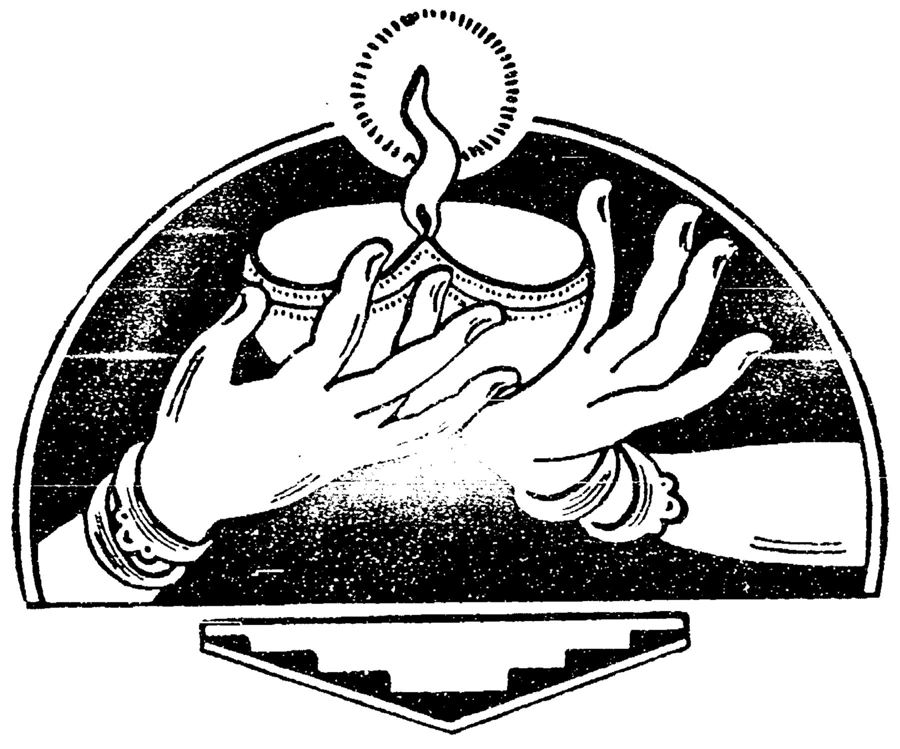

২৫

দেখিতে দেখিতে পুনরায় মে মাস আসিল। প্রথম সপ্তাহ হইতেই এমন ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ করিল যে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়া না রাখিলে রাত্রে ঘুমানো যাইত না। শীতও যত প্রখর হইতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরাও তত দ্বীপ ছাড়িয়া উত্তরাভিমুখে অন্য কোন দেশে উড়িয়া যাইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র 'সোয়ালো' পাখীগুলি এই বিষয়ে সকলকে টেক্কা দিয়া চলে। দ্বীপের এই পাখীগুলিই হয়ত একেবারে ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, আমেরিকা না হয় ভারতবর্ষে গিয়া উঠিবে। সুশান্তর মাথায় তখন একটা বুদ্ধি আসিল। সে এই সময় জাল পাতিয়া কতকগুলি সোয়ালো পাখী ধরিয়া কাগজে তাহাদের জাহাজডুবির কথা লিখিয়া পাট করিয়া তাহাদের পায়ের সঙ্গে সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিল। মনে মনে তাহার এই আশা, যদি কোনক্রমে একটা পাখী কাহারও হাতে ধরা পড়ে।

শীতের প্রারম্ভেই দ্বীপবাসীদের মধ্যে আর একটি উত্তেজনাকারী ঘটনা ঘটিল। অশোকের কার্য্যকাল দশই জুন তারিখে শেষ হইবে, অর্থাৎ তাহাদের এইবার আর একজন নূতন দলপতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অশোক ও সুশান্ত দুইজনেই এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন। কেবল একজন এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সে রঞ্জিৎ। তাহার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা এইবার সে যেন তাহাদের দলপতি নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু তাহার আশা বড় কম; তাহার দলে মাত্র তিনটি ছেলে,—কুণাল, কমলাক্ষ ও রোহিতাশ্ব। কিন্তু তাই বলিয়া সে নিরাশ হইল না। ভোট সংগ্রহের জন্য সে সকলের দ্বারে দ্বারে রীতিমত তদ্বির সুরু করিল। সকলকে খোসামোদ করিতে প্রথমে তাহার অহঙ্কার ও দাম্ভিকতায় বাধিয়াছিল; কিন্তু পরে সে ভাবিয়া দেখিল দুনিয়ায় সর্ব্বত্রই সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। যাহার ভোটের, সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হইবে সেই দলপতি নির্ব্বাচিত হইবে। শেষে একদিন সত্যি সত্যি দশই জুন তারিখ আসিয়া

উপস্থিত হইল। নির্ব্বাচন পর্ব্ব আরম্ভ হইবে সেদিন বিকাল বেলায়। প্রত্যেক ছেলেকে এক টুকরা কাগজে তাহার মনোনীত ব্যক্তির নাম লিখিয়া দিতে হইবে। বেলা তিনটার সময় অশোক নির্ব্বাচন তালিকা খুলিল। সমস্ত কার্য্যাবলী অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত সমাপ্ত হইল; শেষে ভোটের সংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল নির্ব্বাচন ফল নিম্নরূপ দাঁড়াইয়াছে—

সুশান্ত…৮, রঞ্জিৎ…৩, অশোক…১।

রঞ্জিৎ ও অশোক কাহাকেও ভোট দেয় নাই; সুশান্ত কেবল অশোককে ভোট দিয়াছিল। নির্ব্বাচন ফল দেখিয়া সুশান্ত অবাক্ হইয়া গেল, আর রঞ্জিৎ রাগে, দুঃখে চুল ছিঁড়িতে আরম্ভ করিল। সুশান্ত ভাবিয়াছিল অশোকই পুনর্নির্ব্বাচিত হইবে, কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য, সে ছাড়া অশোককে কেহ ভোট দিল না। অশোক মনে মনে বুঝিল তাহাকে কেহ চায় না। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সুশান্ত অশোকের নিকট হইতে সমস্ত কার্য্যভার বুঝিয়া লইল।

৮০

দলপতি হইবার পর সুশান্তর প্রথম কাজ হইল স্কুনার উপসাগরে গিয়া নিশানটির বদলে একটা বেলুন টাঙ্গাইয়া দেওয়া। নিশানটাকে আর কত দূর হইতেই বা দেখা যাইত, এই বেলুনটিকে সমুদ্রের বহুদূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে। নলখাগড়ার বেত হইতে ঝুড়ি আর ক্যান্‌ভাসের কাপড় দিয়া এই বেলুন তৈরী হইল।

তার পর সুরু হইল প্রচণ্ড শীত। এখন আর গুহার বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ছেলের দল পড়াশোনায় মন দিল। সঙ্গে বইএর অভাব ছিল না। বড় ছেলেরা ছোটদের গল্প শুনাইত—ইতিহাসের গল্প, বিজ্ঞানের কাহিনী, এমনি কত কি! সেই সঙ্গে আবৃত্তি, অভিনয় এ সবও চলিতে লাগিল। এই ভাবে আগষ্ট মাসও শেষ হইল। শীত ক্রমে কমিতে লাগিল, কিন্তু তুষারপাতের বিরাম নাই।

সেদিন শীতটা অপেক্ষাকৃত কম ছিল; বাহিরের মাঠ, বন, নদী—চারিদিক্ তুষারে ধব ধব করিতেছে। সুশান্তর তাই ইচ্ছা হইল সকলকে লইয়া বাহিরে বরফের উপর একটু স্কেটিং করে। গত বৎসরের শীতের সময় তাহারা সকলেই কিছু কিছু স্কেটিং শিখিয়াছিল, কারণ স্কেটিংএর সরঞ্জাম সমস্তই জাহাজে ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল তিন জন—রঞ্জিৎ, কমলাক্ষ ও মনন। আর এই তিন জনের মধ্যে মননই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা তৎপর। স্কেটিং করিতে করিতে ইহারা হয়ত বহুদূরে গিয়া পড়িবে; কিন্তু যে রকম ভীষণ কুয়াশা ও নিবিড় অন্ধকার করিয়া আছে তাহাতে খুব অধিক দূরে যাওয়া নিরাপদ নয়। অন্ধকারে পথ তো হারাইবেই, উপরন্তু নেকড়ের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারানও বিচিত্র নয়। তাই সুশান্ত সকলকে পই পই করিয়া বারণ করিয়া দিল—"কেউ যেন বেশী দূর যেও না, আর সকলেই পরস্পরের লক্ষ্যের মধ্যে থাকবে; আমি ও অশোক



তোমাদের জন্য এখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।" তার পর সকলেই স্কেটিং সুরু করিল; কেহ দুই পা গিয়া আছাড় খাইল, কেহ বা খানিকটা গিয়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু কেহই নিবৃত্ত হইল না; সকলেই হাসিতে হাসিতে অন্ধকারের ভিতর দিয়া দূর হইতে ক্রমে দূরতর স্থানে অগ্রসর হইতে লাগিল। সব চেয়ে সুন্দর চলিল মনন; কখনো এক পায়ে, কখনো দুই পায়ে, কখনো সোজা হইয়া, কখনো বা ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আবার কখনো বা চক্র দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সহিত সকলকার আগে আগে চলিল। ক্রমে সকলে বহুদূরে গিয়া দলছাড়া হইয়া পড়িল। খানিক দূর গিয়া রঞ্জিৎ কমলাক্ষকে বলিল—"চল, আমরা আরো ওদিকে যাই, ওদিকে অনেক বন-হাঁসের বাসা আছে।" কমলাক্ষ কহিল—"না, বড় অন্ধকার, শেষে নেকড়ের মুখে পড়্‌ব।"—"সত্যি কথা বল না, তোমার সুশান্তকে ভয়।" অগত্যা কমলাক্ষকে রঞ্জিতের সঙ্গ লইতে হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা ক্রমে বহুদূরে গিয়া পড়িল। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; অবিরাম তুষারপাত ও নিবিড় কুয়াশার আবরণে সমস্ত প্রকৃতি যেন নিঃঝুম অসাড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাথার উপর হাঁসের ডাক শোনা যায়, কিন্তু চোখে কিছুই পড়ে না। এ যেন তাহাদের সেই চিরপরিচিত সিন্ধুদ্বীপ নহে, এ যেন এক কুয়াশাকজ্জল, শীতজর্জ্জর প্রেতের রাজ্য! ওদিকে সুশান্ত ও অশোক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বেলা তিনটার পর কুয়াশা ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল; শেষে এমন আঁধার হইয়া উঠিল যে তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়াও পরস্পরকে আর দেখিতে পাইল না। সুশান্ত কহিল—"আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল; ছেলেরা এখন কি করে পথ চিনে ফিরবে?" অশোক কহিল—"তোমার শিঙ্গাটা একবার বাজাও।" সুশান্ত তখন তাহার শিঙ্গা তিনবার বাজাইল; সেই শীতল কঠিন তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়া সেই শিঙ্গারব যেন দ্বিগুণ হইয়া গড়াইয়া গেল। দশ মিনিট পরেই একে একে সকলে ফিরিল। ফিরিল না শুধু রঞ্জিৎ ও কমলাক্ষ। বার বার শিঙ্গা বাজাইয়াও কোন ফল হইল না। এদিকে বেলা গড়াইয়া চলিল। তখন অশোক কহিল—"এক কাজ করা যাক্, আমাদের একজন এখনই শিঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক। শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে গেলেই ওরা শুন্‌তে পাবে।" অশোকের কথা শুনিয়া শঙ্খচূড় কহিল—"আমি যাচ্ছি।" নীলাদ্রি কহিল—"আমি যাব;" রোহিতাশ্ব কহিল—"আমি যাব।" সুশান্ত কহিল—"কারোর যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।" তখন মনন কহিল—"তুমি যাবে কেন দাদা, আমি যাচ্ছি। আমার মত জোরে স্কেটিং করে কেউ যেতে পারবে না।" সুশান্ত কহিল—"বেশ, তুমিই যাও। খুব তাড়াতাড়ি যাবে এবং সারা পথ শিঙ্গা বাজাবে। তার পর ওদের বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলেই ওদেরকে ডেকে আনবে।" পরমুহূর্ত্তেই মনন সেই নিবিড় কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অন্ধকার যেন এখন আরো গভীর ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। মননের শিঙ্গারবও এখন

আর শ্রুতিগোচর হয় না। দেখিতে দেখিতে আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখন সুশান্ত কহিল—"অশোক, এক কাজ কর, শীঘ্র একটা কামান ছোঁড়।" ফরাসী গুহার দুয়ারের দুই পাশে ঘুলঘুলির ভিতর মুখ করিয়া দুইটা পিতলের কামান বসানো ছিল। একটা কামানকে হড় হড় করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে টানিয়া আনা হইল। রোহিতাশ্ব কহিল, "খানিকটা ঘাসের চাপ্‌ড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া যাক্, তাহাতে শব্দ দ্বিগুণ হ'বে।" তখন তাহাই করিয়া শঙ্খচূড় কম্পিত হস্তে কামানে আগুন দিল। সেই কুয়াশাকজ্জল মেঘান্ধকার থম্‌থমে প্রকৃতির মধ্যে কামান একেবারে বজ্রনিনাদের মত প্রচণ্ড শব্দ করিয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সকলেই কাঁপিয়া উঠিল। যেরূপ শব্দ হইল তাহাতে বোধ করি দশ মাইল দূরের লোকও উহার শব্দ শুনিতে পাইবে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল তবুও ওদিক্ হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। তখন পুনরায় সেই কামান ছোঁড়া হইল। তবুও কোন দিকে কোন সাড়া-শব্দ নাই। এইরূপে এক ঘণ্টা ধরিয়া পর পর ছয়বার কামান ছোঁড়া হইল।

হঠাৎ মনে হইল, দূরে—বহুদূরে যেন দুই তিনটা বন্দুকের শব্দ হইল। নীলাদ্রি উল্লসিত কণ্ঠে কহিল—"ও যে বন্দুকের শব্দ সুশান্ত!" শঙ্খচূড় নিমেষের মধ্যে বন্দুক ছুঁড়িল। এইবার পূর্ব্বদিক্ হইতে পুনর্ব্বার বন্দুকের শব্দ আসিল; মনে হইল তাহা যেন খুব নিকটে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল দুইটা ছায়ামূর্ত্তি তীরের মত তাহাদের দিকে স্কেটিং করিয়া আসিতেছে। ও কি, ও যে কেবল রঞ্জিৎ ও কমলাক্ষ! মনন তো সঙ্গে নাই! মননকে তাহারা দেখে নাই।

সুশান্ত হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"আমি নিজেই চল্লুম; যদি মননকে পাই তো ফিরব, নচেৎ আর ফিরব না।" অনেক কষ্টে তাহাকে থামান হইল।

কামানের শব্দে ফল হইল না দেখিয়া শুকনা পাতা জড় করিয়া আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইল। কুয়াশাটা যেন এই সময় একটু কমিয়াছিল। সকলে যখন ঐ কাজে ব্যস্ত তখন হঠাৎ অশোক কহিয়া উঠিল, "সুশান্ত, দূরে—বহুদূরে অস্পষ্ট ছায়ার মত ওটা কি নড়ে বেড়াচ্ছে?" সকলেই সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, দূরে বহুদূরে হ্রদের উপর দিয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি তীরের মত তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নিশ্চয়ই মনন। সকলেই তখন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া মননকে ডাকিতে লাগিল। মনন তখন তীরের মত, উল্কার মত হ্রদের উপর দিয়া স্কেটিং করিয়া আসিতেছে। অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত মননের পায়ের সেই সহজ সাবলীল গতি, সর্ব্বাঙ্গে তার উড়ন্ত পাখীর লঘুতা। সুশান্ত তখন চোখে দূরবীণ লাগাইয়া মননের দিকে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ সে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"অশোক, দেখ দেখ, মননের পেছনে আরও দু'টো লোক ছুটে আসছে; কারা ওরা?"

(ক্রমশঃ)

---

# হিমালয়ের ছাঁদ

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি

ছোট শিশুদের জিজ্ঞাসার যেন সীমা নাই। "এটা কি?" "পাখীটা উড়ে যাচ্ছে কেন?"—এমনি সব প্রশ্ন তা'দের মুখে লাগিয়াই আছে। বিজ্ঞানীর মনও তেমনি যেন ছোট শিশুর মনেরই মত। যা দেখিলে তোমার আমার মনে কোন প্রশ্ন কোন দিনই উঠে না তাই দেখিয়াই বিজ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন "এটা কি?" "ওটা কেন?" "সেটা কি করে হ'ল?" এমনি কত কি!

ভারতবর্ষের ম্যাপ্ খুলিলে প্রথমেই চোখে পড়ে তাহাতে বিশেষ কোনও রং কি চিহ্ন দিয়া হিমালয় পাহাড় দেখান আছে। কোনও দিন কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিমে খিরথর পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া সুলেমান, তারপর হিমালয়, তারপর আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পাটকই, তারপর আরও দক্ষিণে আরাকান ইয়োমা পর্য্যন্ত এই সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীকে যেন একটি মাত্র পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়া মনে হয়? মনে হয় যেন একটিই পর্ব্বতমালা নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে একটি প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে! তোমরা না দেখিলেও বিজ্ঞানীর চোখে এটি ধরা পড়িয়াছে। আরও ধরা পড়িয়াছে কি জান? কেমন করিয়া এমনটি হইল।

ভারতবর্ষের ম্যাপে লক্ষ্য করিয়া দেখ হিমালয় পর্ব্বতমালা কেমন একটি সরল ধনুকের মত ঈষৎ বাঁকা ছাঁদে আসামের উত্তর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। তারপর কাশ্মীরের দক্ষিণে নাঙ্গা পর্ব্বতের কাছে সেই সরল পর্ব্বতরেখা কেমন হঠাৎ তীব্র মোচড় খাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকিয়া গিয়াছে। এইখানে তার নাম 'সুলেমান'। তারপর আবার আরও একটু দক্ষিণে বেলুচিস্তানের মধ্যে আর এক মোচড়—আরও তীক্ষ্ণ মোচড় পর্ব্বতমালাকে কেমন ইংরাজি S-এর আকারে বাঁকাইয়া দিয়াছে। এইখানে খিরথর পাহাড়ের উদ্ভব।

এই দুই জায়গায় যেন পাঞ্জাব আর বেলুচিস্তানের দুই অংশ সরু গলা বাড়াইয়া হিমালয়ের কাশ্মীর বাঁক আর বেলুচিস্তানের বাঁকের ফাঁকে ঢুকিয়া

আর শ্রুতিগোচর হয় না। দেখিতে দেখিতে আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তখন সুশান্ত কহিল—"অশোক, এক কাজ কর, শীঘ্র একটা কামান ছোঁড়।" ফরাসী গুহার দুয়ারের দুই পাশে ঘুলঘুলির ভিতর মুখ করিয়া দুইটা পিতলের কামান বসানো ছিল। একটা কামানকে হড়, হড় করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে টানিয়া আনা হইল। রোহিতাশ্ব কহিল, "খানিকটা ঘাসের চাপ্‌ড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া যাক্, তাহাতে শব্দ দ্বিগুণ হ'বে।" তখন তাহাই করিয়া শঙ্খচূড় কম্পিত হস্তে কামানে আগুন দিল। সেই কুয়াশাকজ্জল মেঘান্ধকার থম্‌থমে প্রকৃতির মধ্যে কামান একেবারে বজ্রনিনাদের মত প্রচণ্ড শব্দ করিয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে সকলেই কাঁপিয়া উঠিল। যেরূপ শব্দ হইল তাহাতে বোধ করি দশ মাইল দূরের লোকও উহার শব্দ শুনিতে পাইবে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল তবুও ওদিক্ হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। তখন পুনরায় সেই কামান ছোঁড়া হইল। তবুও কোন দিকে কোন সাড়া-শব্দ নাই। এইরূপে এক ঘণ্টা ধরিয়া পর পর ছয়বার কামান ছোঁড়া হইল।

হঠাৎ মনে হইল, দূরে—বহুদূরে যেন দুই তিনটা বন্দুকের শব্দ হইল। নীলাদ্রি উল্লসিত কণ্ঠে কহিল—"ও যে বন্দুকের শব্দ সুশান্ত!" শঙ্খচূড় নিমেষের মধ্যে বন্দুক ছুঁড়িল। এইবার পূর্ব্বদিক্ হইতে পুনর্ব্বার বন্দুকের শব্দ আসিল; মনে হইল তাহা যেন খুব নিকটে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল দুইটা ছায়ামূর্ত্তি তীরের মত তাহাদের দিকে স্কেটিং করিয়া আসিতেছে। ও কি, ও যে কেবল রঞ্জিৎ ও কমলাক্ষ! মনন তো সঙ্গে নাই! মননকে তাহারা দেখে নাই।

সুশান্ত হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"আমি নিজেই চল্লুম; যদি মননকে পাই তো ফিরব, নচেৎ আর ফিরব না।" অনেক কষ্টে তাহাকে থামান হইল।

কামানের শব্দে ফল হইল না দেখিয়া শুকনা পাতা জড় করিয়া আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইল। কুয়াশাটা যেন এই সময় একটু কমিয়াছিল। সকলে যখন ঐ কাজে ব্যস্ত তখন হঠাৎ অশোক কহিয়া উঠিল, "সুশান্ত, দূরে—বহুদূরে অস্পষ্ট ছায়ার মত ওটা কি নড়ে বেড়াচ্ছে?" সকলেই সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, দূরে বহুদূরে হ্রদের উপর দিয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি তীরের মত তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। নিশ্চয়ই মনন। সকলেই তখন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া মননকে ডাকিতে লাগিল। মনন তখন তীরের মত, উল্কার মত হ্রদের উপর দিয়া স্কেটিং করিয়া আসিতেছে। অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত মননের পায়ের সেই সহজ সাবলীল গতি, সর্ব্বাঙ্গে তার উড়ন্ত পাখীর লঘুতা। সুশান্ত তখন চোখে দূরবীণ লাগাইয়া মননের দিকে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ সে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"অশোক, দেখ দেখ, মননের পেছনে আরও দু'টো লোক ছুটে আসছে; কারা ওরা?" (ক্রমশঃ)

---

# হিমালয়ের ছাঁদ

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, এম্.এস্-সি

ছোট শিশুদের জিজ্ঞাসার যেন সীমা নাই। "এটা কি?" "পাখীটা উড়ে যাচ্ছে কেন?"—এমনি সব প্রশ্ন তা'দের মুখে লাগিয়াই আছে। বিজ্ঞানীর মনও তেমনি যেন ছোট শিশুর মনেরই মত। যা দেখিলে তোমার আমার মনে কোন প্রশ্ন কোন দিনই উঠে না তাই দেখিয়াই বিজ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন "এটা কি?" "ওটা কেন?" "সেটা কি করে হ'ল?" এমনি কত কি!

ভারতবর্ষের ম্যাপ্ খুলিলে প্রথমেই চোখে পড়ে তাহাতে বিশেষ কোনও রং কি চিহ্ন দিয়া হিমালয় পাহাড় দেখান আছে। কোনও দিন কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যে সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিমে খিরথর পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া সুলেমান, তারপর হিমালয়, তারপর আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পাটকই, তারপর আরও দক্ষিণে আরাকান ইয়োমা পর্য্যন্ত এই সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীকে যেন একটি মাত্র পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়া মনে হয়? মনে হয় যেন একটিই পর্ব্বতমালা নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে একটি প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে! তোমরা না দেখিলেও বিজ্ঞানীর চোখে এটি ধরা পড়িয়াছে। আরও ধরা পড়িয়াছে কি জান? কেমন করিয়া এমনটি হইল।

ভারতবর্ষের ম্যাপে লক্ষ্য করিয়া দেখ হিমালয় পর্ব্বতমালা কেমন একটি সরল ধনুকের মত ঈষৎ বাঁকা ছাঁদে আসামের উত্তর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। তারপর কাশ্মীরের দক্ষিণে নাঙ্গা পর্ব্বতের কাছে সেই সরল পর্ব্বতরেখা কেমন হঠাৎ তীব্র মোচড় খাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকিয়া গিয়াছে। এইখানে তার নাম 'সুলেমান'। তারপর আবার আরও একটু দক্ষিণে বেলুচিস্তানের মধ্যে আর এক মোচড়—আরও তীক্ষ্ণ মোচড় পর্ব্বতমালাকে কেমন ইংরাজি S-এর আকারে বাঁকাইয়া দিয়াছে। এইখানে খিরথর পাহাড়ের উদ্ভব।

এই দুই জায়গায় যেন পাঞ্জাব আর বেলুচিস্তানের দুই অংশ সরু গলা বাড়াইয়া হিমালয়ের কাশ্মীর বাঁক আর বেলুচিস্তানের বাঁকের ফাঁকে ঢুকিয়া

গিয়াছে। যেন তাহারাই ঐখানে ঢুঁ মারিয়া হিমালয় পর্ব্বতের সরল পূর্ব্ব-পশ্চিম ভঙ্গীকে অমনি করিয়া বাঁকাইয়া দিয়াছে।

শুধু এইখানেই নয়, আবার আসামের কোণেও হিমালয় পর্ব্বতমালার এক মস্ত বাঁক রহিয়াছে। মূল হিমালয়ের পূর্ব্ব-পশ্চিমমুখী গতি যেন হঠাৎ আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণটিকে পাইয়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দক্ষিণ-

তুষারশৃঙ্গ হিমালয়ের একটি দৃশ্য

পশ্চিমে বাঁকিয়া গিয়াছে! পাটকই পাহাড়, মণিপুরী পাহাড়, সিন পাহাড়, আরাকান ইয়োমা এই দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ।

হিমালয় পাহাড় প্রায় সমস্তটাই পালল পাথর (যা' নদীর পলিমাটি হইতে সমুদ্রের তলায়ই শুধু গড়িয়া উঠে) দিয়া গঠিত। সমুদ্রে যে সব প্রাণী থাকে—যেমন শামুক, শাঁখ ইত্যাদি—তাহাদের শক্ত খোলা বা অন্যান্য অংশ হিমালয়ের পালল পাথরের স্তরে দেখা যায়। বিজ্ঞানী তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এখন যেখানে হিমালয় ২৯,০০০ ফুট পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে, এককালে (বেশী দিন আগে



নয়, ৫।৬ কোটি বৎসর আগে) সেখানে এক সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্র যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে টানা ছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূবিদ্ এই সমুদ্রের নাম দিয়াছেন "টেথিস সাগর"। হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অংশই কিন্তু মূলতঃ এমন পাথরে গঠিত যে সেই পাথর দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেখানে ৫০।৬০ কোটি বৎসরের মধ্যে কোন দিন সমুদ্র ছিল না। সেই পাথর ভারি কঠিন, দুর্নম্য।

অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এই সব দেশেও এই জাতীয় পাথর দেখা যায়, তাহা ছাড়া আরও নানা কারণে (সব এখানে বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে) বেশ বোঝা যায় যে এই সব দেশগুলি, যারা এখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, এক সময়ে সব সংলগ্ন ছিল। এক বিরাট মহাদেশ এই সব জায়গা জুড়িয়া ছিল, ভারতবর্ষ তারই এক অংশ ছিল। এই অধুনালুপ্ত অতীত মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোআনা মহাদেশ (অনুবাদ করিলে হয় "গোঁড়ভূমি"—মধ্যভারতের গোঁড় জাতির নামানুসারে)।

এই গণ্ডোআনা ভূমির উত্তরে টেথিস সাগরে হিমালয়ের মালমশলা—নানা নদীর জলে আনা কাদা, বালি ইত্যাদি, জমা হইতেছিল। এগুলি জমে স্তরে স্তরে; আর এই সব যখন পালল পাথরে পরিণত হয় তখন সেই পালল পাথরও থাকে সমান ভাবে, কাপড়ের দোকানের তাকে রাখা কাপড়ের মত স্তরে স্তরে বিস্তৃত। কিন্তু যখন পৃথিবীর ভিতরের শক্তিতে পালল পাথরের স্তর সমুদ্রের জলের উপর মাথা জাগাইয়া সমতলভূমি বা পাহাড়-পর্ব্বতের সৃষ্টি করে তখন প্রায়ই স্তরগুলি বিপর্য্যস্ত, দুমড়ানো হইয়া যায়।

হিমালয়ের সর্ব্বত্র এমনি দুমড়ানো, বিপর্য্যস্ত স্তর দেখা যায়। তাই প্রমাণ হয় যে টেথিসে সঞ্চিত পালল পাথরের স্তর সরাসরি শুধু উপরে ঠেলিয়া উঠে নাই, কোন পাশ হইতে চাপে সেই স্তরগুলিকে কুঁকড়াইয়া, কুঁচকাইয়া ঠেলিয়া তুলিয়াছে—হিমালয় পর্ব্বতরূপে। আবার পাঞ্জাবের কোণে, বেলুচিস্তানের বাঁকে যে পালল-স্তরগুলি আছে, সেগুলি অতি মাত্রায় নিষ্পেষিত ও বিপর্য্যস্ত। প্রবল চাপে স্তরগুলি পরস্পরের গায়ে পিষিয়া আছে, এ উহার ঘাড়ের উপর দিয়া পিছলাইয়া গিয়াছে শুধু ঐ পাঞ্জাব বাঁকে আর বেলুচিস্তানের বাঁকেরই কাছে।

নিঃসন্দেহ, উত্তর হইতে কোন চাপে টেথিসে সঞ্চিত পালল-স্তরগুলিকে গণ্ডোআনা ( এখনকার ভারতবর্ষ ) ভূমির কোলে ঠাসিয়া ধরিয়াছিল ; পাঞ্জাবের ও বেলুচিস্তানের ঐখানে ভারতবর্ষের ঐ অংশে সরু গলার মত উদগত-থাকা স্তরের উপর চাপ পড়িয়াছে বেশী। সেগুলি নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে, আর সেগুলিকে ঘিরিয়া স্তরগুলি একদিক্ হইতে আর একদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে,—হাঁটুর গুঁতা দিয়া একটুক্‌রা চেরা বাঁশকে বাঁকাইয়া যেমন ধনুক করা হয় ( খুব বেশী বাঁকাইলে অবশ্য ভাঙ্গিয়া যায় )।

আসামের কোণের বাঁকও ঠিক এই রকম কারণেই হইয়াছে ; তবে সেখানে স্তরগুলি এখনও কোনও ভূবিদ্ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই যে সেগুলি অমনি অতি মাত্রায় ঠাসা কিনা। তবে যত দূর বোঝা যায় —এই ধারণা ভুল নয়।

ভূবিদ্ তাই বলিতেছেন যে হিমালয়ের ঐ অদ্ভুত ছাঁদ কেমন করিয়া হইয়াছে জান ? অতীতের গণ্ডোআনা-ভূমির এক অংশের, এখনকার ভারতবর্ষের, উত্তরে খুব আঁকাবাঁকা উপকূল দিয়া ঘেরা এক টেথিস সাগর ছিল ; সেই উপকূলের কোলে পূর্ব্ব-পশ্চিমে টানা পালল স্তর জমিয়া উঠিতেছিল ; তারপর একদিন প্রবল চাপে সেই স্তরগুলিকে কে যেন উপকূলের গায়ে ঠাসিয়া ধরিয়াছিল। সেগুলি আঁকাবাঁকা উপকূলকে অবলম্বন করিয়া—তাহারই ছাঁদে নানা ভঙ্গীতে বাঁকা হিমালয় পর্ব্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে মতভেদ বাধিয়াছে যে স্তরগুলিকে উত্তর হইতে সেই চাপে দক্ষিণের মহাদেশের গায়ে পিষিয়া ধরিয়াছিল, না দক্ষিণ হইতে গণ্ডোআনা-ভূমি নিশ্চেষ্ট একরাশ পালল স্তরকে উত্তরের দিকে পিষিয়া দিয়াছিল ? কেননা যখন টেথিস হইতে হিমালয় জাগিয়া উঠে, বোধ হয় তখনই গণ্ডোআনা মহাদেশ হইতে খণ্ড খণ্ড দেশ ও মহাদেশ—ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ইত্যাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যাহার নিজস্ব অস্তিত্ব পায়। হয়ত তখন ভারতবর্ষ একটি বিরাট ভূমিখণ্ডরূপে সচল হইয়া উঠিয়াছিল,—পৃথিবীর ভিতরের অংশ অনেকটা নমনীয়—তারই উপরে যেন তাহা পিছলাইয়া সরিয়া গিয়াছিল! যাই হোক, অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে



হিমালয় সৃষ্টির চাপ আসিয়াছিল উত্তর হইতে, অপেক্ষাকৃত নরম পালল-স্তরকেই ঠেলিয়া ধরিয়াছিল কঠিন, সুদৃঢ় গণ্ডোআনা-ভূমির দিকে।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় যে হিমালয়, যে পাহাড় দু'-তিন হাজার মাইল ধরিয়া বিস্তৃত, তাও নাকি এমনি করিয়া কাদামাটি হইতে গঠিত! কুমার যেমন করিয়া কাদার তালকে ঠাসিয়া, পিষিয়া, টিপিয়া সুন্দর প্রতিমায় পরিণত করে তেমনি নাকি এই বিশাল পালল-স্তররাশিকেও পৃথিবীর অদৃশ্য শক্তিতে ঠাসিয়া পিষিয়া বিচিত্র ছাঁদের হিমালয় গড়িয়া তুলিয়াছে! ভারতবর্ষের ভূমি ছাঁচের কাজ করিয়াছে, তার উত্তর দিকের সীমা যেমন ভাবে আঁকা বাঁকা হিমালয়ের বিস্তারও তারই সঙ্গে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। পালল-স্তরগুলি ছিল নরম, অবশ্য ভারতবর্ষের কঠিন ভূমির তুলনায় ; তাই সেইগুলি অমন করিয়া ঠাসিয়া চাপিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—আকাশে ঢেউ খেলাইয়া হিমালয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ভূমি অতি কঠিন পাথরে গড়া, তাহাকে সেই অদৃশ্য শক্তি ঢেউ খেলাইতে পারে নাই। কিন্তু একেবারে তাই বলিয়া ছাড়িয়াও দেয় নাই। হিমালয়ের কোল হইতে দক্ষিণে প্রায় ২০০ মাইল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভূমি, এই চাপকে আটকাইতে গিয়া, ধনুকের মত নীচের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই ঢালু জমি দিয়া এখন গঙ্গা, সিন্ধু বহিয়া যাইতেছে ; তাহাদেরই আনা পলি-মাটি জমিয়া সেই ঢালু জমি ভরাট হইয়া উঠিয়া সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

---

## জলের তেপান্তর

শ্রীঅজিত দত্ত

ছোট্ট মোদের নৌকো, মাঝিমাল্লা আমরাই,  
লোজং থেকে দিলাম পাড়ি—ছাড়িয়ে যাবো ধামরাই।  
পদ্মা নদী পেরিয়ে পড়বো গিয়ে বিলে—  
হাটের হল্লা এড়িয়ে বনের নিরিবিলে।

জলের উপর আম-কাঁঠাল আর বাব্‌লা গাছের ঝোপ,
সেই যেখানে বিছিয়ে রাখে ঠাণ্ডা ছায়ার ছোপ,
আর যেখানে সরু খালের জল
রূপোর ফিতের মতন করে রোদ্দুরে টল-টল,
সে-সব পথে ঘুর্‌বো কেবল আমরা,
চাইনে দালান চক্‌-মিলানো, খিলান দেওয়া কামরা।

ছপ্‌-ছপা-ছপ্‌ জলের বাজ্‌না বাজ্‌বে ডিঙি বাওয়ায়,
সুর মেলাবে ঝির্‌ঝিরানি হাওয়ায়;
ডাঙার আরাম দিক্‌ যতো হাতছানি
পদ্মা নদীর দোলাই মোদের মন রেখেছে টানি।
ছোট্ট মোদের নাও,
দাঁড় যত খন রইবে হাতে চাই নে দুনিয়াও।

ছোট্ট মোদের নৌকো, লক্ষ্মী তা'র চল্‌তি,
ঢেউয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিষ্টি তাহার দোলটি।
ঝড়কে মোরা ভয় করি না, জলেই মোরা থাকি,
বন্ধু মোদের জলের মাছ আর বন-বাদাড়ের পাখী।

---

# আও-তে-আরোয়া

শ্রীঅবনীমোহন ঘোষ

'আও-তে-আরোয়া' হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপ। নামটা নতুন নতুন ঠেকছে, নয়? লাগবেই তো, কারণ ও নামে সেটাকে কম লোকেই চেনে, ইংরেজরা সেখানে গিয়ে তার নাম বদলে রেখেছে 'নিউ-জীল্যাণ্ড'।



আও-তে-আরোয়া কথাটার অর্থ হচ্ছে "সাদা মেঘ"। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে টাস্‌মান্‌ প্রথম এটির সন্ধান পান। তার পর ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী কুক্‌ এই দ্বীপটি ভাল ক'রে "আবিষ্কার" করেন।

জায়গাটা অনেকটা বৃটীশ-দ্বীপপুঞ্জেরই মত। পশ্চিমের বাতাসে প্রচুর বর্ষা হয়। গরমকালে তাই খুব গরম হয় না এবং শীতকালেও তেমন ভীষণ শীত পড়ে না।

দ্বীপটি দু'ভাগে বিভক্ত। উত্তর দ্বীপ আর দক্ষিণ দ্বীপ। তারই মাঝে হচ্ছে কুক্‌ প্রণালী। উত্তর দ্বীপে অনেক আগ্নেয়গিরি দেখা যায়, কিন্তু দক্ষিণ দ্বীপে যেমন মালভূমি আছে তেমনি বিস্তীর্ণ সমতলভূমিও আছে। দক্ষিণের পর্ব্বতমালাটির নাম হচ্ছে 'দক্ষিণ-আল্‌প্‌স্‌'। এটি পশ্চিম কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। পূর্ব্বে একটা সমতলভূমি রয়েছে, তার নাম 'ক্যান্‌টারবেরী'। আর দক্ষিণে হচ্ছে 'ওটাগো'—মাল। আল্‌প্‌স্‌ বেশ উঁচু পাহাড়। কাজেই সেখানে বরফ জমবে তাতে আর বিচিত্র কি? আর তাই থেকে বেরিয়ে আসছে নানা নদী। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি একটা দেখবার জিনিষ! বড় বড় 'গেসার' বা উষ্ণ প্রস্রবণ (যার জল ২৷৩শ' ফুট উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে), কর্দ্দম-হ্রদ, হিমবাহ ইত্যাদি অনেক কিছুই দেখবার আছে। তাই অনেক সৌখীন ভ্রমণকারী এখানে বেড়াতে আসেন। এখানকার মাখন, দুধ, পনীর, ভেড়ার মাংস নাম করবার মত। প্রত্যেক বছর প্রায় পনের ষোল লক্ষ টাকার এই সব জিনিষ কেবল ভারতেই পাঠান হয়। পশম এবং চামড়াও যথেষ্ট হয়।

আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতটা রয়েছে দক্ষিণ দ্বীপে। এক সময় এই পাহাড়টিকে লোকে দুর্ভেদ্য বলেই জান্‌ত কিন্তু বছর কুড়ি হ'ল এই পাহাড় কেটে একটা সুড়ঙ্গ বসান হয়েছে। বৃটীশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে এই 'আর্থার-পাস্‌' সুড়ঙ্গই সব চেয়ে বড়—প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা। সুড়ঙ্গের ভিতরে দিব্যি ইলেক্‌ট্রিক্‌ ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। পাহাড় ফুঁড়ে যাতায়াত করতে কোন অসুবিধাই নেই।

ক্যান্‌টারবেরী সমতলভূমির কথা আগে বলেছি। এখানে এলে দেখবে অসংখ্য ভেড়া সব সময়ে চরে বেড়াচ্ছে। উপকূলবর্ত্তী সহরগুলিতে বড় বড় কসাইখানা আছে; এই সব কসাইখানাতেই ভেড়ার মাংস সংগ্রহ করা হয়,

তার পর টিনে এঁটে বিভিন্ন যায়গায় চালান দেওয়া হয়। এখানকার দুধের জিনিষও পৃথিবীবিখ্যাত। কত দুধ হয় তার, হিসাব দিতে গিয়ে এটুকু বল্লেই বুঝবে যে এখানে গড়ে প্রত্যেক লোক পিছু প্রত্যহ ৫৬ আউন্স দুধ পড়ে, আর আমাদের বাংলা দেশে গড়ে প্রত্যেক লোক পিছু পড়ে প্রত্যহ মাত্র ৩ আউন্স দুধ। ছোট ছেলেদের যে 'গ্ল্যাক্সো' প্রভৃতি খাওয়ান হয় তার সব এইখানেই তৈরী হয়। 'ওটাগো'তেও ভেড়া পালা হয়, যদিও বর্ষা সেখানে কম।

উত্তর দ্বীপেও পাহাড়ের কোলে মেষ-পালনের ব্যবস্থা আছে। ভূমিকম্পটা এখানে প্রায়ই হয়ে থাকে তাই এখানকার প্রধান সহর আর রাজধানী ওয়েলিংটনের অনেক ঘর কাঠের তৈরী। এই উত্তর দ্বীপে একটি বিখ্যাত 'মৃত' আগ্নেয়-গিরি আছে—তার নাম মাউণ্ট এগমণ্ট।

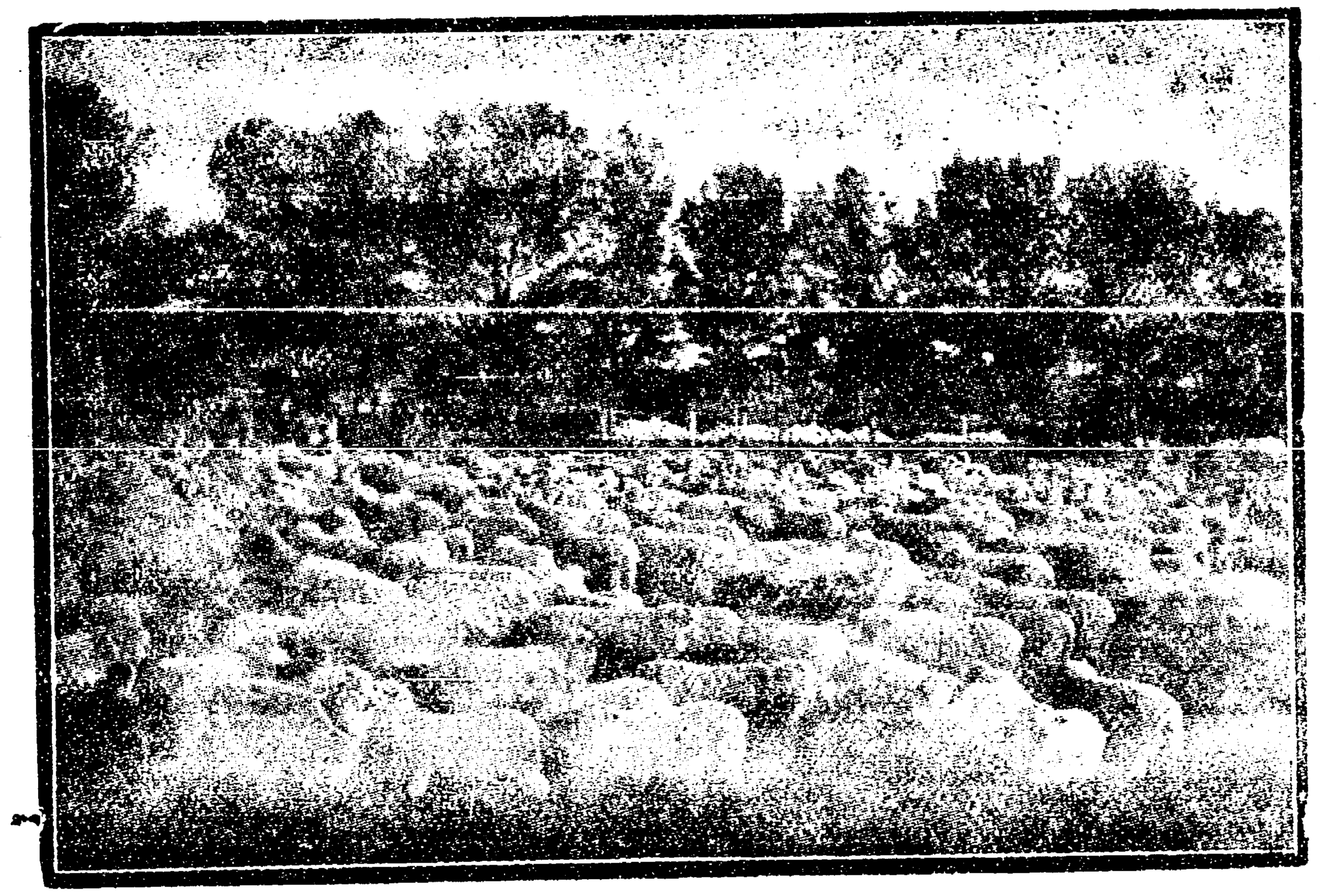

অসংখ্য ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে।

এই বারে এই দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু বলি। এখানকার যারা বাসিন্দা তাদের বলা হয় ম্যাওরি। এরা দেখতে বেশ সুন্দর। গায়ের রং একটু তামাটে, কিন্তু মাথার চুল ভারী চমৎকার। ঐ চুল তাদের একটা গর্ব্বের বস্তু—যেমন রামধনু-গ্রাহিকাদের অনেকের। গায়ে তারা নানা রকমের উল্‌কি পরতে ভালবাসে। তোমরা যদি কখনও মধ্যপ্রদেশ বা উড়িষ্যার মফঃস্বলে বেড়াতে যাও তা' হ'লে এমনি উল্‌কি-কাটা মেয়ে-মানুষ অনেক দেখ্‌তে পাবে। মুখে দাগ কাটা প্রথা আজকাল অবশ্য উঠে গেছে তবে বুড়ো দলপতিদের মুখে উল্‌কি এখনও দেখা যায়। মেয়েদের চিবুকেও



অমনিধারা দাগ কাটা হয় কিন্তু ছোকরা গোছের লোকেদের মধ্যে দাগ কাটার রেওয়াজ নেই। ম্যাওরিরা এখন উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তারা সব বিষয়ে ইয়োরোপীয়দের অন্ধ ভাবে অনুকরণ করতে সুরু করেছে। এখন এমন অনেক ম্যাওরি দেখতে পাওয়া যায় যারা খাঁটি বিলাতী পোষাক ছাড়া পরে না। কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষদের বেশভূষা খুব সস্তার,—মাত্র একটা কাপড়; আর ধনী হ'লে রং-বেরঙের ফুল আঁকা একটা চাদর, তা'তে অনেক যায়গায় সুন্দর সুন্দর পালক সেলাই করা থাকে। মেয়েরা মাথায় অনেক রকমের পালক গোঁজে। তাদের সবচেয়ে সুন্দর দেখায় কোন পর্ব্বদিনে।

পূর্ব্বে ম্যাওরিরা কাঠের ঘরে থাকত। ভূত-প্রেতও তারা বিশ্বাস করত খুব বেশী আগে, কিন্তু আজকাল আর সে ভাব নেই। পুরানো বাড়ীর থামে, দেওয়ালে নানা রকমের মুখওয়ালা দেবতা, প্রেত এই সব প্রায়ই আঁকা আছে দেখা যায়। ম্যাওরিরা শুধু বেশভূষায় বিলাতী ধরণ অনুকরণ করছে না, তাদের অনেকে বিলাতী কৃষকের মতও হ'তে চেষ্টা করছে। উকীল, ডাক্তার, পাদ্রী, শিক্ষক—এ সবও আজকাল তাদের মধ্যে যথেষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমন কি পার্লেমেণ্টের মেম্বারও।

এই ম্যাওরিরা খুব উঁচু দরের ঘোড়-সওয়ার। তাদের দেশে শিশুরা চার-পাঁচ বছর বয়সেই ঘোড়ায় চাপতে শেখে। আমাদের দেশে মফঃস্বল সহরের ইস্কুলের সামনে যেমন ছেলেদের সাইকেল রাখবার যায়গা থাকে ওদেশে ঠিক তেমনি ঘোড়া রাখবার আস্তাবল থাকে।

ওদের রীতি-নীতিও অনেক বিষয়ে আমাদের চেয়ে একেবারে আলাদা। তা'দের সম্ভাষণ করার এক মজার প্রথা আছে। আমরা তো পরিচিত বা অপরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে প্রণাম বা নমস্কার করি। সাহেবরা হ্যাণ্ড শেক্ করে। তারা কি করে জান? দু'জনকার দেখা হ'লে নাকে নাক ঠেকিয়ে ঘষতে থাকে; ঐ নাকি তাদের দেশের নমস্কার! সর্দ্দি হ'লেই একটু অসুবিধায় পড়তে হয় নিশ্চয়ই। নয় কি? কিন্তু আজকাল শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে এ প্রথা উঠে যাচ্ছে। মফঃস্বলে বুড়োদের মধ্যে এখনও এর চলন আছে।

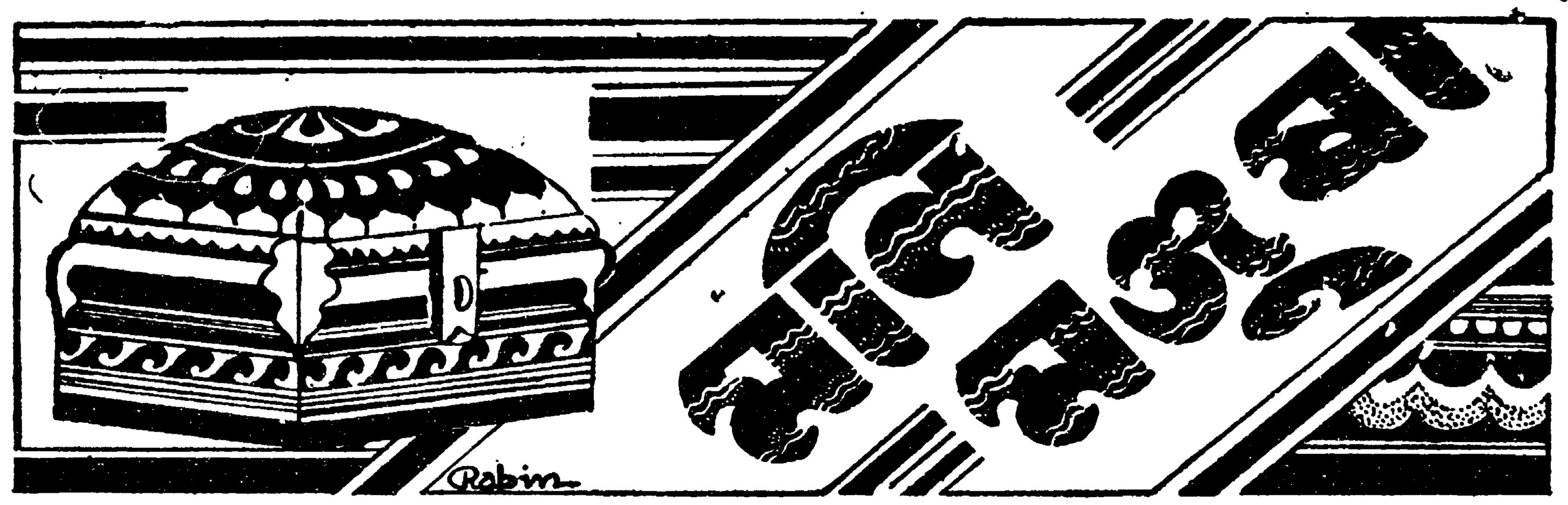

শ্রীঅশোক সেন, এম্.এ

জন্ গল্‌সোয়ার্দি ( ১৮৬৭-১৯৩৩ ) ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ১৯৩২ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। আমাদের সামাজিক জীবনের কতকগুলো বড় বড় সমস্যা নিয়েই তাঁর বেশীর ভাগ বই লেখা হয়েছে। ধনী-নির্ধনের মাঝে যে চিরন্তন প্রভেদ, সভ্য মানুষের গড়া আইন-কানুন যে সব সময়ে নিরপেক্ষ হয় না—এই সব প্রশ্নই তিনি তুলেছেন তাঁর লেখার মধ্যে। এ জন্য যাঁরা সমাজ-সংস্কারক তাঁদের পক্ষে অনেক কিছু ভাববার আছে এই সব বইএ। 'দি সিল্‌ভার বক্স' সেই রকম একখানি সমস্যামূলক বিখ্যাত নাটিকা,—প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর ইঙ্গিতগুলো সবই যে অভ্রান্ত তা নাও হ'তে পারে। বড় হ'লে এ সবের সত্যাসত্য নিজেদের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে।

## 'দি সিল্‌ভার বক্স'

জন্ বার্থউইকের অভিজাত বংশ—নিজে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য। ধনী-মানী লোক—বংশের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তিনি সব সময়ে সচেষ্ট। দরিদ্র মজুরদের তিনি সমানাধিকার দিতে রাজী নন্, তবে তাদের দুরবস্থার প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। মিসেস্ বার্থউইক কিন্তু একেবারে গোঁড়াপন্থী—শ্রমিক আন্দোলন বা তাদের দাবী—কিছুই তিনি প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন না। এই অবস্থায় ধনীর দুলাল জ্যাক্ যে বিগ্‌ড়ে যাবে তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আর হয়েছিলও তাই। জ্যাক্ ছাত্রজীবন থেকেই টাকার অপব্যয় করতে সুরু করেছে—তাও আবার বাপকে না জানিয়ে। ওকে বাঁচাতে ও নিজেদের সুনাম বজায় রাখবার জন্য অনেক দণ্ড দিতে হয়েছে জন বার্থউইক্‌কে।

এদিকে শ্রমিক জোন্‌সের সংসার—তার স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেমেয়ে। বড়ই দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত ওরা। দিন এনে দিন খেয়ে কোন রকমে সংসার চলে। তারপর আবার জোন্‌সের সব সময়ে কাজ জোটে না; মাসের মধ্যে অনেক দিন তাকে বেকার বসে থাকতে হয়। দ্বারে দ্বারে ঘুরে প্রার্থনা জানায়, "কাজ দেবেন? ঘরে বউ-ছেলেমেয়ে আছে।" কেউ ওকে কাজ দেয় না;



বরঞ্চ প্রত্যুত্তরে মনিবদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে ওর মনে হয় যেন সহস্র সাপ ওকে দংশন করছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করবে তারও উপায় নেই। এই সব দেখে দেখে মন তার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে: আমাদের সমাজের কি ন্যায়-বিচার, একেই আমরা বলি সাম্যের যুগ! যাই হোক, মিসেস্ জোন্‌স্ ঝিয়ের কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়। আজ মাস খানেক হ'ল বার্থউইকের বাড়ীতে ও কাজ নিয়েছে।

সেদিন ইষ্টারের সময়ে একটি ঘটনা থেকে অশান্তি দেখা দিল। অনেক রাতে জ্যাক্ বার্থউইক্ নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় বাড়ী ফিরে দরজা আর খুলতে পারে না। সেই সময় জোন্‌স্‌ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—তারই সাহায্যে দরজা খুলে জ্যাক্ খাবার ঘরে ঢুকে সোফায় এলিয়ে পড়ল। জ্যাকের হাতে একটি মণি-ব্যাগ্। ওর অসংলগ্ন কথা থেকে বোঝা গেল, ওটি ও অন্য কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। জোন্‌স্ ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ওর হাত থেকে মণি-ব্যাগটা কেড়ে নিল। তার পর একটু ইতস্ততঃ করে সিগারেটের একটা রূপোর কৌটো পকেটস্থ করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরদিন মণি-ব্যাগের মালিক এসে ওটা দাবী করল। বার্থউইক্ তো আকাশ থেকে পড়লেন—তাঁর ছেলে কিনা আজ চুরি করেছে! অর্থদণ্ড দিয়ে সে-যাত্রা রক্ষা পেলেন।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে যেত যদি না সেই রূপোর কৌটোটাও সঙ্গে সঙ্গে নিখোঁজ হ'ত। বার্থউইকদের বাড়ীতে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সবাই নিঃসন্দেহ হ'ল যে ওটা চুরি গেছে, বার্থউইক্ ভাবলেন, চোর খুঁজে বের করতেই হবে; এ-সবের প্রশ্রয় দিলে আমাদের সমাজ দু'দিনেই বিপন্ন হয়ে পড়বে। অনেক খোঁজখবর নেওয়ার পর সকলের সন্দেহ গিয়ে পড়ল মিসেস্ জোন্‌সের উপর। জোন্‌সের অবস্থা ভাল নয়, তার পর আবার তার স্বামীও বেকার। এ-অবস্থায় ওর পক্ষে ওই দামী জিনিষটার লোভ সাম্‌লান খুবই কষ্টকর। জিজ্ঞেস করতেই মিসেস্ জোন্‌স্ কথাটা একেবারে অস্বীকার করে বসল; তা হলেও, মনিবের সন্দেহ দূর করতে পারল না। মিঃ বার্থউইক্—আইন ও শৃঙ্খলার অভিভাবকদের একজন—এই অন্যায় বরদাস্ত করতে পারলেন না। পুলিশে খবর গেল।

জোন্‌সের বাড়ী। বাড়ীখানা জীর্ণ ও পুরোনো। সেদিন মিসেস্ জোন্‌স্ কিছু আগেই বাড়ী ফিরল। এসে দেখল, জোন্‌স শুয়ে আছে, পায়ের নীচে কোটটা গড়াগড়ি যাচ্ছে, জুতোযোড়া একেবারে কর্দ্দমাক্ত। বাড়ী ফিরেই আবার সেই অভাব অভিযোগ—ছেলেমেয়েদের কি খেতে দেবে তার ভাবনা; এর মধ্যে আবার বাড়ী ভাড়ার জন্য অতিষ্ঠ করে তুলেছে—তাও মেটাতে হ'ল।

হঠাৎ জোন্‌সের হাতে একটা লাল থলে দেখে ভীতস্বরে সে বল্‌ল, "এটা কি?, নিশ্চয়ই চুরি করে আনা হয়েছে?"

"চুরি ? কখ্‌খনো না, এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।"

এ কথা ও কথায় থলের কথাটা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে জোন্‌সের থলেটা একটু ঝাড়তেই একটি রূপোর কৌটো টুপ্‌ করে মেঝেতে পড়ল; তার স্ত্রীর তো চক্ষুস্থির—তা' হলে ওরা তো মিছে সন্দেহ করে নি; আজ ওর সুনামটুকু নষ্ট হয়ে গেলে ভবিষ্যতে কোথাও আর কাজ পাবে না। মিসেস্ জোন্‌স্ ঠিক করল, ওটা ফিরিয়ে দিয়ে সব কথাই ওদের খুলে বলবে।

এই ভেবে যেই জোন্‌সের হাত থেকে ওটা কেড়ে নিতে যাবে, ঠিক সেই সময় পুলিশ বিভাগের একজন কর্ম্মচারী সেই ঘরে ঢুকেই চুরির অপরাধে জোন্‌সের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। এখনও সে তার দোষ অস্বীকার করল—কিন্তু এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ, সেই রূপোর কৌটোটা, সামনে থাকতে পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করবে কেন ? তা'ছাড়া বার্থউইকের যে ঘরে ওটা ছিল সেখানে আজ সকালে কিছুক্ষণ ওকে একলা থাকতেও দেখা গিয়েছিল। এখন কৌটোটা এখানে পাওয়া গেল। আর কি প্রমাণ চাই ? জোন্‌স্ তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করল; কিন্তু পুলিশ সে কথায় কান দিল না। তখন সে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে মারল এক ঘুষি সেই পুলিশ কর্ম্মচারীটিকে। মারপিটের অপরাধে পুলিশ তাকেও ধরে নিয়ে গেল।

পুলিশ কর্ম্মচারী বার্থউইক্‌কে খবর দিয়ে গেল, চোর ধরা পড়েছে এবং সেই সঙ্গে জোন্‌সের কাছে একটা লাল মণিব্যাগ পাওয়া গেছে। বার্থউইকের বুঝতে দেরী হ'ল না যে এই ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ালে জ্যাক্‌কে শুদ্ধ জড়াবে। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তাঁর তো অজানা নেই যে, জ্যাক্‌ই মত্ত অবস্থায় জোন্‌স্‌কে ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল, আর সেই থলিটাও তো ওই নিজে চুরি করে নিয়ে এসেছিল। আদালতের জেরায় তো সব কথাই বেরিয়ে পড়বে। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে—অক্সফোর্ডের ছাত্র জ্যাক্ আজ কিনা জোন্‌সের মত বাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা সুরু করেছে! বার্থউইক্ প্রমাদ গণলেন। দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা দেখানোর অজুহাতে জোন্‌সের বিরুদ্ধে চুরির মামলাটা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব তিনি পুলিশ কর্ম্মচারীর কাছে করলেন। কিন্তু তা কি হয় ? সত্য যা, তা বেরিয়ে পড়বেই। সলিসিটার নিযুক্ত করলেন; তিনি আশ্বাস দিয়ে গেলেন, মণি-ব্যাগের ব্যাপারটা আদালতে চাপা দিতে চেষ্টা করবেন এবং জ্যাকের জন্য যা করবার তা করবেন। টাকা অনেক সময় আমাদের অনেক উপকারে আসে, কিন্তু…! যাক্, এই সব আলোচনা করতে করতে রাত হয়ে গেল; ঠিক এই সময় দূরে অন্ধকারে একটি শিশুর কান্না শোনা গেল—জানা গেল, রাস্তায় জোন্‌সের ছোট্ট ছেলেটি কাঁদছে।

আট দিন পরের কথা। লণ্ডনের পুলিশ-কোর্ট। আজ জোন্‌স ও তার স্ত্রীর বিচার হবে—



জ্যাক্‌কেও সাক্ষ্য দিতে হবে। বার্থউইক্‌ও উপস্থিত। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ক'রে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জোনসের স্ত্রীকে মুক্তি দিলেন; কিন্তু গোলমাল লাগ্‌ল জোন্‌স্‌কে জেরা করবার সময়ে। জেরার উত্তরে ও উত্তেজিত হয়ে বল্‌ল: "জ্যাক্ যা করেছে, আমি তার চেয়ে বেশী কিছু অন্যায় করি নি; কিন্তু আমি গরীব, পয়সা নেই, কোন বন্ধুও নেই; ও যা করতে পারে আমি তা করতে পারি না। আমার মত বেকার সহায়হীন হ'লে অনেকেই এ রকম কাজ করে থাকে। আচ্ছা, জ্যাক্‌কে জিজ্ঞেস করুন তো ও কেন——" ব্যস্, কোর্ট আর ওকে কিছু বলতে দিল না। আর বলতে দিলেও, এই সব কথার কি কোন মূল্য আছে ? রূপোর কৌটোটা ও নিয়েছে—এ কথা ও স্বীকার করেছে। কিন্তু কেন নিয়েছিল ? কার প্রশ্রয় ও উৎসাহ পেয়ে ও ও-বাড়ীতে ঢুকেছিল ? যে টাকা ওর কাছে পাওয়া গেছে—তাই বা এল কোত্থেকে ? এ সব রহস্য আজ ভেদ করবে কে ? একমাত্র জ্যাক্‌ই সব কথা খুলে বলতে পারে—তাতে জোন্‌সের অপরাধের গুরুত্ব অনেকখানি কমে যেত। কিন্তু জ্যাক্ তো ওর পরিচয় স্রেফ্ অস্বীকার করে বস্‌ল। এ ছাড়া আইনজ্ঞ সলিসিটারের সুকৌশল চালনায় মণি-ব্যাগের কথাটা উঠ্‌তেই দেওয়া হ'ল না। বার্থউইক্‌ও হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জোন্‌স্‌কে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন, সেই সঙ্গে মন্তব্য করলেন—"এই প্রকৃতির লোক সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ।"

"এই তবে হ'ল ন্যায়-বিচার ?—একেই আমরা বলি জাষ্টিস! কিন্তু জ্যাকের কি হ'ল ? ওই তো মণি-ব্যাগটা প্রথমে চুরি করেছিল। টাকার জোরেই না আজ ও বেঁচে গেল!………" জোন্‌সের আর বলা হ'ল না। দু'জন পুলিশ এসে ওকে বের করে নিয়ে গেল।

---

# বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

শ্রীআনন ঘোষাল

## ৪

হ্যালিসহরের প্ল্যাটফর্ম্। ট্রেনখানা ইন্ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সেকেণ্ড্ ক্লাসের দরজা খুলে গেল। প্রফেসার মুখার্জ্জি ব্যস্তভাবে বন্দুক হাতে দরজার সামনে এসে, দেওয়ালের উপরে আঁকা ষ্টেশনের নামটার দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে দেখে, চেঁচিয়ে উঠলেন—"হ্যালিসহর। বয়েজ্! চাপরাশী!"

এদিকে পাশের থার্ড ক্লাশেরও ত্ব’-তিনটে দরজা একসঙ্গে খুলে গেল। দরজায় দরজায় ভীড় করে ছেলেদের দল প্রত্যুত্তর করল—“স্তর, ইয়েস্ স্তর।”

গাড়ীখানা থামবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসার সাহেব নেমে পড়লেন। বাঁধা গরু ছাড়া পেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি করেই ছেলেদের দল হৈ হৈ করতে করতে, প্ল্যাটফর্মের উপর লাফিয়ে পড়ল। তাদের পিছন পিছন নামতে লাগল ইউনিভারসিটির তক্‌মা আঁটা চাপরাশীর দল। প্রফেসার সাহেব হাতের ঘড়ীটা দেখে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—“ফোর সেকেণ্ডস্ মোর। কুলি, কুলি!”

প্রফেসার অনেক হাঁকডাক করলেন। কিন্তু সবই বৃথা। কোনও কুলি বা মুটের দর্শন পেলেন না। ছোট্ট ষ্টেশন, কুলি কোথায়? সাদা কাপড়ের উপর নীল কোর্ত্তা পরা ষ্টেশন মাষ্টার এতক্ষণ সাহেবকে লক্ষ্য করছিলেন, তিনি একটু এগিয়ে এসে জানালেন—“কুলি এখানে পাওয়া যায় না স্তর!”

বিরক্ত হয়ে প্রফেসার চেঁচিয়ে উঠলেন—“হু সেইস্ সো? হুয়াক?”

ষ্টেশন মাষ্টার এরূপ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। একটা বিশেষ ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে তিনি পিছিয়ে এসে বললেন—“কে রে বাবা!”

এদিকে হঠাৎ ট্রেনখানা চলতে সুরু করল। গার্ড্ সাহেব হুইস্‌ল্ দিতে দিতে নিশান নেড়ে এগিয়ে চললেন। ছাত্র অজিত ট্রেনের দিকে প্রফেসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে উঠল—“গাড়ী যে ছেড়ে দিল স্তর!”

চাপরাশীর দল ব্যস্তভাবে গাড়ী থেকে তখনও লাগেজ নামাচ্ছিল। প্রফেসার তাদের একজনকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—“এই উল্লুক, ত্ব’ নম্বরের বাক্সটা সাবধানে নামাস্। ওতে মাইক্রসকোপ্ আছে। মিঃ রায়! হোয়ার ইজ্ ডিমনষ্ট্রেটার রায়?”

চায়ের ফ্লাস্‌ক্ আর খাবারের টুক্‌রী নামাতে নামাতে ডিঃ রায় উত্তর দিলেন—“ইয়েস্ প্রফেসার, আই য়্যাম্ হিয়ার।”

অনেক কষ্টে তাড়াহুড়ো করে চাপরাশীরা জিনিষপত্র নামিয়ে আন্‌ল। কেবল মাত্র প্রফেসারের কোটটা বাদে আর সবই নামান হয়েছে, এমন সময় হুস্ হুস্ ক’রে গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে প্রফেসার বললেন—“নেভার মাইণ্ড্। মাষ্ট্ বি য়্যান্ আন্‌লাকি কোট্। এখন দেখি হ্যালিসহর পরগণার ম্যাপ্‌খানা। নক্সাখানা কার কাছে আছে?”

ডিমনষ্ট্রেটার রায় তাড়াতাড়ি লাগেজের তাড়ার উপর হ্যালিসহর পরগণার নক্সাখানা বিছিয়ে ধরে উত্তর করলেন—“এই যে আমার কাছে। আই হ্যাভ্ গট্ ইট্।”

প্রফেসার নক্সাখানার উপর কয়েকটা পেন্‌সিলের ডট্ দিয়ে জানিয়ে দিলেন—“এই হচ্ছে আমাদের পথ। বুঝলে? দিস্ উড্ বি আওয়ার রুট।”



ডিঃ রায় অনেক ক্ষণ ধরে স্থিরদৃষ্টিতে ম্যাপখানা দেখে নিয়ে উত্তর দিলেন—“হুঁ, দ্যাট্‌স্ ইট্। এই পথই হবে।”

কয়েকজন গ্রাম্য গৃহস্থ শনিবারের বাজার সেরে, পোঁটলা পুঁটলি হাতে, গ্রামে ফিরছিল। সাদাসিদে পরিচ্ছদে, গল্প করতে করতে তারা চলে আসছিল। হঠাৎ তাদের উদ্দেশ করে প্রফেসার বলে উঠলেন—“এই, টোমরা আমার সঙ্গে যাবে?”

প্রফেসারের এই অদ্ভুত প্রশ্নে ভদ্রলোকেরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিরক্ত হয়ে তারা চলে গেল। প্রফেসারের কথার কেউ উত্তর দিল না। একজন মাত্র বলে গেল—“না সাহেব, আমরা কুলি নই।”

কুলির অভাবে প্রফেসার উত্যক্ত হয়ে উঠলেন। এতগুলো জিনিষ নিয়ে পথ চলতে হবে, সঙ্গে ক্যাম্প্‌ও আছে। বিরক্ত হয়ে প্রফেসার বলে উঠলেন—“এই এ দেশের একটা ড্র ব্যাক্। এভ্‌রি বডি ইজ্ লেজি হিয়ার। ইভ্‌ন্ দি ইণ্ডিয়ান্ ডগ্ ইজ্ লেজি। বাট্ ইন্ আওয়ার লণ্ডন, উই ফাইণ্ড—ওহ্—”

এদিকে ছাত্র অজিত ডিঃ রায়ের হাত থেকে হ্যালিসহর পরগণার নক্সাখানা নিয়ে, আশেপাশের জমিজমা, পথঘাটের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। এইবার সে প্রফেসারের কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল,—“মিলছে না যে স্তর?”

“ইডিয়ট্” সম্বোধনের পর প্রফেসার নিজের হাতে নক্সাখানি তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—“উত্তর কোন্ দিক্। য়্যাঁ, হুইচ্ ইজ্ দি নর্থ?”

সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। এইবার ইডিয়ট্ হবার পালা কার তা কারুর বোধগম্য হ’ল না। অজিতের ঘড়ির লকেটে একটা কম্পাস ছিল। তাড়াতাড়ি হাতের চেটোর উপর সেটা সমভাবে রেখে সে উত্তর করল,—“পেয়েছি স্তর্।”

ছাত্রের দল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ডিঃ রায় আজিতের পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললেন—“ব্রেভো মাই বয়।” প্রফেসার ষ্টেশনের উত্তর দিক্‌টার একটা রাস্তার সঙ্গে নক্সার একটা লাইন্ মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। এবার উৎফুল্ল হয়ে তিনি বলে উঠলেন—“এই পথ দিয়ে যেতে হবে। হারি আপ্ বয়েজ্।”

আদেশ পাবা মাত্র ছেলের দল মিলিটারি কায়দায় তুই সারি হয়ে দাঁড়াল। প্রফেসার সামনের দিকে সরে এলেন। ডিঃ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—“ষ্টুডেণ্টস! কুইক্ মার্চ্।” হাত তুলিয়ে তুলিয়ে ছেলেরা চলতে সুরু কর্‌ল। (ক্রমশঃ)

# অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

[ সত্য ঘটনা ]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতা যে ঘটতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। গহন অরণ্যের মধ্যে হিংস্র জন্তুর বা ততোধিক হিংস্র জংলী মানুষের পাল্লায় পড়ে ফিরে আসা, অথবা আবিষ্কারের নেশায় বরফের রাজ্যে বা মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পথ হারিয়ে অবিশ্বাস্য উপায়ে উদ্ধার পাওয়া—এ রকম কাহিনী তো কতই শোনা যায়! বছর খানেক আগে তো আমাদেরই এক বন্ধু বিলেত থেকে ফিরবার পথে জাহাজ-ডুবি হয়ে সাত দিন একটা ভাঙ্গা নৌকোয় সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে ভেসে বেড়িয়েছিলেন। খাবার ফুরোতে ফুরোতে শেষে যখন প্রত্যেকের ভাগে দৈনিক ছু' খানা বিস্কুট আর এক চামচে জল বরাদ্দ হ'ল, এবং অনাহারে চোখের উপর একটি ছু'টি করে সঙ্গী মরতে সুরু কর্‌ল তখন দৈবাৎ এক মিত্র পক্ষীয় জাহাজ তাঁদের উদ্ধার করে। সে সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে অভিজ্ঞতার কথা বল্‌ব তার কাছে সেও যেন কিছু নয় বলে মনে হবে।

ঘটনাটি একটি পুরোনো ইংরেজী কাগজে বেরিয়েছিল, এবং ঘটেও ছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু যিনি ঐ কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন তিনি খুব জোর করেই লিখে গেছেন যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য।

ব্যাপারটা ঘটেছিল তিমি শিকার উপলক্ষ্য করে। অন্যান্য শিকারের মত তিমি শিকারটাও যে মানুষ কোন দিন বাদ দেয় নি তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। কেবল সখ ক'রে বা শিকারের বাতিকের জন্য নয়, ব্যবসার দিক্ দিয়েও তিমি শিকার একটা মস্ত লাভজনক ব্যাপার। তিমি নানা জাতের হয়। কোনটার দাঁত থাকে, কোনটার থাকে না। এক রকম অতিকায় তিমি আছে (ওজনে ৩।৪ হাজার মণ), তাদের মুখের মধ্যে থাকে এক রকম অতিকায় হাড়ে বোনা ঝালর—ইংরেজীতে যাকে বলে 'হোয়েল বোন্'। এ ঝালর মানুষের অনেক সৌখীন



জিনিষ তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। আর এক রকম তিমি আছে, তাদের বলে 'স্পার্ম্ হোয়েল' বা মোমতিমি। আকারে এরাও বড় কম নয়, হাঁ করলে ছোটখাট নৌকো গিলে ফেলতে পারে। এদের মাথা ভর্ত্তি থাকে প্রচুর মোম; এক-একটার মোম বার করে নিতে পারলে তা দিয়ে বেশ বড় গোছের এক-একটা জলের চৌবাচ্চা বোঝাই করা যেতে পারে। এদের পেটেও থাকে এক রকম রজন জাতীয় জিনিষ, সেটাও খুব দামী। তা ছাড়া তিমির গায়ে যে বিরাট পরিমাণ তেল বা চর্ব্বি পাওয়া যায় তার দামও বড় কম নয়। আজকাল তো তিমির চামড়া, মাংস, হাড় কিছুই ফেলা যায় না!

তিমি শিকারের জন্য আলাদা ধরণের জাহাজ থাকে। ঐ জাহাজে চড়ে

একটি অতিকায় তিমি

তিমি শিকারের বল্লম—হারপুন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিমি-শিকারীর দল, সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। উত্তর সাগর, আটলান্টিক মহাসাগর প্রভৃতি হচ্ছে তিমির রাজ্য।

যেদিনের কথা বলছি সেদিনও এমনিধারা একখানি তিমিশিকারী জাহাজ আটলান্টিক মহাসমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ জাহাজের ক্যাপ্‌টেন্ দেখ্‌তে

পেলেন, একটা অতিকায় মোমতিমি জাহাজ থেকে অল্প দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকার দেখে মনে হ'ল—তিমিটাকে মারতে পারলে শ' খানেক না হোক, অন্ততঃ নব্বই মণ চর্ব্বি পাওয়া যেতে পারে। এত বড় লোভ দমন করা কোন তিমি-শিকারীর পক্ষেই সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন তখনই জাহাজ থেকে বোট্ নামিয়ে কয়েকজন বাছা বাছা অনুচর ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিমিটাকে ধাওয়া করলেন। কিন্তু সে তিমি কি সহজে ধরা দেবার পাত্র? লেজের আছাড়ে সমুদ্র তোলপাড় করে, লোকজন জখম ক'রে, সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। নৌকো উল্টে দেয় আর কি! যা হোক্, অনেকক্ষণ যুদ্ধ ক'রে অবশেষে তাকে ঘায়েল করা হ'ল।

তিমি তো মর্‌ল কিন্তু দেখা গেল নাবিকদের মধ্যে বার্ট্‌লি বলে একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল বার্ট্‌লি? নিশ্চয়ই তিমির লেজের ঝাপ্টায় নৌকো থেকে জলে পড়ে গেছে। কিন্তু বার্ট্‌লি তো ভাল সাঁতার জান্‌ত! তবে কি গুরুতর রকম জখম হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তাই তলিয়ে গেল?

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বার্ট্‌লিকে পাওয়া গেল না। কি আর করা? অগত্যা তার আশা ছেড়ে দিয়ে সকলে মিলে তিমিটা কেটে তার চর্ব্বি সংগ্রহে মন দিল। এই ভাবে সারা দিন কেটে গেল। অবশেষে অতি সাবধানে তিমির পেট চেরা আরম্ভ হ'ল। কারণ, আগেই বলেছি, এই জাতের তিমির পেটে যে রঞ্জন জাতীয় জিনিষ পাওয়া যায় তাও খুব মূল্যবান্।

কিন্তু পেট খানিকটা চিরতেই দেখা গেল অদ্ভুত কাণ্ড। তিমির পেটের ভিতর আস্ত একটা মানুষ! মানুষটিকে টেনে বার করা হ'ল; তখন সবাই দেখে, কি অদ্ভুত ব্যাপার, এ যে তাদের বার্ট্‌লি! আর—আরও অদ্ভুত কাণ্ড, বার্ট্‌লি তখনও মরে নি—অজ্ঞান হয়ে আছে শুধু।

বার্ট্‌লিকে ধরাধরি করে জাহাজে তোলা হ'ল; তার পর অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর অবশেষে সত্যি সত্যি বার্ট্‌লির জ্ঞান হ'ল, এবং ক্রমে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

ঘটনাটা নাকি এই ভাবে ঘটেছিল। তিমির লেজের বাড়িতে সমুদ্রের জল যখন তোলপাড় হ'তে থাকে তখন বার্ট্‌লি হঠাৎ নৌকো থেকে পড়ে যায়। ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝবার আগেই সে টের পেল যে সে একটা ভয়ানক পিছল পথ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার পরই প্রচণ্ড গরমে তার সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার পর কি হ'ল সে আর জানে না। জ্ঞান হ'লে দেখছে জাহাজে শুয়ে আছে।



বার্ট্‌লির সৌভাগ্য যে তিমিটা তাকে গিলে ফেলবার পরই মারা পড়ে, তাই তাকে আর হজম করবার সুযোগ পায় নি। যতক্ষণ সেটা বেঁচেছিল সেই সময়টুকুই জীবন্ত তিমির শরীরের ভিতরকার প্রচণ্ড উত্তাপে বার্ট্‌লির অবস্থা শেষ হয়ে এসেছিল। অজ্ঞান না হ'লে সে ভয়েই নির্ঘাৎ মারা পড়্‌ত। তিমির মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে থাকাতেই বোধ হয় তার নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বার্ট্‌লির অভিজ্ঞতার মত এ রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী আর কখনও শুনেছ?

---

# নিমাই পণ্ডিত

[জীবন-কথা]

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্

সাড়ে চারশ' বছর আগেকার কথা। নবদ্বীপ সহর। একদিন সকাল বেলা দেখা গেল একটী বাড়ী থেকে একটী ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এল, পেছনে তার মা, লাঠি হাতে। ছেলেটী বড় দুষ্টু, মা কিছুতেই তা'কে বাগ মানাতে পারেন না। ছেলেটী এক দৌড়ে গিয়ে বাড়ীর বাইরে এঁটো ময়লার যে স্তূপ ছিল তা'র মাঝখানে একটা ভাঙা হাঁড়ির ওপর গিয়ে ব'সে পড়্‌ল। মা আর সেই নোংরার মধ্যে যেতে পারেন না, গেলে স্নান করতে হ'বে, তাই খানিকক্ষণ বকুনি দিয়ে ফিরে গেলেন। ছেলেটী তখন হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে দাঁড়াল। তার পর চল্‌ল গঙ্গায়।

গঙ্গায় ঘাট অনেকগুলি। দলে দলে লোক স্নান করছে, পূজো করছে। ছেলেটী এসেই একজনের সাজান নৈবেদ্যের থালা তুলে নিয়ে তা' থেকে খেতে

সুরু করল। সেখানে তাড়া খেয়ে গেল আর একজনের পূজোর ফুল নিয়ে নিজেই পূজো করতে। সেখানে বকুনি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্ল গঙ্গায়, আর যাবার সময় একজনের পা ধ'রে তাকে একটু গভীর জলে টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। আবার হয়তো এক ডুবে গিয়ে একজনের পায়ের ফাঁকে ভেসে উঠে তাকে ভয় পাইয়ে দিল। তার হাজার রকম দুষ্টুমীতে লোকে পাগল হ'য়ে যাবার উপক্রম।

তোমরা হয়তো ভাবছ' যে এ ছেলে তো গোল্লায় যা'বে, এর কথা আর কি শুন্ব? তা নয়। দুষ্টুমীতেও যেমন লেখাপড়ায়ও তেমনি এর যুড়ি ছিল না। চৌদ্দ বছর বয়সে সে যে ব্যাকরণ লিখেছিল তা' অনেক পণ্ডিতদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। তার পর ন্যায়শাস্ত্র পড়তে আরম্ভ ক'রে সে বিষয়ে সে একখানা বই লিখতে আরম্ভ করে, কিন্তু তার আর একটী বন্ধুর লেখা একখানা বইয়ের আদর ক'মে যাবে ব'লে নিজের লেখা বইখানি গঙ্গায় ফেলে দেয়। তার পড়াশুনাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়।

এই ছেলেটীর নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। চিন্‌তে পারলে কি? ইনিই পরে সন্ন্যাসী হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় আর দক্ষিণ ভারতে সহস্র সহস্র লোক আজও তাঁকে ভগবানের অবতার ব'লে মানেন। নিমগাছের তলায় জন্মগ্রহণ করেন ব'লে তাঁর ডাকনাম ছিল নিমাই।

নিমাই ষোল বছর বয়সে পড়াশুনা শেষ ক'রে নবদ্বীপে ব্যাকরণ পড়াবার জন্য এক টোল খুল্‌লেন। জ্ঞানী লোকের বয়স তো আর কেউ দেখে না তাই ছাত্রও জুট্‌ল অনেক। তাই ব'লে নিমাইয়ের ছট্‌ফটে স্বভাব কমেছে নাকি? রাস্তা দিয়ে এক দৌড়ে গঙ্গায় যাবেন, সেখানে গিয়ে পণ্ডিতদের নানা প্রশ্ন ক'রে ঠকাবেন, একে ঠাট্টা করবেন, ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দেবেন, সবই চল্‌ছে।

এমনি ক'রে দু'বছর কাট্‌ল। পড়ান'য় নিমাইয়ের বেশ নাম হ'য়েছে। এমন সময় এলেন কাশ্মীর থেকে কেশব পণ্ডিত। তিনি পথে যত জায়গায় যত পণ্ডিত পেয়েছেন সকলকে বিদ্যায় হারিয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন। তাঁদের হারাতে পারলেই তিনি দিগ্বিজয়ী হ'তে পারেন। কিন্তু তাঁর কপাল মন্দ, পড়্‌বি তো পড়্ একেবারে নিমাইয়ের পাল্লায়।



ব্যাপারটা হ'ল এই রকম। কেশব পণ্ডিত নবদ্বীপে এসে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছেন, দেখেন যে একটী ছেলেকে ঘিরে অনেক পড়ুয়া লেখাপড়ার আলোচনা করছে। কেশব তো অতটুকু পণ্ডিতকে দেখে অবাক্। পরিচয় নিয়ে জানলেন যে ছেলেটীর নাম নিমাই পণ্ডিত, ব্যাকরণে একজন দিগ্‌গজ। তখন কেশব একটু এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে নিমাইকে একটু মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন।

ভগবৎ-প্রেমে বিভোর নিমাই

নিমাইও যেন কৃতার্থ হ'য়ে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি দয়া ক'রে গঙ্গার স্তব একটী আমাদের শোনান তা হ'লে ভাল কবিতা শুনে আমরা ধন্য হই।' অমনি কেশব ঝড়ের মত বেগে মুখে মুখে একরাশি সংস্কৃত শ্লোক তৈরী ক'রে গঙ্গার বন্দনা করলেন। যখন শেষ হ'ল তখন নিমাই আবার হাতযোড় ক'রে বল্‌ছেন, 'দয়া করে এই শ্লোকটী আমাদের বুঝিয়ে দিন।' এই ব'লে একটী শ্লোক বললেন। কেশব তো অবাক্! তিনি ঝড়ের মত তাড়াতাড়ি নতুন শ্লোক ব'লে গেলেন, তার থেকে একটি শ্লোক নিমাই কি ক'রে মনে রাখলেন! যা'হোক, তিনি তখন শ্লোকটীর মধ্যে কত ভাল ভাল কথা আছে, আর সেগুলো কত সুন্দর,

ক'রে—কায়দা ক'রে বসান হ'য়েছে ইত্যাদি ব'লে ব'লে শ্লোকের গুণ ব্যাখ্যা করলেন। নিমাই তখন আবার বিনয় ক'রে বলছেন, 'শ্লোকটীতে কোনও দোষ নেই তো ?' শুনে অহঙ্কারী কেশব পণ্ডিত গেলেন চ'টে। তখন নিমাই আস্তে আস্তে দেখিয়ে দিলেন যে ঐ চার লাইন শ্লোকের মধ্যে একঝুড়ি দোষ আছে। কেশবের তো মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। প্রকাশ্য রাস্তায় হাজার লোকের মধ্যে ছোট একটী ছেলের কাছে বিদ্যায় হেরে গেলেন, তাও আবার নিজের তৈরী শ্লোক নিয়ে। পরদিনই তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন, সন্ন্যাসী হ'য়ে। প্রবাদ আছে যে সরস্বতী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে সাক্ষাৎ ভগবান্ নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে তিনি কেশবকে সাহায্য করতে পারেন নি।

নবদ্বীপের মান এইভাবে রক্ষা করেন আঠারো বছরের সেই দুষ্টু ছেলেটী। পরে বড় হ'য়ে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পবিত্র করেন এক নতুন ধর্ম্ম প্রচার ক'রে। সে ধর্ম্মে বলে যে ভগবান্ কেবলমাত্র ভাল আর সুন্দর, তাঁকে ভয় করবার কিছু নেই, তিনি ঘুষ বা খোসামোদ্ চান না, তাঁকে বাধ্য করতে হয় কেবল ভালবেসে।

---

## 'বাসে' বিড়ম্বনা

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, রাত হয়েছে বোধ হয় তখন আটটা কি সাড়ে আটটা। কুঞ্জ দাদু তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে ফিরলেন। ছড়িটাকে ঘরের একটা কোণে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে বসলেন এসে আমাদের সামনের কৌচটায়। মাথায় পাকান চাদরটী খুলতে খুলতে বল্লেন মাসীমার দিকে তাকিয়ে,—'জ্বালাতন! মহা মুস্কিলে পড়েছিলাম আজ!'

আমরা জানি, দাদু মুস্কিলে প্রায়ই পড়েন এবং জ্বালাতনটা হ'ন তার চেয়েও বেশী। ব্ল্যাক আউট, রাস্তায় ষাঁড়, ট্রামে বাসে অসম্ভব ভীড়, বৃহস্পতিবারে দোকান বন্ধ, মাথার উপরে বিদিকিশ্রী আওয়াজ এরোপ্লেনের,—সব কিছুই জ্বালাতন করে তোলে আমাদের দাদুকে। শুধু তাই নয়, লোকের বাড়ী গিয়েও জ্বালাতন হ'তে হয় দাদুকে কম? বুড়ো হয়েছেন যে হেতু সেই হেতু সকলেই তাঁর কাছে নিয়ে এসে হাজির করবে তামাকের গড়গড়া; তারা কি জানে না



যে দাদু কোনও রকম নেশার পক্ষপাতী ন'ন—পানটী পর্য্যন্ত খান না? নিজে ত' করেনই না কোন নেশা—এমন কি যে করে তার ওপরও তিনি হাড়ে চটা।

যাক্, আমরা ভাবলাম, আজও ঘটেছে ঐরকমই একটা কিছু। দাদু বল্লেন—"আমার জীবনে একটা সমস্যাই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কলকাতার লোকগুলো কি সারাদিন ট্রামে বাসেই থাকে—ঘরবাড়ী কি নেই কারো? বৈকালবেলা আজ ঐ বড় রাস্তার মোড়ে পাকা আধটা ঘণ্টা ট্রামের চেষ্টায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে হতাশ হয়ে হলাম 'বাসে'র শরণাপন্ন শেষ পর্য্যন্ত। 'বাস' দেখি সে বিষয়ে ট্রামের উপর দিয়ে যায়! ট্রামে তবু, যাই হোক, ফাষ্ট' ক্লাশে শুধু ভদ্রলোকের ভীড়। বাসের ও সব বালাই নেই—সাম্যের ছড়াছড়ি—ঝাড়ুদার, মাছওয়ালার সঙ্গে হয়ত রাজা হরকিষণের ছেলের একেবারে গলাগলি—বসে এবং দাঁড়িয়ে।

"বাস্ সম্বন্ধেও যখন প্রায় হতাশ হয়ে এসেছি তখন হঠাৎ দেখি একখানি দোতলা বাস্ এসে দাঁড়াল সামনে—দু'চার জন দাঁড়াবার মত জায়গা আছে তার মধ্যে। উঠে পড়লাম চট্ করে। বিদ্যুৎবেগে ছুটল বাস্—মাথার উপরে একটা হাতল ধরে কোনও রকমে দাঁড় করিয়ে রাখলাম নিজেকে বাসের ভিতর।......দুটী কি তিনটী 'ষ্টপেজ্' গেছে হয়ত সবে মাত্র—ব্যস, তিলটী ধরে এমন জায়গাই রইল না; ব্যাঙ-চ্যাপ্টা হয়ে গেলাম স্রেফ্—"

দাদুর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সকলেই হাস্‌ল একটু, উপমাটা নেহাৎ ভুল হয় নি।

দাদু বলতে লাগ্‌লেন—"আরও একটা 'ষ্টপেজ্'—আবার জন কতক লোক, আমার বুকের কাছে চেপে এসে দাঁড়াল একজন।" উঠে পড়ছিলাম; রোজই শুনি দাদুর এ সব গল্প, নতুনত্ব ছিল না কিছুই এতে; নিজেদের ভাগ্যেও ত' রোজই ঘটে এ সব ব্যাপার। প্রায় উঠেছি, এমন সময়ে হঠাৎ কানে এল—দাদু বল্‌ছেন,—"লোকটার চেহারাটী যেমনি, পোষাকও তেমনি। মুখের দু' কষ বয়ে ঝরছে, পানের রস,—তার উপরে সে হতচ্ছাড়াটার মুখে আবার দারুণ মদের গন্ধ—" ওঠা আর হ'ল না, বসে পড়লাম আবার, জমেছে গল্পটা মনে হচ্ছে যেন। দাদুর বুক ঘেঁসে মুখের কাছে দাঁড়িয়ে মতাল! লোকটা দাদুকে চিন্‌ত না তাই—তা না হ'লে দিত লাফ বাস্ থেকে; দাদুও নেহাৎ ব্যাঙ-চ্যাপ্টা হয়ে ছিলেন—নইলে তিনিও এতক্ষণ বাস্ থেকে পড়তেন ছিটকে।

দাদু বলতে লাগ্‌লেন—"জীবনে বহু বিপদে পড়েছি, কিন্তু এ রকম বিপদে কখনও পড়ি নি। কি করব, বিধির মার দুনিয়ার বার; চুপ করে চোখ বুজে মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"হঠাৎ শুনি, আমার কানের কাছে চলেছে এক মহা বাক্-বিতণ্ডা। তাকিয়ে দেখি, কণ্ডাকটার ঐ লোকটার কাছে বাসের ভাড়া চাইছে।

"লোকটা জড়িত কণ্ঠে চোখ বুজে বুজে বল্‌ছে—'কি-সের ভা-ড়া, বা-বা ?'

"কণ্ডাকটারটা হেসে বলে—'কিসের ভাড়া আবার ? বাসের ভাড়া।'

"লোকটী টেনে টেনে বলে—'ভাড়া ত' দিয়েছি বাপধন !'

"কণ্ডাকটার একটু বিরক্ত হয়েছে মনে হ'ল—বল্‌লে শুধু,—'ভাড়া দিয়েছেন, মিথ্যা কথা বল্‌ছেন কেন ?'

"লোকটী চোখটী আধখানা বুজে, পান-খাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মুচকি একটু হেসে বল্‌লে,—'মিথ্যে কথা বল্‌ছি নে, গোপাল ! ভাড়া—মানে নগদ চারটে পয়সা, মানে একটী আনি দিয়েছি, সত্যি বল্‌ছি—'

"কণ্ডাকটার চটে উঠে বল্‌লে আবার—'ভাড়া দিয়েছেন ? কখন দিলেন ?'

"সে বল্‌লে—'অনেকক্ষণ।'

"কণ্ডাকটার খেঁকিয়ে উঠ্‌ল—বল্‌লে, 'অনেকক্ষণ ? মজা মারবার জায়গা পান নি ? এতক্ষণ ধরে উপরে থেকে টিকিট কেটে এই সবে আমি নাম্‌ছি নীচে—অথচ অনেকক্ষণ হ'ল পয়সা দিয়েছেন আপনি ? চালাকী ছাড়ুন, পয়সা দিন—'

"লোকটী নির্ব্বিকার। আধবোজা চোখে, অতি মোলায়েম স্বরে বল্‌লে সে—'তু'বার পয়সা নেবে বাবা ? সত্যি বলছি—দিইছি পয়সা—'

"বাধা দিয়ে কণ্ডাকটার বল্‌লে—চীৎকার করে বল্‌লে—'পয়সা দেবেন ত' দিন—নইলে নেমে যান—'

"লোকটী একটু যেন ঝিমুচ্ছে মনে হ'ল। কণ্ডাকটার আবার কসে তাড়া দিল—'শুন্‌ছেন মশায় ? নেমে যান।'

"লোকটার চমক ভাঙ্গল। বল্‌লে—'য়্যাঁ ?'

"বাসের লোকেরা সবাই বেশ উপভোগ করছিল ব্যাপারটা। এতক্ষণে মধ্যস্থতাও সুরু করে দিল তু' চারজন। একজন হয়ত উকীল—উকীলের জেরাই সুরু করে দিলেন—

"'আচ্ছা মশাই, পয়সা দিয়েছেন বল্‌ছেন আপনি এবং অনেকক্ষণ দিয়েছেন বল্‌ছেন। অথচ আপনি ওঠার পর কণ্ডাকটার ত' এই মাত্র নাম্‌ল উপরতলা থেকে। তা'হলে কি করে কণ্ডাকটারকে আপনি পয়সা দিলেন—বলুন ?'

"লোকটী তেমনি জড়িয়ে জড়িয়েই বল্‌লে—'কণ্ডাকটারকে পয়সা দিয়েছি,—এ কথা ত' একবারও বলি নি, বাবা ! ও ত' ছিল না এতক্ষণ, সত্যিই।'

"আর একজন ভদ্রলোক চটে গিয়ে বল্‌লেন—'বেড়ে মজার কথা ত' মশাই ! কণ্ডাকটার ছিল না, অথচ পয়সা দিয়েছেন কাকে ?'



"লোকটা তখন করলে কি জান ? ঘাড়টা উল্টো দিকে একটু ফিরিয়ে, ফিক্ করে একটু হেসে, আঙ্গুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে—'এই মশাইকে।'

"আমি প্রায় বসে পড়লাম। লোকটা বলে কি ? মাতাল, ও বেটাকে মেরে নামিয়ে দিচ্ছে না কেন কেউ ? কোনও রকমে নিজেকে সংযত করে বল্‌লাম শুধু—'আমাকে পয়সা দিয়েছ ?'

"লোকটী বিনয়ে গলে গিয়ে বল্‌ল—'আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যর্ !'

"বল্‌লাম—'আমার হাতে দিয়েছ পয়সা ?'

"ও বল্‌ল—'না, আপনার হাতে ত' দিই নি।'

"মাথায় রক্ত উঠে গেল—বল্‌লাম চীৎকার করে,—'মিথ্যাবাদী, মাতাল ! বল্‌লে যে আমাকে দিয়েছ পয়সা !'

"ও বল্‌লে—'মাতাল হ'লেও মিথ্যাবাদী নই। পয়সা দিইছি আপনাকে—এ কথা সত্যি।'

"ধৈর্য্য হারালাম ; লোকটার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লাম—'তবে যে বল্‌লে এক্ষুণি, আমার হাতে দাও নি ?' লোকটী হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—বল্‌লে, 'হাতে ত' দিই নি, সত্যিই।'

"বোকা বনে গেলাম। বল্‌লাম, 'তবে কোথায় দিয়েছ ?' লোকটা কথা বল্‌লে না—শুধু ওর বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা বেঁকিয়ে আমার বুক-পকেটটা দেখিয়ে দিল। আশ্চর্য্য, মহা আশ্চর্য্য, পকেটটার দিকে তাকিয়ে দেখি যে আমার বুক-পকেটে রুমালের উপর সত্যিই একটা দুয়া আনি শোভা পাচ্ছে ! মাতালটা কখন কোন্ ফাঁকে আনিটা নিঃশব্দে রেখে দিয়েছে আমারই বুক-পকেটে ! বেকুবের মত আমি তু'টী আঙ্গুলে করে আনিটা তুলে ধরতেই লোকটা তার হাত দুটো যোড় ক'রে কাঁদ কাঁদ স্বরে, জড়িতকণ্ঠে বল্‌লে—'দেখ্‌লেন ত' প্রভু, মিথ্যা কথা বলি নি। মাতাল হ'তে পারি কিন্তু মিথ্যাবাদী নই।'

"বাসের মধ্যে হাসির রোল উঠ্‌ল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে নেমে পড়লাম পাগলের মত ভীড় ঠেলে। পিছনে তখনও চলতি বাসের মাঝে হাসির হল্লা চল্‌ছে শুন্‌তে পেলাম।"

দাদু থাম্‌লেন, সুরু করলাম আমরা। সুরু করলাম হাস্‌তে—ককিয়ে ককিয়ে হাস্‌তে। সত্যিই ত' মাতাল হ'তে পারে—কিন্তু, মিথ্যাবাদী নয় ত' !

রামধনুর পাঠক পাঠিকারা আমাদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ ক'র। তোমাদের কাছ থেকেও, প্রতিবারের মত, আমরা বিজয়ার শুভেচ্ছাসূচক অজস্র চিঠি পেয়েছি। সেজন্য রামধনুর পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পূজা-সংখ্যা রামধনু তোমাদের অধিকাংশেরই মনের মত হয়েছে জেনে সুখী হ'লাম।

গত মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় অনেকেই যোগ দিয়েছ দেখে আরও খুসী হলাম। কিন্তু অনেকেই আলাদা ভাবে না পাঠিয়ে ধাঁধার উত্তর প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতার লেখা পাঠান'য় ঐ সব বিভাগ ঘুরে এবং বাছাই হয়ে যথাস্থানে তা পৌঁছতে দেরী হয়েছে। তাই তার ফলাফল আগামী সংখ্যায় বার হবে। ঐ সংখ্যায় আবার নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতাও থাকবে।

—রাঃ সঃ

---

## শিশুসাহিত্য-সংবাদ

**হাবুলচন্দোর**—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা। দাম ॥৵০

"ননীগোপাল" বাবু শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁর প্রবন্ধ ও রসরচনা ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ে ও প্রচুর আনন্দ পায়। এ বইএ তিনি যে হাবুলচন্দোরের কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাও তাদের কাছে নিঃসন্দেহ তেমনি আদর পাবে। হাবুলচন্দোরকে আমরাও চিনি, দেখবে তোমাদেরও সে মোটেই অপরিচিত নয়। শ্রীযুক্ত ফণী গুপ্তের আঁকা ছবিগুলি বইখানাকে আরও লোভনীয় করেছে।

---

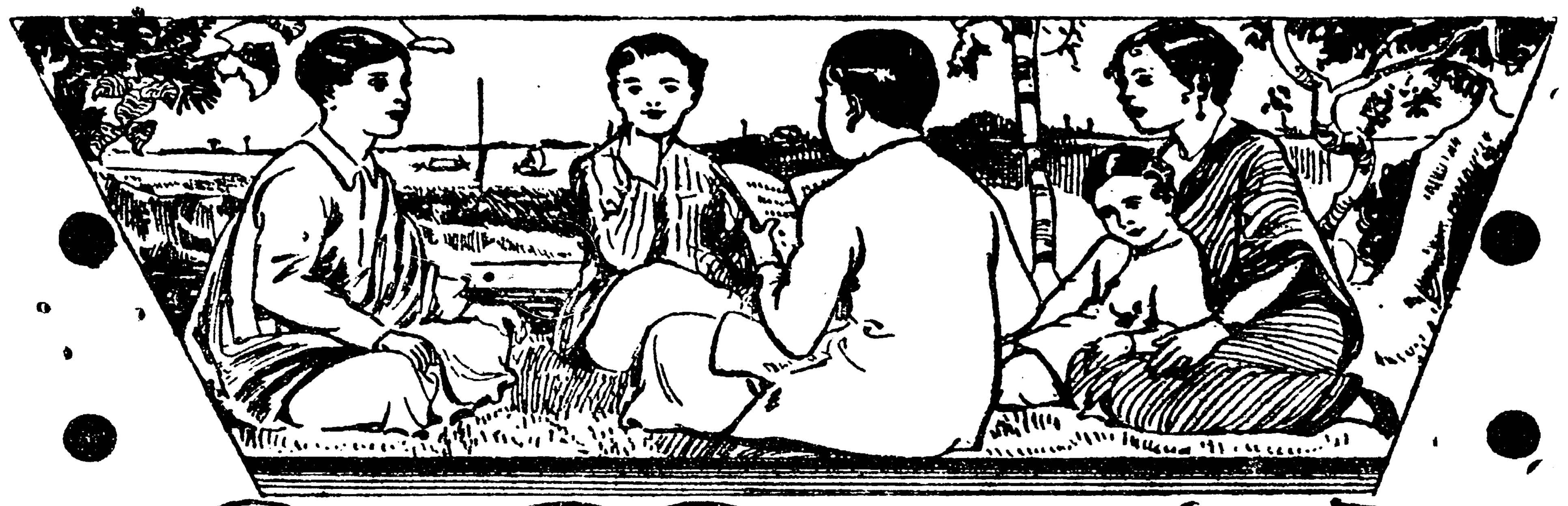

# ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

## বিজয়ার চিঠি

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামধনু সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু—

বোমার-ভয়ে পালিয়ে এসে সহর ছেড়ে অনেক দূরে  
আজকে আমি আছি বসে পল্লীমায়ের অন্তঃপুরে।  
নাইকো হেথায় বাসের কিংবা ট্যাক্সি ট্রামের ঘড়ঘড়ানি,—  
সকাল হ'তেই ছুটাছুটী—কাজের তাড়ায় ধড়ফড়ানি।  
নাইকো হেথায় ধোঁয়ায় ঢাকা গোমড়ামুখো আকাশ গো,  
গ্যাসের গন্ধে ভারী হয়ে বয় না হেথা বাতাস তো।  
সকালবেলা ভাঙ্গায় না ঘুম কাগজওয়ালা হেথায় ডেকে'  
ফেরীওয়ালা যায় না মোটেই নানান্ সুরে হেঁকে হেঁকে।  
তরুণ রবির অরুণ আলো পূবের আকাশ রোজ রাঙ্গিয়ে  
খাটের পাশে লুকিয়ে এসে ঘুমটী আমার যায় ভাঙ্গিয়ে।  
বৈতালিকের দল যে হেথা নাম-না-জানা বনের পাখী—  
সকাল হ'লেই সবাই এসে করে আমায় ডাকাডাকি।  
শিউলী গাছের আঁচল ধ'রে দামাল হাওয়া রোজ সকালে  
লাগায় নাচন ফিঙের সাথে দোলন চাঁপার তালে তালে।

চুপটী ক'রে আছি বসে, বিসর্জ্জনের করুণ সুরে
মনটা আমার চাচ্ছে যেতে আজকে ছুটে অনেক দূরে।
হারিয়ে সে আজ গেছে কোথায় মিলছে নাকো পাত্তা তারই,
চুপি চুপি বলছি শুনুন, করুছে সে খোঁজ কলকাতার-ই।
প্রণাম আমার আপনি নিয়ে বড়'র মাঝে বিলিয়ে দেবেন,
চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলে প্রীতিটাকে তুলে নেবেন।
ছোটর দ্বারে পোঁছে দেবেন আজ বিজয়ার মধুর প্রীতি,
বলার যাহা ছিল বলে এইখানেতেই করনু ইতি।

---

দেখতে দেখতে এবারকার মত পূজোর ছুটী কেটে গেল। কিন্তু এবার বাঙ্গালীর ভাগ্যে পূজোর দিনগুলো তেমন আনন্দের সঙ্গে কাটতে পারে নি। একে তো যুদ্ধের গোলমাল, জিনিষপত্রের চড়া দাম, তার ওপর এবার সপ্তমী পূজোর দিন সমস্ত বাংলা যুড়ে দেখা দিল প্রবল ঝড়। সব জায়গাই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও মেদিনীপুর জেলার মত দুর্ভাগা আর কোন জায়গার হয় নি—এমন প্রচণ্ড ঝড় সেখানকার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম। যত দূর জানা গেছে, হাজার হাজার লোক শুধু মেদিনীপুর জেলাতেই মারা গেছে। তার ওপর ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বন্যা এসে চারদিক্ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কাঁচা বাড়ীর অস্তিত্ব তো নেই-ই, বড় বড় পাকা বাড়ীগুলি পর্য্যন্ত বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ীর মত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মাঠঘাট, খালবিল মৃতদেহে ভরে গেছে। সমস্ত জেলাটা যেন এক বিরাট শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

এদিকে কালীপূজোর পর দিন কলকাতায় হ'ল আর এক দুর্ঘটনা। উত্তর কলকাতায় হালসীবাগানে কালীপূজো উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ্ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষ তাঁর দলবল সহ ব্যায়াম ক্রীড়া দেখাচ্ছিলেন—হাজার হাজার নরনারী, শিশু ভীড় করে খেলা দেখছিল; হঠাৎ কি ক'রে হোগলায় ছাওয়া মণ্ডপে আগুন ধরে গেল, এবং দেখতে দেখতে সেই জ্বলন্ত মণ্ডপ ভেঙ্গে পড়ে অসংখ্য লোক—বেশীর ভাগই নারী ও শিশু, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারাল। যতটা জানা গেছে ১৪৫ জন লোক এই



দুর্ঘটনায় মারা গেছে, আর কত যে আহত হয়েছে তার ঠিক নেই! শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষের একমাত্র পুত্রও প্রাণ হারিয়েছেন। কলকাতার ইতিহাসে এ রকম অগ্নিকাণ্ডও বোধ হয় নতুন।

তাই বলছিলাম, এবারকার পূজো বাঙ্গালীর বিশেষ আনন্দে কাটে নি।

* * *

গত বারে তোমরা শুনেছিলে কলকাতার অনতিদূরে বাটানগর থেকে 'বাটা' ফুটবল্ দল বোম্বাইএ রোভার্স টুর্ণামেণ্ট খেলতে গিয়েছিল এবং ফাইনালে উঠেছিল। তোমরা শুনে সুখী হবে যে এই 'বাটা' দলই এবার রোভার্স কাপ্ জিতে বাংলায় নিয়ে এসেছে। এই দলের অনেক খেলোয়াড়ই বাঙ্গালী—এবং প্রায় সকলেই কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের নাম-করা খেলোয়াড়। তাদের এই সাফল্যে আমরা তাদের অভিনন্দিত করছি।

* * *

সম্প্রতি মহাযুদ্ধের গতির: কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। রুশরা এখনও অমিতবিক্রমে ষ্ট্যালিনগ্রাড্ সহর রক্ষা করছে, যদিও 'সহর' বলে সেখানে এখন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর ইতিহাসে এ যেন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ককেশাসের দিকে অবশ্য জার্ম্মানরা কিছু সাফল্য লাভ করেছে এবং নালচিক্ দখল করেছে।

ওদিকে মিশরে অষ্টম বাহিনী একটা বড় রকম বিজয় লাভ করেছে, এবং শত্রুপক্ষকে বহুদূর পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছে। শত্রুর প্রচুর সমরসজ্জা ইংরেজদের হস্তগত হয়েছে, এবং প্রচুর শত্রুসৈন্য বন্দী হয়েছে। তার ওপর আমেরিকান্ বাহিনী ফরাসী অধিকৃত উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য নামিয়েছে এবং কয়েকটা বড় বড় বন্দর দখল ক'রে ভিতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফরাসী বাহিনী বাধা দিয়েছিল, কিন্তু পরে যুদ্ধবিরতি হয়েছে। এদিকে হিটলার, ফ্রান্স আক্রান্ত হবে এবং ফ্রান্সের নৌবহর বিপক্ষের হাতে যাবে এই আশঙ্কা দেখিয়ে, ফ্রান্সের দখল-না-করা অংশেও জার্ম্মান্ সৈন্য এনে ফেলেছেন। এতে সন্ধির সর্ত্তভঙ্গ হয়েছে ব'লে মার্শাল পেতাঁ্যা আপত্তি জানিয়েছেন। ব্যাপারটা একটু ঘোরালই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(১১ই নভেম্বরের খবর)

---

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

অঙ্কটা এই রকম হবে:—

```
   ৩৫২১৫৬১
        ২৪১
   --------
   ৩৪২১৫৬১
 ১৩৬৮৬২৪৪
৬৮৪৩১২২
---------
৮২৪৫৯৬২০১
```

### উত্তরদাতাদের নাম

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর); শীলা, অশোক, অমিয়, অমিতাভ, প্রভাত (বাঁকুড়া); শরৎকুমার ঘোষ (হাওড়া); গৌরাঙ্গদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতু, শুকু, বুড়ু, বইমু প্রভৃতি (পুরুলিয়া): আভা, প্রভা, সত্যেন, কালু, তপেন (হাবড়া); মধু, অরুণ, বেবী, মণি, রবীন্দ্র,

চট্টোপাধ্যায় ( মেঘলিবাঁধ ) ; অঞ্জু, মণ্টু, মীনু, মীরা, শান্তি চট্টোপাধ্যায় ( মহেশতলা ) ; বাবা, মা, কেবু, বচু, বলাই ( কলিকাতা ) ; মোহনলাল ( মণিরাম ) জালান ও সুপ্রকাশচন্দ্র ( বৈদ্যনাথ ) চক্রবর্ত্তী ( সুজানগর—পাবনা ) ; অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বড়রী ) ; শঙ্করলাল, পাঁচুগোপাল, শান্তিগোপাল, অতনুকুমার ( বাণীমন্দির—মুড়াগাছা ) ; অমিতাভরঞ্জন, শৈলেশচন্দ্র, সিদ্ধার্থ, পদ্মা ও ভারতী গুপ্ত ( যশোহর ) ; বনতোষ, কমলেন্দু, কল্যাণ, নির্ম্মল, আশুতোষ প্রভৃতি ( বেলতলিয়াতপাড়া ) ; হরিহর, শান্তি, গৌরী মজুমদার ( ইংলিশ বাজার—মালদহ ) ; শক্তি, মহাদেব, পাঁচু, শ্রীমন্ত ( সালিখা ) ; যতীশ, বিকাশ, বিজন, অশোক ( শ্রীহট্ট ) ; যূথিকা, লতিকা, খোকন চন্দ্র ( রাজামহল—চন্দ্রগিরি ) ; রত্না, স্বপ্না ও জয়ন্ত রায় ( পাটনা ) ; সুপ্রভা, সাবিত্রী, মণিকা, মঞ্জু, রঞ্জু ( এলাহাবাদ ) ; অশোক, মিনতি, অজয়, তপতী দত্ত ( হায়দ্রাবাদ ) ; রামানন্দ সাহিত্য-সদনের সভ্যবৃন্দ ( রামচন্দ্রপুর ) ; কালিদাস পাল ( বালুভরা ) ; কুন্তলা মজুমদার ( রায়পুর ) ; বিজলী ঘোষ ( চন্দ্রভাগ ) ; মঞ্জুলা সান্যাল ও গুরুদাস বাগচী ( নবদ্বীপ ) ; লক্ষ্মণচন্দ্র সাধুখাঁ ( গারুলিয়া ) ; মনোজকুমার মুখোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ) ; অজিত, টকি, ডলি, খুকু, সিপ্রা প্রভৃতি ( খুলনা ) ; রীণা রায় ( টালীগঞ্জ ) ; বুবুল, গীতা ও শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য ( মির্জ্জাপুর ) ; সন্ধ্যা, গীতা, দীপালি, সুনীতি, শ্যামল মুখার্জ্জি প্রভৃতি ; জ্যোতির্ম্ময় ও অমল গুপ্ত ও বাণী গুপ্তা ( কলিকাতা ) ; নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, সৌরীন্দ্র, কনকেন্দ্র, গৌরী প্রভৃতি ( খড়্গপুর )।

---

## নূতন ধাঁধা

নীচের কথাগুলির জায়গায় জায়গায় প্রয়োজন মত প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসিয়ে পড়লেই পাঠোদ্ধার করা যাবে। চেষ্টা করে দেখ তো :—

সেটা পাখীখাদ্য—চারদিকে হতাশার ধ্বনি নয় চারটের ইংরেজী মানুষ সার বেঁধে ব্যায়াম ছাগস্বরবুন অথবা মানুষ মশলা বিশেষফ খারাপমীরে ভশব্দ, তবে পদবী বিশেষ দেখে রাশি বিশেষ এক প্রত্যঙ্গ। তবু পোষাক ভয়েই ভিজন্য ঢুফলবিশেষম।

( কেবল মাত্র নির্ভুল উত্তরদাতাদের নামই ছাপা হবে। )

---

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি প্রণীত

**বিজ্ঞান-বুড়ো**
—বিজ্ঞানের গল্প—
প্রচুর ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ১৲

**আবিষ্কারের গল্প**
—দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মরণজয়ী অভিযান-কাহিনী—
পুরু কাগজে ছাপা, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৷০

**বিজ্ঞানের জয়যাত্রা**
—বিজ্ঞানের গল্প—
পুরু এণ্টিক কাগজে ছাপা, অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৷৷৵০

**জন্মদিনের উপহার**
—সরস, মজাদার গল্পের বই—
চমৎকার ছাপা, চমৎকার রঙ্গীন বাঁধাই মলাট, চমৎকার ছবি। দাম—৷৷/০

**আকাশের গল্প**
—গ্রহ-তারার বিচিত্র কাহিনী—
অসংখ্য ছবি, সুন্দর রঙ্গীন মলাট—দাম ৸১০

**ফুলের মূল্য**
বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস "দি ব্ল্যাক টিউলিপের" মর্ম্মানুবাদ ( যন্ত্রস্থ )

### ছোটদের উপহারের উপযোগী কয়েকখানা বই

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের
ইউরোপের আলো ... ১৲
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
দিগ্বিজয়ী বীর ... ৷৷০
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ
১ম ও ২য় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ... ৷৷০
শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের
হালকা হাসির খাতা ... ৷৷০
নতুন কিছু ... ৷৷৵০
শ্রীমাধুরী ও শ্রীনমোজন কর্মীর
গল্পসল্প ...৶১০ ছুটির গল্প...৶১০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
কলকাতার হালচাল ... ৸৵০
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ... ৭০
অধ্যাপক মনোরঞ্জন ও শ্রীক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
আজব গল্প...।০ অনেক গল্প...।০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ... ৷৷৵০
শ্রীঅমলেন্দু সেনের
অনুসন্ধানী (সাধারণ জ্ঞান) ... ১৷৷০
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর
রং-চং ... ৷৷০

পুরাতন বাঁধান রামধনু : ১ম—৬ষ্ঠ বর্ষ—প্রতি সেট ১৷৷০, ৭ম—১৪শ বর্ষ—প্রতি সেট ২৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ( ১বি, রসা রোড, কলিকাতা )

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর ( কলিকাতা ), কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Regd. No. C—1641

# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী

ঘি'এর মত কিছুই নয়।

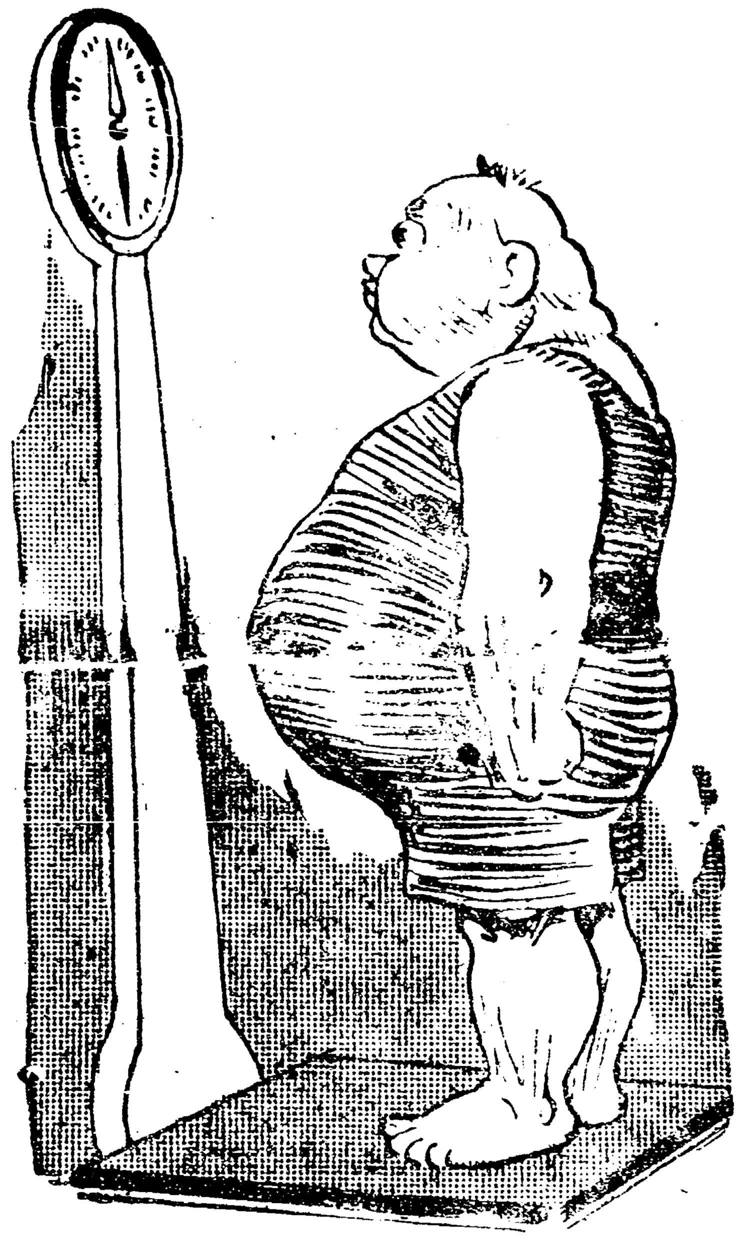

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

**লক্ষ্মীদাস প্রেমজী**

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০



১৫শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৯ | ১২শ সংখ্যা


# রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বার্ষিক ২।৵০

প্রতি সংখ্যা ।০



মাত্র ৭টী
[আবিষ্কৃত ১৯০২]

ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

Regd. No. C—1641

# শক্তি এবং সামর্থ্য

গায়ে খানিকটা মাংস আর চর্ব্বি থাকলেই হয় না।

শরীরকে শক্তিশালী করতে খাঁটী ঘি'এর মত কিছুই নয়।

খাঁটী ঘি বলতে

## লক্ষ্মী ঘি-ই

বোঝায়।

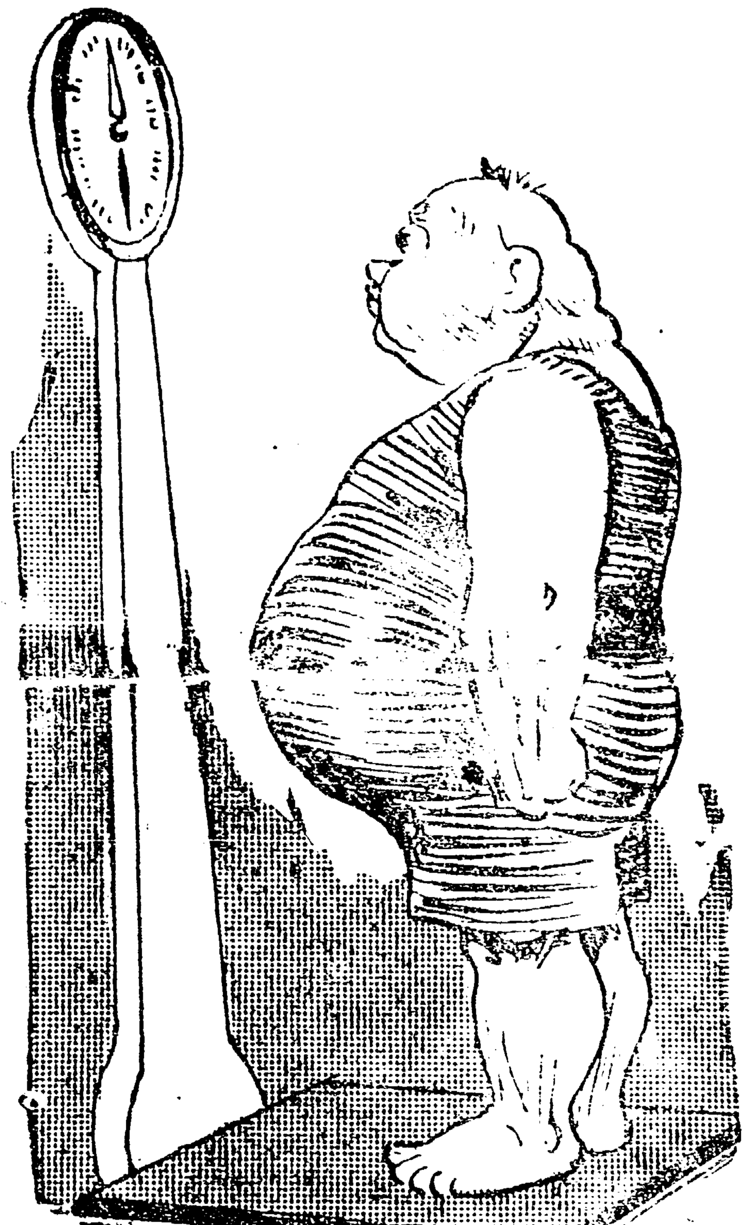

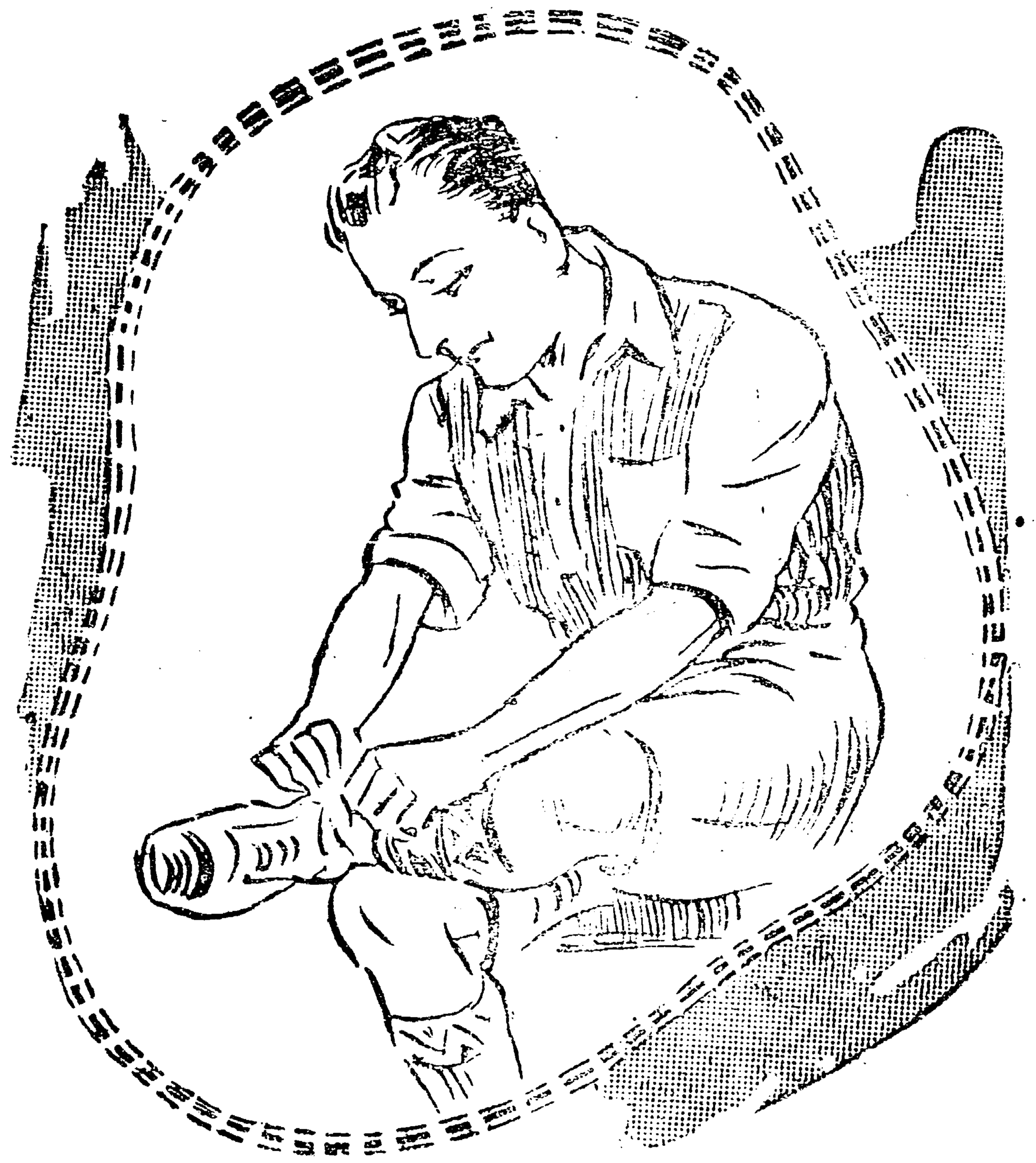

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর
বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সুস্বাদু বলে
সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—

**লক্ষ্মীদাস প্রেমজী**
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ফোন: কলি: ৩৬৬০

১৫শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৯ | ১২শ সংখ্যা

# রামধনু

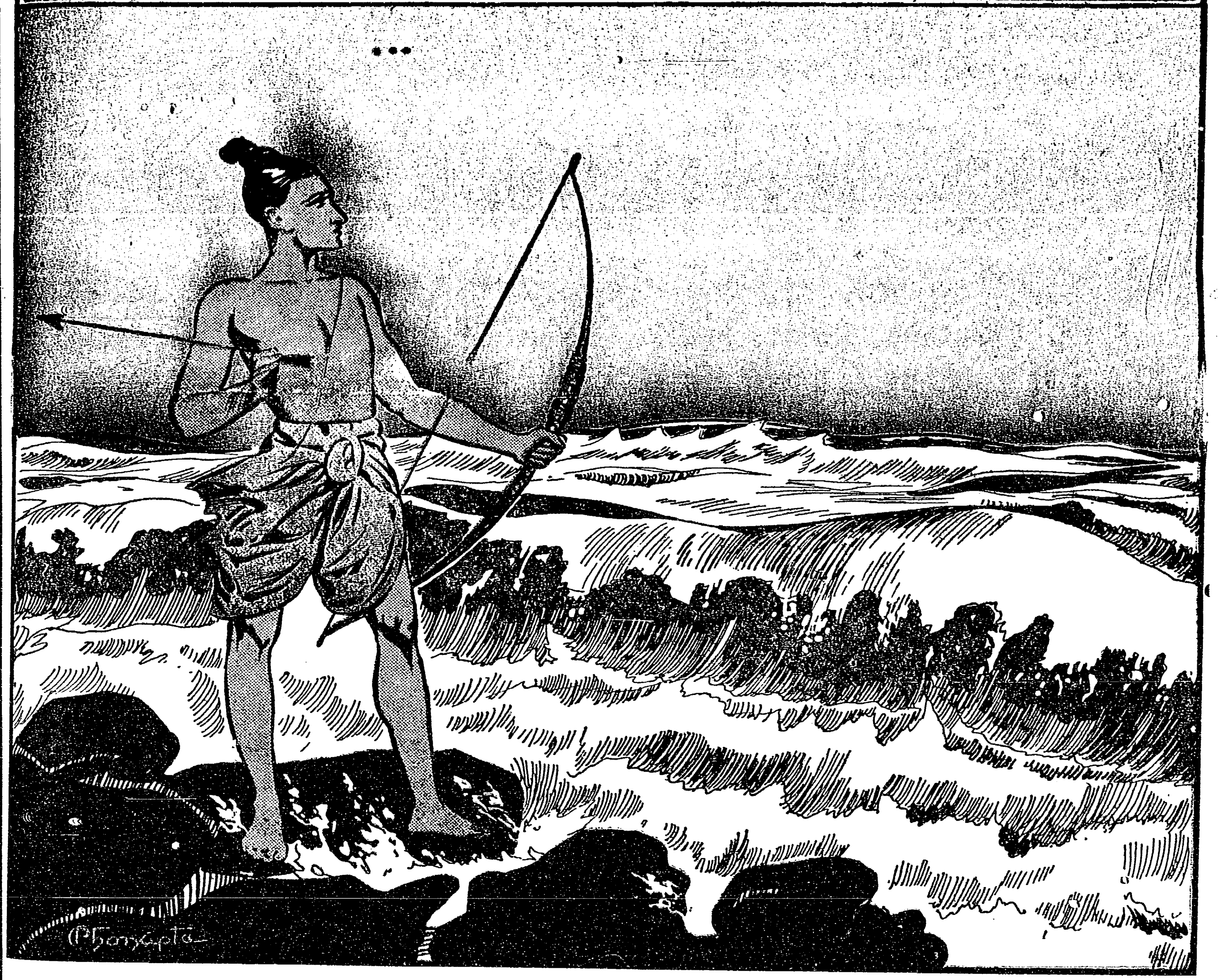

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

বার্ষিক

মাত্র ৭টী ঔষধে সব রোগ সারে
পুস্তিকার জন্য আজই লিখুন
[আবিষ্কৃত ১৯০২]
ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPO

## রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৵০, ষাণ্মাসিক ১৵০ ; প্রতিসংখ্যা।০ ভি, পি, চার্জ্জ স্বতন্ত্র। রামধনুর বৎসর মাঘ মাস হইতে। নমুনা সংখ্যার জন্য চারি আনার ডাকটিকেট পাঠাইতে হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ মাসের ২০ দিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে মাসের প্রথম দিন পত্রিকা প্রকাশের তারিখ

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ কিংবা সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে টিকেট পাঠাইবেন না, এবং কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক-নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন।

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে, মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর (কলিকাতা)
ফোন্ নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

আমাদের সর্ব্বজন সমাদৃত পূজাবার্ষিকী

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত

**মধু মেলা**

মূল্য মাত্র দেড় টাকা

এই দুর্ব্বৎসরেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত প্রবন্ধে ও চিত্রে সমৃদ্ধ বিশাল গ্রন্থ

[ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ]

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
ছোঃ চয়নিকা
গল্প সঞ্চয়ন
ঝলমল
আজব বই
শিশু-গল্পিকা
প্রত্যেকখানি ১৷০

অন্যান্য বৎসরের বার্ষিকী
সোনার কাঠি
যাদুঘর
চিত্রদীপ
মায়া মুকুর
সোনালী ফসল
প্রত্যেকখানা ১৷০

পুরস্কার বিতরণে দিবার ভাল ভাল বই

| | | | |
|---|---|---|---|
| দুই ভাই | ১৲ | দ্বাদশ সূর্য্য (জীবনীকথা) | ১৲ |
| হারানো দিন | ১৲ | তাতারের বন্দী | ৸০ |
| দেড়শো খোকার কাণ্ড | ১৲ | আধুনিক রবিনহুড | ৸০ |
| পাল্কী বুড়ো | ।৵০ | সাহারার আতঙ্ক | ॥৵০ |
| ছানা বড়া | ।/০ | স্বর্গে থিয়েটার | ॥৵০ |
| অন্ধকূপের বন্দী | ৸০ | ছেলেধরা সার্কাস্ | ॥৵০ |
| ছোটদের শাহনামা | ৸০ | রোমাঞ্চকর কাহিনী | ॥০ |
| উড়োজাহাজে কয়েদী | ॥০ | কম্যাণ্ডার কবুতর | ৸০ |
| বোম্বেটে দ্বীপ | ৸০ | আকাশ গঙ্গা | ৸০ |
| তেপান্তরের মাঠ | ॥০ | দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন | ॥০ |
| নিশির ডাক | ৸০ | ঋষি অরবিন্দ | ॥০ |
| বিষের তীর | ॥০ | দানবীর কার্ণেগী | ॥০ |

বিস্তারিত পুস্তকের তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের দ্বিতীয় বর্ষের বিংশতি সংখ্যা অবধি প্রকাশিত হইয়াছে

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি. ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

"কাউকে বলো না
আমি লিলির কার্নিভ্যাল
বিস্কুট ভালবাসি!"
ছোট ছোট ছেলে
মেয়েদের জন্য
"কার্ণিভ্যাল" বিস্কুট
বাজারে বাহির হইয়াছে।
কলিকাতা লিলি বিস্কুট কোং বোম্বাই

অশোক বনে সীতা

শিল্পী : শ্রীমন্মথনাথ সেন

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

১৫শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৪৯ { ১২শ সংখ্যা

## দাঁড়কাক

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁড়কাক দাঁড়ে ব'সে গায় নাক' গান—
ডাকে শুধু কা-আ কা-আ স্বরে,
তুমি বল, 'বিষে ভ'রে যায় দুটো কান—
টি'কে থাকা ভার হ'ল ঘরে।'

লাফ দিয়ে ধেয়ে কাছে আসে,
ঠোঁট ঘসে কচি কচি ঘাসে,
সারা দিন ফেরে মোর পাশে

এক কুচি খাবারের তরে ;
মিছে রাগ কর মাগো, তুমি,
তাই যে ও কা-আ কা-আ করে।

তোমাদের দেখ্‌লে ও দূরেতে পালায়
আমাকে তো করে নাক' ভয়,
তুমি বল, 'ও কালোটা মিছেই জ্বালায়,'
ওরে মোর লাগে মধুময়।

পড়ি যবে কথামালা হাতে
বস্‌বে ও এসে জান্‌লাতে,
কত কথা কবে মোর সাথে
দুলে দুলে কি পুলক ভরে!
মিছে রাগ কর মাগো, তুমি,
তাই যে ও কা-আ কা-আ করে।

আষাঢ়েতে জাম-বন মেঘের বরণ—
ও আমারে ডাকে বাগানেতে,
সবুজের শোভা করে নয়ন হরণ—
ওর ডাক শুনি ধান-ক্ষেতে।

পাঠশালা হ'তে ফিরি যবে
বাঁকা চোখে চায় ও নীরবে,
ওর কি মা নেই মাগো ?—তবে
কেন আসে আমাদের ঘরে ?
তোমাকে ও মা বল্‌তে চায়
তাই যে ও কা-আ কা-আ করে।

---

# বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

## অম্লতত্ত্ব

তোমরা আমানি সম্ভবতঃ খাইয়া থাকিবে। উহার আস্বাদ টক্। একটা হাঁড়িতে কিছু ভাত ও জল রাখিয়া দিলে দুই-এক দিনের মধ্যেই আমানি প্রস্তুত হয়। এক প্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদাণু ভাতের শ্বেতসার অংশকে য়্যাসেটিক্ য়্যাসিডে পরিণত করে। য়্যাসেটিক্ য়্যাসিড্ই আমানিকে টক্ আস্বাদ দেয়। বায়ুমণ্ডলে ঐ ব্যাক্‌টিরিয়ার বীজ উড়িতে থাকে; ঐ বীজের কতকগুলি হাঁড়ির মধ্যে পড়িয়া খাদ্য ও জল পাইয়া অঙ্কুরিত হইয়া অম্ল নির্ম্মাণ করিতে থাকে। একটু পুরানো আমানি যদি হাঁড়ির মধ্যে দেওয়া যায় তাহা হইলে খুব শীঘ্র আমানি প্রস্তুত হয়। একটু আমানি অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার মত ব্যাক্‌টিরিয়া দেখা যায়।

আখের রস বা আঙ্গুরের রস বা মদ অনেক সময় ঐ জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া টকিয়া যায়। এইরূপে ভিনিগার বা শির্কা প্রস্তুত হয়। ভিনিগার এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে—নানা রকম চাটনি ও স্যালাড্ প্রস্তুত করিবার জন্য।

দুগ্ধে ল্যাক্‌টিক্ য়্যাসিড্ ব্যাক্‌টিরিয়া নামে এক জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মিয়া দুধকে দইতে পরিণত করে। ঐ উদ্ভিজ্জাণু দুধের ভিতরকার চিনি অর্থাৎ দুগ্ধ-শর্করাকে (ল্যাক্‌টোজ্) ল্যাক্‌টিক্ য়্যাসিডে পরিণত করে। ঐ অম্লই দইয়ের টক্ আস্বাদের কারণ। দই একটু বেশীক্ষণ থাকিলে উহাতে আরও বেশী ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মিবার ফলে দই অত্যন্ত টকিয়া যায়। কলিকাতার ভাল ভাল খাবারের দোকানে আজকাল দই প্রস্তুত হইবার পর উহাকে শীত-পেটিকার (রেফ্রিজারেটার) অভ্যন্তরে রাখা হয়। অধিক শীতে ব্যাক্‌টিরিয়ারা অসাড় হইয়া যায়—উহাদের আর বংশবৃদ্ধি হয় না—কাজেই দই টকিয়া যায় না।

কোন কোন মানুষের অন্ত্রের মধ্যে বিবিধ ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মিয়া য়্যাসেটিক্

য়্যাসিড প্রভৃতি অম্লবস্তু নিৰ্ম্মিত হয়। ক্রমশঃ ঐ অম্ল আমাশয়ে ( ষ্টমাক্ ) গিয়া হাজির হয়। তখন উদ্‌গার তুলিলে টক্ টক্ লাগে এবং গলা ও বুক জ্বালা করে। ইহাকেই "অম্বলের ব্যারাম" বলে। উহারা যদি খড়ি সোডা বা চূর্ণ প্রভৃতি ক্ষারবস্তু ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাদের অম্ল ক্ষারের সহিত মিশিয়া দূর হয়। কিন্তু পীড়াকে সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার দুইটি উপায়। প্রথম শারীরিক পরিশ্রম করা—যাহাতে অন্ত্রের মধ্যে অনাবশ্যক খাদ্য সঞ্চিত হইতে না পারে। দ্বিতীয়—ঐ সকল রোগীর খাদ্যে ভাত কমাইতে হইবে। ভাত অম্লপ্রস্তুতকারী খাদ্য। পটোল, আলু, কিসমিস প্রভৃতি খাদ্যে বেশীমাত্রায় ক্ষার থাকায় উহারা অম্ল প্রতিষেধক খাদ্য। দুধও অম্ল প্রতিষেধক খাদ্য।

---

# ষ্টালিনগ্রাদ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

[ ষ্টালিনগ্রাদ সহরের উপর রাত্রির অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে চারিদিকের অগ্নিশিখা। জায়গায় জায়গায় বোমাহত বাড়ীগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে।

একটু আগে বোমা পড়ছিল, এখন সব স্তব্ধ।

একটী ঘরের মধ্যে জন কয়েক রুষ সৈনিক মুখোমুখি বসে আছে। তাদের বয়স বেশী নয়, জামা কাপড় বিপর্য্যস্ত, মুখ মলিন।

ঘরে আলো নেই। আশপাশের বহ্নিমান্ বাড়ীগুলির রক্তিমাভা জানলা দিয়ে ভিতরে এসে পড়ছে, সেই আলোকে লোকগুলির আভাস পাওয়া যাচ্ছে ভূতের মত। চেয়ার টেবিলের অস্পষ্টতা কাটে নি, শুধু বোঝা যাচ্ছে ঘরে কয়েকটি জিনিষপত্র আছে, আর আছে কয়েকটী মানুষ।

শোনা যাচ্ছে গলার স্বর ]

বুখারোভ। তিন দিন পরে আজ একটু থেমেছে।

শিলোভ। আমার মনে হচ্ছে এটা হয়তো আক্রমণ করার আর এক নতুন ফন্দী।



ইবানেঙ্ক। আমার কিন্তু এই চুপচাপ ভালো লাগ্‌ছে না, ক'দিন ধরে অবিরাম দুমদাম্ শুনতে শুনতে এখন কেমন যেন অস্বস্তি মনে হচ্ছে। যা হ'ক একটা কিছু হয়ে যাক বাপু, হারি আর জিতি!

ইভ্‌স্কি। হারি মানে? আমরা হারবো না, জনশক্তি—সাম্যবাদী শক্তি কখনও হারতে পারে না।

ওপশ্‌কই। আচ্ছা বাপু, মানলাম আমরা জিতবো, কিন্তু সেই জয় দেখবার জন্য তুমি আমি বাঁচবো তো?

ইভ্‌স্কি। নাই বা বাঁচলাম। আমার দাম কি? আমার আদর্শই তো সব। আমার আদর্শ বাঁচলে দেশ বাঁচবে,—সারা দুনিয়া বাঁচবে, সারা বিশ্বের কোটি কোটি লোক পরস্পরকে সমানভাবে ভাবতে শিখবে, তখন তাদের মনের মাঝে বেঁচে থাকবে আমাদের মন। সেই তো সত্যিকারের বাঁচা। কমরেড লেনিন তো মরে গেছেন কিন্তু তাঁর মন বেঁচে আছে আঠারো কোটি রুষ নর-নারীর মধ্যে।

[ ঘরের মধ্যে একটী ছায়াকে এতক্ষণ পায়চারি করতে দেখা যাচ্ছিল ; এবার সে ইভ্‌স্কির সামনে এসে দাঁড়াল। ছায়াটি কমরেড লেফ্‌টেন্যাণ্ট পোল্‌কার ]

পোল্‌কা। বক্তৃতা দেবার অভ্যাসটা এখনও তোমার ঠিক আছে দেখছি। তুমি শুধু কথার জোরেই জার্ম্মানদের হটিয়ে দেবে দেখছি।

ইভ্‌স্কি। তার মানে কমরেড?

পোল্‌কা। মানে তুমি যতক্ষণ কথা বলবে ততক্ষণে জার্ম্মানরা এসে আমাদের উপর চড়াও হবে।

ইভ্‌স্কি। এবং আমি চুপ করে থাকলে তারা আর আক্রমণ করবে না?

পোল্‌কা। না, তা নয়। গল্পগুজবে সময় কাটিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করার সুযোগ আমরা দেব না; তার আগে তাদেরকে আমরা আক্রমণ করবো।

ইভ্‌স্কি। অর্থাৎ এই দেয়ালের আড়াল থেকে তবু আমরা এই ক'দিন আত্মরক্ষা করেছি, এখন এই ছ'জনে ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে তাদের গুলি খেয়ে মরি।

পোল্‌কা। কিন্তু এই ছ'জন যদি ছত্রিশ জনকে মেরে মরতে পারি, তা'হলে তো মরা সার্থক হবে।

বুখারোভ। আমরা যদি এখানে বসে থাকি তা'হলেও তো নাৎসীদের প্রতিরোধ করতে পারবো।

পোল্‌কা। না তা পারবো না, আমাদের রসদ আসা বন্ধ হয়েছে, আজ থেকে আমরা রুটি

পাব না। জলের পাইপ ফেটে গেছে, যদি জার্ম্মানরা তিনদিন না আক্রমণ করে তা'হলে সেই ক'দিনেই আমরা অনাহারে মরে যাব। তার চেয়ে আক্রমণ করেই মরি না কেন?

ইভ্স্কি। আক্রমণ করলেই যে মরতে হবে তার তো কোন মানে নেই।

পোল্কা। আমি যে ভাবে আক্রমণ করবো বলে ঠিক করেছি তাতে মরার সম্ভাবনাই বেশী, তা' ছাড়া আমরা সংখ্যাতেও তো নগণ্য।

ইবানেজ। এখানে আমার একটা কথা আছে।

পোল্কা। কী?

ইবানেজ। প্ল্যানটা আলোচনা করার আগে, এক এক পিয়ালা কফি খেয়ে নিলে মন্দ হয় না।

[ সকলে হেসে উঠলো। ইবানেজ এক কোণে একটি উনুনের সামনে গিয়ে বসলো। তার উপর দুধ ফুটছিল, তারই মধ্যে এক এক পিয়ালা কফি মিশিয়ে ঢেলে দিলে। সকলে পান করতে সুরু করলো। ]

ইবানেজ। এই চিনি-হীন কফি খাওয়ার চেয়ে জার্ম্মান বোমা খাওয়াও ভালো।

[ সকলে আবার হেসে উঠলো।

পোল্কা। যাক্, এবার আমার প্ল্যান শোনো। হাত-বোমা নিয়ে আমরা একে একে আক্রমণ করবো। একজন যাবে সবার আগে। হামা দিয়ে যাবে সামনের ওই বাড়ীটির সামনে, তার পর একটা হাত-বোমা ছুড়বে। সেই শব্দে জার্ম্মানরা চকিত হয়ে গুলি চালাতে সুরু করবে, আমরা তখন এদিক্ থেকে তাদের উপর ব্রেন গান চালাবো আর যে যাবে সেও চালাবে হাত-বোমা। ওই সামনের ঘাঁটিটি আমরা দখল করবো।

ইবানেজ। কিন্তু আগে কে যাবে?

পোল্কা। আগে যাব আমি।

ইবানেজ। দলপতিকে আগে যেতে নেই, তুমি আমাদের দলপতি।

ইভ্স্কি। আগে আমি যাব।

বুখারোভ। আমি কি অপরাধ করলাম?

শিলোভ। আমি।

পশ্কই। আমি।

পোল্কা। বেশ, তা'হলে লটারী করা হ'ক।

সকলে। সেই ভালো।

[ পোল্কা পকেট থেকে একখানি ডায়েরী বের করলো, এক-একখানি পাতায় এক একটি



নাম লিখে পর পর ছ'খানি পাতা ছিঁড়ে ছোট-ছোট করে মুড়লে, তার পর ছড়িয়ে দিলে। ]

পোল্কা। নাও, এবার কে তুলবে তোল।

সকলে। তুমিই তোল কমরেড, তুমিই তোল। [ পোল্কা চোখ বুঁজে কাগজগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে একখানি তুললো। তার পর কাগজখানির ভাঁজ খুলে সবাইকার চোখের সামনে তুলে ধরলো। ]

সকলে। ইভ্স্কি।

ইভ্স্কি। বেশ, আমি যাব।

পোল্কা। কফিটা আগে খেয়ে নাও।

ইভ্স্কি। আমি প্রস্তুত।

সকলে। [ কফির পিয়ালা ইভ্স্কির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ] শুভমস্তু! শুভমস্তু!

পোল্কা। হাত-বোমা ঠিক আছে?

ইভ্স্কি। ঠিক।

[ পোল্কা দরজা খুলে দাঁড়ালো। হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইভ্স্কি বেরিয়ে গেল। সকলেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। পথের ও মোড়ে সাদা একখানি বাড়ীর আবছায়া চোখে পড়লো। পথের অন্ধকারে ইভ্স্কি গেল হারিয়ে।

কিছু সময় সব চুপচাপ। সহসা একটা আগুনের ঝিলিক দেখা গেল, শোনা গেল একটা বিস্ফোরণের শব্দ। একটা আর্ত্ত চীৎকার। কয়েকটি বন্দুকের শব্দ। কারা যেন দৌড়ে আসছে। আবার কয়েকটি বন্দুকের শব্দ। দরজার সামনে বুখারোভ দাঁড়িয়েছিল, সহসা বুকে হাত দিয়ে ঘুরে পড়ে গেল। ]

পোল্কা। বুখারোভ! কমরেড্! কমরেড্!!

[ বুখারোভ কোন সাড়া দিলে না, পোল্কা একবার নীচু হয়ে দেখলো, তার পর তাকে তুলে এনে শুইয়ে দিলে একপাশে। ]

শিলোভ। আর একজন কমলো।

পোল্কা। হ্যাঁ, আর একজন কমলো।

[ বাইরে আবার বন্দুকের শব্দ হ'ল ]

ইবানেজ। ইভ্স্কিও বোধ হয় গেছে।

পোল্কা। [ চিন্তিতভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে করতে ] আমাকেই যেতে হবে, আমি না গেলে হবে না।

ইবানেজ। তা হয় না কমরেড, আগে আমরা যাই তার পর তুমি। আগে সৈনিক, শেষে সেনাপতি।

পোল্‌কা। আমার সামনে তোমরা কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরবে, আর আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো?

ইবানেজ। এই দেখাই তো দলপতির কাজ। যে তা দেখতে পারে না সে কোনদিনই পাকা দলপতি হ'তে পারে না কমরেড। তুমি থাক, আমি দেখে আসি ইভ্‌স্কির কি হ'ল।

পশ্‌কই। একটু দেখে গেলে হ'ত না, ওরা তো এখন অন্ধের মত গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

ইবানেজ। গেলে এই সময়েই যাওয়া ঠিক। ওরা বিশ্বাস করতে পারবে না যে এই গুলিবৃষ্টির মাঝে কেউ এগুতে পারে। এই সুযোগ, আমি চললুম। বিদায় কমরেড।

[ কারুর কোন কথা শোনার প্রতীক্ষা না করে ইবানেজ হাতে পায়ে হামা দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে গুম্ গুম্ করে বন্দুক গর্জাচ্ছে, দু' চারটে দরজার গায়ে লেগে ধম্ ধম্ করে উঠছে। সবাই শুধু তাকিয়ে রইল দরজার পানে, পূর্ব্বের মত কেউ আর ইবানেজের কি হ'ল দেখার জন্য দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল না। সকলে চুপ করে প্রতীক্ষা করতে লাগল ]

পোল্‌কা। অনেকক্ষণ তো হ'ল, ইবানেজও ব্যর্থ হয়েছে, এবার আমাকেই যেতে হবে।

শিলোভ ও পশ্‌কই। আর আমরা?

পোল্‌কা। তোমরা দু'জন এখানে থাকবে। এই ব্রেনগানটা নিয়ে তৈরী থাকবে যদি জার্ম্মানরা এগিয়ে আসে অবিরাম গুলি চালিয়ে যাবে।

শিলোভ ও পশ্‌কই। ও. কে.।

পোল্‌কা। গুড্ বাই।

শিলোভ ও পশ্‌কই। গুড্ বাই।

[ পোল্‌কা পথে নেমে পড়ল। মঞ্চটা অর্দ্ধেক ঘুরে গেল। দেখা গেল পোল্‌কা মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে শুঁয়োপোকার মত এগুচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে আগুনের ঝিলিক খেলে যাচ্ছে, আর শব্দ হচ্ছে বুম্ বুম্। আগুনের ঝিলিকে চারিপাশের বাড়ীগুলি চমকে উঠছে, আওয়াজের ঝাঁকানিতে উঠছে কেঁপে।

ধীরে ধীরে পোল্‌কা এগিয়ে চললো। সামনের বাড়ীর কাছাকাছি যখন প্রায় গিয়ে পড়েছে, এমন সময় পোল্‌কার মনে হ'ল কাছাকাছি কি যেন একটা নড়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটি হাত-বোমা বের করলো। ছুড়তে গিয়ে থমকে গেল। ]

পোল্‌কা। [ চাপা গলায় ] বজারোভ! ইভ্‌স্কি! বজারোভ!! ইভ্‌স্কি!!



[ শায়িত লোকটী মাথার উপর হাত তুলে ইসারা করলো। পোল্‌কা অগ্রসর হোল।

কাছে এসে পোল্‌কা চমকে উঠলো: লোকটির পরনে জার্ম্মান য়ুনিফর্ম্ম। তখনই পকেটে হাত ভরলো কিন্তু বোমা ছোড়ার আগেই জার্ম্মান সৈনিকটি লাফিয়ে উঠে তাকে চেপে ধরলো। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পোল্‌কা ছুটলো, কিন্তু তখনই জার্ম্মানটী গুলি চালালো। পায়ে আঘাত লেগে পোল্‌কা ঘুরে পড়ে গেল। জার্ম্মানটী আরো এগিয়ে আসছিল, কিন্তু কিছু করার আগেই পোল্‌কা তাকে গুলি করলো। তারপর এগিয়ে চললো সামনের বাড়ীটীর দিকে।

বাড়ীর দরজার সামনে এসে সে করাঘাত করলো। ]

পোল্‌কা। আহত সৈনিককে সাহায্য করুন···আহত সৈনিক···আহত···

[ দরজা খুলে গেল। দরজার দু' পাশে দু'জন জার্ম্মান সৈনিককে দেখা গেল। তাদের মুখের পানে তাকিয়ে ভিতরের পানে তাকিয়ে, পোল্‌কা চকিতে কয়েকটি হাত-বোমা ছুড়ে মারলো।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সারা বাড়ীখানি যেন এখনি মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে বলে মনে হ'ল। ঘরখানি অগ্নিময় হয়ে উঠলো। ক'জন হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, পোল্‌কা আবার হাত-বোমা ছুড়লো তাদের উপর। ইতিমধ্যে পিছনে পোল্‌কার আড্ডা থেকে ব্রেনগানের গুলি চলতে সুরু করলো।

একজন জার্ম্মান সৈনিক কোত্থেকে এসে গুম্ গুম্ করে দুটি গুলি চালালো পোল্‌কার উপর। পোল্‌কা বহ্নিশিখার আলোকে তার মুখের পানে তাকিয়ে হেসে উঠলো অট্টহাসি।

হাসি থামলো। এক পাশ ফিরে হাত দু'টী বারেক সঙ্কুচিত করে পোল্‌কা স্থির হয়ে গেল। দেখা গেল তার য়ুনিফর্ম্মটা রক্তে ভিজে উঠছে।

রাশ্যান ব্রেনগানের গুলি এসে আঘাত করতে লাগলো বাড়ীটীর গায়ে। অবিরাম, অজস্র।

তারই মাঝে যবনিকা নেমে এল ধীরে ধীরে। ]

---

# দরদী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহিত্যভূষণ

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই সাজাদপুরে আসতেন। সাজাদপুরের লোকেরা কবি বলে যতটা শ্রদ্ধা না করতো, তার চেয়ে বেশী ভয় করতো জমিদার ব'লে। কারণ, কি করে যেন র'টে গিয়েছিল 'রবিবাবু বড্ড কড়া মেজাজের লোক'। কাজেই কুঠিবাড়ীর ঘাটে যখন রবীন্দ্রনাথের

রঙচঙা বোট এসে লাগতো, রাজদরশন-আকাঙ্ক্ষী নরনারী পারে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি দেখে চলে যেতো। যদিও সে মূর্ত্তিতে তাদের ভয় না জাগিয়ে হৃদয়ে শ্রদ্ধাই জাগাতো বেশী।

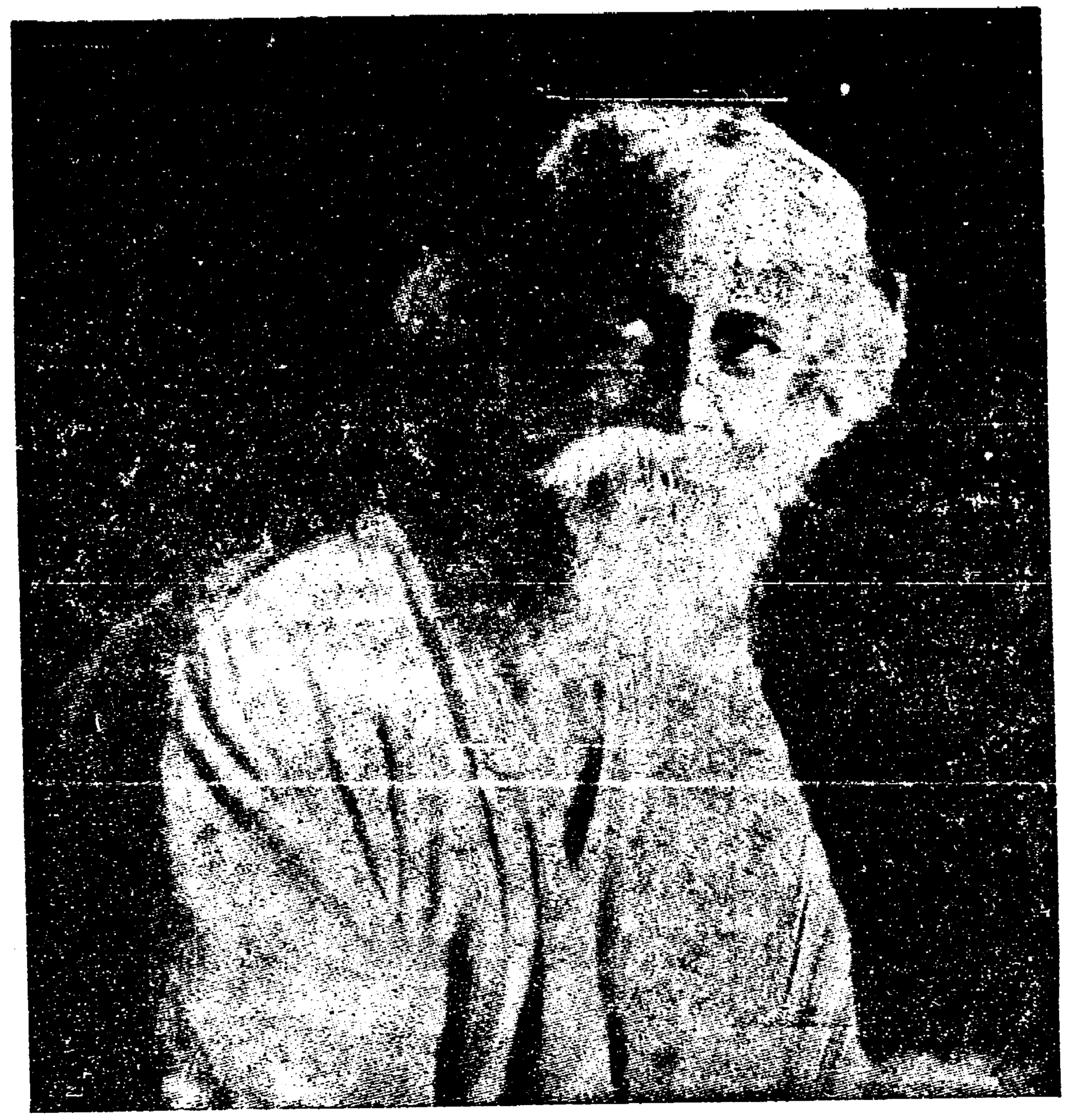

দরদী রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কড়া মেজাজের লোক ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃত দরদী, তারই একটা গল্প বলব।

নবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন এই গ্রামের ছেলে, ছোট বেলা থেকে তাঁর কবিতা লেখবার খেয়াল ছিল। কিন্তু তখনকার দিনে স্কুলের ছেলের পক্ষে পড়াশুনা ছাড়া অন্য কোনও রকম অভ্যাসই পড়তো 'বদ্ অভ্যাসের' পর্য্যায়ে। কাজেই নবদ্বীপচন্দ্র পড়ার বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে উপন্যাস পড়ার মত অঙ্ক-খাতার আড়াল করে কবিতার খাতা ভরে তুলতেন। কিন্তু কবিতা লিখে কাউকে না দেখাতে পারলে মন যে কেমন ছট্‌ফট্ করে তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। কিন্তু নবদ্বীপচন্দ্র অভিভাবকের তিরস্কারের ভয়ে মনের আবেগ মনেই চেপে রাখতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার খুব ভক্ত ছিলেন, যদিও ত্রিশ বছর আগের রবীন্দ্রনাথকে আজকের মত এত লোকে চিনতো না। সহসা নবদ্বীপচন্দ্রের একদিন মনে হ'ল, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কবিতা দেখাবেন। কিন্তু ভেবেও শান্তি পেলেন না, কারণ তাঁর কাছে পৌঁছান এক রকম অসম্ভব।

সেবার খালে জল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বোট এসে লাগ্‌লো ঘাটে। কুঠিবাড়ীর ঘরগুলি আবার কবি-সমাগমে নবজীবন লাভ করলো। রোজই স্কুলের



ছুটির পর বালক নবদ্বীপচন্দ্র কবিতার খাতাখানা হাতে করে কুঠিবাড়ীর সামনে আনাগোনা করেন আর দোতলার দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু যমদূতের মত হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ানের ভয়ে বেশী এগোবার সাহস পান না।

সহসা একদিন রবীন্দ্রনাথ দোতলার ছাদ থেকে এই সুন্দর ছেলেটীকে ঐ অবস্থায় দেখে ফেল্লেন। তাঁর মনে হ'ল, যেন প্রায় দিনই ছেলেটীকে এই ভাবে আনাগোনা করতে দেখেন, নিশ্চয়ই ওর কোন উদ্দেশ্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর কণ্ঠে ওপর থেকে ডাকলেন: 'ওহে খোকা, শুনে যাও; ওপরে এস।' নবদ্বীপচন্দ্র চম্‌কে উঠ্‌লেন, ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি কবিতার খাতাখানা পকেটে পুরবার চেষ্টা করলেন, ফলে খাতাটা অর্দ্ধেক পকেটে ঢুকলো, অর্দ্ধেক রইলো বেরিয়ে।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ কানে যেতেই দ্বারোয়ান বেরিয়ে এলো: 'হেই খোঁখা, তোমকো কেৎনা রোজ হাম্ মানা কর্ দিয়া হ্যায়. হিঁয়া মৎ আও, চলো আভি মহারাজকা পাস্' বলেই হিড় হিড় করে টান্‌তে টান্‌তে বালকটিকে মহারাজ-সমীপে নিয়ে হাজির করলো!

রবীন্দ্রনাথ দ্বারোয়ানকে তিরস্কার করে বিদায় দিলেন; তার পর বালকের ভীতিবিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার নাম কি?'

'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।' কবি আস্তে আস্তে বল্লেন: 'ঐ টুলে বসো।' নবদ্বীপ ভয়ে ভয়ে টুলের ওপর বস্‌লে রবীন্দ্রনাথ হেসে বল্লেন: 'তুমি কি এখানে রোজ ফুল চুরি করতে আসো?'

'আজ্ঞে না'—আর কিছু বলবার মত সাহস বালকের হ'ল না।

রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই বালকের পকেটের দিকে লক্ষ্য করছিলেন, বল্লেন: 'পকেটে ওটা কি?'

এবার নবদ্বীপচন্দ্রের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এত দিনের গোপন আকাঙ্ক্ষা, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কবিতা দেখাবেন, অথচ আজ তিনি যখন দেখে ফেল্লেন তখন বালকের মনে হ'ল এ বুঝি মস্ত অন্যায়।

তাঁকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন: 'দেখি, খাতাটা বের কর।'

নবদ্বীপ কম্পিত হস্তে খাতাটা বের করে তাঁর হাতে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ খাতাটা হাতে নিয়েই একটু হাসলেন: 'এ যে দেখ্‌ছি কবিতার খাতা! কে লিখেছে, তুমি?' 'আজ্ঞে হাঁ' বল্‌লে বালক। কবির আর বুঝ্‌তে বাকি রইলো না যে এই বালকটি প্রতিদিন তাঁর বাড়ীর পাশে আনাগোনা করে কোন্ আশায়। তিনি বালককে নিরাশ করলেন না। তার পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লেন: 'তুমি কি কবি হয়ে আমাকে হারিয়ে দিতে চাও নাকি? য়্যাঁ!'

এতক্ষণে নবদ্বীপচন্দ্রের প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। যাক্, তা'হ'লে কবি রাগ করেন নি। তিনি সলজ্জভাবে মাথা নীচু করে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথ বল্লেন: 'নূতন কবিতা লিখলেই আমাকে দেখিয়ে যাবে, বুঝ্‌লে? অমন চোরের মত উঁকি-ঝুঁকি মারবে না, আমি কিন্তু ভয়-কাতুরে ছেলেদের পছন্দ করি না।'

এবার নবদ্বীপ সাহস করে বলে ফেল্লেন: 'দ্বারোয়ান আস্‌তে দেয় না যে!'

রবীন্দ্রনাথ বল্লেন: 'আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে বলে দিচ্ছি।'

এদিকে হয়েছে আর এক ব্যাপার। নবদ্বীপকে যখন দ্বারোয়ান টান্‌তে টান্‌তে ওপরে নিয়ে যায় তখন আশপাশের ছেলের দল, এবং বৃদ্ধেরাও, শঙ্কিতভাবে একস্থানে এসে দাঁড়িয়ে জটলা কর্‌তে লাগলো।

কেউ বল্লে, 'ছোঁড়ার ভাগ্যে আজ হিন্দুস্থানীর গলাধাক্কা আছে।'

কেউ বল্লে, 'ছোঁড়াটা ওখানে গেল কি কর্‌তে?' আজিজ মেছের নামে নবদ্বীপচন্দ্রের সহাধ্যায়ী বল্লে, 'যে রাগী রবিবাবু, নবদ্বীপ নিশ্চয় মার খাবে।' এমনি আম্বোও অনেক মন্তব্যই হয়তো হ'তো কিন্তু সম্মিলিত জনতা দেখ্‌লো, হাস্‌তে হাসতে বেরিয়ে আস্‌ছে নবদ্বীপচন্দ্র, হাতে দু'টি ফজলী আম! দ্বরোয়ান বলছে, 'আবার এসো খোঁকাবাবু!' বিস্ময়ে সবাই আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এও কি সম্ভব! রবিবাবু সম্বন্ধে তাদের এত দিনের ভুল ধারণা মুহূর্ত্তে বদলে গেল।

সাজাদপুর]

---

# সোমড়ার ভোম্‌রা

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি

সোম্‌ড়া-বাজারে নামতেই হলো ভোম্‌রার সাথে দেখা,
আম্‌ড়া-তলায় প্রাণ চায় যত গান গায় ক'ষে একা।
মিশ্‌মিশে কালো মূর্ত্তিটি, ভালো গোম্‌ড়া মুখের ছিরি,
হোম্‌রা-চোম্‌রা হাম্-বড়া ভাবে চাল মেরে চলে ফিরি'।
চম্‌কিয়ে গেনু পাশ কেটে তার সাম্‌লিয়ে তিন লাফে,
কামড়াতে আসে ধম্‌কিয়ে তেড়ে ঠ্যাং নেড়ে মহাদাপে।
চামড়াতে যদি দাঁত বসে তার প্রাণ-পাখী খাঁচা-ছাড়া,
দুম্‌ড়িয়ে যাবে অম্‌নি পাঁজর, একদম যাবো মারা।
হুম্‌কিতে তার শঙ্কিত তাই পড়িনু হুম্‌ড়ি খেয়ে,
ইষ্টিশনের কাম্‌রাতে গিয়ে, ঘাম ঝরে হাঁটু বেয়ে।
হাঁ-হাঁ ক'রে এলো চুম্‌ড়িয়ে দাড়ি বুড়ো সে টিকিট্-বাবু,
'করো কি ছোক্‌রা! সোম্‌ড়াতে এসে ভোম্‌রার ভয়ে কাবু?'
দম্ নিয়ে দেখি, হেসে কুটিকুটি সোম্‌ড়ার শিশুপাল,
রোমরাজি খাড়া রাগে, আর লাজে রাঙা হলো মোর গাল।
ভোম্‌রা তখনো বন্ বন্ ঘোরে, চক্র নয়নে চায়,
যমরাজ যেন ছদ্মমূর্ত্তি শিকারের পানে ধায়!

হঠাৎ ক্ষেপিয়া তাগ্‌ ক'ষে তারে মারিলাম এক চড়,
ভোম্‌রা ভাগিল অম্লান মুখে বিদ্রূপে ভরি' ঘর।
তোমরা কি চেনো ভোম্‌রাকে ভাই? ঐ সে চলেছে উড়ে—
জাম্‌রুল-ফুলে মধু খেতে চলে কামরাঙা-বন ঘুরে।

---

## ২৬

শঙ্খচূড় চীৎকার করিয়া বলিল—"কই লোক? ও যে দুটো ভীষণ নেকড়ে বাঘ মননকে তাড়া করে আস্‌ছে!" তখন সকলেই স্পষ্ট দেখিল, মানুষও নয়, নেকড়ে বাঘও নয়, দুইটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক মননকে ধরিবার জন্য তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া আসিতেছে। সেই ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র ভাল্লুকের মুখে পড়িলে মননের আজ আর রক্ষা নাই। এক মুহূর্ত্তেই তাহাকে টুক্‌রা টুকরা করিয়া ফেলিবে। মনন তখনো প্রায় আধ মাইল দূরে। রঞ্জিৎ তখন কোন কথা না বলিয়া দ্রুতবেগে মননের দিকে ছুটিয়া গেল; পায়ে তার স্কেটিংএর জুতা। তীরের মত সে হ্রদের দিকে ছুটিয়া গিয়া ভাল্লুক দুইটাকে লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটা গুলি করিল। অব্যর্থ তাহার হাতের লক্ষ্য। গুলি খাইয়া ভাল্লুক দুইটা সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের দিকে পালাইল। ভাল্লুক দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সিন্ধুদ্বীপে তাহা হইলে হিংস্র ভাল্লুকের বাসও আছে!

সুশান্ত তখন রঞ্জিতের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ভাই রঞ্জিৎ, তোমার অবাধ্যতার জন্যই আজ এই কাণ্ডটি হ'ল। কেন তুমি দল ছেড়ে অত দুরে গিয়েছিলে? যাই হোক, আজ যে তুমি সাহস ও মনের বল দেখিয়েছ তার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। দাও ভাই, এখন হাতে হাত দাও।" রঞ্জিৎ হাত না বাড়াইয়া শুধু কঠোর মুখে কহিল—"এতে ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই। আমি কেবল আমার কর্ত্তব্য সমাপন করেছি।"



উপরোক্ত ঘটনার পর প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গিয়াছে। শীতও এখন ঢের কমিয়াছে। হ্রদ ও নদীর বরফও সমস্ত গলিয়া গিয়াছে; মাটির উপর এখন আর বরফের চিহ্ন নাই।

সেদিন দশই অক্টোবর। সিন্ধুদ্বীপের চারিটি ছেলে হাটিতে হাটিতে একেবারে শম্বর হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, একটা গাছের নিম্নে আগুন জ্বালাইয়া তাহারা দুইটা বনহাঁস ঝলসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ করি আসিবার পথে তাহারা এই দুইটা পাখী মারিয়াছিল। আহারের পর তিনজনে কম্বল বিছাইয়া শুইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল; চতুর্থ ছেলেটি বসিয়া বসিয়া চৌকি দিতে লাগিল। তোমরা হয়ত ভাবিয়া অবাক্ হইতেছ, ফরাসী গুহা হইতে এত দূরে এই ছেলে চারিটি আসিলই বা কেন, আর ছেলে চারিটিই বা কে? তাহারা আর কেহই নয়, রঞ্জিৎ, কমলাক্ষ, কুণাল ও রোহিতাশ্ব। ইহারা তাহাদের দল ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে আলাদা ঘর-সংসার পাতিবার জন্য। ইদানীং সুশান্ত ও রঞ্জিতের মধ্যে প্রতি কথায় কলহ বাধিত। সুশান্ত এখন তাহাদের দলপতি, তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতি কথায় তাহার আদেশ মানিয়া চলা রঞ্জিতের পক্ষে ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ইদানীং রঞ্জিৎও যেন ইচ্ছা করিয়াই সুশান্তকে প্রতি কাজে-কর্ম্মে তাচ্ছিল্য করিয়া চলিত। সুশান্তও রঞ্জিৎকে তিরস্কার করিতে ছাড়িত না। শেষে অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে আর তাহারা বুঝি একত্র বাস করিতে পারিবে না। সুশান্ত একদিন অশোককে আড়ালে ডাকিয়া কহিল—"ওরা রাতদিন কি অত মন্ত্রণা করে?" অশোক কহিল—"বোধ হয় ওরা চারজনে আলাদা হবার আয়োজন কর্‌ছে।"—"আলাদা হয়ে ওরা থাক্‌বে কোথায়?"—"তা জানি না, তবে একদিন দেখ্‌লাম রোহিতাশ্ব বদোয়া সাহেবের ম্যাপ্‌টার একটা নকল করে নিচ্ছে।"—"তবে ত' ওরা নিশ্চয় আলাদা হবার পথ দেখ্‌ছে; এক কাজ কর্‌লে হয় না, অশোক? রঞ্জিৎকে তোমরা দলপতি করে নেও, আমি না হয় পদত্যাগ করছি।"—"না, তা হ'তে পারে না; অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে ওদের এখন আলাদা হওয়াই দরকার।" তাহারা যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই সত্য হইল। ক্রমে শীত শেষ হইয়া আসিল। শেষে নয়ই অক্টোবর সন্ধ্যার সময়ে খাইতে বসিয়া রঞ্জিৎ কহিল—"সুশান্ত, কাল থেকে আমরা চারজনে আলাদা থাকব।" সুশান্ত কহিল—"আমাদের কি তোমরা ত্যাগ করে যাচ্ছ?"—"না, সুশান্ত, ত্যাগ কর্‌ছি না; তবে আমরা চারজনে আর এখানে থাক্‌ব না, দ্বীপের অন্যত্র বাসা করব।"—"কেন, কিসের জন্য তোমরা এ ব্যবস্থা কর্‌ছ?"—"কারণ তুমি জানো, সুশান্ত, আমরা আমাদের খুসী মত থাক্‌তে চাই; কারোর হুকুম মেনে চলা আমার বরদাস্ত হয় না।"—"আমার ব্যবহারে তুমি এমন কি দোষ দেখ্‌লে, রঞ্জিৎ?"—"তোমার দোষ অনেক সুশান্ত! তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে এই, তুমি দ্বীপের দলপতি।" সুশান্ত একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"বেশ, তোমরা আলাদা হয়ে যাও, আমার কোন আপত্তি

নেই।"—"কিন্তু আমাদের ভাগের সমস্ত অংশ চাই।"—"তা নেবে বৈকি; কবে তোমরা যাচ্ছ?" —"কালই। আর দেরী করা উচিত নয়।"

সুশান্ত যখন হ্রদের পরপারে অভিযান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল তখন সে পূর্ব্ব নদীর মোহানার নিকট সমুদ্রতীরবর্ত্তী সেই সুন্দর গহ্বরগুলির গল্প করিয়াছিল। এ কথাও সে বলিয়াছিল যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে তাহারা ফরাসীগুহার বাস তুলিয়া সেই গহ্বরগুলির মধ্যে বাসা স্থাপন করিবে। পূর্ব্ব নদীর জল খুব সুন্দর, নদীর দুই তীরে গভীর বন, বনের মধ্যে অসংখ্য গাছ, গাছের ডালে ডালে অসংখ্য পাখী, বনের মধ্যেও অসংখ্য জন্তু। এই সমস্ত শুনিয়া রঞ্জিৎ মনে মনে তখন স্থির করিয়াছিল সুবিধা হইলেই তাহারা হ্রদের ঐ দিকে গিয়া বাসা করিবে। কিন্তু সুশান্তর মত সে নৌকা করিয়া হ্রদ পার হইবে না। সে প্রথমে শম্বর হ্রদের দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া তার পর ঘুরিয়া পূর্ব্ব নদীর উৎসমুখে গিয়া উঠিবে। তার পর পূর্ব্ব নদীর তীর ধরিয়া সে অলীক উপসাগরে গিয়া পৌঁছাইবে। ইহাতে হ্রদের সমীপবর্ত্তী অনাবিষ্কৃত প্রদেশগুলিও দেখা হইবে, এবং নূতন পথ ধরিয়া গন্তব্যস্থানেও পৌঁছানো যাইবে। তাই সে প্রথমে বেশী জিনিষ সঙ্গে লইল না। যে সব সামগ্রী প্রথম যাত্রায় না লইলেই নয় তাহাই সে চারিটা থলির মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া লইল।

তখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই। একদিকে বনান্তরাল হইতে বহিয়া চলিয়াছে স্বচ্ছসলিলা বিসর্পিণী পূর্ব্বনদী, সাগরসঙ্গম-মুখে তাহার নিস্তরঙ্গ নয়নাভিরাম কালো গাঢ় জলরাশি; আর একদিকে বিপুল আকাশনিম্নে এক দূরপ্রসারী সীমাশূন্য তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র। রঞ্জিৎ খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া সমুদ্রের সেই রক্তিম রূপরাশি দেখিতে লাগিল। তার পর বন্ধুদের উদ্দেশ করিয়া কহিল—"সিন্ধুদ্বীপের এই পূর্ব্ব অঞ্চলেই আমাদের থাকা উচিত; আমার মনে হয় আমেরিকা মহাদেশ এখান থেকে বেশী দূরে নয়। ম্যাগেলান প্রণালীর ভিতর দিয়ে যে সব জাহাজ চিলি ও পেরুর বন্দরে যাতায়াত করে তারা এই পূর্ব্বদিক দিয়েই যাবে; একদিন না একদিন কোন জাহাজ আমাদের চোখে পড়বেই; সেইজন্য আমরা এই অলীক উপসাগর ছেড়ে অন্যত্র যাব না।" পূর্ব্বনদীর সঙ্গম-মুখেও বেশ একটি বন্দর হইতে পারে। রঞ্জিৎ ভাবিতে লাগিল তাহাদের জাহাজখানা যদি এইখানে আসিয়া উঠিত তাহা হইলে সব দিক দিয়াই সুখের হইত। সমুদ্রতীরে অসংখ্য পর্ব্বতগহ্বর। পর্ব্বতমালার পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে সেই নিবিড় অরণ্য। রঞ্জিৎ তখন বাছিয়া বাছিয়া নদীর নিকটস্থ একটা গুহা বসবাসের জন্য নির্ব্বাচন করিল। চারিদিকে শক্ত গ্রানাইট-পাথরের দেওয়াল, মেঝে মিহি বালুতে আচ্ছাদিত। এই গুহাটি তাহাদের বাসগৃহ হইবে। আশপাশের অন্যান্য গহ্বরও তাহারা অন্য ভাবে ব্যবহার করিবে। পাহাড়টির আকৃতি দেখিয়া তারা তার নাম রাখিল "ভাল্লুক পাহাড়"।



পরদিনই ফরাসী গুহায় না ফিরিয়া তাহারা সমুদ্রতীর ধরিয়া উত্তরপ্রান্ত অবধি ঘুরিয়া আসিবে ঠিক করিল, এবং খুব ভোরে উঠিয়া চারিজনে রওনা হইল। প্রথম তিন মাইল পথ কেবল পাথরে পূর্ণ। পাহাড়ের লাইন শেষ করিতেই তাহাদের দুপুর হইয়া গেল। এইবার পথে একটা ছোট নালার মত নদী পড়িল। তাহার নাম রঞ্জিৎ রাখিল উত্তর নদী। বেলা তিনটার সময় তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া এক জায়গায় বসিয়া বিশ্রাম করিবার আয়োজন করিতেছিল, হঠাৎ কি দেখিয়া কমলাক্ষ চীৎকার করিয়া উঠিল—"রঞ্জিৎ, দেখ দেখ ওটা কি নড়ে বেড়াচ্ছে?" সকলে চাহিয়া দেখিল অদূরে বনের মধ্যে একটা অদ্ভুতাকার বিশালকায় রাঙা জন্তু গাছের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই বন্দুক হস্তে সেদিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়াই তাহারা ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইল—একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার নদীর তীরবর্ত্তী নল-বনের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তার পর সাহস করিয়া চারিজনেই একসঙ্গে গুলি ছুঁড়িল; জন্তুটার গায়ে চারিটা গুলি লাগা সত্ত্বেও সে হুড়মুড় করিয়া নল-বন হইতে উঠিয়া গভীর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইল। গণ্ডারের মাথায় কিন্তু কোন শিং ছিল না। রঞ্জিৎ জন্তুটাকে চিনিতে পারিল। সেটা প্রকৃতপক্ষে গণ্ডার নহে, একটা প্রকাণ্ড 'ট্যাপির'। দক্ষিণ আমেরিকার বিপুলসলিলা নদীগুলির তীরে এই সব জন্তুকে প্রায়ই দেখা যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উঠিবার আগেই তাহারা পুনরায় সমুদ্র-উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সেদিন আকাশ ছিল বড় মেঘলা। বেলা আটটা বাজিয়া গেল, তবুও সূর্য্যের মুখ দেখা গেল না। সমুদ্র হইতে বেশ একটা জোর ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দিক্-দিগন্ত আবৃত করিয়া আকাশে মেঘের উপর মেঘ আসিয়া জমিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হইল প্রবল ঝড়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পিছন ফিরিল। কিন্তু সেই দারুণ ঝড়ের মুখে আর কত জোরেই বা চলিবে? বেলা পাঁচটার পর হইতে আবার ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাত সুরু হইল। ওদিকে চোখে আর কিছুই দেখা যায় না; কালো অন্ধকারের মধ্যে কালো সমুদ্র যেন মিশিয়া গিয়াছে! শুধু সমুদ্রের উপলমুখর তরঙ্গনিনাদ শুনিয়া তাহারা বেলাভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু চলা কি সহজ?

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইতেই সমুদ্রতীরে কি একটা প্রকাণ্ড কালো পদার্থ দেখিয়া রোহিতাশ্ব আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা যেন তিমি, না সেঁতাসিধাঁ, না সিন্ধু-ঘোটক না অন্য কোন জন্তু সমুদ্রজল হইতে উঠিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে! সেই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আর রক্ষা নাই, এইবার জন্তুটা তাহাদের গিলিয়া খাইবে। পরমুহূর্ত্তেই পুনর্ব্বার বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। কই, জন্তুটা ত' ঠিক একই জায়গায় পড়িয়া আছে! কিন্তু ওটা জন্তু না অন্য কিছু? রঞ্জিতের মনে হইল যেন একটা বড় নৌকা সমুদ্রতীরে পড়িয়া

রহিয়াছে। রাত্রি তখন প্রায় নয়টা। সে এক ভীষণ কাল রাত্রি। তাহারা তখন ভয়ে ভয়ে সন্দেহ-দোদুলমনে নৌকাটার নিকট অগ্রসর হইল। হাঁ, এ ত' নৌকাই বটে! সমুদ্রতীরে এমন জায়গায় নৌকা আসিল কোথা হইতে? যেরূপ ঝড় উঠিয়াছে তাহাতে নিশ্চয় কাছে পিঠে কোন জাহাজ ডুবি হইয়াছে। তাহা না হইলে নৌকা আসিবে কোথা হইতে? ক্রমে তাহারা একেবারে নৌকার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়েই একটা প্রচণ্ড বজ্রপাত হইয়া গেল; মনে হইল বাজটা একেবারে তাহাদের পাশে আসিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরণ। সেই বিদ্যুৎ-আলোকে যে আর এক নূতন দৃশ্য দেখা গেল তাহাতে তাহারা প্রথমে ভয়ে কাঠ হইয়া পরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোয় তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল নৌকার পাশে দুইটা মানুষের মৃতদেহ হাত পা ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে কি বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য! (ক্রমশঃ)

## নানা প্রসঙ্গ

# একটি অদ্ভুত হ্রদ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে যে কোনও একটি জলপ্রপাত বা যে কোনও একটি নদী তোমাদের দেখান হইবে, তবে তোমরা একবাক্যে কোন্ কোন্টা দেখিতে চাহিবে তা' আমি চোখ বুঁজিয়া বলিয়া দিতে পারি। নিশ্চয়ই বলিবে, নায়গ্রা জলপ্রপাত আর আমাজন নদী। অত বড় জলপ্রপাতও যেমন পৃথিবীতে নাই, অত চওড়া নদীও তেমনি দুনিয়ায় দু'টি মিলিবে না। কাজেই ঐ দু'টি দেখিতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি বলা যায়, পৃথিবীর বিখ্যাত হ্রদগুলির মধ্যে কোন্‌টি তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করে?

এ ক্ষেত্রে অমন চট্ করিয়া জবাব দেওয়া মুশ্‌কিল। কেউ কেউ হয়তো



ক্যাস্পিয়ান্ সাগরের নাম করিবে—কারণ পৃথিবীর মধ্যে ঐটিই সব চেয়ে বড় হ্রদ। কিন্তু যাই বল, ক্যাস্পিয়ান্ সাগর দেখিয়া বিশেষ কিছু নতুন জিনিষ দেখিলাম বলিয়া মনে হইবে না। নামেও যেমন 'সাগর' আসলেও তেমনি এই হ্রদটি একটি সাগরেরই মত। দেখিয়া সমুদ্র দেখার আনন্দ পাওয়া যায় এই যা। আমি কিন্তু কোন্ হ্রদটি দেখিতে চাহিব সে বিষয়ে মন স্থির করিয়া রাখিয়াছি। কোন্‌টা জান? 'ডেড্ সী'—বাংলায় যাকে বলে মরু-সাগর। প্যালেষ্টাইনের এই অদ্ভুত হ্রদটির কথা তোমরা ভূগোলে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ।

সাগর বলিলাম বটে কিন্তু আয়তনে এটি নেহাৎই ছোট। লম্বায় ৪৭ মাইল্

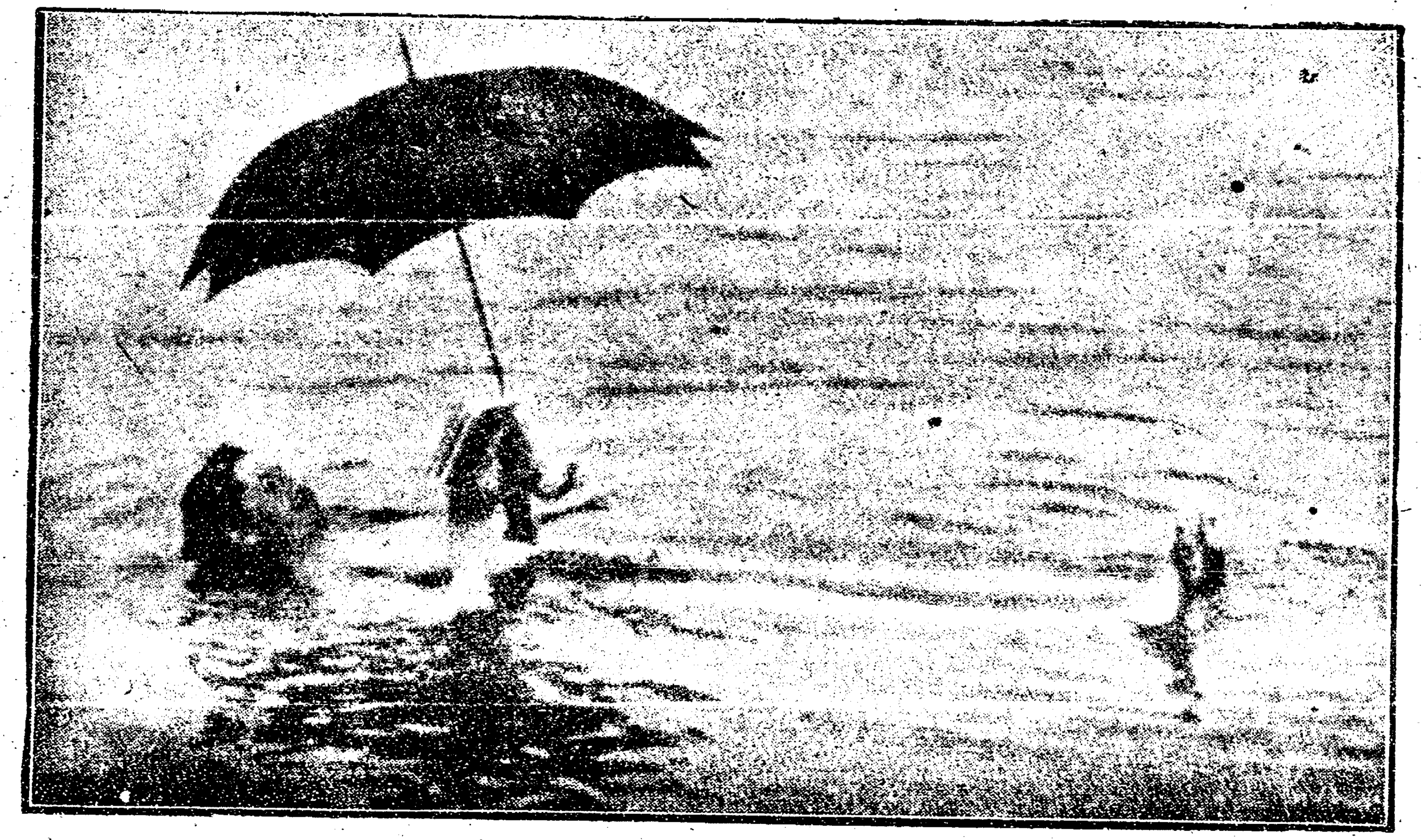

সাহেব হ্রদের জলে শুইয়া আরামে বই পড়িতেছেন,—ডুবিবার ভয় নাই।

আর চওড়ায় মাত্র ১০ মাইল। কিন্তু ছোট হইলে কি হয়, এমন অদ্ভুত হ্রদ দুনিয়ায় দু'টি নাই।

হ্রদে জল যে খুব বেশী তা নয়, সমস্ত হ্রদটা গড়ে হাজার খানেক ফুটের কিছু বেশী গভীর হইবে, কিন্তু গোটা হ্রদটাই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৩০০ ফুট নীচে। পৃথিবীর এত নীচুতে আর কোন হ্রদই নাই। শুধু তাই নয়, এই হ্রদের জল যেমনি লোনা তেমনি ভারী। এত ভারী যে তোমাকে উহার মধ্যে ফেলিয়া দিলে তুমি

মোটেই ডুবিবে না, সাধারণ পুকুরের জলে যেমন সোলা ভাসে তেমনি ভাসিয়া বেড়াইবে। ছবিতে দেখ এক সাহেব এই হ্রদের জলে শুইয়া শুইয়া ছাতা মাথায় দিয়া কেমন আরামে বই পড়িতেছেন! ডুবিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই।

আর একটা মজার ব্যাপার, এই হ্রদের জলে কোন জীবন্ত প্রাণী নাই। অন্য জন্তু দূরের কথা, একটি মাছ বা একটি জলজ উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না। শুধু হ্রদের জলে নয়, হ্রদের তীরভূমি হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটি আগাছা বা একগাছা ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না। এই জন্যই এর নাম রাখা হইয়াছে মরু-সাগর বা মৃত সাগর!

পণ্ডিতেরা বলেন, চিরকালটা কিন্তু এমন ছিল না। মরু-সাগর এক সময়ে আয়তনে কম করিয়া ২০০ মাইল লম্বা আর ৪০ মাইল চওড়া ছিল। তখন এর জলও এত লোনা ছিল না এবং সে জলে জলজন্তুরও অভাব ছিল না। নানা পরীক্ষা,—নানা গবেষণা করিয়া তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। এখনও মরু-সাগরের ধারে ধারে সে যুগের জলজন্তুদের পাথুরে কঙ্কাল মাঝে মাঝে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা আবার বলেন, সেকালকার কয়েকটি বড় বড় সহর 'সোডোম', 'গোমোড়া' ও 'জোর' এই হ্রদের নীচে চাপা পড়িয়া আছে। ইহা লইয়াও অনেক অনুসান্ধান—অনেক গবেষণা হইয়াছে, এবং হ্রদের কোন্ দিক্‌টায় ঐ জনপদগুলি ছিল তারও নাকি খোঁজ মিলিয়াছে।

যাই হোক্, নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে হ্রদটি ক্রমে শুকাইয়া ছোট হইয়া যাইতে থাকে। আশপাশ হইতে ছোট ছোট নদীনালা বহিয়া যতটা জল ইহার মধ্যে আসিত তার চাইতে অনেক বেশী জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে থাকে। এই ভাবে, এবং ঐ ধরণের আরও কতকগুলি কারণে, এখন মরু-সাগর ছোট্টটি হইয়া গিয়াছে। অবশ্য আশপাশের অনেক নদী যে এখনও এই হ্রদের মধ্যে না পড়িতেছে এমন নয়। তোমরা জর্ডান্ নদীর নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। হিন্দুদের কাছে যেমন গঙ্গা, খৃষ্টানদের কাছে তেমনি জর্ডান্ ভারী পবিত্র নদী। এই জর্ডান্‌ও আসিয়া পড়িয়াছে মরু-সাগরে। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে এক জর্ডানই, প্রত্যহ ৬০ লক্ষ টন্ জল আনিয়া মরু-সাগরে ঢালিতেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জল উড়িয়া



যাওয়ারও কামাই নাই। হ্রদের তীরে দাঁড়াইলে অনেক সময় দেখা যায়—অদ্ভুত নীলাভ সাদা কুয়াসার মত কি সব জলের উপর ক্রমাগত ভাসিয়া উঠিতেছে। অদ্ভুতই বটে!

মরু-সাগরের জল এত লোনা কেন? পণ্ডিতেরা এরও কতকগুলি কারণ বাহির করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সূর্য্যকিরণে ক্রমাগত জল উড়িয়া গিয়া হ্রদের জল ঘন হইতেছে। লবণগুলি তো আর উড়িতে পারে না, কাজেই জলে সেগুলির পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, মরু-সাগরের কাছেই আছে সোডোমের লোনা পাহাড়ের শ্রেণী। আশপাশের নদী এই পাহাড় বাহিয়া আসিবার সময় তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণ লবণ ধুইয়া আনিয়া মরু-সাগরে ফেলিতেছে। এ ছাড়া হ্রদের তীরে, আশপাশে অনেক লবণ-ঝরণা আছে। সেখান হইতেও অজস্র পরিমাণ লবণ আসিয়া হ্রদের জলে মিশিতেছে।

মরু-সাগরের জল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উহার মধ্যে শত করা ২৫ ভাগই নানা রকম লবণ। আর সাধারণ সমুদ্রের জলে (যা এত লোনা যে মুখে দিলে আমাদের মুখ বিস্বাদ হইয়া যায়) শতকরা কত ভাগ লবণ থাকে জান? বড় জোর ৪ কি ৬ ভাগ। কাজেই ভাবিয়া দেখ মরু-সাগরের জল কি ভীষণ রকম বিস্বাদ! হ্রদের জলে কেউ স্নান করিলে তার সর্ব্বাঙ্গে চাপ চাপ লবণ লাগিয়া যায়—মাথার চুলগুলি লবণ লাগিয়া শূয়োরের লোমের মত শক্ত হইয়া উঠে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা নয় কি?

লবণগুলি লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সাধারণ নূন বলিতে আমরা যা বুঝি—বৈজ্ঞানিকেরা যাকে বলেন 'সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্', এগুলি সবই সেই নূন নয়। বিভিন্ন জাতের লবণ আছে—যেমন ধর সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্, ক্যাল্‌সিয়াম্ ক্লোরাইড্, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ ক্লোরাইড্, পোটাসিয়াম্ ক্লোরাইড্ ইত্যাদি। এই সব রাসায়নিক পদার্থ মানুষের নানা কাজে আসিলেও এর কোন কোনটা—যেমন ধর ক্যাল্‌সিয়াম্ ক্লোরাইড্, জীবিত প্রাণীর পক্ষে বিষের কাজ করে। এই জন্যই মরু-সাগরের জলে কোনও মাছ বা জীবন্ত প্রাণী থাকিতে পারে না। তা ছাড়া জল অত ভারী হওয়ায় মাছেদের পক্ষে তার তলায় গিয়া থাকাও কষ্টকর।

উপরে যে সব রাসায়নিক জিনিষের নাম করিলাম, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে

নানা শিল্পে, ব্যবসায়ে তাদের চাহিদা বড় কম নয়; কাজেই বৈজ্ঞানিকদের নজর যে এদিকে পড়িবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? মরু-সাগরের জল হইতে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা তাঁরা অনেক দিন হইতেই করিতেছিলেন। গত মহাযুদ্ধে যখন বাজারে পটাশের অভাব দেখা দিল তখন বিশেষ করিয়া এই হ্রদটির দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়িল—এবং নানা প্রক্রিয়ার পর এখান হইতে পটাশ্ বাহির করিবার ব্যবস্থা হইল। আজকাল বছর বছর এখান হইতে কম করিয়া প্রায় ২০ লক্ষ টন্ পটাশ বাহির করা হইতেছে। ওষুধপত্রে, ফোটোগ্রাফিতে, নানা রকম বিস্ফোরক তৈরীর কাজে এবং বিশেষ করিয়া জমির সার হিসাবে পৃথিবীতে পটাশের প্রয়োজন তো বড় কম নয়!

শুধু পটাশ্ নয়, ম্যাগ্নেসিয়াম্, ক্যাল্সিয়াম্, সোডিয়াম্, ক্লোরিন্ প্রভৃতি কত জিনিষই না আজ মরু-সাগর হইতে তোলা হইতেছে! নানা রকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে এর প্রত্যেকটিরই দারুণ চাহিদা। এ সবের জন্য হ্রদের চারধারে বড় বড় কারখানা বসিয়াছে। লোকের বসতি হইলে আধুনিক যুগে যা যা দরকার একে একে সে সবও সেখানে আসিতেছে—ফলে মরু-সাগর অঞ্চল এক হাস্যময় দেশে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। প্যালেষ্টাইন্ সরকারও এদিক্ দিয়া কম লাভবান্ হন নাই।

মরু-সাগর অঞ্চলে যাঁরা বেড়াইতে গিয়াছেন তাঁরা বলেন জায়গাটি নাকি বাস্তবিকই বড় মনোরম। হ্রদের জল যেমন নীল, তেমনি স্বচ্ছ; চারিদিকের দৃশ্য এমন গাম্ভীর্য্যময় যে দেখিলে ভাবুক মাত্রই মুগ্ধ হইবে। সেকালকার লোকেদের অবশ্য ধারণা ছিল যে এই অঞ্চলটি—শুধু এর জল নয়, আশপাশের মাটী-বাতাস পর্য্যন্ত, এমন বিষাক্ত যে কোনও জীবিত প্রাণীর পক্ষে সেখানে টেকা দুষ্কর। এখন সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া জানা গিয়াছে। জায়গাটির আবহাওয়া বাস্তবিকই ভাল—এবং শীতকালে অতিরিক্ত রকম ভাল। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে কাছাকাছি প্রয়োজন মত ২।৩টি মরূদ্যান বানাইয়া লওয়া বিশেষ কষ্টকর নয়। ঐ ভাবে অতি সহজেই বোধ হয় জায়গাটিকে একটি আদর্শ স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত করা যায়।

---

# মোটা মাসীমার মাত্র একদিন

শ্রীপ্রতিভা বসু

মাসীমার যন্ত্রণায় আর পারি না। আমরা অতগুলো ভাইবোন, কি জানি কেন আমার উপরই তাঁর যত সুদৃষ্টি! যেখানেই যাবেন আমাকে নেবেনই নেবেন। কত অজুহাত দেখাই, কত মাথা ধরা বলি, পেটের ব্যথায় অস্থির হই,—উঁহু, ভবি কি ভোলে? তিনি বলেন, 'লিলি বেশ স্মার্ট্ মেয়ে, চমৎকার ভদ্রতা শিখেছে।' তাই জন্যে আজকাল পূর্ণবেগে অসভ্যতার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেছি।

মাসীমাকে তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। সেই যে প্রকাণ্ড একটা ঢোলের মত গোল মানুষ। কলকাতার সব পার্টিতে, সব নিমন্ত্রণে, সব সিনেমায়, সব বড় বাড়িতেই তো তাঁর অবিরাম গতিবিধি—আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হাঁদারাম।

আরো অনেক দিনের মত একদিন তিনি বল্লেন, 'লিলি, চল্ সিনেমায় যাই।' তাঁর সঙ্গে যেতে ঘোর অনিচ্ছা, কিন্তু নিতান্তই যখন সিনেমা তখন তো আর না বলতে পারি নে। সাজগোজ করে তো রওনা হওয়া গেল। পথে বেরিয়ে মাসীমা বল্লেন, 'বাব্বা, আজকাল যা রোদ, ট্রামের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক পাপের শাস্তি।' আমি চুপ করেই ছিলাম, এর মধ্যেই তিনি হাত তুলে একটা রিকসা ডেকে থামালেন আর আমি অমনি চেঁচিয়ে উঠ্লাম, 'তুমি কর কি মাসী! তুমি যাবে রিক্সতে?'

মাসীমা মুখভার করে বল্লেন 'কেন, আমার মত মানুষ বুঝি আর রিক্সয় চড়ে না? আমি তো মাঝারি রকম; কত কত মোটা মানুষ দেখি চড়ে চড়ে যাচ্ছে।'

একদৃষ্টিতে মাসীমার মাঝারি চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তাড়া খেয়ে চড়ে বসলাম। আমি বসবার পরে উঠ্লেন মাসীমা। মাসীমা যখন পাদানিতে একখানা পদপাত করলেন তখনই গাড়ি প্রায় বসে যাবার যোগাড়; আর যে মুহূর্ত্তে তিনি আমার পাশে এসে আমাকে চেপ্টে দিয়ে বসলেন সেই মুহূর্ত্তে রিক্সওয়ালা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অতীত হয়ে শূন্যে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। হ'ল কি—পেছনের দিকে এত ভার হ'ল যে আমরা চিৎ হয়ে প্রায় রাস্তায় ঠেকলাম, আর রিক্সওয়ালা বগলের তলায় রিক্সর ডাণ্ডিটা নিয়ে মাটি থেকে প্রায় একহাত শূন্যে উঠে ঝুলতে লাগলো। সে এক দৃশ্য। লজ্জায় আমি লাল আর মাসীমা চীৎকার করে বল্তে

লাগলেন—'বেয়াদব্ তোম্ হায়, একদোম বেয়াদব্। এয়সা ঝুলালে আধা পয়সা ভি মিলতা না হায়। তোমকো জেলমে দিয়ে দেবেগা'। ঘন ঘন তিনি মুখ মুছতে লাগলেন রুমাল দিয়ে। আর এদিকে রাস্তায় ভিড় জমে গেল। ছোট ছেলেগুলো হো হো করে হাস্‌তে লাগল। অবশেষে বাস্ থেকে নেমে জোয়ান জোয়ান তিনটি যুবক এসে ঝুলে পড়ল রিক্‌সর ডাণ্ডি ধরে, আর রিক্‌সওয়ালার পা ঠেকলো তখন মাটিতে।

আমি তো তক্ষুণি লাফ দিয়ে নাম্‌তে যাচ্ছিলাম কিন্তু মাসীমা একখানা হাত থপ্ ক'রে আমার কোলের উপর রাখলেন আর আমার পা ভারি হয়ে গেল পাথরের মত। কি আর করি, মুখ চুণ ক'রে ঐ রিক্‌সতেই ঠুকুর ঠুকুর ক'রে এলাম সিনেমা দেখতে। মনে মনে জোরের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম এই শেষ! এই শেষ!

সিনেমার দরজায় দাঁড়িয়ে আর এক ব্যাপার—রিক্‌সওয়ালাকে মাসীমা ভীষণ ধমকাতে লাগলেন। তার দোষ সে ভাড়া চেয়েছে। আমি টিকিট কিনে এসে কাণ্ড দেখে তো অবাক্। মাসীমা বলছেন, 'তোম্ তো আচ্ছা বদ্‌মাস আদ্‌মী হায়! আধা ঘণ্টা ধরে রাস্তামে ঝোলাতা—ক্যাত্‌না সরম পাতা—তবুও আবার ভাড়া চাতা হায়?' আমি চটে বল্‌লাম, 'কি আরম্ভ করেছ তুমি! লোকটা বয়ে নিয়ে এলো আর ভাড়া দেবে না?'

'দিয়েছি তো—চারটে পয়সা, তুই আবার ফোঁপর দালালি করতে এলি কেন?'

মুখে মুখে বল্‌লাম, 'ফোঁপর দালালি কি, ওকে ন্যায্য পাওনা দেবে না তাই ব'লে? তোমার ক'জনের ভাড়া দেয়া উচিত জান? তার মধ্যে সেই বালিগঞ্জ থেকে বেচারা এই ভবানীপুরে এসেছে, দিলে মাত্র চারটে পয়সা!' আমি রিক্‌সওয়ালার হাতে তাড়াতাড়ি একটা আধুলি গুঁজে দিয়ে মাসীমাকে টেনে নিয়ে এলাম হলে।

হলে বসেও তিনি গজ্ গজ্ করতে লাগলেন। আমি সেদিকে কান না দিয়ে ছবিতে মন দিলুম। একটু পরেই মাসীমা উঠে দাঁড়ালেন—'উঃ, অসম্ভব গরম। টিকৃতে পারছি না। আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি।'

আমি অবাক্ হয়ে বল্‌লাম, 'হাতমুখ? এ কি বাড়ি নাকি যে তোমার জন্য সব হাতমুখ ধোবার জল সাজিয়ে রাখবে!"

আমাকে ধমক দিয়ে বল্‌লেন, 'চুপ কর তুই, সব তাতেই তোর ডেঁপোমি? জল না রাখলে এরা করছে কি? নালিশ করবো না ম্যানেজারের কাছে?'

লোকেরা বিরক্ত হচ্ছিল, কেননা মাসীমার প্রস্থ তো বড় কম নয়। পেছনের সিটের অন্তত: প্রায় দশজন লোকের চোখ তিনি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বল্লুম, 'ঠিক ঠিক—যাও, শীগ্‌গির এসো।'



মাসীমা চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ আমার হুঁস হ'ল যে মাসীমা এখনো ফিরে আসেন নি। একটু উৎকণ্ঠিত হলুম কিন্তু তক্ষুণি আবার একটা দৃশ্যে মন লেগে গেল আর নিবিষ্ট হ'য়ে গেলুম সেদিকে। এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ইন্‌টারভ্যাল হয়ে গেল তবু মাসীমা এলেন না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে হঠাৎ দেখি বাথরুমের দিকে বেজায় ভিড়। একটা চাপা হাসির ঢেউ সকলের চোখে মুখে। এসে যা দেখ্‌লাম—আমার মনে হ'ল ধরণী, দ্বিধা হও।

দেখি কি, বাথরুমের দরজার একটা পাট বন্ধ, আর একটা পাট খোলা। আর সেই ফাঁকটুকুর মধ্যে মাসীমার প্রকাণ্ড দেহ অদ্ভুত এক বক্রভঙ্গীতে আটকে আছে। কোথায় গেছে মাথার আঁচল, খোঁপা খুলে, চশমা ভেঙে ভীষণ ব্যাপার। এদিক্ থেকে একজন স্ত্রীলোক সবেগে টান্‌ছে, ওদিক্ থেকে আর একজন কেউ সবেগে টান্‌ছে। আমি তো স্তম্ভিত। মনে হ'ল লম্বা দিই, কিন্তু হাজার হোক্ মাসী তো। কি আর করি, ডেকে আন্‌লাম ম্যানেজারকে। এলো মিস্ত্রী, ভাঙলো কপাট; অবশেষে এক চমৎকার মূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়ে এলেন মাসীমা। এসেই তিনি প্রথমটায় আমাকে আক্রমণ করলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ম্যানেজারের উপর।

'এ কি অন্যায় আপনাদের! কেন আপনারা দরজায় রং লাগিয়ে রেখেছেন? একটা পাট আটকে গেল বলেই তো এই কাণ্ড হ'ল। আমি নালিশ করবো আপনার নামে—মানহানির মোকদ্দমা করবো। আমার পিসতুতো দাদা হাকিম, খুড়তুতো ভাসুর মুন্সেফ—মামা একজন মস্ত ডাক্তার, জ্যাঠতুতো বোনের আপন দেওর এড্‌ভোকেট—তা কি আপনি জানেন? আপনার এত সাহস!'

আমি লজ্জায় অধোবদন। উচিত ছিল মাসীমাকে ফেলে পালিয়ে আসা কিন্তু গুরুজনদের আরো অনেক যন্ত্রণার মত এটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হজম করতে হ'ল। শেষে বাজলো ঘণ্টা—সবাই এবার সব ছেড়ে ছবি দেখতে গেল; মাসীমা বল্‌লেন, 'যাব না, দেখবো না ওদের ছবি। চল্, বাড়ি ফিরে যাই।'

আমি বল্লুম, 'তাই ভাল।'

নেমে এলুম রাস্তায়।

দাঁড়িয়েছিলুম ট্রামের জন্য—হঠাৎ মাসীমা, 'ঐ রে হাবুল যায় রে!'—বলেই হিমালয়ের মত বিরাট শরীর আন্দোলিত করতে করতে ছুট্‌লেন হাবুলকে ধরতে।

হাবুল আমার দাদা। একেবারে পাখোয়াজ ছেলে। রাতদিন তার চালের অন্ত নেই। মাসীমা মনে করেন পৃথিবীর যে কোন দুরূহ কাজই চলে ওকে দিয়ে। তিনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে বলতে লাগলেন, 'হাবলা—এই হাবলা! ম্যানেজারটাকে একটা শিক্ষা দিবি—আয় তো। এই

হাবলা!'—দড়াম্ করে এক বোমা ফাটার মত শব্দ হ'ল—অর্থাৎ মাসীমা ফুটপাথে আছাড় খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। হাবুল শব্দের চোটে ফিরে তাকিয়ে ছুটে এলো। সেই মুহূর্ত্তে এলো একটা বালিগঞ্জের ট্রাম। লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম আমি। তার পর জানলায় একটু একটু মুখ বাড়িয়ে দেখলাম হাবুল টেনে তুলছে মাসীমাকে আর মাসীমা মুখ বিকৃত করে কর্পোরেশনের শ্রাদ্ধ করতে করতে রাস্তার ধূলোবালি মাখা বিচিত্র শাড়িখানা ঠিক করছেন।

---

# খোস গল্প

শ্রীকৌটিল্য

[ বিলাতী সাময়িক পত্রে অনেক সময় ছোট্ট ছোট্ট মজার মজার গল্প দেখা যায়। এই ধরণের কয়েকটি গল্প সংগ্রহ ক'রে গত আশ্বিন সংখ্যায় দেওয়া হয়েছিল; এখানে আর কয়েকটি দেওয়া হ'ল। ]

১

আদালতে এক উকিল জনৈক ডাক্তারকে জেরা করছিলেন।

উকিল—আপনার কোন ভুল হয় নি তো? ঠিক বলছেন?

ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকিল—ডাক্তারের ভুল হ'লে কি হয় জানেন তো? রোগীকে অনেক সময় ৬ ফুট মাটীর তলায় গিয়ে শুতে হয়।

ডাক্তার—জানি বই কি। আর এও জানি যে উকিলদের বেলা ঐ রকম ভুল হ'লে আসামীকে অনেক সময় ঝুলতে হয় ৬ ফুট মাটীর ওপরে গিয়ে।

২

বিষ্ণু বাবু অনেক দিন বিলেতে কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। তিনি নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত সব বিজ্ঞান্ শিখে এসেছেন,—মানুষের শরীরের গঠন-প্রণালী দেখে তার স্বাভাবচরিত্র—নাড়ীনক্ষত্র সব বলে দিতে পারেন।

সেদিন বিষ্ণু বাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছেন এবং থেকে থেকে তাঁর নানা বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছেন, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন হরিশ বাবু। হরিশ বাবু যেমন মোটা তেমনি মস্ত তাঁর মাথাটা। মাথার একটা দিক্ আবার কেমন ফুলে রয়েছে। বিষ্ণু বাবু একবার তাঁর দিকে চেয়ে, একটু হেসে বল্লেন, "এই ধরুন এঁর কথা। এঁর মাথার এইখানটা এঁর শিশুপ্রীতি বোঝাচ্ছে।"



হরিশ বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "যা বলেছেন মশাই। পাড়ার ছোঁড়াগুলো কাল ঢিল মেরে ঠিক ঐখানটাই তো ফুলিয়ে দিয়েছে!"

৩

মাঝ সমুদ্রে জাহাজ চলেছে। হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। একজন যাত্রী দৌড়ে এসে ক্যাপ্‌টেনকে জিজ্ঞেস করলে, "কি রকম ঝড় উঠছে, দেখছেন তো?" ক্যাপ্‌টেন বল্লেন, "হুঁ।"

"এখন কি উপায়! ডাঙ্গা কত দূর এখান থেকে?"

ক্যাপ্‌টেন একটু ভেবে বল্লেন, "তা মাইল তিনেক হবে।"

যাত্রীটি যেন একটু আশ্বস্ত হলেন, বল্লেন, "তবু ভাল।" খানিক পরে আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কোন্ দিকে ডাঙ্গা?"

উত্তর এল, "আজ্ঞে, ঠিক নীচের দিকে,—জলের তলায়।"

৪

এক উকিল বাবুর ছবি তোলা হয়েছে। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে ছবিটা দেখিয়ে বল্লেন, "কেমন এঁকেছে দেখ তো হে?" বন্ধু অনেকক্ষণ ভাল ক'রে দেখে বল্লেন, "সবই তো ভাল হয়েছে, কিন্তু তোমার হাত দু'টো গেল কোথায়?"

"কেন, ঐ তো আমার পকেটে ঢোকান রয়েছে!"

"ঐখানেই তো ভুল এঁকেছে। তোমার হাত তো তোমার নিজের পকেটে কখনও থাকে না,—আমি তো জানতাম ওটা সর্ব্বদাই অন্যের পকেটে ঘোরাফেরা করে!"

৫

দু'টি পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক ঘড়ীর দোকানে এসেছেন ঘড়ী কিনতে। তাঁদের একজন একটা পছন্দসই ঘড়ী বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটার দাম কত?" দোকানী বিনীতকণ্ঠে বল্ল, "আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকা।" ভদ্রলোক তখন তার চাইতে কিছু ছোট আর একটা ঘড়ী দেখিয়ে বল্লেন, "এটার?" দোকানী বল্লে, "সত্তর টাকা।" ভদ্রলোক একটু অবাক্ হয়ে চাইলেন, তার পর আরও ছোট একটা ঘড়ী দেখিয়ে বল্লেন, "আর এটা নিলে কত পড়বে?" দোকানী তেমনি বিনীতকণ্ঠে বল্লে, "আজ্ঞে ওটা পড়বে একশ' টাকা।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি এইবার কথা বল্লেন, "বলেন কি মশাই! তা হ'লে একদম ঘড়ী যদি নাই নেই তা হ'লে তো হাজার খানেক টাকা দিতে হবে বলুন?"

---

# বৈজ্ঞানিকের বিপত্তি

শ্রীআনন ঘোষাল

৫

দু'ধারে বাগান বাগিচা ও বৃক্ষাদির সার, আশে পাশে ঝোপঝাড়, কাঁটাবন। মাঝখান দিয়ে উঁচুনীচু কাঁচা রাস্তা। ছাত্রের দল হোঁচট্ খায়, কেউ বা পড়তে পড়তে রয়ে যায়। তাদের শ্রমের লাঘব করবার উদ্দেশ্যে ডিঃ রায় হুকুম দিলেন—'মার্চ্চ সং—বেঙ্গলী।' সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের দল ইংরেজী সুরে গেয়ে উঠল :

"এগিয়ে চল এগিয়ে চল,
আমরা ছাত্রদল,
ভবিষ্যতের বল,
আমরা ছাত্রদল।

আননে মোদের নূতন আভা,
শিখেছি যা' কিছু নূতন ভাবা,
জানি না কাহারে বলে অতল,
খুঁজিব সবারি তল ;
আমরা ছাত্রদল।

হইয়া আমরা আপন-হারা
খুঁজিয়া খুজিয়া হইব সারা
দিক্ ও ভূমণ্ডল ,
এগিয়ে চল,—এগিয়ে চল,
আমরা ছাত্রদল,
ভবিষ্যতের বল।"

প্রফেসার চলতে চলতে অনেকক্ষণ এই বাংলা মার্চ্চ-সঙ্গীত শুনলেন। পল্লী অঞ্চলের শস্য-শ্যামল পথঘাট ও মাঠ তাঁকেও বেশ ভাবাকুল করে তুলেছিল। চারিদিক্ কি সুন্দর শোভাময়! তাঁর মনে হ'ল দৃশ্যগুলির সঙ্গে ইংল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের কাউন্টিগুলির তুলনা করা চলে। তিনিও এইবার আত্মহারা হয়ে আদেশ জানালেন—'মার্চ্চ সং,—ইংলিশ।' ছাত্রের দল ডিঃ রায়ের গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পূর্ব্বের মতই গেয়ে উঠল :



"হাফ্ এ লীগ্, হাফ্ এ লীগ্
ও ই ষ্টুড্ন্ট্স্ গ্যাং,
ষ্টেডি প্লীজ্, মার্চ্চ্ অন্
ড্রাইভ্ অল্ ফিউচার্স্ প্যাং।"

বাগিচা ও বৃক্ষের সার পার হয়ে বিজনী গাঁয়ের রাস্তাটা এইখানে মাঠে এসে পড়েছে। দু' পাশে ধূ ধূ দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর। মাঠের বুক চিরে বিজনী গাঁয়ের দিকে উঁচু পথটা চলে গেছে। দু' পাশে ধানের ক্ষেত। চাষী হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে বীজ ধান পুঁতছে। কেউ বা লাঙ্গল ঠেলছে। একজন চাষা লাঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে আপন মনে গান গাইছিল :

"কোমল আঁখির কাজল তারায়
আগল ভাঙা জল,
দিল্ দরিয়ায় পাগল নেয়ে
কোথায় যাবি বল্ ?
প্রাণের টানে উজান বেয়ে
চলিস ও তুই সারি গেয়ে,
কোন্ সুদূরের গাঙ্গের মাঝে
ভুলতে ভবের ছল ?"

হঠাৎ প্রফেসার ও ছাত্রের দলটীকে সেই দিকে মার্চ্চ্ করে গান গাইতে গাইতে আসতে দেখে সে তার গান থামাল। প্রফেসার ও ডিঃ রায়ের পরনে বিলাতী স্যুট্, ছেলেদের পরনে খাকি হাফ্ প্যাণ্ট্ ও শার্ট। চাষীর দল অবাক্ হয়ে সেই হাফ্ প্যাণ্ট্ পরা পল্টনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চাষীদের মধ্যে একজন ছিল একটু বেশী সাহসী ; উপরে রাস্তার উপর উঠে, ভয়ে ভয়ে পিছনের এক শীর্ণকায় ছাত্রকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল—"হুজুররা কি জরীপ করতে এইয়েছেন ?"

কথাটা প্রফেসারের কানে গিয়েছিল। তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"হোয়াট্ হি সেইস্ বয়েজ্ ? য়্যা, কি বলে লোকটা ?"

উত্তরে ছাত্র দেবেশ বল্ল—"সার্ভের কথা বলছে স্যর্ ! ওরা আমাদের জরীপ করা সাহেব ভেবেছে।"

প্রফেসার মুচকি হেসে, মাথা নেড়ে উত্তর করলেন—"হুঁ, অজ্ঞ মানব ! ইচ্ছে হয় তোমাদের বিজ্ঞান শেখাই। ইগ্নোরেণ্ট্ পিপ্ল্। আই উইশ্ টু টিচ্ দেম্ সায়েন্স।"

চাষী লোকটী ব্যাপার দেখে ভড়কে গিয়ে সরে দাঁড়াল। ছাত্রের দল গান গাইতে গাইতে, আবার মার্চ্চ্ সুরু করল।

(ক্রমশঃ)

# গ্রীজ্‌লি ভালুকের কবলে

শ্রীশান্তা দেবী

আমাদের দেশে আগে রাজারা মৃগয়ায় যেতেন। মৃগয়া মানে হরিণ শিকার। তবে সব সময়ে যে হরিণই মারতেন তা নয়, বুনো শূয়োর কিংবা ঐ রকম অন্য বন্য জন্তুও বাদ যেত না। আজকাল অবশ্যি বড়দরের শিকার বলতে আর হরিণ শিকারকে বোঝায় না। বাঘ, সিংহ, চিতা এই সব শিকারই বোঝায়। আধুনিক যুগের বাঘ-সিংহ শিকারের গল্প তোমরা অনেক শুনেছ, আজ একটা ভালুক শিকারের গল্প শোন।

আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে হিমালয় অঞ্চলে, ভালুক যথেষ্ট দেখা যায়। হিংস্র জন্তু হিসাবে বুনো ভালুক বড় কম চীজ্ নয়। কিন্তু আমি যে ভালুকের গল্প বলছি এর মত ভয়ানক জাতের ভালুক দুনিয়ায় কমই আছে। মেরুর দেশের হিংস্র মাংসখোর সাদা ভালুকের কথা তোমরা শুনেছ, কিন্তু এদের কাছে তারাও বোধ হয় নিরীহ গোছের প্রাণী।

এই ভালুকদের বলে গ্রীজ্‌লি ভালুক। এরা থাকে উত্তর আমেরিকায়। এদের রং সাদাও নয়, কালোও নয়—পাটকিলে রংএর। সারা গা বড় বড় লোমে ঢাকা। লম্বায় এক-একটা হয় প্রায় ন' দশ ফুট, ওজনেও এক একটা কম করে ১২।১৪ মণ। স্বভাবটা যেমন এদের মার্কামারা তেমনি অদম্য এদের সাহস, আর তেমনি এদের শক্তি। একবার এদের আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা পড়লে, যত শক্তিশালী জানোয়ারই হোক্ না কেন, তার দফা শেষ হবেই। বুনো মোষের মত জোয়ান্ আর বদ্‌মেজাজী জানোয়ার কমই আছে, কিন্তু তাদেরও এই গ্রীজ্‌লি ভালুকের ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকতে হয়। একটি মাত্র ভালুক দলকে দল বুনো মোষকে ঘায়েল করে ছেড়েছে এমন ঘটনাও অনেক শোনা গেছে।

মঃ ওগান্ নামে এক শিকারী এই ভালুক শিকারের যে কাহিনী লিখে গেছেন তারই কথা বল্‌ব।

ওগানের বাড়ী ছিল ফ্রান্সে। সোনার ব্যবসা করবার জন্য তিনি ক্যালি-



ফোর্ণিয়ায় আসেন এবং অল্প দিনেই প্রচুর টাকাপয়সা উপার্জ্জন ক'রে ফেলেন। তাঁর দেশ-ভ্রমণের বাতিক ছিল, আর ভাল শিকারী ব'লেও একটু গর্ব্ব ছিল। প্রায়ই তিনি বন্দুক নিয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। নতুন নতুন জায়গা দেখে যেমন আনন্দ পেতেন তেমনি নতুন নতুন জন্তু শিকার করতে পারলেও কম খুসী হতেন না।

একবার ওগান্ তাঁর প্রিয় খচ্চর "কাদির" পিঠে কিছু জিনিষপত্র চাপিয়ে এই রকম এক বন-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। নানা জায়গা ঘুরে শেষে তিনি এক নির্জ্জন জায়গায় এসে পড়লেন। জায়গাটা ঘন বন হ'লেও বড় বড় পাহাড়ে ভরা।

একটা পাহাড় দেখে ওগানের সাধ হ'ল তার চূড়ায় উঠবেন। তিন দিন ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও কিন্তু তিনি পেরে উঠলেন না—মাঝে থেকে এমন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে দিন কয়েক জিরিয়ে না নিলে আর চলে না। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর নজরে পড়্‌ল পাহাড়ের নীচে চমৎকার একটা গুহা। গুহার সামনেই একটা ওক্ গাছ গুহায় ঢুকবার দরজাটা আগলে রেখেছে। আর ঐ গাছ বেয়ে চট্ ক'রে পাহাড়ের উপরে উঠে যাওয়ারও ভারী সুবিধে। ওগান্ ঠিক করলেন এই গুহাটার মধ্যেই তিনি দিন সাতেক বিশ্রাম ক'রে নেবেন।

সঙ্গের ব্যাগে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই আছে, আর আছে বন্দুক। বনে শিকার থাকতে খাবারের ভাবনা কি? ওগান্ একটা হরিণ মেরে গুহায় ফিরে এলেন। কিন্তু এসেই দেখেন, জায়গাটা খুব ভাল বাছেন নি। গুহার চারদিকে চিবোন হাড়ের টুক্‌রো ছড়ান, আর ভালুকের পায়ের দাগ। এক সময় হয়তো কোন ভালুক এই গুহাটিতে বাস করে গেছে, তারই চিহ্ন চারদিকে পড়ে রয়েছে। তবু, সাবধানের বিনাশ নেই ভেবে, ওগান্ সামনের ওক্ গাছ থেকে ডাল কেটে এনে গুহার দরজায় বেশ মজবুত ক'রে একটা বেড়া দিয়ে নিলেন। তার পর হরিণটাকে পুড়িয়ে কিছুটা মাংস খেলেন, বাকীটা নূন দিয়ে মেখে, গুহারই এক কোণে একটা গর্ত্ত খুঁড়ে, সেখানে পাতা বিছিয়ে তার ওপর রেখে দিলেন—ভবিষ্যতের জন্য।

তখন দুপুর বেলা, তাই ওগান্ ভাবলেন একটু কাছাকাছি ঘুরে দেখা যাক্। খচ্চরটা ওকের ডালে বেঁধে রেখে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা দূরেই তিনি চলে এলেন। একটা উঁচু জায়গা তাঁর ভারী পছন্দ হ'ল। সামনেই ছিল একটা ওক্ গাছ। তারই নীচে গিয়ে বসলেন। বেচারা বরাবরই শ্রান্ত ছিলেন, একটু আরাম পেয়ে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না; গভীর ঘুমে ঢলে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই বনের মধ্যে পথ চিনে গুহায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না ভেবে তিনি রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। বেশ শীত পড়েছিল, তাই শুকনো ডালপাতা যোগাড় ক'রে আগুন জ্বালিয়ে বসলেন।

একটু পরেই দেখলেন সামনে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখেন চারটে গ্রীজ্‌লি ভালুক তাঁর দিকে কটমট করে চেয়ে আছে কিন্তু আগুনের ভয়ে কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না। ওগান্ তাদের না ঘাঁটিয়ে আরও বেশী ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। আগুন দেখে ভালুকগুলো সেখান থেকে সরে পড়্‌ল।

কোন রকমে রাত কেটে গেল। দিনের আলো উঠতেই ওগান্ ত্বরিত পদে ছুটলেন গুহার দিকে—খচ্চরটা যে গাছেই বাঁধা রয়েছে! গুহার কাছে পৌঁছবার আগেই তিনি দূর থেকে যা দেখলেন তাতে তো চক্ষু চড়ক গাছ। চারটে ভালুক তাঁর আদরের খচ্চরটাকে নিয়ে পরমানন্দে জলযোগ করছে। দেখে রাগে ওগানের গা জ্বলে গেল কিন্তু গ্রীজ্‌লি ভালুককে (তাও আবার তারা দলে ভারী) চটান বিপজ্জনক ভেবে কিছু করতে সাহস পেলেন না। একটা পাহাড়ের ফাটলে লুকিয়ে থেকে তিনি ভালুকদের ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগলেন। ভালুকগুলো খচ্চরটিকে সম্পূর্ণ শেষ করে চলে গেল—শুধু পড়ে রইল গাছের সঙ্গে বাঁধা তার মাথাটা। ওগান্‌কে তারা দেখতে পেল না। খচ্চরের তাজা মাংসের গন্ধেই বোধ হয় তাদের নাক ভরপুর ছিল; ওগানের গন্ধ তারা টের পেল না।

ভালুকগুলো চলে গেলে ওগান্ গুহার কাছে এগিয়ে এলেন। এসে দেখেন, আর এক কাণ্ড। তাঁর অত মজবুত ওকের বেড়া কে ভেঙ্গে কুটি কুটি করে রেখেছে, আর গুহার ভিতর থেকে কেমন একটা গাঁক্ গাঁক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওগান্ ভিতরে না গিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে কয়েকটা বড় বড় পাথর তুলে গুহার ভিতর



ছুঁড়ে মারলেন। একটু পরেই একটা বিকটাকার গ্রীজ্‌লি ভালুক গুহা থেকে তেড়ে বেরিয়ে এল এবং ওগানের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই হেলতে দুলতে তাঁর দিকে রওনা হ'ল। গুহার সামনেই যে ওক্ গাছটা ছিল মুহূর্ত্তের মধ্যে সে সেটায় চড়ে বসল, তার পর ওগান্‌কে ধরবার জন্য তর্ তর্ করে বেয়ে উঠতে লাগ্‌ল। ওগান্ বেগতিক দেখে আর দেরী না ক'রে পর পর তিনটি গুলি ছুঁড়লেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলি খেয়ে ভালুক মাটীতে গড়িয়ে পড়্‌ল। তার পর তার সে কি রাগ! আঁচড়ে কামড়ে ওক্ গাছটাকে কুটি কুটি করতে পারলে যেন সে বাঁচে। তার গর্জ্জনে সমস্ত বনভূমি কাঁপতে লাগ্‌ল। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তা চলল না। একটু পরেই সে স্থির হয়ে গেল।

ভালুক মারা যেতেই ওগান্ নেমে এলেন। গুহায় ঢুকে দেখেন ভালুক এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল না—তাঁর সঞ্চিত নূন-মাখা হরিণের মাংস খেয়ে শেষ করে গেছে। ওগান্ আর কি করেন, তিনি শুনেছিলেন গ্রীজ্‌লি ভালুকের মাংসও খেতে নেহাৎ মন্দ নয়। তিনি ভালুকটাকেই পুড়িয়ে তার খানিকটা দিয়ে জলযোগ সারলেন, আর বাকীটা নূন মাখিয়ে আগেকার মত রেখে দিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগলেন।

---

## কার্ত্তিক মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গ্রাহক-গ্রাহিকার ভোটে প্রতিযোগিতার উত্তর এই রকম দাঁড়িয়েছে :—

(১) বৈজ্ঞানিক (২) চিকিৎসক (৩) ধর্ম্মোপদেষ্টা (৪) রাজনীতিক (৫) শিল্পী (৬) কবি (৭) সাহিত্যিক (৮) ব্যবসায়ী (৯) সাংবাদিক (১০) যোদ্ধা (১১) ঐতিহাসিক (১২) অভিযাত্রিক। এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠিয়েছেন শ্রীইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী (কলিকাতা)। তিনিই প্রথম পুরস্কার পাবেন। ২য় পুরস্কার পাবেন শ্রীমালবিকা রায় (বালীগঞ্জ), ও ৩য় পুরস্কার পাবেন শ্রীজয়ন্ত মজুমদার (নিউ দিল্লী)। শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র সাধুখাঁ (গারুলিয়া), শ্রীকুন্তলা মজুমদার (রায়পুর) ও শ্রীমনীষা সেন (খুলনা)—এঁদের উত্তরও তালিকার বেশ কাছাকাছি হয়েছে।

---

# মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্যের জীবিত লেখকদের মধ্যে যাঁদের লেখা তোমাদের সব চেয়ে ভাল লাগে তাঁদের নাম লিখে পাঠাবে। যাঁরা গল্প বা উপন্যাস লেখেন তাঁদের ৫ জনের নাম, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের ৫ জনের নাম এবং যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন তাঁদের ৫ জনের নাম পাঠাতে হবে। সকলের ভোট নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং যাঁর প্রেরিত তালিকা ঐ তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে তাঁকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে। ১লা মাঘের (১৩৩৯) মধ্যে তালিকা রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

---

স্যর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়েছে। তাঁর নাম তোমরা সবাই জান। এক সময়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে তিনি কিছুকাল পাটনায় আইন ব্যবসায় করেন এবং কিছু দিনের জন্য ভারত সরকারের আইন সচিবের কাজও করেন। শেষ বয়সে তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা রূপে দেশের কাজে নামেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার তিনি সভাপতি ছিলেন। গত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বরেণ্য নেতাকে হারাল।



সম্প্রতি কলকাতায় রণজী প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের সঙ্গে বিহার দলের ক্রিকেট ম্যাচ্ হয়ে গেছে। বিহার দলের অধিনায়ক ছিলেন বিখ্যাত টেষ্ট খেলোয়াড় ও বোলার এস. ব্যানার্জ্জি; বাংলা দলের অধিনায়ক ছিলেন কে. বোস। বিহার দল প্রথম ইনিংস্এ করেছেন ২৭১, বাংলা দল ৩১২। বাংলা দলে এন্. চ্যাটার্জ্জি ১০৪, জনষ্টন ৮৭ ও কুচবিহারের মহারাজা নট্ আউট্ থেকে ৭১ রান্ করেন। দ্বিতীয় ইনিংস্এ বিহার দল ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার করে। তাদের রান্ হয় ১৭৬। বাংলা দল এই ইনিংস্এ ৩ উইকেটে ১২০ রান্ করলে খেলা শেষ হয়। এন্. চ্যাটার্জ্জি এবারেও ৬৪ রান্ করেন। তিন দিনের খেলা, কাজেই প্রথম ইনিংস্এর ফলাফল দেখেই খেলার জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়েছে। পরবর্ত্তী রাউণ্ডে বাংলা দলকে যুক্তপ্রদেশ কিংবা হোলকারের সঙ্গে খেলতে হবে।

* * *

যুদ্ধের মতিগতি বোঝা ভার, তবে যুদ্ধটা এখন অনেকটা মিত্র পক্ষীয়দের অনুকূলেই চলছে। উত্তর আফ্রিকায় ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত বাহিনী অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে। সেখানকার ফরাসী অধিবাসীরাও তাদের সাহায্য করছে। রুশ রণাঙ্গণেও রুশরা নানা জায়গা পুনর্দখল করে চলেছে।

এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি; তবে বাংলা এবং আসাম সীমান্তে তাদের আক্রমণের আশঙ্কা কমে নি এবং, ইতিমধ্যে, চট্টগ্রামের উপর তাদের বিমান বহর একাধিক বার হানা দিয়েও গেছে। (১৩ই ডিসেম্বরের খবর।)

* * *

সম্প্রতি এক আমেরিকান্ নিগ্রোর অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনীর খবর বেরিয়েছে। একটা আমেরিকান্ জাহাজ বিপক্ষের টর্পেডোর ঘায়ে ডুবে গেলে, আরোহীরা একটা ছোট নৌকোয় করে অকূল সমুদ্রে ভাসতে থাকে। সঙ্গে যে খাবার ছিল তা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়, ক্ষুধার জ্বালায় একটি একটি করে লোক মরতে থাকে। তার ওপর সমুদ্রের সেই অঞ্চলটা ছিল হাঙ্গরে ভরা। নৌকোর আশেপাশে নরমাংসলোভী হাঙ্গরের দল সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায়, নৌকোর আরোহীদের মধ্যে থেকে এক আমেরিকান্ নিগ্রো, অসীম সাহসের সঙ্গে একটা ছুরি নিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে এবং একটা হাঙ্গরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মেরে নৌকোয় তোলে। সেই হাঙ্গরের মাংসে নৌকোর আরোহীরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এই রকম একবার নয়, পর পর কয়েক দিন ধরে সেই মহাপ্রাণ নিগ্রোটি নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে সমুদ্রে নেমে হাঙ্গর শিকার ক'রে সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করেছে। অবশেষে একটি মিত্রপক্ষীয় জাহাজ এসে তাদের উদ্ধার করে।

* * *

বাংলার অর্থসচিব, হিন্দু মহাসভার জনপ্রিয় নেতা ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন। গভর্ণরের সঙ্গে মতের অমিল হওয়াতেই তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

---

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লেখাটা এই রকম হবে ( বোঝাবার জন্য পরিবর্ত্তিত শব্দগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া হ'ল ) :—

সেটা (চিড়িয়া)(খানা)—চারদিকে (হায়া)(না) (গণ্ডা)র (ম্যান্)(ড্রিল্) (ব্যা)বুন (বা)(নর) (জিরা)ফ (কু)মীরে ভ(রা), তবে (খাঁ)(চায়) (আট)(কান্)। তবু (বেশ) ভয়েই ভি(তরে) ঢু(ক)লাম।

---

### উত্তরদাতাদের নাম

রত্না, স্বপ্না ও জয়ন্ত রায় ( বাঁকীপুর ) ; আর্য্য, অমিতাভ, বেবি, টুকুন, গৌরী, মন্টি, উমা ; মণীন্দ্র, ভূপেন, অনন্ত, যামিনী, বিজলী, মা, বাবা, কাকা, কাকীমা, জয়া, বুলু ; সিরাজ, বিবি, দেবী-প্রসাদ, প্রবোধ, নারায়ণ, মাণিক ( যশোহর ) ; কবিতা দেবী ( বালীগঞ্জ ) ; শ্রী ও জয়শ্রী সেন ( ঢাকা ) ; গদাধর মাইতি ( পাটনা ) ; শক্তি বসু ( দিল্লী ) ; কল্পনা রায় ( এলাহাবাদ ) ; সীতা দেবী ( কলিকাতা ) ; মৃগাঙ্ক ও রত্নমঞ্জরী ( কলিকাতা )।

---

## নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি এক-একটি খাবারের নাম দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। ভিতরে ভিতরে ইচ্ছামত দাঁড়ি-কমা বসিয়ে নিতে পার।:—

ওকে —স? আমাদের —নন; বাড়ী ঢাকা —তা হা—য় —সে কাজ করেন। ওকে বলেন — ভীষণ দয়া—নবার যো নেই কিন্তু। অব— পেলেই দান করবে। ওর খ— বছরই পাই। সেবার এ — র আসামীকে নিজের বি— দিয়ে দিল! আর একবার —খেতে কা—কি দেখা গেল না, দেখি ওর — — — টাক পথ দিব্যি চলে এসেছে!

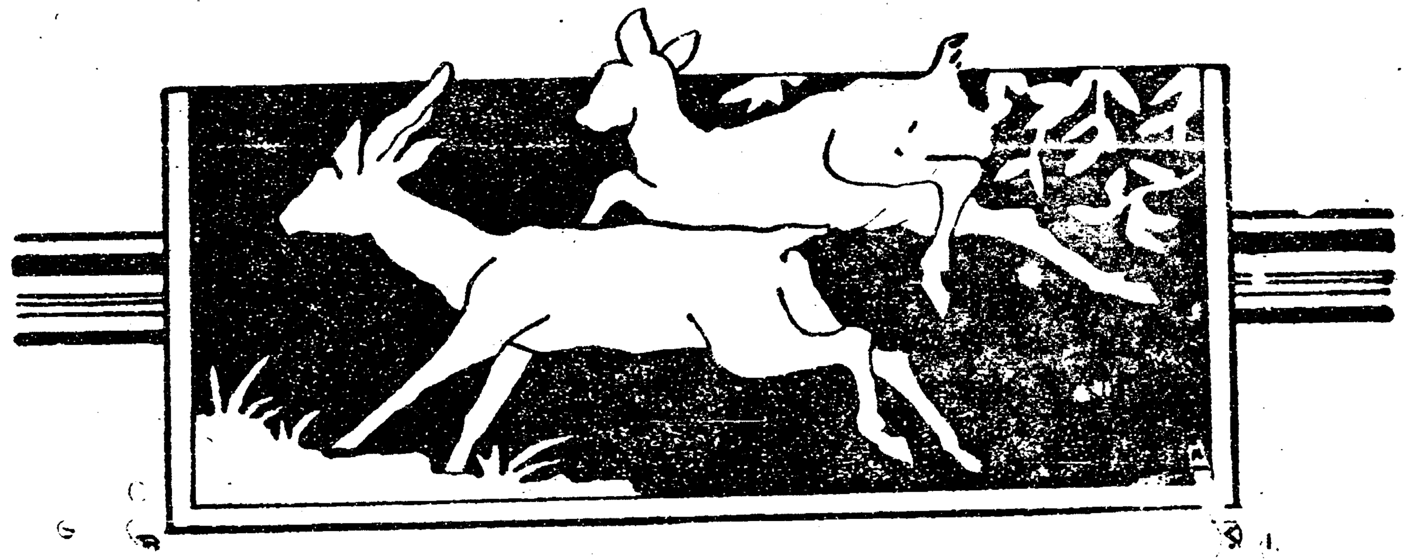

## গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে 'রামধনু'র ১৫শ বর্ষ শেষ হ'ল। পরবর্ত্তী সংখ্যা থেকে রামধনু ১৬শ বর্ষে পড়বে। রামধনুকে যাঁরা এতদিন স্নেহের চোখে দেখে এসেছেন তাঁদের এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্ত্তমানে কাগজ কি রকম দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে তা কে না জানে? সাধারণ খাতার জন্য দু' দিস্তা কাগজ কিনতে গেলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়। সম্প্রতি সরকার থেকে জানান হয়েছে যে এদেশে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগই তাঁরা তাঁদের দরকারে নেবেন, বাকী দশ ভাগ মাত্র বেসরকারী কাজে পাওয়া যাবে। এক সংবাদপত্র হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন যে এর ফলে ভারতে প্রতি বছর বেসরকারী কাজে যত কাগজ লাগত তার মাত্র শতকরা ২½ ভাগ পাওয়া যেতে পারে।

ফলে কাগজের বাজারে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, এবং সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ বা পুস্তক প্রকাশ ( এবং ঐ ধরণের যে সব কাজে প্রচুর কাগজ লাগে তাও ) যে কি ক'রে সম্ভব হবে তা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যাবৎ রামধনুর জন্য মিল্ থেকে কিছু কিছু কাগজ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন তা বহু চেষ্টা ক'রেও একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। রামধনুর মত সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার জন্য প্রতি বছর কি প্রচুর পরিমাণ কাগজ লাগে তার হিসাব দেওয়া অনাবশ্যক। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাসাধ্য কমিয়েও এখন আর প্রয়োজনীয় কাগজ যোগাড় করা যাচ্ছে না।

এখন কথা হচ্ছে, ক... ভবিষ্যতে কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে যখন আমরা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত তখন সম্পূর্ণ এ... বছরের উপযোগী কাগজের ব্যবস্থা না ক'রে নতুন বছরের, রামধনুতে হাত দেও... যুক্তিযুক্ত নয়। কয়েক সংখ্যা বার করার পর যদি মোটেই কাগজ না পাওয়া যা... তখন আরও বিব্রত হ'তে হবে। তাই আমরা ঠিক করেছি যে আপাততঃ কিছুদিন আমরা রামধনুর প্রকাশ বন্ধ রাখব। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। হয়তো কিছুদিন পরে আরও কিছু কাগজ বেসর... কাজের জন্য দেওয়া হ'তে পারে। কাগজ সংগ্রহ

[ ২ ]

হ'লে আবার বৈশাখ থেকে রামধনু প্রকাশের ব্যবস্থা হ র—অর্থাৎ রামধনুর ষোড়শ
বর্ষের ১ম সংখ্যা মাঘ (১৩৪৯) সংখ্যা না হয়ে বৈশাখ (১ ০) সংখ্যা হবে।
আর যদি বিধি নিতান্তই বাম হ'ন -এই তিন ম সের মধ্যেও কাগজের কোন
ব্যবস্থা করা না যায় তা হ'লে বাধ্য হয়েই, অনিশ্চিত কালের জন্য রামধনু প্রকাশ
স্থগিত রাখতে হবে। (এবং সে রকম হ'লে বোধ হয় অনেক পত্রিকাকেই ঐ রকম
করতে হবে।) তবে এর থেকে 'রামধনু' বরাবরের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এ কথা মনে
করবার কোনই কারণ নেই।

রামধনুর অধিকাংশ গ্রাহকেরই দেওয়া চাঁদা এ ই পৌষ সংখ্যায় শেষ হ'ল।
নতুন বছরের চাঁদা তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে এখন পাঠাবে না, পাঠাবার আগে আমরা
তাঁদের জানাব। অত্যধিক মূল্যে কাগজ কিনে রা ধনু বার করতে হ'লে হয়তো
রামধনুর মূল্যও কিছু বাড়াতে হ'তে পারে; তবে বর্ত্তম ন অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে একান্ত
নিরুপায় না হ'লে মূল্যবৃদ্ধি করা হবে না। যাঁদে র দেওয়া চাঁদা এখনও শেষ
হয় নি তাঁরা বৈশাখ সংখ্যা থেকে কাগজ বেরোলে অব ই তাঁদের প্রাপ্য সং গুলি
পাবেন। আর যদি ঐ সংখ্যা বার করা অদূর ভবি ষ্যতে বাস্তবিকই সম্ভব না হয়
তবে অপ্রাপ্ত সংখ্যাগুলির অনুপাতে তাঁদের চাঁদার ব াকি অংশ ঐ দামের বই দিয়ে
বা অন্য ভাবে তাঁদের ফেরৎ দেওয়া যাবে।

ষোড়শ বর্ষের রামধনুকে যতদূর সম্ভব ছোট দের মনের মত করবার জন্য
আমরা নানা ব্যবস্থা করে রেখেছি। রামধনুতে যে স বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা লিখে
আসছেন তাঁরা তো আছেনই, তা ছাড়া শিশুসাহি ত্য অত্যন্ত জনপ্রিয় দু' জন
লেখকের দু'খানা নতুন ধারাবাহিক উপন্যা পনেরে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমরা জানি, রামধনুর গৌরবে জ্জ্বল কারা বর্ত্তম াটি বছরের কথা স্মরণ ক'রে
তার অগণিত পাঠকপাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহি অপ্র ান পরিস্থিতিটাকে সহানুভূতির
চোখেই দেখবেন এবং রামধনু যখন পুনরায় আ কাশ করবে তখন তাকে আগের
মতই স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। ইতি—

সম্পাদক, রামধনু।



ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বের ইতিহাস ও জীবনী। (৭) অজয়কুমার মিত্র, ৬৮নং বেচারাম দেউড়ী, ঢাকা। ঝোঁক—সাহিত্য ও বিজ্ঞান। (৮) দেবব্রত সেন, C/o শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, উকিল, গোয়ালপাড়া (আসাম); বয়স ১২ বছর।

বিলাতের সখের ফুটবল দল ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্‌স্ কলিকাতায় আসিয়া মহামেডান্ স্পোর্টিংএর সহিত প্রথম খেলায় ড্র করিয়াছে, সে খবর তোমরা গেল বারেই পাইয়াছ। তার পর ঐ দল বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে অনেকগুলি ম্যাচ্ খেলিয়াছে; বেশীর ভাগই তারা জয়লাভ করিয়াছে, কয়েকটি খেলা 'ড্র' হইয়াছে, এবং একমাত্র ঢাকায় তারা হারিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় এদের ২য় খেলা হয় মোহনবাগানের সঙ্গে। তার আগের দিন তারা জামসেদপুরে গিয়া ৫-২ গোলে জিতিয়া আসিয়াছিল। মোহনবাগান খুব ভাল খেলিয়াও এক গোলে পরাজিত হয়। তৃতীয় খেলা হয় আই-এফ্-এর বাছাই দলের সঙ্গে। ফল হয় ড্র (১—১)। ৪র্থ খেলা হয় নিখিল ভারতীয় দলের সঙ্গে। নামে নিখিল ভারতীয় হইলেও এই দলের খেলোয়াড়েরা সকলেই কলিকাতায় আই-এফ্-এতে খেলিয়া থাকেন। খেলায় ভারতীয় দল ২ গোলে পরাজিত হয়। তার পর ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের কাছে কোরিন্থিয়ান্‌স্ দলের প্রথম পরাজয় ঘটে। (১—০)। ইষ্ট বেঙ্গলের বি, সেন এই গোলটি দেন। সারা ভারতের মুখরক্ষা করিয়াছে ঢাকা—কারণ বিলাত হইতে বাহির হইয়া কোরিন্থিয়ান্‌স্ দল এ পর্য্যন্ত আর কারো কাছে হারে নাই। পর দিন অবশ্য কোরিন্থিয়ান্‌স্ ঢাকাকে ১ গোলে হারাইয়া দেয়। তার পর বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অনেক সহরে তারা খেলিয়াছে। তার মধ্যে ময়মনসিংহ

তাদের কাছে ৬ গোলে হারিয়াছে, পাটনার বিহার দল ৫ গোলে হারিয়াছে। চট্টগ্রাম ১ গোলে হারিলেও খুব ভাল খেলিয়াছিল। ধানবাদে আই-এফ্-এ দলের সঙ্গে ও লক্ষ্ণৌএ যুক্তপ্রদেশ দলের সঙ্গে কোরিন্থিয়ান্স্‌দের ড্র হইয়াছে।

* * * *

লর্ড্ টেনিসনের ক্রিকেট-দল ভারতে আসিয়াছে এবং লাহোরে নিখিল ভারতীয় দলের সহিত ১ম খেলায় ভারতকে হারাইয়া দিয়াছে সে খবরও তোমরা পাইয়াছ। তার পর রাজপুতানা দলের কাছে টেনিসন দলের প্রথম পরাজয় হয় (রাজপুতানা—২৩৭, ৮৯ (৮ উইকেট) টেনিসন দল—২১২ ও ১১২)। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও 'ক্রিকেট ক্লাব্ অব্ ইণ্ডিয়া' দলের সঙ্গে টেনিসন দলের ড্র হয়, আর নওয়ানগরের কাছে তাদের আবার পরাজয় ঘটে। (নওয়ানগর—২০৬, ২২৩ (৭ উইকেট), টেনিসন দল ১২৬, ২৬৯)। নওয়ানগরের পক্ষে অমর সিং ২ ইনিংসে একাই ১০ জনকে আউট করেন এবং ২য় ইনিংসে অদ্ভুত ভাবে পিটাইয়া ৮১ রান্ করেন। মহারাষ্ট্র দলের প্রফেসর দেওধর ১১৮ রান্ করেন। টেনিসন দলের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম সেঞ্চুরি।

সম্প্রতি বোম্বাইএ নিখিল ভারতীয় দলের সহিত ২য় খেলাও (টেষ্ট) শেষ হইয়াছে। ভারতীয় দল এবারেও ৬ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। (টেনিসন দল ১৯১, ১৭১ (৪ উইকেট), ভারতীয় দল ১৫৩, ২৩৮)। তরুণ খেলোয়াড় বিন্নু মানকড় এই খেলায় খুব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

---

## সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

(১) মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়া। (২) সান্‌ইয়াৎসেন। (৩) সিন্ধু (৪) রেড্ উড্ গাছ (ক্যালিফোর্ণিয়া)। (৫) পারদ লোহার চেয়েও ভারী; পারদের আকার কঠিন নয়, তরল, এবং পারদ একটা ধাতু। (৬) ১নং—ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল; ২নং—কলোসিয়াম্, রোম।

---

# ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

### মাটি-মা

(শ্রীদেবব্রত সেনগুপ্ত)

শস্য-শ্যামলা জন্মভূমি গো,
ভালবাসি আমি তোরে,
তোর জলবায়ু—ঘাট, মাঠ, বাট
পাগল ক'রেছে মোরে।
আম্র-মুকুল, বন-ছায়াতল,
কোকিলের কুহুতান,
মৌমাছিদের মধুগুঞ্জন,
রাখালের গেঁয়ো গান,
শুক্‌না নদীর উঁচু-নীচু পাড়—
কল-কল্লোল স্বর,
পাল-তোলা নাও, ধূধূ বালুচর,
তরুশাখা-মর্ম্মর,
রজনী-গন্ধা ফুলের সুবাস,
রাতের শীতল বায়,
এঁকে-বেঁকে-চলা গেঁয়ো পথখানি
ডাকিতেছে মোরে "আয়"।
পাগল ক'রেছে, আকুল ক'রেছে
পরাণ আমার তাই,
ছুটিয়া এসেছি মাটি-মার কাছে,
আজ মোর দুখ নাই।

---

### ইচ্ছা

(শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলী)

ইচ্ছা হয় মস্ত বড় হই একটী 'জিনিয়াস,'
নোবেল প্রাইজ—অম্‌নি কিছু কীর্ত্তিগাথা কিনি আজ।
(তাই) লিখ্‌ব আশায় বসি রোজই খাতা-কলম খুলে গো,
(কিন্তু) বস্‌তে গেলেই নিদ্রা আসে, মাথাটি যায় গুলে গো!

ইচ্ছা হয় একদিনে হই 'কোটিপতি', দাদা রে,
ব্যবসা ফেঁদে লক্ষ্মী-মারে রাখ্‌বো ঘরে বাঁধা রে!
(তাই) দিলাম দোকান—কিন্তু হয় না একটী পয়সার বিক্রী
দু'মাস যেতেই মহাজনে কর্‌লে সেটা ডিক্রী।

ইচ্ছা হয় যে মস্ত বড় হই একটা 'পালোয়ান',
পায় দিব না জুতা-মোজা, গায় দিব না আলোয়ান।
( তাই ) মুগুর কিনে ডন-কুস্তির করি রোজই আয়োজন
( কিন্তু ) ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় রোজই ক'মে যায় ওজন।

ইচ্ছা হয় মস্ত বড় হই একটা 'বক্তা',
টেবিল চাপ্‌ড়ে গলার জোরে মিটাই মনের সখ্‌টা।
( কিন্তু ) যদিই বা কোনক্রমে দাঁড়াই 'প্ল্যাট্‌ফর্‌মে'
বুক কাঁপুনির চোটে সাহস হয় না আর ও-কর্ম্মে।

ইচ্ছা হয় হই একটা দিব্যি 'বাবু' মস্ত,
টেড়ি মাথে ছড়ি হাতে ফ্যাসন্‌টা দুরস্ত।
কিন্তু হায়রে মুখের সামনে ধর্‌লে পরেই আয়না
'ছুরৎ' দেখে সাজ্‌তে 'বাবু' মনটা ত আর চায় না

ইচ্ছা হয় মস্ত বড় হই একটা 'গায়ক',
তানসেন বা তারই মত মস্ত গানের নায়ক।
( তাই ) গেলাম যদি ধরতে সুরটা একটু কেসে গলাটা
( অম্‌নি ) কাঁপতে লাগ্‌ল দালান, বাবা দিলেন কানমলাটা।

ইচ্ছা হয় গো দেখে-শুনে সব ছেড়ে হই বাহির
ধ্যানে মগন হ'য়ে আজি নামটা করি জাহির।
( তাই ) হ'লেম 'সাধু'—দুরদৃষ্ট! বলে সবাই 'ভণ্ড',
( হায় ) কোন ইচ্ছাই হয় না পূরণ—সবই হ'ল পণ্ড।

---

# ছোটদের চিত্রশালা

লছমন ঝোলা সেতু,
হরিদ্বার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র গৃহীত
আলোকচিত্র

---

## শিশুসাহিত্য-সংবাদ

**চীন জাপানের এ-ও-তা**—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ। নিউ পাবলিশিং হাউস। দাম ৶০। চীন ও জাপানের নানা বিবরণ ছেলেমেয়েদের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লেখা। পড়লে যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি অনেক কিছু শিখতেও পারবে।

**পৃথিবীর গল্প**—সম্পাদক অনুবাদক শ্রীসতীকান্ত গুহ ও শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাচী পাবলিশিং হাউস। দাম ১৷০। পৃথিবীর কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা কয়েকটি গল্পের অনুবাদ বেশ ঝরঝরে ভাষায় লেখা। বইখানার বহিরবয়ব বেশ ভাল, ভিতরে শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর আঁকা কতকগুলি ছবি আছে।

**পৃথিবীর উপন্যাস**—সম্পাদক অনুবাদক শ্রীসতীকান্ত গুহ ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাচী পাবলিশিং হাউস। দাম ১৲। এই বইখানায় ডিকেন্স, ভিক্তর হুগো, বালজাক্ ও এল্ডারের চারখানা বিখ্যাত উপন্যাস ছেলেদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে; তোমরা পড়ে বেশ আনন্দ পাবে। ভিতরে অনেকগুলি হাফটোন ও রেখা-চিত্র আছে।

---

# রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

দশম বর্ষের রামধনুতে (মাঘ, ১৩৪৩—পৌষ, ১৩৪৪) যত গল্প-প্রবন্ধ বেরিয়েছে তার মধ্যে তোমার মতে সব চেয়ে ভাল ৫টি গল্প ও ৫টি প্রবন্ধের নাম লিখে পাঠাবে। সব মিলিয়ে ভোট নেওয়া হবে। ভোটে যে তালিকা প্রস্তুত হবে সেই তালিকার সঙ্গে যার তালিকা সব চেয়ে কাছাকাছি হবে তাকে ১ম পুরস্কার ও তার পরেরটিকে ২য় পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৮ই পৌষের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে তালিকা পৌঁছান চাই। কেবল মাত্র গ্রাহকেরাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। খামের উপর 'পুরস্কার-প্রতিযোগিতা' কথাটি লিখে দিতে হবে, এবং প্রত্যেক লেখার সঙ্গে গ্রাহকের নাম ও **নিজের গ্রাহক নং** দিতে হবে। যাঁরা পুরস্কার পাবেন তাঁদের ছবি রামধনুতে বেরোবে।

# সন্দেশ

চীনের উপর জাপানের লোভ অনেক দিন ধরিয়া। গত শতাব্দীর শেষ দিকে চীন-জাপান যুদ্ধে কোরিয়া চীনের হাতছাড়া হয়, ১৯৩১ সনে মাঞ্চুরিয়াও কার্য্যতঃ জাপানের অধীনে একটা সামন্ত প্রদেশে পরিণত হয়। তার কিছুদিন পর মঙ্গোলিয়ার জেহল প্রদেশ কাড়িয়া জাপানী সৈন্য পেইপিংএর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হয়। কতকগুলি সর্ত্তে তখনকার মত তারা থামে কিন্তু তখন হইতেই টিয়েনৎসিন ও কাছাকাছি জায়গায় জাপানী সৈন্য থাকিত। গত বছরের মাঝামাঝি একদল জাপানী সৈন্য যুদ্ধের নানা কায়দা (মানোভার) অভ্যাস করিতেছিল, চীনারা ভুল বুঝিয়া তাদের আক্রমণ করে। সেই হইতেই গোলমাল সুরু হয়। উত্তর চীনে চীনা ও জাপানীতে বে-সরকারী যুদ্ধ লাগিয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে জাপানীরা সহরের পর সহর দখল করিতে থাকে। শেষে নানকিং সরকারকে তাড়াতাড়ি জব্দ করিবার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে জাপানীরা সাংহাইএ চীনাদের আক্রমণ করিল। তিন মাস ধরিয়া চীনারা প্রাণপণে জাপানীদের বাধা দিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাপানীদের ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও ভারী কামানের সঙ্গে



আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। গত নভেম্বরে তাদের সাংহাই হইতে হটিয়া যাইতে হইল। জাপানীরা এইবার দ্রুতগতিতে সহরের পর সহর দখল করিতে করিতে নানকিংএর দিকে অগ্রসর হইল। জাপানীদের যুদ্ধজাহাজ ঠেকাইবার জন্য চীনারা ইয়াংসিকিয়াং নদীতে কতকগুলি বাঁধ দিয়াছিল, জাপানীরা সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিল। চীনারা অবস্থা দেখিয়া তাদের রাজধানী ও দপ্তর সেচুয়ান প্রদেশে চাংকিংএ লইয়া গেল। জাপানী সৈন্যেরা অবশেষে নানকিং সহরও দখল করিয়াছে।

* * *

চীনা সহর, নদী ইত্যাদির নামগুলির কিছু অর্থ যাতে বুঝিতে পার সেজন্য কয়েকটি চীনা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এখানে দেওয়া গেল—

টুং—পূর্ব্ব, সি—পশ্চিম, পেই—উত্তর, নান—দক্ষিণ, সান, লিং—পর্ব্বত, কিয়াং, হো—নদী, হোয়াং—পীত। এই ভাবে পেকিং—উত্তরের রাজধানী, নানকিং—দক্ষিণের রাজধানী, টুংহাই—পূর্ব্ব সমুদ্র, সিকিয়াং—পশ্চিম নদী ইত্যাদি। সানটুং, সানসি, হোনান, হোপেই প্রভৃতি নামগুলির অর্থ এখন বোধ হয় তোমরা চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবে।

* * *

স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হাতে আস্তুরিয়া ও বাস্ক অঞ্চল গিয়াছে, ম্যাড্রিড বা অন্য কোন জায়গায় এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—শীঘ্র হইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

* * *

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) তাল (২) পাড় (৩) গুণ

উত্তরদাতাদের নাম

দিলীপকুমার ব্যানার্জ্জি, নিখিল চৌধুরী, (জলপাইগুড়ি); মৃদুলানন্দ দাশগুপ্ত (কুষ্টিয়া); কমল, পচু, বেলু, (ইটালি); অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, নির্ম্মল, পুতুল (কলিকাতা); জ্যোৎস্না রায় (কলিকাতা); হরিহর, খোকা, শান্তি মজুমদার (বালীগঞ্জ); মঞ্জুশ্রী দেবী (ভবানীপুর); তরুণকুমার ও প্রসূনকুমার ব্যানার্জ্জি (রংপুর); সুকৃতি সরকার (বালীগঞ্জ); কাটু, বলাই, রামপ্রসাদ সিং বেহালা; অজিতকুমার সান্যাল, কল্যাণী দেবী, মিহির (পাবনা); সুকুমার পাল ও মায়া পাল

(উল্লাপাড়া); রাখাল, তারা, মনা (নীলফামারী); ডলি, তুলতুল, দেবাশীষ (রংপুর); নিখিল চৌধুরী (কুমিল্লা); শিবানী ও কল্যাণী সরকার (ধুবড়ী); মায়া, সুলক্ষণা, কাজল (ফয়জাবাদ); পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া); সুনীলবন্ধু ভৌমিক (পাটনা); ছায়া দেবী (রতনপুর); পুলিন, বিমল, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); আভা, অরুণ, বিমান (হাসনাবাদ), চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যগণ (কলিকাতা); বাণী বিশ্বাস, বিমল, অমল (ভবানীপুর); ভুজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (চন্দননগর); অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (কালীঘাট); মীরা, বিলু, শান্তি চট্টোপাধ্যায় (বারুইপুর); সমীর চৌধুরী, সন্তোষ চৌধুরী (আঙ্গুল); উত্তরা চৌধুরী (কটক); অমলবরণ, প্রতুলকুমার রায় (সাটীরপাড়া); অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব ও ঘনশ্যাম (বালীগঞ্জ); পাঁচু, পঞ্চমী, রাখু (বারাসত); অরুণা সেন (কলিকাতা); ঝণ্টু ও নণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় (ডোমার) প্রতুলকুমার রায় চৌধুরী (পুরুলিয়া); আশা, শান্তি, শেফালি (ধুবড়ী); সুনীল, গৌরীদি, রেণুদি (মুন্সীগঞ্জ); রথীন্দ্র ও সুনীল সেন (দিনাজপুর); প্রফুল্ল, বিশু, ক্ষিতীশ (যোগদা—ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, রাঁচি); রেণু চৌধুরী (রাজসাহী); বীণারাণী গুপ্ত ও জহরলাল (ডলু চা-বাগান); বাসন্তী, কল্যাণী, নীহার প্রভৃতি (শ্রীহট্ট); কামাখ্যা প্রসাদ দেব, অনিমারাণী দেবী (শ্রীহট্ট); শিবপ্রসাদ দাস (কলিকাতা); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ (শালিখা); বাণীমন্দিরের সভ্যবৃন্দ (মুড়াগাছা); প্রভা, প্রবীণ, পূরবী প্রভৃতি (বেতিয়া); মন্মথ, বাদল, রমা; প্রভা, ঘুছু, তরু (বালীগঞ্জ); অসীমরঞ্জন ও ননী সেন, দীপ্তি (সাটিরপাড়া); বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ (শালিখা); সবিতা রায়, মা, দাদা (কুমিল্লা); মণি দাস, খোকন, অশোকমঞ্জু (শ্রীহট্ট); ভারতী সেন (গয়া); বিশ্বনাথ দে (কলিকাতা); বিমলা, শতদল, বিদ্যুৎ (ডেহরী অন্ শোন); অরুণা, ডলি, বেলু প্রভৃতি (সিংরৈল); রাণী, শিবানী, মহাবীর প্রভৃতি (লালমণির হাট); অনিলকৃষ্ণ, নীরেন্দ্রনাথ, ব্রজগোপাল গোস্বামী (বাণীগ্রাম); শঙ্কর মিত্র, চন্দ্রনাথ, সীতানাথ (ভবানীপুর); প্রমথ, বটু, শামু (ধেমো মেন্ কলিয়ারী); রুবী চ্যাটার্জ্জী (ভাগলপুর); নরেশচন্দ্র গুহবক্সী, নিখিল ও সচিত্র শিক্ষার লেখকগণ (বিন্যাফৈর); বিকাশচন্দ্র শ্যাম (কাষ্টঘর); বিশ্বনাথ সিংহ (বেলফুলিয়া); রমেন্দ্রনাথ রক্ষিত (রাজসাহী); আরতি ও প্রতিমা চৌধুরী (পাটনা); রণেন্দ্র, সমীতা, গোপা (ধুবড়ী); ফুলু, তোতা, শুভেন্দু প্রভৃতি (পাটনা); মীরানন্দিতা দাশ (লাহোর); অনিমা পাল (শিলং); অঞ্জলি, বিজন, সিধু চৌধুরী (কলিকাতা) সুধীর, সুভাষ, শান্তি প্রভৃতি (ফরিদপুর); স্মৃতি সান্যাল (লক্ষ্ণৌ); জগন্নাথ, মনোতোষ, কামাক্ষী প্রসাদ বিশ্বাস (আলিপুর দুয়ার); সমরেন্দ্র, অমরেন্দ্র, শ্যামলকুমার নাথ (কলিকাতা) সুনীলকুমার গোস্বামী, রেণুকণা, মলিনা (বালী); কুমার প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কালীকচ্ছ);



সুভাষ রায় (বহরমপুর); নলিনচন্দ্র, পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় (মেলেকোলা) বাবামা, লতিকা, যূথিকাসুন্দরী চন্দ্র (মান্দ্রাজ); করুণা, অনিমা, নীলিমা (ইকড়া); পুতুল, গৌরী (খারুয়া), কোকডহরা জাহ্নবী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (টাঙ্গাইল); কল্যাণী, সরলা, নমিতা (কলিকাতা); মান্দারকান্দি এম্, ই, স্কুলের ছাত্রবৃন্দ; তপন ও সবিতা সেন (রেঙ্গুন); সান্ত্বনা ও সাধনা ঘোষ (যশোহর); রমাপ্রসাদ মিত্র, দাসু, ছোট (কলিকাতা); বিজলীপ্রভা, রণেন, গুণেন রায় (কলিকাতা); শান্তি দত্ত (শিলং); মিলনের মা, সুনীল, সুশীল বিশ্বাস (কুমিল্লা); দেবাশীষ সরকার (সরিষা); সাধন ও তপনকুমার দত্ত (বালীগঞ্জ); প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র (ভবানীপুর); দীপালি, আলোক, পুলক রায় (জলপাইগুড়ি); মনীষকুমার বসুমল্লিক (ফুলেশ্বর); কল্যাণী ঘোষ (দিনাজপুর); স্থাণুবালা কর (কলিকাতা); মঞ্জিমামুকুল দত্ত (মেদিনীপুর); রেণু, দুর্গা, সতীরাণী মৈত্র (রাজসাহী); চিনু ও শান্তি (জলপাইগুড়ি); কাবুল, বাবলু আবুল (কিশোর লাইব্রেরী—কলিকাতা); ভূপেশ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন ধর, কুমুদ রায় চৌধুরী (বাণিয়াচং); রমাকান্ত, বাসন্তী, বীণা চৌধুরী (চরনারচর); কুমুদ, মীরা, কুশলকুমার বাগচী (কলিকাতা); গোপালচন্দ্র ঘোষ, পাঁচুগোপাল ঘোষ (গারুলিয়া); দি ভৌমিকস্ (বালীগঞ্জ); বীরেন্দ্রনাথ গুহ (ভবানীপুর); প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (শ্যামনগর); মালবিকা ও অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); চিত্ত, মনু, বিভাস (জ্যোৎশ্রীরাম); জ্যোৎস্না সেন (কলিকাতা); মনোরমা দেবী ও গৌরী দেবী (ভবানীপুর)।

---

## নূতন ধাঁধা

জমীদার-বাড়ীর পুরানো দলিলপত্র ঘেঁটে নীচের অদ্ভুত কাগজখানা পাওয়া গেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাগজে লেখা শব্দগুলি উল্টে পাল্টে বসান হয়েছে, সেগুলি যথাস্থানে বসাতে পারলেই রহস্য ভেদ হবে। একবার চেষ্টা করে দেখ তো—

অন্দর দ্বিতীয় খুঁড়িয়া কেবল মহলে ঘরের কোণে গাছের
ঢুকিয়া পাইবে; দক্ষিণ কতক যাও, যে পশ্চিমে হইতে
গর্ত্ত আছে এক হাত না তলায় পেয়ারা ঘড়া
কয়লা খোঁড়। পর্য্যন্ত ধৈর্য্য বাদশাহী হারাইয়া পঁচিশ তাহা
মোহর দশ গুলি আরও দেয়াল আমলের হাত পাইবে।

---

# গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

এই পৌষ সংখ্যায় রামধনুর দশম বর্ষ শেষ হইল, আগামী মাঘ হইতে একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইবে। এ বছর যাঁহারা রামধনুর গ্রাহক আছেন, আশা করি তাঁহারা আগামী বছরও গ্রাহক থাকিবেন। গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করিয়া আগামী বছরের বার্ষিক চাঁদা ২৷৵০ বা ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৷৵০ মনি অর্ডারে আগামী ১৮ই পৌষের মধ্যে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। স্থানীয় গ্রাহকেরা হাতে রামধনু কার্য্যালয়ে বা শাখা-কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড্ কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা) টাকা জমা দিতে পারেন। কেহ কোন বিশেষ কারণে গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া ১৮ই পৌষের মধ্যে আমাদের জানাইবেন। ঐ তারিখের মধ্যে কাহারও টাকা বা চিঠি কোনটাই না পাইলে মাঘ সংখ্যা আমরা তাঁহার নিকট ভি. পি. তে পাঠাইব। আশা করি সহৃদয় গ্রাহকেরা সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়া আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করাইবেন না। ভি. পি. তে পত্রিকা লইলে ।/০ অতিরিক্ত ভি. পি. মাশুল দিতে হয়, অর্থাৎ ২৸৵০ লাগে; পত্রিকা পাইতেও কিছু দেরী হয়। কাজেই মনি অর্ডারে টাকা পাঠানই সুবিধাজনক।

**ব্রহ্মদেশ** সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ হইয়া যাওয়ায় ডাক মাশুলের হার অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে (একখানা রামধনু পাঠাইতে ৫ স্থলে /১০ লাগিতেছে)। কাজেই ব্রহ্মদেশের গ্রাহকদের নিকট এ বৎসর হইতে অন্যান্য বৈদেশিক গ্রাহকদের মতই অতিরিক্ত ৸৵০ চাঁদা ধরিতে হইল। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ৩৷/০ মনি অর্ডার করিবেন।

আগামী বছর রামধনুতে পৃষ্ঠা-সংখ্যা এ বছরের চেয়ে বাড়ান হইবে, রামধনুকে আরও বৈচিত্র্যময় করিবারও চেষ্টা করা হইবে। পুরস্কার-প্রতিযোগিতা খুব ঘন ঘন দেওয়া হইবে।

**—রামধনু কার্য্যাধ্যক্ষ**
১৬নং টাউন্‌সেণ্ড রোড্, ভবানীপুর,
কলিকাতা